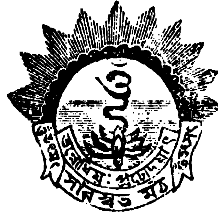


আর্য্যশাস্ত্রগহনার্থদীপক-
শ্চেতসস্তিমিরবারবারকঃ ।
দ্যোতয়ন্নিজম্মা স্বপ শ্চতা-
মর্চ্চিষা হৃদয়মার্য্যদর্পণঃ ॥



আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে
তত্রত্য ঋষি-বিদ্যালয় হইতে
ব্রহ্মচারী-সঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত

—*—

একবিংশ বর্ষ---১৩৩৫

—*—

সম্পাদক—স্বামী নির্ব্বাণানন্দ সরস্বতী

বার্ষিক মূল্য— ২৷৷৹ প্রতি সংখ্যা—।৹

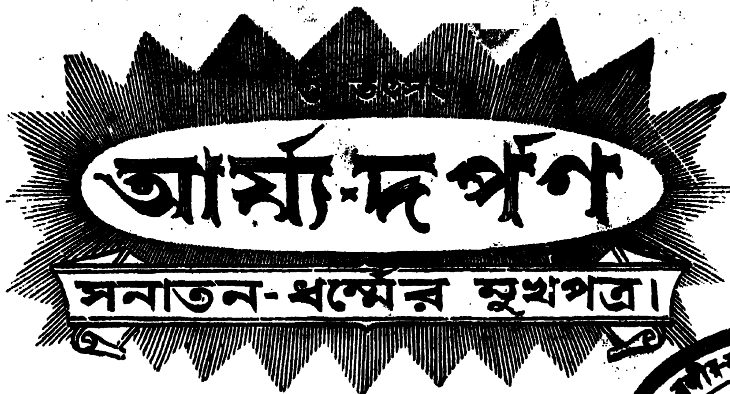
যোরহাট
সারস্বত মঠস্থ "যোগমায়া প্রিণ্টিং-ওয়ার্কচ্" হইতে
ব্রহ্মচারী সতীশ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

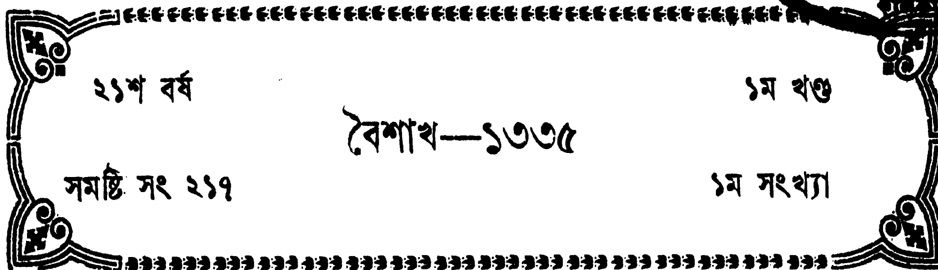
সূচী

(বর্ণমালা অনুসারে)

—:*:—







রক্ষোহা

—*—

ঋগ্বেদ সংহিতা—৪।৪।১-৭

—*—

[বামদেব ঋষিঃ—অগ্নির্দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ]

কৃণুষ্ব পাজঃ প্রসিতিং ন পৃথ্বীং
যাহি রাজেবামবাঁ ইভেন।
তৃষ্বীমনু প্রসিতিং দ্রূণানো-
স্তাসি বিধ্য রক্ষসস্তপিষ্ঠৈঃ॥

বিশাল বাগুরা হেন শিখা তব ছড়াইয়া দাও,
রাজা যেন পাত্র সহ করিপৃষ্ঠে গর্ব্বভরে যাও।
ছুটে যায় রক্ষসেনা, তড়বড়ি তারি পাছে ছোটো
খেদাড়িয়া, মর্ম্ম মাঝে তপ্ততম শেল হয়ে ফোটো!

তব ভ্রমাস আশুয়া পতন্ত্য
অনু স্পৃশ ধৃষতা শোশুচানঃ।
তপূংষ্যগ্নে জুহ্বা পতঙ্গান্
অসংদিতো বি সৃজ বিষ্বগুল্কাঃ॥

দ্রুতগতি শিখা তব চঞ্চলিয়া দিকে দিকে ধায়—
নির্ম্মম পরশে দহ বিদ্রোহীরে, ওগো দীপ্তকায়।
তপ্ত ওই শিখা হতে কত শত বিস্ফুলিঙ্গ ফোটে—
না মানি বন্ধন কারো চারিদিকে উহা যেন ছোটে।

ঊর্দ্ধো ভব প্রতি বিধ্যাধ্যস্মদ্
আবিষ্কৃণুষ্ব দৈব্যান্যগ্নে।
অব স্থিরা তনুহি যাতুজূনাং
জামিমজামিং প্র মৃণীহি শত্রূন্॥

আমাদের লক্ষ্যি যায়, তারে মন্ত্রে নিন্দিরে বলিয়া
ওঠ না দেবতা আজি—দিব্য তেজে ওঠ ঝলসিয়া।
অত্যাচারী রাক্ষসের দৃঢ় ধনু দাও শিথিলিয়া—
জ্ঞাতি বা বে দাণ হোক, সর্ব শত্রু মার নিপীড়িয়া।

প্রতিস্পশো বি সৃজ তূর্ণিতমো
ভবা পায়ুর্বিশো অস্যা অদব্ধঃ।
যো নো দূরে অঘশংসো যো অন্ত্য্
অগ্নে মাকিষ্টে ব্যথিরা দধর্ষীৎ॥

পাঠাও তোমার চর শত্রুপানে, ওগো তূর্ণতম,
রক্ষা কর আমাদের, হে দেবতা কেহ নাহি তব সম।
বহুক কাছে বা দূরে, আমাদের কয় কটুকথা—
দাও সাজা হেন জনে, বন্ধু যেন নাহি দেয় ব্যথা।

স তে জানাতি সুমতিং যবিষ্ঠ
য ঈবতে ব্রহ্মণে গাতুমৈরৎ।
বিশ্বান্যস্মৈ সুদিনানি রায়ো
দ্যুম্নান্যর্যো বি দুরো অভি দ্যৌৎ॥

চঞ্চল, তরুণ তুমি, স্তুতি গাহি চাহে তোমা পানে—
তুমি যে বেসেছ ভাল, হে তরুণ, সে কথা সে জানে।
সুদিনের পায় লাগ, যত ধন পড়ে উপচিয়া—
ওঠে বস্ত্র ঝলমলি, দ্বারে প্রভু ওঠ বিভাতিয়া।

উদগ্নে তিষ্ঠ প্রত্যা তনুষ্ব
ন্যমিত্রাঁ ওষতাত্তিগ্মহেতে।
যো নো অরাতিং সমিধান চক্রে
নীচা তং ধক্ষ্যতসং ন শুষ্কম্॥

ওঠ অগ্নি! শত্রুপানে জ্বালা তব বিথারিয়া দাও—
তীক্ষ্ণ ওই শিখা মেলি উহাদের পোড়াও—পোড়াও!
জ্বালায়েছি কেন, শোন, যে অরাতি আমাদেরে মারে
শুষ্ক কাষ্ঠ সম দহ, হে নিঠুর—দহি পাড় তারে।

সেদগ্নে অস্তু সুভগঃ সুদানু-
র্যস্ত্বা নিত্যেন হবিষা য উক্থৈঃ।
পিপ্রীষতি স্ব আয়ুষি দুরোণে
বিশ্বেদস্মৈ সুদিনা সাসদিষ্টিঃ॥

গান গেয়ে খুসী করে, নিতি নিতি যোগায় যে হবি,
সে তো মহাভাগ্যবান্, যাহা কিছু দাও তারে সবি;
বেঁচে থাক্ চিরকাল—সুদিনের পেয়েছে সে নাগ—
ভরা ঘর থাকে যেন, সেই ঠিক করিয়াছে যাগ।

নববর্ষে

—*—

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনঃ যথা বঃ সুসহাসতি ॥

—তোমাদের আকূতি বা অভিপ্রায় এক হউক, তোমাদের হৃদয় এক হউক, তোমাদের মন এক হউক, যাহাতে তোমরা সর্ব্বতোভাবে এক হইতে পার।

যে বিচিত্র কর্ম্মের কথা, যে দিব্য অনুভূতির কথা বেদ নানা ছন্দে গাহিয়া গিয়াছেন, ইহাই তাহার শেষ অভিব্যক্তি, "মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতির ইহাই শেষ আশীর্ব্বাণী। এমনও বলিতে পারি, এই সমানুভূতির সীমানায় আসিয়া বেদের অন্ত হইয়াছে; কর্ম্মজীবনের পর্য্যাপ্তিতে বেদান্ত-জ্ঞানের আবির্ভাব এই মন্ত্রে সূচিত।

এই মন্ত্রের ঋষি কে?—সংবনন ইহার ঋষি। সংবনন শব্দের অর্থ মিলিত ভোগ। আঁধারের পরপারে আদিত্যবর্ণ মহান্তপুরুষকে পাইয়াও যে ঋষি-হৃদয়ের পূর্ণতা বিশ্বের পানে উপচিয়া পড়িয়াছে, অমৃতের আস্বাদনে অমর হইয়া বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া বলিয়াছে, "ওরে, কে কোথায় আছিস্ ছুটে আয় অমৃতের পুত্র তোরা দিব্য-ধাম হতে, এই যে অমৃতের উৎস উৎসারিত আমার হৃদয়ে" —একার সঞ্চয়কে নিখিলে বিলাইয়া দিবার এই যে আকুল প্রেরণা, ইহাই সংবনন। এই সংবনন তোমার হৃদয়ে আছে, আমার হৃদয়ে আছে। "মা গৃধঃ"—গৃধ্রের মত একা সকল ভোগ আগুলিয়া থাকিও না—যাহা তোমার, তাহা সবার হউক, এই সাধনায় সিদ্ধ হও—ব্রহ্মবিদ্ ঋষির সংবননের আকূতি বুঝিতে পারিবে।

কাহাদিগকে লক্ষ্য এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে? —যাহারা যজমান, তাহাদিগকে। ত্যাগের দীক্ষা যে পাইয়াছে, সেই যজমান; দিব্যস্বরূপের সহিত পরম সাম্য অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষা যার হৃদয়ে জাগিয়াছে, সেই যজমান। সে জানে, জগতে যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা আমার বলিয়া আঁকড়াইয়া রহিবার কিছু নয়; উহা দেবতারই দান, দেবতারই করুণা। আমি যদি উহাকে একান্তভাবে ভোগ করিতে যাই, তাহা হইলে উহা মৃত্যুস্পৃষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তের মাঝে শিথিল-পাণ্ডুর হইয়া পড়ে; কিন্তু এই মৃত্যুদিগ্ধ ভোগকেই যদি দেবতার পায়ে নিবেদন করিয়া দিই, তবে তাহা হয় ইড়া—যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত। অধ্রুব দ্বারা ধ্রুবকে পাইবার এই মৃত্যুপ্রোক্ত সঙ্কেত; এই সঙ্কেতের মর্ম্ম যে বুঝিয়াছে, সেই যজমান।

প্রাণের অরণিমন্থনে দেশমাতৃকার যজ্ঞবেদী আজ সমিদ্ধিত হইতেছে; ভোগোপকরণ উৎসর্গ করিয়া অমৃতের অধিকার লাভ করিতে ব্যাকুল বহু যজমান আজ যজ্ঞভূমিতে সমবেত। দেবতাকে যাঁহারা জানিয়াছেন, দেবতার সহিত যজমানের ঐক্য ঘটাইবার নিগূঢ় শিল্প যাঁহাদের করায়ত্ত, সেই ঋত্বিকেরও আজ অভাব হইবে না। সব আয়োজন প্রস্তুত; এইবার দেবতার আবাহন করিতে হইবে। বিশ্বনরের প্রতিনিধিরূপে বৈশ্বানরকে পাঠাইতে হইবে দিব্যধামের বার্ত্তাবহ করিয়া।—কিন্তু অপেক্ষা কর, একবার চারিদিক ভাল করিয়া চাহিয়া লই—

এই যে ইলস্পদে—যজ্ঞবেদিতে সমিদ্ধিত অগ্নি, ইনি "বিশ্বান্তর্য আ"—বিশ্বের সবার মাঝে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, আমাদের প্রত্যেকের প্রাণে প্রদীপ্ত রহিয়াছেন; ইহাঁকে সাক্ষী করিয়া বল—তোমরা

এক পথে চলিবে, এক কথা বলিবে এক মত আশ্রয় করিবে, ইহাই তোমাদের সঙ্কল্প কিনা!—বল, সংশয় করিও না, শঙ্কা করিও না; জগৎ জুড়িয়া স্বার্থলিপ্সার প্রচণ্ড বুভুক্ষা দেখিয়া মনে করিও না, উহাই সনাতন ধর্ম্ম। আমি বলি, মানুষের মাঝে যে পশু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এই বুভুক্ষা তাহারই; আরও একটু খেলাইয়া দেখ, পশুশক্তিকে বাহন করিয়া দেবতার আবির্ভাব। দেবতারা জানেন একের মন্ত্র, তাই তাঁহারা "দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বং সংজানানা উপাসতে"—তাঁহারা চিরকাল তাঁহাদের ভোগ সম্মিলিতভাবে করিয়া আসিয়াছেন, তাই তাঁহারা "সংজানানাঃ"—তাঁহাদের সংজ্ঞা আছে, এই কথাই বলি।—সংজ্ঞাহীন হইও না—পশু হইও না; বল, আমাদের যাহা কিছু তাহা একার জন্য নয়, তাহা সবার জন্য—আমাদের এক সঙ্গতি, এক সংবাদ, এক সম্মতি, এক সংজ্ঞা। আমিও আশীর্ব্বাদ করি—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং
সং বো মনাংসি জানতাম্!

—তোমাদের এক গতি হউক, এক বাদ হউক, এক সংজ্ঞায় তোমাদের মন সাড়া দিয়া উঠুক!

আবারও বলি,

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।

—এক মন্ত্র তোমাদের; এক সংঘ তোমাদের আশ্রয়; অতএব তোমাদের মন এক হইবে না কেন, চিত্ত এক হইবে না কেন?

ঐক্য তোমাদের স্বরূপ, অনৈক্য মায়া। আজ স্বাতন্ত্র্যের ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিতেছ, একার আরামকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কেন দশের সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া মরি?—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তোমাকে কি দিয়াছে?—ঔদার্য্য না সঙ্কোচ? তোমার ব্যক্তিত্বটুকুকে এত সন্তর্পণে আগ্‌লাইয়া রাখিয়া মনে করিতেছ, ইহা আমার হক্; কিন্তু এমন কথা তো অপর ব্যক্তিও বলিতে পারে। সবাই যদি সেই কথা বলে, তাহা হইলে মানুষ ফিরিয়া যায় আবার সেই আদিম পশুসমাজে—মানুষের সমাজ ভাঙ্গিয়া যায় তখন। ইহা কি সিদ্ধি?

বৈচিত্র্য আছে, তাহাকেও তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাহার উপায় সঙ্কোচ নয়, ঔদার্য্য। একের সঙ্গে, অপরের যেখানে বৈষম্য, সেখানে যে যার চেষ্টা, বাক্য ও মননকে লইয়া পৃথক হইয়া যাইবার চেষ্টা করিও না; স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ, এই বৈষম্যের ঊর্দ্ধে এমন কোনও স্থান আছে কিনা, যেখানে দাঁড়াইয়া পরস্পরের বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বলিতে পার,

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমস্তু—

—আমাদের এক মন্ত্র, এক সঙ্ঘ এক মন, এক চিত্ত হউক্!

এমনি করিয়া বৈষম্যের ঊর্দ্ধসমন্বয়ে একদিন অনুভবের চরম শিখরে উঠিয়া দেখিতে পাইবে, এমন এক অখণ্ড-ব্যক্তিত্বের উদার প্রসার তোমার মাঝে, যেখানে চক্রনাভিতে সমর্পিত চক্রশলাকার মত তোমাতেই এই বিশ্ব তাহার বৈচিত্র্যকে অব্যাহত রাখিয়াও নিশ্চিন্ত নির্ভরে শয়ান রহিয়াছে; একমাত্র তুমিই আছ; এক ব্যক্তি মাত্র—এবং সে ব্যক্তি যথার্থতঃ স্বতন্ত্র।

এই পূর্ণতম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে তোমাদিগকে সিদ্ধ করিবার জন্যই আজ পর-পর ঐক্যের মন্ত্র তোমাদিগকে শুনাইতেছি। যেখানে বিন্দুমাত্র বিরোধ, বিন্দুমাত্র অনৈক্য—বিশ্বাস কর, সেইখানেই পাপ। একমাত্র তুমিই থাকিবে, ইহাই যদি সত্য হয়

তো তোমা হইতে পৃথক অপর কাহারো সত্তা কোনও রূপে অনুভব করা তোমার পক্ষে আত্ম-হত্যা। নিজকে লইয়া দূরে সরিয়া যাইও না —উহা অনৈক্যের সাধনা, কেননা তুমি ছাড়া অপরেরও সত্তা তুমি সেখানে স্বীকার করিতেছ। তুমি সম্পূর্ণরূপে এক হও—সকলকে বুকে তুলিয়া লইয়া।—

এই ঐক্যের মন্ত্রেই তোমাদিগকে অভিমন্ত্রিত করিতে চাই। তাই আবার বলি—

সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা জুহোমি!

—তোমাদের আমি একই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করি-তেছি, একই হবির সহিত যজ্ঞানলে তোমাদিগকে আহুতি দিতেছি!

শুধু উপকরণের আহুতি দিয়া কি ভাবিয়াছ নিষ্কৃতি পাইবে? এই যে যজ্ঞবেদিতে আজ বৈশ্বা-নরকে সমিদ্ধ করিয়াছি, ইনি তোমার সমস্ত ভোগ, সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়াও ক্ষান্ত হইবেন না— শেষ আহুতি চাহিবেন তোমাকে!

অতএব আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক। আবার দেখিবে, এই আত্মাহুতির প্রস্তুতিই তোমাকে সকলের সঙ্গে এক করিয়া দিতেছে। বাস্তবিক তুমি এক, তুমি অদ্বিতীয়; ইহাই তোমার জীবনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। কিন্তু অভিমানকে উদ্রিক্ত করিয়া তুমি অনৈক্যের বুদ্বুদ সৃষ্টি করিয়াছিলে; গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দাও, ক্ষুদ্র আমি বৃহৎ আমিতে লীন হইয়া যাইবে, বিন্দু আবার সিন্ধুতে মিশিয়া যাইবে। জীবনের নিয়তি এই পরম সাম্য। বিশ্বযজ্ঞে ইহাই পূর্ণাহুতি।

একা তোমাকে নয়, একত্র সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি—

সমানী বঃ আকুতিঃ সমানাঃ হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো—যথা বঃ সুসহাসতি।

—মিছামিছি পরস্পরকে সংশয় করিতেছ; যাহা তোমাদের আকৃতি, তাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে স্বার্থবুদ্ধির স্তূপীকৃত জঞ্জালের পেছনে;—জীবনকে মন্থন করিয়া তাহার মূল রহস্যটী আবিষ্কার কর, দেখিবে এক ছন্দে গাঁথা সবার প্রাণ। সেই ছন্দে বাঁধা মন্ত্র এই —"বিশ্বানুর্ষ আ"—তুমি বিশ্বের সঙ্গে এক হইয়া আছ; ইহাই তোমার অগ্নিময় রূপ—সত্য স্বরূপ। —অতএব বলি, "সমানী ব আকৃতিঃ।"

জীবনের মূল সুরটী যখন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে হৃদয়ের তন্ত্রে, তখন দেখা দেয়—বৈচিত্র্য। একই আকৃতি, কিন্তু বিচিত্র তার প্রকাশভঙ্গী। অতএব একের ভাষা অপরে বোঝে না, একের হৃদয়বেদনা অপরকে স্পর্শ করে না। আকৃতি এক, একথা যদি বা বোঝ, হৃদয়ের বেদনা প্রতি ব্যক্তিতে একান্ত হইয়া দেখা দেয় বলিয়া সেখানে আর এককে দেখিতে পাও না। তাই তো দেখি, হৃদয়বেদনার দোহাই দিয়া জগৎ জুড়িয়া চলে অনৈক্যের তাণ্ডবলীলা—আত্মাহুতির আকৃতি আত্মতৃপ্তির ছলনায় বার বার লাঞ্ছিত হয়।

তা হোক্।—তবুও বলি, বিশ্বাস কর, "সমানা হৃদয়ানি বঃ"—বেদনার ভূমিতেও তোমরা সকলে সমান। আকৃতির ঐক্য অনুভব না করিলে এই বেদনার ঐক্য অনুভব করা যায় না, আবার সম-বেদনা না থাকিলে সমাকৃতিও বোঝা যায় না—এই এক সঙ্কট! এই সঙ্কট-মোচনই সাধ্য। শ্রুতি বলেন, নীহারে প্রাবৃত এই জল্পলোক—এখানে পথ নাই, আলো নাই। যাহারা "অসুতৃপঃ"—আপন প্রাণের তৃপ্তিতে মূর্চ্ছিত হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে—তাহাদের ভোগবতী পাতালভূমি এই হৃদয়ের ক্ষেত্র।

যদি পথ না পাও তো নামিয়া আইস বুদ্ধির ক্ষেত্রে—সমানমস্তু বো মনঃ—তোমাদের মনন এক হউক। ঐক্যের মন্ত্রই পুনঃ পুনঃ জপ কর, তাহারই চর্চ্চা কর, এক হইবার যত সুযোগ সম্ভব, তাহার

কোনটীকেও উপেক্ষা করিও না—তাহা হইলেই তোমাদের সিদ্ধি—"যথা বঃ সুসহাসতি"—যাহাতে সর্ব্বতোভাবে তোমরা এক হইবে।—বর্ষারম্ভে শ্রুতি-জননীর ইহাই অভয়বাণী।



একান্তী ভক্ত

—*—

ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ—যাহাঁরা একান্তী অর্থাৎ অব্যভিচারী ও অভ্যন্তরচারী ভক্ত, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ।

ভক্তি যদি অখণ্ডৈকরস স্বভাব হয়, তাহা হইলে তাহার মাঝে উচ্চ নীচ ভেদ আছে কি ;—ইহার উত্তর পূর্ব্বে আরও দিয়াছি। ভক্তি স্বরূপতঃ নির্গুণা, পরিণামরহিতা ; কিন্তু যে সাধনসিদ্ধ আধারকে আশ্রয় করিয়া তাহা প্রকটিত হয়, তাহার উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট পরিণাম অনুসারে ভক্তিতেও তারতম্য উপচরিত বা আরোপিত হয়।

এই উপচারবাদ বা আরোপবাদই যথার্থ Riddle of the universe :—একটা কিছু আছে, যাহাকে প্রাকৃত দেহ-মন ধারণা করিতে পারে না, অথচ যাহাকে ধারণা করিতে গিয়া তাহারা কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফাটিয়া যায় এবং এই আত্মবিলয়ের মাঝেই স্বরূপতত্ত্বের আস্বাদনের ঝলক দিয়া যায়। প্রলয়ের এই সীমানায় দাঁড়াইয়াই মানুষ বলে, স্বরূপ লক্ষণ যদি স্থিতি, তটস্থ লক্ষণ তবে গতি ; দু'য়ে কিন্তু ভেদ নাই ; তবে যে ভেদ নজরে পড়িতেছে ওটা মায়া। সমস্ত দর্শনের সমাধি—এই মায়াতে, আরোপে বা উপচারে।

এখানেও স্বরূপসিদ্ধিকে সাধনসিদ্ধির পরিভাষা দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, তাই ছোট-বড় কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িতেছে। বস্তুর দোষ নয়—দৃষ্টির দোষ!

সে যাই হোক, আসল কথাটা কিন্তু এই, তোমাকে একান্তী হইতে হইবে। কেমন করিয়া, তাহা ভাঙ্গিয়া বলিতেছি।

প্রকৃতির একটা মজ্জাগত ধর্ম্ম আছে—দিদর্শয়িষা—দেখানোর ইচ্ছা ; আধুনিক কামতন্ত্রে বৈজ্ঞানিকেরা যাহার নাম দিয়াছেন Exhibitionism। তোমার মাঝে একটু কিছু ফুটিল বা না ফুটিল, অমনি তুমি তাহা জাহির করিতে ব্যগ্র। তুমি চাও, তোমাকে দেখিয়া সবাই খুসী হইয়া উঠুক ; আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে তুমি বৈশ্বানরের ভোগ্যা হইতে চাও। যে পুরুষালীর অভিমান করে তাহারও প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকাইয়া থাকে এই প্রাকৃত আকৃতি। ইহাই ফুটিয়া উঠে—মানুষের বিলাসে, আড়ম্বরে, যশোলিপ্সায়।

এই দিদর্শয়িষা প্রকৃতির ধর্ম্ম বটে, কিন্তু উহা তাহার অবর ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে গুণলীলার বিস্তার ও পুষ্টি। ইহার সহিত অহমিকার যোগ হইলে পুরুষ-প্রকৃতির সংমিশ্রণ ঘটিয়া জীবের বন্ধনদশার সৃষ্টি হয়। দিদর্শয়িষাকে বিশুদ্ধ অর্থাৎ অহমিকাবর্জ্জিত রাখিতে পারিলে উহাই রতিরূপে অভিব্যক্ত হইত ; কিন্তু সংসারে তাহা তো হয় না। বিশুদ্ধ অহং কিম্বা বিশুদ্ধ সমর্পণ কোথায়ও সুলভ নহে। আমরা পাই একটা মিশ্রভাব। বিচার দ্বারা এই মিশ্রভাব হইতে স্বরূপকে বাছিয়া লইতে হইবে।

ভক্তি কিছুই ছাড়িতে চাহে না; তাই তাহার মাঝে বিচারের স্থান অল্প, আবেগের প্রাধান্য বেশী। এই জন্য তাহাতে দিদর্শয়িষা বা আড়ম্বরের ভাবও অতি সহজে ঢুকিয়া পড়ে। যাহারা কপট-ভক্ত (গেয়োঁ ভাষায় যাহাদের বিটল উপাধিতে ভূষিত করা হয়), তাহাদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। প্রাণের আবেগে যাহারা পথ চলে, তাহারাও অজ্ঞাতসারে অবিদ্যার কবলিত হইয়া পড়ে—ভাব চাপিয়া যাওয়ার চেয়ে তাহার উৎকট স্ফুরণকেই সিদ্ধির অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে করে। ফলে একটা স্নায়বিক শৈথিল্য উপস্থিত হয়, যাহাতে অতি অল্পেই হৃদয় মথিত হইয়া উঠে, আবেগ সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

সাধককে এখানে সাবধান হইতে হইবে। নতুবা গভীরতর তৃপ্তির আস্বাদন তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। যত পার ভাব চাপিয়া যাও; অবরুদ্ধ স্রোতের মত উহার শক্তি ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে, অবশেষে একদিন হয়ত আচম্বিতে হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া দিবে।

রামায়ণে আছে হনুমানের কথা। তাহার প্রতি লোমকূপে সীতারামের মূর্ত্তি; কিন্তু গায়ে গঙ্গা-মৃত্তিকার ছাপ মোটেই নাই। মহাপ্রভুর লীলা-পার্ষদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কথা স্মরণ কর।

একটা মেয়েলী উদাহরণ দিই। নববধূ স্বামীর সোহাগের কথা সখীর কানে গুঞ্জরিতে ভালবাসে; কিন্তু সন্তানের জননী হইলে আর তাহা পারে না। রতি যখন তরলিত ছিল, তখন উহা টল-মলিয়া ছলকিয়া পড়িয়াছে; তাই এই বহির্ব্যক্তি; ভাবের সন্তাপে গাঢ় হইয়া সেই রতিই আবার অটল হইল। তখন প্রাণ ভরপূর, কিন্তু বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই।

প্রেমের সঙ্গে কামের মিশ্রণ থাকিলেই এই-রূপ হয়। শুধু প্রিয়জনকে সুখী করিয়াই তোমার সবটুকু নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, সে-আনন্দ যে আবার তোমাতেও প্রতিফলিত হইতেছে, এই মত্ততাতে তোমার চিত্ত বিকল হইয়া গিয়াছে; তাই অন্তরের অনুভব ভাষায় মুখরিত হইয়া উঠি-তেছে—এবং সেটা তোমার ভালই লাগিতেছে। এই তো কামের বীজ।

আড়ম্বরের নিন্দা করিতেছি, কিন্তু তা বলিয়া অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশকে ঠেলিয়া ফেলিতেছি না। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, মূর্চ্ছা—উন্মাথী ভাবের এইগুলিও নিশানা। এইগুলিকে কি রোধ করা যায়?

আড়ম্বর আর সাত্ত্বিক ভাবের প্রধান তফাৎই এই, একটা তোমার জানা, আর একটা তোমার অজানা; একটা তোমার হুকুমে চলে, আর একটার হুকুমে তুমি চল।

তবে ভান করিয়া কেহ বলিতে পারে, এই যে বিকার আমার মাঝে দেখিতেছ, এ কি আমি আর ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছি?—আড়ম্বর-টাও তো সাত্ত্বিকভাবের ভান ধরিয়া হইতে পারে।

ভক্তিতে যে ভান করে, তাহাকে ঠেকাইবার উপায় আর কি? কামারকে ইস্পাত ফাঁকী দিলে আপন অস্ত্রেই ধার হইবে না। কিন্তু ভানও কিছুদূর চলে; সবগুলি সাত্ত্বিকভাবেরই নকল হয় না।

একটা মাঝামাঝি অবস্থা হইতে পারে, ঠিক ভান নয়, তবে কিনা বিবশতা। তার কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যথাসাধ্য চাপিয়া যাও; চাপি-বার শক্তিও বাড়িবে। আর মনে রাখিও এই বিবশতাটাই বাহাতরী নয়। বিবশ হইয়া পড়িলে তো বুঝিব, এক গণ্ডূষেই শামুকের খোল ভরিয়া উঠিল। সেটাই কি খুব বড় কথা হইল? গোড়া হইতেই সঙ্কল্প রাখ, আমি বাহিরে কিছু ফুটিতে দিব না, অন্তরের ধন অন্তরেই লুকাইয়া

রাখিব। যদি বীর্য্য দৃঢ় থাকে, তাহা হইলে এই সঙ্কল্পে সিদ্ধিলাভ হইবে। সাত্ত্বিকভাব আসিবে—কিন্তু সে আসিবে চরম দশায়। তাহার সমজদার তুমিই, অপরে নয়।

আর একটা কথা। আড়ম্বরটা বহিরঙ্গ লোকের সামনেই জমে ভাল; কিন্তু সাত্ত্বিকভাব ফোটে অন্তরঙ্গের কাছে। এইটুকু হইল ভাবের কষ্টিপাথর। যে আড়ম্বর করে, সে একটা জেদ নিয়া করে; আর যার ভাব হয়, তার হৃদয়টা গলিয়া যায়, সে তখন আপনার জন খোঁজে। যেজন তাহার ভাবের ভাবুক, তাহারই কাছে তাহার হৃদয়ের কপাট খুলিয়া যায়। বহিরঙ্গ লোকের কাছে সে বোবা। কিন্তু মেকী ভক্ত আড়ম্বর করিয়া সর্ব্বত্রই হাট জমাইতে চায়।

পূর্ব্বে যে কুলবধূর দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম, তাহার সহিত ইহার কতকটা সাম্য আছে। কিন্তু বৈষম্যের বীজ কোথায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একে রতির তরলতা, অপরে গাঢ়ত্ব। তাই বাহ্যস্ফূর্ত্তিতে সাম্য থাকিলেও অন্তরে দু'য়ে প্রভেদ আছে।

বৈষ্ণবের ইষ্টগোষ্ঠীর কথা সিদ্ধান্তশাস্ত্রে আছে। আর একটী কথা আছে, "পরিবার।" যেমন স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজন নিয়া মায়িক সংসার, তেমনি এক ভাবের ভাবুকদের নিয়া আধ্যাত্মিক সংসার। এই সংসারে যে কত মধু উছলিয়া উঠিতে পারে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা অজস্র ভঙ্গীতে দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় দুয়ার বন্ধ করিয়া গাইতেন, নাচিতেন—বহিরঙ্গ লোকে যাহাতে দেখিতে শুনিতে না পায়। তারপর গম্ভীরার কথা তো মনে করিতেই বুক কাঁপিয়া ওঠে। আর গোদাবরীর তীরে রামানন্দের সঙ্গে সেই অ রূপ বিশ্রম্ভালাপ।—আপন পরিবার লইয়া, স্বগণ লইয়া কিরূপে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে হয়, মহাপ্রভু থরে থরে তাহা বিবরিয়া গিয়াছেন। এই ইষ্টগোষ্ঠীতে আবির্ভূত হয় সাত্ত্বিক ভাব।

তাই ঋষিও বলিতেছেন, **কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঞ্চ**—রুদ্ধকণ্ঠে, রোমাঞ্চিত হইয়া, অশ্রুতে গলিয়া গিয়া তাঁহারা যখন পরস্পরের সহিত আলাপ করেন, তখন কুল পবিত্র হয়, পৃথিবী পবিত্র হয়।

এই সূত্রে পাই একান্তী ভক্তের ইষ্টগোষ্ঠীর কথা আর তাঁহাদের ভাবব্যূঢ় দশায় সাত্ত্বিক বিকারের উপলক্ষণ।

আর একটী কথা আছে, তাঁহারা কুলপাবন, তাঁহারা জগৎপাবন। সাধুহৃদয়ের সম্প্রত্যয় শুধু তাঁহাতেই আবদ্ধ থাকে না। তেজের বিকিরণ যেমন স্বভাব, গন্ধপরমাণুর বিসর্পণ যেমন স্বভাব, তেমনি ভাবের ব্যাপ্তিও স্বাভাবিক। ভাব মাত্রেই—তা সুভাবই হউক, আর কুভাবই হউক—জগৎময় ছড়াইয়া পড়িতে চায়। এইজন্য কাহারও অনিষ্ট করা বলিয়া নয়, অনিষ্ট চিন্তাও অপরাধের মধ্যে গণ্য। তুল্যকারণে আত্মহিত চিন্তা, সদ্ভাবের পরিপোষণ জগদ্ধিতেরই নামান্তর। সাধারণ লোকের মাঝে অল্প-বিস্তর এই প্রকার শক্তির পরিচালনা অহরহঃই ঘটিতেছে। সাধুর কেন্দ্রীকৃত চিতি-শক্তির প্রভাবে ভাব বহুদেশ পর্য্যন্ত, অনাগত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। তাই তাঁহারা জগৎ-পাবন। আবার তাঁহারা যে কুলপাবন, সে কথারও বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। বংশে একটী সাধুভক্তের আবির্ভাব পূর্ব্বপুরুষের অনুক্রমিক সাধনারই চরম সার্থকতা। তাই সৎপুত্রকে কুলপাবন বলা হয়।

একান্তী ভক্তেরা **তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি, সুকর্ম্মীকুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি, সচ্ছাস্ত্রীকুর্ব্বন্তি শাস্ত্রাণি**—তাঁহারা তীর্থকে তীর্থ করেন, কর্ম্মকে সুকর্ম্ম করেন, শাস্ত্রকে

করেন। তাঁহারা তীর্থে আছেন বলিয়াই তীর্থের মহিমা; তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মেই কর্ম্ম-বাদের প্রামাণ্য; এবং তাঁহাদের জীবনে শাস্ত্রবাণী জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে বলিয়াই শাস্ত্রের মর্য্যাদা। এক কথায়, তাঁহারাই জগতের যা কিছু শুভ, তাহার উন্মেষক ও ধারক।

ছাত্রসমস্যা

—*—

ছাত্রসমস্যা তুমুল হইয়া উঠিয়াছে।

ছাত্র কাহারা?—প্রাচীন ব্যুৎপত্তি হইতেছে, "ছত্রমেব শীলমস্য" এবং "ছত্রেণ গুরুসেবা লক্ষ্যতে।" কেহ কেহ বলেন "গুরোর্দোষাবরণং ছত্রম্।" গুরুর পক্ষে শেষোক্ত ব্যুৎপত্তি শ্লাঘার কারণ না হইতে পারে, কিন্তু গুরুর প্রতি ছাত্রের ইহা একান্ত মমত্ববোধের পরিচায়ক। আর একটা কথা আছে—"ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ।"

এই বচনগুলি নিঙ্‌ড়াইয়া এই পাই—আচার্য্যের প্রতি মমতাসম্পন্ন ও তাঁহার সেবাপরায়ণ বিদ্যার্থীকেই ছাত্র বলি; এবং অধ্যয়ন তাহার উৎকৃষ্ট তপস্যা। ছাত্র সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ইহাই প্রাচীন আদর্শ।

জীবনসংগ্রামের জন্য একটা প্রস্তুতি সকলের পক্ষেই অত্যন্ত আবশ্যক। শুধু আত্মসংরক্ষণ সমস্যার সমাধানের জন্য নয়; দেশকে আমি যে অবস্থায় পাইয়াছি, তাহার চেয়ে উন্নততর অবস্থায় তাহাকে রাখিয়া মরিবার দায়িত্বও স্বচ্ছন্দে বহন করিবার জন্য আমার একটা বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। সমাজের যে আবহাওয়ায় আমি জন্মিয়াছি, নানা কারণে সেখানে এই শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র পাওয়া যায় না। অতএব সমাজের আবহাওয়া হইতে একটু দূরে একটা নির্ঝঞ্ঝাট পারিপার্শ্বিকের মাঝে শিক্ষাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন; সেখানেও সমস্ত ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত গুণী পুরুষের কাছে আমাকে কেবলমাত্র শিক্ষার্থী হইয়া জীবন যাপন করিতে হইবে, ইহাও যুক্তি-সঙ্গত।

সমুদ্রে ঝড়-তুফান আছে; তাহাতে জাহাজ-ডুবিও হয়। কিন্তু যে ডকে জাহাজ তৈরী হয়, সেখানে ঝড়-তুফানে যাহাতে কাজ পণ্ড না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা থাকে। অথচ ডকটা সমুদ্রেরই কূলে, এবং সেখানে সমুদ্রতরণের উপযোগী করিয়াই জাহাজ তৈরী হয়।

বর্ত্তমানে বাহির-সমুদ্রের ঝড়ের ঝাপ্‌টা আসিয়া ডক্ ইয়ার্ডকেও আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। ইহা হইতেই সমস্যার উদ্ভব।

সমস্যাটা টোলের ছাত্রদের নিয়া নয়, মক্তবের ছাত্রদের নিয়া নয়, অজাতশ্মশ্রু নাবালক ছাত্রদের নিয়াও বোধ হয় নয়। ইংরাজের স্কুল-কলেজে যাহারা জাত- কিম্বা জায়মান-গুম্ফ তরুণ, তাহাদের নিয়াই গণ্ডগোল।

ছাত্রেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা আর শাসন মানিতে চাহে না, শিক্ষককে তাঁহার ন্যায্য সম্মান দিতে চাহে না, ইহাই অভিযোগ।

ছাত্রেরা বলিতেছে, যাহারা সর্ব্ববিধ উপায়ে

আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে হরণ করিতে চাহে, আমাদের মনুষ্যত্বকে নিষ্পিষ্ট করিয়া মারে, তাহাদের আদেশকে আমরা বেদবাক্য বলিয়া মানিতে পারিব না।

উভয় পক্ষের অভিযোগই সত্য, কিন্তু পরিস্থিতি বড় সঙ্কুল। ঝগড়াটা ব্যক্তিগতভাবে কোনও শিক্ষককে নিয়া নয়, বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিকে নিয়া। শিক্ষা-পদ্ধতি বিদেশীর প্রবর্ত্তিত। অতএব এই ক্ষোভ বিদেশীয়ানার প্রতি এবং ক্ষোভ-প্রকাশের ধরণটাও বিদেশী। বর্ত্তমান যুদ্ধের ভাব, ভাষা, কায়দা-কানুন, সব বিদেশী ছাঁচে ঢালা, মায় সৈনিকদের পর্য্যন্ত বিদেশী সজ্জা; কিন্তু ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই এ দেশের মাটীতেই মানুষ। —তাই দেশী প্রকৃতির সহিত বিদেশী ধরণের তাল পাকাইয়া সমস্যাটা ভিতরে-বাহিরে অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

শিক্ষকেরা শিক্ষা দেন বিজাতীয় ভাব ও বিজাতীয় ভাষা; তাহার ফলটা যখন বিজাতীয় হইয়া দেখা দেয়, তখন কিন্তু স্বদেশী রাগিণীতে আর্য্য-শিক্ষার নজীর তুলিয়া বিলাপের পালা গাহিতে সুরু করেন। শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের কোথাও বিন্দুমাত্র মমতার সম্পর্ক নাই, শিক্ষকের শিক্ষাদানও গতানুগতিক ও নীরস, একের চরিত্রের প্রভাব অপরের উপর পড়িবার কোনও সুযোগ নাই, আছে শুধু সার্কুলার ও রেজলিউসান। সেক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা আসিবে কোথা হইতে?

অতএব বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ফলে যে ছাত্র ও শিক্ষকে এইরূপ সংঘর্ষ ঘটিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। প্রাণের ক্রিয়া যেখানে স্তিমিত, সেখানেই বিকার দেখা দেয়। সত্য কথা বলিতে গেলে, এখানে দেশী-বিদেশীর তুলনা করাও ঠিক হইবে না। পড়ুয়াদের হাতে গুরুমশাইদের দুর্গতির কাহিনী ছড়ায়, গল্পে, সাহিত্যেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দেশী টোলের অধ্যাপক নির্য্যাতনের কথা এ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই নাই। অথচ ইংরেজী টোলের উচ্চতম কক্ষার অধ্যাপক পুনঃ পুনঃ প্রহৃত হইয়াছেন, ইহা জানি। ইংরেজী টোলের আবহাওয়ায় পড়িয়া সংস্কৃত-পণ্ডিতের নাকাল হওয়ার খবরও শুনিতে পাই।

এই ঘটনাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয়, শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষা নেওয়া যেখানে প্রাণের ব্যাপার নয়, সেখানে গণ্ডগোল পাকিয়া উঠিবেই—কি স্বদেশী টোলে, কি বিদেশী টোলে। তবুও কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী বহু ব্যাপক না হইলেও প্রাণের আদান-প্রদানে অধিকতর মর্য্যাদাসম্পন্ন ছিল এবং এখনও আছে; এই জন্য ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক দেশীয় টোলগুলিতে এখনও তিক্ত হইয়া উঠে নাই। ঋষিযুগের আদর্শ না হয় অতীতের কল্পনা বলিয়া ছাড়িয়াই দিলাম।

যেমন অস্বাভাবিক উপায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার ফল কটু হইলেও নালিশ করিবার পথ নাই। কেহ কেহ আবার এত অগাধবুদ্ধিসম্পন্ন যে ছেলেদের বর্ত্তমান ঔদ্ধত্যের সমর্থন করিবার জন্য বিলাতী নজীর তুলিয়া বলি থাকেন, "বিলাতের ছেলেরা হল্লা করিয়া বিদ্যালয়ের চেয়ার-টেবিল দরজা-জানালা জখম করে, অশিষ্টতার ও বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত করে, তাহাতে কিছু হয় না, আর আমাদের ছেলেরা এ আর বেশী কি করিয়াছে?" অনেক আইডিয়াই বিলাত হইতে ধার করিয়া আনিয়া আমরা সভ্যতার উন্নততর স্তরে উঠিয়াছি; আচার্য্য অবমাননার আইডিয়াটাও রপ্ত হইয়া গেলে বোধ হয় আর এক ডিগ্রী বেশী সভ্য হইতে পারিব।

যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বিদ্যাপদ্ধতি বজায় থাকিবে, সে পর্য্যন্ত এইরূপ ঘটনা ঘটিতেই থাকিবে,

এই কথা মানিয়া লইয়াই মন্দের ভালও কিছু করিবার আছে কিনা. আমাদের তাহাই দেখিতে হইবে।

যাহারা শিক্ষার্থী. তাহারা শিক্ষককে মানিয়া চলিবে, ইহা ন্যায়সঙ্গত ও স্বভাবসঙ্গত কথা। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা হইতেছে না। কেন হইতেছে না, তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি শুধু বিদ্যাই বিতরণ করে না, তাহারা আরও কিছু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার, শিক্ষাসচিব প্রভৃতি মহাজনেরা শুধু ব্রাহ্মণ্য-নীতি মানিয়াই শিক্ষা-বিভাগ পরিচালনা করেন না, তাঁহারা ক্ষাত্র-নীতিরও আশ্রয়গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ্যনীতিতে আর ক্ষাত্রনীতিতে মিলিয়া শিক্ষাবিভাগে চাণক্যনীতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বিরোধের সূত্রপাত এইখানেই।

রাজা-প্রজায় বনিবনাও হইতেছে না,—নানা রকম বোঝাপড়ার কথা চলিতেছে। ইহাই রাজনৈতিক আন্দোলন। এ আন্দোলনে দেশের সবাই এখনও যোগ দেয় নাই, কিন্তু আন্দোলন ক্রমেই বিসর্পিত হইয়া চলিয়াছে। সরকার শিক্ষাবিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও কাণ্ডারী; তিনি বলিলেন, "তোমরা বুদ্ধিমন্ত, গালাগালি-চ্যাচামিচি যা করিতে হয় কর, কিন্তু অবোধ ছেলেগুলিকে ঘাঁটাইতে পারিবে না।" সরকার যে দেশশুদ্ধ সকল অবোধ ছেলেরই মুরুব্বিয়ানা করেন বা করিতে পারেন, তাহা নয়; যে ছেলেগুলি শিক্ষাবিভাগে ঢুকিয়াছে বলিয়া তাঁহার তাঁবে আছে, তাহাদের তিনি কর্ণ ধরিয়া আছেন। এটা সরকারের পক্ষে সঙ্গত হইতেছে না, ইহাই রাজনৈতিক পাণ্ডাদের বিশ্বাস। তাই তাঁহারা ছেলে ভাঙ্গাইয়া নেওয়াটাও রাজনৈতিক চালবাজীর অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইলেন। স্বদেশী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত শিক্ষাবিভাগে প্রবিষ্ট অপোগণ্ড ও তরুণদিগকে লইয়া রাজনৈতিক মল্লভূমিতে এইরূপ Tug of war চলিতেছে।

উভয় পক্ষের যুক্তি আছে। সরকার বলেন, "রাজনৈতিক আন্দোলনটা ভুয়া, উহাতে ছাত্রেরা যোগ দিয়া শুধু সময় ও মাথা নষ্ট করিবে; তাহারা লেখাপড়া শিখিতে আসিয়াছে, তাহাই শিখুক, ওসব দাপাদাপি কেন?" সরকার-পক্ষ ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া এই কথাটাই নানা ভাবে বলিয়া আসিতেছেন। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার ধমকের সুরে এই কথাটাই বলিলেন। তাঁহার নিম্নতর কর্ম্মচারী ভাইস্-চ্যান্সেলার একটু মোলায়েম সুরে বলিলেন. "তোমরা দেশের সেবা করিবে, সে তো ভাল কথা; কিন্তু তাহার যোগ্যতা তো চাই। আমাদের কারখানায় আগে যোগ্যতার সার্টিফিকেট অর্জ্জন কর, তারপর পেট্রিয়ট হইও।"

অপর পক্ষ বলিতেছেন, "ও তো তোমার বিদ্যাপীঠ নয়; ও হচ্ছে গোলামখানা। তোমার দপ্তরের কেরাণীকুলের আঁতুরঘর ওটা। দাসমনোভাবের উদ্ভব ও পুষ্টি ওখান হইতেই হয়। অতএব আমরা ওটা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাই। সরকারের আর কিছু করিতে পারি না পারি, তার কেরাণীর আবাদটা কিছু কমাইয়া একটা রামচিমটী কাটিয়া দেখি না কেন!"

প্রথমেই বলিয়া রাখি, সরকারী শিক্ষাপদ্ধতির উপর আমাদের আস্থা নাই। শিক্ষাবিভাগটা সরকারের হাতে বলিয়া যে তাহার প্রতি বিশুদ্ধ রাজনৈতিক বিতৃষ্ণা অনুভব করি, তাহা নয়। শিক্ষার মূল নীতিটা লইয়াই আমাদের আপত্তি। এ আপত্তি শুধু আমরা নয়, সরকারের দেশের লোকেরাও করিয়াছে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তো রাজোচ্ছিষ্টের এঁটোকাঁটাটাই জোটে কিনা, তাই যে নীতি সরকারের জন্মভূমিতে পঞ্চাশ বছর আগে পরিত্যক্ত হইয়াছে, আমাদের দেশে

এখনও তাহার জের চলিতেছে। "গোলামখানা"র মুণ্ডপাত করিয়া যাঁহারা "জাতীয় ভাবে" মনিবখানা গড়িতেছেন, তাঁহারাও দেখিতেছি অবিকল সেই সরকারী ধাঁচাটাই বজায় রাখিতেছেন। অথচ দাস-মনোভাবের বিরুদ্ধে মুষ্টিযোগের ব্যবস্থাটা তাঁহারাই আগে করিতে যান! শিক্ষাক্ষেত্রে যাহার অভিনবত্ব ও মনুষ্যত্বের আমদানী করিতেছে, এমন কয়েকটী প্রতিষ্ঠান দেশে সৃষ্টি হইয়াছে বটে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইহাদের রাজনৈতিক হিড়িকে পড়িয়া জন্ম লাভ করিতে হয় নাই।

ইহা হইতে প্রমাণ হয়, যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়া সরকার-পক্ষ আর নেতৃপক্ষ শিক্ষাক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রের অবতারণা করিতেছেন, সে সমস্ত যুক্তির সহিত শিক্ষার্থীর ভাল-মন্দের সম্পর্ক খুব কম। যুক্তিগুলি উভয় পক্ষের স্বার্থ ও জেদ লইয়া—শিক্ষার মূল নীতি লইয়া নয়।

এখন নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়, ছেলেদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত কিনা। বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। একটা ব্যক্ত, আর একটা গুপ্ত। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কি করিয়া সে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে, ইহা লইয়াই বিবাদ। একদল বলিতেছেন, "পরিবর্ত্তন ঘটানো রাজার হাতে। অতএব ছলে-বলে কৌশলে রাজাকে চাপ দাও।" রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইঁহারা Propaganda-work চালান। এই মনোবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ইঁহারা সামাজিক ব্যাপারেও আইন-কানুন প্রবর্ত্তন করিতে যান। আর এক পক্ষ বলিতেছেন, "পরিবর্ত্তন ঘটানো আমার হাতে; সুতরাং চাপ দিতে হয় তো নিজকে চাপ দাও; পল্লীসংস্কার কর, সমাজ সংস্কার কর, শিক্ষা বিস্তার কর,—সব নিজেরাই কর।" ইঁহারা দেশে Constructive work চালান। ইহাও যে একপ্রকার গুপ্ত রাজনৈতিক আন্দোলন, সরকারও তাহা আশঙ্কা করেন এবং সেই জন্য দেশের সমস্ত শুভানুষ্ঠানের পেছনেই টিকটিকি নিযুক্ত করিতে ভুলেন না।

আমাদের মনে হয়, ছাত্রদের Propagandist-দের দলে না ভিড়াই ভাল। Propagandists! বক্তৃতার উত্তাপে যে পরিমাণ ভাবের বাষ্প সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা চুঁয়াইয়া গিয়া এপর্য্যন্ত শিক্ষা-ক্ষেত্রে দু'চার ফোঁটার বেশী কাজ হয় নাই। বক্তৃতা দিয়া ছেলে মাতা না খুব সোজা; নেতারা এই সহজ কাজটাই ভালবাসেন এবং ইস্কুল হইতে এক পল্টন ছেলে ভাগাইয়া "স্বাধীনতার বাহিনী" সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া দম্ভ করেন। ন্যাশনাল স্কুল গজাইতে দেখিলাম, ননকোঅপারেশনে গোলামখানা বর্জ্জন দেখিলাম, আরও হয়ত কত কিছু দেখিব। কিন্তু এই সমস্ত মাতামাতিতে দেশের শিক্ষা-সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান যদি হইয়া থাকে! নেতারা ভুলিয়া যান যে ছেলেরা বাপমায়ের—রাজার নয়। ইস্কুল হইতে ছেলে ভাগাইলে রাজাকে তত বিব্রত হইতে হয় না, যত বিব্রত হইতে হয় অভিভাবককে। রাজা তো বরং য়ুনিভার্সিটী বন্ধ করিয়া দিব বলিয়া ধমক দিতেও ছাড়েন না! আর ছেলে নাচাইয়া নিরীহ অভিভাবককে চটাইয়া ঘরের শত্রু বিভীষণ সৃষ্টি করিয়া দেশের কি হিত করা হয়, তাহাও বুঝি না। "তরুণ বাহিনী" লইয়া তো নেতারা খুবই মাতামাতি করেন, কিন্তু এই "তরুণ বাংলার" অতরুণ বাবারা কি বলেন, সেটা একবার শুনিয়া নিলে ভাল হয় না?

বর্ত্তমানে বাপ-মায়ের মায়াকান্নাকে কি করিয়া ঠেকাইতে হইবে, তরুণের পাণ্ডারা তরুণ-বাংলাকে তাহাও শিখাইতেছেন। সর্ব্ববিধ প্রাচীন কুসংস্কা-

রের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া (এবং বাপ-মাও একটা প্রাচীন কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়) তরুণের ফাঁকা-ময়দানের "জয়যাত্রা" ইতি-মধ্যেই নাকি সুরু হইয়া গিয়াছে!

দেশে বর্ত্তমানে একটা সংগঠন-নীতির ক্রিয়াও বহু দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে এবং দিন দিন তাহার শক্তিও বাড়িতেছে। আমাদের মনে হয়, এই সংগঠন-নীতিতে যোগ দিবার জন্য ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। ছাত্রদের রাজনীতি এই Constructive রাজনীতি হইলে তো কাহারও কোনও আপত্য থাকে না; আর সত্যিকার দেশ-সেবাই তো এই। এবার বসিরহাট কন্‌ফারেন্সে নেতারা এ দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু কত বাধা ও জঞ্জাল যে সংগঠন-নীতির পথ আগুলিয়া রহিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। Propaganda work সৌখীন রাজনীতি; কিন্তু Constructive work তো তা নয়। এতদিন ধরিয়া যে আমরা কেবল সৌখীনতার চর্চ্চাই করিয়া আসিয়াছি, আজ কাদা ঘাঁটিতে মন চাহিবে কি? বিলাস ব্যসন যে আজ আমাদের তরুণদের মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার নেশা এত শীঘ্রই ছুটিবে কি?

নেতারা এখানেও সরকারের দোষ দেখেন। বলেন "ওরাই তো আমাদের বিলাসী হইতে শিখাইল। বিলাসের জিনিষ ওদের কারখানায় উৎপন্ন করিয়া সস্তাদরে আমাদের হাটে বেচিতে আসে, তাই না আমরা ও সব ছাই কিনি। রাজা যদি আমাদের হিত খুঁজিত, তাহা হইলে ও সব ব্যসনের উপর চড়া শুল্ক বসাইয়া ওগুলিকে আমাদের পক্ষে মহার্ঘ্য করিয়া তুলিত!" বলিহারি যুক্তি! রাজা যে বেনিয়া, তাহা তো গোপন নাই; কিন্তু তোমরা না নিজেদের অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক বলিয়া জাহির কর? প্রলোভন সামলাইবার শক্তি তোমার হইল না, সে লজ্জা যে লোভ দেখায় তার, না তোমার?

বর্ত্তমানে যে সরকারী শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা বিলাসব্যসনকে রোধ করে না, এই মাত্র তার অপরাধ। শিক্ষাটা বিদেশী; সুতরাং বিদেশের দোষগুণ উভয়ই তাহাতে আছে; আমাদের কর্ত্তব্য তাহা যাচাই করিয়া লওয়া। য়ুরোপীয় জাতিগুলি শক্তিমন্ত অতএব বিলাসী। সে বিলাস তাহাদের সহে। আমরা দুর্ব্বল, আমাদের তাহা সহে না। কিন্তু দুর্ব্বল বলিয়াই আমাদের লোভ বেশী এবং আমাদের লোভকে আশ্রয় করিয়াই রাজার বেনিয়া-বুদ্ধি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের ছাত্রদের চালচলন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বোঝা যায়, শিক্ষার দায়ে কতটুকু বিলাস-ব্যসন তাহাদিগকে অঙ্গীকার করিতে হয়, আর নিজেদের গরজেই বা তাহারা কতটুকু জোটাইয়া লয়। ব্যসনবর্জ্জন করিয়াও ইংরেজী পড়া চলে—বিদ্যাসাগর-গুরুদাস তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশের ছাত্রেরা অপরিমিত-মাত্রায় বিলাসী হইয়া উঠিল কেন?—ইহাও কি রাজার দোষ?

Constructive রাজনীতিকে সফল করিতে হইলে এই বিলাসব্যসনের বিরুদ্ধে Propaganda চালাইতে হইবে এবং ছাত্রদিগকে ইহার মধ্যে টানিয়া আনিতে হইবে। কত সৌখীন হুজুগ তো গজায়; একবার "ব্রহ্মচর্য্যের" হুজুগটা গজায় না? ও ব্যাপার নিয়া কংগ্রেস-কনফারেন্স, বয়কট-পিকেটিং ইত্যাদির কলরব ওঠে না?—শক্ত মাটী কিনা!

দেশাত্মবোধ না জাগিলে মানুষ মানুষ কিসের? সুতরাং দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করিবার প্রচেষ্টাও শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তব্য। সরকার বলিবেন, "তোমাদের good citizen বানাইবার জন্য আমার কি

কম আগ্রহ ?—তবে কিনা দেশহিতৈষণার পাঠটা আমি পড়াই আমার রুচি ও গরজ অনুযায়ী।” দেশের লোকের সঙ্গে সে শিক্ষার বনিবনাও কিছুতেই হইবার নয়। এই কথাটা ছাত্রদের চেতনায় আজকাল চেতাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উদ্দেশ্যটা সাধু নিশ্চয়ই, কিন্তু উপায়টা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তরুণকে সহজে উত্তেজিত করিতে পারা যায় বলিয়াই তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তোলা স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। Propagandaর হৈ চৈ ছাড়িয়া দিয়া সংগঠন-নীতিকে শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টাই কল্যাণকর।

গুরুশিষ্যের ব্যবহার কিরূপ হইবে, তাহা লইয়া আলোচনার কোনও সার্থকতা নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিক্ষার ধারাটা আগাগোড়া বিদেশী; ফলটা দেশী ফলিবে কোথা হইতে? শিখাইবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বুলি, অথচ গুরুদক্ষিণার বেলায় প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-সেবার দাবী করিলে চলিবে কেন? আচার্য্যকে অবজ্ঞা করা ছাত্রদের গুণপনা বলিতেছি না, কিন্তু বিলাতী ছাত্র-নীতিতে উহাই যে দস্তুর, সে কথাও ভুলিলে চলিবে না।

ছাত্রদের একটা জায়গায় মারাত্মক একটা ত্রুটী দেখি। শিক্ষকের সঙ্গে তাহাদের বেপরোয়া ব্যবহার না হয় শিক্ষানীতির অঙ্গীভূত, কিন্তু অভিভাবকের সম্বন্ধে তাহাদের ব্যবহার নিতান্ত প্রশংসাযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। “স্বাধীনতার সংগ্রামে” ছেলের দল যখন তাতিয়া ওঠে, তখন অভিভাবকের মতামতের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেও তাঁহার গাঁটের কড়ির সহিত তো সম্পর্ক ছিন্ন করে না। অপোগণ্ড “শহীদের” গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা তো ডেঁপোমী ছাড়া আর কিছুই নয়, যাহারা সাবালক তাহাদের স্বেচ্ছাচারকেও সাধুবুদ্ধিসম্মত বলিতে পারি না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া বাবা কড়ি জোটাইবেন, আর ছেলে এদিকে দড়ি ছিঁড়িবার বাহানায় দাপাদাপি করিবে, এটা বীররস না করুণরস, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অভিভাবকের মতান্তরকে উপেক্ষা করিয়াও যাহাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে বিবেকের ডাক পড়ে, তাহাদের উচিত, আগে অর্থসম্বন্ধে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা। উপার্জ্জনক্ষম না হইয়াও বিবাহ করিয়া বংশ-বৃদ্ধি করিবার বেলায় এ দেশের তরুণেরা পরম উৎসাহী; তেমনি বাপের কড়ি খসাইয়া স্বাধীনতার লড়াই করিতেও তাহাদের সমান উৎসাহ। “যুবক বাংলার” কাছে কি Love and War একই পর্য্যায়ের জিনিষ?

ছেলেদের তত দোষ নয়, দোষ যত ছেলেদের যাঁহারা নাটের গুরু, তাঁহাদের। “তরুণ” “তরুণ” বলিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহারা ছেলে খেপাইতে সুরু করিয়াছেন। অথচ ছাত্রেরাই যে দেশের একমাত্র তরুণ, তাহা তো নয়। ইহারা ছাড়া দেশে আরও যে তারুণ্য অভিশপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের সহিত ইহাদের পরিচয় ঘটাইবার জন্য তাঁহারা কি করিতেছেন? শিক্ষিত তরুণকে তাঁহারা দেশহিতৈষণার নামে খেপাইয়া দিয়া স্বজনদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, উচ্ছৃঙ্খল ও হুজুগপ্রিয় করিয়া তুলিতেছেন, ইহা কি দূরদর্শিতার পরিচয়? কোথায় আমরা ঘর সামলাইব না নিজেরাই ঘরের মাঝে নিত্য-নূতন অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া তুলিতেছি!)

কর্ম্মত্যাগ

—*—

অর্জ্জুন যখন ক্লীবের মত অস্ত্র পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, মোহের ঘোরে কর্ম্মত্যাগের বাসনা যখন তাঁর মাঝে প্রবল হয়ে উঠেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তখন স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন "হাজার চেষ্টা করলেও তোমার মাঝে যে কর্ম্মের বীজ নিহিত রয়েছে, তাকে বাধা দিয়ে দাবিয়ে রাখবার শক্তি তোমার নাই। অতএব হে বীর, জাগ, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, স্বধর্ম্ম পালন কর!"

যাঁর দূরদৃষ্টি রয়েছে, তিনি সবই দেখতে পান। শ্রীকৃষ্ণ দেখেছিলেন অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করতেই হবে; সাময়িক অবসাদ, ক্ষণিকের মোহ তো প্রারব্ধকে খণ্ডাতে পারে না।

ফল পাকলে বোঁটায় তাকে ধরে রাখতে পারে না। সবারই এমন একটা সময় আছে, যখন সে বন্ধনে জড়িত থাকতে চায় না—চায় মুক্তি; তাই সকল বন্ধন তখন আপনি খসে যায়। কিন্তু পাকার আগে শত চেষ্টাতেও ফল বোঁটার মায়া কাটিয়ে মাটিতে পড়তে পারে না। কর্ম্মের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম আমাদের কিছুতেই মুক্তি দেবে না। না বুঝে আমরা অবশ্য চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু কিছুতেই কর্ম্মের হাত হতে নিস্তার পাব না। স্বভাবে যখন কর্ম্মত্যাগ হয়, তখন কোন দিকেই বিশৃঙ্খলা ঘটে না। কর্ম্মত্যাগে তখন মানুষের ভিতর অশান্তির অনল জ্বলে না। অর্জ্জুনকে অকাল-বার্দ্ধক্যে ধরেছিল, অসময় তিনি স্বধর্ম্ম হতে নিরস্ত হতে চেয়েছিলেন; তাই যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত হয়েও তাঁর মনে শান্তি থাকত না। তিনি নিজকে তলিয়ে দেখেননি, বিবেকজ্ঞান হারিয়ে তাঁর বদ্ধজীবের দশা হয়েছিল। ক্ষত্রিয়ের শক্তি, তেজ, বীর্য্য যে তাঁর মাঝে পরিপূর্ণ মাত্রায় আছে, অভিভূত হয়ে পড়ায় এ কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। মানুষ যখন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, তখন চারিদিক হতেই সে কেবল আতঙ্কের দৃশ্য দেখতে পায়।

সদ্‌গুরু প্রপন্ন শিষ্যের মাঝে কি অভাব, কি দুর্ব্বলতা রয়েছে তা স্পষ্ট দেখতে পান। কাকে দিয়ে কি কাজ হবে, তাও তিনি পূর্ব্বেই টের পান। তাই যে যে কাজের যোগ্য, তার ওপর সেই কাজের ভারই অর্পণ করেন। বিরাটের অভিমান তো সবার মাঝেই রয়েছে কিনা, তাই কেউ ছোট হয়ে থাকতে চায় না—পারুক আর না পারুক বড়র দাবী সবাই করে। যারা বোঝে না, গুরুর কথায় প্রতিবাদ করতে যায় তারাই। অভিমানকে মন্দ বলছি না, কিন্তু যেখানে অভিমানের মর্য্যাদা মোটে থাকে না, সেখানে বৃথা অভিমান করে কি লাভ? অনিশ্চিত উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় যদি নিশ্চিতকে হারাতে হয়, যা পাইনি তার ভাবনা-কামনা এসে যদি যা পেয়ে আছি তাকে হরণ করে নিতে চায়, তবে কি প্রয়োজন আমার অনিশ্চিতের পিছনে ঘুরে? তাই গুরুনির্দ্দিষ্ট পন্থাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। গুরু সব বুঝেই ব্যবস্থা করেন।

বাস্তবিক কর্ম্ম তো আমাদের বাঁধতে পারে না আমরা বাঁধা পড়ি মনের কাছে। মনকে জয় করতে পারলে কর্ম্ম অতি সহজ-অনায়াস হয়ে ওঠে। কর্ম্ম ত্যাগ করে হাত-পা গুটিয়ে যিনি বসে রয়েছেন, তিনি মুক্ত নন। কর্ম্ম করেও যিনি কর্ম্মের আবর্ত্তে পড়ে নিজকে হারিয়ে ফেলেন না, তিনিই মুক্ত। কিন্তু আমাদের মাঝে শতকরা নিরানব্বই জনের ধারণা, কর্ম্ম হতে বিরত হয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকাই বুঝি মুক্তের লক্ষণ!

কোন কিছু করবার না থাকলেই মানুষ অলস হয়ে পড়ে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। "আমাদের

কিছু করার নাই, আর করেই বা কি হবে” এমনি ভুল ধারণা হতেই মানুষকে অলক্ষ্মীতে ঘিরে। সে ভাবে, এইটাই বুঝি তার নির্গুণদশা। নির্গুণত্ব মানে যদি জড়ত্ব হত, তবে গুণাতীত ভগবান এত বড় সৃষ্টির গোড়ায় আছেন কি করে? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন “ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥” ত্রিলোকের মধ্যে যাঁর কর্ত্তব্য কিছুই নাই, তিনিই অনবরত কর্ম্ম করে আনন্দ পান; আর যার মাঝে এখনও কত-কিছু পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত রয়েছে, কর্ম্ম ত্যাগ করে অলস হয়ে বসে থাকতে চায় সেই আগে! আপাতবিরুদ্ধ শোনালেও কর্ম্মজগতের এই এক অদ্ভুত রহস্য।

পেন্সন নেবারও একটা সময় আছে, অসময়ে কেউ সেটার দাবী করতে পারে না। সময় হলে ওপরওয়ালাকে খোসামোদও করতে হয় না, সে আপন খুসীতেই কর্ম্মচারীকে পেন্সন দিয়ে বিদায় দেয়।

কবীর ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছিলেন বলেই কি তাঁর স্বজাতীয় ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছিলেন? জ্ঞানী হয়েও তিনি তাঁত বুনতেন। কর্ম্মকে না ছেড়ে যে ধর্ম্ম লাভ হয় না, এ কেমন কথা? কর্ম্ম তো জীবের স্বভাব। একে অতিক্রম করে এমন সাধ্য কার? তবে এক ফন্দী রয়েছে, নিরাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা। তবেই কর্ম্মের মলিনতা এসে কর্ম্মকর্ত্তাকে বাঁধতে পারে না। এ উপদেশই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বারবার শুনিয়েছিলেন; আজও শোনাচ্ছেন।

পরলোক

পরলোকে বিশ্বাস সব জাতিরই আছে। তবে হিন্দুর এ বিশ্বাস একেবারে মজ্জাগত। মানুষ মরলেই সব ফুরিয়ে যায় না, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে, যারা বেঁচে থাকে তারা মৃতের উদ্দেশ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান করে থাকে। সমগ্রভাবে এই অনুষ্ঠানগুলিকে “শ্রাদ্ধ” বলতে পারা যায়। শ্রাদ্ধ যে হিন্দুরাই করে, তা নয়, সমস্ত জাতির মধ্যেই শ্রাদ্ধপদ্ধতি নানা আকারে প্রচলিত আছে। তবে হিন্দুর শ্রাদ্ধপদ্ধতি পরলোক সম্বন্ধে বিশেষ অনুশীলন ও বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরলোক সম্বন্ধে অনুমানমূলক বৈজ্ঞানিক আলোচনা আজকাল ইউরোপের পণ্ডিতেরাও করছেন। হিন্দু একদিন এ নিয়ে প্রত্যক্ষমূলক বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছে। তাই নিয়ে হিন্দুর শ্রাদ্ধবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। হিন্দু বলে, মানুষ মরলে কি হয়, তা দেখা যায়; এখনও এমন লোক আছেন, যাঁরা অন্তর্দৃষ্টির ফলে মৃতব্যক্তির গতির অনুসরণ করতে পারেন। তাঁদের কথাটা বিশ্বাস না করাও একরকম গোঁড়ামী। নিজের চোখে দেখিনি, অথচ অপরের কথায় বিশ্বাস করে মেনে নিচ্ছি—এমন ব্যাপার হামেশাই ঘটছে। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের কত কথাই তো এমনি বেমালুম বিশ্বাস করে যাচ্ছি। আর অধ্যাত্মবাদী বৈজ্ঞানিকের কথাটাই অপ্রামাণ্য? বিশেষতঃ অধ্যাত্মবাদী তাঁর

থিয়োরী প্রমাণ করতে, চোখে দেখিয়ে দিতে যেখানে প্রস্তুত, সেখানে অবজ্ঞাভরে সব হেসে উড়িয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

মানুষ মরলে পর স্থূল দেহটা এখানেই পড়ে থাকে আর তার সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গদেহ নিয়ে আত্মার গত হয়। এই লিঙ্গদেহটা কি? হিন্দুরা বলেন, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি—এই সতেরটার সমষ্টিই লিঙ্গদেহ। যদি আধুনিক দর্শনের পরিভাষায় বলা যায়, তাহলে বল্‌তে পারি, আমাদের Physical ও Psychical energyর সূক্ষ্ম আশ্রয়টাই লিঙ্গদেহ। যে স্থূলভূত দ্বারা এই জীবন্ত দেহটা সৃষ্ট হয়েছে, তার সূক্ষ্মরূপকেই বলে তন্মাত্র বা ভূতসূক্ষ্ম। আমাদের মাঝে তিনটা শক্তির ক্রিয়া দেখ্‌তে পাই—জড়ের, প্রাণের আর অন্তঃকরণের। জড়ের সূক্ষ্মরূপ ভূতসূক্ষ্ম বা তন্মাত্র, প্রাণের সূক্ষ্মরূপ ইন্দ্রিয়, আর মন-বুদ্ধি হল অন্তঃকরণ। কতকগুলি জড়-বস্তু ধ্বংস করে আমরা প্রাণধারণ করছি। এক রাশ অন্ন ব্যঞ্জন কি করে যে কর্ম্ম-শক্তি, বোধ-শক্তি, চিন্তাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তা আমরা বুঝ্‌তে পারি না; জড় আর অজড়ের মাঝে সেতু কি, তা আমরা জানি না। হিন্দুর মনীষা এই সেতুকে আবিষ্কার করে তার নাম দিয়েছে তন্মাত্র বা ভূতসূক্ষ্ম। এগুলো বস্তুরাজ্য আর ভাব-রাজ্যের মাঝামাঝি সত্তা। আত্মা বাসনা পরিপূরণের জন্য দেহধারণ করে থাকেন; অর্থাৎ দেহ আত্মার সৃষ্টি, দেহের বিবর্ত্তনে আত্মার উদ্ভব নয়—এই হচ্ছে হিন্দুর মত। সৃষ্টির বা জন্মের প্রারম্ভে দেহের যে সূক্ষ্ম উপাদানগুলি সংগ্রহ করে আত্মা এই জড় দেহের বীজ সৃষ্টি করেন, তাই ভূত-সূক্ষ্ম। আবার এই জড়দেহের প্রয়োজন মিটে গেলে মাত্রানুযায়ী ভূতসূক্ষ্ম বা তন্মাত্রকে আশ্রয় করে আত্মা একে ছেড়ে যান। অতএব আত্মার জীবন্তে যেমন দেহ থাকে, মরণেও তেমনি দেহ থাকে; এইজন্য সংসারী আত্মার একটা পারিভাষিক নাম "দেহী।" ভূত-সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ—এগুলি বেঁচে থাকতেও যেমন আত্মার বাহন, মরণেও তেমনি। এগুলিই আত্মার কর্ম্মাশয় অর্থাৎ জগতে যা কিছু করি না করি, তার সব রেকর্ড হয়ে থাকে এই লিঙ্গশরীরে। ওই হচ্ছে আমাদের চিত্রগুপ্তের খাতা। মানুষ তো সর্ব্বদা আত্মগোপন করেই চল্‌ছে, জীবনের সকল চিত্রই সে জগতের কাছে গুপ্ত রেখে যেতে চায়। বাইরে সব গুপ্ত থাকে বটে, কিন্তু ভিতরে সমস্তই ব্যক্ত হয়ে পড়ে। মরণকালে জড়ের বাঁধন শিথিল হয়ে গেলে পরে দৃষ্টিশক্তির এমন তীব্রতা জন্মে যে তাতে আজীবনকাল পর্য্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, তার একটা প্রতিলিপি বায়োস্কোপের মত চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায়; চিত্রগুপ্ত যেন তাঁর খাতা খুলে তোমাকে সব হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে শেষ পাতায় ঠিক্ দেবার জন্য মরণের কসি টেনে বলেন, "আজীবন এই জমা করেছ, এই খরচ করেছ, এই এখন তোমার তহবিল; এখন বুঝে নাও, এর পরের পৃষ্ঠায় তোমার নামে জের টেনে কেমন ধারা হিসাব লিখ্‌তে হবে!" ভগবানের ব্যবস্থায় কোথাও ফাঁকী নাই, হিসাবের গরমিল একচুলও হবার নয়।

মৃত্যুর পর তিন রকম অবস্থার কথা হিন্দু বলছেন। এক ব্রহ্মীভাব, দ্বিতীয় দেবযান পন্থা, তৃতীয় পিতৃযান পন্থা। যাঁরা জীবন্মুক্ত, তাঁদের ব্রহ্মীভাব। শ্রুতি বলেন, তাঁদের আর গতি হয় না; রঙ্গমঞ্চ হতে বিদায় হয়ে তাঁরা চিরকালের দরুণ দর্শকের স্থানে এসে বসে যান, সুতরাং যবনিকার আড়ালে গিয়ে আর বারবার তাঁদের পোষাক বদল করতে হয় না। একটা বুদ্বুদ ভেঙ্গে

গেলে যেমন, একটা ঘূর্ণীর আবর্ত্ত ভেঙ্গে গেলে যেমন—তেমনি তাঁদের মরণ; তাঁদের সমস্তই "অত্রৈব সমবলীয়তে"—এই খানেই সব মিলিয়ে যায়। ব্যষ্টিভাবে জন্মমৃত্যুর খেলা আর তাঁদের থাকে না —তাঁরা অধিষ্ঠানতত্ত্বরূপে জেগে উঠে অনন্তকালবাহী অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের জন্মমৃত্যুর তরঙ্গভঙ্গ বুকে ধরে প্রশান্ত সমুদ্রের মত অচল প্রতিষ্ঠায় বিরাজিত থাকেন। এই হচ্ছে নির্ব্বাণ মুক্তি - এইটেই জীবের পরম পুরুষার্থ।

বাসনা যাদের নিঃশেষিত হয়নি, তাদেরই পরলোকে গতি হয়, সাজঘরে ঢুকে পোষাক বদল করতে হয়। এই লোকের পর আরও ছয়টা লোক পর-পর বিস্তৃত রয়েছে, সেইগুলোই হচ্ছে পরলোক। হিন্দুর ছেলে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাহ্নিক করবার সময় ব্যাহৃতি-মন্ত্রে এই পরলোকের স্মরণ করে থাকে। গায়ত্রীমন্ত্রের প্রারম্ভে এই পরলোকের কথাই গাঁথা রয়েছে। এই মন্ত্রগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়, তুমি শুধু এখানকার মানুষ নও, ত্রিভুবন—সপ্তলোক পর্য্যন্ত তোমার ব্যাপ্তি। হিন্দু ছাড়া আর কোনও জাতি এমন করে ব্যক্তির জীবনকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে কি?

বেদে আছে, তিনটী ভুবনের কথা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যৌঃ। ইংরেজ বুঝিয়েছেন, ওটা হল, Earth, Sky and Heaven। খুব মোটা অর্থ বটে; কিন্তু আমরা বুঝেছি অন্য রকম। এই তিনটী লোকই ত্রিগুণিত হয়ে পুরাণের সপ্তলোক হয়েছে। বেদে য সূক্ষ্ম আভাসিত, পুরাণে তাই বিস্তৃতভাবে চিত্রিত। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যৌঃ —এদের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিনটী বিভাগ আছে। স্থূলতঃ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ আর দ্যৌঃ পুরাণের ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ অথবা মনুষ্যলোকে, প্রেত ও পিতৃলোক এবং দেবলোক। কিন্তু সমষ্টি হিসাবে এই তিনটী নিয়েই আবার বৈদিক পৃথিবীলোক। যারা এই পৃথিবীরই মানুষ অর্থাৎ এখানকার কামনা বাসনা যাদের মিটেনি, তারা এই তিন লোকের মাঝেই ঘোরা ঘুরি করতে থাকে: তাই বেদে তাদের বলা হয়েছে "মর্ত্ত্য।" মর্ত্ত্য শব্দটী পারিভাষিক। মাধ্যাকর্ষণের টান যেমন একটা জগতের কিছুদূর পর্য্যন্ত ক্রিয়াশীল, তেমনি এই মাটীর টানও ওই তিনটী লোক পর্য্যন্ত ক্রিয়াশীল। কঠোপনিষদের গোড়ায় যম নচিকেতাকে এই রহস্যই বুঝিয়েছেন। শ্রাদ্ধবাসরে মন্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করে কঠোপনিষদ্ পাঠের ব্যবস্থা এই পরলোক রহস্যেরই স্মরণ-মননের জন্য।

ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ - এই তিন লোকের পরে পুরাণে আছে আর তিনটী লোক—মহঃ, জনঃ, তপঃ। এই তিনটী লোক যথাক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটী লোককে কুক্ষিগত করে রয়েছে। অর্থাৎ যিনি মহর্লোকে আছেন, তিনি ভূলোককে তাঁর মাঝে অনুভব করেন, তিনি ভূলোকের শাস্তা, নিয়ন্তা; যিনি জনলোকে আছেন, তিনি ভূঃ, এবং ভুবঃ এই দুটী লোককে তাঁর মাঝে দেখ্‌তে পান, তিনি ওই দু'লোকের প্রভু। আর যিনি তপোলোকে আছেন, তিনি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনটী লোককেই তাঁর মাঝে দেখ্‌তে পান; তিনি ওই তিন লোকের ইন্দ্র। মহঃ, জনঃ, তপঃ —এই তিনটী লোককে বেদের ভাষায় বলা হয়েছে অন্তরীক্ষলোক; অন্তর্ মানে মাঝে, ঈক্ষ্ দেখা; যে লোকের মাঝে অবর লোকসমূহকে দেখা যায়, তাই হল অন্তরীক্ষ—ইংরেজের sky নয়। গায়ত্রীর ব্যাহৃতিভাগে ভুবঃ বল্‌তে এই বৈদিক ভুবর্লোক বা ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মাবস্থারূপী অন্তরীক্ষলোককে বুঝ্‌তে হবে।

ছয়টী লোকের পর হল সত্যলোক বা ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির আসন। সত্যলোক আর ছয়টী লোকেই

গ্রাস করে আছে, অর্থাৎ যিনি সত্যলোকে আছেন, তিনি ছয়টী লোককেই তাঁর মাঝে অনুভব করেন, তিনি এক ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। এই সত্যলোকই বেদের দ্যুলোক। Bibleএর Heaven, যা Godএর আবাসভূমি, তাই এই সত্যলোক—অবশ্য আধুনিক ইংরেজ একথা তলিয়ে বুঝ্‌তে চাইবে কিনা সন্দেহ! পৃথিবীকে (পুরাণের ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃকে) আবিষ্ট করে আছে (পুরাণের মহঃ, জনঃ, তপঃ): আবার আর অন্তরীক্ষকে আবিষ্ট করে আছে দ্যুলোক (পুরাণের সত্যলোক)। এ যেন Chinese boxএর মত একটা আর একটার মাঝে পোরা। এই জড়াজড়ি ভাবটা জগতের সর্ব্বত্র। আধুনিক বৈজ্ঞানিকও একটা পরমাণুর অবয়বসংস্থানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই আভাস দেখ্‌তে পেয়ে চমকে ওঠেন। জগৎটা যে এমনি জালবোনা, একথা স্পষ্ট করে দার্শনিকভাবে বুঝিয়েছেন, সাংখ্য তাঁর ত্রিগুণবাদ দিয়ে। বৈদিক আর পৌরাণিক লোকসংস্থানে এই ত্রিগুণেরই আভাস পাওয়া যায়।

পৃথিবী যদি হয় স্থূল, অন্তরীক্ষ তাহলে সূক্ষ্ম, আর দ্যুলোক কারণ। এটা পরলোকের সাংখ্যসম্মত ব্যাখ্যা।

এখন দুটী গতির কথা বলেছিলাম—দেবযান আর পিতৃযান। পৃথিবীলোকে যে জীবের যাতায়াত, যাতে বার বার এই ধরাতেই আসতে হয়, তাকেই বলে সংসার। এই সংসার-গতিকেই বলে পিতৃযান পন্থা। আর পৃথিবীলোককে অতিক্রম করে অন্তরীক্ষলোকবাহী হয়ে দ্যুলোক পর্য্যন্ত যে গতি, তাকে বলে দেবযান পন্থা। এই দুটী পথের নিদান আর ইতিহাস, ঈশোপনিষদের শঙ্করভাষ্যে, কঠোপনিষদে, প্রশ্নোপনিষদে ও ছান্দোগ্যোপনিষদে বিস্তৃতভাবে বিবৃত আছে। এগুলির জ্ঞানও বেদান্ত-জ্ঞানের অন্তর্ভূত। এগুলির তাৎপর্য না বুঝ্‌তে পেরে MaxMuller অবজ্ঞার সহিত বলেছিলেন, "বেদান্তের দার্শনিক চিন্তার মাঝে এ সব ছেলেমানুষীর যে কি করে স্থান হল, তা বুঝ্‌তে পারছি না।"

ব্রহ্মীভাব কর্ম্মসন্ন্যাসের ফল, নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি; আর দেবযান ও পিতৃযান কর্ম্মফলানুযায়ী গতি। কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ নিয়ে মতভেদ আছে। এ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের মীমাংসাই সুন্দর বলে মনে হয়। শঙ্করাচার্য্য বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের সমুচ্চয় বা মিলন হতে পারে না; এ ক্ষেত্রে তিনি অসমুচ্চয়বাদী। বাস্তবিক মরণের পর ব্রহ্মীভাবদশার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হলে একথা স্বীকার করতেই হবে। কর্ম্ম জ্ঞানদৃষ্টিতে মিথ্যা না হলে বুদ্‌বুদ-ব্যক্তির নির্ব্বাণে সমুদ্রত্ব লাভ অসম্ভব। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মের যে একেবারে সমুচ্চয় হয় না, এ কথা শঙ্কর বলেননি। তিনি বলেন, দেবতাজ্ঞান আর কর্ম্মে সমুচ্চয় হয় এবং তাই লোকের অভ্যুদয়ের কারণ; সুতরাং দেবতার উপাসনার বেলায় তিনি সমুচ্চয়বাদী। শঙ্কর আরও বলেন, অজ্ঞানবশতঃ যে দেবাদির উপাসনা, সেখানে কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ না থাকায় জীবের ঘোরদশা উৎপন্ন করে থাকে। এইটাই মরণের পর অন্ধতামসের সৃষ্টি করে।

জ্ঞান আর কর্ম্মের এই তিন রকম সম্বন্ধ হতে মরণের পর পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী অবস্থা উপস্থিত হয়। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি কর্ম্ম হতে পৃথক; তাঁর পক্ষে দেহান্তে নির্ব্বাণ। যিনি জ্ঞানদৃষ্টিতে কর্ম্ম হতে নিজকে পৃথক্ বুঝ্‌তে পারেননি, কিন্তু দেবশক্তির তত্ত্ব বুঝ্‌তে পেরেছেন এবং জ্ঞানসহ কর্ম্মানুষ্ঠান করে থাকেন, অতএব কর্ম্মের অভিমানও বহন করেন, সেই বিবিদিষাসম্পন্ন সাধকই মরণের পর

দেবযান-পথের অধিকারী। এই কথাটার একটু বিবৃতি আবশ্যক।

দেবযান পথকে উপনিষদে বলা হয়েছে, আদিত্যের পথ, প্রাণের পথ, অন্নাদের পথ, জ্যোতিঃর পথ, উত্তরায়ণের পথ। এই গতির সীমা অন্তরীক্ষ লোক হতে সুরু করে দ্যুলোক পর্য্যন্ত, বা পুরাণের ভাষায় মহর্লোক হতে সত্যলোক পর্য্যন্ত। সাতটী লোকই ভোগ-ক্ষেত্র। তবে ভোগ জ্ঞানতঃ হতে পারে, অজ্ঞানতঃও হতে পারে। যাঁরা জ্ঞানে জগৎটা বুঝেছেন, কিন্তু চৈতন্য ও জড়ের বন্ধন-সংস্কার অতিক্রম করতে পারেন নি, বেদের ভাষায় যাঁরা তপঃ, শ্রদ্ধা, সত্য ও ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্ম-সম্পন্ন, তাঁরা দেবশক্তিতে আত্মসংমিশ্রণ করেন বলে দেবযানপন্থা বা ক্রমমুক্তির অধিকারী হন। তাঁরা এ জগতে ফিরে আসেন না বটে, কিন্তু মহর্লোক হতে পর পর অন্যান্য লোকের জ্ঞান সংগ্রহ করে সত্যলোকে উপনীত হন। সেখানে প্রলয়ে যখন সত্যলোকাধিপতির জ্ঞানদৃষ্টি উন্মেষিত হয়, তখন তাঁদের জ্ঞান হয়। এই পথটীকেই জ্যোতির্ম্ময় পথ বলা হয়েছে। জ্ঞানসহ কর্ম্মানুষ্ঠানের এই ফল।

আর যারা অজ্ঞানতঃ গতানুগতিক ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করে যায়, শঙ্কর বলেন, তারা মৃত্যুরই উপাসনা করে; মৃত্যু বলেন, তারা "পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে"—বার বার তারা আমার কবলিত হয়। উপনিষদে এই পথটীকে চন্দ্রের পথ, রয়ির পথ, অন্নের পথ, ধূমের পথ, দক্ষিণায়নের পথ বলা হয়েছে। বেদের পৃথিবীলোক বা পুরাণের ভূ ভুর্বঃ স্বঃ এই তিনলোক নিয়ে এর সীমা। এটা এই জগতের মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। এই পথে জীব মৃত্যুর পর প্রেতলোক, তারপর পিতৃলোক ও স্বর্গলোক পর্য্যন্ত ভোগ করে মহর্লোকে গিয়ে একবার দিব্যলোকের আভাস পেয়ে আসে। ইচ্ছা করলে সে এই মহর্লোক হতেই দেবযান পথ বেছে নিতে পারত, জ্যোতিঃর পথে চলতে পারত। কিন্তু সেই সময়ই কোন্ অজ্ঞাত আকর্ষণের ফলে তার নীচের দিকে নজর চলে যায়, এই পার্থিব জীবনের জন্য তার প্রাণ কেঁদে ওঠে; তখন অদৃষ্টের আকর্ষণে অচেতনবৎ অভিভূত হয়ে তাকে আবার এই পৃথিবীতে নেমে আসতে হয়। সে মহর্লোকে যে দিব্য সম্পদের আভাস পেয়ে এসেছে, মাতৃগর্ভে থাকবার সময় তারই ধ্যানে বিভোর থাকে। ভাবে, এবার জগতে গেলে তার সেই চকিতে দেখা স্বর্গলোককে ধরার বুকে নামিয়ে আনবার জন্য সে প্রাণপাত করবে। কিন্তু নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! পৃথিবীর কলুষিত বায়ুমণ্ডলে পড়তেই তার সব উল্টে যায়, আগেকার স্মৃতি কিছুই আর মনে থাকে না। তাই কোনও সাধক খেদ করে বলেছিলেন, "গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটী।"

এই হল পিতৃযান পথ বা সংসার। সাতটী লোকের মধ্যে মহর্লোকটী যেন চাঁদ; দেবযানের তিনটী লোক তার ঊর্দ্ধে আর পিতৃযানের তিনটী লোক তার অধোভাগে। এই মহর্লোকাধিপতিই আমাদের পৌরাণিক ইন্দ্র—ইনি দেবতা হয়েও মানুষের অতি নিকট আত্মীয়। ভগবান কোথাও অবিচার করবেন না বলেই পিতৃযানপন্থীকেও মহর্লোকের বহির্বাটীতে নিয়ে একবার দিব্যলোকের দৃশ্যটা দেখিয়ে আনেন; কিন্তু মানুষ স্বেচ্ছায় সে দিব্যসুখ ছেড়ে কামসুখের পানে ঝুঁকে পড়ে। ভগবান বলেন, "ভালটাও দেখিয়েছি, কিন্তু তোমার তো রুচি হল না; তাহলে আমাকে আর দুষতে পারবে না, বুঝেছ!"—এই বলে হাসেন! জীব বলে, "না, তোমাকে আর দুষব কেন? তবে কিনা এই স্বর্গ যদি

পৃথিবীতে না নামিয়ে আনতে পারি, তাহলে আমার স্বস্তি হবে না; অতএব আমি ওখানেই নেমে যাব।"—তারপর যা হয়, তোমার-আমার ভিতর অহরহঃই যা হচ্ছে, তা তো জানি। স্বর্গ গড়বার বৃথা চেষ্টায় সবাই জীবনপাত করছি —কিন্তু স্বর্গ গড়তে পারলাম কোথায়?

সাতটা লোকের মধ্যে জীবের তিনটীতে অর্থাৎ পিতৃযানের এলাকায় ব্যষ্টিভাব প্রবল। মহর্লোকে ব্যষ্টি, সমষ্টি দুটী ভাবই আছে। এর পরে দেবযান-পথে সমষ্টিভাবের প্রাবল্য। জড়, প্রাণ, চেতনা, এই তিনটী শক্তির কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এই তিনটীরই মিশ্রভাব, তার মাঝে ভূলোকে জড় প্রবল। আবার এদেরই প্রকাশ ব্যষ্টিতে। তাকেই বলি জীব। ভুবর্লোকে প্রাণ ও ইন্দ্রিয় প্রবল। স্বর্লোকে চেতনা বা অন্তঃকরণ প্রবল। এই তিন লোকেই জীবের ব্যষ্টি চেতনার ক্রিয়া; আমি দেহী, আমি স্বতন্ত্র, এই ভাব তখন বেশী ক্রিয়া করে। মহর্লোকে গেলে দিব্যভাবের আভাস পাওয়া যায়, তখন ব্যষ্টিটা যেন সমষ্টিতে গলে যেতে চায়। বিরাট জনসংঘের একমুখীনতার মাঝে থেকে একটী বিশিষ্ট ব্যক্তির যে ভাবান্তর হয়, তার সঙ্গে সে অবস্থার উপমা চলে। তখন যেমন "দেহটা আমার" এও মনে হয়, আবার "এই জনসংঘেরই একটা অঙ্গ আমি," এ-ও মনে হয়—কতকটা তেমনিতর ভাব। তার পরের তিনটী লোকে যথাক্রমে ওই তিনটী শক্তিরই সমষ্টিপরিণাম। জনলোকে সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর, তপলোকে সমষ্টি ইন্দ্রিয় ও প্রাণ আর সত্যলোকে সমষ্টি অন্তঃকরণ বা universal consciousness। মানুষ যখন দেবত্ব লাভ করে তখন সে তার ব্যষ্টির গণ্ডী ভেঙ্গে সমষ্টির অভিমানে অভিমানী হয়, এটা তো আমরা এই জগতেই অনুভব করে থাকি।

এই হল হিন্দুর পরলোকের ছক্। যদি বল এ কি দেখ্‌তে পাওয়া যায়? হিন্দু যোগী বলবেন, হাঁ, তোমার দেহের মাঝেই এগুলো দেখিয়ে দিতে পারি।

এক একটা লোকের অনুভূতি তোমার এক একটা চক্রে ফুটে উঠবে। মূলাধার হতে দ্বিদল পর্য্যন্ত থরে থরে এই লোকগুলি তোমার মাঝেই সাজানো রয়েছে। এর প্রমাণ তোমার চাক্ষুষ প্রমাণ। সখ হয় তো যাচাই করে নিতে পার!

এই পরলোকের সঙ্গে ইহলোকের সম্বন্ধ ধরে হিন্দুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। বারান্তরে তার একটু আভাস দিতে চেষ্টা করব।

হিমাচলের পথে

——*——

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা মটরবাসে চলে ক্রমে বেলা ৯॥টার সময় হৃষীকেশে গঙ্গার ওপর রঘুনাথজীর ধর্ম্মশালায় পৌছলাম। রঘুনাথজীর ধর্ম্মশালা অতি সুন্দর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মশালার দক্ষিণ পার্শ্বেই রঘুনাথজীর মন্দির। সামনেই একটী প্রকাণ্ড কুণ্ড। অনেকে এখানেও শ্রাদ্ধাদি করে থাকেন। একটু দূরেই ভাগীরথীর গম্ভীর কলতানে প্রাণে প্রকৃতির অনাহতনাদ ধ্বনিত করে তোলে। এখানে গঙ্গার বেগ অত্যন্ত বেশী। ১॥ বা ২ ফুট জলের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর। কিন্তু এত বেগের মধ্যেও স্নানের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। ৮।১০ হাত দূরে অনেকগুলি বড় বড় পাথর সাজিয়ে একটী বড় থামের মত করা হয়েছে, থামগুলি ৬।৭ হাত চওড়া ৮।১০ লম্বা হবে। তাতে ধাক্কা খেয়ে বাইরের দিকে স্রোতের বেগ চলে যায়, অথচ তার আড়ালে অল্প স্রোতে কোমর পর্য্যন্ত জলে অনায়াসে স্নান করা যায়। এমনিতর ৪।৫টী থামে স্নানের ব্যবস্থা আছে। আমরা তাতে মহানন্দে স্নান করেই ছত্রশালায় পক্কান্ন ভিক্ষার জন্য বের হয়ে পড়লাম। হরিদ্বারে অনেকগুলি ছত্রশালা আছে, তার মাঝে বাবা কালীকম্বলীওয়ালার ছত্রটীই সব চেয়ে বড়। তিনিই প্রথমে হৃষীকেশে ছত্রশালা খুলে সাধু-মহাত্মাদের সাধন-ভজনের সহায়তা করেছেন। চারটী ছত্রশালা হ'তে ভিক্ষা করে রুটী, অন্ন ভাত, ডাল, তরকারী নিয়ে এসে গঙ্গার ওপরে সেই বাঁধান থামের উপর বসে সেগুলির সদ্ব্যবহার করলাম। অনেক সাধুকেই ঐ ভাবে খেতে দেখলাম। জল অত নিকট, থালার দরকার নাই,

হৃষীকেশ
৭ মাইল

একখান বড় পাথর ধুয়ে নিলেই থালার কাজ হয়ে যায়। গ্লাস বা ঘটিরও দরকার করে না, অঞ্জলি ভবে জল তুলে খেলেই হল।

এখানেও হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের মত মাছের খেলা দেখতে পেলাম। অসংখ্য যাত্রী রুটী, মিষ্টি প্রভৃতি কিনে মাছকে খেতে দিচ্ছে। আমরাও কয়েকখানা রুটী মাছকে খেতে দিলাম। মাছগুলি এত নির্ভীক যে হাত হতে খেতেও ভয় করে না, বরং আমাদেরই ভয় হয়, পাছে হাতে কামড়ে দেয়। সবই খুব বড় বড় মহাশোল মাছ।

ঘাটের ওপরেই অনেক সাধু-মহাত্মা ধুনী জেলে আসন করে বসে আছেন। তাঁরাও কেদার-বদরী দর্শনে যাবেন। বাবা কালীকম্বলীওয়ালার সদাব্রতের চিঠি না পাওয়াতে এখনও রওনা হন নি। অনেক নাগাসন্ন্যাসী আছেন, ৩।৪ জন রামানুজ সম্প্রদায়ের সাধুও বিরাজ কচ্ছেন। তাঁরা ছত্রশালা হতে রুটী-ডাল আনেন না। কাঁচা আটা, ডাল, লবণ প্রভৃতি এনে নিজেরা পাক করে আহার করেন। সন্ধ্যার পর তাঁদের পাক ও অতিথিসৎকার দেখে খুব আনন্দ হল। কাছে যত লোক ছিল, প্রত্যেককে কিছু কিছু ডাল রুটী দিয়ে অবশিষ্টটুকু নিজে আহার করলেন। আমি দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলাম, তাঁরা আমাকেও প্রার্থী মনে করে দু'খানা রুটী দিলেন। এই সাধুদের সঙ্গে সুন্দর ছোট্ট একটী বিলাতী কুকুর ছিল। জানি না এ সব মহাত্মাদের সঙ্গে আমাদের কি রকম যোগাযোগ আছে; আমরা চারিধামই এই সব মহাত্মাদের সঙ্গে ঘুরেছি। আমরা হয়ত ২।১ দিন আগে চলে গেছি, পরে যেয়ে তাঁরা আমাদের সঙ্গে মিশেছেন। অথবা

তাঁরাই পূর্ব্বে চলে গেছেন, আমরা ৩।৪ দিন পরে রওনা হয়েও তাঁদের সঙ্গে গিয়ে মিশেছি। বদরীনারায়ণ পর্য্যন্ত আমরা প্রায় এক সঙ্গেই ছিলাম। বদরীনারায়ণে আমাদের দেরী হওয়াতে তাঁরা চলে এলেন, পরে আর তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় নি।

বিকালবেলা দুটী ছত্রশালা হতে রুটী ভিক্ষা করে আনলাম। বিকালবেলা রুটী ভিক্ষা করতে যাওয়ার সময় ৩।৪ জন বাঙ্গালী সাধুর সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা এখানে কেশবানন্দজীর আশ্রমে থেকে সাধন-ভজন করছেন। তাঁদের সঙ্গে কেশবানন্দজীর আশ্রমে চলে গেলাম। ভরতজীর মন্দিরের সামনে কেশবানন্দজীর আশ্রম। সেখানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে ফিরে আসি। তাঁরা ভিক্ষা করে যে রুটী পেয়েছিলেন, আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে তার ভাগ হতে বঞ্চিত করলেন না। তাঁদের মধ্যে স্বামী শঙ্করানন্দজী নামীয় আমার পূর্ব্বপরিচিত একজন সাধুও আছেন। সেখানে ১২।১৪ জন বাঙ্গালী সাধু নির্জ্জনে থেকে সাধন-ভজনাদি করছেন। কেশবানন্দজীর একটী আশ্রম কনখলে বড় আখড়ার নিকটে শ্রীমন্মুনি-মণ্ডল মহাবিদ্যালয় নামে খ্যাত। কেশবানন্দজী খুব নামজাদা পাঞ্জাবী সাধু। বাঙ্গালী সাধু কয়জন সেখানে বেশ আনন্দে কাটাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে অল্প সময় থেকেই খুব আনন্দ নিয়ে ফিরে আসি।

রাত্রিবেলা আমি, চিদানন্দদাদা ও হরিদাসদাদা তিনজনে গঙ্গার ধারে উন্মুক্ত প্রান্তরে কাটিয়ে দিই। যে ভীষণ শীত! কোথায় লাগে তার কাছে বাঙ্গলা দেশের মাঘ মাস! অনেক সাধু ধুনী জ্বেলে বসে আছেন। এখানে মাছির উপদ্রব অত্যন্ত বেশী। দিনের বেলায় পায়খানায় গেলে মাছি সমস্ত শরীর মলাচ্ছন্ন করে দিত। খাবার জিনিষ পাক করার সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে না রাখলে তাতে এত মাছি বসত যে খাবার আর দেখা যেত না, উপরে যেন একখানা কাল ন্যাকড়া দিয়ে জড়ান আছে মনে হত। কিন্তু মশা মোটেই নাই বলেই মনে হল।

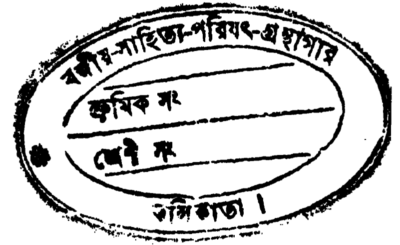
১৬ই বৈশাখ শুক্রবারঃ— হৃষীকেশ আধুনিক তপোবন, অতিপবিত্র ও রমণীয় সাধনার স্থান। এখানে গৃহস্থ বিরল; কেবল সাধু, ভক্ত, তপস্বী, গৈরিকবেশধারী, পর্ণকুটীরবাসী, সাংসারিক ব্যস্ততাবিহীন শান্তিময় যোগীদিগের অপূর্ব্ব ছোট ছোট কুঁড়ে-ঘরে তপোবন পূর্ণ। প্রত্যহ বিকালে তপোবনের অনেক স্থানে সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ, উপদেশ দান, ভগবদ্-বিষয়ক গান-ভজনাদি হয়ে থাকে, তাতে সর্ব্বসাধারণের সাধু-সঙ্গ করবার বিশেষ সুযোগ ঘটে। সাধু মহাত্মাদের জন্য অতি সুন্দর ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত আছে। সাধুদের নিত্য আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিষপত্র বাবা কালীকম্বলী-ওয়ালার ছত্র হতে এবং কোন-কোনও জিনিষ পঞ্চায়েতী পাঞ্জাবী ছত্র হতে সরবরাহ হয়ে থাকে। সাধন করবার জন্য পর্ণকুটীর, পাতবার জন্য মাদুর, কম্বল, জলপাত্র, কমণ্ডলু, কৌপীন, বহির্ব্বাস, গামছা, গেরীমাটী, কাপড়কাচা সাবান, রাত্রে জ্বালাবার তৈল, দেশলাই; পক্ষান্তে ক্ষৌর কার্য্যের জন্য নাপিতের বন্দোবস্ত, চিকিৎসার জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় প্রভৃতি যা কিছু প্রয়োজন, বাবা কালীকম্বলীওয়ালার ছত্র ও পাঞ্জাবী ছত্র হতে তার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। আহারের ব্যবস্থাও তদনুরূপ। প্রাতে সাধুমহাত্মাগণ চারটী ছত্র হ'তে ও বৈকালে দু'টী ছত্র হতে রুটী, ডাল, তরকারী, অল্প ভাত ভিক্ষা করে আহার করে থাকেন। সাধুদের জন্য এমন সুবন্দোবস্ত হৃষীকেশ ভিন্ন আর কোথাও নাই। সর্ব্বপ্রকারে এমন সাধনোপযোগী স্থান আর কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না।

জলবায়ুও বিশেষ অনুকুল। পতিতপাবনী ভাগীরথী সুমধুর তানে ভগবানের কীর্ত্তি-গাথা গেয়ে সাধুমহাত্মাদের প্রাণে ভগবৎপ্রেম জাগিয়ে আনন্দে নৃত্য করে করে চলেছেন। তিন দিক অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত; দক্ষিণ দিকে যদিও কোন পর্ব্বত নাই, তবুও দূরে হরিদ্বারের মনসা ও চণ্ডীর পাহাড় যেন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। অনেক গৃহীও বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করে সৎসঙ্গ মানসে এবং সাধনভজন করবার জন্য এখানে এসে বাস করছেন।

গঙ্গার গর্ভে দ্বীপের মধ্যে "ঝাঁসী" নামে একটী সাধুদের তপোবন ছিল। স্থানটী চারি-দিকে গঙ্গার পবিত্র ধারা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তাতে ৬।৭ শত ছোট ছোট কুঁড়ের মধ্যে সাধু-মহাত্মারা সাধন ভজন করতেন। গত ১৩৩২ সনের আশ্বিন মাসে ভাগীরথীর প্রবল বন্যায় সে অপূর্ব্ব তপোবন সাধুমহাত্মাদের নিয়ে ভেসে গিয়েছে। এখন ঝাঁসীর চিহ্নমাত্রও নাই। আবার নূতন করে এখানে তপোবন তৈরী হয়েছে এবং তিন চারি শত সাধুমহাত্মা সাধন ভজনে রত আছেন। আমাদের বাঙ্গালী সাধুও কয়েকজন আছেন।

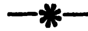
যে মহাত্মার কৃপায় সাধুমহাত্মাদের সাধন ভজনের এমন সুবন্দোবস্ত হয়েছে, যে মহাত্মার কৃপায় দেবভূমি হিমালয়ের তীর্থগুলির সমস্ত রাস্তা-ঘাট, চটি, জলছত্র, অন্নছত্র, ঔষধালয়, পুস্তকালয়, সাধু ও গরীবদুঃখীদের জন্য সদাব্রত, সাধারণের জন্য ধর্ম্মশালা প্রভৃতির বন্দোবস্ত হয়ে সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা হয়েছে, যাঁর কৃপায় আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী, দরিদ্র, অন্ধ, আতুর, খঞ্জ যাত্রীবর্গের স্বর্গভূমি ভ্রমণ ও বিহার সম্ভবপর হয়েছে, যিনি বদরিকাশ্রমযাত্রীদিগের দুঃখে কাতর হয়ে স্বয়ং অকিঞ্চন হয়েও প্রাণপণ অধ্যবসায়সহকারে হিমালয়ের দুর্গম পথ সুগম করেছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় সাধুর নাম জানবার জন্য সকলেই উৎসুক হয়ে থাকবেন। তিনি বাবা কালীকম্বলীওয়ালা। তাঁর পূর্ণ নাম পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রী ১০৮ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধা-নন্দ সরস্বতী। তিনি দশনামী সন্ন্যাসী। তিনি হিমালয়ের ভিতর চিরতুষারাবৃত গহ্বরে একটী কাল কম্বল গায়ে দিয়ে বহুদিন সাধনভজন করে-ছিলেন। সর্ব্বদা কাল কম্বল গায়ে দিয়ে থাকতেন বলে তাঁকে লোকে বাবা কালীকম্বলীওয়ালা বলত। তিনি স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। শুন্‌লাম তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন তিনি পাঞ্জাবী ছিলেন। হিমালয়ের ভিতর কঠোর তপস্যা করে পূর্ণমনোরথ হয়ে, জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি হৃষীকেশে এসে অবস্থান করতে লাগলেন। তখন অনেক সাধনপিপাসুও হৃষীকেশে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁদের ভরণপোষণের কোন সুব্যবস্থা না থাকায় সে অসুবিধা দূর করতে তাঁর ইচ্ছা হল। সুযোগও ঘটে গেল। কল-কাতার প্রসিদ্ধ শেঠ্ রায়বাহাদুর সুরজমল শিব-প্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা তাঁর বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীকে নিয়ে শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ দর্শনাভিলাষী হয়ে হৃষী-কেশে উপস্থিত হলেন। তখন বদরীনারায়ণের পথ অত্যন্ত দুর্গম ছিল। একদিন শেঠবাহাদুর তপোবনে বাবা কালীকম্বলীওয়ালার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সেবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। শেঠ বাহাদুর অনেক মাড়োয়ারী সভা-সমিতির সভাপতি এবং নিজেও কলকাতার মাড়োয়ারী বণিকসমাজের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন। কালীকম্বলী বাবা হৃষীকেশে সাধুদের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করার জন্য এবং উত্তরাখণ্ডের দুর্গম পথগুলি সুগম

করবার জন্য তাঁকে আদেশ করলেন। তাঁরই আদেশে ধর্ম্মাত্মা শেঠবাহাদুর সোমনদীর উপর সুদৃঢ় লৌহপুল, লছমনঝোলার পুল, অনেক ধর্ম্মশালা, ছত্রশালা খুলে সর্ব্বতোভাবে সাধুদের এবং তীর্থযাত্রীদের সুবিধা করে দিয়েছেন। বাবা কালীকম্বলীওয়ালাই সর্ব্বপ্রথমে উক্ত শেঠ বাহাদুর এবং ভারতের ধনকুবেরগণ দ্বারা হৃষীকেশ ছত্র-শালা খুলে সাধুদের সাধনভজনের বাধা অপ-সারিত করেন, এবং তাঁরই আদেশমত উত্তরা-খণ্ড চারিধামের দুর্গম রাস্তাগুলিও সুগম হয়েছে। পূর্ব্বে উত্তরাখণ্ডের পথে কোনও চটী বা দোকান, ধর্ম্মশালা, ছত্রশালা, ঔষধালয়, হাঁসপাতাল প্রভৃতি ছিল না। তিনিই উক্ত শেঠ বাহাদুরকে নিয়ে উত্তরাখণ্ডের সমস্ত প্রধান তীর্থস্থানগুলি পর্য্যটন করে যে যে স্থানে যে রকম ব্যবস্থা করা দরকার তার পত্তন করে আসেন। পরে উক্ত শেঠ বাহা-দুর ভারতের অন্যান্য ধনকুবেরগণ সহ মিলিত হয়ে বাবা কালীকম্বলীওয়ালা পঞ্চায়তীছত্র নামে এক একটী ছত্র খুলে হৃষীকেশ ও হিমালয়ের পথের সমুদয় অসুবিধা দূর করেছেন। (ক্রমশঃ)



তীর্থরামের গৃহস্থালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি) খ।



নারী ও পুরুষ

যেখানে গুরুশিষ্যের কথা আসে, সেখানে সেবার কথাও আসিয়া পড়ে। স্ত্রী স্বামীর শিষ্যা, এই কথাতেও যেমন ভারতের নারী কোনও দিন লজ্জা অনুভব করে নাই, তেমনি সে পুরু-ষের সেবিকা, এই কথাতেও তাহার চিত্ত সঙ্কু-চিত হয় নাই। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যের যুগে সেবা কথাটা নিতান্তই শ্রুতিকটু হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাই আজকাল "নারী সেবিকা" এই কথাটার ভাষ্য হইতেছে "নারী দাসী।" তাহার দাসীপনা ঘুচাইবার জন্য ভিতরে-বাহিরে আজ কলরবের অন্ত নাই। প্রথমেই বলিয়া রাখি, সেবা কথা-টাকে এত ছোটনজরে দেখা প্রকারান্তরে হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যেরই পরিচায়ক। বার বার দেখিয়াছি, যাহারা আভিজাত্যে বা অন্তঃকরণে ছোট, তাহারা কোনও রকমে সেবার দায় এড়াইয়া সেব্যের আসন পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে; আর যে জাতিতে প্রাণে বড়, সেই আনাখাসে সেবার ভার মাথায় তুলিয়া লয়। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে যত সহজে ব্রাহ্মণের পদসেবার ভার লইয়াছিলেন, অপর কেহ তেমনটী করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

সেবার মাঝে এই যে বড় দিকটা রহিয়াছে, এটা সচরাচর আমাদের নজরে পড়ে না। আমরা ভাবিয়া দেখি না, গুরু জগতের সেবক, ভগবান জীবের সেবক; এই কথাগুলি গুরুকে ভগবানকে খাটো করে না, স্বরূপ প্রকটিত করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা বাড়াইয়া তোলে।

আপত্তি হইবে, ওটা তো ভাবের কথা; কার্য্যতঃ কি হয়, তাই দেখ। বাস্তবিক পক্ষে সেবককে আমরা ছোট করিয়া রাখি নাই কি?

আমাদের দেশের নারীর দেবীত্ব আর গাঙীর ভগবতীত্ব যেমন তুল্য মর্য্যাদা বহন করে, নারীর সেবিকা-মহত্বও ঠিক তাহাই করে না কি?

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা আলোচনা করিতেছি আদর্শ নিয়া, বাস্তব নিয়া নয়। প্রাচ্য মনে নারীজীবনের যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নারীর মূলপ্রকৃতিকে কতটুকু অঙ্গীকার করিয়া চলিয়াছে, তাহাই আমাদের বিবেচ্য। আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার অক্ষমতাকে বাগাড়ম্বর দ্বারা ঢাকিয়া ফেলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আর বর্ত্তমান আন্দোলনও তো একরকম বস্তুতন্ত্রতাহীন; ভাবের ঘোরে কতকগুলি শব্দে কদর্থ আরোপ করিয়া তাহা লইয়াই মাতামাতি সুরু হইয়াছে, কল্পনাকে বাস্তবের সঙ্গে কেহ মিলাইয়া দেখিবার চেষ্টা তো করিতেছে না।

যে কথাটা বলিতেছিলাম। নারী পুরুষের আশ্রিতা, পুরুষের শিষ্যা, পুরুষের সেবিকা—এই কথাগুলি আমরা পুরুষ-নারী উভয় পক্ষই চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছি, এবং ইহা নিয়া কখনও কোনও আপত্তিই করি নাই। প্রতীচ্য নারীও এতদিন করে নাই, আজ করিতেছে। আজ সে বলিতেছে, "এতদিন খৃষ্টধর্ম্মের মাঝে প্রাচ্য ইহুদীর যে জবরদস্তীর ভাবটা সংগোপন ছিল, তাহাই আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে চাপিয়া রাখিয়াছিল তাই পুরুষের শাসন আমরা নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া আসিয়াছি; আজ প্রাচ্যের মোহ কাটিয়া গিয়াছে. কাজেই আমাদের বিধিপ্রদত্ত অধিকার আমরা ফিরাইয়া পাইতে চাই।" প্রতীচ্য নারীর এই মনোভাব কতিপয় শিক্ষিতা প্রাচ্য নারীর মনকেও দোলা দিয়াছে এবং নারীর স্বাতন্ত্র্যলাভের প্রচেষ্টায় নারী অপেক্ষা পুরুষ অধিকমাত্রায় উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান আন্দোলনের সৃষ্টি।

এই স্থলে আমাদের বক্তব্য এই, যে কেহ তাহার নষ্ট মর্য্যাদা ফিরিয়া পাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে, তাহাতে কাহারও বাধা দেওয়া উচিত নয়। বস্তুতঃ আমাদের সমাজে নারী যে বহুল পরিমাণে তাহার মর্য্যাদা হারাইয়া ফেলিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর্য্যশাস্ত্রেই নারীর যে মর্য্যাদা নিরূপিত হইয়াছে, নারী সে শিক্ষা, সে মর্য্যাদা আজ পায় না। কিন্তু এই লুপ্ত মর্য্যাদা ফিরিয়া পাইবার উত্তেজনায় নারী যদি আত্মহত্যা করিয়া বসে, তাহা হইলে তাহা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে কিনা, ইহাই চিন্তা করিবার বিষয়।

আমরা বলি, আর্য্যশাস্ত্র সমাজে নারীর জন্য সে আসন নিরূপিত করিয়া দিয়াছে, তাহা কামনার তাড়নার নয়, কল্যাণের প্রেরণায়। নারীর গভীরতর অন্তঃপ্রকৃতির এবং তাহার সার্ব্বভৌম প্রকাশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই হিন্দু নারী-পুরুষের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছিল। আর একটা বিশেষ কথা এই, যাঁহারা অন্তর্জীবনে নারীত্ব এবং পৌরুষের সম্মোহনকে কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন, অন্তরে অন্তরে যাঁহারা একান্ত ভাবে পুরুষও নহেন, নারীও নহেন, নারী পুরুষ ভেদের উর্দ্ধে যাঁহাদের প্রতিষ্ঠা, অথচ প্রকৃতির এই দুইটী বিভাবকেই অখণ্ড-আনন্দে বিলসিত যুগলমাধুরীতে যাঁহারা হৃদয়ে অনুভব করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন, সমাজে নারীর ও পুরুষের স্থান নির্দ্দেশ তাঁহারাই করিয়াছিলেন। পুরুষ শাস্ত্রকর্ত্তারা নারীর উপর জবরদস্তি করিয়া আইন গড়িয়াছিল, এ কথাটা বিলাতী। শাস্ত্রকর্ত্তাদের যদি কোনও লিঙ্গ-বিশেষণে বিশিষ্ট করিতে হয়, তবে বলা উচিত তাঁহারা ক্লীব—স্ত্রীও নন, পুরুষও নন। আজকালকার নারী আন্দোলনে এই কথাটা কেহই তলাইয়া দেখিতেছেন না। নারী যে তাহার মর্য্যাদা হারাইয়াছে, ইহার অর্থ

এই নয় যে পুরুষ তাহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই নারীর প্রতি অত্যাচার করিতেছে। আজ আমাদের সমাজে পুরুষের পৌরুষই বা কোথায়? দেশটা যে বীর্য্যহীন, ক্লীবের দেশ! পুরুষ তাহার আত্মমর্য্যাদা রাখিতেই বা জানে কোথায় যে নারীর মর্য্যাদাজ্ঞান সম্বন্ধে সে সচেতন হইবে? আজ যে পুরুষ আর নারী দুই-ই সমান বেগে রসাতলের দিকে তলাইয়া যাইতেছে! এখানে পুরুষের সহিত রেষারেষি করিয়া নারী যদি একটা পৃথক গৃহস্থালী পাতে, তাহাতেই কি সমস্যার মীমাংসা হইবে?

পুরুষ যদি পুরুষ হইত তাহা হইলে নারীকেও সে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত। নারীকে দেবী বলিয়া আরতি করিয়াছিল পুরুষই; উহা স্তোকবাক্য নহে, কামুকের চাটুবাদ নহে, পাশ্চাত্য Chivalry নহে—উহা দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত পুরুষের আত্মশক্তিরই সম্বর্দ্ধনা। আজ সে নারীকে দেবীর আসন হইতে নামাইয়া আনিয়াছে; কিন্তু সে ই কি দেবতার আসনে অটল হইয়া আছে?

তারপর আর একটা কথা। নারী জোরগলায় আজ পুরুষের অত্যাচারের কাহিনী রটাইতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু নারীর অত্যাচারকাহিনী তো কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতেছে না। প্রকৃতিতে পুরুষ-শক্তির ক্রিয়া ব্যক্ত, নারীশক্তির ক্রিয়া অন্তর্লীন। তাই নারীর উপর পুরুষের অত্যাচারটা স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে, কিন্তু পুরুষের উপর নারীর অত্যাচার মর্ম্মন্তুদ হইয়াও সঙ্গোপন থাকিয়া যায়। সাহিত্যের আসরে কেবল একদিকের কথাটাই বড় হইয়া উঠে। আমরা জানি, পুরুষ আর নারী পরস্পরের আপূরক শক্তি (Complimentary)। পুরুষ অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে, ইহার মূলে নারীর অত্যাচার না থাকিয়াই পারে না। উভয় শক্তিই অসংস্কৃত বলিয়া পরস্পরের সংঘর্ষে হলাহলের উদ্ভব হইতেছে। নারীশক্তি ও পুরুষশক্তি যদি শুদ্ধ হয় তো এ জ্বালা আপনা হইতে নিভিয়া যায়। এমন এক যুগ ছিল, যখন পুরুষ নারীর কুৎসিৎ নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিল; আজও শিক্ষিতা নারী পুরুষকে সেই যুগের কথা তুলিয়া খোঁটা দেয়। এখন আবার নারীও তেমনি পুরুষের কুৎসায় শতমুখ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বলি, উভয়ত্র অনিরুদ্ধ কামের বিজৃম্ভণ—নারী ও পুরুষ মনের কামময় প্রতিরূপ মাত্র। ইহার কোথায় আত্মপ্রতিষ্ঠা নাই, প্রেম নাই—তাই ধৃতিও নাই, শ্রীও নাই।

"নারী সেবিকা অতএব দাসী", অতৃপ্তকাম পুরুষ মহা কলরব করিয়া নারীকে এই কথাই শুনাইয়া তাহার ছদ্মহিতৈষণা দ্বারা অভিনব উপায়ে নারীর মন জিনিয়া লইবার ফিকির করিতেছে!—পুরুষ একথা বলে না কেন যে, "নারী সেবিকা, অতএব সে মাতা!" কামান্ধ পুরুষ নারীকে সেবার মাধুর্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার নায়িকাত্বকেই বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চায়, সেবার সাধনায় তাহার মায়ের স্বরূপকে অঙ্কুরিত করিতে তো চাহে না! নারী যদি সেবিকা না হইত, সে কি মা হইতে পারিত? মা যে সন্তানের দাসী—এ যে মায়ের কত বড় গরব, তাহা সন্তান-গরবিনী যে কোনও নারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও। যেখানে নারীর সেবা, সেখানেই তার মাতৃত্বের বিকাশ। শুধু দৈহিক সম্পর্কের বিচারে তাহার অখণ্ড মাতৃত্বকে চিরিয়া চিরিয়া দেখাইয়া নারীর অপমান করিতেছ কেন? হোক্ সে স্থূলের বিচারে জায়া, সখী, তনয়া বা সহোদরা—নারী জানে, যেখানে সে সেবিকা, সেখানেই যে সে মা!

বলিয়াছিলাম, পুরুষ আজ আত্মমর্য্যাদা হারাইয়াছে বলিয়া নারীকেও সে যথার্থ মর্য্যাদা দিতে পারিতেছে না। এখন ভাবিয়া দেখ, নারী-পুরুষে সম্মিলিত এই সমাজকে আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন করিয়া

তুলিতে হইলে কোথা হইতে কাজ সুরু করিতে হইবে। আগে পুরুষকে জাগাইয়া তোল, তাহার ঈক্ষণে নারীপ্রকৃতি আপনা হইতে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমান নারী-আন্দোলনের মূলেও তো দেখি পুরুষেরই ঈক্ষা। কিন্তু ইহার পরেই কথা উঠে, পুরুষকে জাগাইবে কে? ভাবিয়া দেখ, পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছে কে?—নারী। প্রত্যেক পুরুষকেই একদিন অসহায় হইয়া নারীর কোল আঁকড়িয়া থাকিতে হইয়াছে। পুরুষ গড়িবার প্রথম ছাঁচই হইল নারী। অস্ফুটবাক্ পুরুষকে নারী যাহা শুনাইয়াছে, আধ আধ ভাষায় সে তাহাই আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছে; বক্ষের শোণিতকে স্তন্যে পরিণত করিয়া যে ভাব পুরুষের মাঝে নারী সংক্রামিত করিয়াছে, অন্তর্গূঢ় সেই ভাবরাশি নিয়তির মত মরণকাল পর্য্যন্ত পুরুষকে অনুসরণ করিয়াছে!—মাতৃশক্তিকে অতিক্রম করিবার সাধ্য জীবের নাই।

তবেই দেখিতেছি, পুরুষকে জাগাইবার, জাতিকে গড়িয়া তুলিবার ভার বিধাতা নারীর হাতেই সর্ব্বাগ্রে তুলিয়া দিয়াছেন। পুরুষকে সৃষ্টি করিয়া নারী স্বেচ্ছায় তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে—মূলে এবং স্থূলে নারী-পুরুষের ইহাই চিরন্তন রহস্য। এই রহস্যে অনুপ্রাণিতা বলিয়া নারী চিরযুগ ধরিয়া সেবিকা; সে সেবিকা দাসী বলিয়া নয়, মাতা বলিয়া। স্ত্রী যে স্বামীর সেবা করে, তাহাও তাহার মাতৃত্বের প্রেরণাকে সার্থক করিবার জন্যই করে; কামাতুর পুরুষ মিথ্যা তাহাকে নায়িকাবৃত্তি বলিয়া, দাসীবৃত্তি বলিয়া কলঙ্কিত করে।

জীবধাত্রী বলিয়াই সেবা নারীর স্বভাব; পুরুষ সে সেবার আশ্রয়মাত্র। এই আশ্রয়তত্ত্বটা নারীর কাছে এমনই নির্ব্যক্তিক হইতে পারে যে শুধু একটা ভাবকে অবলম্বন করিয়া অবিশ্রান্ত সেবা করিয়া যাইতেও নারীর কোথায়ও বাধে না। নারীহৃদয়ের এই চিন্ময় রহস্য ঋষি জানিতেন বলিয়াই অসঙ্কোচে নারীকে সেবিকার আসনে বসাইয়া গিয়াছেন; এমন কি আশ্রয়রূপী পুরুষের ক্রটীবিচ্যুতিকে বড় করিয়া দেখিয়া নারীপুরুষের মর্য্যাদা লইয়া দরকসাকসি করিবার প্রয়োজন পর্য্যন্ত অনুভব করেন নাই।

স্বভাবের রাজ্যে চাহিয়া দেখ, নারী আর পুরুষের কি সম্পর্ক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মোদর-পূরণের চেষ্টাটাই প্রবল, ততক্ষণ স্ত্রীপশু আর পুরুষ-পশুতে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু সন্তানের জননী হইলে বিশেষ করিয়া স্ত্রীপশুতে ফুটিয়া উঠে সেবিকার ভাব। আত্মোদরপূরণের পিপাসায় মত্ত থাকিয়া যে-সেবা সে তাহার সহচরকে দিতে পারে নাই, আজ সেই সেবা সে সন্তানের উপর ঢালিয়া দিয়া আপনার স্ত্রীস্বভাবকে একটা বিশেষ অর্থে মণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে। পশুজীবনের মাঝে একমাত্র বিশেষত্বই হইতেছে স্ত্রীপশুর এই আত্মোৎসর্গ, এই সেবা। স্ত্রীপশুর এই সেবাতেই ফুটিয়া উঠে একটা চিন্ময় লোকের আভাস; ইহাকে বাদ দিলে পশুজগতে একমাত্র জড়ের ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর এই সেবাপরায়ণা জননীপশুর কাছে পুরুষ-পশু একেবারে অবান্তর, অর্থশূন্য—একটা মাংসপিণ্ড মাত্র! এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখি, জড়প্রকৃতির রাজ্যে যদি কোথাও সত্য শিব সুন্দর কিছু থাকে, তবে তাহা এই জননীর সেবা। মানুষীর মাঝেও যে এই প্রকৃতির প্রেরণা অবলীলাক্রমে নামিয়া আসিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? আমাদের সমাজে নারীর এই সেবাপ্রকৃতিটুকু এখন পর্য্যন্ত বজায় আছে বলিয়াই নিতান্ত জড় হইয়াও আমরা এখনও নিজকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিই। যদি জড়ত্ব ভাঙ্গে তো নারীর সেবাতেই, জননীর মমতাতেই ভাঙ্গিবে।

সর্ব্ববিষয়ে আমরা একান্ত পরাধীন বলিয়াই আজ নারীপুরুষের সম্পর্কটা এমন কুৎসিৎ হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার প্রতিকারের চেষ্টাও হইতেছে রেষারেষি আর গালাগালির ভিতর দিয়া। একবার স্বাধীন ভারতের স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক বিচার করিয়া দেখ, নারীর মর্য্যাদায় কোথাও লেশমাত্র ন্যূনতা নাই, অথচ নারী সেখানেও সেবিকা। বৈদিক বা পৌরাণিক নারীচিত্রগুলি আমাদের চিত্তে কি ভাব জাগায়? নারী কি সেখানে দাসী না সম্রাজ্ঞী? অথচ সে নারীও সেবিকা। নারীপুরুষকে বুদ্ধদেব তুল্যাধিকার দিয়াছিলেন। বৌদ্ধজাতক, অপদান, থেরীগাথা, প্রাতিমোক্ষ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দেখ, সেখানেও নারী মহিমময়ী, কিন্তু তাহার সেবিকা-ভাবের, তাহার জননীত্বের অমর্য্যাদা কোথাও হয় নাই। জৈনশাস্ত্রেও নারীর এই স্থান। এগুলি স্বাধীনযুগের চিত্র—যে যুগে পুরুষ স্বাধীন রাষ্ট্র, স্বাধীন ধর্ম্মমত, স্বাধীন শিল্পসাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিল; সে যুগে সে নিজে স্বাধীন হইয়া যে নারীকে পরাধীন করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাহাকে পরাধীন রাখিয়াও নিজের অন্তরে-বাহিরে স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল, ইহা মনোবিজ্ঞানসম্মত কথা নয়। স্বাধীন ভারতের নারীচরিত্রের আলোচনায়ও আমরা দেখি, নারী স্বেচ্ছায় জাতির জননীর আসন অধিকার করিয়া থাকিয়াই আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

পুরুষ যখন কামবাসনার ঊর্দ্ধে আপনার গুরুত্বে বা শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত, নারী তখন স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তাহার সেবিকা; আবার নারীই সেবিকা জননীরূপে পুরুষকে বাসনার ঊর্দ্ধে শিবস্বরূপের পানে প্রচোদিত করিতে সমর্থা—নারী আর পুরুষের মাঝে ইহাই সনাতন সম্বন্ধ। স্বাধীন নরনারীর ইহাই নিরপেক্ষ আলেখ্য।

তীর্থরাম দাম্পত্যজীবনে এই সত্যেরই প্রয়োগ এবং পরীক্ষা করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

বর্ত্তমান শিক্ষা



মেনে নিলাম, ধর্ম্মশিক্ষা, কর্ম্মশিক্ষা, সংযমশিক্ষা বর্জ্জিত এই যে শিক্ষা আমাদের দেশে চল্‌তি আছে, এতেই আমাদের পুরুষার্থ সিদ্ধ হবে। এ কথা মেনে নিয়েও "কিন্তু" খোঁচা এড়াবার যো নাই কিন্তু।

প্রথম আপত্তিই হচ্ছে, বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকে বরখাস্ত করে বিদেশী ভাষার অত্যধিক ব্যবহার। একেবারে Infant Classটাতে বোধ হয় ইংরেজীর তালিমটা বাদ যায়, কিন্তু তার পরের বছরই মাতৃভাষা ভাল করে পড়্‌তে না শিখ্‌তেই ছেলের ইংরেজী বর্ণপরিচয় সুরু হয়ে যায়। দশবছর যদি একটা ছেলের ইস্কুলে কাটে, তবে তার মাঝে কমপক্ষে নয় বছর কি সাড়ে নয় বছর তার যায় ইংরেজীর চর্চ্চাতে। শুধু ভাষা হিসাবে ইংরেজীর চর্চ্চা নয়; আট বছরের ছেলে আঁক কস্‌বে ইংরেজীতে, ভূগোল পড়বে ইংরেজীতে, ইতিহাস মুখস্থ করবে ইংরেজীতে। এর উপর খাস ইংরেজীভাষা তো আছেই; তার ব্যাকরণ আছে, রচনা আছে, অনুবাদ আছে, প্রত্যনুবাদ আছে, আরও কত কি আছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আছে ইংরেজী

জামার গর্ব্ব; ছোট বেলা হতেই এই গর্ব্বটা এমনি মজ্জাগত হয়ে দাঁড়ায় যে ছেলে তার অজ্ঞাতসারেই দেশী রীতিনীতিগুলিকে পর্য্যন্ত ইংরেজী-ছাঁচে ঢেলে নেয়, তাতে বয়স্ক ব্যক্তিরা আপত্তি করেন না বা আপত্তি করার কল্পনাটাও তাঁদের মাথায় আসে না। ছেলের বইএর মুখপাতেই দেখতে পাব, ইংরেজীতে কাঁচা হরফে তার নাম-ধাম-কুলজী লেখা। বাংলা বইয়েও বা সংস্কৃত বইয়েও বাংলায় নাম লেখা দস্তুর নয়। চিঠিপত্র লিখতে গেলে বা কোথায়ও নাম সই করতে গেলে ইংরেজী হরফগুলোই লেখনীর মুখে গজিয়ে ওঠে। কল্পনা কর, একজন ইংরেজ বাংলা শিখছে। সে তার বর্ণ-পরিচয় বা বোধোদয়ের উপর কোন্ হরফে তার নাম-ধাম লিখবে ইংরেজীতে না বাংলাতে? দেখেছি ইংরেজ বিদেশী ভাষাতেও স্বদেশী চালায়; আর আমরা স্বদেশী ভাষাতেও চালাই বিদেশী! অথচ এটা যে কত উদ্ভট, সে খেয়াল আমাদের হয় না।

এর চাইতেও মজা হয়, যখন দেখি, ছেলের খাতার শিরোভাগে ইংরেজীতে লেখা আছে—"শ্রীহরিশরণং"এর ইংরেজী সংস্করণ—God is good; কিংবা তার চাইতেও সরস—ইংরেজী হরফে Om! —দেখে হাসব কি কাঁদব ঠিক করতে পারি না।

ছেলে মায়ের কাছে চিঠি লিখছে—শিরোনামা দিচ্ছে—To my mother; অথচ "মাদার" বেচারী হয়ত হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞানবর্জ্জিতা পল্লীকন্যা! গোটা চিঠিখানা বাংলায় লিখে তার গোড়ায় দিলে My dear অমুক আর শেষে থাকল Yonrs ইত্যাদি! —দেশী ভাষায় শিষ্ট সম্ভাষণের এমনি দুর্ভিক্ষ!

তারপর শিক্ষার কথাতেই ধর না কেন। ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত আমাদের ছেলেরা বিদ্যামন্দিরের প্রবেশদ্বারে যে ঠেলাঠেলি করে, সে মন্দিরের মণিকোঠায় কি ইংরেজী ভাষা ছাড়া আর কোনও জ্ঞাতব্য কিছু নাই? ইংরেজীজানা গ্রাজুয়েটের মুখে যে সময় সময় বস্তুতন্ত্রতাহীন অপরূপ হাস্যকর এক একটা কথা শুনতে পাই, তার মূলে কি ভাষা শিক্ষার প্রতি এই অতিরিক্ত ঝোঁক নয়? "বীরবল" বলেছিলেন, হবু-উকীল গ্রাজুয়েট যুবক আইনের পরীক্ষাপত্রে স্থাবর সম্পত্তির দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন—পর্ব্বত, আর অস্থাবর সম্পত্তির উদাহরণ—নদী! একশ' খানা কাগজের মাঝে পাঁচখানাতেই নাকি এই উত্তর ছিল। মানুষ এত সহজে কাণ্ডজ্ঞান হারায় কি করে বলতে পার কি?

কেউ কেউ আক্ষেপ করে বলে থাকেন, ইংরেজের বা জার্ম্মানের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরা আমাদের দেশের ছাত্রদের চেয়ে কত বেশী জানে! কিন্তু কেন জানে, তা জানেন? তাদের বাংলার ইতিহাস ইংরেজীতে মুখস্থ করতে হয় না, অঙ্ক, ভূগোল, বিজ্ঞানের বুলি ইংরেজীতে আওড়াতে হয় না। প্রবেশিকা পরীক্ষার ছ বছর আগে থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ানো সুরু হল, কিন্তু তবুও ইতিহাস সম্বন্ধে ছেলেদের একটা কাণ্ডজ্ঞান জন্মাল না। কেননা, ইতিহাস পড়ানোর উপলক্ষ্য করে ইংরেজী ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে যে! মাতৃভাষার হলে হয়তো ওই ছবছরে একটা ছেলে ছয়টা দেশের ইতিহাস শিখতে পারত। কিন্তু একই ইতিহাসের ছোট, মাঝারি, মাঝারি, রকমারি সংস্করণ তাকে মুখস্থ করে মরতে হয় কেন? ইতিহাস শিখবার জন্য নয়, ইংরেজী শিখবার জন্য! মাতৃভাষায় ছ'মাসে দিন আধঘণ্টার চেষ্টায় ছেলেদের যে ভূগোলজ্ঞান জন্মায় দেখেছি, ইংরেজীতে ছ'বছরে আমাদের তা জন্মায় নি। জ্যামিতির এক একটা প্রতিজ্ঞা বাংলায় বুঝিয়ে দিলে যে কোনও ছেলে তা দিব্য বুঝে যাবে। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞার ইংরেজী সংস্ক-

রণ নিয়ে দিনের পর দিন ছেলেরা যে অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকে যায় তা শুন্‌লে কার না দুঃখ হয়? অবশ্য ক্ষমতার এই অপব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটী নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই ত্রুটীকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে— বিদেশী ভাষার প্রতি এই অত্যধিক ঝোঁকে।

বিদেশী ভাষা শিক্ষার আর একটা শাস্তি হচ্ছে ভাবের দৈন্ত। এইটাই সব চেয়ে মারাত্মক বলে মনে হয়। যদি এর মূলে কোনও রাষ্ট্রীয় কূট-নীতি প্রচ্ছন্ন থেকে থাকে তো সে নীতি ষোল-আনা সফল হয়েছে বল্‌তে হবে। আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা ইংরেজী শেখার ঝোঁকে না পারে ভাল ইংরেজী শিখতে, না পারে ভাল বাংলা লিখতে। যে কোনও গ্রাজুয়েটের বাংলা রচনা পড়ে পাঠককে বোধ হয় ভাবনায় পড়তে হবে যে লোকটা বাংলার অধিবাসী না প্রবাসী?

এখন যে শিক্ষা প্রচলিত আছে, তার সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট ফল হত কি?—ভাব সঞ্চয় করে সুষ্ঠু-ভাষায় তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করা। বাঙ্গালী শিক্ষায় মানুষের সুপ্তশক্তিকে জাগিয়ে তুলবে—এ তো সহজবোধ্য কথা। যে শিক্ষাতে শিক্ষণীয় অন্যান্য বিষয় ছেড়ে ভাষাশিক্ষার প্রতিই বেশী জের দেওয়া হয়েছে, সে শিক্ষা একাঙ্গী হলেও তার দ্বারা ভাবপ্রকাশ করবার ক্ষমতা নিশ্চয় জন্মাত। কিন্তু আমাদের তাই হচ্ছে কি?

শিক্ষণীয় বিষয়ের মাঝে ইংরেজী ভাষাকেই মুখ্যস্থান দেওয়া হয়েছে এবং স্বাভাবিক কারণ-বশতঃই সে ভাষায় রচনা-শিক্ষাকে একেবারে কোণঠেসা করে রাখা হয়েছে। বাংলা রচনা-শিক্ষা দেওয়া তো অনেক জায়গায় দস্তুরই নয়। ইস্কুলে যদি বা বাংলা-শিক্ষার রেওয়াজ কিছু কিছু আছে. কলেজে আর সে বালাই নাই; থাকলেও ইংরেজীতে বাংলা শেখাবার বন্দোবস্ত আছে দেখেছি! কিন্তু মনোভাবকে মাতৃভাষায় স্ফুটরূপে প্রকাশ করতে শিক্ষা দেওয়াটাই যে সাহিত্যচর্চ্চামূলক শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য, সে কথা শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তারা মোটেই আমলে আনেন না। তাই দেখি, প্রকাশ করবার ক্ষমতার অভাবে অতিপরিচিত বিষয় সম্বন্ধেও শিক্ষিত যুবকের মন একেবারেই সাড়া দিতে চায় না। বিদেশী-ভাষায় সব-কিছু অর্জ্জন করতে হয় বলে চিত্তের সমস্ত চেষ্টা তাতেই ব্যয়িত হয়ে যায়, কাজেই আর ভাব সম্বন্ধেও কোনও স্বাধীনতা থাকে না। আমাদের দেশে যত ছেলে উচ্চশিক্ষা পায়, শুনেছি ইংরেজের আপন দেশেও তত ছেলে উচ্চশিক্ষা পায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও চিন্তার রাজ্যে দুই দেশে আকাশ-পাতাল তফাৎ। শিক্ষিত বাঙ্গালীর সমস্ত মেধা ব্যয়িত হয়ে যাচ্ছে নিম্নশ্রেণীর গল্প-উপন্যাস-কবিতা-মূলক অপটু সাহিত্যসৃষ্টিতে। মৌলিক গবেষণা দূরে থাক, একটা কঠিন বিষয় নিয়ে ইংরেজীতে যেখানে হাজারখানা বই পাওয়া যাবে, বাংলায় সেখানে পাঁচখানা পাওয়া গেলেই পরম সৌভাগ্য। অথচ বাঙ্গালী ইংরেজের দর্শন-বিজ্ঞান কিছু কম শিখেনি। এর মূল কথাটাই হচ্ছে এই, বিদেশী ভাষার চাপে আমাদের ছেলেদের ভাববার এবং ভাব প্রকাশ করবার শক্তিকে নির্ম্মমভাবে পিষে ফেলা হচ্ছে।

তারপর যে রীতিতে ইস্কুল-কলেজে পড়াশোনা হয়। সে যে কতখানি ভ্রান্ত আর অবৈজ্ঞানিক, তা বলবার নয়। প্রথমতঃ ধর শ্রেণীবিভাগ। এক একটা শ্রেণীতে কতকগুলি পুথি ও বিষয় নির্ব্বাচনদ্বারা একটা গণ্ডীরচনা করে তার মাঝে কতকগুলি ছেলেকে পুরে দেওয়া হল। ছেলেরা তো আর সবাই এক মাপের নয়। কারু হয়ত ইতিহাসে মাথা খেলে তো অঙ্কে খেলে না; কারু সাহিত্যে খেলে তো ভূগোলে খেলে না।

কিন্তু সেদিকে শিক্ষকের নজর দেওয়ার কোনও উপায় নাই। যে ছেলের কাছে অঙ্ক দুর্ব্বোধ্য, ক্লাসের মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য তাকে তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে, তার দরুণ তার প্রিয় পাঠ্য বিষয় উপেক্ষিত হোক না কেন। তিনটা চারটা বিষয় নিয়ে সারাবছর এইরকম ধস্তাধস্তি করে বার্ষিক পরীক্ষায় দেখা গেল, ছেলে যদি সাহিত্য ও ইতিহাস ভাল শিখেছে তো ভূগোলে তার জ্ঞান হয়েছে চলনসই, আর অঙ্ক সে কোনও রকমে পার হয়ে গিয়েছে মাত্র। মাষ্টার খুসী হয়ে তাকে 'পাশ' করে উপরের শ্রেণীতে প্রমোশান দিয়ে দিলেন। সেখানে তার সাহিত্য আর ইতিহাস পড়া হয়ত ভালই হল, কিন্তু ভূগোলে আর অঙ্কে যে খুঁৎ ছিল, তা সারবার কোনও ব্যবস্থাই থাকল না। ফলে এই হল, গরহজমের উপর ভূরিভোজন হলে যেমন নাড়ী আল্‌গা হয়ে যায়, ছেলেরও তেমনি ভূগোল আর অঙ্কের নাড়ী আল্‌গা হয়ে গেল, আর তার জের টেনে সে চল্‌ল বিদ্যালয়ের মেয়াদের শেষদিন পর্য্যন্ত। পরীক্ষায় ওই নাড়ী-আল্‌গা বিষয় দুটোকে সে কোনও রকমে রস্তা দেখিয়ে পার হয়েই ভাবল, বাঁচা গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ও খুসী হয়ে সার্টিফিকেট দিলেন, হাঁ, প্রবেশিকা কক্ষা পর্য্যন্ত যা কিছু জানবার, তা এই ছেলে বেশ জানে! এটা কি জোচ্চোরী নয়?

(একটা পরীক্ষা রীতি আছে। তাতে ছেলে কিছু শিখেছে কিনা তার যাচাই হয় না, ছেলেকে ঠকানো যায় কিনা, তাই দেখা হয়। ছেলের মনও আতঙ্কে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে—কি জানি পরীক্ষায় কিই বা জিজ্ঞেস করে বসে! তাই সে বইয়ের পাতা উলটিয়ে লাল-নীল বেগুনী পেন্সিলের খোঁচায় বইখানাকে জর্জ্জরিত করেও সোয়াস্তি পায় না; মনে হয়, ওই অংশটায় একটা দাগ দেওয়া হল না—কি জানি যদি ওটাই পরীক্ষায় এসে পড়ে। ফলে প্রথম নম্বরেই তার গুরু লঘু জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়; অধীতব্য বিষয়ের কোনটা যে দরকারী আর কোন্‌টা অদরকারী—সে বিচারশক্তি তার থাকে না; গ্রন্থকারের বক্তব্যের মূলসূত্র হতে তার বিবৃতির অংশটুকু নিষ্কর্ষণ করে নিয়ে সজীব চিন্তার যে একটা আনন্দ, সে তা মোটেই পায় না; কাজেই মৌলিক চিন্তা করবার ক্ষমতাও তার ক্রমে চলে যায়। তার সর্ব্বদাই ভয়, কি জানি কোন পাতা থেকে প্রশ্ন পড়ে। এতে দেহ মন যে আতঙ্কে, দুশ্চিন্তায় কতখানি অবসন্ন হয়ে পড়ে, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। ফলে এক একটা পরীক্ষায় মনে হয়, যেন ছেলের দশ বছর আয়ু কমে গেল!

শুধু কি তাই? অস্থির মনের শিক্ষায় সংশয় তো থেকেই যাবে। আর সংশয় হতেই জন্মাবে ঠকাবার বুদ্ধি। যাঁরা ইস্কুলকলেজের ছেলেদের উত্তরপত্র পরীক্ষা করেছেন, তাঁরাই জানেন পরীক্ষককে লেখার ধোকায় বা ভাষায় ধোকায় ফেলে নম্বর আদায় করবার ফিকিরটা ছেলেদের কেমন শানিয়ে উঠে! এটা কি নৈতিক উন্নতির লক্ষণ?

তারপর নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা, সে তো আরও চমৎকার। একটা বিষয়ে পূর্ণ সংখ্যা থাক্‌ল ১০০। তার অর্থ এই, যে এই বিষয়টা বেশ ভাল রকম আয়ত্ত করেছে, সে পুরোপুরিই ওই নম্বরটা পাবে। তারপরই আবার বলা হল "কিন্তু ৩০ নম্বর থাকলেও ছেলে 'পাশ' হবে।" এর অর্থ এই, তোমার শিক্ষণীয় বিষয়ের দশ আনাও যদি তুমি না জান, তবুও আমি মেনে নেব যে তুমি বিষয়টা জান! এটা কি ছেলের প্রতি সুবিচার হল? ছেলে যে শিক্ষককে মাইনে দেয়, সে কি তাঁর কাজ আধাআধি করবেন বলে? আমি ভাল ছেলে নই, কাজেই তোমার এক বছরের অধ্যাপনায়

বিদ্যার চার আনা মাত্র আমার মাথায় ঢুকল। তোমার উচিত নয় কি, যে পর্য্যন্ত ষোলআনা আমার মাথায় না ঢুকছে, সে পর্য্যন্ত আমাকে রেহাই না দেওয়া? আমি যাতে ১০০ নম্বরের মাঝে ১০০ নম্বরই পাই, সেই চুক্তিতেই তো তোমার বেতন জোগাচ্ছি; তুমি তোমার চুক্তি সম্পূর্ণ না করে আধাকাঁচা থাকতেই উপরের ক্লাসে ঠেলে দিয়ে চিরকালের জন্য আমায় পঙ্গু করে রাখলে—এই কি বিদ্যাদাতা গুরুর কর্ত্তব্য?

সব ছেলে কিছু সমান নয়; কারু একটা বিষয় শিখ্‌তে দুদিন লাগে, কারু লাগে দশদিন। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে সবার জন্যই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় বাঁধা রয়েছে। এতে কারু সময়ে কুলায় না, কারু বা উদ্বৃত্ত থাকে। কিন্তু মার্কা মারবার সময় সব একাকার করে দেওয়া হয়। ফলে ভিতরে গোঁজামিল রেখে উপরে থাকে পাশের পালিস। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে গিয়েই সব ঝুটা ধরা পড়ে যায়।

আজকাল সে ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না, আগে দেখেছি ক্লাসে উপর-নীচ করবার প্রথা ছিল। যে ছেলে পড়ায় পারত, সে সকলকে ঠেলে উপরে উঠে যেত, আর মন্দ ছেলেরা ক্রমে তলিয়ে যেত। এতে ভাল ছেলেরা উৎসাহ পেল বুঝলাম, কিন্তু মন্দ ছেলের যে মাথা খাওয়া হয়ে গেল! শিখ্‌তে এসে সে শিখ্‌তে পারছে না —এটা হল তার অপরাধ আর সেই অপরাধের শাস্তি দেওয়া হল তাকে অপমান করে। ক্রমে সে 'লাস্ট্‌ বেঞ্চ'টাকেই তার ইজারামহল মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল; আত্মশক্তির প্রতি সে বিশ্বাস হারিয়ে নিজকে পায়ে ঠেলবার যোগ্যই মনে করে রাখ্‌ল। এখানে শিক্ষার ফলে তার উন্নতি হল, না অবনতি হল? শিক্ষক কি চালুনীর মত ভাল ছেলে চেলে বার করতেই ওস্তাদ?

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর হাজারে হাজারে গ্রাজুয়েট বের করে দিচ্ছেন। গ্রাজুয়েটরা যখন উপাধিগ্রস্থ, তখন তাদের 'পণ্ডা' জাত হয়েছে, এ কথা মনে করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? হয়ত এই হাজারটা ছেলের মাঝে বাস্তবিক দশজনের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, আর বাকী ৯৯০ জনই শিক্ষাবিভাগের ভেজাল। এমনি করে উচ্চশিক্ষা দিন দিন দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে, আর আমরা ভাবছি, আমাদের চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়ে গেল আর কি!

আমায় তুমি এক বস্তা ধান দিয়ে বল্‌লে, ওগুলো চাল করে দাও। আমি ঢেঁকিতে সেগুলো এক পালটান কুটেই তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লাম, এই নাও, চাল হয়েছে। তুমি দেখ্‌লে এক বস্তা ধানের মাঝে সেরখানেক যদি চাল হয়ে থাকে, আর বাকী সব আভাঙ্গা-আধা-ভাঙ্গা হয়ে আছে। চাল কুটে দেওয়ার জন্য তুমি আমায় পুরোপুরি মজুরী দেবে না? বর্ত্তমান ইউনিভার্সিটীও এমনি ধরণের ধান ভানার কারবার চালাচ্ছেন।

বর্ত্তমান শিক্ষায় মেকীর কারবার যে কতখানি চলছে, একটা কথাতেই তা বোঝা যাবে। আজ-কাল বাংলা দেশ নাকি খুব শিক্ষিত; সেই তুলনায় আসাম, উড়িষ্যা, বিহার পেছনে পড়ে আছে। দেড়শ' বছর ইংরেজী শিক্ষার ফলে এই দশা দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দেড়শ' বছর পূর্ব্বে আসামে, উড়িষ্যায়, বিহারে প্রাচ্য ধরণে শিক্ষিত দিগ্‌গজ পণ্ডিতের অভাব ছিল না। হঠাৎ এই দেশগুলির প্রতিভা এমন করে নিভে যাওয়ার অর্থ কি? সমাজে যারা উঁচুতে থাকে, সর্ব্বত্রই উচ্চশিক্ষা তাদের ভাগ্যেই জোটে। আগে এই উচ্চশিক্ষা যখন প্রাচ্য ধরণে দেওয়া হত, তখন যতগুলি ধান গড়ে পড়েছে, সবগুলোই যাতে চাল হয়ে

বেরোয়, তার চেষ্টা ছিল। কাজেই দেশে পণ্ডিতের সংখ্যা বেশী হত এবং পাণ্ডিত্য হিসাবে কোনও দেশ কারু কাছে খাটো ছিল না। বর্ত্তমানে উচ্চ-বংশীয়েরা উচ্চশিক্ষা পাচ্ছেন পাশ্চাত্য ধরণে; তাতে যারা চালাক, তারাই সহজে উৎরে যায়। বাঙ্গালী চিরকালই চতুর; তাই ভিতরে সার-পদার্থ না থাকলেও উচ্চশিক্ষার বার্ণিশে সে রাতারাতি চক্‌চকে হয়ে উঠেছে। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন এই অনুপাতে সমস্ত ভারতবর্ষে যথার্থ পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা কি রকম দ্রুত-গতিতে দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

সংস্কৃত শিক্ষাতেও পাশ্চাত্য নীতির প্রবর্ত্তন হওয়ায় সংস্কৃতের পাণ্ডিত্যও দিন দিন কমে যাচ্ছে। গবর্ণমেণ্ট ঝুড়ি-ঝুড়ি "তীর্থ" বের করছেন; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েটদের যা দশা, তাদেরও সেই দশা। বিদ্যার বহরও যেমন, চাকরীর বাজারে দামও তেমন!

আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (অবশ্য সে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের খড়ো চণ্ডীমণ্ডপে—গোলদীঘির পারে রাজপ্রাসাদে নয়) প্রতিজ্ঞা ছিল, "যে একশ নম্বরের মাঝে একশ নম্বর পাবে, তাকেই বলব পাশ; আর যতগুলি ধান পাব, সবগুলিকে চাল করে দেব, এক পাল্‌টানে যার হবে না, তিন্ পাল্‌টানে তার তুষ ছাড়াব; তাতে এখন যত সময়ই লাগুক না কেন! বিদ্যার্থীকে উপাধি দেব বিচারসভায় দশজন পণ্ডিতের সামনে হাজির করে তার নবোন্মেষিত বিচারশক্তির ঝলক্ দেখিয়ে; আর বিদ্যা বতরণের দায় তার কাঁধে চাপিয়ে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় হতে ছুটী দেব।"

এখন এই সমস্ত নীতির সঙ্গে অধুনাপ্রচলিত বিজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন-খানটায় মিল আছে, আপনারা তাই ভেবে দেখুন, আর মেকী শিক্ষার মোহে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে, তাই বুঝুন। লেখাপড়া শেখাটাই শিক্ষা—শিক্ষার এই সঙ্কীর্ণ অর্থ মেনে নিলেও, আমরা যে তাতেও লাভবান হচ্ছি, তাও তো নয়।

আজকাল Pestalozzi, Montessori, Frœbel Herbart, Parkhurst প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাসংস্কারকদের চিন্তাধারা আমাদের মাঝে যে ঢুকছে, তা জানি। কিন্তু দুটা দেশের ভাবের ধারা, সংস্কার, পারিপার্শ্বিক সবই যে বিভিন্ন, এ কথা না বুঝে অতি উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্য শিক্ষানীতিও আমাদের দেশে আমদানী করলে ফলটা গণেশের কাঁধে ঐরাবতের মাথা বসিয়ে দেওয়ার মতই হবে। এ কথা অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।



সওয়াল-জবাব

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]



আজ আর কোনও একটা বিষয় ধরে দস্তুরমত বক্তৃতা করা হবে না। রামের কাছে অনেকে অনেক প্রশ্ন নিয়ে আসছে। প্রশ্নগুলো সময় সময় ভাবী অদ্ভুত ঠেকে। তারি দু'চারটার জবাব দেওয়া যাবে আজ। তোমাদের উপস্থিত কারু কোনও জিজ্ঞাস্য থাকে, আমেরিকার যে যেখানে থাক না কেন, কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে এক টুকরা কাগজে লিখে রামের কাছে পাঠিয়ে দিও। তার জিজ্ঞাস্য বিষয় নিয়ে এই হলে বা অন্য যে কোনও জায়গায় রামের কথা কওয়ার সুযোগ হবে, সেখানে তন্ন তন্ন করে তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পূর্ব্বে, লোকের মনে যে ধরণের প্রশ্ন সব ওঠে, তা নিয়ে মোটামুটী কিছু বলা দরকার। জানই তো, ইউরোপ বা আমেরিকার পণ্ডিতদের ধরণের সঙ্গে ভারতবর্ষের দার্শনিকদের মিল নেই। ভারতীয় দার্শনিকেরা যখন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, তখন প্রথমতঃ বিষয়টার একটা বিবৃতি দিয়ে তারপর তার সম্বন্ধে নানাধরণের প্রশ্নের জবাব দেন। রামেরও এই সমস্ত অবস্থা পার হয়ে গিয়েছে। মানুষের মনে যত রকম প্রশ্নের উদয় হতে পারে, সব রামের মনে জেগেছে কোনও দিন। বাস্তবিক প্রশ্ন আর কুতর্কের সাগর যেন রয়েছে মানুষের বুকে। কতক প্রশ্ন জেগেছে যখন রাম পাঁচ বছরের মাত্র; কতক তাঁর মাথা ঘুলিয়েছে পনের বছর বয়সে; আবার কতক হয়ত তাঁর মনে জেগেছে পঁচিশের পাড়ি দিয়ে।

প্রশ্ন সম্বন্ধে আর একটা কথা বলবার আছে। কোনও প্রশ্ন হয়ত মনে দার্শনিকভাব জন্মাবার গোড়ার প্রশ্ন; কতক তার পরের যুগের; কতক আরও পরের। একজন এসে তোমায় বলল, ইউক্লিডের জ্যামিতির ৪৭ প্রতিজ্ঞা বুঝিয়ে দিতে। তুমি যদি সরাসরি ৪৭ প্রতিজ্ঞা বোঝাতে বস অথচ লোকটা ৪৬, ৪৫ বা প্রথম প্রতিজ্ঞাটা পর্য্যন্ত জানে না, ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ বা অবশ্য স্বীকার্য্যের কোনও সন্ধান রাখে না—তাহলে কি তাকে ৪৭ প্রতিজ্ঞা বোঝাতে পারবে মনে কর? যদি ওটা বোঝাতে হয়, তাহলে তোমাকে ৪৬ প্রতিজ্ঞা আগে বোঝাতে হবে, বর্গক্ষেত্র কি, তা বোঝাতে হবে, ৩২ প্রতিজ্ঞা পড়াতে হবে ইত্যাদি। আবার সে সব প্রমাণ করতে লাগবে ১৬, ২২ প্রতিজ্ঞা; ক্রমে তুমি গিয়ে পৌঁছাবে প্রথম প্রতিজ্ঞায়; তা থেকে যাবে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ আর স্বীকার্য্যের কোঠায়। সব নিয়ে একটা তাল পাকিয়ে যাবে। কোনও কিছুই প্রমাণ করা হবে না।

এমনি তালগোল পাকিয়ে বিজ্ঞানের আলোচনা হয় না। বিজ্ঞান আলোচনা করতে হয়, একটা শৃঙ্খলা ধরে, ধারা ধরে। বেদান্তদর্শনটা ধর্ম্মও বটে, বিজ্ঞানও বটে। তোমাদের ইউরোপে ধর্ম্মে আর বিজ্ঞানে মহা বিরোধ; কিন্তু রাম তোমাদের শোনাবেন সমন্বয়ের কথা। বাস্তবিক বেদান্তে দর্শন, ধর্ম্ম আর বিজ্ঞানের সমন্বয় হয়েছে

বেদান্ত হল বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞান; কাজেই ধীরস্থির ভাবে একটা ধারা ধরে তার আলোচনা হওয়া দরকার। যে কয়েকটী বক্তৃতা তোমরা পূর্ব্বে শুনেছ, তাতে এই দর্শনের আলোচনা মোটেই হয়নি। বেদান্তকে দর্শন হিসাবে ধরে কোনও বক্তৃতাই এ যাবৎ দেওয়া হয়নি; কেবল তার

আশপাশের কথা আলোচনা হয়েছে। ভূমিকা করে বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে। এই পরমাশ্চর্য্য দর্শন ও বিজ্ঞানের একটা স্বরূপবর্ণনা দেবার সময় যদি রামের হয়, তাহলে তোমাদের সমস্ত সংশয়, সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে।

কেউ কেউ বড় বাস্তবাগীশ। তাদের প্রশ্নের জবাব এক্ষুণি চাই। আচ্ছা, বেশ। তেমন ধরণের দু'চারটা প্রশ্নই তুলছি। প্রশ্নগুলিও অদ্ভুত।

গতরাত্রে, কি তার আগের রাত্রেই হবে, একজন এসে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি লোককে কিসের উপদেশ দেন? আপনার আত্মা আছে? আপনি কি আত্মায় বিশ্বাস করেন?" রাম বললেন, "না, আমার আত্মা নেই।" লোকটা অবাক্ হয়ে গেল।

"ওঃ, এ তো সয়তানের ধর্ম্ম তাহলে! লোকটার আত্মা নাই!" রাম যে বলেছিলেন, "তাঁর আত্মা নাই" এ কথার অর্থ কি? ইউরোপে আর আমেরিকায় ধর্ম্মটা কি? ধর্ম্ম হচ্ছে বৈঠকখানা সাজাবার আসবাব। আমার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, মস্ত বড় বাড়ী আছে; ধন-জন আছে, ব্যাঙ্কে কোটী ডলার জমা আছে। সবই আছে, কিন্তু আরও কিছু চাই। পুঁজি বাড়াবার বাতিক সবার মাঝেই আছে কিনা, তাই জগৎময় হাতড়ে হাতড়ে আশা মিট্‌ছে না, আরও একটা কিছু চাই। আত্মীয়-স্বজনের ছবি না হলে যেমন ঘরের শোভা হয় না, তেমনি শুধু টাকা হলে কি হবে, ছটাকখানেক ধর্ম্ম না হলে মানাবে কেন? যেমন এটা-ওটা আছে, তেমনি ধর্ম্মটাও থাক্; তবে এটা-ওটা হল গিয়ে সবার আগে, আর ধর্ম্ম সবার পেছনে!

রামকে মাপ করো। হয়ত এমন কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে, যা তোমাদের সবার কানে মিষ্টি লাগ্‌বে না। রাম মানুষের চেয়ে সত্যের জ্যাদা কদর করেন; আর সত্যের কদর করাতেই তোমাদের কদর করা হয়, কেননা রাম জানেন, তোমরা সত্যস্বরূপ, এই মিছে দেহ বা অভিমান তোমরা নও। সত্যের খাতিরে রামকে এ সব কথা বলতে হচ্ছে। এদেশে যে প্রার্থনা করা হয়, তাতে ভগবানকে কি বানানো হয় জান? কি বলে লোকে ভগবানের কাছে দাঁড়ায়? ছেলেটার অসুখ, সম্পত্তিটা যায় যায়, নিজে রোগে ভুগ্‌ছে, তখন ভগবানের পানে দু'হাত তুলে চোখ উল্‌টিয়ে লোকে বলে, "হে স্বর্গবাসী ভগবান্ হে আকাশবাসী পরমপিতা—" একবার ভগবানের উপর একটু মায়াও হয় না? আকাশে বসে থাক্‌তে হলে যে তাঁর সর্দ্দী লেগে যাবে গো! "হে ভগবান্, দয়া কর, ছেলেটাকে ভাল করে দাও!" এর নাম ধর্ম্ম? ভগবানে বিশ্বাস করি কখন, না যখন বাড়ীতে একটা কিছু পাকিয়ে উঠেছে, ঘর দোর নোংরা হয়ে উঠেছে, একটু মেরামত দরকার; বেচারী ভগবানকে ডেকে খান, ঝাঁট টাট দিয়ে যাবে এসে। এই না ভগবানের কদর! শুধু এর দরুণই ধর্ম্ম নয়? এই কি ধর্ম্ম? এখানে আসল কথা হচ্ছে তোমার এই দেহটা, তোমার অভিমানটুকু, তোমার স্ত্রী-পুত্র; ভগবানকে ডাকা হয় শুধু তোমার ঘরের জঞ্জাল সাফ করতে। বাস্তবিক তাই নয় কি?

সমস্ত ভারতবর্ষে না হোক্, যারা সেখানকার সাধুপুরুষ, তাঁদের কিন্তু অন্যরকম ভাব। আমি বেদান্তের দিক দিয়ে কথাটা বল্‌ছি। খৃষ্ট বলেছিলেন, "ধর্ম্ম তোমার লক্ষ্য হোক্; আর সব আপনা হতে আস্‌বে।" একথা এখানকার লোকের কানে যায় না। কিন্তু ওদেশে এই কথাটার ওপরেই অসম্ভব রকম জোর দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই, দেহ-মন, ধন-জন সব তোমার প্রিয়তমের পায়ে বিসর্জ্জন দাও। এই উদার বিশ্বই

তোমার গৃহ. পরোপকারই ধর্ম্ম। ধর্ম্মকেই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা করা হয়েছে, আর সব যেন উপসর্গমাত্র—তারা পরদেশী। সংসার ভগবানের—এই হচ্ছে আদত কথা। বাইরের সংসারটা পান্থশালামাত্র। সেখানকার লোকেও স্ত্রী-পুত্রের ভরণ পোষণ করে বটে, কিন্তু তারা আসলে যা, তার চেয়ে তাদের বেশীকিছু মনে করে না।

এই যে প্রশ্ন হয়েছিল "তোমার কি আত্মা আছে?" তার কি জবাব হয়েছিল, মনে আছে তো? প্রশ্নটাই বেখাপ্পা। আমার দেহ আছে। আর লোকটা জিজ্ঞাসা করছে, তোমার আত্মা আছে? রাম বলছেন, আমিই যে আত্মস্বরূপ—সোঽহং। কি বোকার মত প্রশ্ন, "তোমার কি আত্মা আছে?" যেন আমি আসলে একটা দেহপিণ্ড আর আত্মা আমার সম্পত্তি। আমি আত্মস্বরূপ—অতএব আমার দেহ আছে—এই জগৎটাই আমার দেহ।

আর একজন জিজ্ঞাসা করল, "ভগবান মানেন?" রাম বলেন, "আমি যে তাঁকে জানি!" আমরা যা জানি না, তাই মেনে নিই, জোর করে তা আমাদের মনের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তা হলে "ভগবান মানেন?"—এ প্রশ্নের অর্থ কি? আমি ভগবানকে জানি, সোঽহং—সোঽহং।

তারপর বলছে কি, "ভগবান্ তো তোমার মাঝে।" রাম বলেন, এই দেহ, এই জগৎ যে তাঁর মাঝে! আমিই ঈশ্বর। এতেই সব ফারাক্ হয়ে যায়। দুটো মত যে বিপরীত, এ হতেই তা বোঝা যায়। মানুষ মরলে এখানকার লোক বলে, সে আত্মা ত্যাগ করল (gave up the ghost); আর ও দেশের লোক বলে, সে দেহত্যাগ করল। "আত্মা ত্যাগ করল!"—যেন দেহটাই তার আসল, আর আত্মাটা উপসর্গ মাত্র! সে যেন দেহস্বরূপ, আর আত্মা একটা আগন্তুক ধর্ম্ম! ভারতবাসী বলে, সোঽহং—আমি দেহত্যাগ করলাম। যেমন কাপড় ছাড়ি, তেমনি দেহ ছাড়লাম।

আর একটা, "ভগবানই যদি সব, তা হলে জগতে এত দুঃখকষ্ট কেন? জানই তো, বেদান্ত বলে, ব্রহ্মই সব, তিনি সবের সব; তুমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম। লোকে বলে, তুমি কি ব্রহ্মের অংশ? না—না, তা কেন? ব্রহ্মকে ভাগ করা যায় না, দ্বিখণ্ডিত করা যায় না। তুমি ব্রহ্মের অংশ হবে কি করে? ব্রহ্ম যদি অনন্ত তা হলে তুমিও পূর্ণ ব্রহ্ম, ব্রহ্মের অংশমাত্র নও! (ক্রমশঃ)



সাধন-সঙ্কেত



কথায়-বার্ত্তায়, চাল-চলনে প্রকাশ করছি, আমি যেন দেহের মাঝে। এই ধারণাটা বদলে ফেলতে হবে। আমি দেহের ভিতরে নই, দেহটা আমার ভিতরে—এই ভাবটা মজ্জাগত হয়ে থাক্। আমার দৃষ্টির গণ্ডীর মাঝে যেমন দেখি, দশটা দেহ নড়া-চড়া করছে, তাদের মাঝেও দেখব তেমনি আমার এই দেহটা; সবগুলিকে ছাপিয়ে আছি এক আমি নিস্তরঙ্গ হয়ে।

বাস্তবিক দেহ তো আমি নই। জেগে ঘুমাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখ, তার প্রমাণ পাবে। সমস্তটা শরীর শিথিল করে ছেড়ে দিয়ে তা হতে একটু বিবিক্ত হবার চেষ্টাতেই আমিটা যেন লঘু হয়ে ওপরে ভেসে ওঠে। তখন মনে হবে না যে দেহের সঙ্গে আমার কোনও শক্ত একটা বাঁধন আছে। অথচ দেহ যে একটা আছে, তা বোঝা যাবে কিন্তু। তবেই হলো, দেহটা একটা সংস্কার। মনটা না জাগলে এ কথা যুক্তি দিয়ে বোঝানো শক্ত। কিন্তু অনুভবের ওপর তো কথা নেই। আর এই অনুভব পাবার সঙ্কেতও আছে আমার মাঝেই।

আমি ভিতরে আটকে নই, বাইরে ছড়িয়ে আছি—এই অনুভূতিতেই তো মুক্তি। আত্মার লক্ষণগুলি বেশ ভাল করে মনন করতে হবে। একেবারে স্থূলে দেখার বিপরীত কিনা, তাই হাজারো সংশয় হবে; তা হোক, তবু মনন করতে হবে, জোর করেই। কেউ হয়ত ঠাট্টা করে বলবে, একটু কাঁটার খোঁচা সইতে পারো না, আবার মুখে 'শিবোহং' কপ্চাও। বলি, অমন কপচানোটাই তো সাধনা। ভিতরে ভক্তির ভ'-ও নাই, অথচ লোকে ভক্তির বুলি আওড়ায়; ভরসা এই, যদি বল্‌তে বল্‌তে একবার বলার মত বলা হয়ে যায়! যেমন ভক্তির কীর্ত্তন, তেমনি আছে জ্ঞানের কীর্ত্তন—বল্‌তে বল্‌তে যদি বা হয়ে যায়। কিছুই যে হয় না, তাই বা কি করে বলব? কথার কি জোর নেই?

কাজের মাঝে পড়ে শুধু হাঁপিয়ে উঠ্‌লে চলবে না। কাজ যতই বাধা দেবে, আঘাত পেয়ে প্রেম ততই দৃঢ় হবে। সাধক মাত্রেরই প্রতিষ্ঠা যে পরকীয়াতে রতিতে। কাজটা হচ্ছে দশের সঙ্গে সম্পর্ক; আর ভাবটা আমার একলার। একলা ঘর একটা সবাই চায়; হাটের লোক গিয়ে সেখানে জড় হোক, এ কেউ চায় না। একলা ঘরে নিরালায় মিলতে পারি, তার দরুণই কাজের তাড়াহুড়ো। সবার দাবী মিটাতে পারলে তবে না আমার ছুটী। কারু যদি পাওনা থেকে যায়, সে হয়ত তাড়া করবে একেবারে সাঁইঘর পর্য্যন্ত। তাই হুঁসিয়ার হতে হয়; যত মাতামাতি, দাপাদাপি তোমাদের—তা বাইরে-বাইরেই চলুক। অন্দরমহলে কেউ পা বাড়াতে পারবে না। এই জন্যই সাধকের ভাবগোপনের চেষ্টা। সবার সঙ্গে সমান তালে চল্‌ছে বটে, কিন্তু মুখ দেখে কেউ বুকের কথা আন্দাজ করতে পারবে না।

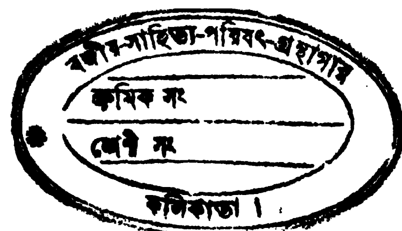
অহমিকার ভাব জাগে। কাজ করি, মনে হয়—বেশ করছি। মিথ্যা কথা—তুমি তো কর্ত্তা নও। কাজের সঙ্গে তোমার কোনও সম্বন্ধ নেই। সমুদ্রের এক ঢেউ যায়—আর এক ঢেউ আসে। সমুদ্র সমুদ্রই থাকে—বিকার সত্ত্বেও সে নির্ব্বিকার। নির্ব্বিকার ভাবটুকু আগে ধরতে হবে; তারপর বিকারগুলো বোঝা কঠিন হবে না।

জ্ঞান নির্ব্বিকার, প্রেম নির্ব্বিকার। জ্ঞান নির্ব্বিকার সে কথাটা চট্ করে বুঝে নিই!—কিন্তু প্রেম নির্ব্বিকার বললেই খট্কা লাগে। তাহলে কান্নাকাটী আকুলি-বিকুলির কি হবে? ছট্ফটানীর কথা তো বল্‌ছি না—বল্‌ছি পাওয়ার কথা। বুক ভরে যে পেয়েছে, কাজের সঙ্গে তার সম্বন্ধ চুকে গেছে; আর তাতেই সে অবিরাম হাসিমুখে খেটেও যেতে পারছে। স্বামীসোহাগী বউএর মত। বুকের মাঝে তার কি মধু যে পোরা, সে কথা অপরের কানে তুল্‌তেও লাজে-সুখে সে কেঁপে ওঠে। কিন্তু কাজের কোনও খুঁৎ পাবে না তার মাঝে। বুকের মালঞ্চে তার ফুল ফুটেছে, পল্লবিত কাজ দিয়ে সে তা সবার চোখ থেকে আড়াল করে রেখেছে। এই লুকোচুরিই তার সুখ। পরিপূর্ণভাবে না পেলে এই লুকোচুরিটুকু আসে না—আসে চলানী। পরিপূর্ণ পাওয়াটা সহজস্থিতি, তাই তা নির্ব্বিকার, তাই কাজের বিকারের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

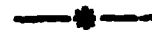
এতদূর না যেতে পার, অন্ততঃ এইটুকু বল, এ তো তোমার কাজ—আমার তো নয়। তোমাকে দিলাম, আমার সব—নিশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত। এই আমার ফুলের হার, পাতার ভূষণ, তুমি আদর করে পর না গো! তোমারই তো সব, দেব আবার কি; তবে সাজিয়ে দেবার উপলক্ষ্য করে আমার আমিটুকু তোমায় দিলাম। আমি চির-ভিখারী—অতএব অসঙ্গ।

পেতে হলে কঠোর হতে হবে। বাসনার মায়াকান্নায় ভুল্‌লে চলবে না। অবসর সময় হয়ত ভাব—এখন কি করি? করবে আবার কি! —কাটারী শানাও। কোপ দেওয়া পরের কথা; এখন অস্ত্রে ধার হোক্। বল, শিবোঽহং-শিবোঽহং—কূটস্থ অবিচল আত্মা আমি। কর্ম্ম করছি, আর বল্‌ছি, কর্‌ছি না! এই হেঁয়ালীই জীবনে সত্য।

হয় তো কখনো একটা অস্বস্তি এসে জুড়ে বসে—কি জানি কখন কি হয়! কি আর হবে! সবই তো তারই রূপ। সে যে মহারৌদ্রী মহাঘোরা—আবার সৌম্যা সৌম্যতরা। লক্ষ্মীও সে, অলক্ষ্মীও সে। দুই ই যদি জীবনে তুলামূল্য হয়, তবে কারু সত্যতা থাকে না। আর ভালমন্দ মিথ্যা হয়ে গেলে থাকে শুধু প্রেম। সে যে আমার—এই ভাব; অথবা সে যে আমি—এই জ্ঞান। আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও—ভাবের চোখ খুলে যাবে। অভাব গেলে ভাব পাবে। ভাব জোটাতে হয় না; কিছু না থাকতেও তা আপনি উপচে ওঠে। যতক্ষণ অভাব, ততক্ষণ তোড়জোড়, হট্টগোল। ভাব এলে সব চুপ —নিশুত রাতে তারার ঝিকিমিকির মত বুকের মাঝে শুধু আলোর ঝিকিমিকিটুকু।



আলোচনা



দেশ ও কালভেদে বিভক্ত হইয়া সনাতন ভাবধারা পর্ব্বে পর্ব্বে প্রকটিত হয়। এক একটী যুগে এক একজন মহাপুরুষকে আমরা প্রতীক রূপে পাই। বুদ্ধের পর শঙ্কর, শঙ্করের পর গৌরাঙ্গ, এ যেন একটী পরিণতর ধারা। শঙ্কর আর গৌরাঙ্গের মিলন আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম, রামকৃষ্ণে। তাই রামকৃষ্ণকে আমরা যুগাবতার বলিয়া থাকি। পাশ্চাত্য শিক্ষার অখণ্ড প্রতাপের যুগে রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। আমাদের দেশে নানা বিভাগে যখন ক্ষণজন্মা মহারথীদের অভ্যুদয় হইতেছিল, তখন বাংলার অধ্যাত্মসাধনার জগৎকে আলোকিত করিয়া ভগবান রামকৃষ্ণ প্রকটিত হইলেন। পাশ্চাত্য ভাবের সহিত প্রাচ্য ভাবের তখন তুমুল সংঘর্ষ চলিতেছে। শিক্ষিতসমাজ একদিকে যেমন বিজাতীয় সভ্যতার প্রভাবে আত্মহারা হইতেছিল, অপর দিকে তেমনি সনাতন সমাজের প্রাণপুরুষ তাহাকে সবলে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবে, আচারে বিলাতী-গ্রহণ ও বিলাতী-বর্জ্জন উভয় আন্দোলনই তখন পুরামাত্রায় চলিতেছে। ঠিক এই সময় বিশ্বাত্মবোধ আর দেশাত্মবোধের মধ্যে অপরূপ সমন্বয়ের বাণী বহন করিয়া আসিলেন, রামকৃষ্ণদেব। বেদান্তের যে অনবদ্য ভাবধারা তিনি দেশের বুকে প্রবাহিত করিতে চাহিলেন, তাহার মাঝে উত্তাপ ছিল না, উগ্রতা ছিল না—ছিল একটী সহজ ও অনাবিল প্রীতির সুর। প্রত্যক্ষ সাধনার দ্বারা তিনি দেখাইলেন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান একেরই অভিব্যক্তি; জ্ঞানে-ভক্তিতে-কর্ম্মে দ্বন্দ্ব নিরর্থক। রামকৃষ্ণদেবের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ এত সহজভাবে আত্মপ্রকাশ করিল যে তাহার ভাবরাশি সমস্ত জগৎময় ছড়াইয়া পড়িবার পক্ষে কোনও বাধাই রহিল না। আজ যখন হিন্দুতে-মুসলমানে, হিন্দু-সভ্যতায় ও খৃষ্টানসভ্যতায় বিরোধ তুমুল হইয়া উঠিয়াছে, তখন সমন্বয়ের ঋষি রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী জাতীয় জীবনের জটিলতা উন্মোচন করিতে কতখানি সমর্থ, তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। শুধু বাংলার নয়, ভারতবর্ষের নয়, রামকৃষ্ণ সমগ্র বিশ্বেরই যুগাবতার—এ কথা ভাবিতে গেলে বাংলার নিগূঢ় প্রাণশক্তিকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন না করিয়া পারা যায় না।



কিন্তু আমাদের এমনই হতভাগ্য যে আজ বাঙ্গালীর চিন্তাজগৎ ঢুঁড়িয়া কোথায়ও এই যুগাবতারের আসন পাতা দেখিতে পাইব কিনা সন্দেহ। রামকৃষ্ণদেব শুধু সর্ব্বসমন্বয়ের উদার বাণীই বহন করিয়া আনেন নাই, তিনি কঠোর সাধনার সঙ্কেতও জাতিকে দিয়া গিয়াছিলেন। সাধনার দ্বারা জড়ের গোত্রান্তর যে কতখানি বিস্ময়কর হইতে পারে, গৌরাঙ্গের পর আর কেহ তাহা এমন করিয়া প্রত্যক্ষ করান নাই। সাধনার জগতে তিনি কোথায়ও দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেন নাই; মাতৃসত্তাতে লীন থাকিয়া বজ্রনির্ঘোষে জাতিকে কামিনী-কাঞ্চন পরিহার করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আকুল আহ্বানে বাংলার যে যৌবনশক্তি তাঁহার পায়ে আপনাকে বিলাইয়া দিতে আসিয়াছিল, তাহার প্রতিও তাঁহার ওই অলঙ্ঘ্য নির্দ্দেশ—কামিনী-কাঞ্চন পরিহার, নারীর প্রতি অটুট শ্রদ্ধা। কিন্তু ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়, আজ চল্লিশ বৎসর পার হইতে না হইতে বাংলার বুক হইতে রামকৃষ্ণদেবের বাণী যেন

শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর কাম-পিপাসা, কাঞ্চন-লালসা দিন দিন এমন ভয়াবহ হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে যে কে বলিবে, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই জাতিরই মাঝে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের আদেশ দিতে যুগাবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল? তাঁহার কোন্ শিক্ষাটা আজ বাঙ্গালীর মাঝে ফুটিয়া উঠিয়াছে? তিনি দেখাইয়াছিলেন, রাম-রহিম এক, ঈশা-মুশা শ্রীচৈতন্য এক; তিনি বলিতেন, "আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও নমস্কার"; তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, সংসারে একমাত্র বন্ধন কামিনী-কাঞ্চন; যুবক বাংলাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ওরে বেশী যাস্‌নি (মেয়েদের কাছে), পড়ে যাবি"; আবার তিনিই বলিয়াছিলেন, "আমি দেখি মা আমার একরূপে গেরস্তের ঘর আলো করে আছেন, আবার সেই তিনিই আর এক রূপে সোণাগাছিতে দাঁড়িয়ে আছেন"; এক বর্ণ ইংরেজী না শিখিয়াও কি করিয়া ইংরেজকে জয় করিতে হয়, তাহার আশ্চর্য্য কৌশল তিনি দেখাইয়া গিয়াছিলেন। এক কথায় হিন্দু মুসলমান সমস্যা, হিন্দু ব্রাহ্ম সমস্যা, নারী-পুরুষ সমস্যা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমস্যা, অস্পৃশ্য-সমস্যা, পতিতা-সমস্যা, কোন্ সমস্যা সমাধানের সঙ্কেত তিনি না দিয়া গিয়াছেন? কিন্তু সমস্ত সমস্যা-সমাধানের মূল মন্ত্র ছিল ত্যাগ-বৈরাগ্য, তাঁহার অতুলনীয় স্পষ্ট ভাষায়—কামিনী-কাঞ্চন বর্জ্জন! আজ জাতিসংগঠনের কলরবের মাঝে এই যুগাবতারের বাণী কোথায় তলাইয়া গেল?



মনে হয় রামকৃষ্ণদেবকে জাতি বুঝিতে পারে নাই। তবে সে দম্ভ করিয়া বলে, রামকৃষ্ণদেবকে না বুঝুক, বিবেকানন্দকে কিন্তু সে ঠিক বুঝিয়াছে। বোধ হয় এমন তরুণ বাংলায় একটীও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ, নবযৌবনের উন্মেষে বিবেকানন্দের আদর্শে যে নিজকে সম্মোহিত না করিয়াছে। "আমি দ্বিতীয় বিবেকানন্দ হইব"—উদীয়মান তরুণের এই শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্ন সফল করিবার ভূমিকা রচনা হয় কেমন করিয়া তাহা জান? বিবেকানন্দ কেমন করিয়া আলষ্টার পরিতেন বা চুল ফিরাইতেন তাহার নক্স করিয়া! বিবেকানন্দ বক্তৃতা করিয়াছেন, সাগর পাড়ি দিয়াছেন, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতকে গাল দিয়াছেন, জাতিভেদ মানেন নাই, স্বাধীন জেনানার প্রশংসা করিয়াছেন—এইগুলি আজকালকার যুগের প্রামাণ্য কথা। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রেরণা যে মূলতঃ ধর্ম্মের প্রেরণা, বাংলা তাহা স্বীকার করিয়াছে কি? কোনও রকম ভণ্ডামী বিবেকানন্দ বরদাস্ত করিতে পারেন নাই—কামুক বাঙ্গালার মর্ম্ম বিদ্ধ করিতেও তিনি ছাড়েন নাই। কিন্তু সে কথায় কান দিবার কেহ নাই। বিবেকানন্দের বিভূতিটাই সকলের চোখে পড়ে, কিন্তু তাহার ত্যাগ ও তপস্যা বাঙ্গালীর কাছে অলীক। তরুণ বিবেকানন্দ আচার্য্য বিবেকানন্দের কাছে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ, বরাহনগরের বিবেকানন্দ ম্লান হইয়া গিয়াছে। এই বিবেকানন্দেরই একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিই, "চালাকী দ্বারা কখনও কোনও মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না।"



অবতার দেশে খুব সুলভ হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ এই বাংলাদেশে। একই সময়ে কয়েকটী অবতারের যুগপৎ আবির্ভাব দেখিয়া মনে হয়, ইঁহারা তাহা হইলে পূর্ণাবতার নন, অংশাবতার; আর তাই যদি হয়, তাহা হইলে তুমি-আমিই বা বাদ যাই কেন? পূর্ণের অংশে যদি অবতারত্ব থাকে, তাহা হইলে অংশের অংশে তস্য অংশেই বা থাকিবে না কেন? কিন্তু সেদিকেরও পথ বন্ধ। চেলাচামুণ্ডাদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, অবতারেরা কেউ অংশ নন, সবাই পূর্ণ। ব্যাপা-

রটা তখনই রহস্যপূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। ভগবানকে যাহারা দুই চক্ষে দেখিতে পারে না, তাঁহার এই একান্ত সন্নিকর্ষে তাহারা অবতারদের উপরই চটিয়া লাল হয়, যেন দোষটা তাঁহাদেরই। কিন্তু বাঙ্গালীর মনোরাজ্যের সঠিক খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা দেখেন ব্যাপারটা অন্যরূপ। সবাই যখন পূর্ণাবতার, তখন সেটা ভগবানের কারসাজি নয়, ভক্তের কারসাজি। আপন আপন গুরুকে সবাই জগদ্গুরু বা ভগবান বা অন্য কিছু মনে করিতে পারে, তাহাতে ন্যায়তঃ বা শাস্ত্রতঃ কোন বাধা নাই। গুরু অনেক; এবং প্রত্যেক গুরুই তাঁহার শিষ্য-বর্গের কাছে ভগবান্; অতএব ন্যায়ানুসারে পাই, যুগপৎ বহু ভগবান্। ন্যায় তো শুধু এই যুগেই খাটে না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেও খাটিয়াছে। অতএব প্রমাণ হয়, দেশে সকল সময়ই বহু ভগবান্ যুগপৎ প্রকটিত হইয়া আসিয়াছেন। তবে পূর্ব্বযুগের সহিত বর্ত্তমান যুগের পার্থক্য এই, এখনকার মত প্রচারের সুবিধা তখন ছিল না। ছাপাখানার মারফতে এখন যে যাহার মত অনায়াসে ছড়াইতে পারিতেছে। কাজেই কোনও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব হইলে সে খবর দেশময় রাষ্ট্র হইতে তো বেশী সময় লাগে না। এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হইবার যে কি আছে তাহা তো ভাবিয়া পাই না। বাঙ্গালী চতুর; সুতরাং চাতুরালী দ্বারা যে সে ভগবানকে পাইবে, ইহা তো সোজা কথা। অচেতন শালগ্রামকে বিষ্ণু মনে করা যায়, আর জ্যান্ত মানুষকে ভগবান ভাবা যায় না?—বিশেষতঃ তাহাতে যদি সাধন-ভজনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া মুক্তিটা সহজ হইয়া আসে এবং (জনান্তিকে) সংসারটাও বজায় থাকে। আমরা এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর ফিকির-বুদ্ধিকে প্রশংসা না করিয়া পারি না। বৈদান্তিক গুরু বলিলেন, "আমি যদি ভগবান্, তবে তুইও তো তাই।" শিষ্য জিভ কাটিয়া বলিল, "রাম, রাম, ও আজ্ঞা করিবেন না। আমাদের চৌদ্দপুরুষ ভক্তিরসে নাকানী-চুবানী খাইয়া আসিয়াছে। আজ যদি সবাই ভগবান হয় তো ভক্ত মিলিবে কোথায়? আমরা পতিত হইয়া না থাকিলে আপনার পতিতপাবন নামটা যে মাঠে মারা যাইবে।" তাই তো বলি, দেশে এত অবতারের প্রাদুর্ভাব ভগবানের কৃপায় নয়, ভক্তের খেয়ালে। আর "ভক্তাধীন ভগবান্!"



সিটি কলেজের হাঙ্গামা শিক্ষিতসমাজে আজ তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। যুদ্ধটা যখন ধর্ম্ম-যুদ্ধ, তখন অধ্যাত্মসেবীরা আন্দোলনের একটা উপকরণ পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন নিশ্চয়ই। আমরা নিরাকার-পূজা, সাকার-পূজা দুয়েরই অর্থ বুঝি; সুতরাং কাহার মতটা ন্যায্য, তাহা লইয়া কোনও কথা বলিব না। "যুদ্ধং দেহি", "ক্রোধং সংহর সংহর"—ইত্যাদি বাণী উভয় তরফ হইতেই শুনিতেছি। হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া ছিল, এইবার হিন্দু-ব্রাহ্মে সুরু হইল—বেশ ভাল কথা। হিন্দুর সঙ্গে ব্রাহ্মের রফা হওয়া প্রয়োজন, আরও ভাল কথা। কিন্তু একটা কথা উত্তেজনার মুখে সবাই ভুলিয়া যাইতেছেন। হিন্দুর সঙ্গে ব্রাহ্মের রফা করিবার পূর্ব্বে সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইলে ভাল হইত না কি? বিদ্যামন্দিরে সরকার তো ধর্ম্ম বলিয়া কোনও বালাই-ই রাখেন নাই, তবে আর কবন্ধের শিরঃপীড়ার অভিনয় কেন? আজ যদি সরকার বলেন, ছাত্রেরা যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে পারিবে না, তেমনি অতঃপর আর কোনও ধর্ম্মান্দোলনেও যোগ দিতে পারিবে না—তাহা হইলেই কিন্তু গোল মিটিয়া যায়; আর তাহাতে সরকারের কনস্টিটিউশন অনুযায়ী কোনও দোষও হয় না। হিন্দু আর ব্রাহ্মেরও যে তাহাতে কিছু অসুবিধা হইবে, তাহাও তো মনে হয়

না ; কারণ উভয় দলই তো ধর্ম্মকে বাদ দিয়াও এক সঙ্গে বিদ্যালাভ করিয়া আসিয়াছে। এই ব্যাপারে যদি কোনও নজীর থাটে তো আইনের নজীর, ধর্ম্মের নজীর নিশ্চয়ই নয়—কেননা বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে কোথাও ধর্ম্মকে কবুল করা হয় নাই। ছাত্রদের যে আবার কোনও ধর্ম্ম আছে, তাহা তো জানিতাম না। থাকিলেও হয়ত তাহা ব্যক্তিগত বা সুবিধাগত ব্যাপার। ধর্ম্মের মূলে আচার ; বিলাতী শিক্ষায় সেই আচারই লোপ পাইতে বসিয়াছে ; আর আচার লোপের পাণ্ডাই হইল "তরুণ" ছাত্র। হঠাৎ আজ ধর্ম্মের জন্য তাহাদের এতখানি দরদ উথলিয়া উঠিলে মনে একটু খট্‌কা লাগে না কি ?

ধর্ম্মের দিক দিয়া ইহার বিচার হওয়া তো প্রহসন বলিয়াই মনে হয়। যদি বিচার করিতে হয় তো আইন ধরিয়া করিতে হইবে। যতদূর জানি, আইন হিন্দুর অনুকূল নহে ; হোষ্টেলের কন্‌সটিটিউশন ব্রাহ্মমতেরই পোষকতা করে। তবুও কর্ত্তৃপক্ষ হিন্দুর ব্যক্তিগত উপাসনায় বাধা দেন নাই—এটাও খুব ভাল কথা। এই ধরণে খৃষ্টানের বাইবেল পাঠ দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হিন্দুর ছেলেদের বাধে না—ইহাও দেখিয়াছি। আজ যে হঠাৎ ব্রাহ্মদের সম্পর্কে হিন্দুর ধর্ম্মবুদ্ধি এতখানি জাগ্রৎ হইয়া উঠিল, ইহা আমাদের সনাতন স্বজাতিবিদ্বেষের নমুনা নয় তো ? ব্রাহ্ম এবং খৃষ্টানেরা যে শিক্ষাক্ষেত্রে এইরূপ limited tolerationএর প্রবর্ত্তন করিয়াছে, ইহা স্বীয় সাম্প্রদায়িক প্রভাব সংক্রামিত করিবার ফন্দীমাত্র—এরূপ কথাও হিন্দু ভাবিয়া লইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে তাহার উচিত ছিল স্বধর্ম্মনিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের সংস্রব পূর্ব্ব হইতেই পরিহার করা। হিন্দুর যখন ধর্ম্মবোধ উগ্র ছিল (সেটা ভাল কি মন্দ তাহা বলিতেছি না), তখন এইরূপে খৃষ্টধর্ম্মকে সে সোজাসুজি বয়কট্ করিয়া চলিয়াছে—খৃষ্টানের কেতাব পড়ে নাই, পোষাক পরে নাই, বুলি আওড়ায় নাই, খানা খায় নাই ; তাহার ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইলে গঙ্গা ছুঁইয়া শুদ্ধ হইয়াছে। আজ সে নিষ্ঠা নাই, আচার নাই, কিন্তু বাহানাটুকু আছে ! এটা হিন্দুর আত্মপ্রতারণা নয় কি ?

হিন্দু ছাত্রেরা যেরূপ লুকোচুরি খেলিয়াছে, অধ্যাপক নির্য্যাতন করিয়াছে, সতীর্থের অপমান করিয়াছে, কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষকে জব্দ করিবার জন্য প্রচার চালাইয়াছে—ইত্যাকার যতপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাইয়াছে, ধর্ম্মের নামে অনুষ্ঠিত হইলেও ইহা হিন্দুর মহত্ত্বকে সকলের সম্মুখে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। ধর্ম্মের জন্য যাহারা নির্য্যাতন সহে, তাহারা এমন অভদ্র হয়, চালবাজ হয় ? অবশ্য রণ-ক্ষেত্রে নামিয়া ব্রাহ্মও তাহার ধর্ম্মবুদ্ধিকে সজাগ রাখিতে পারে নাই—চেঁচামিচি করিয়া, চিম্‌টী কাটিয়া সেও হাঙ্গামা আরও পাকাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু মরা হিন্দুর তরফ হইতেই বলিতেছি—মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মকে অপদস্থ করবার জন্য এই হীন চালবাজী ছাড়া বিবেকসম্মত কোনও উদার পন্থা কি আর ছিল না ? এই ব্যাপারে হিন্দু বা ব্রাহ্ম কাহারও গৌরব প্রকাশ পাইতেছে না—গোটা জাতিটাই যে কতখানি সঙ্কীর্ণচেতা, কলহপ্রিয় ও আত্মপ্রতারক, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে মাত্র।

নব্যতন্ত্রের জয়জয়কার ! পর পর তাহাদের দুইটী মস্ত বড় দাঁও মিলিয়াছে। প্রথম নম্বর—করবীর পীঠের শঙ্করাচার্য্য দ্বারা মিস্ মিলারের শুদ্ধি ; দ্বিতীয় নম্বর—ব্রাহ্মণপণ্ডিত প্রমথনাথের হিন্দুমহাসভার পতিত্ব। দুটীই সমান উপভোগ্য। কয়েক

বৎসর পূর্ব্বে একজন শঙ্করাচার্য্য নন্‌কোঅপারেশনে মাতিয়া কারাবরণ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এইবার আর এক শঙ্করাচার্য্য হোলকার-মিলারের গাঁটছড়া বাঁধিয়া মুমূর্ষু হিন্দুধর্ম্মের মস্তকে সূচিকাভরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেবার তুষ্ট নবদম্পতী আশ্বাস দিয়াছেন, অতঃপর তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের সপিণ্ডীকরণে চির-অবহিত থাকিবেন। শঙ্করাচার্য্যজীর আর যাহাই কাল থাকুক না কেন, নামকরণের কৃতিত্ব কিন্তু অতি চমৎকার। মিলারকে যে তিনি শর্ম্মিষ্ঠা বানাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান, পাত্রজ্ঞান, রসজ্ঞান সবই আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি না বলিয়া দিলেও বুঝিতেছি, তুকাজীরাও বিংশতি শতাব্দীর যযাতি, যেহেতু তিনি দানবকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার বল্লভ। এই রাজযোটকের ফলে যে দ্রুহ্যু-অনুরা জন্মাইবে, তাহারাই হিন্দুধর্ম্ম উদ্ধার করিবে তো? শঙ্করাচার্য্যজী এই ভবিষ্যদ্বাণীটা করিয়া দিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতাম।

❦

"বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।" বৃদ্ধ প্রমথনাথকে তরুণী হিন্দুসভা বরমাল্য পরাইয়াছে দেখিয়া কাহারও কাহারও চোখ টাটাইতেছে। রোসনাইর তীব্র আলোক সকলের চোখে সয় না; ইহাদিগকে আমরা কৃপার পাত্র মনে করি। প্রমথনাথ তাঁহার অভিভাষণে যুক্তি দেখাইয়াছেন, শাস্ত্রও দেখাইয়াছেন; দুইটার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি তো নিজেই বলিয়াছেন, আজ এই ধর্ম্মসঙ্কটে ঋষিরা উপস্থিত থাকিলে একটা মীমাংসা করিয়া দিতেন; তাঁহারা না থাকায় অগত্যা বিবেকীদের সে ভার নিতে হইতেছে। বিবেকের ইঙ্গিতেই যদি সমস্ত সিদ্ধ হয় তো শাস্ত্রবচন আওড়াইবার প্রয়োজন কি? চুপিচুপি আরও একটা কথা বলি: যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, ঋষিরাও যে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন, সে ভরসা হয় না; ব্যাপার সঙ্গীন বুঝিয়া তাঁহারা তাই আগে হইতেই চম্পট দিয়াছেন। সভায় উপস্থিত থাকিলেও শেষকালে ভোটে তাঁহাদের হারিতেই হইত। জনমতকে উপেক্ষা করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন কোন্ ঋষি? —বিশেষতঃ এই ডেমোক্রেসীর যুগে? সুতরাং ঋষিদের অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করাটা পণ্ডিত-প্রমথনাথের পক্ষে বাহুল্য হইয়াছে। আজ তাঁহাকে আমরা চিনি বলিয়াই "পণ্ডিত প্রমথনাথ" বলিতেছি; কে জানে, হয়ত "আজি হতে শতবর্ষ পরে" নব্যহিন্দুর চোখে তিনি "ঋষি প্রমথনাথ" বলিয়াই প্রতিভাত হইবেন!

❦

প্রমথনাথ অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহার নিন্দা করি না, কেননা অমন বুলি আজকাল দুগ্ধপোষ্য শিশুও কপচাইতে সুরু করিয়াছে —ধমক দিয়া নিন্দা করিয়া কাহার মুখ আটকাইব? কথাও তো এমন কিছু নূতন নয়। আমাদের আপত্তি কেবল প্রমথনাথ অভিভাষণের গোড়ায় যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা লইয়া। "অকিঞ্চন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের" যে মূর্ত্তি তিনি অভিভাষণে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত না হোক্, কালোপযোগী নিশ্চয়ই হইয়াছে। তাঁহার কথাতেই বলি, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সংজ্ঞাটা তো আর "ঢালাই করা লোহার ফ্রেম নয়!" সুতরাং ব্রাহ্মণপণ্ডিতের এই অভিনব রূপান্তর দেখিয়া বিস্মিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। আর যাই হোক্, "ব্রাহ্মণপণ্ডিত"গুলি আর এবং "হিন্দু"রা নিতান্ত অনুদার ও সঙ্কীর্ণচেতা হইলেও ইহাদের নামের কিন্তু একটা মোহ আছে; সেটার কদর নব্যতন্ত্রীরা করিতে জানেন। তাই প্রমথনাথের খিচুড়ী অভিভাষণও "ব্রাহ্মণপণ্ডিতে"র অভিভাষণ আর

ওই খিঁচুড়ী সভাও "হিন্দু"-মহাসভা। আমরা বলি, অতঃপর নামের একটু পরিবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ ও হিন্দু শব্দের পূর্ব্বে একটী "মহা"শব্দ বসাইয়া দেওয়া হউক—"মহাব্রাহ্মণ"-পণ্ডিতের সভাপতিত্বে পরিচালিত "মহাহিন্দু"-সভার আমরা জয়ধ্বনি করি! কালক্রমে সমস্তই বদলাইয়া যাইতেছে, তাহা চোখের সামনে দেখিয়াও অস্বীকার করিব, এমন গোঁড়ামী আমাদের নাই। কিন্তু তবুও বলি, যা যা নয়, তাকে তার নামে পরিচিত করিয়া কপটতা করা কেন? [illegible]কও শঙ্করাচার্য্য, প্রমথনাথও ব্রাহ্মণপণ্ডিত, আর খিঁচুড়ী সভাও হিন্দুসভা—এসব নামকরণ কেন? তার চাইতে ভারতাচার্য্য, ভারত-পণ্ডিত আর ভারতসভা নাম দিলেই তো সকল ল্যাঠা চুকিয়া যায়। তাহাতে শুধু প্রাচীন শক-হূণ-কিরাত কেন, আধুনিক মুসলমান খৃষ্টান পর্য্যন্ত জাতে উঠিয়া যাইত। আর বর্ত্তমান "পলিটিকাল ধর্ম্মে"র সঙ্গেও বেশ খাপ খাইত!

দ্বন্দ্ব

—*—

মিথ্যা অভিমানে যে মানুষকে কত ছোট করে দেয়, নিজের জীবন আলোচনা করলেই তা বুঝতে পারি। যৌবনে একটা একগুঁয়েমীর ভাব খুব প্রবল থাকে, কারও কাছে মাথা হেঁট করতে হলে যেন মাথায় বজ্র পড়ে। এ ভাবটাকে মন্দ বলছি না, যদি ভিতরে সত্যের জোর থেকে থাকে; কিন্তু যেখানে কেবল মিথ্যা-প্রবঞ্চনায় হৃদয় পরিপূর্ণ, নিজের বিশেষত্ব জাহির করবার চেষ্টাই যেখানে উৎকট হয়ে রয়েছে, সেখানেও কি একে ভাল বলব?

অসংখ্য মোহ রয়েছে জগতে, তার একটা হতে মুক্ত হলেই চরম মুক্তি হল না। আঘাত করবার পূর্ব্বে মনে ভাবি না—শত্রু রয়েছে, বিপদে ফেলবার জন্য. আপন আপন স্বার্থ-উদ্ধারের জন্য, তারা অনবরত কেবল সুযোগ অনুসন্ধান করেই বেড়াচ্ছে। একটা ধাক্কা সামলিয়ে উঠলেই নিরুদ্বেগে দিন কাটাতে থাকি, ভূত-ভবিষ্যতের কথা আর মাথায় খেলতে চায় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এর পরও হয়ত অতর্কিতে সেই আঘাত! বারবার অমন হওয়াতে এখন আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারছি না। কত কি ঘটতে পারে কে জানে? সুদূর ভবিষ্যতের ভাবনা মাথায় খেলত না বলে, বয়সের চাপল্যে এতদিন বিবেকহীন, বিচারশূন্য হয়ে কত কি যে করে ফেলেছি, তাই এখন ভাবছি।

বিচারের ক্ষমতা ছিল না বলেই এত দুঃখ পেয়েছি, অসত্যের মন্ত্রণায় চলা এত সহজ হয়েছে। বিবেক অনুযায়ী না চলে, চলেছি পরের নির্দ্দেশে। তাতে সময়ে ভালও হত, আবার মন্দও হত।

দুঃখের আর একটা কারণ হচ্ছে, কোন দিন ভাবসংযমের চেষ্টা করিনি। মনে আবোল তাবোল কত কিছু উঠতে পারে, কিন্তু তা কি প্রকাশযোগ্য? সব হতে পারে বটে, কিন্তু সবই যে প্রকাশ করা চলে, এমন নয়। তাই অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ দুটা কথাই রয়েছে। আমার কাছে আমি যতই কেন অসংলগ্ন, বিচারহীন কথা বলি, এতে আমি নিজকে কখনই ছোট বলে ধারণা করব না। কিন্তু পরের বেলায় তো এ নিয়ম খাটবে না। চারিদিক বিচার বিবেচনা করে কথা না বললে

পাগল বলেও তো তারা আমায় উড়িয়ে দিতে পারে। তাই বল্‌ছি, নিজের কাছে অনেক সময় সতর্ক না হলেও যদি বা চল্‌তে পারে, কিন্তু পরের সঙ্গে যেখানে দেনা-পাওনার সম্পর্ক রয়েছে, শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার দায় রয়েছে, সেখানে হুঁসিয়ার না হলে চল্‌বে না।

যেমন টেনে তুলবার শক্তি রয়েছে, তেমনি নীচে নামিয়ে আনবারও শক্তি রয়েছে। যখন নীচে নেমে পড়ি, তখন উপরের দিকে আকর্ষণ হয়, আবার যখন উপরে উঠি, তখন নীচ হতে টান পড়ে। তাই মন্দকে ছেড়ে, ভাল অবস্থাও নিরাপদ নয়। ভাল-মন্দের অতীত হতে পারলে, তবে টানাটানি হতে মুক্ত হওয়া যায়।

মাধ্যাকর্ষণের ওপরেও যাওয়া চলে; একটা অবস্থা আছে—সেটা হচ্ছে দ্রষ্টৃত্ব, মানে দেখে যাওয়া। যা কিছু হচ্ছে, অচঞ্চল হয়ে দেখে যাচ্ছি। জড়িত অবস্থায় এ অনুভূতি আসে না। যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি শুধু মাঝপথে, যা এ তরফও নয়, ও তরফও নয়। নির্গুণত্ব আর জড়ত্বে তফাৎ বোঝা বড় কঠিন। খুব সাত্ত্বিক আর খুব তামসিক ভাব প্রায় একধরণের। তাই জড়ত্বকেও নির্গুণত্ব বলে অনেক সময় ভুল হয়।

মহাপুরুষদের অভিমান আরও বেশী, কিন্তু সে অভিমানের সার্থকতা রয়েছে। তাঁদের রাগে আমাদের অনিষ্ট না হয়ে বরং ইষ্টই হয়ে থাকে। তাঁদের অভিমানে তো বিচ্ছেদ ঘটায় না। সে অভিমানে মানুষকে মঙ্গলের পথে প্রচোদিত করে। মিথ্যা অভিমানেই মানুষকে নীচে নামিয়ে আনে।

জেদ আসে অভিমান থেকেই। আবার মানুষের মাঝে জেদ আছে বলে নীচে পড়ে থেকে মানুষ তৃপ্তি পায় না। সকলকে ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠে যাই, এ ইচ্ছাটা সকলের মাঝেই রয়েছে। "সে এটা করতে পারল, আর আমি পারব না", এমন জেদে, অভিমানে মানুষের ভিতর শক্তি আসে, ছোট হয়েও বড়র সঙ্গে সে তখন টেক্কা দিয়ে চলতে চায়। সত্যকার জেদ হলে জয় অবশ্যম্ভাবী।

যারা হিংস্র, অপরের ভালটা যেন তাদের সহ্য হতে চায় না। তারা ভাল হতে চায় না—ভালর ধ্বংস চায়। দু'রকম ভাবই আমাদের মাঝে ক্রিয়া করে। মার খেয়ে কোনও ছেলে শিক্ষকের মরণকামনা করে, কেউ বা আত্ম-সংশোধনের চেষ্টা করে।

অভিমান করি, জেদ করি, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু গতি হচ্ছে কোন দিকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। দ্বন্দ্বের মাঝে দুলতে দুলতে এগিয়ে না যেতে পারলে সেটা আশঙ্কার কথা। সময় মত নিজের মত বদল করবার স্পর্দ্ধাও থাকা চাই।

সত্যকাম

—•—

(৮)

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বনের কোলে অন্ধকার কালো হয়ে নেমেছে, কিন্তু বনের বাইরে আত্রেয়ীর বুকে গোধূলির ধূসর আলো নিস্তব্ধ উদাস হয়ে আকাশ-বাতাস ছেয়ে আছে। গাই দুটী আপনা হতে কুটীরে ফিরে এসেছে—আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে বাছুরকে দুধ দিতে দিতে সতৃষ্ণচোখে পথের পানে চেয়ে কাকে যেন খুঁজ্‌ছে। ঘরের কাজ-কর্ম্ম সারা হয়ে গিয়েছে ; মা জবালা কুটীরের দুয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, —সন্ধ্যার সোনালী আলোতে আমলকী গাছের চূড়াটি ঝিল্‌মিল্ করছে—তার পরে দুটী শ্রান্ত চোখ মেলে দিয়ে। অন্যদিন সত্যকাম আত্রেয়ী হতে ছোট্ট ঘটটী পূরে জল নিয়ে এসে সুমিষ্ট তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাক্‌ত—"মা!" মা তাড়াতাড়ি তার মাথা থেকে জলের ঘটটী নামিয়ে কুটীরে নিয়ে যেতেন। তারপর খুঁটী নাটী দু'চারটী কাজ সেরে দুজনায় সান্ধ্যোপাসনায় বস্‌তেন, মাথার ওপরে একটী-দুটি করে আকাশে তারা ফুট্‌তে থাক্‌ত!

সত্যকাম নাই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা নিজেই জলের ঘটটী নিয়ে চললেন আত্রেয়ীতে জল আন্‌তে। ফিরে এসে আনমনা হয়ে প্রতিদিনকার মতই উপাসনার জায়গা কর্‌তে লাগলেন। অভ্যাসবশতঃ রোজকার মত আজও দুখানা আসন পেতে দিয়েছেন। "আঃ, মানুষের কি ভোলা মন!" একটুখানি বিষণ্ণ হাসি হেসে মা একখানা আসন গুটিয়ে রাখ্‌তে যাবেন, আবার কি ভেবে ওখানা আর তুললেন না—শূন্য আসনখানার পাশেই বসে গেলেন উপাসনা করতে।

এই আটবছর ধরে একটি দিনের জন্যও মায়ে-ছেলেতে ছাড়াছাড়ি হয় নি ; সত্যকামের মুখে কথা ফোটা অবধি আজ এই প্রথম তাকে বাদ দিয়ে মা উপাসনায় বসেছেন, এ কথাটা যেন মায়ের মন মান্‌তে চাইল না। সত্যকাম যেখানেই থাক, এই সময়টায় কি তার মায়ের কথা একবার মনে পড়বে না—স্থূলে না হোক্, মনে-মনেও কি এই সময়ে একটিবার সে মায়ের কোল ঘেঁষে এসে দাঁড়াবে না! ভাব্‌তে ভাব্‌তে মা জবালার শূন্য বুক ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, পাশের আসনটীতে সত্যকাম যে বসে আছে—এ যেন তিনি নিঃসংশয়িতরূপে দেখ্‌তে পেলেন।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে একটি হুতাশের ভাব তাঁর বুকময় ছড়িয়ে ছিল. সন্ধ্যার আলোর সাথে সাথে ধীরে ধীরে সেটা যেন মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল—রাত্রির স্নিগ্ধ অন্ধকারের মতই একটা অপরূপ স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যের মাঝে তিনি ডুবে যেতে লাগ্‌লেন। ঠিক সুখেরও নয়, দুঃখেরও নয়

—অথচ এমন একটা নিবিড় অনুভূতি; —ফুলের বুকে ভ্রমর যেমন নিস্তব্ধ হয়ে যায় মধু পান করতে, তেমনি মা জবালার দেহ-মন সবই নিষ্পন্দ হয়ে এল যেন!

ভগবান আমার কাছে আছেন, আমার সাম্‌নে আছেন, এই ভাবে তন্ময় হওয়াই ঠিক উপাসনা। ভগবান্ শান্ত, স্তব্ধ, গম্ভীর; তাই তাঁর কাছে বস্‌তে গেলেও তেমনি শান্ত, স্তব্ধ, গম্ভীর হতে হয়। সুখেই হোক্, আর দুঃখেই হোক্, মনটা যখন ছট্‌ফট্ করতে থাকে, তখন ভগবানকে কাছে পাওয়া যায় না, তাই উপাসনাতেও শান্তি মিলে না। একটা আঘাত পেলে মনটা নিঝুম হয়ে পড়ে। আঘাতটা যদি অসহ্য হয়, তবে আবার মনের ছট্‌ফটানী সুরু হয়। কিন্তু কেউ যদি বীরের মত আঘাতটা সয়ে যেতে পারে, তাহলে তার মনে এক বিচিত্র গাম্ভীর্য্যের আবির্ভাব হয়—যাতে তার মাঝে ঠিক সুখ নয়, কিন্তু সুখের চেয়েও গভীর একটা কিছু জেগে মনকে অভিভূত করে ফেলে। উপাসনায় তখন ভগবানকে বুকের মাঝে পাওয়া যায়—তাঁর প্রশান্ত স্নিগ্ধ স্পর্শে আমাদের সমস্ত জ্বালা তিনি জুড়িয়ে দেন।

আজকার উপাসনাতেও মা জবালার ঠিক তাই হল। সত্যকামকে ছেড়ে যে গভীর দুঃখে তাঁর মন আলোড়িত হয়ে উঠ্‌ছিল, স্তব্ধ হয়ে তিনি তা সয়ে গিয়েছেন, নিস্তব্ধ হয়ে উপাসনায় বসেছেন, তাই অনায়াসে ভগবানের নিস্তব্ধ মাধুর্য্যে তাঁর বুকখানা ভরে উঠ্‌ল। তিনি অনুভব করলেন, তিনি যে সত্যকামেরই মা, তা নয়—তিনি শুধু মা—শুধু মা! আকাশকে আচ্ছন্ন করে আছে যেমন পারাপারহীন অন্ধকার, আর তারই বুকে নিষ্পন্দ হয়ে আছে এই পৃথিবী, তেমনি তাঁর মায়ের মন ছড়িয়ে আছে বিশ্ব জুড়ে—আর বুকের কাছে, বুকের মাঝে আছে তাঁর সন্তান। সে মা কি জবালা?—সে ছেলে কি সত্যকাম?

রাত গভীর হয়ে চলেছে। ধ্যানভঙ্গে একটী মৃদু-বিকম্পিত দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করে মা জবালা বললেন, "গুরো!"

ও কে তাঁর কোলের ওপর এসে বুকে মুখ লুকাল? "সত্যকাম!" মা জবালা কম্পিতকণ্ঠে ডাক্‌লেন, "সত্যকাম!"

সত্যকাম নিঃশব্দে নিবিড়ভাবে মাকে জড়িয়ে ধর্‌ল।

মা জবালা স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

আকাশের কোলে অসংখ্য তারা ঝিক্‌মিক্ করে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

(ক্রমশঃ)

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

উত্তাপ পেয়ে, দুধ পাত্র হতে উথলে উঠে, আবেগ সহ্য করতে না পেরে পড়ে যেতে চায়। কিন্তু পাক পেয়ে যতই ঘন হয়, ততই তার উচ্ছ্বাস কমে আসে। দুধ যে উপচে পড়তে চায় তাও আনন্দেই বটে, কিন্তু এটা হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ - তাই ক্ষণস্থায়ী। এ আনন্দে ক্ষয়ই হয়, অপচয়ই ঘটে মাত্র। আনন্দে আধার শূন্য হয়, এ কথা তো শুনিনি কখনও। শূন্যকে পূর্ণ করা, জীর্ণকে সতেজ করা, এই তো হচ্ছে আনন্দের ধর্ম।



উদ্দেশ্য সকলেরই এক, কেবল চিন্তা-প্রক্রিয়া ও অনুভূতি বিভিন্ন। তিনি যে এক হয়েও বহু, তা মানুষের বিচিত্র চিন্তা হতেই ধরা পড়ে। এক রকমে পেয়েই মানুষ তুষ্ট হতে পারে না, তাই বিভিন্ন উপায়ে ভগবানকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে।



আদর্শ সেবকের মনে যাচাই-বুদ্ধি ওঠেই না, তাই তাকে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে ভাল-মন্দ কাজ সমান ভাবে করতে দেখি। নীচ হতে যদি কেউ না টানে তবে ওপরে ওঠা খুব সহজ, কিন্তু সবার ভাগ্যই যে একরূপ তা তো নয়। আর যদি তাই হতো, তবে জীবন একঘেয়ে হয়ে যেত। টানাটানির ভিতরেও যিনি অটল থাকেন, তাকেই না বলব বীর, আদর্শ-পুরুষ।



স্মৃতিই হচ্ছে মানুষের সকল দুঃখের মূল। যখনকার কথা তখন ভুলে গেলে, জগতে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না কারু। পশুপক্ষী ইতর-প্রাণী সহজেই ভুলে যায়, কুকুরকে একটা ঘা দিলে পরমুহূর্তেই সে লেজ নেড়ে তোমার কাছেই এসে হাজির হবে। এদের সুখ-দুঃখ মান-অভিমান বোধ এ সব কিছুই নাই। যার যা নাই সে তা বুঝবে কি করে? মানুষ চেতন, কাজেই সুখ-দুঃখ বোধ তার পুরামাত্রায়। "আছে" বলে যার অভিমান নাই, সেই হল প্রকৃত মানুষ—একেই বলে জীয়ন্তে মরা। দেবাদিদেব ভোলানাথ হয়ে বসে আছেন, তা না হলে বিশ্ব-সংসারের সংহারকর্তাকে জগতের দুঃখ-কষ্ট নাকাল করে তুলত। সবই যেমন তেমনটাই থাকবে, কেবল আমরই অন্তরের পরিবর্তন হবে, তাতে যে চোখে জগৎকে দুঃখময় বলে মনে হত, লুকিয়ে থাকবার ইচ্ছা হত, সেই চোখেই আত্ম-পরিশুদ্ধির ফলে জগৎকে মধুময় বলে মনে হবে, বিস্মৃতির অনুভূতি প্রাণে জাগবে।



সৌন্দর্যে মাতাল হলে তাকে উপভোগ করা যায় না। উপভোগ করা যায় শান্ত হয়ে দেখ্তে পারলে।



তোমার আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আর কতটুক? যিনি জগন্ময় ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাঁর সঙ্গে একাত্মানুভূতি হোক্, দেখ্বে অনন্ত সুখ-দুঃখের একরসে কি মহাশান্তির অবস্থা! দুঃখ-রোধের ওই উপায়।



প্রতিষ্ঠা বাহিরে নয় অন্তরে। মূল্য থাকে তো তাহারই। শাস্ত্রকার বলেন, বাইরে প্রতিষ্ঠা কাকবিষ্ঠা।

সংবাদ ও মন্তব্য

আমাদের কথা

বিগত অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে সারস্বত মঠের একবিংশ বার্ষিক উৎসব ও পরবর্ত্তী পঞ্চমী তিথিতে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের জন্মোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন যথারীতি পূজা, হোম, আরতি, বেদ-গীতা-চণ্ডীপাঠ এবং নামযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূজান্তে সকলেই যজ্ঞীয় তিলকাদি ধারণ করেন এবং উপস্থিত সকলের মধ্যেই ফলমূল, খেচরান্ন, মিষ্টান্ন ও মিষ্টাইপ্রসাদ বিতরিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অন্য কোন স্থান হইতে এবার ভক্ত-সমাগম হয় নাই।

—*—

উক্ত তিথিতে বিভাগীয় আশ্রমসমূহেও অক্ষয়তৃতীয়া মহোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, দক্ষিণ-বাংলা সারস্বত আশ্রমে বিভাগীয় ভক্তসম্মিলনীরও অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। হালিসহরের সম্মিলনীতে শ্রীশ্রী-ঠাকুরমহারাজ উপস্থিত ছিলেন। সম্মিলনী অন্তে তিনি পুনরায় পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

—*—

"শ্রীশ্রীগুরুধামসমিতির" প্রেসিডেণ্ট সংবর্দ্ধিত সমস্ত গুরু-ভাইদিগকে নিম্নলিখিত নিবেদনটী জানাইয়া তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন—

"গত ভক্তসম্মিলনীর নির্দ্ধারণ অনুসারে ব্যবস্থা হইয়াছে যে শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজের জন্মভূমিতে শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের পূজা ও নিত্যসেবার জন্য সেবায়েৎ নিযুক্ত করা হইল; তাঁহার ভরণপোষণের ও নিত্যব্যয়ের জন্য মাসিক ৩০ টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার তাঁহার ভক্তশিষ্যগণের উপর চাপাইয়া দূরে অবস্থান পূর্ব্বক শিষ্যগণের গতিবিধি, ভক্তি, উদ্যম-উৎসাহ, পরীক্ষা করিতেছেন। এ সময় কি প্রত্যেক ভক্তেরই যাহাতে তাঁহার নিজহাতে-গড়া আশ্রমকে সঞ্জীবিত ও পুষ্ট করা যায়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত নয়? সাধন-ভজন অপেক্ষা কি শ্রীশ্রীগুরুপ্রীত্যর্থে তাঁহার নির্দ্ধারিত কর্ম্মে আমাদের সকলের অর্থ বা সামর্থ্য নিয়োগ করা অধিকতর ফলোপধায়ক হইবে না? শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মভূমিতে তিনি ভক্তশিষ্যগণের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলেন, উহা যাহাতে সংরক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং সেই সঙ্গে মঠের ও আশ্রমসমূহের দারিদ্র্যকেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব করা কি প্রত্যেক ভক্তশিষ্যের উচিত নয়? আমার এ বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই। সুধী-ভক্তগণের কর্ত্তব্যের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া সকলকেই অনুরোধ করিতেছি যে, যিনি যে ভাবে পারেন সাহায্য করিলে বাধিত হইব। যিনি যেরূপ অর্থাদি সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হন, উহা প্রতি মাসে "শ্রীশ্রীগুরুধামের সম্পাদক" শ্রীমৎ রামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীগুরুধাম, গ্রাম—কুতুবপুর, পোঃ—কাথুলী, জেলা—নদীয়া" এই ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি—

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত
শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩১ শে বৈশাখ ১৩৩৫ সাল

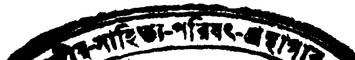
কুতুবপুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে সাহায্য প্রাপ্তি

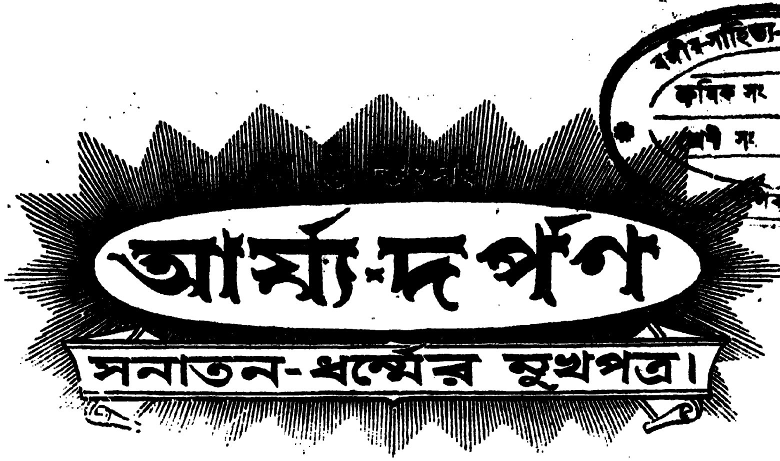
—*—

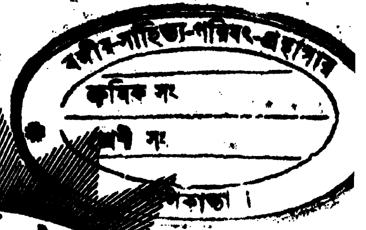
(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিত্র ১০৲ শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ঘোষ ৫০৲ শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস নন্দী ৫০৲ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৫০৲ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বণিক ৩০৲ শ্রীযুক্ত জ্ঞানদানন্দ ভাদুড়ী ৫০৲ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর দত্ত ৫০৲ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সাহা ৩০৲ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৲ শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য (২য় দফা) ২৫৲ শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসীচরণ আঢ্য ২৫৲ শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র দেব ২৫৲ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুরুবৈদ্য ২৫৲ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দাস ২৫৲ শ্রীভৈরবচন্দ্র হাজরা ২৫৲ শ্রীযুক্ত মানিকলাল সিংহ ২৫৲ শ্রীযুক্ত রাধানাথ দে ২০৲ শ্রীযুক্ত করুণাসিন্ধু প্রামাণিক ২০৲ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দাস ২০৲ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দাস ১০৲ শ্রীযুক্ত জানকীজীবন চক্রবর্ত্তী ১০৲ শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত ১০৲ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন কুরী ১০৲ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দে ১০৲ শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত পাল ১০৲ শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (১ম দফা) ১০৲ শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲ শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫৲ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন দাস ৫৲ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মৈত্র ৫৲ শ্রীযুক্ত শশধর চক্রবর্ত্তী ৫৲ শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিবাস দাস ৫৲ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস ৩৲ শ্রীযুক্ত করুণাকান্ত মুখোপাধ্যায় ২৲ শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সিংহ ২৲ শ্রীযুক্ত ইন্দ্র-মোহন কুরী ২৲। (ক্রমশঃ)

গত মঠ-সম্মিলনে যাঁহারা কুতুবপুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে চৈত্রমাসের মধ্যে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাঁহারা এ পর্য্যন্ত টাকা পাঠাইতে পারেন নাই, তাঁহারা অবিলম্বে পুরীতে টাকা পাঠাইয়া দিবেন।
(সঃ-আঃ-দঃ)







২১শ বর্ষ — ১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৫

সমষ্টি সং ২১৮ — ২য় সংখ্যা

রক্ষোহা

—*—

ঋগ্বেদ সংহিতা—৪।৪।৮-১৫

—*—

[ঋষিঃ—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ—অগ্নি দেবতা]

অর্চামি তে সুমতিং ঘোষ্যর্ব্বাক্
স তে বাবাতা জরতামিয়ং গীঃ।
স্বশ্বাস্ত্বা সুরথা মর্জয়েম
অস্মে ক্ষত্রাণি ধারয়েরনু দ্যূন্॥

ইহ ত্বা ভূর্যা চরেদুপ ত্মন্
দোষাবস্তর্দীদিবাংসমনু দ্যূন্।
ক্রীড়ন্তস্ত্বা সুমনসঃ সপেমা
অভিদ্যুম্না তস্থিবাংসো জনানাম্॥

বুদ্ধিরে বাখানি তব, নতি মম জানায়েছি পায়,
কলকণ্ঠ স্তাবকের স্তুতি ওই তোমা পানে ধায়;
আমাদের গাড়ীঘোড়া ভাল হলে তোমারি তো ভাল—
বাহুড়িয়া যত ধন আন হেথা, ঘর হোক্ আলো।

নিশারে উজলি তোল—অনুদিন আছ ঝলমলি,
কত উপচারে হেথা তোমারে যে পূজিছে সকলি।
শত্রুর দৌলত যত লুটে এনে করেছি দখল;
পেতেছি সুখের খেলা—সেবি তোমা চিত্ত-নিরমল।

যস্ত্বা স্বশ্বঃ সুহিরণ্যো অগ্ন
উপযাতি বসুমতা রথেন।
তস্য ত্রাতা ভবসি তস্য সখা
যস্ত আতিথ্যমানুষগ্ জুজোষৎ॥

ভাল ঘোড়া আছে যার, আরো যার আছে সোণাদানা,
গাড়ীভরা নিয়ে মাল তব ঠাঁই যে দিয়াছে হানা—
তোমারে অতিথি পেলে সেবা করে খুঁটিয়া খুঁটিয়া
বিপদে বাঁচাও তারে, বিনিময়ে দিলে বুঝি হিয়া!

যে পায়বো মামতেয়ং তে অগ্নে
পশ্যন্তো অন্ধং দুরিতাদরক্ষন্।
ররক্ষ তান্ সুকৃতো বিশ্ববেদা
দিপ্সন্ত ইদ্রিপবো নাহ দেভুঃ॥

জানে সবে, দীর্ঘতমা অন্ধ ছিল—মমতার ছেলে;
দেখে তারে হল দয়া, চক্ষুদান দিল অবহেলে।
সুকৃতি এ তাহাদেরি; হে দেবতা জান তো সকল—
রুখে এল শত্রু যত - দীর্ঘতমা তবুও অটল।

মহো রুজামি বন্ধুতা বচোভি
স্তন্মা পিতুর্গোতমাদন্বিয়ায়।
ত্বং নো অস্য বচসশ্চিকিদ্ধি
হোতর্যবিষ্ঠ সুক্রতো দমূনাঃ॥

"বন্ধু তুমি আমাদের"—এই মন্ত্র রক্ষোবুকে হানি;
জনক গোতম হতে সুতকণ্ঠে নেমেছে সে বাণী।
এই সেই স্তুতিখানি—আজি তারে কর গো স্বীকার—
ওগো হোতা, যুবতম, প্রজ্ঞাবান্, দয়াপারাবার!

ত্বয়া বয়ং সধন্যস্ত্বোতা-
স্তব প্রণীত্যশ্যাম বাজান্।
উভা শংসা সূদয় সত্যতাতে-
ঽনুষ্ঠুয়া কৃণুহ্যহ্রয়াণ॥

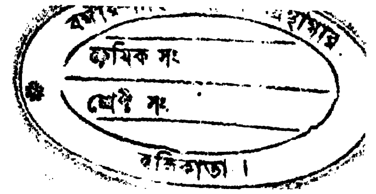
তোমাধনে ধনী মোরা, তব পায় নিয়েছি শরণ,
তোমারি ইঙ্গিতে চলি ভুঞ্জি হেথা অশন বসন।
তুমি সত্য, নিরভীক, তাই তোমা বলি বার বার,
কাছে কিম্বা দূরে হোক্, নিন্দুকেরে কর ছারখার!

অস্বপ্নজস্তরণয়ঃ সুশেবা
অতন্দ্রাসোঽবৃকা অশ্রমিষ্ঠাঃ।
তে পায়বঃ সধ্র্যঞ্চো নিষদ্য
অগ্নে তব নঃ পান্তমূর॥

চঞ্চলিত দিকে দিকে, কি সুন্দর!—ঘুমায় না তারা,
শ্রান্তি নাহে জানে কভু, নহে হিংস্র, জাগে তন্দ্রাহারা,
এ-ওরে জড়ায়ে থাকে; যজ্ঞভূমে হের অভিযান—
হে অমৃত, শিখা তব আমাদের করুক কল্যাণ!

অয়া তে অগ্নে সমিধা বিধেম
প্রতি স্তোমং শস্যমানং গৃভায়।
দহাশসো রক্ষসঃ পাহ্যস্মান্
দ্রুহো নিদো মিত্রমহো অবদ্যাৎ॥

তোমারে সঁপিব বলে আনিয়াছি সমিধের ভার—
তোমারি রচিয়া গাথা গাহিতেছি, শোন অনিবার!
রাক্ষসেরা গাহে না তা'!—পুড়ে মার!—আমাদেরে নয়;—
দূর কর ওগো বন্ধু, দ্রোহী আর নিন্দুকের ভয়!



নবীন ও প্রবীণ

যাহারা জীবনে সত্যলাভ করিতে চায়, সহজ জীবন চায়, তাহাদের মাঝে নবীনে আর প্রবীণে দ্বন্দ্ব থাকিবে কেন বুঝি না। নবীন প্রবীণ নয় এবং প্রবীণ নবীন নয়—এ তো ন্যায়শাস্ত্রের কথা; কিন্তু অনুভবের কথাটাও কি তাই? অনুভবের তুরীয় লোকে কি উভয়ে চিরমিলনে মিলিত হইয়া থাকে নাই?

নবীন এবং প্রবীণের যা ভাবরূপ—তাহা একেরই বিভিন্ন বিভাব মাত্র; যে আমি আজ নবীন, সেই আমিই কাল প্রবীণ। সুতরাং ভেদটা কোথায়? আমাতে কি?—না আমার অবস্থাতে? আমি অবস্থার দাস হইব, না অবস্থাই আমার দাস হইবে—স্বাধীন হৃদয় তাহার মীমাংসা করুক।

বাস্তবিক নবীনে-প্রবীণে যে ভেদ, তাহা আন্তরিক নহে—তবে অন্তর্জগতের কতকটা অংশ লইয়া বটে। হয়ত কতকগুলি ধারণা, বিশেষ বিশেষ রুচি বা বিচারপদ্ধতি লইয়া উভয়ের মিলে না। নবীনের ধারণা অপক্ক, প্রবীণের ধারণা সুপক্ক; প্রবীণ শুধু নিজের রুচিটুকু ছাড়াও অপরের রুচিতে মমতা রাখে, নবীন হয়ত তাহা পারে না। নবীন বিচার করে উদ্দণ্ডভাবে, আর প্রবীণ করে রহিয়া সহিয়া। প্রবীণ অনেক ক্ষেত্রে হাসির কারণ ঘটিলেও হাসে না. নবীন সহজ আনন্দে কারণে-অকারণে অজস্র হাসিই সর্ব্বত্র ঢালিয়া বেড়ায়। নবীন যেখানে অল্প আঘাতেই জিঘাংসু হইয়া উঠে, প্রবীণ সেখানে স্তব্ধ হইয়া অন্তরের মাঝে আপনাকে সংহৃত করিয়া লয়। এমনিতর নবীনে-প্রবীণে কত ভেদই না রহিয়াছে; অথচ সত্যদৃষ্টি দিয়া দেখিতে গেলে ইহাদের কোনটাই ঐকান্তিক নহে, সব ভেদগুলি সকলের মাঝেই ফুটিতে পারে—নবীনও প্রবীণ বনিতে পারে, প্রবীণও নবীন হইতে পারে। সবই অবস্থার ফের; সুতরাং এগুলি নিয়া নিজেদের মাঝে দলাদলি সৃষ্টি নিতান্ত নিরর্থক।

আমি জানি, আমিই নবীন—আমিই প্রবীণ; নিরপেক্ষ বিচারে কাহাকেও আমি খাট করিতে পারি না। উভয়ের বেদনাই আমার বুকে সমান বাজে। এক পক্ষকেই অন্ধ ভাবে আঁকড়িয়া ধরা ঠিক নয়। যাঁহারা নিজকে নবীন মনে করে এবং তজ্জন্য প্রবীণোচিত কষ্টসহিষ্ণুতা বা কর্ত্তব্যনিষ্ঠাকে কটাক্ষ করিয়া 'স্বভাব' ওরফে সুবিধাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যায়, তাঁহারা ঋণী হইয়াও ঋণ-স্বীকার না করার নির্লজ্জতাকে প্রশ্রয় দিয়া থাকে। এ কথা স্বচ্ছন্দেই ভুলিয়া যায় যে, এই প্রবীণের বুকের রক্তেই তাহারা মানুষ হইয়াছিল। সুতরাং প্রবীণকে যখনই অবজ্ঞা করিয়াছে, তখনই তাহারা মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে, ধ্রুবকে ছাড়িয়া অধ্রুবে মজিয়াছে, পথভ্রষ্ট হইতে চলিয়াছে। প্রবীণ আত্মদান না করিলে নবীন আত্মলাভ করিতে পারিত না।

কিন্তু আজ উচ্ছ্বাসপ্রবণ পল্লবগ্রাহী নবীন অভিমানের কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সাময়িক উত্তেজনায় ভ্রান্তধারণাকেই চরমসিদ্ধান্ত ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আরামে কর্ম্মবিমুখ ভাবব্যসনে মত্ত হইয়া রহিয়াছে। কাহারও কথা কেহ বিশ্বাস করে না—ঠিক 'করে না' নয়, করিতে পারেই না। যে বীর্য্যে বাহিরে ঠকিয়াও অন্তরে সাধুত্বের জয় অনুভব করিতে শিখায়, সে বীর্য্য তাহাদের নাই। ব্যক্তির ক্ষতিটুকুকেই তাহারা বড় করিয়া দেখে, ফলিয়া অলক্ষ্যে

সমাজের ক্ষতিকে উপেক্ষা করিয়া চলে। তখন সুরু হয় প্রকৃতির প্রতিশোধ—আপনা হইতেই অপরের দৃষ্টিতে তাহারা ছোট হইয়া যায়, অপরকে ব্যথা দিতে থাকে—কেননা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সমষ্টির প্রেরণা যে মানুষকে বড় করিয়াই তুলিতে চায়। আমি বড় না হইলে যে শুধু আমার দুঃখ, তাহা নয়; অপরের দুঃখও যথেষ্ট। কিন্তু নবযৌবনের মত্ততায় আত্মসুখে আমরা নিজকে লুপ্ত করিয়া ফেলি—নিজের দুঃখ কিসে, তাহাই বুঝি না, অপরের দুঃখ বুঝা তো দূরের কথা।

এই যে আত্মব্যাপ্তির প্রতি অন্ধ থাকিয়া নিজের দুর্ব্বলতায় দিন দিন সঙ্ঘকে নিজের প্রতি বিরূপ করিয়া তোলা—শক্তিমন্মন্ত নবীনের পক্ষে ইহা আত্মাবমাননা বই কি!—'সহজ' বলিয়া সে যে কেন ভোগের দিকটা, নিজের আরামের দিকটাই বাছিয়া লয়, ত্যাগকে ঠেলিয়া রাখিতে চায়—ইহা কে বুঝাইয়া দিবে? সে চিন্তা কি আঘাত না পাইতেই আপনা হইতে জাগে না? "যা ভাল লাগে, তাই করি"—এ যে প্রবৃত্তির পথ! "যা ভাল লাগে" তা নয়—"বস্তুতঃ যা ভাল" তাই করিতে হইবে—ইহাই নিবৃত্তিপথ, মনুষ্যের "সহজ" ধর্ম্ম। যাহা ভাল লাগে বলিতেছি, তাহা ভাল নাও হইতে পারে—কেননা "লাগাটাই" হইল ব্যক্তিগত রুচির কথা, অতএব কুটিল কথা—সহজ কথা নয়। ভাল লাগার মাঝ হইতে ঔচিত্য-জ্ঞানকে যদি বিসর্জ্জন দিই, তাহা হইলে অন্তর দেবতাকে অস্বীকার করা হয়। তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া শ্রেয়ঃ কোথায়? অন্তর্য্যামীকে যদি ধরিতে না পার, তবে তাঁহার নির্দেশ সঙ্ঘের নিকট হইতে লও, সঙ্ঘপতির নিকট হইতে লও; তোমার আর দশটা ভাই আজ যে ভাবে সত্যকে পাইতে চাহিতেছে, সেই ভাবে চলিলেই বুঝিতে পারিবে, তোমার অন্তরাত্মা কত উদার, কত মহান—সকলকে লইয়া তাঁহার মাঝে তুমি একরস হইয়া আছ। তিনিই পথ, তিনিই লক্ষ্য।

তোমার রসে যদি অপরের প্রাণও রসিয়া না উঠিল, তবে কিসের তোমার রস? যে রস একান্ত তোমার, তাহার আস্বাদন তোমার অন্তরে হউক, বাহিরে আনিলে তাহা নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে বাঁটিয়া দিয়াই ভোগ করিতে হইবে। শুধু নেওয়াতেই কি ভোগ—দেওয়াতে ভোগ নাই? আজ যে মত্ততা বাহিরে ছড়াইয়া দিয়া তুমি নিজে মত্ত হইতেছ, সেই আনন্দ দিয়া সকলকেই তুমি আনন্দিত করিতে পারিতে, আরও অনন্তগুণ সুখী হইতে পারিতে, তোমার মূলধন অক্ষত থাকিত—দুদিন পরে ফতুর হইতে না, অবসাদ আসত না! আত্মসুখবাসনার উদ্দাম প্রবর্ত্তনাকে বাক্য হইতে মনে, মন হইতে প্রাণে, ক্রমেই অন্তর হইতে অন্তরে সংহত করিয়া আনিলে তাহার প্রকাশ নিরুদ্ধ হয় না, বরং উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠে। যে আনন্দকে দু'ঘণ্টার বাজে বকুনীতে খরচ করিয়া ফতুর হইয়া পড়, সেই আনন্দই ধৃতিশক্তির সহায়ে দিব্য প্রেরণাময়ী বাণীতে রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশ পাইত, মন আলোক হইতে আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। নবীনে-প্রবীণে মতদ্বৈধ হয়, এই আনন্দ প্রকাশের রীতি নিয়া। নবীন যাহা পায়, তাহাই ছড়াইয়া দিতে চায়; প্রবীণ বলে, ছড়াইবার জন্য ব্যস্ততা কেন?—সংযত কর, সংহত হও, সঞ্চয় বাড়ুক—এখনই কি? নবীনের বিশৃঙ্খল উদ্দেশ্যবিহীন আত্মপ্রচারকে আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত, ধ্রুবলক্ষ্যে একাগ্র, সুশৃঙ্খল, সুন্দর ও সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। প্রবীণের ইহাই একান্ত সাধনা। ইহাতে প্রবীণের কোন মতলব নাই। প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃই একের উচ্ছ্বাস অপরকে আঘাত করে, নতুবা জীবনের প্রগতি হয় না, আত্মা জাগে না। এক

সাক্ষীচেতা বিভুর অঙ্গুলিসঙ্কেতেই প্রবীণ হইতে নবীনে, নবীন হইতে প্রবীণে জীবনের আবর্ত্তন চলিতেছে—জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রত্যেকে প্রত্যেককে জাগাইয়া দিতেছে। যে কোন বিরোধ, যে কোন বাধাই আপাতপ্রতীয়মান রহস্যবিভ্রম মাত্র—মীমাংসা অন্তরালে নিগূঢ় হইয়া আছে। এই আস্তিক্যবুদ্ধি লইয়া প্রত্যেক আঘাতের তাৎপর্য্য বিচার করিতে হইবে;—দুর্ব্বলতা বা কামনা ব্যতীত আঘাত আসে না, সুতরাং যে কোনও সমস্যা হইতেই তোমার দুর্ব্বলতাকে খুঁজিয়া বাহির কর, নির্ম্মম শাসনে তাহার আত্মসম্মানজ্ঞান উদ্দীপ্ত করিয়া তোল, তখন সে নিজেই নিজের পথ বাছিয়া লইতে পারিবে।

তোমার দুর্ব্বল অথচ ভোগলোলুপ আমিটাই নবীন, তাহারই পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, তোমারই সবল আমি যা পরিণত প্রবীণ আমি বসিয়া বসিয়া কখনো সমবেদনায় ব্যথিত হইতেছে, কখনো বা নির্ম্মম ভ্রূকুটীতে তোমাকে নয়, তোমার অন্তর্নিহিত দানবী কামনাকে বিদ্ধ করিয়া নিজের পাপে নিজকে লজ্জিত হইতে বলিতেছে, কখনো বা রাশ ছাড়িয়া দিয়া তোমার দায়িত্ব তোমাকেই বহন করিবার জন্য নির্ব্বাক্ অনুরোধ করিতেছে;—সবই শুধু তোমার জন্য, তোমার সঙ্গে লড়াইর জন্য নয়। তুমি যে তোমার জন্য কত ব্যাকুল, তাহার অনুভব তুমি প্রবীণের বুকে কর।—কেননা নিছক্ নিজের জন্য তো প্রবীণের এতটুকু ব্যাকুলতা নাই; যে ব্যাকুলতার ব্যথা তাহার বক্ষ ছাইয়া রহিয়াছে দেখিতেছ, সে তোমারই ব্যথা, তোমারই ব্যাকুলতা—তোমার সম্বন্ধে তুমি নিশ্চেষ্ট আছ বলিয়াই তোমার হইয়া তোমার ভাবনা সেই ভাবিতেছে। এ ঋণ তুমি তাহার শোধ করিবেই, এ আশা তার চিরসঙ্গী। হে নবীন! তুমিও দশের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া ওঠ, শুধু ব্যক্তিগত তৃপ্তিতেই তৃপ্ত থাকিও না—তবেই তুমি প্রবীণের ঋণমুক্ত হইবে।

তোমার আদর্শ তোমারই মাঝে রহিয়াছে—তুমি নিজেই জান, নিজের ভাল কি। তুমি যে তোমারই নিকট ঋণী—যাহা ভাবিয়াছিলে, তাহা করিতে পার নাই। নিজের কাছে নিজে ঋণমুক্ত হও—জগতে কোথাও তোমার ব্যাপ্তি ব্যাহত হইবে না।

তুমি যাহা হইয়া আছ, তাহাই নবীন; আর যাহা তুমি হইতে পার, অর্থাৎ যাহা তোমাকে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে একদিন হইতে হইবে, তাহাই প্রবীণ। কিন্তু নিজকে একান্ত নবীন ভাবিয়া তুমি প্রবীণকে আঘাত কর, অর্থাৎ নিজেই নিজের গা কামড়াইয়া মর—ইহাতে বৃথা শক্তি নষ্ট ছাড়া বিন্দুমাত্র লাভ আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। বিরোধ করিয়া কখনও বিরোধমুক্ত হওয়া যায় না। নিজের পদযুগল চর্ম্মমণ্ডিত করিলেই জগৎ চর্ম্মমণ্ডিত হইয়া থাকে।

যৌবনের অফুরন্ত সার্থকতার মাঝে ব্যর্থতার রেখাপাত মাত্রের আশঙ্কায় স্নিগ্ধচিত্ত প্রবীণের হৃদয় বেদনার্দ্র হইয়া উঠে—তাই সে মত্ততার উপর দু'কথা বলিতে আসে। নতুবা নবীনের সঙ্গে তাহার বিরোধ কোথায়? বিরোধ যাহারা কল্পনা করে, তাহাদের। নবীন যে তাহার উন্মদ শক্তিকে স্বয়ংপ্রজ্ঞাদ্বারা সুশাসিত করিয়া চালাইতে পারিত, অথচ পারিল না—তাহার এ দুর্ব্বলতা সে বুঝুক, সে আরো সবল হোক্। গুহাহিত প্রবীণের বেদনাহত হৃদয়ে নবীনের প্রতি এই মঙ্গলকামনাই যে অবিরাম ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।

নিজের ভোগ করিবার শক্তি নাই বলিয়াই প্রবীণ নবীনকে সহিতে পারে না, তাই নবীনের যত গাত্রদাহ—এ নির্লজ্জ উক্তি যে উৎকট কামনারই বিজৃম্ভণ, এ কথা বুঝিবার মত প্রশান্তি নবীনের কোথায়?

জীবনে এমন একটী নিরপেক্ষ দাঁড়াইবার জায়গা রহিয়াছে, যেখানে নবীন-প্রবীণ একান্ত মিলনে সম্মিলিত। সেখানে একে অপরের হাতে অমৃত বাঁটিয়া দিবার ভার তুলিয়া দিতেছে. স্বেচ্ছায় আত্মাহুতির সাধনা চলিতেছে। প্রবীণ হইতে নবীনে আত্মসমর্পণের—একের মৃত্যুতে অনেকের নব নব সৃষ্টির সুমঙ্গল সম্বন্ধ। এ বড় মধুর সম্বন্ধ দুই-ই এক বলিয়াই একের ত্যাগে অপরের পুষ্টি, একের তপস্যায় অপরের মধ্যে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ। এই নিরপেক্ষ ভূমিকা প্রবীণের নিকট সিদ্ধ, আর নবীনের নিকট সাধ্য —উভয়ে এইমাত্র তফাৎ। উভয়ে বৈসাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু বিরোধ নাই। একের বিরুদ্ধে অপরের ক্ষুব্ধ উত্তেজনা নাই—একের পশ্চাতে অপরের সত্যসন্ধ উদ্দীপনাই বরং রহিয়াছে। চক্ষুষ্মান্ হইয়া অন্তরে তলাইতে হইবে —অন্ধভাবে শুধু কতকগুলি ঘটনাপরম্পরা লইয়া টানাটানি করিলে চলিবে না। তরুণ জীবনের প্রত্যেকটা বিপ্লবকে অন্তর্দৃষ্টি নিয়া দেখিলে প্রবীণের প্রতি নবীনের অমর্য্যাদা-বোধ আসিত না।

বলিতে পার, প্রবীণের ভালবাসা নবীনের প্রতি এত গভীর নয়, যাহাতে তোমাদের উদ্দণ্ড বুদ্ধি আপনা হইতেই নত-শান্ত হয়। যে ভালবাসা চায় না—এ কথা তার, যে পাইয়াছে তার নয়। বিফলতার বেদনায় গুমরিয়া মরিতে পারে, যে ভালবাসে একমাত্র সেই; তুমি বাহিরের ফলাফল দিয়া অন্তরের যাচাই কি করিবে?

নবীন যত মাতামাতিই করুক, আজ তাহার আত্মবিশ্বাস বিনষ্ট, তাই সে অপরকে সহিতে পারিতেছে না। প্রবীণের প্রতি তাহার যে অবিশ্বাসভাব, তাহার একমাত্র কারণ তাহার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের অভাব। সে সংশয়ে আকুল, সে ভয়ে অস্থির—কাজেই সকলকেই তাহার সন্দেহ। হয়ত ভাল কথাকেও অনেক সময় সে ভাল বলিয়া বুঝিল না—কেননা সে সংশয়াত্মা —তাহার ইহও গিয়াছে, পরও যাইতে বসিয়াছে।—নবীনের নবীনত্ব আজ একটা চ্যালেঞ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার দরুণ অপর অনেক কিছুই নাকচ করিবার চেষ্টা চলিতেছে—ইহার মূলে নবীনের আত্মসংশয়, নিজের স্থায়িত্বে তাহার যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্বাস নাই।

সংশয় আসিয়াছে কেন?—অভিমান-বশে নিজকে অযথা কতকগুলি কল্পনায় ফাঁপাইয়া তুলিয়াছি বলিয়াই সংশয় আসিয়াছে। সংশয় সত্যবোধেরই পূর্ব্বরাগ। আত্মার সত্যস্বরূপ যতটুকু, তদপেক্ষা বেশী ভাবিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আত্মার প্রেরণা মাঝে আসিয়া বাধা দেয়—ইহাই সংশয়। সংশয় হইতেই বিরোধ, বিরোধের পরই সন্ধি।

প্রত্যেককে আত্মবোধ লাভ করিতে হইলে—এই জন্যই আজ নবীনে-প্রবীণে ঝগড়া বাধিয়াছে। ইহা চিরকালের ঝগড়া। অন্ধ মূঢ় হইয়া ভাবব্যসনে তলাইয়া থাকার চেয়ে এই আপাতবিরোধ আশাপ্রদ। তরুণ আজ জাগিতেছে মাত্র, তাহার চেষ্টায় সংহত শৃঙ্খলার অভাব—কোন যথার্থ প্রবীণই, অর্থাৎ যাঁহারা নিজের নবীনত্ব ভুলিয়া যায় নাই, তাঁহারা ইহাকে অক্ষমার চোখে দেখিতে পারেন না। প্রবীণের তরফ হইতে নবীনের প্রতি কোন অবিচারেরই আশঙ্কা নাই। তাঁহারা যে কি দৃষ্টিতে আমাদের দেখিতেছেন, আমাদের তাহা বুঝিবার সাধ্য হয় নাই। তবু ইচ্ছা করিলে আজ আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে, তাঁহারা আমাদের শত্রু নন। আপাতদৃষ্টিতে যাঁহাকেই শত্রু মনে হইতেছে, তলাইয়া দেখিলে দেখিব, তিনিই আমার পরম মিত্র। অস্থায়ী আস্বাদে ভুলিয়া স্থায়ী সত্যকে আমরা যেন অগ্রাহ্য না করি—

প্রবীণ বোধ হয় নবীনের নিকট আজ এই শ্রদ্ধা-বিনত ছাত্রোচিত ভাবটুকুই চাহিতেছেন। কেননা গুরুর যা কিছু সম্পদ, ঐ পথ দিয়াই সংক্রামিত হয়। কিন্তু আমরা যে শিষ্যের বয়সে রহিয়াছি, একথা আজ একেবারে ভুলিয়াছি—তাই যত গণ্ডগোল।

এই বিপ্লব সমস্ত দেশ জুড়িয়া। আত্মকর্তৃত্ব নিয়া একটা আলোড়ন সবদিকে চলিতেছে। ইহা দুদিনের মাতামাতি মাত্র না হৌক—ইহাই কিন্তু আশা। যাহা হইবার হইয়াছে—কেহই স্বেচ্ছায় কিছু বাধাইয়া তোলে নাই। স্বয়ং ভগবানই ইহা বাধাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু মিটাইতে হইবে আমাদের—ইহাই তাঁহার লীলা। অস্বস্তিতে এলাইয়া থাকা মানুষের স্বভাব নয়। নিজে যখন অস্বস্তিতে থাকিতে পারি না, অপরকে আমার জন্য অস্বস্তিতে ফেলিব কেন? কাজেই আমাদের কর্তব্য, একটা স্বস্তির, সামঞ্জস্যের অধিষ্ঠান আবিষ্কার করা - যাহার মধ্যে নবীন-প্রবীণ উভয় পক্ষেরই স্থান হয়—কেহ কাহাকেও ঠেলিয়া না ফেলে, কেহ কাহাকেও অবিশ্বাস না করে।

যতদিন সমাজ জীবিত থাকে, ততদিন দুইটী পক্ষ থাকিবেই। শুধু পরস্পরে যোগাযোগ থাকা চাই। নতুবা কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ কোন যোগই জীবনে ফুটিবে না—ভোগের পঙ্কিল প্রবাহেই সব তলাইয়া যাইবে। কাহকেও অগ্রাহ্য করিয়া জীবনে কিছু সঞ্চয় করা যায় না। নবীন বলিয়াই হৌক, প্রবীণ বলিয়াই হৌক, নিজের চারিদিকে গণ্ডী রচিলেই জীবনের সহজ নির্ম্মলতা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। আজ যাহা বুঝিয়াছি, ইহাই যে চরম বুঝা নয়—আমার বুঝটাই যে সেরা বুঝ নয়—জীবনের এই সবল সচলতা-টুকুর উপর বিশ্বাস রাখিতে হইবে—তাহারই নাম অভিমান বিসর্জ্জন। পরস্পর বিশ্বাসের, মিলনের, সত্যলাভের, সহজ জীবন বা বহির্নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ আনন্দ লাভের ইহাই পন্থা। অগ্রবর্ত্তী হিতকামী হইয়া পশ্চাৎবর্ত্তীকে এই পথেই আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি পরম প্রেমের সহিতই টানিতেছেন—তবে যেখানে দেখি আঘাত করিতেছেন, সেখানে বুঝিতে হইবে, কোথাও আমিই পশুবৃত্ত হইয়াছি। পাশব বৃত্তিতেই আঘাত আসে, দেববৃত্তের পথ চিরনির্দ্বন্দ্ব। "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"—শ্রীভগবানের এই পরমাশ্বাস যেন শ্বাসে শ্বাসে আমাদের আত্মবিশ্বাসকে অটল শক্তিদান করে। আমরা নবীনও নই, প্রবীণও নই—আমরা তাঁহার কল্যাণীয় সন্তান; কল্যাণই আমাদের মত, কল্যাণই আমাদের পথ, কল্যাণময়ই আমাদের লক্ষ্য। তাঁহার অমায়িক আকর্ষণ যে আমাদিগকে সুখ দিয়া, দুঃখ দিয়া—স্পর্শ দিয়া, আঘাত দিয়া অবিরাম পরমকল্যাণময় প্রেমধামেই লইয়া চলিয়াছে, এই নির্ভরেই চিত্তকে আমাদের সরস রাখিয়া চলিতে হইবে—পথিমধ্যে দুদিনের জন্য একটা কলহ বা অকল্যাণ যেন আমাদের আস্তিক্যবুদ্ধিকে বিচলিত করে। নবীনের উন্মাদনায় প্রবীণের বেদনাবোধকে যেন আমরা তুচ্ছজ্ঞানে হেলা না করি।

সওয়াল জবাব

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—•—

কথা হচ্ছে, ভগবানই যদি সব হলেন, তাহলে এক দেহে তিনি দুঃখ ভোগ করছেন, আর এক দেহে দারিদ্র্য ভোগ করছেন, এ কেন হয়? আমেরিকাকে তিনি স্বাধীনই বা করলেন কেন, আর ভারতবর্ষেই বা মহামারী আর দুর্ভিক্ষ ডেকে আনলেন কেন? একজনকে লক্ষপতি করলেন কেন, আর একজনকেই বা শাকান্নের কাঙ্গাল করলেন কেন? তাঁর মতলবখানা কি? তিনি এত অবিচার করলেন কেন? এদেশে এবং ভারতবর্ষেও এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে প্রশ্নকর্ত্তাকে ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা হয়। তার দরুণ লোকে কর্ম্মবাদের দোহাই দেয় বা কার্য্য-কারণের নিয়মের কথা বলে। কিম্বা বলে, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা: সবাই আপন আপন রুচি অনুযায়ী তার পারিপার্শ্বিক গড়ে তোলে, সুতরাং ভগবান নিশ্চই ন্যায়বান্; মানুষ নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে।

কর্ম্ম-বাদ নিয়ে আলোচনা করা রামের উদ্দেশ্য নয়। কার্য্য-কারণবাদও ভারতবর্ষ থেকে এসেছে, বেদান্তও তাকে সমর্থন করে বটে, কিন্তু এটা শুধু স্থূলজগৎ নিয়ে, প্রাতিভাসিক জগৎ নিয়ে কথা। এতে আসল ব্যাপারের মীমাংসা হয় না কিন্তু। কর্ম্ম-বাদ জন্মান্তর স্বীকার করে এবং প্রতিপন্ন করে যে তোমার বর্ত্তমান অবস্থা অতীতের কর্ম্ম ও বাসনার ফল। তোমার যেমন দশা, যেমন ভাগ্য, যেমন পারিপার্শ্বিকই হোক্ না কেন, এ তোমার অতীত কামকর্ম্মের ফল। যদি একটু তলিয়ে দেখ, তাহলে বুঝ্‌তে পারবে, এতে কেবল সমস্যাটাকে এখান থেকে ওখানে সরিয়ে রাখা হল মাত্র। ঠিক ঠিক প্রশ্নের জবাব হল না তাতে। রাম এ মতকে অবশ্য খণ্ডন করতে চাইছেন না। রাম একে সমর্থন করেন বটে কিন্তু প্রশ্নটার যে আর একটা দিক আছে, তাও দেখাতে চান। এ দেশের লোক সে দিকটা খেয়ালই করে না; কিন্তু খেয়াল করলেও আমল দিতে চায় না।

কর্ম্ম-বাদ বলে, অতীতের কর্ম্ম তোমার বর্ত্তমানের অবস্থাবৈষম্য সৃষ্টি করেছে। এতে প্রমাণ হয়, তোমার পূর্ব্বজন্মেও কর্ম্ম ও বাসনায় বৈষম্য ছিল নিশ্চয়ই। তখনও কেউ রোগী, কেউ দরিদ্র, কেউ ধনী ছিল। অতীতের এইসমস্ত বৈষম্যের হেতু ছিল কি? উত্তর হবে, তারও পূর্ব্বজন্মে যে কামনা ও কর্ম্মের বৈষম্য ছিল, তা হতেই এই বৈষম্য ঘটেছে। তাহলে সে জন্মের বৈষম্যই বা এলো কোথা থেকে?—সেগুলো এসেছে তার পূর্ব্বজন্মের বৈষম্য থেকে। এতে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে পড়ল। কারণ এতে বোঝা গেল, তোমার অতীত-জন্মকে যদি অনন্তকাল পর্য্যন্তও ঠেলে নেওয়া যায়, একেবারে সব আদিরও আদিতে পৌঁছান যায়, তবুও বৈষম্য থেকেই যায়। একটা বৈচিত্র্যের দ্বন্দ্ব বরাবরই বজায় রয়েছে। তাতে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, বরং সেটা আরও জটিল হয়ে যায়।

প্রশ্নটা এখন আরও জোরালো হয়ে উঠ্‌ল; সেটা দাঁড়াল এই—"ভগবান্ অনন্তকাল থেকে এই বৈষম্যটা রাখলেন কি করে? অনন্তকাল

ধরে মূলতঃই তিনি এক ঠাঁই ধনী আর এক ঠাঁই গরীব হয়ে আছেন কি করে? কেন তিনি এক জায়গায় রোগী আর এক জায়গায় সুস্থ-সবল? কি অযৌক্তিক কথা! এই বৈষম্যের মীমাংসা কি? বেদান্ত বলছেন, এই প্রশ্ন তোমাকেই করতে হয়; তুমি বেদান্তকে ও করলে চলবে না। এ প্রশ্নের জবাব তোমাকেই দিতে হবে। বোঝাটা বেদান্তের ঘাড়ে চাপালে চলবে না। বেদান্ত অদ্বৈত মানে, আবার এই আপাত-বৈচিত্র্যও ব্যাখ্যা করে।

ধর, একটা লোক আছে, খুব অত্যাচারী। তার সামনে পাঁচটা লোক দাঁড়িয়ে; লোকগুলো তা হতে ভিন্ন অত্যাচারী লোকটা যেন ভগবান্; আর ওই পাঁচটা লোক ভগবানের সৃষ্টজীব বা দাস। তখন এই লোকটা যদি একজনকে গরাদে পোরে, আর একজনকে একটা বাগানবাড়ীতে রাখে, আর একজনকে রাখে রাজপুরীতে, আর একজনকে পায়খানায়, আর শেষের লোকটার বুকের ওপর গোটা হিমালয়টা চিরকালের দরুণ চাপিয়ে দেয়, তাহলে সে লোকটাকে তুমি কি বলবে? বলবে কি নিষ্ঠুর. কি একচোখা! ঈশ্বর যদি জীব হতে ভিন্ন হন, আর একটা জাতকে সুখে রেখে আর একটা জাতকে দুঃখের পাথারে ডুবিয়ে দেন, একজনকে করেন ধনী, আর একজনকে করেন গরীব, তাহলে তাঁকে তুমি কি মনে করবে? নিষ্ঠুরের একশেষ সে —অমন একচোখা আর দুটী নাই! যারা মনে করে জীব হতে ঈশ্বর পৃথক, তাদেরই এখন এই সমস্যা মীমাংসা করা উচিত। বেদান্ত তো ঈশ্বরকে হোথা হোথা মনে করে না; সে দেখে চোখ বুজতেই অন্তর আলো করে আছেন তিনি!

ধর, বাড়ীর কর্ত্তা একবার গেলেন বাগানে, একবার গেলেন গোয়ালে, একবার গেলেন বৈঠকখানায় একবার পায়খানায় একবার পাকশালাতে, আর একবার একটা বোঝা বুকের ওপর নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রইলেন। তাঁকে কি বলবে? বলবে, তিনি একচোখা? না—না, যাদের তিনি গরাদে পুরেছেন বা বৈঠকখানায় রেখেছেন বা পায়খানায় রেখেছেন, তাদের থেকে যদি তিনি পৃথক্ হন্, তবে তিনি একচোখা। কিন্তু তিনি তা করেন নি। কিন্তু তিনিই যদি পায়খানায় যান, আবার পাকশালায় যান, তাহলে তো তাঁকে একচোখা বল্‌তে পারি না। তখন আর তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না।

তাই বেদান্ত বলে, এই যে আপাতবৈষম্য, এ ভগবানের মুখে কলঙ্কের দাগ হত, যদি নাকি যারা দুঃখ পাচ্ছে, যারা গরীব, তাদের থেকে ভগবান্ পৃথক হতেন। এ যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর —এ যে রাম স্বয়ং! এ যে আমিই কোথাও ধনী, কোথাও দরিদ্র, কোথাও কারাবাসী, কোথাও প্রাসাদবাসী; আমিই কোথাও সুন্দর, কোথাও কুৎসিত। তুমি দোষ দেবে কার? যে নিন্দুক, সেও যে আমি। এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলবার আছে।

এ দেশে বেদান্তপ্রচার করা বড় কঠিন, কেননা এখানে আমি বলতেই বোঝায় দেহটা। এ দেশের লোকে বলে আমার আত্মা আছে, আর আমি বল্‌তে তারা বোঝে দেহ, মন, বুদ্ধি, বা বড় জোর দেহীকে। কিন্তু বেদান্তের অনুভূতি যিনি পেয়েছেন, তিনি কখনও আমি বলতে দেহ-মন-বুদ্ধিকে বোঝেন না। আমি তো এসব নই। আমি যদি কিছু হই তো ব্রহ্ম।

বলছি, "আমি রাজা" "আমি ঘোড়ার মালিক" "আমি সাধু", "আমি আমেরিকান্", "আমি হিন্দু।" "আমি ব্রহ্ম" এই বলা হতে এ সব বলার তফাৎ আছে। তফাৎটা বোঝ। যখন বলি, "আমি

রাজা" তখন 'রাজা' কথাটা একটা উপাধি; যখন বলা হয়, "আমি ঘোড়ার মালিক", তখন ওটা যেন একটা বিশেষণ চড়িয়ে দেওয়া হয়। যখন বলি, "আমি গরীব", তখন 'আমি' একটা কিছু, আর গরীব আর একটা কিছু।—হিন্দু বলে, "আমি ব্রহ্ম।" ব্রহ্ম একটা উপাধি নয়, বিশেষণ নয়, নিজকে ক্ষুদ্র অহমিকায় আবদ্ধ রেখে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া একটা বিশেষণ এ নয়; ব্রহ্মত্ব একটা পোষাক নয়। হিন্দু যখন বলে, "আমি ব্রহ্ম", তখন ওসব ভাব তার মনে জাগে না।

কথাটা কেমন হল, জান? যেন বলা হল, এই সাপটা দড়ি। অন্ধকারে একটা লোক দড়িকে সাপ বলে মনে করেছে। একটা দড়ি জড় হয়ে পড়েছিল মাটীর ওপর, সে তাকে সাপ মনে করে ভয়ে মূর্চ্ছা গেল। কেউ কেউ এসে বল্‌ল, "ভায়া, তোমার সাপটা যে দড়ি।" তার অর্থ কি? অর্থ এই, যাকে সাপ মনে করেছ, সেটা সাপ নয়, দড়ি। এ কথাটা, "আমি রাজা" এই কথাটার মত তো হল না। সাপ কথাটা কোনও ধর্ম্ম নয়; দড়ি কথাটাও ধর্ম্ম নয়। যদি বল্‌তে, সাপটা কালো, তাহলে কালো হতো সাপের ধর্ম্ম। কিন্তু যখন বল, সাপটা দড়ি, তখন দড়ি তো সাপের ধর্ম্ম হয় না। কথাটা খেয়াল করো কিন্তু। একটু গোলমেলে হয়ে আছে কথাটা, কিন্তু একবার তলিয়ে বুঝ্‌লে আপত্তি করবার আর কিছু পাবে না। ঠিক ঠিক বুঝে নাও। সাপটা কালো—এই হচ্ছে একরকম কথা আর সাপটা দড়ি, এই হচ্ছে আর এক ধরণের কথা।

তেমনি "আমি দেবব্রত", "আমি শুদ্ধসত্ত্ব" এগুলো একরকম কথা; আর "আমি ব্রহ্ম" এ হচ্ছে আর এক রকম কথা। যখন সে বলে, "আমি ব্রহ্ম", তার অর্থ হয় "আমি দেহ নই, তোমরা আমাকে যা মনে করছ, আমি তা নই। তোমরা মনে করছ আমি রক্ত-মাংস, হাড়-হাড্ডির খাঁচা একটা, কিন্তু আমি তা নই। আমি হাড় নই, পেশী নই, এই সাড়ে তিন হাত মাপের মানুষ নই—আমি মন নই, বুদ্ধি নই। আমি প্রাণের উৎস; আমি শক্তি, আমি সত্য, আমি ব্রহ্ম। আমি তাই, অপর কিছু নই।

লোকে চায় ভগবানকে আসামীর কাঠগড়ায় পূরে তাঁর বিচার করতে। ভগবান্ যেন তাদের মতই একজন কেউ; সাধারণ লোকের মতই যেন তাঁকে নিয়ে টানাটানি করা যায়, হেনেস্তা করা যায়।

এই সব সংশয় আর দুর্ব্বুদ্ধি হয় কেন, সে বিষয়ে একটা গল্প বল্‌ছি।

ভারতবর্ষে একজন তেলী ছিল। তার বাড়ীতে সুন্দর একটা তোতাপাখী ছিল। একদিন তেলী দোকান ছেড়ে কোথায় যেন গিয়েছে। তার চাকরও কি কাজে গিয়েছে যেন। তোতাটা দোকানে আছে। তেলী নাই দেখে একটা মস্ত বিড়াল এসে ঘরে ঢুকল। বিড়ালটা দেখে তোতাটা ভয় পেল। খাঁচার মাঝেই সে ভয়ে ঝাঁপিয়ে উঠ্‌ল। সে পাখা ঝাপ্‌টে কেবল এদিক-ওদিক করছে—করতে করতে দেয়ালের গা থেকে খাঁচাটা একটা তেলের ভাঁড়ের ওপর পড়ে গেল। ভাঁড় ভেঙ্গে তেলটা মাটীতে গড়িয়ে চল্‌ল। তেলী ফিরে এসে দেখ্‌ল, অমন ভাল তেলটা মাটীতে গড়াচ্ছে। দেখে তার ভারী রাগ হয়ে গেল। রাগ পড়ল গিয়ে তোতাটার ওপর, কেননা ওই তো যত নষ্টের গোড়া। ওই তো খাঁচাটা ভাঁড়ের ওপর ফেলে দিয়ে নাহক পঞ্চাশ টাকার ক্ষতি করল। তাই তার ভারী রাগ ধরে গেল তোতাটার ওপর। সে খাঁচা খুলে তোতাটা ধরে তার মাথার ঝুঁটিটা ছিঁড়ে নিতে লাগ্‌ল। তোতাটা

নেড়া হয়ে গেল, ঝুঁটীর একটা রোঁয়াও মাথায় থাক্‌ল না।

তোতাটা আর দু'সপ্তাহ ধরে কথাই কইল না। তেলীর তখন কৃতকার্য্যের জন্য অনুতাপ হচ্ছিল। দু'সপ্তাহ পরে একজন খদ্দের এসেছে তেল কিন্‌তে। তার মাথায় পাগড়ী ছিল না; মাথাটাও ছিল নেড়া। দেখে তোতাটা হাঃ হাঃ করে হেসে উঠ্‌ল; তার একজন সঙ্গী জুটেছে দেখে সে ভারী খুসী! তেলী জিজ্ঞাসা করল, "ভারী ফূর্ত্তি দেখ্‌ছি যে! অত হাসছিস্ কেন?" তোতা বল্‌ল, "ভাগ্য ভাল, আমিই একলা তেলীর চাকর নই! ওই লোকটাও তেলীর ঘরে চাকরী করে নিশ্চয়ই, তা না হলে ওর মাথা নেড়া হবে কেন?"

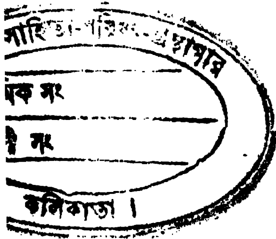
লোকে ঠিক এই ধরণের সব যুক্তি দেখায়। তারা ভাবে তারা যা কিছু করে, যা কিছু বলে সবার মূলে একটা মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। অথচ একটা স্বার্থপরতার পূর্ব্বাভাস নিয়ে তারা কাজ করে। তারা বলে, ভগবান্ এই জগৎটা সৃষ্টি করেছেন; অতএব কোনও একটা বিশেষ মতলব এঁটেই তিনি তা করেছেন। এটা তর্কের ভুল ধারা। এতে ভগবানকে খাটো করা হয়। তুমি বল্‌ছ, তিনি অনন্ত, অথচ তাঁকে নামিয়ে আন্‌ছ একটা সাধারণ মানুষের কোঠায়। এতে চল্‌বে না।

"ভগবান্ কেন এই ভেদ সৃষ্টি করলেন?" এই প্রশ্নটাই আর এক ধরণে করা হয়,—"আমিই যদি সব তো আমার দুঃখ কেন?" রাম শুধু জিজ্ঞাসা করছেন, "স্বপ্নে কি তুমিই সব নও?" তখন তুমিই সব। স্বপ্নে পাহাড়-পর্ব্বত, সাগর-মরু সব তুমি, সব তোমার সৃষ্টি। অথচ সেই স্বপ্নেই বাঘ আসে তোমাকে গিলে খেতে, সাপ আসে তোমায় ছোবল দিতে, আর তাতেই তুমি চম্‌কে ওঠ। তাই নয় কি? অথচ তুমিই সিংহ, তুমিই বাঘ, তুমিই সাপ।

তোমরা তো জানই, রাম বলে বেড়ান যে তোমরা ব্রহ্ম। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, "আমি যদি ব্রহ্ম তো আমি সব জান্‌তে পারি না কেন?" রাম বলেন, "আচ্ছা ভাই, ব্রহ্ম না হও তো কি তুমি? সেটাই আগে বল না কেন!" সে বল্‌ল, "কেন আমি দেহ!" আচ্ছা বেশ। তুমি যখন দেহ (যদিও সেটা তোমার মিথ্যা অভিমান মাত্র), তখন বল দেখি, তোমার মাথায় চুল কতগুলি? মাথাটা তোমার না? সে বলবে, "হাঁ, আমারই মাথা তো!" তোমার মাথা যদি তো বল মাথায় চুল কতগুলি! তোমার শরীরে হাড় কতগুলি? (হাঃ—লোকটা শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানে না—অথচ সে দেহ, এটুকু বোঝে!) তোমার পেশী কতগুলি? সকাল বেলা খেয়েছিলে না? বল দেখি, সে খাবারটা কোথায় গেল? পাকস্থলীতে গেছে, না মূত্রাশয়ে গেছে, না ফুস্‌ফুসে গেছে? কোথায় গেছে? লোকটা আর জবাব দিতে পারে না।

তখন রাম বললেন, তোমার মাথায় কতগুলি চুল, তুমি তা জান না, অথচ মাথাটা তোমার। তোমার পেশী বা হাড় কয়খানা তা জান না, তবুও সেগুলি তোমার। আজ সকালে খেয়েছ, তা শরীরের কোন জায়গায় আছে তা জান না, অথচ শরীরটা তোমার। খেয়েছিলে তো তুমিই, আর কেউ তো খেতে যায় নি। তাই বল্‌ছি, আকাশে কতগুলি তারা আছে, তোমার বুদ্ধি তার হিসাব না দিতে পারলেও তারাগুলি কিন্তু তোমার। ইংলণ্ডে এখন কি হচ্ছে না হচ্ছে না জান্‌তে পারলেও ইংলণ্ড তোমার। বুধগ্রহে এখন কি ঘটছে, তা না জানলেও গ্রহটা তোমার। তুমি এ সব খবর জান না বলেই যে ওগুলো

তোমার নয়, এ কথা তো ঠিক নয়। এ সব কথা বল্‌বে কে? যে সান্ত, সেই গুণে গেঁথে কথা বল্‌তে পারে। (দেয়ালে একখানা ছবি দেখিয়ে) ওই ছবিখানার খবর তুমি দিতে পারবে, কেননা তুমি জান ছবিটা ওখানে আছে। তুমি তো আর ছবি নও বিষয় আর বিষয়ী পৃথক। তুমি ছবিটার খবর বল্‌তে পার, কেননা ছবিটা তোমা হতে পৃথক—অবশ্য 'তুমি' বল্‌তে এখানে মিথ্যা অভিমানকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। তুমিই যদি সব, তুমি ছাড়া যদি আর কিছু কোথাও না থাকে, তোমাকে গণ্ডীবদ্ধ করবার কিছু যদি না থাকে তাহলে তোমার কথা আর কে বল্‌বে? সব বলা-কওয়া দেখা-শোনার ইতি সেখানে; যেখানে কারু কথা গিয়ে পৌঁছাতে পারে না। (ক্রমশঃ)



তীর্থরামের গৃহস্থালী

স্বামী-স্ত্রী

"রামের পত্নী ফুল তুলে আন্‌তেন, ধূপ-দীপ সাজাতেন, আর আনন্দে বিভোর হয়ে যেতেন। পূজা শেষ হয়ে গেলে পর রামের পানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে গভীর ধ্যানে ডুবে যেতেন···"

কথাগুলি স্বামী রামতীর্থের, পাঠক তাহা জানেন। নারী ও পুরুষের সম্বন্ধকে হিন্দুর ধরণে যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ইহার মাঝে বিসদৃশ কিছু দেখিতে পাইবেন না; সনাতন ধর্ম্মকে দেশ-কাল-পাত্রনিরপেক্ষ মানবজাতির সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারাও ইহাতে চমকিয়া উঠিবার মত কিছু পাইবেন না। কেন, তাহার বিবৃতি পূর্ব্ব প্রবন্ধে করিয়াছি।

তীর্থরাম যে পুরুষ, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। যিনি স্বরূপে অবস্থিত, তিনিই পুরুষ ইহা পুরুষের সার্ব্বভৌম অন্তরঙ্গ সংজ্ঞা। এই পুরুষের ঈক্ষায় যিনি পরিচালিত হন, তিনিই নারী, তিনিই সতী। এই তত্ত্বের উপর হিন্দুর স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা—ইহাই হিন্দুর গৃহস্থালীর ভিত্তি।

আত্মজ্ঞান লাভ করাকেই হিন্দু পরমপুরুষার্থ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। ইহাতে যে ইহ-বিমুখীনতা আসিয়া পড়ে, এ কথা সত্য নয়; আধুনিক শিক্ষিত সমাজের অনেক কু-সংস্কারের মত ইহাও সাহেবদের উচ্ছিষ্ট। কর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়া নয়, অনায়াসে অতিক্রম করিয়াই পুরুষের প্রতিষ্ঠা—ইহা হিন্দুর শাস্ত্রের কথা এবং তাহার সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতাও বটে। আত্মজ্ঞান পরমপুরুষার্থ—ইহার অর্থ এই যে, সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্যই এই পুরুষার্থে পরিসমাপ্ত হইবে; আকাশ যেমন আপনার উদার আশ্রয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বিধৃত রাখিয়াছে, তেমনি আত্মজিজ্ঞাসাই আমাদিগকে সংসারে বিধৃত করিয়া রাখিবে। গৃহস্থিত পুরুষের ইহাই আদর্শ।

এই জন্যই গৃহে পুরুষ কর্ত্তা হইয়াও উদাসীন। এই ঔদাসীন্য ক্লীবত্ব নয়—অটল গাম্ভীর্য্য। মূলের এই সত্যটুকু স্থূলে নামিয়া আসিতে কথঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া যায়—উহা আধারের দোষ, আধেয়ের দোষ নয়। মোট কথা, গৃহব্যাপারে পুরুষ সর্ব্বময় হইয়াও উদাসীন—ইহাই তাহার মর্ম্মকথা।

কিন্তু কর্ম্মহীন গৃহ তো হইতে পারে না। অতএব পরিপূর্ণ কর্ম্মও চাই, সেই কর্ম্মের নিয়ামকও চাই। নারী সেই কর্ম্মের নিয়ন্ত্রী। বাস্তবিক স্ত্রী-স্বাধীনতা এইখানে। অহরহ চারি দিকে দেখিতে পাইতেছি, গৃহব্যাপারে পুরুষ অতি সহজেই শিবনেত্র হইয়া পড়িতেছে, আর নারী সেখানে পরিপূর্ণ মমতায়, প্রাণপূর্ণ আবেগে অশ্রান্ত খাটিয়া যাইতেছে। সাধক কবি রূপকছলে এই কথাটাই বলিয়াছিলেন—

কর্ম্মরূপা মাতা আমার কর্ম্মে দিন বক্ষে,
অকর্ম্মা জনক আমার সপ্ততল মক্ষে।

যে কর্ম্ম নারীর পক্ষে স্বভাব, তাহা তাহার বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। আমি যদি তোমাকে দড়ি দিয়া বাঁধি, তাহা হইলে তুমিই যথার্থরূপে বাঁধা পড়, দড়িটা কিন্তু তোমার সঙ্গে সংলগ্ন থাকিয়াও মুক্ত। কেউ কাহাকে বাঁধিলে যে বাঁধে সে মুক্ত, এবং যাহাকে বাঁধে সে বদ্ধ—এটা খুব সহজ কথা। যে বাঁধে, প্রকারান্তরে সেও এক দিক দিয়া বাঁধা পড়ে, এমন একটা সূক্ষ্মতর্ক উঠিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার জবাব দিতে গেলে উপমার জের টানিতে গিয়া কথাগুলি ঘুলাইয়া উঠিবে। সুতরাং কথাটা মোটামুটাই গ্রহণ করা যাক্।

সংসারে নারী পুরুষকে বাঁধিয়াছে, সুতরাং যে সংসারে নারীর দরুণ পুরুষ বদ্ধ, সেই সংসারেই নারী মুক্ত। ইহা হইতেই প্রমাণ হয়, নারী প্রকৃতির স্বরূপ শক্তি; এই জন্যই কর্ম্ম তাহার পক্ষে বন্ধন হয় না—কর্ম্মের প্রতি অনুরক্তি তাহার স্বভাব। সে সংসার ফাঁদিতেই ভালবাসে, ইহাই তাহার তৃপ্তি। পুরুষ প্রকৃতির আবিষ্ট শক্তি, তাই সংসারের প্রতি একটা বিরূপতা, স্বভাবজ একটা বৈরাগ্যের ভাব তাহার মজ্জাগত।

কিন্তু নারীতেও যেমন পুরুষের ছায়া পড়িয়াছে, তেমনি পুরুষেও নারীর ছায়া পড়িয়াছে। তাই নারী ও পুরুষ উভয়েই স্বীয় প্রকৃতির একদেশে স্বরূপের অনুসরণ করে, অপর দেশে আবার স্বীয় আপূরক শক্তির অনুসরণ করে। এই জন্য পুরুষেরও কর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগে, এবং নারীও এক জায়গায় কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তি চায় অর্থাৎ নারীর পক্ষেও একস্থানে কর্ম্ম বন্ধন হইয়া উঠে।

পুরুষের পক্ষে কর্ম্ম-বিমুক্তি যেরূপ ঔদাসীন্যে, নারীর পক্ষে তেমনি কর্ম্ম-বিমুক্তি সেবায়। ইহাই যথাক্রমে জ্ঞানের বৈরাগ্য ও প্রেমের বৈরাগ্য। সংসারে ভোগের হাটে পুরুষ আত্মপ্রতিষ্ঠা হেতু বিরাগী, আর নারী আত্ম-সমর্পণ হেতু বিরাগিণী।

যে সংসারে এই বৈরাগ্যের দীপ্তি ফুটিয়া উঠে, সেই সংসারই কৈলাস। হর-গৌরী হিন্দুর স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ।

যাহাকে আমি এটা-সেটা দিয়া ভুলাইতে পারি না, তাহাকে আমার সবটুকু নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া আত্মসাৎ করিতে চাই; ইহাতে আমার সুখ আছে, আত্ম-শক্তি স্ফুরণের উত্তেজনা আছে। নারীর সেবার মূলে এই আত্ম-মায়া বিজৃম্ভণের উত্তেজনা। এই উত্তেজনা সফল হয়, যদি পুরুষ নির্ব্বিকার থাকিয়া নারীকে আত্ম-শক্তি বিকাশের সুযোগ দেয়। আর অনায়াস স্নিগ্ধতায় মায়াকে অতিক্রম করাতেও পৌরুষের এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি আছে। সে তৃপ্তিই আবার পুরুষের মাঝে শ্রীরূপে ফুটিয়া উঠে এবং তাই নারীকে অদম্য আকর্ষণে পুরুষের পানে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

এই জন্য দেখি, যাহারা ভোগী, যাহারা কামাতুর, নারী তাহাদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়পর স্বামীকে সতীস্ত্রী আন্তরিক ঘৃণা করিবে, ইহা বিধির বিধান। কেননা লালসায় অন্ধ হইয়া সে নারীর উপচিত শক্তিকে বন্ধ্যা

করিয়া রাখিয়াছে, আত্ম-শক্তির এই অনাদর নারী কিছুতেই সহিতে পারে না। যে সংসারে পুরুষ ভোগের কাঙ্গাল নয়, অথচ নারী সেবার জন্য উন্মুখ, সেখানে পুরুষ-শক্তির ও নারী-শক্তির অসম-উর্দ্ধ-স্ফুরণে আনন্দ উছলিয়া পড়িবে। সেইখানেই তীর্থরামের ভাষায়, "নারী পুরুষের মাঝে আত্মদর্শন করিবে এবং পুরুষ নারীর মাঝে আত্মদর্শন করিবে।" ইহাই সুখের সংসার, ধর্ম্মের সংসার।

নারী এবং পুরুষ—এই লইয়াই তো সংসার। কল্পনা করিয়া দেখ, যে সংসারে নারী ভোগ-লোলুপা, কামনার অতৃপ্ত দাহে দিনরাত জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছে, রিরংসার উত্তেজনায় পুরুষকে শুষিয়া মারিতেছে, পুরুষের পক্ষে সে সংসার কি ভয়ানক!—আবার নারীর তরফ হইতে বিচার করিয়া দেখ, যে সংসারে পুরুষ লোভক্লিন্ন, কামাতুর, দুর্দ্ধর্ষ—সে সংসার নারীর কাছে কি দুঃসহ!

গৃহস্থালীকে আনন্দনিকেতন করিতে হইলে পুরুষ এবং নারী উভয়কেই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম অনুভব করিয়া ইন্দ্রিয়ের বুভুক্ষাকে সংযত করিতে হইবে। হিন্দুর গৃহস্থালীর ইহাই আদর্শ। মনুমহারাজের কথা দিয়া তাহা দেখাইতেছি।

আর্য-পুরুষের পক্ষে যৌবন পর্য্যন্ত মনু কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিলেন। যাহারা বলে, পুরুষ নিজের সুখের দরুণ পক্ষপাত করিয়া নারীকেই শুধু বিধি-নিষেধের দড়িতে বাঁধিয়াছে, তাহারা কতখানি অন্ধ, তাহাই বুঝিয়া দেখ। বিধি-নিষেধ গড়িয়াছে বলিয়া তাহারা অবশ্য পুরুষ শাস্ত্রকারকেই দোষী করিয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্রকার বেচারীরা যে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে নিজেদের দরুণ কেবল আলো-চাল আর কাঁচা কলার ব্যবস্থাটাই গোড়া হইতে পাকা করিয়া রাখিয়াছে, সেটা কি কারো চোখে পড়ে না? হিন্দুর সমস্ত মনোবৃত্তিই যে আগাগোড়া সংযমের ধারাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, এ কথা যাহারা তলাইয়া বোঝে না, পক্ষপাতের কোলাহলটা তাহারাই জমকাইয়া তোলে।

গুরুগৃহে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জিহ্বোপস্থকে সংযত করিয়া যে তেজস্বী, বীর্য্যবান্, দৃঢ়কায় স্নাতক গৃহে ফিরিয়া দারপরিগ্রহ করিবেন, তিনি নিজেও যেমন কামের ক্রীড়নক নন, নারীকেও—সহধর্ম্মিণীকেও তেমনি কামনিবৃত্তির উপায়রূপে ভাবিতে অভ্যস্ত নয়। এই স্বামী নারীহৃদয়ের শ্রদ্ধা ও পূজারতি স্বয়ং অকাম হইয়াই আকর্ষণ করিয়া থাকেন এবং পতিব্রতা নারী তাঁহাতেই আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিজের নারীত্বকে সার্থক মনে করিয়া থাকেন।

পুরুষের পক্ষে যে কঠোর সংযমের ব্যবস্থা, নারীর পক্ষেও তাহাই, তবে অবস্থাভেদে একটু রূপান্তর ঘটিয়াছে মাত্র। গুরুগৃহবাস যে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই নিতান্ত আবশ্যক, এ কথা অপক্ষপাতেই আর্য্যশাস্ত্রকারের মাথায় ঢুকিয়াছিল। পুরুষদের বিধিব্যবস্থা করিয়া দিয়া মনুমহারাজের মনে পড়িল মেয়েদের কথা। "গুরৌ বাসঃ" তো তাহাদেরও প্রয়োজন। মনু বলিলেন, 'পতিসেবা গুরৌ বাসঃ'—পতিসেবাই নারীর পক্ষে গুরুকুলবাস ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত।

নব্য তান্ত্রিক কথাটা শুনিয়াই লাফাইয়া উঠিবেন।—কিন্তু আমরা বলি,—ধীরে ভায়া, ধীরে! পতি-সেবা অর্থে পতির কামপরিতৃপ্তি নয়. তাহা হইলে গুরৌবাসঃ বা ব্রহ্মচর্য্যব্রতরূপ পবিত্র যজ্ঞের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঋষি কল্পনাও করিতে পারিতেন না।

পুরুষের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের ছক্‌টা এই!—

আট বছর হইলেই (পাঁচবছর হইলে আরও ভাল) বাপ-মা ছেলেকে গুরুর বাড়ীতে উপনীত করিয়া রাখিয়া আসিবেন। গুরুর ঘরও একটা সংসার—যথার্থতঃ হরগৌরীর সংসার। ব্রহ্মচারী

সেখানে দেহ-মনকে তপস্যা দ্বারা যেমন গড়িয়া তোলে, তেমনি আবার গুরুকে জানে পিতা, গুরুপত্নীকে জানে মাতা, গুরুপুত্র এবং গুরুকন্যাকে জানে সহোদর-সহোদরা। অর্থাৎ একটু জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর হইতেই হিন্দু পরকে আপন করিবার শিক্ষাটা সন্তানের মজ্জাগত করিয়া দিতে চায়। মনে রাখিও, এটা হিন্দুর- জাতীয় শিক্ষা। এই শিক্ষার ভিতর দিয়া, পুরুষ-ছেলের ২৪ বৎসর কি ৩৬ বৎসর কি ৪৮ বৎসর কাটিয়া গেল। যে ছেলের ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা হইল না, সে আর দারপরিগ্রহ না করিয়া গুরুর সংসারেই ব্রহ্মচারী হইয়া জীবন কাটাইয়া দিল।

এখন নারীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের ছক্‌টা কিরূপ তাহাই দেখা যাউক।—

অষ্টমবর্ষে গৌরীদানের কথা আছে। নব্য তান্ত্রিক বলিবেন, অসভ্য রীতি!—সে গাল মাথা পাতিয়া লইতেছি। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াইতেছে এই।—যেমন আটবছর বয়সে আমার ছেলেটিকে পরের সংসারে মানুষ হইতে পাঠাইয়াছিলাম, তেমনি আটবছরে আমার মেয়েকেও পরের সংসারে মানুষ করিতে পাঠাইলাম। এই আট বছরের মেয়েকে যদি ২৪ বৎসরের ধৃতবীর্য্য স্নাতক স্বীয় ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি বয়সের অনুপাতে একটা স্নেহমিশ্রিত বাৎসল্য ছাড়া আর কি জাগিতে পারে?—বর্ত্তমান যৌন-ব্যভিচারের আপত্তি তো সেখানে টিকিতেই পারে না। বয়সের এই যে অন্ততঃ ষোল বছরের পার্থক্য, ইহার মাঝে গভীর দূরদর্শিতা ও যৌন-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত রহিয়াছে। জন্মসংরোধের বৈজ্ঞানিক উপায় লইয়া যাঁহারা চ্যাঁচামিচি করিতেছেন, তাঁহারা হয়ত ভাবিয়া পাইবেন না, হিন্দু কিরূপ সুকৌশলে অথচ মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া স্বাভাবিক জন্মসংরোধের ও সুপ্রজননের ব্যবস্থা করিয়াছিল। সে কথা না হয় এখন থাক্।

যে পুরুষ স্বপ্রতিষ্ঠ, জগতের কোনও কামনা বা প্রলোভনকে যে রেয়াৎ করে না, প্রকৃতির কোনও বন্ধনকে যে স্বীকার করে না, প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশ্যা করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া তারপর তাহার প্রেমে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া সে একটা অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি পায়। আর প্রকৃতিরও রহস্য এই, স্বপ্রতিষ্ঠ পুরুষের সেবিকা হইয়াই তাহার পরম তৃপ্তি।—নরনারীর অন্তর্জীবনের ইহা এক নিগূঢ় রহস্য।

শিবস্বরূপ স্নাতক এইরূপেই গৌরীকে মানুষ করিয়া তুলে এবং এইরূপ শিবের মত স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াই বালিকা গৌরী তাহার গুরুকুলবাস ব্রতের উদযাপন করে। ইহাতে নারীর ব্রহ্মচর্য্যও অটুট রহিল, অথচ তাহার প্রেমপ্রবণ হৃদয় অতি কচি বয়সেই প্রেমের শিক্ষা ও দীক্ষায় গঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

যদি কোনও নারী এইরূপ অবস্থায় অকালে বিধবা হয়, তাহা হইলে গুরুকুলবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ন্যায় আজীবন সে পতিকুলবাসিনী ব্রহ্মচারিণী হইয়া কাটাইয়া দেয়। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে প্রবল জ্ঞানস্পৃহা যেমন ভোগের প্রতি তাহাকে বিতৃষ্ণ করিয়া তোলে, বিধবা অথবা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীকেও তেমনি একান্ত প্রেমেই ভোগবিতৃষ্ণ করিয়া রাখে।

তার্কিক বলিবেন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী স্বেচ্ছায় ভোগ বিতৃষ্ণ থাকে, বিধবাকে তো জোর করিয়া ভোগবঞ্চিত রাখা হয়।—সেই ইংরাজের উচ্ছিষ্ট কথা! কথাটা কাম-বিহ্বল পুরুষের হৃদয় দিয়া বিচার করিও না —সংযত পুরুষ ও নারীর অন্তর দিয়া নারীর হৃদয় বিচার কর। গোড়া হইতেই যে নারীকে ব্রহ্মচর্য্যের দীক্ষায় দীক্ষিত করা হইয়াছে এবং তাহার

দীক্ষদাতা যে তাহার স্বামী স্বয়ং! স্বভাবতঃই নারী স্বল্পভোগে তৃপ্ত, পরের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দেওয়া তাহার স্বভাব। এই নারীই যদি বালিকা বয়স হইতে তাহার প্রিয়জনের নিকট হইতে ভোগবিমুখতার শিক্ষাই পায়, তাহা হইলে সে যে তাহার স্মৃতির অবমাননা করিয়া রিরংসায় অস্থির হইয়া পড়িবে, এ কল্পনা যে নারীর কত বড় অপমান, অন্ধ সংস্কারক কি তাহা দেখিতে পায় না?—বিশেষতঃ নারীহৃদয় অতি কমনীয় বলিয়া একটা শিক্ষার ছাপ সহজেই তাহার অন্তরে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া পড়ে; এবং যে ভোগে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইতেছে, সে ভোগকে তো তার প্রিয়জনকে লইয়াই—জ্ঞানোন্মেষের পর হইতে যে প্রিয় তাহার গুরু, পিতা, সখা ও স্বামী। এই দুইটী প্রবল প্রতিকূল কারণ থাকা সত্ত্বেও নারী ভোগের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, এ কি নারীর অন্তরের কথা?

এখন নারী আর পুরুষের শিক্ষার দুইটি দিক নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া বল, শাস্ত্রকার অবিচার করিলেন কোথায়। হিন্দুর এই সব বিধি-ব্যবস্থায় যে অসাধারণ নরচরিত্র-জ্ঞান ও দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।

এই ব্যবস্থারই একটা অনুবৃত্তি কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের দেশে চলিয়া আসিয়াছিল। ঠিক আর্যমতের না হইলেও সেটাও সুন্দর। অল্পবয়সে দুটীর বিবাহ হইয়া গেল; তারপর ছেলে চলিয়া গেল গুরুগৃহে; মেয়ে থাকিল পতি-গৃহে; সংসার-জীবনে দুয়েরই শিক্ষানবীশী চলিতে লাগিল। তারপর পরিপূর্ণ যৌবনে দুয়ে মিলিয়া ঘরসংসার পাতিল। বোধ হয় যৌবন-মিলনের মাদকতা স্মরণ করিয়া কেহ কেহ এই ব্যবস্থায় নিমরাজী হইবেন। কিন্তু ইহাতে দুইটী আপত্তি—বয়সের একান্ত সন্নিকর্ষ, দ্বিতীয়তঃ নারীকে আপন হাতে গড়িয়া তুলিবার পুরুষোচিত আকাঙ্ক্ষার অপরিতৃপ্তি। তবুও এ ব্যবস্থায় পুরুষ ও নারী উভয়কেই পরার্থপরতা শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকায় ইহা একান্ত অশ্রদ্ধেয় নহে।

এ প্রসঙ্গে বলিবার অনেক কথাই আছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক উঠিবে জানি; তর্কের জবাবও আছে। সে সমস্ত কথা তুলিয়া পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। কেবল একটা কথা বলিয়া রাখি, কায়মনোবাক্যে যাহারা সংযত নহে, সংযম ও তপস্যাই হিন্দুর সমগ্র মনোজীবনের নিয়ামক, এই কথা যাহারা বোঝে না, ধারণা করিতে পারে না, তাহাদিগকে হিন্দুর যৌনব্যবস্থায় যুক্তি-যুক্ততা বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা। (ক্রমশঃ)

তন্ময়

—•—

তন্ময়াঃ—একান্ত ভজনের ফল তন্ময়ত্ব। তন্ময়ত্ব স্মৃতি না বিস্মৃতি? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। তবুও ধারা ধরাইয়া দিবার জন্য দু'চার কথা বলি।

আগে তত্ত্বটা বোঝ। একটা অহংএর ধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। তার যে সবটুকুই স্মৃতি, তা নয়; স্মৃতিতে-বিস্মৃতিতে মিলিয়া সে এক অপরূপ অনুভব। মানুষ "আমি-আমি" করে

বটে এবং তার দরুণ ভাল লোকের কাছে খোঁটাও খায়, কিন্তু বাস্তবিক তার 'আমি'টাকেও কি সে জাগাইয়া রাখিতে পারে? জীবনের কয়টা কাজ তুমি সচেতন হইয়া কর?—আছ মোহাচ্ছন্ন হইয়া—আঁধার হইতে অজানার স্রোত আসিয়া তোমায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে—কখন কি কর, কখন কি বল, তাহার হিসাবও রাখ না।

কিন্তু এই অভিভূত ভাবের একটা বেদনা আছে। ভোর হইয়া গেলে যেমন ঘুম একেবারে ছাড়িয়া যায় না, অথচ বিছানায় পড়িয়া থাকিতেও ইচ্ছা হয় না, এমনিতর একটা অস্বস্তির ভাব মানুষকে ছাইয়া ফেলে। যদি পূর্ব্বের অবস্থাটাকে বলি বিস্মৃতি, এইটা তাহা হইলে স্মৃতির পূর্ব্বরাগ। তখন আমাকে অর্থাৎ আমি বলিয়া চিনিয়া রাখিয়াছি এই যে দেহ মনকে—আর ভাল লাগে না। আমার জানার বাহিরে কিছু আছে কিনা, তাহার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।

আছে নিশ্চয়ই, কেননা আছে কি না, এই জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যয় জন্মিয়া যায়, নিশ্চয়ই আছে, নহিলে বাঁচিব কেমন করিয়া! কিন্তু যে আছে, সে কেমন? ঠিক তাহা জানি না, কিন্তু এখানে আমার যাহা অভাব, তাহার পূরণ হইয়া আছে সেখানে, এইটুকু বিশ্বাস হয়। এই আশা এবং বিশ্বাস লইয়াই কল্পনায় একটা মূর্ত্তি গড়িয়া তুলি এবং দিনের পর দিন প্রাণের ঐকান্তিকতা ঢালিয়া সেই মূর্ত্তিকে সজীব করিয়া তুলি। জানার বাহিরে অজানার মাঝে যখন এমনি করিয়া আমারই আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়া একটা নূতনতর আমি গড়িয়া তুলি, তখনই আমার বাস্তব আমির যথার্থ পরিচয় ঘটিবার সুযোগ হয়। সেই কল্পিত আমির সহিত বাস্তব আমির একটা সমন্বয় ঘটাইবার জন্য যে ব্যাকুলতা, তাহাই ভক্তির আকার ধরিয়া ফুটিয়া উঠে। ভক্তিতে যেন আমি আমাকেই আবার ফিরিয়া পাই। যাহা ছিল এতদিন বিস্মৃতির অতলে, আজ স্মৃতি দিয়া তাহাকে আলোড়িত করিয়া তুলি, তাহার মাঝে যাহা অবান্তর, তাহা বাছিয়া ফেলি, যাহা সমঞ্জস তাহা খুঁজিয়া বাহির করি। এইরূপে দিনের পর দিন স্মৃতির সহায়ে আমার রূপান্তর ঘটাইতে থাকি। তারপর একদিন হয়ত এমন হয়, যখন আমার স্বপ্নদৃষ্ট কাল্পনিক সত্তাই বাস্তব হইয়া উঠে। এতদিন যাহাকে বাস্তব বলিয়া লালন করিয়া আসিয়াছি, তাহা কোথায় মিলাইয়া যায়।

এই যে রূপান্তর, ইহা ভিতরে যতটা ফুটিয়া উঠে, বাহিরে ততটা ফোটে না। একেবারে যে কিছু ফোটে না, সে কথা বলিতেছি না; কিন্তু তাহাকে না ফুটিতে দেওয়াই রূপান্তরকে সহজ করিয়া তোলা। এমনও হইতে পারে, একজনের বাহির দেখিয়া কিছুতেই ঠাহর করিতে পারিতেছি না যে মানুষটা অন্তরে অন্তরে একেবারে আর একটা মানুষ হইয়া গিয়াছে। ইহাই তন্ময়ত্বের নিশানা। যে তন্ময়, সে নিজকে খুঁজিয়া পায় না, অপরে যে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, সে পথও রাখে না। সে এই আমাদের মতনই মাটীর মানুষ, কিন্তু একেবারে পুরোপুরি সহজ মানুষ।

সহজ মানুষ কাহাকে বলি? তুমি-আমি সহজ নই, কেননা আমাদের রূপান্তর সিদ্ধ নয়, সাধ্য। তোমার আমার মাঝে এখনও একটা কিছু হইতেছে, একটা আবর্ত্তন চলিতেছে; আমরা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নই, অতএব দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আমরা সঙ্কুল। ইহাকে সহজ বলি কি করিয়া? মানুষ সহজ হয়, যখন তাহার বিবর্ত্তনের শেষ ধাপে

গিয়া সে পৌঁছায়। সমস্ত শক্তির বিকাশে ও পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে সে যখন অটল—তখনই সে সহজ—মানুষ।

অন্তরের অব্যক্ত ব্যাকুলতাকে স্ফুট আকার দিয়া যাহারা নিজেদের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটাইতে পারিয়াছে, তাহারাই তন্ময়, তাহারাই সহজ মানুষ। তাহারা স্বচ্ছ, চিন্ময়।

এমনিতর একটী সহজ মানুষ গড়িয়া তুলিবার জন্য যুগ-যুগান্তর ধরিয়া প্রকৃতির কি আকুল তপস্যাই চলিতেছে! ভোগী যতই স্পর্দ্ধা করুক না কেন, তপস্যার বিরাম নাই এ জগতে। বারবার রাজার মুকুট তপস্বীর পায়ে লুটাইয়া পড়িতেছে। রাজার শক্তি আছে, দণ্ড আছে, তপস্বীর কি আছে? তবুও রাজা তাহার পদানত। শক্তিমদমত্ততা ক্ষণিকের, কিন্তু অপ্রমত্ত প্রশান্তি চিরন্তত। ইহাই তপস্যার ফল।

বিক্ষুব্ধ, মদমত্ত জগতের বুকে এমনিতর প্রশান্তি যে দিন ফুটিয়া উঠে, সে দিন কি হয়? —ঋষি বলেন—

মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি—পিতৃগণ সেদিন আমোদিত হন, দেবতারা নৃত্য করেন, এই পৃথিবীও সেদিন সনাথা হয়। দ্যুলোকে, ভূলোকে, অন্তরীক্ষে সেদিন সাড়া পড়িয়া যায়—ত্রিভুবনের মহামহোৎসব সে তিথিতে।

এ সব কথা আজ ভাবুকতা বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু এ তো ভাবুকতা নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। অন্তর্মুখী না হইতে পারিলে মানুষ বুঝিতে পারে না, তাহার আত্মীয়তার পরিধি কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইন্দ্রিয়াতুর মানুষ যাহা স্থূলে দেখে, স্থূলে শোনে তাহাই বোঝে; অন্তরের ভাব সে জানে না, বোঝে না। কিন্তু চিত্তের একাগ্রতায় সর্ব্বভূতের হৃদয়ে হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত এই অন্তর্জ্জগৎই ফুটিয়া ওঠে—দেবতা হয় মানুষের পরমাত্মীয়। একদিন দেবতায় মানুষে প্রীতির বিনিময় এত সহজ ছিল যে উভয়কে মনে হইল একই সত্তার এপিঠ আর ওপিঠ। আজ একাগ্র-সাধনা হইতে আমরা এমন করিয়াই চ্যুত হইয়াছি যে সে সব কথা ঐন্দ্রজালিকের স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখনও পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে—অন্তরে যাহার অস্ফুট বাণী তোমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে, তাহার ভাষাকে স্পষ্ট করিয়া তোল—অন্তশ্চর স্বরূপে তন্ময় হইয়া যাও—ত্রিলোকে আনন্দের বন্যা বহিয়া যাইবে।

শিষ্যের মন্ত্র

কাকে বিদ্যাদান করতে হবে? বেদ বলেছেন—

বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম
গোপায় মা শেবধিষ্টে হহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবে হযতায়
ন মা ব্রূয়া বীর্য্যবতী যথা স্যাম।

—বিদ্যা ব্রাহ্মণের কাছে এসে বললেন, আমি তোমার নিধি—অন্তরের ধন; যার তার হাতে আমায় তুলে দিও না, আমায় সঙ্গোপন রেখো। পরের উন্নতি যে সইতে পারে না, মন যার কুটিল, চরিত্রে যার সংযম নেই, তার কাছে

আমার কথা বলো না—তবেই আমি তোমার হৃদয়ে থেকে বীর্য্যবতী হব।

তারপর শিষ্যকে সম্বোধন করে বেদ বলেছেন—

য আতৃণত্ত্যবিতথেন কর্ণা-
বদুঃখং কুর্ব্বন্নমৃতং সংপ্রযচ্ছন্।
তং মন্যেত পিতরং মাতরঞ্চ
তস্মিন্ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহ॥

—যিনি সত্যবাণী দ্বারা তোমার দুটী কর্ণকে পূরিত করেছেন, কখনো তোমাকে যিনি দুঃখ দেন নি, তোমায় অমৃতের অধিকারী করেছেন, মনে করবে, তিনিই তোমার পিতা, তিনিই তোমার মাতা কখনও তাঁর দ্রোহ করবে না।

যে শিষ্য বিপরীতবুদ্ধি, তার সম্বন্ধে বেদ বলছেন—

অধ্যাপিতা যে গুরুং নাদ্রিয়ন্তে
বিপ্রা বাচা মনসা কর্ম্মণা বা।
যথৈব তে ন গুরো র্ভোজনীয়া-
স্তথৈব তান্ন ভুনক্তি শ্রুতং যৎ॥

—যারা গুরুর কাছে বিদ্যা গ্রহণ করেও কায়মনোবাক্যে তাঁর সৎকার করে না, একদিকে তারা যেমন গুরুর ভোগে লাগে না, আর এক দিকে তেমনি তারা যা শুনেছে, তাও ধরে রাখতে পারে না।

শিষ্যের আদর্শ কি তাই উল্লেখ করে বেদ বলছেন—

যমেব বিদ্যাঃ শুচিমপ্রমত্তং
মেধাবিনং ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নম্।
যস্তে ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহ
তস্মৈ মা ব্রূয়া নিধিপায় ব্রহ্মন্!

—বিদ্যা বলছেন, হে আচার্য্য, তোমার শিষ্যদের মাঝে যাকে তুমি জানছ এ ছেলেটী শুচি, তোমার উপদেশ হতে স্খলিত হয় নি, যে মেধাবী এবং ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত, যে কখনও তোমার দ্রোহ করেনি, তার কাছে তুমি আমার কথা বলো; তোমার অন্তরের ধন সেই রক্ষা করতে পারবে।

তপোবনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আচার্য্য উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করছেন তাঁর প্রাণ হতেও প্রিয় আপন জনকে—

আ মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বিমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্রমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা!

—চারিদিক থেকে ছুটে আসুক ব্রহ্মচারীরা আমার কাছে—ফুটিয়ে তুলুক এই তপোবনে —বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, শম এবং দম!

যথাপঃ প্রবতা যন্তি, যথা মাসা অহর্জরম্, এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা।

—হে ভগবন্, হে বিধাতঃ, জল যেমন নীচের দিকে বয়ে যায়, মাসগুলি যেমন সংবৎসরের মাঝে মিলিয়া যায় তেমনি চারিদিকে ব্রহ্মচারীরা আমার কাছে ছুটে আসুক্—স্বাহা!

শিষ্য যেমন গুরুকে আত্মদান করেন, গুরুও তেমনি শিষ্যকে আত্মদান করে থাকেন। বেদ জলন্ত ভাষায় এই ঐক্যের উপনিষৎ ঘোষণা করছেন—

সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ।...
আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্, অন্তেবাসী উত্তররূপম্।
বিদ্যা সন্ধিঃ। প্রবচনং সন্ধানম্।...

—মিলনের রহস্য ব্যাখ্যা করছি। আচার্য্য পূর্ব্বরূপ; শিষ্য উত্তররূপ। বিদ্যা সন্ধি (ফল) এবং বিদ্যার উপদেশই সন্ধান (ক্রিয়া)। (উপমাটী ব্যাকরণ সম্পর্কে।)

আচার্য্য ও অন্তেবাসীর এই মিলনের কথা নানা ভঙ্গীতে বেদ বর্ণনা করছেন—

সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ।

—আমরা উভয়ে ব্রহ্মের শরণাগত। ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে একত্র রক্ষা করুন। আমরা তাঁকে আত্মদান করেছি, অতএব তিনি আমাদের উভয়কেই একত্র ভোগ করুন। তাঁর স্পর্শে আমাদের মাঝে বীর্য্য প্রকাশ পাবে; সেই বীর্য্যকে আমরা উভয়েই একত্র বীরকর্ম্মে যেন সার্থক করি। সেই বীর্য্যবলে আমরা যা কিছু অধিগত করব, তা যেন আমাদের উভয়ের পক্ষে তেজস্কর হয়। —এবং শেষ প্রার্থনা, দুঃসহ তেজের স্ফুরণে পরস্পরকে পরস্পরের অসহন বলে মনে হতে পারে, আমাদের যেন তা না হয়, আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্।

—বিদ্যার নিমিত্ত যে আমাদের প্রতিষ্ঠা, তা যেন আমাদের উভয়ের একত্র হয়। আমাদের ব্রহ্মতেজ লাভও যেন একত্রই হয়।

বেদাধ্যয়নের অন্তে অন্তেবাসীর প্রতি গুরুর এই উপদেশ—

সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যং। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।

—সত্য বলো। ধর্ম্মাচরণ করো। স্বাধ্যায়ের অধ্যয়ন হতে কখনও বিচ্যুত হয়ো না (অর্থাৎ বিদ্যালয় হতে ছাড়া পেয়েই পড়াশুনা খতম হলো মনে করো না।) আচার্য্য যা ভালবাসেন, তা তাঁকে দক্ষিণা-স্বরূপ দিয়ে তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বেড়িও না —সৃষ্টি-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রাখবার জন্য ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ করো। সত্য হতে কখনও বিচলিত হয়ো না। ধর্ম্ম হতে বিচলিত হয়ো না। কল্যাণ হতে বিচলিত হয়ো না। যাতে তোমার এবং অপরের অভ্যুদয় হয়, এমন চেষ্টা হতে বিরত হয়ো না। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা কখনও ছেড়ে দিও না।

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতরাণি।

—মাতাকেই জানবে দেবতা। পিতাকেই জানবে দেবতা। আচার্য্যকেই জানবে দেবতা। অতিথিকেই জানবে দেবতা। যে কাজে কোথাও খুঁৎ নেই, এমন কাজই করবে, অন্য কাজ করবে না। আমরা এখানে যা আচরণ করে দেখিয়েছি, তুমিই তাই আজীবন আঁকড়ে থাকবে, অপর আচরণ করবে না।

যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ, তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।

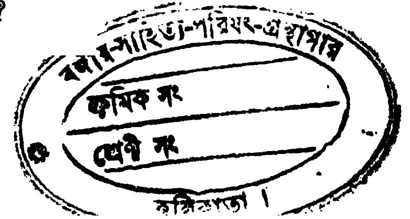
—আমাদের চেয়েও বড় কোনও ব্রাহ্মণ যদি থাকেন, তবে তাঁকে আসন দিয়ে তুমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। কাউকে কিছু দিতে হয় তো শ্রদ্ধাসহকারে দেবে। অশ্রদ্ধা করে কখনও দিও না। তোমার দানে যেন শ্রী থাকে, লজ্জা থাকে, ভয় থাকে, সংবিদ্ থাকে।

অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ, যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ, যুক্তাঃ, আযুক্তাঃ, অলুক্ষা, ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্, তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনো, যুক্তাঃ, আযুক্তাঃ, অলুক্ষাঃ, ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ, যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্, তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষদ্। এতদনুশাসনম্। এতমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্।

—যদি কখনও কোনও কাজ সম্বন্ধে বা আচরণ সম্বন্ধে তোমার সংশয় আসে, তাহলে তুমি যেখানে আছ, সেখানে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বিশেষ চিন্তাশীল, যাঁরা যুক্তিযুক্ত ভাবনায় অভ্যস্ত, যাঁরা করিতকর্ম্মা এবং অভিজ্ঞ, যাঁরা মৃদু-স্বভাব, যাঁরা ধর্ম্ম চেয়ে চলেন, তাঁরা সে ব্যাপারে যেমন ভাবে চলেন, তুমিও তেমনি চলবে। তাঁরা যা বলে দিলেন, তাতেও যদি আবার সংশয় হয়, তাহলে আবারও তাঁদের আচরণেরই অনুরূপ আচরণ করবে (অর্থাৎ সাধুর আদর্শকে কখনও লঙ্ঘন করবে না।) এই হচ্ছে আদেশ। এই আমার উপদেশ। বেদের রহস্য এই। আচার্য্যের অনুশাসনও এই। তুমিও এই মেনেই চল্‌বে। এই মেনেই তোমার চলা উচিত।

ঋষির হৃদয়ে উদ্ভাসিত এই তো শিক্ষার সঞ্জীবন মন্ত্র।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পিতৃপুরুষেরা সম্মুখে যে উদার পন্থা প্রসারিত দেখে সেই পথে চল্‌তে সকলকে আহ্বান করেছিলেন, সেই সরল ও সনাতন পন্থা আমরা আজ উপেক্ষা করব ?



হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাবা কালীকম্বলীওয়ালার সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল হৃষীকেশ। তাঁর দুই শিষ্য—রামানন্দজী ও আত্মপ্রকাশজী। তাঁরা দুজনেই হৃষীকেশে থেকে পঞ্চায়েতী ছত্রের সুব্যবস্থা করছেন। বাবা কালীকম্বলীওয়ালার দেহত্যাগের পর উভয়ের মতান্তর হওয়াতে আত্মপ্রকাশজী হৃষীকেশের উত্তরে, কৈলাসাশ্রমের গঙ্গার অপর পারে, নীলকণ্ঠ পর্ব্বতের নীচে স্বর্গাশ্রম নাম দিয়ে একটী অপূর্ব্ব তপোবন করেছেন। প্রায় দু' মাইল ব্যাপী তাঁর আশ্রম। উত্তর দিকে ক্রমে লছমনঝোলার পুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাতে তিন চারশত ছোট-ছোট পাকা দালান তুলে কোন কোন ঘরে দুটী কোঠা, কোনটাতে বা একটী কোঠা করে দিয়ে সাধকদের সাধনের সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটী ঘর ১০০ গজ দূরে গাছের ছায়ায় পাহাড়ের স্তরে-স্তরে সজ্জিত। পাশেই ভাগীরথী ভীষণ রবে আপন মনে গন্তব্য পথে চলেছেন। ফুল-ফলের গাছও যথেষ্ট আছে। পূর্ব্বপার্শ্বে নীলকণ্ঠ পর্ব্বতের শিখরে শ্রীশ্রীনীলকণ্ঠ মহাদেব বিরাজ করছেন, উত্তর দিকে অভ্রভেদী হিমালয়

এবং বদরিকাশ্রমের রাস্তা, পশ্চিম পার্শ্বেই গঙ্গা, গঙ্গার পশ্চিম পারে উত্তর দিকে লছমনঝোলা, লক্ষ্মণজীর মন্দির, লক্ষ্মণকুণ্ড, ধ্রুবের মন্দির; ক্রমে দক্ষিণ দিকে কেদার-বদরীর রাস্তার উপর শত্রুঘ্নজীর মন্দির, স্বামী রামতীর্থের আশ্রম, কৈলাস আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। স্থানটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও নির্ম্মল জলবায়ুর গুণে প্রাণে স্বতঃই একটী পবিত্র ভাবের উদয় হয়ে থাকে।

স্বর্গাশ্রমে যাবার দু'টী রাস্তা আছে; স্বামী রামতীর্থের আশ্রমের সামনেই নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে স্বর্গাশ্রম অথবা লছমনঝোলার উজান হতে ক্রমে দক্ষিণ দিকে রওনা হলেই স্বর্গাশ্রম। পারাপারের জন্য প্রায় ৫০।৬০ খান বড় বড় নৌকা শেঠবাহাদুর সুরযমলজীর খরচে চলছে। দক্ষিণ দিকে হৃষীকেশের তপোবন, বাবা কালী-কম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালা, ছত্রশালা প্রভৃতি। আত্ম প্রকাশজী ও রামনাথজী এখনও জীবিত আছেন। আত্মপ্রকাশজী সেখানেও সাধন-ভজনের জন্য সকল রকম সুবন্দোবস্ত করেছেন। ঘর খালি থাকলেই যে কেউ যেয়ে সে ঘরে থাকতে পারেন, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না। দু'বেলাই সেখানে ছত্রশালায় খাবার জিনিষ পাওয়া যায়। এ ছত্র-শালাও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় বহু ধনকুবের এ ছত্রশালায় এবং স্বর্গাশ্রমে অজস্র অর্থ দান করে হিন্দুর গৌরব রক্ষা করে সাধুদের সাধনের সহায়তা করছেন।

আত্মপ্রকাশজীর আর একটী সুমনোরম উদ্যান লছমনঝোলা হতে ২ মাইল দূরবর্ত্তী কেদার-বদরী পথের উপর গরুড় চটীতে দেখেছি। তাতে অসংখ্য ফুল-ফলের গাছ ও ধর্ম্মশালা আছে। ধর্ম্ম-শালার পাশেই ঝরণার জল আছে, সেখানে আম, কলা, পেঁপে, ডালিম প্রভৃতির গাছে পরি-পূর্ণ। ফুলের গাছের ত কথাই নাই। নীচেই ভাগীরথী। স্থানটী অতীব মনোরম। গরুড় মহারাজের একটী মন্দিরও সেখানে আছে।

উত্তরাখণ্ডের পথে বাবা কালীকম্বলীওয়ালার যে সকল ধর্ম্মশালা বা ছত্রশালা আছে, তা উক্ত মহাত্মার অন্যতম শিষ্য রামনাথজীর তত্ত্বাবধানে চলছে। এ সব প্রতিষ্ঠানের নাম "কালীকম্বলী-ওয়ালা রামনাথজী।" হিমালয়ের উত্তরাখণ্ডের পথে উক্ত মহাত্মাজীর সদাব্রতের চিঠি নিতে পারলে থাকার এবং খাওয়ার জিনিষ পাবার সুবিধা হয়। তাঁর আদেশে উত্তরাখণ্ডে ৫০।৬০টী ধর্ম্মশালা, ছত্রশালা চলছে। চিঠি না নিয়ে গেলে সে সব ছত্রশালায় খাবার মিলবে না। ও সব জায়গায় জিনিষপত্রাদির দাম অত্যন্ত বেশী। চিঠি ছাড়া সেখানে সদাব্রত খুললে প্রায় সকলেই ভিখারী সেজে সদাব্রত নেবে, তাতে কাজের নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা হয়ে পড়বে। অধিকন্তু ছত্রের ম্যানেজার জিনিষপত্র বিক্রী করে আত্মসাৎ করে কি সদাব্রত দেয়, তার কোন হিসাব পাওয়া যাবে না বলেই সদাব্রতের চিঠির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক একখানা চিঠি এক এক স্থানের, তাতে কি কি জিনিষ দিতে হবে, সব ছাপান আছে। সেই চিঠিখানা নিয়ে সেখানে পৌছলেই বিনা বাক্যব্যয়ে জিনিষপত্র পেয়ে যাবেন। অবশ্য এ সব চিঠি সাধু-সন্ন্যাসী ও গরীব-দুঃখীরাই পেয়ে থাকেন। আমরা সদাব্রতের চিঠি নেবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম, প্রত্যহই দু'বেলা মহাত্মার ছত্রে চিঠির জন্য যেতাম। হিমালয়ের পথ এখনও পরিষ্কার হয়নি বলে এবং ছত্রশালায় এখনও সদাব্রতের জিনিবপত্র, অর্থাৎ আটা, চাল, ডাল, ঘি, লবণ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পাঠাতে পারা যায়নি বলে এখনও চিঠি পাওয়া যাচ্ছে না। এবার কুম্ভ উপলক্ষে বহু যাত্রী কেদার-বদরীর পথে

যাবার জন্য এখানে জমায়েত হয়েছে। পুলিশের ব্যবস্থায় বেশী লোক যেতে পারছে না, কাজেই মনে হত যেন হরিদ্বারের কুম্ভমেলা এখানে উঠে এসেছে। রোজ দু'বেলা হাজার গরীব, দুঃখী, কম্বলীওয়ালার ছত্রে গিয়ে সদাব্রতের চিঠির জন্য কলরব করত! আমরাও প্রত্যহ যেতাম এবং এক কোণে চুপ করে থেকে সাধারণের কোলাহল শুনতাম। কোনদিন বা হরিদাস ভায়ার সঙ্গে গঙ্গার কলকল নাদের সাথে সুর মিলিয়ে বিভোর হয়ে গাইতাম—

ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ!
তুমি হে দেবেশ, পরম পুরুষ,
ত্রিগুণে ব্যাপ্ত, আছ ত্রিজগত,
সন্ধ্যা পূজা বন্দনা, সকলি তোমার উপাসনা,
এ মোহন বিশ্ব, সুন্দর দৃশ্য
তুমি ত করেছ প্রভু রচনা॥
ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ॥
গঙ্গা ভাগীরথী, সপ্ত সমুদ্র,
ব্রহ্মা পুরন্দর, তুমি হে রুদ্র,
তুমি আদি কল্প, তোমাতেই সঙ্কল্প,
তোমাতেই হয় সব অচ্ছিদ্র॥
বিন্ধ্য নীলগিরি, সুমেরু ধবল,
মন্দার গিরিরাজ, তুমি হিমাচল,
উর্দ্ধে গগনে, তারকা তপনে,
চন্দ্র কিরণে আছ জ্যোতির্ব্বৎ॥
ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ!
তন্ত্রে মন্ত্রে, গীতা ভাগবতে,
বায়ুরূপে আছ হরি জীবন দেহেতে,
তুমি বিশ্বব্যাপী, তুমি বহুরূপী,
তোমাকেই করি প্রভু দণ্ডবৎ॥
ওঁ হরি ওঁ, ওঁ তৎ সৎ॥

হায়! সে দিন কি আর ফিরে আসবে? যে দিন বিশ্বের সমুদয় ভুলে প্রকৃতির অনাহত নাদে মনপ্রাণ মাতিয়ে, অপ্রাকৃত তপোবনে, পতিতপাবনী, ত্রিভুবনতারিণী মা ভাগিরথীর কোলে বসে, আপনহারা হয়ে এমনি করে গান করতে পারব! ঝঙ্কারে আকাশ, বাতাস, জল, স্থল, পশু, পাখী সবই বিভোর হয়ে যাবে! পুনঃপুনঃ হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করে সমস্ত দিনই কেবল মনে বাজবে—

"তুমি বিশ্বব্যাপী, তুমি বহুরূপী
তোমাকেই করি প্রভু দণ্ডবৎ!"

* * *

হিমালয়ের অন্যান্য ছত্রগুলি যত দিন যাত্রী চলাচল করে ততদিন চলে, কিন্তু বাবা কালী-কম্বলীওয়ালার ছত্র, হৃষীকেশের ও উত্তরকাশীর ছত্র বার মাস খোলা থেকে সর্ব্বসাধারণের উপকার করছে। যারা সদাব্রতের চিঠি নেন না, তাঁরা ইচ্ছা করলে ধর্ম্মশালায় থাকার জন্য চিঠি নিতে পারেন। চিঠি থাকলে ধর্ম্মশালায় থাকার কোন অসুবিধাই হয় না, নতুবা ধর্ম্মশালার ম্যানেজারেরা বড়ই রূঢ় ব্যবহার করে। অত্যধিক শীতপ্রধান স্থানে গরীব দুঃখীদের জন্য কম্বল কর্জ্জও দেওয়া হয়। অনেক লোক সে সব কম্বল নিয়ে পালিয়ে যায় বলে আজকাল একটু কড়াকড়ি নিয়ম হয়েছে। স্থানে স্থানে চিকিৎসার জন্য উক্ত মহাত্মারই প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য-চিকিৎসালয়ও আছে। বিদ্যার্থীদের অধ্যয়ন করার জন্য হৃষীকেশে অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। বিদ্যার্থীকেই সর্ব্বপ্রকার খরচ বহন করতে হয়। হৃষীকেশে কেদার-বদরীর পথের উপর প্রকাণ্ড বাড়ীতে বাবা কালীকম্বলীওয়ালার ব্রহ্মচর্য্য-স্কুলও আছে। স্কুলটী অবৈতনিক। (ক্রমশঃ)

কোন পথে ?

—•—

যা পাবার তা অলক্ষ্যে এসে আমাকে পূর্ণ করে দেবেই। বুঝি না বলেই অসময়ে একটা কিছু পেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার বাসনা জাগে। আদি-অন্ত সবই যদি আমার জানা থাকে, তবেই একটা সামঞ্জস্য করে নিতে পারি; যেক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠে না, সেখানেই যত ব্যাকুলতা আর বৃথা আস্ফালন।

"যা পাবার তা একদিন পাবই" এ আশাটুকু নিয়ে সকলেই যে নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাটাতে পারে, তা মনে হয় না। আবার জীবনে এই দৃঢ় বিশ্বাস, এই অবিচলিত আত্ম-প্রত্যয়টুকু আনবার জন্যই যত সাধন-ভজন, তপস্যা সংযম। গুরুর কাছে এসে হাজির হতেই বললেন "তোদের সাধন নেই, ভজন নেই, তোরা মুক্ত। অনাসক্ত হয়ে আমার জন্য প্রাণ ঢেলে কর্ম্ম করে যা। যা পাওয়ার তা নিশ্চয়ই পেয়ে যাবি" এ কথা শুনেও যে নিজের ব্যক্তিগত স্পৃহা ও সাধন-ভজনের স্বাতন্ত্র্য পাওয়ার ইচ্ছা ছাড়তে পারি না, এতেই বুঝি *ঠিক ঠিক* নির্ভরতা এখনও আসেনি।

মানুষ ঠেকেই শিখে। যিনি সত্যলাভ করেছেন তাঁকে জীবনে বহু দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ অতিক্রম করে যেতে হয়েছে। সবাইকে অতিক্রম করে গিয়েছেন বলেই সবার খবরই তিনি দিতে পারেন।

হতাশ, হয়ে কখনো ভেবেছি আচ্ছা, শুনবামাত্রই কেন বিশ্বাস হতে চায় না? পরে বুঝেছি, এখনও খোঁজা শেষ হয়নি, ধারণা রয়েছে নিজের ইচ্ছাতেই একটা কিছু ঘটিয়ে তুলতে পারব। আবার দু'দিন পর বুদ্ধি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যা ভাবি হয়ে পড়ে তার উল্টো, তখন বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হয়, আমার ব্যষ্টি ইচ্ছার ওপর একটা সমষ্টি ইচ্ছার কল্যাণময়ী শক্তি রয়েছে। না চেয়েও যে পাই, এ তারই নিদর্শন। এ জায়গায় স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন জাগে "তবে সাধন-ভজনের প্রয়োজন কি?" তারও মীমাংসা পেয়েছি "সাধন-ভজন করাই—সাধন-ভজন করে যে কিছু হয় না তা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে।" জ্ঞানীর কর্ম্মত্যাগের মাঝে এ রহস্যটুকুই গুপ্ত রয়েছে। না বুঝে লোকের কথায় সাময়িক উত্তেজনায় তাঁরা একটা কিছুকে ধরেনও না, আবার সহজে ছাড়েনও না। সবই বিচার করে করেন বলে কোন জায়গাতেই তাঁদের ঠক্‌তে হয় না।

নিঃশেষে তাঁর আপন জন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁর কথায় সংশয় তো আসবেই। কিন্তু একে মন্দ বা ক্ষতিকর বলব কি করে? এ বেদনাটুকু আমাদের মাঝে রেখে দিয়েছেন বলেই তো তাঁকে ভাল করে চিনে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা, অন্তহীন ব্যাকুলতা সকলের মাঝেই দেখতে পাই। বুঝ্‌তে পারি না বলে, মীমাংসা হয়ে ওঠে না বলে, হতাশ হয়ে জড়ের মত বসে থাক্‌তেও তো পারি না। তখন যে নূতন উদ্দীপনায় প্রাণ ভরপূর হয়ে ওঠে, নূতন আলোকের অনুসন্ধানে অন্ধকারে থেকেও প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। কেন এমন হয়? ওপর থেকে তাঁর আকর্ষণ রয়েছে বলে। কাজেই সংশয়ী দেখে অবজ্ঞা করবার, ঘৃণার চক্ষে দেখার কার অধিকার আছে?

কোন শুভমুহূর্ত্তে যে তাঁর করুণা-রাশি অলক্ষ্যে এসে তিলে-তিলে হৃদয় পূর্ণ করতে থাক্‌বে তা আমরা জানি না আর যদি জানাই থাক্‌ত, তবে পরিশ্রম করে সাধ্য-সাধনার দ্বারা কিছু পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা মোটেই থাক্‌ত না।

ভগবান অসাধনের ধন, তাঁকে পেতে কোন সাধন-ভজন, কৃচ্ছ্র সাধন লাগে না—তিনি নিজে যেচে যাকে ধরা দেন, সেই কেবল দর্শন পেয়ে ধন্য হয়ে যায়।—বেশ সোজা কথা, অন্ততঃ অনেকের মুখেই তাই শুনি। কিন্তু তা বলে কি তপস্যা দ্বারা ইষ্টলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা মানুষের মাঝে একেবারে নিভে গিয়েছে? এখনও কত মহাপুরুষ কঠোর তপস্যায় জীবনপাত করছেন। এর মাঝে যদি বাস্তবিক কোন কিছু না থাক্‌বে তবে কতকগুলা মানুষের মনে তদনুযায়ী সংস্কারই বা কেন রয়েছে? তাঁদের অসীম কষ্টসহিষ্ণুতার, জীবনপাতী তপস্যার কি কোন সার্থকতা নেই?

যখন ভেদভাব থাকে তখনই আমার মাঝে কিছু পাওয়ার চেষ্টা জেগে ওঠে। সাধন-ভজন মানুষ এই জন্যই করে; এটা ত তো একটা দিক। আবার ব্রহ্মের সঙ্গে যাঁরা একাত্মতা উপলব্ধি করেছেন, তাঁরাই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ; তাঁদের মাঝে বিরহের দাহ, আশার আকুলতা কিছুরই স্থান নেই।

ওপরে যিনি উঠেছেন, যাঁর জ্ঞানদৃষ্টি খুলে গিয়েছে, তিনি কিন্তু কাউকে ভালও বলেন না, মন্দও বলেন না। তিনি দেখছেন দুটোই সত্য আবার দুটোই মিথ্যা। একদল বলছেন, না খেটে যেমন মাইনে পাওয়া যায় না, তেমনি সাধন-ভজন বিনে ভগবানের দর্শনও লাভ হয় না। এখানে শুধু দেনা-পাওনার সম্পর্ক। আরেক দল বলছেন, সাধন-ভজন আবার কি? ভগবান যে সাধনের অতীত. তাঁকে পেতে কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কোনটাকে খাঁটি বলব? যতই বিশ্লেষণ করতে যাই, ততই কেবল ফ্যাসাদে পড়ি। কার পক্ষে কোনটা যে খাঁটি এবং প্রকৃত সহায়ক, এ বলা বড় কঠিন। তবে মনের সঙ্গ বোঝাপড়া করে নিতে হয়, যে দিকে ঝোঁক বেশী সে দিকেই ঝুঁকে পড়তে হয়। সাধন-ভজনের সংস্কার তীব্র থাক্‌লে, হাজার বললেও সহজ পথ ছেড়ে সে, কুটিল পথেই চলবে। দুদিন আগে আর দুদিন পিছে, কিন্তু গুরু যা বলেন তা ঠিকই থাকে। আমিই শুধু দিন কতক বুদ্ধির পরিতৃপ্তির জন্য এ পথ ওপথ করে কেবল পথে পথে ঘুরে বেড়াই। সাধ যখন মিটে যায়, তখন দেখি গুরুর কথাই ঠিক! বিশ্বাস যদি সহজেই হয়ে যায়, স্বাভাবিকই মনে সংশয় না জাগে সে তো ভালই; কিন্তু যাঁরা সংশয় করে. সন্দেহ এনে নিজের স্পর্দ্ধায় আত্ম-নির্ভরের পথে তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করে চলছেন, তাঁদেরই বা মন্দ বলি কিসে? বিচার করে, যাচাই করে গ্রহণ করেন বলে তাঁদের শুষ্কজ্ঞানী বলে ঠেস্ দিয়ে কথা বলারও যে কি প্রয়োজন রয়েছে, তাও তো বুঝ্‌তে পারি না। রামকৃষ্ণদেব বলতেন "আমার ওপর শুধু বিশ্বাস কর"; পরমুহূর্ত্তেই আবার এও বলতেন "কেবল আমার কথায় মেনে নিবি কেন, আমায় যাচাই করে নে। হাঁড়ি যদি কিনবি তবে বাজিয়ে নে।" যদি মানতেই হয়, অজ্ঞ অবোধের মত মানব কেন? মরতে যদি হয় তবে একবার খুঁজেই বা দেখব না কেন? এ স্পর্দ্ধাটুকু থাকলে যা পাওয়ার তা তো লাভ হয়ই, মাঝ পথের কিছু আবর্জ্জনাও দূর হয়ে যায়।

লাভালাভ নিয়ে যদি কথা ওঠে, তা হলে বলতে হয়, বিশ্বাসে যত সহজে গন্তব্য-স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়, আর কিছুতেই তেমন নয়। কি জানি কার কুহকে পড়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মন বিগড়ে যায়—তাই সহজ পথ অবলম্বন করে যত সহজে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছে যাই, তার জন্যই শিষ্যের প্রতি গুরুর এ সহজ নির্দ্দেশ। অধিকারী বুঝে আবার বার বৎসর বনজঙ্গলে ঘোরার উপদেশও দেন, এও তো দেখতে পাই।

নির্ব্বিচারে বিশ্বাস হয়ে যায়, সে তো ভাল; নতুবা সংশয়ের পথেই চল না, তাতেই বা ক্ষতি কি? মোট কথা, না বুঝে মাঝ পথে হাল ছেড়ে বসো না। বুকে জোর থাকে তো নেমে পড়। প্রবঞ্চনা করে নিজেও মাঝে, গলদ রেখে আনাড়ির কথায় বিশ্বাস করার চেয়ে, সংশয় দিয়ে যদি স্তূপীকৃত মনের ময়লা দূর হয়ে যায় সে তো আরও ভাল কথা। চিত্তশুদ্ধি হওয়া তো প্রয়োজন? তা যে ভাবেই পার করে নাও না। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, উপায় যেন লক্ষ্যের কণ্টক হয়ে না দাঁড়ায়।

গুরু সার্ব্বভৌমভাবে একটা কথা বলছেন; তা তোমার মনে-প্রাণে না লাগলেও যে তখনকার জন্য গুরুবাক্যে বিশ্বাসের ভান করতে হবে, এ কেমন অদ্ভুত কথা! একটা কথা আছে যে বোকা হাসে তিনবার—একবার না বুঝে, আবার অপরের দেখাদেখি, শেষটায় বুঝে-সুজে। না বুঝে নিজের দোরে নিজে ঠেকে থাকতে যাব কেন?

এটাও দেখতে হবে "নড়ে-চড়ে বার, ঘরে বসে তের" এ কথাটা যাঁরা বেশ করে নড়ে-চড়ে দেখেছেন তাঁরাই বলতে পারেন, তাঁদের মুখেই এ কথাটা মানায়।

মোট কথা, যা কিছু করছ, মনের সঙ্গে মিলিয়ে সচেতন হয়ে কর, তবেই আর বেগ পেতে হবে না। সকলেরই যে একরকম সংস্কার, তা তো নয়।

কু সঙ্গ ?

"ও পাড়ার নগুকে চেন তো?"

"খুব চিনি। বিশেষতঃ আমাদের বাগানে লিচু পাক্‌তে সুরু হয়েছে। এমন সময় পরিচয়ের ন্যূনতাটুকু পূরণ করবার উৎসাহটা তার অসাধারণ হয়ে ওঠে!"

"আমি কিন্তু বিমলের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ছি।"

বিমল বন্ধুবরের ছেলের নাম। ভাল ছেলে বলে পাড়ায় তার খ্যাতি আছে; আবার বয়াটে বলে নগুরও পাড়ায় বেজায় অখ্যাতি। সুতরাং দুটী নাম একসঙ্গে ওঠাতে ব্যাপার কি, তা কথঞ্চিৎ অনুমান করা গেল।

তবু জিজ্ঞাসা করলাম, "কি রকম?"

"আজ ক'দিন ধরে দেখ্‌ছি, ছেলেটা ওই হতভাগাটার সঙ্গে মিশেছে।"

"কেমন করে জানলে?"

"জানই তো, এ সব বিষয়ে আমার অত্যন্ত কড়াকড়। পারৎপক্ষে আমি ছেলেকে এক্‌লা কোথাও যেতে দিই না, কিন্তু কি করে যে কি হলো, তা বল্‌তে পারি না, পর পর তিনদিন দেখ্‌লাম, ও ছোঁড়াটা আমাদের বাড়ীতে এসে বিমলের সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে তুলছে। এত করে আগলে রেখেও যে কোথা হতে—"

বাধা দিয়ে বল্‌লাম. "কিছু বলেছ না কি?"

"না, বলিনি এখনও। বল্‌ব বলে মনে করেছি। কিন্তু বিমলের ওপর আমার খুব বিশ্বাস ছিল! সে যে আমার শিক্ষা অগ্রাহ্য করে একটা অসৎ ছেলেকে এমনি করে প্রশ্রয় দিতে পারে, এটা স্বপ্নেও ভাবিনি। তাই মনটা বড় তিক্ত হয়ে আছে। আর সেই জন্যই পষ্টাপষ্টি একটা কিছু বল্‌তেও সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"কিছু বলনি, ভালই করেছ। কিন্তু ব্যাপারটাকে তুমি এত গুরুতর করে তুলছ কেন, বলত?

বন্ধু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন "এটা গুরুতর নয়? ছেলের সঙ্গ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বাপ-মা জেনে-শুনেও নিশ্চিন্ত থাকবে, বলছ?"

"নিশ্চিন্ত থাকতে বলছি না, কিন্তু সব সময় খারাপ দিকটা চিন্তা করবারই বা কোন্ সার্থকতা রয়েছে? মনের মাঝে অহরহঃ সংশয় জাগিয়ে রাখাটাই কি তুমি কল্যাণকামনার নিদর্শন বলে মনে কর?"

"কি করতে বল তুমি?"

"আমি বলি কি, কর্ত্তব্যটা তোমার ছেলের প্রতি তত নয়, যতটা তোমার নিজের প্রতি। নিজকে যদি সামলিয়ে রাখতে পার, ছেলেকে সামলিয়ে নেওয়া বিন্দুমাত্র কঠিন হবে না। এখন পর্য্যন্তও যে তুমি চুপ করে আছ, একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তোলনি, এটা তোমার খুবই বাহাদুরী মনে করি। সাধারণ বাপ-মা এতটা সহিষ্ণু হয় না। একটা ব্যাপার তলিয়ে বুঝতে হলে নিজকে তার মাঝে কল্পনায় দাঁড় করিয়ে বুঝতে হয়। তা হলে হয়ত ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য্যটা চোখে পড়ে।—আচ্ছা তুমি যে ওদের দেখতে পেয়েছ, ওরা তা জানে?"

"জানে।"

"কোনও ভাবান্তর দেখলে কি?"

"ও ছোঁড়াটা একটু থতমত খেয়ে গেল যেন। বিমলের কোনও ভাবান্তর দেখতে পেলাম বলে মনে হল না।—কিন্তু ও যে এমন বোকা, সর্ব্বনাশের কূলেও অমন নিরুদ্বেগে এসে দাঁড়াতে পারে, এতেই তো মনটা বিকল হয়ে পড়ে!"

"আমি বলি, ওইটাই শুভ লক্ষণ। নসীরাম যে চমকে উঠল, সেটা নিজের কথা তত ভেবে নয়, যত নাকি তোমাদের মত হিতাকাঙ্ক্ষীদের কথা ভেবে। ও বয়াটে, ও হতভাগা, ও লক্ষীছাড়া—এ বিশেষণগুলো আমরাই ওর হিতৈষণা-প্রণোদিত হয়ে নির্ব্বিচারে ওর প্রতি প্রয়োগ করে এসেছি। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'—ফলে ও আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেছে। প্রথম প্রথম আমরা জানতাম ও বয়াটে, এখন ও নিজেও জেনেছে ও বয়াটে। এতে দশের বিচারে যেমন ও ছোট হয়ে আছে, তেমনি নিজের কাছেও ছোট হয়ে গেছে। এর দরুণ তার মন যে পীড়া সঞ্চিত হয়েছে, আমাদের ওপর অত্যাচারের বাড়াবাড়িটা আমি মনে করি তারই তির্য্যক্ রূপ।"

বন্ধু বললেন, "ঠিক বুঝ্‌তে পারলাম না।"

"বোধ হয় লক্ষ্য করেছ, একটা ছেলের আচরণ সম্বন্ধে কূট মন্তব্য করলে তার জেদ্‌টা আরও বেড়ে যায়। কেন বল দেখি? ছোট হোক্, বড় হোক্, আত্মাভিমান সবার মাঝেই আছে—সবাই নিজকে ভাল বলে জানে। সেই ধারণাতে যখন তুমি রূঢ়ভাবে আঘাত দাও, তখন অন্তরাত্মা তার প্রতিবাদ করে। কিন্তু প্রতিবাদ করে যখন তোমায় আঁটতে পারে না তখনই সে জিঘাংসু হয়ে ওঠে। এমনি করে ঘাত-প্রতিঘাতে মন্দটাই বেড়ে চলে; অবশেষে এক দিন তার সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদটাই যথার্থতঃ সত্য হয়ে দাঁড়ায়।—বিমলকে আজ যেমন তোমার নিষ্কলুষ বলে মনে হচ্ছে, আমার বিশ্বাস নসীরামও একদিন এমনি নিষ্কলুষই ছিল। তার আদিম মনোবৃত্তির বিপরীত ভাষ্য করতে করতেই আজ তাকে আমরা ঠিক আমাদের মনের মত করে দাঁড় করিয়েছি।—এখন সে চিরকাল ধরে পরম উৎসাহে আমাদের হাড় জ্বালাতে থাকবে। তুমি যদি ইচ্ছা কর তো বিমলকেও হাড়জ্বালানো টাইপের করে তোলবার চুক্তি আমি নিতে পারি!"

বন্ধু একটুখানি বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন,

"তোমার থিয়োরীতে অনেকখানি সত্য আছে বলেই তো মনে হয়।—কিন্তু তবুও আমার ছেলের এমন জঘন্য রুচিই বা কেন হবে, সেটা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। আমার ব্যথাটাও ঠিক ওইখানেই।"

"ওইখানে তো তোমার ভুল হচ্ছে। মনে-প্রাণে যে নিষ্কলুষ, তার রুচি মূৰ্দ্ধণ্য কি জঘন্য, সে বিচার তো বাইরে থেকে হতে পারে না। তুমি ভাবছ, বিমল কেন নসীরামকে প্রশ্রয় দিল: কিন্তু এ কথাটা ভাবছ না কেন যে নসীরাম কেন বিমলের কাছে এল? একদিকের বিচারে তুমি যেটাকে বিমলের পরাভব বলে মনে করছ, আর এক দিক দিয়ে যে সেটাই মস্ত গৌরবের বিষয়। নসীরামের ভিতরকার ভাল ছেলেটার তোমরা গলা টিপে ধরলেও এখনও সে মরে যায়নি; তাই মাঝে মাঝে সে একটু আলো-বাতাসের জন্য হাঁপিয়ে ওঠে। আমার বিশ্বাস বিমলের মাঝে যে শুভ-শক্তির দ্যোতনা রয়েছে, তারই আকর্ষণে নসীরাম তার কাছে ছুটে আসে। তুমি অনুসন্ধান করে দেখো, অশুচিতাকে ক্ষালিত করে মানুষ যেমন শুচি হয়ে দেবমন্দিরে প্রবেশ করে, নসীরামও তেমনি শুচি-সংযত হয়েই বিমলের কাছে এসে দাঁড়ায়। যদিও সে আসে আত্মস্বার্থে, তা বলে বিমলকে ঠকাতে আসে না।"

"কি করে জানলে?"

"আমি জানি। একদিন ভাল ছেলে বলে আমারও খ্যাতি ছিল। কিন্তু সে ভালর মাঝে শুচিবাই ছিল না। তাই যারা ভাল ছেলে তারাও আমায় যেমন ভালবাসত, তেমনি যারা মন্দ ছেলে, তারাও আমায় ভালবাস্‌ত। ক্ষিতীশ বলে একটী ছেলে ছিল—লোকে বলত বজ্জাতিতে তার আর জুড়ী নাই। আমি কিন্তু কোনও দিন তার কোনও বজ্জাতি ধরতে পারি নি। একদিন তাদের আসর খুব জমে উঠেছে, এমন সময় আমি গিয়ে সেখানে হাজির। ক্ষিতীশ চোখ-মুখ ঘুরিয়ে কি বলছিল, আমি যেতেই অমনি চুপ হয়ে গেল। তারপর আমার দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌ল, তুই যা তো এখান থেকে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লাম, কেন? হঠাৎ সে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌ল, তুই যাবি কিনা এখান থেকে বল্! আমারও জেদ চড়ে গেল। বললাম, কেন তা না বললে কিছুতেই যাব না। ক্ষিতীশের চোখ দুটী ছল্‌ছল করতে লাগ্‌ল। আমার দুটী হাত ধরে মিনতির সুরে বল্‌ল, আমরা ভাই বয়ে গিয়েছি, আমাদের কোনও আশা ভরসা কেউ করে না। কিন্তু তোর মাঝে যদি কোথাও এতটুকু ছোঁয়াচ লাগে, তাহলে আমি আত্মহত্যা করব।...সেদিন ক্ষিতীশের কথা শুনে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম, কেননা তার অন্তরটা তলিয়ে বুঝবার মত বয়স তখন আমার হয় নি। তারপর আজ প্রায় ত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে—বয়াটে ক্ষিতীশের আর্ত্তির অর্থ এখন বুঝ্‌তে পেরেছি।"

কিছুক্ষণ ধরে দু'জনাই চুপ করে রইলাম। খানিকক্ষণ পরে বন্ধু বললেন "আমায় কি করতে বল, তাহলে?"

হেসে বল্‌লাম, "কিছু করতে বলি না, ভাবতে বলি।"

হিন্দু-সঙ্গীত

—*—

(বগুড়া—সাধারণ সভায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা পঠিত)

হেতুর্জগৎস্বাবহৃতের্ব্বিরাজয়ন্তী স্বযোগতোর্বীণাঃ।
জয়তি ব্যাপনশীলা শব্দাখ্যব্রহ্মশক্তিঃ সা॥

বন্ধুগণ,

আপনাদের ন্যায় বিদ্বজ্জনের সম্মুখে কথা বলবার অধিকার লাভ করে আমি কৃতজ্ঞ ও ধন্য; কিন্তু এর জন্য যে গৌরব, তা আমার নয়। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে আমি যে মহতী বিদ্যার কথঞ্চিৎ সাধনা করবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি,—এ গৌরব সেই বিদ্যাদাত্রী মহাশক্তি গায়ত্রী-রূপা বীণাপাণি দেবীর এবং সকল শক্তির আধার মহাপ্রণবরূপে সদাবিরাজমান সেই সত্য, শিব ও সুন্দরের। তাই সর্ব্বাগ্রে পরাবিদ্যারূপা সাবিত্রী সহ বিরাজিত সেই বেদান্তের বেদ্য, যোগীর গম্য ও ভক্তের নয়নানন্দ-পরমানন্দ শ্রীমাধবকে প্রণাম করি।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং॥

তারপর আপনারা আমার শ্রদ্ধাসহকৃত অভিবাদন গ্রহণ করুন, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, স্বস্তিবাদন উচ্চারণ করে বলুন,—

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

দশের মাঝখানে কথা বলা আমার পক্ষে দুঃসাহসিকতার কথা;—কিন্তু যাঁরা দশের ও দেশের জন্য চিন্তা করেন, তাঁদের নিকটই আমার এ দুঃখ নিবেদন করা প্রয়োজন। মর্ম্মজ্ঞ আপনারা, আপনাদের কাছেই এ ব্যথার কথা বললে সুফল লাভ হবে এই আশাই আমাকে সাহস দিয়েছে। আর, মর্ম্মবেদনার কথা নিজজন ভিন্ন আর কাকে জানাব?—বিশেষতঃ একান্ত স্নেহ-ভাজন নিজজন বলে আমি আপনাদের উপর স্নেহের ও প্রশ্রয়ের দাবী করতে পারি—এই ভরসাতেই আমি এ ধৃষ্টতা প্রকাশে সাহসী হ'য়েছি, নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

সঙ্গীতবিদ্যা যে কি মহাফলদাত্রী, তা এ থেকেই বুঝ্‌তে পারবেন যে, এই বিদ্যার ভারবাহী মাত্র হয়েও আমি আপনাদের দুটো কথা শোনাবার অধিকার লাভ করেছি;—কিন্তু সেই পরাবিদ্যা, গানবিদ্যার সম্মান ও সমাদর আমাদের দেশে আজকালও যে ভাবে হচ্ছে—তা দেখে দুঃখে ম্রিয়মাণ ও লজ্জায় অধোবদন হ'তে হয় না কি? সত্যদ্রষ্টা আর্য্যঋষিগণ

জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণো লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥

এবং

পরমানন্দবিবর্দ্ধনমভিমতফলং বশীকরণং।
সকলজনচিত্তহরণং বিমুক্তিবীজং পরং গীতং॥

ইত্যাদি ব'লে যে গানবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছিলেন, তিনি আজ অনাদরে, উপেক্ষায় এবং অত্যাচারে প্রপীড়িতা ধূলিধূসরিতা ও বিমলিনা হ'য়ে এমন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছেন যে, তাঁর প্রাণবায়ু আছে কি নাই, তা নিশ্চয় করা কঠিন বোধ হচ্ছে। হায়! তাই বুঝি আমাদের এই দুর্দ্দশা!—কিন্তু এই গানই হিন্দুস্থানের প্রাণের সঙ্গে ওতঃ-প্রোত ভাবে বিজড়িত ছিল। আজ সে গানের সাধনাও নেই, প্রাণেরও উপবাস চলছে। তাই দেশের নাড়ীতেও প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা কৃচ্ছ্রসাধ্য হ'য়েছে।

সঙ্গীত-সাধনা ব্যপদেশে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় জান্‌তে পেরেছি যে, অবিদ্যার কবল থেকে ত্রাণকারিণী মহাশক্তি বেদমাতা গায়ত্রীদেবীর গায়ত্রী-নামের সার্থকতা এই যে, তিনি গীতা হ'য়েই ত্রাণ

করে থাকেন। নিরুক্তিসম্মত শাস্ত্রও বলেন, "গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাত্তস্মাৎ গায়ত্রীতি স্মৃতা।" তবেই দেখুন, হিন্দুর জীবনে গানের স্থান কোথায়? সর্ব্বোপনিষদসার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার "গীতা" অভিধান হবার বিষয়ও প্রণিধান করবেন। এই গানই যে হিন্দুর প্রাণ, হিন্দুর চতুর্ব্বর্গ—"ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষানামিদমেবৈকসাধনং।" গানই হিন্দুর ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ ও সুগম সোপান। হবে না কেন? গানের অন্তরে যে আনন্দময় সদাই নাদ-রূপে বিরাজ করছেন। গানেই যে সেই অসীম, সুরে, ছন্দে সসীম হয়ে কত মনোরমা আনন্দলীলা প্রদর্শন করছেন, গানেই তাঁর পরম প্রকাশ। তাইত শোনা যায় যে, গানযোগেই সেই জ্ঞানাতীতকে সহজে ধরা যায়। তাই বুঝি বিহগের গীতি এত শ্রুতিসুখ দান করে, তাই ভৃঙ্গের গুঞ্জন এত শ্রবণ-রঞ্জন! তাই বুঝি তাঁরই "সৃজিতা" হয়েও প্রকৃতিদেবী নির্ঝরের ঝরঝর্ নাদ, তটিনীর কুলুকুলু ধ্বনি, সাগরের গম্ভীর-গর্জ্জন ও ঝটিকার তাণ্ডবসহকৃত সঙ্গীতদ্বারা নানা সময়ে তাঁর অভিনন্দন করছেন, জীবগণকে মুগ্ধ করছেন এবং হয়ত বা সেই জগমনোমোহনেরও মনোমোহিনী হয়ে এত বিচিত্র মায়ায় মায়া-জাল বিস্তার করে চলেছেন।

আপনারা সকলেই বহুশ্রুত। সুতরাং শাস্ত্রের এবং পুরাতত্ত্বের সবই জানেন। আপনাদের সামনে অধিক কথা কয়ে বাবদুকতার পরিচয় দিতে চাই না। কোনও নূতন কথা বল্‌বার স্পর্দ্ধাও রাখি না। মাত্র স্মরণার্থ ইঙ্গিতে নিবেদন করব।

এ দেশের সঙ্গীতের জন্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করতে গেলে জানা যায় যে অনাহতনাদ প্রণব থেকেই দেবাদিদেব সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীত ধারণ করেন। তারপর সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সামবেদ থেকে এই সঙ্গীত সংগ্রহ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। "সামবেদাদিদং গীতং সঞ্জগ্রাহ পিতামহঃ।" মন্বন্তরাদির আবর্ত্তন ও কালের অনাদিতা প্রভৃতি বিষয় সম্যক্ আলোচনা করলে বুঝ্‌তে পারা যায় যে, এ সঙ্গীতের উৎপত্তি-কালের নির্ণয় দূরে থাকুক, ধারণা করাও সুকঠিন। সৃষ্টিপ্রবাহের বর্ত্তমান কল্পে পুনঃপ্রকাশিত বেদের একটা আনুমানিক কাল নির্ণয় কতকটা যুক্তিসাধ্য হলেও সে যে হিন্দুসভ্যতার কোন উজ্জ্বল গৌরবময় অতীত যুগে হয়েছিল, তার কালনির্ণয় নিঃসংশয়রূপে করা যায় কিনা, এ সম্বন্ধে বোধ হয় সংশয়ের অবকাশ আছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের "তদপ্যেতে শ্লোকা অভিগীতাঃ," ছান্দোগ্য-উপনিষদে ষড়্‌জাদি সপ্তস্বরকে সপ্তবীণারূপে স্বীকরণ ইত্যাদি বহু উদাহরণই আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, সন্দেহ নাই। তারপর যজ্ঞে উদ্‌গাতার প্রয়োজনীয়তা, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে বিশেষরূপে "বীণাগাথী" ও "আড়ম্বরাঘাত" প্রভৃতির নিয়োগ প্রথা, অদ্যাপি দেশে প্রচলিত দশকর্ম্মের অঙ্গীয় যজ্ঞাদির মন্ত্রে "গানাশক্তৌ ত্রিধা পঠেৎ" বিধি এবং দুর্গোৎসবে মহাস্নানের শেষভাগে অষ্টকলসস্নানকালে গুর্জ্জরী, গৌরী, গোণ্ডকিরি, পঠমঞ্জরী, দেবকিরী, রামকিরী ও মালশ্রী প্রভৃতি রাগ আলাপনপূর্ব্বক দেবীকে স্নাপনের উপদেশ, পুরাণ ইতিহাসাদিতে বর্ণিত রাজগণের প্রশস্তিগান, নারাশংসীগাথার প্রথা, মহাভারতাদি মহাপুরাণে 'সৌখ্যশায়িক' 'বৈতালিক' 'গ্রন্থিক' 'কুশীলব' 'নট' ইত্যাদি বহুবিধ গায়ন শ্রেণীর উল্লেখ এবং বৃহন্নলার নিকট বিরাট-রাজপুত্রীর নৃত্যগীতশিক্ষার কাহিনী প্রভৃতি আপনাদের জ্ঞাত বিষয়গুলি সমালোচনা করলে পূর্ব্বেই বলেছি, এই গানই প্রাণের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত ছিল,—এ কথাটাকে ভিত্তিহীন বলে মনে হবে না। কিন্তু আজ? সেই নাদবিদ্যা কোথায়?

কাব্যজগতের ভাস্কর কবি কালিদাসের কাব্যে আপনারা কতবার দেখেছেন যে সেখানে মৃদঙ্গধ্বনি শুনে মেঘডম্বর ভ্রমে ময়ূরেরা চন্দ্রকদাম বিস্তার করে নৃত্য করত;—আজ কি মৃদঙ্গধ্বনি শুনে পেখম ধরে নাচবার জন্য শিখীর প্রাণ তেমনি উল্লাসে মেতে ওঠবার সুযোগ পায়? আজ মৃদঙ্গ-ধ্বনি বিরল, ধ্রুবপদ গান অনাদৃত। হিন্দুর গৌরবময় যুগ অবসানের বহুকাল পরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিন্দুসঙ্গীত যদিও ইস্‌লাম প্রভাবে কিঞ্চিৎ রূপান্তর পরিগ্রহ করতে বাধ্য হয়েছিল, তবু তাতে জীবনের লক্ষণ ছিল, তার আপন বৈশিষ্ট্য তখনও সে হারায়নি—তাই তখন স্বনামধন্য তানসেনেরও গুরুদেব হরিদাস গোস্বামীর ন্যায় মহাতেজস্বী নাদসিদ্ধ মহাপুরুষও লোকলোচন-বর্ত্তী হতেন। কথিত আছে এই নাদবিদ্যারই বিভূতিযোগে মায়াবলে তিনি দিল্লীশ্বর বাদশাহ আকবরকে মরকতখচিত বিচিত্র সোপানাবলী-বিমণ্ডিত বিচিত্র সরোবর প্রদর্শন করে তাঁর ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব চূর্ণ করেছিলেন। এই মহাত্মার স্থাপিত বিগ্রহ অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত। কিন্তু এখন আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রদেশেই প্রতীচীর যে তীব্র আলোকসম্পাত পড়েছে, তার উষ্মা সহ্য করতে না পেরে বুঝি ললিতা সঙ্গীত-কলা এই-বার ভবলীলা সম্বরণ করে। মৃদঙ্গের স্থান এখন বাঁয়া-তবলা অধিকার করেছে। মত্ত কুঞ্জরগতির পরিবর্ত্তে চটকের নৃত্য অধিকতর সুন্দর বলে সমাদৃত হচ্ছে। হিন্দুসঙ্গীত-সমুদ্রের পরমরত্ন ধ্রুব-পদ সঙ্গীত মৃতপ্রায়। জাতীয়-জীবনের অন্যান্য বিভাগের মত সঙ্গীতেও আজকাল কেবল খেয়ালের রাজত্ব। আবার শুন্‌ছি—ঠুংরীসুন্দরীও নাকি অনুনাসিক সুরে আব্দার ধরেছেন যে,—তিনিই এখন সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে আসীনা হয়ে সঙ্গীতরাজ্যের নেতৃত্ব করবেন। হায়রে! মৃদঙ্গের গম্ভীর "ধিমিদ্ধিমিকিদ্ধিমি" ধ্বনির স্থানে ক্ষীণ ঠুং-ঠাং রব। লোক এত শক্তিহীন যে মৃদঙ্গের ধ্বনিতেও বোধ হয় তাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। অথবা এই প্রবল কলির ফল;—কে জানে?

আজকাল দেশে ভোগবাদের একটা ধুয়া উঠেছে। অনেকেই বলছেন—"জীবনে পূর্ণমাত্রায় ভোগ চাইই চাই!" এই ভোগবাদীদের মধ্যে যাঁরা সঙ্গীত-চর্চ্চা করেন, তাঁদের মতে তরল সুর এবং চটুল ছন্দ ভিন্ন গীত ও নৃত্য নাকি সুন্দর বোধ হয় না। তাই তাঁরা এদেশ থেকে মৃদঙ্গের নির্ব্বাসন ব্যবস্থা করতে চান। কেউ-কেউ আবার এতদূর অগ্রসর হয়েছেন যে তাঁরা ছন্দ-সৌন্দর্য্যদ্যোতক সমস্ত তালযন্ত্রেরই—এমন কি তাল শব্দটারই বিলুপ্তি কামনা করেন। তাঁরা বলেন, তালের নিগড় ছিন্ন হলেই সঙ্গীতের মুক্তিলাভ হবে। আমি বলি ছন্দহীন হলে সঙ্গীতের সপিণ্ডীকরণ গয়াশ্রাদ্ধ এবং মহামুক্তি অর্থাৎ মহানির্ব্বাণ লাভই হবে। কুসুমমালিকার রচনা করে সৌন্দর্য্য সম্পাদন করতে যেমন সূত্রের প্রয়োজন, সঙ্গীতের সুষ্ঠুতা সম্পাদনেও তেমনি তালের আবশ্যকতা। কবিতায় যেমন ছন্দ—সঙ্গীতে তেমনি তাল অপরিহার্য্য। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতাই যেন আজকাল আমাদের চরিত্রের একটা প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। তাই বুঝি সমস্ত নিয়মের নিগড় ভগ্ন করার এই উদ্দাম প্রয়াস! ভোগবাদীগণের নিকট আমার বিনীত জিজ্ঞাসা এই যে ভোগ করবার শক্তি ও অধিকার আমাদের আছে কি? আমি ত জানি, ভোগ করবার শক্তি ও অধিকার একমাত্র শ্রীভগবানের। আমরা শুধু প্রসাদ পাবার অধিকারী। আজকালকার এই দুর্নিবার ভোগেচ্ছা পূরণের চেষ্টায় যে কেবল দুর্ভোগেরই পরিণাম বেড়ে চলেছে, এও বোধ হয় আপনারা উপলব্ধি করেছেন। আর নৃত্যগীত

যদি মৃদঙ্গ সঙ্গীত ছন্দে সুন্দরই না হয়—তবে যাঁর বাঁশীর গানে যমুনা উজান বইত, সেই রসিক-শিরোমণি শ্যামসুন্দর মহারাসনৃত্যোৎসবে মৃদঙ্গ সহযোগে সঙ্গীত অনুষ্ঠান করে কিরূপে সুর-সিকা গোপযুবতীর মনোরঞ্জন করেছিলেন, এ কথাটাও একটু চিন্তা করতে অনুরোধ করি।

আজকাল অনেকে আবার এ দেশের সঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মিলনকামী। তাই প্রসঙ্গক্রমে প্রতীচীর উল্লেখ করাতে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, আমি বোধ হয় হিতকর মিলনের পরিপন্থী;—কিন্তু সেরূপ বুঝলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। মিলনেরই কারবারী আমি, আমি মিলনের বিরোধী নই, আমি চির-দিনই পূর্ণ মিলনের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সুতরাং সত্যমিলনের সঙ্গে আমার বিরোধ থাকতে পারে না। যে মিলনে উভয়ের শক্তি ও সৌন্দর্য্য সম্মিলিত হ'য়ে অভিনব সৃষ্টি হয়, সেই মিলনই সার্থক। নতুবা মিল্‌তে গিয়ে মূল উদ্দেশ্য ও আপন অস্তিত্ব হারান এ ক্ষেত্রে মিলন নয়, মরণেরই নামান্তর মাত্র। আর কার সঙ্গে কার মিলন হবে? উভয়ের শক্তি ও স্বরূপ অবগত না হয়ে অকাল মিলনের চেষ্টায় অকাল মরণ ডেকে আ'না হবে না ত?

স্বতবৈশিষ্ট্য জাতর আসন জগতে কোথায়, —তা কি প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভূত হচ্ছে না?—কোনও জাতির সভ্যতার পরিমাপ করতে হলে তার কলা-বিদ্যার অবস্থা বিচারই যে তার প্রধান সূত্র—এ কথা মনীষীরাই বলে থাকেন। আমাদের এই শ্রেষ্ঠা কলাবিদ্যাও যদি স্বাতন্ত্র্যহীন হ'য়ে অস্তিত্ব হারান, তবে আমাদের থাক্‌বে কি, তা আপনারা চিন্তা করবেন।

যদিও জাতীয় সঙ্গীতের নবরূপদাতা যুগকবি অমর দ্বিজেন্দ্রলাল এ দেশের রাগ-রাগিণীগুলিতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতসম্মত সুরের মিলন করে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছেন, তবু আজকাল প্রতীচীর বিশ্বত্রাসিনী ক্ষুধা যে ভাবে আমাদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা সদাচার আদি গ্রাস করে ফেল্‌ছে, তার কবলে পড়ে আমাদের প্রাণশক্তিস্বরূপ গানও যেন জীবন হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায়। এই জন্যই সময়োচিত নিবেদন করে রাখ্‌ছি। তাল আদি সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারের সুবিবেচিত প্রয়োগে সমৃদ্ধ, সুছন্দসম্বদ্ধ, রস ও ভাবসম্পন্ন যে ধ্রুব-পদ সঙ্গীত সাধনায় ধ্রুব ব্রহ্ম-পদ লাভের অধি-কারী হওয়া যায় বলে শাস্ত্র বারবার বলেছেন, তার স্বরূপ ভুলে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খল খেয়াল আদির অসম্পূর্ণ উপাসনা করেই আমরা হিন্দু-সঙ্গীতের মর্ম্মের পরিচয় নিতে পারব কিনা, তাকে নানা আপদ থেকে রক্ষা করে সাধনবলে তার পূর্ব্ব-গৌরব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করবার যোগ্য হতে পারব কিনা—সে বিচারের ভার সুধীজনের উপর। আপ-নারা বিচার করুন, কর্ত্তব্য নির্ণয় করুন, এই হচ্ছে আমার আর্জ্জির মর্ম্ম। বলবার কথা অনেক আছে, কিন্তু সময় অল্প, আর আমার সামর্থ্যেরও অভাব। তাই আপনাদের বহুমূল্য সময় অধিক নষ্ট না করে কেবল এই নাদবিদ্যার মহিমা ও মহতী শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিদায় প্রার্থনা করব।

(সমাপ্ত)

"অমী-ঘূঁট্"

প্রাচীন হিন্দী-সাহিত্য "সন্ত্ বাণী" বা মহাপুরুষের বাণীতে সমৃদ্ধ। অধ্যাত্ম-রাজ্যের গভীরতম অনুভূতিকে 'দোহা' 'চোপাই', 'ছন্দ', 'কবিত্ত', বা 'শব্দ' প্রভৃতি বিচিত্র কাব্যকলায় ফুটাইয়া তোলার একটা সহজ নিপুণতা হিন্দুস্থানের সাধু-সন্তের মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর কীর্ত্তন বাঙ্গালার অধ্যাত্মসাধনার একটা নিজস্ব রূপ, এই সন্ত-বাণীও হিন্দুস্থানের অধ্যাত্মসাধনার একটী অপরূপ প্রকাশ। ইহার অনুরূপ বাঙ্গালাতে কিছু আছে কিনা জানি না। মহাপুরুষদের এই সমস্ত বাণীর সহিত হিন্দুস্থানী সাধকদের পরিচয় কত নিবিড়, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই জানেন। কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোকের প্রমাণ হাজির করা যেমন পণ্ডিতদের রীতি, তেমনি আলাপ আলোচনার মাঝে প্রচুর পরিমাণে সন্ত্বাণীর আবির্ভাব ঘটানো হিন্দুস্থানী সাধকদের স্বভাব। এই সমস্ত বাণী অল্পাক্ষরে গ্রথিত হইয়াও ভাবার্থে এত গভীর এবং শব্দের ঝঙ্কারে এত বিচিত্র যে শুনিবামাত্র শ্রোতার মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। বঙ্গবাসী তুলসীদাস, কবীর, মীরাবাঈ ও নানকজীর বাণীর সহিত সামান্যভাবে পরিচিত। কিন্তু ইহা ছাড়াও যে কত মহাপুরুষের বাণী হিন্দী সাহিত্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার সন্ধান আমরা রাখি না।

"অমী ঘূঁট্" (অমৃতে চুমুক) এইরূপ একজন সন্তের বাণী। বাণীর রচয়িতার নাম কেশবদাস। ইঁহার পূর্ব্ব-পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কেবল এইটুকু জানা যায় যে ইনি য়ারী-সাহিবের শিষ্য এবং বুল্লা-সাহিবের গুরুভাই ছিলেন। ইহাঁদের সম্প্রদায়ে গুলাল-সাহিব, ভীখা-সাহিব ও পলট্-সাহিবের মত দেশপ্রসিদ্ধ সন্তের আবির্ভাব হইয়াছিল। আমরা সুযোগমত এই সমস্ত মহাপুরুষের বাণীও পাঠকদিগকে উপহার দিতে চেষ্টা করিব। কেশবদাসজী সম্ভবতঃ সম্বৎ ১৭৫০ হইতে ১৮২৫র মধ্যে জীবিত ছিলেন। ইহা ছাড়া ইহাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

কেশবদাস গ্রন্থখানির আদর করিয়া নাম রাখিয়াছেন, "অমী-ঘূঁট্" বা অমৃতে চুমুক। ইহাঁর নামকরণ মিথ্যা হয় নাই। অত সরল এক একটা শ্লোক, অথচ অতি নিবিড় তাহার ভাবের ব্যঞ্জনা,—আস্বাদন করিয়া মনে হয়, বাস্তবিকই যেন অমৃতের পেয়ালায় একটি চুমুক দিলাম। আমরা রসিক পাঠকদিগকে এই পেয়ালার মজলিশে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছি।

ভূমিকাচ্ছলে বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানের অধ্যাত্মসাধনার স্বরূপ সম্বন্ধে একটু তুলনামূলক আলোচনা করিতে চাই। জ্ঞান বড় কি প্রেম বড়, এই নিয়া একটা তিক্ত আলোচনা বাঙ্গালী সাধকের মাঝে দেখিতে পাই। বাঙ্গালীর সাধনা বিশেষ করিয়া যেন রূপ-রসের দিকটা ঘেঁসিয়া গিয়াছে। কি ইষ্টসন্নিধানে, কি দৈনন্দিন জীবনে, ভোগরাগের আয়োজনে একটা মত্ততা ও উত্তেজনা অনুভব করিতে বাঙ্গালী চিরাভ্যস্ত। তত্ত্বের চেয়ে ভাবটাই বাঙ্গালীর জীবনে আধিপত্য করে বেশী। ইহার ফলে ভাবের মদিরায় মশগুল হইয়া তত্ত্ববিচারকে কটাক্ষ করিতেও বাঙ্গালী সাধকের বাধে নাই; জ্ঞানপন্থীকে উপহাস করিয়া বাঙ্গালী মহাজন এমন কথাও বলিতে ছাড়েন নাই—"অভাগিয়া কাক মজে জ্ঞাননিম্বফলে!" জ্ঞানপন্থার প্রতি এইরূপ একটা প্রকট বিরুদ্ধতা বাঙ্গালীর অধ্যাত্ম-বোধকেও বিকল করিয়া রাখিয়াছে

যাঁহারা মনস্বী, তাঁহারা বাঙ্গালার রস-সাধনাকে একটা তত্ত্বের ভূমিতে দাঁড় করাইয়াছেন বটে, কিন্তু রসের উচ্ছলতায় তত্ত্বটুকু এমন ভাবেই আড়াল হইয়া পড়িয়াছে যে সাধারণে তাহার বড় একটা খোঁজ রাখে না। বাঙ্গালীর তত্ত্বদর্শন বড় জোর তাহার এই অতিবাস্তব দেহটাকে লইয়া। সাংখ্য বা বেদান্তের অনুভূতিকে ঘরোয়া ভাষায় রূপ দিবার চেষ্টা হাজার বছর পূর্ব্বের বাঙ্গালী করিয়া থাকিলেও, ইদানীন্তন সেদিকে তাহার বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না। তাহার সাধনা একান্তভাবে বিশেষকে লইয়া; নির্ব্বিশেষকে অগত্যা কোথায়ও স্বীকার করিয়া থাকিলেও তাঁহার মধ্য হইতেই জীবনের রস দোহন করিয়া লইবার সঙ্কেত বাঙ্গালী শিখে নাই, অথবা ভুলিয়া গিয়াছে।

তত্ত্বদর্শনের এই ন্যূনতাটুকু আমরা কিন্তু হিন্দুস্থানী সাধকদের বাণীতে পাই না। প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যে ভক্তিই অধিকাংশস্থলে উপজীব্য হইলেও তাহা কিন্তু একেবারে তত্ত্ববর্জ্জিত নহে। ভক্তিকে শৃঙ্গার রসাশ্রিত করিয়া বাঙ্গালার পদাবলী-সাহিত্যের মত এক শ্রেণীর সাহিত্য মধ্যযুগের হিন্দীতে দেখা যায় বটে; কিন্তু উহার মাঝে শৃঙ্গাররসটাই এত উৎকট হইয়া দেখা দিয়াছে যে কেবল টীকাকারদের ভাষ্যের বাঁধুনীতে উহাকে কোনওরকমে রাধা-কৃষ্ণের লীলার সহিত বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার পদাবলীতে ভক্তের হৃদয়ে যে তরঙ্গ তোলে, এই সাহিত্যে তাহা পারে না। এই জন্য ইহা ভক্তের হৃদয়ানন্দকর না হইয়া বিশেষ করিয়া সাহিত্যামোদীরই উপভোগের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। এই শ্রেণীর সাহিত্যের পাশেই সাধকদিগের বাণী বিশেষ করিয়া একটী নির্ম্মল ভক্তিরসাশ্রিত সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সাহিত্যের মাঝে আমরা লীলা ও তত্ত্বের অপরূপ সমন্বয় দেখিতে পাই। এই সমন্বয় প্রধানতঃ দুইটী ধারায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ ভগবানই মানুষের মাঝে নামিয়া আসিয়াছেন, এই তত্ত্বটীকে আশ্রয় করিয়া ভাগবত লীলার বিস্তার; দ্বিতীয়তঃ মানুষই ভগবানের পানে উঠিয়া গিয়াছে, এই তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া মানুষের গভীরতম অধ্যাত্মানুভূতির বিচিত্র প্রকাশ। এই দুইটী ধারার মধ্যে পূর্ব্বেরটীর সহিত আমরা অল্পাধিক পরিচিত; যদিও কিনা বাঙ্গালার হাতে পড়িয়া ভাবই অধিকাংশ স্থলে তত্ত্বকে ছাপাইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ধারাটীর সহিত আমরা একপ্রকার অপরিচিত বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত জীবন্মুক্ত জীবনের আস্বাদন ও অনুভব বাঙ্গালীর সাহিত্যে ফুটিবার অবকাশ পায় নাই।

আমরা যে মহাপুরুষের বাণীর সহিত পাঠকদিগকে পরিচিত করিতে যাইতেছি, তাহা পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর বাণী। কেশবদাস পরম ভক্ত বটে, কিন্তু তাঁহার ভক্তি জ্ঞানের তীব্র আলোককেই যেন ভাবের ফানুষ দিয়া আবৃত করিয়া স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তাই জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড় এ প্রশ্নের সমাধান তাঁহার মাঝে অনায়াসে হইয়াছে দেখিতে পাই।

জীবনের লক্ষ্য কি?—কেশবদাস বলেন

অদ্ভুত রূপ অবিনাসি সো ঘটহিঁ সমারৈ।

—যে পরমাশ্চর্য্য অবিনাশী রূপ বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা এই ঘটে—এই দেহে ধরিয়া নেওয়া।

সেই "অদ্ভুত অবিনাশী রূপের" পেছনেই মানুষ পাগল হইয়া ছুটিয়াছে অনন্তকাল ধরিয়া; কিন্তু যতদিন মর্ম্মে ব্যাকুলতা, ততদিন দেহ দিয়া তো তাহাকে সে পায় নাই। পাইতে হইয়াছে তাহাকে দেহ ছাড়িয়া, সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করিয়া।

তখন তাঁহার কি দশা হইয়াছে ?—

আসা মনসা সব থকী, মন নিজ মনহিঁ মিলান।
জ্যোঁ সরিতা সমুঁদর মিলী—

—মনের আশা-ভরসা সব শ্রান্ত হইয়া পড়ে, মন নিজের মনে (স্বকারণে) মিলাইয়া যায়—নদী যেমন সমুদ্রের মাঝে মিলায়—

অথবা—

কেসো সম্ভলি খেত মেঁ পরে সো সম্ভলি হোয় !

—লবণের খনিতে যে পড়ে, সে যেমন লবণই হইয়া যায়।

এই আত্ম-বিলোপের সাধনায় "ছোভ মোহ কাম"—রাগ-দ্বেষ-মোহ তো বাধা বটেই, কিন্তু সব চেয়ে বড় বাধা—"দুবিধা"—দ্বিধা বা সন্দেহ। যদি পাইতে হয় তবে সন্দেহ ছাড়িতে হইবে—

কেসো দুবিধা ডারি দে, নির্ভয় আত্ম সেব।
প্রাণ পুরুষ ঘট ঘট বসৈ, সব মহঁ সব্দ অভেব॥

—দ্বিধাকে তাঁহার মাঝেই ডালি দাও, নির্ভয় হইয়া আত্মস্বরূপের সেবা কর। জান, ঘটে ঘটে সেই এক প্রাণের মানুষ, তাঁর অভাবনীয় বাণী সবার মাঝেই।

দ্বিধাহীন চিত্তে এই বাণী তোমায় কান পাতিয়া শুনিতে হইবে, এই দেহকে উৎসর্গ করিতে হইবে—

ঐসো সন্ত কোঈ জানি হৈ, সত্ত সব্দ সুনি লেহ।
কেসো হরি সোঁ মিলি রহো, নেবছাবর করি দেঁহ॥

—এমন কোনও সন্তকে কেউ জান কি, যে সেই সত্য শব্দ শুনিয়া লইয়াছে ? এই দেহ উৎসর্গ করিয়া তোমাকে তাঁহার সঙ্গে নিবিড় ভাবে মিলিয়া থাকিতে হইবে।

তখন,—

তন্ সরবর মন হংস হৈ কেসো পুরন চন্দ।

—তোমার এই তনুর সায়রে মনটী যেন মরাল। এই তোমার লৌকিক রূপ। কিন্তু তোমার আত্মস্বরূপের পানে চাহিয়া দেখ, হে কেশব তুমিই যে পূর্ণিমার চাঁদ হইয়া সেই সরোবরে আলো ঢালিতেছ !

এই শেষের কথাটাই কেশবের উপনিষদ্। পাইতে গিয়া দেহকে উৎসর্গ করিতে হইয়াছে। কিন্তু উহাই শেষ কথা নহে। উৎসৃষ্ট দেহকেও আবার ফিরিয়া পাওয়া যায়। পরশমণির স্পর্শে লোহা যেমন সোনা হয়, তেমনি চিন্ময়ের স্পর্শে এই মৃন্ময় তনুও আবার চিন্ময় হইয়া ফিরিয়া আসে—এই "পাঁচ-পচীসহিঁ"—পাঁচ আর পঁচিশের মেলাতেই ফুটিয়া উঠে একের "অবিগত জ্যোত"—অব্যক্ত জ্যোতিঃ। ইহাই জীবন্মুক্তি। শুধু মোক্ষ নয়—

অর্থ ধর্ম্ম মোচ্ছ কাম চারি ফল হোরঈ।

—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী ফলই তখন পাওয়া যায়। আর দেহান্তে পাওয়া যায় নির্ব্বাণ বা পরম গতি—

পাবৈ পদ নিরবান, পরম গতি তব দিলৈ।

এই অত্যাশ্চর্য্য রূপান্তরের কথাই কেশবদাস বলিলেন—

অদ্ভূত রূপ অবিনাসি, সো ঘটহিঁ সমাঈঁ।

এই অনুভবেরই তত্ত্বরূপটী কেশবদাস দুটী কথায় কেমন ফুটাইয়া তুলিলেন—

সাংখ্য জোগ য়হ ধর্ম্ম হৈ, কর্ম্মবীজ কো জার।
জোঈ থা সোঈ হুবা, দেখা সুন্ন মঁঝার॥

—সাংখ্য-যোগই হইতেছে ধর্ম্ম। তোমার কর্ম্মবীজকে সাধনার সন্তাপে জ্বালাইয়া ফেলিতে হইবে। তখন দেখিবে, যাহা ছিল, তাহাই হইয়াছে—মাঝখানটাই ফাঁকা !—"জোঈ থা সোঈ হুবা, দেখা সুন্ন মঁঝার—একটী কথায় সমগ্র বেদান্ততত্ত্বের কি নিপুণ পরিচয় !

তত্ত্বতঃ মাঝখানটা শূন্য বটে, সমস্তই মায়া বটে, কিন্তু যতক্ষণ "পাঁচ-পঁচিশের" মেলায় রহিয়াছি, ততক্ষণ তো সে বোধ হয় না। যাঁহারা সেই অদেখকে দেখিয়াও ফিরিয়া আসিয়াছেন,

তাঁহাদিগকেও তো আবার এই খেলায় যোগ দিতে হয়। প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগ থাকে। কিন্তু সে ভোগ কি প্রাকৃত জীবের ভোগের মতই ?—কেশব বলেন, তা নয়—

অবিচল অগম অগাধ, সাধ গতি লখৈ ন কোঈ।
প্রেম প্রকাস বাস আকাসহিঁ, নিসুদিন হোঈ॥

—অবিচল, অগম, অগাধ মহাপুরুষদের স্থিতি। তাঁহাদের চলা-ফেরার নিশানা পাইবে কে ? নিশি-দিন তাঁহারা রহিয়াছেন আকাশে নিরালম্ব হইয়া, অথচ জীবনটী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন প্রেমে !

বিনা সীস-কর চাকরী বিন খাঁড়ে সংগ্রাম।
বিন নৈনন দেখত রহৈ, নিসুদিন আঠো জাম॥

—মাথা নাই, হাত নাই, তবুও তাঁহারা করেন সেবা ; খাঁড়া নাই, তবুও করেন সংগ্রাম। নয়ন নাই, তবুও নিশিদিন অষ্টপ্রহর সমস্তই দেখিতেছেন।

নিরভিমান অকর্ত্তার ভাবটী এই দুটী ছত্রে কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে ! অনাসক্তি মজ্জাগত হইয়া গেলে বিনা খাঁড়ায় কি করিয়া সংগ্রাম চলে, তাহা এই যুগে রামকৃষ্ণদেব দেখাইয়া গিয়াছেন।

প্রেম প্রীতি যহ রীতি, জ্যোতি ভ্রমহিঁ ঢহাঈ।
সদা অনন্দ বিনোদ মিলৈ অবিগত সুখ পাঈ॥

—শুধু প্রেম আর প্রীতি, এই তাঁহাদের রীতি। জ্যোতির ছটায় সমস্ত ভ্রম দূর হইয়া গিয়াছে—তাঁহাদের মিলিয়াছে আনন্দের বিনোদ, তাঁহারা পাইয়াছেন অব্যক্ত সুখ।

এই আনন্দ-বিনোদ কি অমনি পাওয়া যায় ? —ইহার জন্যও সাধনা প্রয়োজন। সাধনার জন্য দূরে যাইতে হইবে না—তোমার মাঝেই সব রহিয়াছে—"তন্ মন্ প্রাণ সমান্" করিয়া চিনিয়া লইতে পারিলেই হয়।

সোঈ নিজ সন্ত জিন অন্ত আপা লিয়ো

—সেই সাধু যে নিজের অন্ত পাইয়াছে।

অন্ত পাইবার উপায় ?—কেশব বলিতেছেন—

প্রাণ অপান অসমান মেঁ থির ভয়া
সুন্নকে সিখর পর জিকর লাগী।
রহত ঘর বাস বিনু শ্বাস কা জীব হৈ
সক্তি মিলি সীবসোঁ সুরতি পাগী॥

—প্রাণ আর অপান এই দুইটীর আকর্ষণ বিকর্ষণ আকাশের মাঝে (নিরালম্বপুরে) স্থির হইয়া গেল—শূন্যের শিখরে জাগিয়া উঠিল ধ্রুবা স্মৃতি। —শ্বাস না ফেলিয়াও জীব গৃহবাসী হইয়া রহিল —শক্তি মিলিলেন শিবের সাথে, সুরত রস উথলিয়া উঠিল !

তখন,

অকহ আলেখ আদেখ কো দেখিয়া
পেখি কেসো ভয়ো ব্রহ্মরাগী !

—কথার অতীত, লেখার অতীত, দেখার অতীত যিনি, সেই ব্রহ্মকে দেখিয়া কেশব তাঁহার অনুরাগী হইলেন।

ইহার পর হইতে—

গগন-মগন্ ধুনি, লগন লগী,
সুনত-সুনত তন ত্রিপ্ত ভঈ।
জগর-মগর নহিঁ ডগর-বগর নহিঁ
রবি-সসি নিস্-দিন জার নহী॥
প্রান গবন হরি, পবন মবন করি,
মিলি সম্মুখ পিয় বাঁহ গহী।
সত রতি সত্ত পতি হম পায়ল
কেসোদাস সুহাগ সহী॥

—আকাশ যে সুরে ডুবিয়া গেল, মিলনের লগ্ন আসিয়াছে বুঝি ! শুনিতে শুনিতে আমার তনু তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। সেখানে না আছে জাগরণ, না আছে নিদ্রা ; না আছে সুপথ, না আছে কুপথ ; রবি-শশী নিশি-দিন কিছুই নাই সেখানে। প্রাণের গতি হরণ করিয়া পবনকে মৌন করিয়াছি—আর অমনি সম্মুখে পাইয়াছি আমার প্রিয়তমের বাহু।—সত্যকার ভালবাসা, সত্যকার স্বামী তো আমি পাইলাম—এই তো আমার বিবাহের বাসর-জাগা !

দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এই আনন্দের ঝঙ্কার উঠিয়াছে যে !—

গঙ্গা জমুনা সরস্বতী সুখমন ঘর বিসরাম।

নিঝর ঝরত অমৃতরস নিরমল, পীবহি সন্ত সুজান!

—গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী-(ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না) পার হইয়া যে সূক্ষ্ম ঘর, তাহাতেই বিশ্রাম তখন। সেখানে নির্ঝর ঝরিয়া নির্ম্মল অমৃতরস ক্ষরিয়া পড়িতেছে, আর সাধু সজ্জনেরা তাহাই পান করিতেছেন।

অগম অগোচর গুঞ্জত নিসুদিন, তন মন প্রাণ সমান।

অমর বিদেহ ভয়ো পদ পরসত, তিমির মিটায়ো ভান॥

—যাহা অগম, যাহা অগোচর, তাহাই নিশিদিন সেখানে গুঞ্জরিয়া উঠিতেছে—তনু-মন-প্রাণ একতান হইয়া সে ঝঙ্কারে কাঁপিতেছে। সে চরণ ছুঁইয়া আমি অমর হইলাম—জ্যোতির প্লাবনে অন্ধকার মিলাইয়া গেল।

এমনি করিয়া—

খাক্ কে গাত মে পাক সাহিব মিলো।—

—ভস্মের গহনে পাইলাম আমার পরম শুচি ও রুচির প্রিয়তমকে…

সিফত কা করো সোই অব্ র নহি দুসরো—

—আর ভাঙ্গিয়া কি বলিব, একমাত্র সেই—আর কেউ তো নাই…

তাইতে—

মিলি গয়ো বুন্দ দরিয়াব মাহী!

—এই অস্তিত্বের বিন্দুটুকু সেই সিন্ধুর মাঝে ডুবিয়া গেল! (সমাপ্য)

মরণ-রহস্য

মরণ একটা রহস্যই বটে। মানুষ মরতে ভয় পায়, এ কথা জানি; অথচ অহরহঃ মরণের কোলে বসে থেকেও যে মানুষ মরণকে ভয় করছে না, এও তো দেখ্তে পাচ্ছি। অর্থাৎ জীবের যেন দুটা স্বভাব; একটা তার অমৃত, আর একটা মরণ-ধর্ম্মী। যেটা অমৃত, সেটা আত্মার স্বভাব। আর যেটা মরণভয়-কাতর, সেটা প্রকৃতির ধর্ম্ম। পুরুষ আর প্রকৃতি দুয়ের সংযোগে জীবের সৃষ্টি; তাই পরস্পর বিরুদ্ধ হয়েও দুটীর স্বভাবই জীবের মাঝে অপরূপ হয়ে মিলে-মিশে আছে। মানুষ যে মরণকে চোখের সামনে দেখেও কেয়ার করে না, যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, এইটেই হল জগতের সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার। আবার মরণভয়ে মানুষ যে দেহকে একান্তভাবে আঁকড়ে থাকতে চায়, পতঞ্জলি বলেন, এই হচ্ছে মানুষের একটা ক্লেশ; তিনি এর নাম দিয়েছেন, অভিনিবেশ—এ তার স্বরসবাহী রূঢ় সংস্কার, পুনঃপুনঃ সে মরণদুঃখ অনুভব করেছে বলে আজ মরণকে সামনে উপস্থিত দেখ্লেই সে আঁৎকে ওঠে। এখন মানুষের লক্ষ্য হবে, তার এই প্রকৃতির ধর্ম্মকে পুরুষের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য করা। দেহের বাঁধন ছাড়িয়ে গেলে মানুষের মাঝে মরণভয় বলে আর কিছু থাকে না—এই মহাসত্যটী ফুটিয়ে তোলবার জন্যই হিন্দুর যত সাধনা।

কেন মানুষ মরণকে ভয় করবে না, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তার খুব সহজ কয়েকটী কারণ দেখিয়েছেন। প্রথম কথাই হচ্ছে—মৃত্যুকে স্বভাবসঙ্গতরূপে দেখা। আজকাল স্বভাববাদের ছড়াছড়ি; ভোগ-কল্পে যতরকম বজ্জাতি। সবই স্বভাবের

দোহাই দিয়ে টিকিয়ে রাখবার একটা প্রয়াস সর্ব্বত্র দেখ্তে পাই। ওতে আপত্তির কিছুই নাই, তবে কিনা ওর সঙ্গে দুঃখ, কষ্ট এবং মরণ টাকেও স্বভাবের একটা পরিণাম বলে স্বীকার করলে বোধ করি মন্দ হয় না। কিন্তু আমরা যে মরণকাতুরে জাত, ও কথা কি বুক চিতিয়ে মেনে নিতে পারব? যে দেশ থেকে স্বভাব-বাদ এসেছে, সে দেশের লোকগুলো তা পারে কিন্তু। আর ওই তো হচ্ছে যথার্থ In Imitation of Krishna!

যাক্ সে কথা। শ্রীকৃষ্ণ বলছিলেন, ঠিক যেমন দেহে কৌমার, যৌবন, তারপর জরা, তেমনি আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেই মরণ; এ তো স্বাভাবিক; তবে আর দুঃখ কিসের?

দ্বিতীয় কথা, মরণটা দেহেরই, আত্মার নয়; আত্মা অবিনাশী, অব্যক্ত, অচিন্ত্য; অবিকারী; এই কথা যদি বুঝতে পার, তাহলে মরণের কথা ভেবে তোমার আর অনুশোচনা হতে পারে না।

তৃতীয় কথা, জন্মেছ যখন, তখন মরবেই; জন্মটা রোধ করা যদি তোমার এক্তেয়ার হত, তাহলে মরণকে এড়ানোও সম্ভবপর হত। তা যখন নয়, তখন অপরিহার্য্য বিষয় নিয়ে দুঃখ করা কেন? তারপর শেষ কথা, একবার জগৎটার দিকে চেয়ে দেখ দেখি, যা কিছু দেখছ, তা কোথা হতে আসছে, আবার কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে, কিছু বলতে পার কি? আদিও বুঝি না, অন্তও বুঝি না—দেখি শুধু মাঝখানটা। তবে আর আদি-অন্তের কল্পনা জল্পনা করে মনের মাঝে দুঃখের বোঝা জমিয়ে তোলা কেন?

শ্রীকৃষ্ণের এই যুক্তিগুলি নির্ভীক ও বলিষ্ঠ স্বভাব-বাদ স্বভাববাদের চরম পরীক্ষা এই মরণ-বরণে।

এই হল মৃত্যু সম্বন্ধে দার্শনিকের চিন্তা। এখন মরবার সময় বাস্তবিক কি হয়, তারই একটু আলোচনা করা যাক্।

পাঁচটা প্রাণের কথা সবাই জানেন। কোথাও বা পঞ্চবায়ুও বলা হয়েছে। এই বায়ুগুলি বাতাস নয়—এরা হচ্ছে nervous energy। যেমন স্থূল জগতে বিদ্যুতের স্বরূপ জানি না, অথচ তার কাজ দেখ্তে পাই সর্ব্বত্র, অতএব তাকে একটা শক্তি বা energy বলে স্বীকার করি, তেমনি অধ্যাত্মরাজ্যে এই বায়ুগুলি একটা সূক্ষ্ম energy বা শক্তি। আধিভৌতিক-জগতে electricity যা, আধ্যাত্মিক-জগতে (অর্থাৎ দেহ-দেহী সম্বন্ধে) বায়ুও তা। এই বায়ুর মাঝে উদান বলে একটা বায়ু আছে। উপনিষদে তার ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে উর্দ্ধং নয়তীতি উদানঃ—যা ওপরের দিকে টেনে তোলে তাই হচ্ছে উদান। বেদ বলেন, মরবার সময় আত্মা এই উদানবায়ুকে আশ্রয় করে দেহ ছেড়ে যান।

বেদ আরও বলেন, দেহে যে তাপ ও জ্যোতিঃ তাই হল উদানবায়ুর প্রকাশ। বিদ্যুতের সঙ্গে বেশ মিলে যায় না কি? শুধু তোমার-আমার দেহ তো নয়—সমষ্টি ভাবে একটা ব্রহ্মাণ্ডই হল যেন ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির দেহ। এই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝেও তাপ এবং জ্যোতিঃ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। বেদ বলেন, যদি আধিদৈবত দৃষ্টি দিয়ে দেখ, তাহলে দেখবে, এইটাই সমষ্টিগত উদান-বায়ুর ক্রিয়া।

এখন আর একটা কথা ভেবে দেখুন। অণুর সঙ্গে বৃহতের একটা মাখামাখি ভাব আছে। এ কথা বৈজ্ঞানিকেরাও বলছেন। কতকটা বাতাস একটা ব্লাডারের মাঝে আবদ্ধ করে রেখেছেন; সে অবস্থায় বাতাসটা করছে কি? প্রাণপণে তার চারদিককার দেয়ালটাকে ঠেলছে বেরিয়ে যাবার জন্য। ব্লাডারের এক অংশে একটা ছুঁচ দিয়ে ফুটো করে দিন, বাতাসটা জোর করে বেরিয়ে যাবে সেই

রাস্তা দিয়ে মহাবায়ুর সঙ্গে মিশে যাবার জন্য। তাপের Radiation বা বিকিরণ আছে; আলোর Undulation আছে; কোথায়ও কাউকে ধরে রাখবার উপায় নাই; সবাই চাইছে তার বৃহত্তর স্বরূপের মাঝে মিশে যেতে। বেদ বলছেন, এইটাই হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে উদান বায়ুর কাজ।

এই দেহের আবরণে প্রাণকে আটকে রাখা হয়েছে—এই হচ্ছে জন্ম। কিন্তু প্রাণ এ বন্ধন হতে ছাড়া পাওয়ার জন্য অহরহঃ কেবল বাইরের দিকে ঠেলছে। এই ধ্বস্তাধ্বস্তিতে জীবনে নানা রূপ, নানা বৈচিত্র্য ফুটে উঠছে। কিন্তু আসলে সবার গতি সেই মরণের দিকে, সেই মহাকাশের দিকে।

জীবনটা চলছে একটা টানা-হ্যাঁচড়ার মাঝে। শাস্ত্রকার বলছেন প্রাণ আর অপানের আকর্ষণের কথা। অপানটা আধিভৌতিক জগতে মাধ্যাকর্ষণ বা Gravitation স্থানীয়। প্রাণকে সে টেনে আনছে নাভি পর্য্যন্ত, আবার প্রাণ তাকে টেনে তুলছে গুহ্য হতে নাভি পর্য্যন্ত। এই টানাটানিটাই হচ্ছে জীবন। এর মাঝে উদান সর্ব্বদাই প্রাণকে ঠেলছে ওপর দিকে, বেরিয়ে পড়বার জন্য। যতদিন প্রাণ এই দেহকে আশ্রয় করে থাকার নিয়তি থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত এই ক্রিয়াগুলিতে একটা সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু মেয়াদ ফুরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই উদানের ক্রিয়া প্রবলতর হতে থাকে—প্রাণের শিখাকে সে ঠেলে নিয়ে যায় ওপরের পানে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বায়ুর যে বৃত্তি, তা এসে প্রাণে পর্য্যবসিত হতে থাকে। পদনখ হতে আরম্ভ করে তাপ ও জ্যোতিঃকে আকর্ষণ করে উদান ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হতে থাকে আর মুমূর্ষু মানবের নিম্নাঙ্গ ক্রমে শীতল ও অসাড় হয়ে আসে। শেষ দশায় উদানের ক্রিয়াও প্রাণে পর্য্যবসিত হয়ে যায়। এই প্রাণকে বেদ বলছেন মুখ্য প্রাণ; ইনিই তাঁর শক্তিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করে এতদিন দেহের ওপর সাম্রাজ্য করে এসেছেন, আজ আবার শক্তি নিজের মাঝে সংহৃত করে নূতনরাজ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

তাপের বিকিরণ বা Radiationএ যেমন সীমাবদ্ধ তাপ অনন্ত আকাশে ছড়িয়ে যায়, তেমনি উদানকে অব্যাহতভাবে ক্রিয়া করতে দিলে মরণের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত জীবনের সঙ্গে এই জীবনটা মিশে যেত। কিন্তু মুখ্য প্রাণের অধিষ্ঠাতৃত্ব থাকায় তা হয় না, উদান তার শক্তিকে প্রাণে সমর্পণ করেই নিরস্ত হয়ে থাকে। এই মুখ্য প্রাণ শক্তিস্থানীয়; প্রকৃতি যেমন পুরুষের অনুবর্ত্তিনী, মুখ্যপ্রাণও তেমনি চেতনার অবভাসরূপিণী বাসনাকে অনুসরণ করে থাকে। বাসনার অনুসরণবশতঃ জীবের পরলোকে গতি হয় —মরণেই সব ফুরিয়ে যায় না।

পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে চেতনা, প্রাণ ও জড় এই তিনটী শক্তির উল্লেখ করেছিলাম। জীবনে যেমন দেখতে পাই, তনুপ্রাণ মনকে আশ্রয় করে এই ত্রিশক্তির বিকাশ, মরণেও ঠিক তাই দেখা যায়।

জীবনে যা স্থূল, মরণে তা সূক্ষ্মতর—এই মাত্র প্রভেদ। এখন যেমন কতকগুলি ভূতের সমবায় আমার এই দেহ, কতকগুলি জীবনযোনি-প্রযত্নের (Vegitative functions) সমবায়ে আমার প্রাণ, কতকগুলি চিন্তার সমবায়ে আমার মন, মরণেও তেমনি জেগে উঠে এই দেহ, এই প্রাণ, এই মন—কিন্তু আরও সূক্ষ্মতর হয়ে। অর্থাৎ মরণটা একটা নূতন জীবন ছাড়া আর কিছুই নয়।

মুখ্যপ্রাণ যখন উদানবায়ুর সহায়তায় সমস্ত প্রাণবৃত্তিকে গুটিয়ে আনতে থাকে, তখনই পঞ্চভূতের কারণীভূত ভূতসূক্ষ্ম হতে উপাদান সংগ্রহ

করে একটা নূতন দেহ সৃষ্টি হতে থাকে। এই দেহটা ভৌতিক দেহের অনুরূপ, কিন্তু তার চেয়ে আরও স্বচ্ছ, উজ্জ্বল এবং লঘু। মৃত্যুকালে মস্তকের চারিদিক থেকে একটা সূক্ষ্ম, তরল আলোকের ছটা বেরিয়ে আসতে থাকে; জীবন্ত-কালেও এই ছটামণ্ডলটা থাকে, কিন্তু তত স্পষ্ট হয়ে থাকে না। (হিন্দুর দেবদেবীর মাথার চারিদিকে একটা ছটা দেওয়া থাকে—এই জন্য।) এই ভাস্বর ছটামণ্ডল দিয়েই মরণের রাজ্যে জীবনের নূতন সজ্জায় জীবকে অভ্যর্থনা করা হয়।

শাস্ত্র বল্‌ছেন, জীবের গতি যেন জোঁকের মত। জোঁক যেমন একটা তৃণ হতে মুখ বাড়িয়ে আরেকটা তৃণ ধরে তারপর পূর্ব্বের আশ্রয়টা ছেড়ে দেয়, জীবও তেমনি একটা দেহ তৈরী হলে পর পূর্ব্বের দেহ ছেড়ে যায়। মৃতের দেহ জীবন্ত দেহের অনুরূপ বটে, কিন্তু তার যে সমস্ত খুঁৎ, তা এর মাঝে থাকে না। মরবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই দেহটা স্থূল দেহের মস্তকের একটু উপরে শূন্যে অবস্থান করে; তখন শিশুর নাভিরজ্জুর মত একটা রজ্জুতে প্রাচীন দেহের মস্তকের সঙ্গে নূতন দেহের পায়ের সংযোগ থাকে। কখনও কখনও এমনও হয় যে ওই রজ্জুকে অবলম্বন করে জীব প্রাচীন দেহে আবার ফিরে আসে। এই জন্য মরার পরও অন্ততঃ বারদণ্ড কাল অপেক্ষা করবার বিধি আছে। জন্মাবার সময় যেমন এখানে আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য লোকের অভাব ছিল না, মৃত্যুলোকে এই নবজন্মের সময়ও অভ্যর্থনা করবার লোকের অভাব হয় না। যে স্তরের আমি উপযুক্ত, সেই স্তরের আতিবাহিক সঙ্গীরা আমায় এসে তখন ঘিরে দাঁড়ায়। মরণকালে জ্ঞান ও দর্শন শক্তি তীব্রতর হয়ে ফুটে উঠলে মুমূর্ষু কখনও কখনও এদের স্পষ্টতঃ দেখতে পায় এবং এদের কথা বলেও।

এই যে মরণের কথা বল্‌লাম, এ খুব স্বাভাবিক এবং সুখের মরণ; যাদের আত্মশক্তি কথঞ্চিৎ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তাদেরই এই দশা। কিন্তু এমনও হতে পারে—এবং অনেক স্থলেই তা হয়ে থাকে, মরণ মানুষকে অভিভূত করে ফেলে। তন্দ্রায় যেমন আমরা একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যাই, তারপর ধীরে ধীরে স্বপ্নলোক জেগে ওঠে, তারপর জাগবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যেমন আবার আচ্ছন্ন দশা উপস্থিত হয়, মরণের পরও তেমনি আচ্ছন্ন দশা ঘটতে পারে। পৃথিবীতে জন্মাবার সময় মাতৃগর্ভে বাস করার মত মৃত্যুর গর্ভেও কতকটা সময় বাস করে তারপর পরলোকে জন্ম নিতে হয়। এই সময়টাতে দেহীকে সাহায্য করবার জন্যই হিন্দুর শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা। সে কথা পরে বল্‌ব।

মৃত্যুকে আমরা যতটা ভয় করি, আসলে মৃত্যু তেমন ভয়ের কিছু নয়। বাস্তবিক যদি এ ভয়ের কিছু হত, তাহলে ভগবান্ অহরহঃ আমাদের মাঝে এ ভয় জাগিয়ে রাখতেন। পরিশ্রমের পর যেমন নিদ্রা, জীবনের পর তেমনি মৃত্যু; বাস্তবিক মৃত্যু বিশ্রামই বটে; যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছে, এমন দুচারজন লোকের জবানবন্দী পেলে ব্যাপারটা হয়ত পরিষ্কার হবে। তাই আমাদের দেশের নয়, বস্তুতন্ত্রবাদী পাশ্চাত্য দেশের দু'একজনের মুমূর্ষু-দশার আত্মবিবৃতি এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি।

আর্ণল্ড্ সিগ্রিড্ নামে এক ব্যক্তি আল্‌স্ পাহাড়ের কাপপোটাক চূড়ায় উঠবার সময় বরফ ধসে কয়েক হাজার ফিট্ নীচে পড়ে যান। অচেতন ও সাংঘাতিক জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সিগ্রিড্ বলছেন—

"বেশ বুঝতে পারলাম যে আমি মরে গেছি। কিন্তু তার দরুণ আমার কোনও ভয় বা দুঃখ হল না। যদি আত্ম-রক্ষা করবার সুযোগ থাকত,

তাহলে হয়ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তাম। কিন্তু যখন বুঝলাম, নিজকে বাঁচাবার কোনও উপায়ই নাই, তখন একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। আমার মস্তিষ্ক তখন খুব দ্রুত চল্‌ছে; সময়ের জ্ঞান মোটেই ছিল না।…একবার স্ত্রী-পুত্রের কথা মনে হয়ে একটু কষ্ট হল; আবার জীবন-বীমার কথা মনে হতেই সে কষ্ট দূর হয়ে গেল। তারপরই মনে হতে লাগ্‌ল, আমি যেন এই রক্তমাংসের খাঁচাটা ছেড়ে পরমানন্দময় অমরজীবন লাভ করতে যাচ্ছি। সমস্তটা জগৎ যেন চোখের ওপর দেখ্‌তে পেলাম। মানুষের বাদ-বিসম্বাদ দুঃখ-দারিদ্র্য সব আমার চোখে ভেসে উঠ্‌ল। সুখের রহস্য যেন আমি বুঝ্‌তে পারলাম। মনে হল, যদি ফিরে যেতে পারতাম, তাহলে পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করতে পারতাম। আমার কাণে আনন্দময় শান্তির সুরলহরী গুঞ্জরিত হতে লাগ্‌ল, মনে হল, বিশ্ব-সংসার যেন গানের স্রোতে ভেসে চলেছে।… সঙ্গীরা আমায় যখন বিছানায় এনে শোয়ালো, তখন আমার শ্বাস চলছে না। ডাক্তার আমায় পরীক্ষা করে বললেন, জীবনের কোনও চিহ্নই তো দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমি কিন্তু তখন সম্পূর্ণ সচেতন থেকে মহা আনন্দ ভোগ করছি। মেয়েরা আমায় ঘিরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। ইচ্ছা হল একবার তাদের বুঝিয়ে দিই, মরণ কত সুখের, কিন্তু পারলাম না।…এখন-তখন করে কয়দিন পার হয়ে গেল। আমার কিন্তু কোনও কষ্টই হচ্ছিল না। পড়বার সময় মস্তিষ্কের ক্রিয়া যেমন দ্রুত ছিল, তেমন না হলেও কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেশী দ্রুত ছিল। জীবন সম্বন্ধে দীর্ঘবিচারে তন্ময় হয়ে যেতাম।…হঠাৎ একদিন মনে হল, আমার বড় কষ্ট, আর আমি অচেতন হয়ে পড়ছি। যখন পুনর্জীবিত হলাম, তখন ভয়ানক কষ্ট।…মৃত্যুকালীন সুখের কথা স্মরণ করে এখনও আমার খেদ হয়।”

রেভারেণ্ড হার্মান ষ্টাকনার মাউণ্ট সেণ্ট-বর্ণার্ডে বরফ চাপা পড়েছিলেন। তপ্রায় অবস্থায় তাঁকে উঠিয়ে আনা হয়। তিনি বলছেন—

“রাস্তা হারিয়ে প্রথমটায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। যখন চেষ্টা করেও আর পথ পেলাম না, তখন অবসন্ন হয়ে বরফের উপর পড়ে গেলাম। আত্মরক্ষার চেষ্টা যখন ছেড়ে দিলাম, তখনই এক অনুপম আনন্দে যেন আমায় আপ্লুত করে দিল। আমার হাত-পা নাড়বার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম সবই। বরফে চাপা পড়েও আমি বরফ পড়া সমান ভাবেই দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম। তখন এত আনন্দ হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল, কেউ এসে যেন আমার এ সুখে বাধা না দেয়। ক্রমে আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল—অবশেষে আমি আরামে ঘুমিয়ে পড়লাম যেন।”

জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মেচনীকফ বলছেন—“একবার আমি জ্বরে খুব কাতর হয়ে পড়েছিলাম। অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। একদিন শরীরের তাপ হঠাৎ ১১০ ডিগ্রী হতে সাধারণ অবস্থায় নেমে এল। ভয়ানক একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করতে লাগলাম, মনে হল, মৃত্যু যেন ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, সে অবস্থা আমার কাছে, দুঃখকর না হয়ে বরং অত্যন্ত আনন্দদায়কই মনে হচ্ছিল।”

ডাক্তার বার্ট একবার বরফের ওপর স্কেট্ করতে করতে ফাটল দিয়ে গলে পড়ে জলে ডুবে গিয়েছিলেন। তিনি বল্‌ছেন—

“আত্মরক্ষা করবার সমস্ত চেষ্টাই যখন ছেড়ে দিলাম, তখন আর আমার কোনও কষ্টই হল না। মৃত্যু যে এত আনন্দের হবে, এ ভেবে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার শরীর হিম হয়ে গেল কি শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল—এ আমি বুঝতেই পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল যেন খুব

নরম শয্যায় কে আমায় শুইয়ে দিয়েছে। চারদিকে স্বর্গীয় সঙ্গীতধ্বনি শুনতে লাগলাম—এমন মধুর সঙ্গীত আমি জীবনে কখনো শুনিনি। সহসা শুভ্র জ্যোতিঃতে চরাচর পূর্ণ হয়ে গেল। চন্দ্র, সূর্য্য, তারা কিছুই নাই—অথচ অলৌকিক শুভ্র দীপ্তিতে সব উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল যেন। এমন আশ্চর্য্য আলোও আমি কখনো দেখিনি। সঙ্গীতের ধ্বনি ক্রমে মৃদু হয়ে এল, কিন্তু একেবারে থেমে গেল না। এই সময় আমি আমার গতজীবনের সমস্ত ঘটনা বায়োস্কোপের মত চোখের সামনে দেখতে পেলাম।...এমনি আনন্দে বিভোর হয়ে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, হঠাৎ আমি যেন অচেতন হয়ে পড়লাম। এর মাঝেই একবার বেদনা পেয়ে জেগে দেখি, আত্মীয়-স্বজনেরা আমায় জল হতে তুলে এনে জল নিমজ্জিতের যে ভাবে শুশ্রূষা করতে হয়, তাই করছে।"

এই প্রসঙ্গে আত্মহত্যা সম্বন্ধে দু'চার কথা বললে বোধ হয় মন্দ হয় না। সংসারের যন্ত্রণা এড়াবার জন্য কেউ কেউ আত্মহত্যা করবার সঙ্কল্প করে থাকে। এর চেয়ে মারাত্মক ভুল আর কিছুই হতে পারে না। এতে জ্বালাযন্ত্রণা ফুরিয়ে যাওয়া দূরে থাকুক, আরও তা বেড়েই যায়। কেমন করে, তাই বল্‌ছি।

জীবের গর্ভাশয়ে যেমন কোটী কোটী জীবাণু সঞ্চিত থাকে, তেমনি আমাদের সমস্ত কর্ম্মও কর্ম্মাশয়ে সঞ্চিত থাকে। এই কর্ম্মাশয় হতে বিপাক বা চরম পরিণতির উপযোগী কতকগুলি কর্ম্ম বাসনার যোগে যুক্ত হয়ে জীবকে নবজন্মের প্রেরণা দিয়ে থাকে। এই প্রেরণাবশতঃ জীবের কর্ম্ম-বিপাকানুযায়ী জাতি, আয়ু ও ভোগ নিরূপিত হয়ে যায়। অর্থাৎ জীব কোথায় জন্মাবে (জাতি), কতদিন বেঁচে থাকবে এবং কি ভোগ করবে, তার একটা ছক তৈরী হয়ে যায়। এইটাই কর্ম্মের ফল। একে নিয়তিও বলে।

আত্মহত্যাকামীরা মনে করে, তারা আয়ুকে সংক্ষিপ্ত করে বুঝি ভোগের জ্বালা হতে বেঁচে যাবে। বাস্তবিক কিন্তু তা হয় না। জীবন হতে মরণ পর্য্যন্ত একটা অনুবৃত্তিই চল্‌ছে, সুতরাং দেখার জগৎ হতে অদেখার জগতে যাওয়া ছাড়া জীবনে মরণে বড় একটা পার্থক্য নাই। তুমি রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আত্মহত্যার সঙ্কল্প করছ, ভাবছ, তাহলে তোমার ভোগের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবিক তা হয় না। এখন যদি তোমার দশ বছর রোগভোগের মেয়াদ থেকে থাকে, আর পাঁচ বছর রোগ ভোগ করে তুমি আত্মহত্যা করতে যাও, তাহলে তুমি শুধু পাঁচ বছরের বকেয়া স্থূল-ভোগটাকে সূক্ষ্ম-ভোগে পরিণত করবে মাত্র—ভোগের বিলোপ ঘটাতে পারবে না। অর্থাৎ মরার পরও বাকী ভোগটুকু পূরণ হবার জন্য ভোগ-বাসনা তোমার অনুসরণ করবে এবং মরার পরও তুমি দেখবে, তোমার সেই রোগশুদ্ধই তুমি মরেছ। হাঁপানীর টান না সইতে পেরে যদি আত্মহত্যা করে থাক তো মরেও হাঁপাতে হবে—যে পর্য্যন্ত নাকি টানের মেয়াদ না ফুরাচ্ছে। বরং বেঁচে থাক্‌তে একটু স্বাধীনতা ছিল, যখন তখন ডাক্তার ডাক্‌তে পারতে, ওষুধ খেয়ে সাময়িক উপশম পেতে। কিন্তু মরে এখন সে পথও বন্ধ হয়েছে। যেমন স্বপ্নের বাঘে তাড়া করলে স্বপ্ন না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত আর নিস্তার নাই, তোমার সৃষ্ট বাঘই তোমায় তাড়িয়ে ফিরবে, অর্থাৎ স্বপ্নে যেমন স্বাধীনতা থাকে না, তেমনি মরার পরও আর জীবের কোনও স্বাধীনতা থাকে না—ভোগের বাসনা সূক্ষ্মশক্তির সহায়ে অব্যাহতভাবে আত্ম-প্রকাশ করে থাকে। এইজন্য আত্মহত্যাকারী পতিত, তার শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি বৃথা, এমন কথা হিন্দুর মাঝে চল্‌তি আছে। কর্ম্মফল ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই, অতএব আত্মহত্যা দ্বারা ভোগ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুধু নির্ব্বুদ্ধিতাই নয়, মারাত্মকও বটে।

আলোচনা

বর্ত্তমান বহির্মুখী সভ্যতার প্রসারে আমাদের চিন্তাশক্তিও দিন দিন দুর্ব্বলতাই ঘটিতেছে বলিয়া মনে হয়। শুদ্ধ চিন্তা (abstract thought), যে চিন্তায় কর্ম্মের যোগ অতি সুস্পষ্ট নয়, এরূপ চিন্তার শক্তিতে আমরা আস্থা হারাইতে আরম্ভ করিয়াছি। একটা বিষয় গভীর ভাবে না ভাবিয়া যাহা মনের উপর ভাসিয়া উঠিল, তাহাকেই কার্য্যে পরিণত করিবার একটা উদ্দামতায় আমাদের কর্ম্মকেও লঘু করিয়া তুলিতেছি। ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা ইত্যাদি সেকেলে বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে। ইহা যে প্রকারান্তরে মানসিক দুর্ব্বলতা, ইচ্ছাশক্তিরই দৈন্য, ইহা আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি না। ভিতরের কাজের চেয়ে বাইরের কাজের আমরা কদর করিতেছি বেশী। ইহার ফলে হৃতসর্ব্বস্ব জাতির পরানুকরণ-প্রবৃত্তিই বিশেষ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে এবং যথার্থতঃ জাতীয় মস্তিষ্কের অপব্যবহার ঘটিতেছে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে, বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে ব্রহ্মবিহারের কথা; উহা কর্ম্মনিরপেক্ষ শুদ্ধ ভাবনা মাত্র। আজকাল যেমন রেডিও-ষ্টেশন হইতে বেতার বার্ত্তা দিগ্-দিগন্তরে ছড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে, উহাও তেমনি আধ্যাত্মিক রেডিও-এ্যাক্টিভিটি; ধারণা করিবার উপযোগী যন্ত্র যেখানেই থাকিবে, সেখানেই মূল সুরটী বাজিয়া উঠিবে। একদিন বিবেকানন্দ পওহারী বাবার মাঝে এই শক্তির সন্ধান পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন—ভাব-সংক্রামণ যে বাস্তব জগতের কর্ম্মচপলতার চেয়েও শক্তিশালী, এই কথাই তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের অনেক গভীরতর বাণীর ন্যায় এই বাণীও আমরা উপেক্ষা করিতেছি। অন্তর্গূঢ় তপঃপ্রেরণা আমাদের কাছে আজকাল সময়ের বাজে খরচ। অথচ এই বিজন তপস্যা যে কি করিয়া যুগান্তরকারী বিপ্লব ঘটাইতে পারে, সে খবর আমরা জানিয়া-শুনিয়াও বিশ্বাস করিতে চাহি না। আমাদের দেশের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, পাশ্চাত্য চিন্তার জগতে কাণ্টের অসামান্য প্রভাব কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই আকুমার ব্রহ্মচারী দার্শনিক-যোগসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন—এরূপ সন্দেহ করবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু তিনিও পরিণত বয়সে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ক্রিটিক লিখিবার সময় বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা বলিতেছি, তাহা ক্ষণিকের খেয়াল নয়। গত ৪০ বৎসর ধরিয়া একাগ্র ভাবনা দ্বারা নিঃসংশয়তরূপে সত্য বলিয়া যাহা বুঝিয়াছি, যে দর্শনের মাঝে কোথাও বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি অনুভব করি নাই, আজ তাহাই আমি প্রকাশ করিতে চাহিতেছি।" অন্য কোনও কথা বলিতে চাহি না, কেবল বলি, এই সুদীর্ঘ একাগ্র ভাবনারও একটা ফল আছে। যে আর কিছুই করিতে পারে না, সেও দিনান্তে পাঁচ মিনিটের জন্য চিত্তের সমগ্র একাগ্র-শক্তিকে একটা মহৎ লক্ষ্যের প্রতি সংবদ্ধ করিয়া আত্মার পরিপুষ্টি ও বিশ্বের কল্যাণ উভয়ই সংসাধিত করিতে পারে। কিন্তু আজকাল আমাদের সে অবসরটুকু কোথায়?

*

অনবসর সময়টা মানুষ যা করিয়া কাটায়, তাহাই তাহার জীবনের মাপকাঠী। ছোট ছোট ছেলেপিলে হয়ত খেলা-ধূলাই ভালবাসে; তাহাদের জোর করিয়া কর্ত্তব্যের ঘানিতে জুড়িয়া দেওয়া হয়। তাই যখনই তাহারা ছুটি পায়, তখনই তাহাদের মনের আনন্দ উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতায় ফুটিয়া উঠে। ইহার মধ্যে যদি কোনও সুবোধ ছেলে অবসর

সময়টাতেও কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদনে নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে শিক্ষকের মুখে তাহার প্রশংসা আর ধরে না। অবসর-বিনিয়োগের প্রণালী দ্বারা যে শুধু শিশুরই মনুষ্যত্বের যাচাই হয়, তাহা নহে ইহা সকলের সম্বন্ধেই তুল্যভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। পাশ্চাত্য জগতে একটা মতবাদ প্রচলিত আছে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত খাটিয়া যাওয়া— To die in harness। অবিরাম কর্ম্মকে বাস্তব জগতে প্রাধান্য দিয়াও হিন্দু কিন্তু অবসরের লোভটুকু ছাড়িতে পারে নাই। বেদান্তের সাধনাই হইল অখণ্ড কর্ম্ম ও অখণ্ড অবসরকে যুগপৎ নিজের মাঝে ফুটাইয়া তোলা। ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, কর্ম্মযোগের রহস্য। কিন্তু ইহা ছাড়া একেবারে স্থূলেও কর্ম্মবিরহিত হইয়া অবস্থান করিবার আদর্শও হিন্দু-সাধকের চিত্তকে কম আকর্ষণ করে নাই। সাংখ্যযোগ মানুষকে এই পথ দেখাইয়া দিয়াছে। এই সমস্ত দার্শনিক চিন্তার প্রসারে, অবসর অর্জ্জন করা এবং তাহাকে বিশুদ্ধরূপে উপভোগ করা হিন্দু-সভ্যতায় একটা বিশিষ্ট প্রেরণা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অবসর যাপনের প্রণালীদ্বারাই যে জীবনের আদর্শের যাচাই হইতে পারে, ইহা পাশ্চাত্য চিন্তাবীরেরাও স্বীকার করিয়াছেন। এবং এই কষ্টিপাথরে কষিয়া তাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে যে রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মোটেই উক্ত সভ্যতার গৌরব খ্যাপন করে না। ভোগোপকরণ দিনের পর দিন স্তূপাকার হইয়া উঠিতেছে, এবং ভোগের উপকরণ সরবরাহ করিতে গিয়া এক শ্রেণীর লোক নির্ম্মমভাবে পিষ্ট হইতেছে। যাহারা ভোগী এবং যাহারা মজুর, তাহারা কি ভাবে আপনাদের অবসর সময়টা কাটায়?—হল্লায়, নেশায়, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতায়। যে কর্ম্ম মানুষের অবসরকালকে এমনই বীভৎস করিয়া তোলে, তাহা যতই সুসভ্য হউক না কেন, তাহাকে মনুষ্যত্বের বিকাসক বলিয়া স্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। আবার এ কথাও বলি, শুধু পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে গাল দিয়াই আমরা রেহাই পাইব না। আমরাও কি করিয়া আমাদের অবসর যাপন করি, ইহা জাতিগত এবং ব্যক্তিগত-ভাবে যাচাই করিয়া দেখা প্রয়োজন; তাহা হইলে বাহিরে বাহিরে যেখানে সভ্যতার ও সাধুত্বের জৌলুষে আমরা নিজকে প্রবঞ্চিত করিতেছি, তাহা ধরা পড়িয়া গিয়া আমদের সত্য মূর্ত্তিটী প্রকট হইয়া পড়িবে। সাধকদের মাঝে একটা কথা চল্‌তি আছে, স্বপ্ন দেখিয়া বোঝা যায়, কে কতটুকু উন্নতি লাভ করিল। কথাটা গভীর মনস্তত্বমূলক বটে। স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যে যাহার অবসর-কাল প্রদীপ্ত হইয়া না উঠিল, সে বাস্তবিকই দুর্ভাগা।

*

আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলিয়াছিলেন, আমার "অন্তর্নিহিত আনন্দ অপরের মাঝে সংক্রামিত করাই যদি আর্টের সার্ব্বভৌম সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে যে অতি অল্প আয়োজনে অতি নিবিড় আনন্দ অপরের মাঝে সংক্রামিত করিতে পারে, তাহার আর্টই শ্রেষ্ঠ।" জীবনেরও একটা আর্ট আছে, এবং সেই আর্ট যাচাই করিতে গিয়া এই নীতিও সেখানে প্রযোজ্য হইতে পারে। মানুষ চায় সুখ, মানুষ চায় শান্তি। মদ খাইয়া হউক, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া হউক, পরের জন্য খাটিয়া হউক, যেমন করিয়াই হউক না কেন, একটুখানি সুখের মুখ দেখিতে সবাই লালায়িত। সুখ-সোয়াস্তি পাওয়াই যদি মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন, কিরূপে স্বল্প আয়াসে আমরা বিশুদ্ধতররূপে সে সুখের ভাগী হইতে পারি। যে সভ্যতা সে

সুখের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিবে, নির্ব্বিচারে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লইব। আসলে আমাদের অভাবটা বাইরে নয়, অন্তরে। বাইরের অভাব মিটাইতে গিয়াও আমরা অন্তরেরই তৃপ্তি খুঁজি। বর্ত্তমান বহির্ম্মুখী সভ্যতা এই অন্তরের তৃপ্তি কতটুকু দিতে পারিয়াছে, একবার তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। বিজ্ঞানের উন্নতি বহু অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করিতেছে; কিন্তু মানুষের অন্তর তাহাতে তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিতেছে কি? সমষ্টিগত ভাবে মানব জীবন খুবই স্পৃহণীয় বলিয়া মনে হইতেছে কি? বিজ্ঞান যে উন্নতি করিয়াছে, তাহা রসাতলে তলাইয়া যাউক, এমন কথা বলি না। কিন্তু বিজ্ঞানের মোহে অন্ধ হইয়া নিজের সুখ-শান্তি নিজে বিনষ্ট করিতেছি কিনা, তাহাই ভাবিয়া দেখিতে বলি। ইন্দ্রিয়-তর্পণের কতখানি উপকরণ বিজ্ঞান জুটাইয়া দিল, তাহা দিয়া তাহার মূল্য নিরূপিত হইবে না। কেননা ইন্দ্রিয়ের দাহ বাহিরেই প্রকট হয়; উহার নিবৃত্তিতে যে অন্তর্দাহও প্রশমিত হইবে এমন কোনও আইন নাই। এই হিসাবে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা দার্শনিক সভ্যতার চেয়ে আর্ট হিসাবে বড় নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়া মানুষের ব্যাপ্তি-বোধকে স্থূলেও উন্মেষিত করিয়া দেওয়া। তবে এই ব্যাপ্তি ঘটাইতে গিয়া বিজ্ঞান অকাণ্ডও কম ঘটাইতেছে না; তাহাতে জগতের সুখ-শান্তি বাড়িতেছে কি কমিতেছে, পণ্ডিতেরা তাহার বিচার করিবেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতাকে সমাধানরূপে না সমস্যারূপে গ্রহণ করিব, ইহাই একটা সমস্যা। এই সভ্যতার যাঁহারা দালাল, তাঁহারা বলেন, ইহাই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমাধান। কিন্তু অন্তরের মাঝে সুখ-শান্তিরূপে যেখানে বিজ্ঞানের দান খুঁজিয়া পাই না, সেখানে এই কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বরং যেখানে প্রাচ্য-সভ্যতার অনাড়ম্বর শ্রীতে অন্তর মাধুর্য্যে ভরিয়া তোলে দেখি, সেখানে আর্টের জয়মাল্য তাহাকেই দিতে ইচ্ছা হয়। বৈজ্ঞানিক সভ্যতার চাপে পড়িয়া সুরূপা যুরূপাও মাঝে মাঝে Back to nature! বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে, শুনিতে পাই!

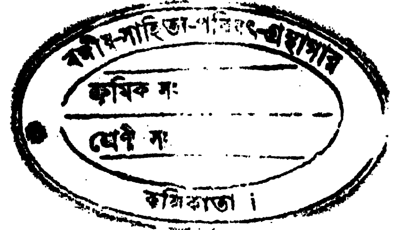
*

হিন্দুর মদন দেবতা। বুঝি ইঁহারই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সংস্করণ ফ্রয়েডের 'লিবিডো।' কিন্তু এই লিবিডো দেবতা না অপদেবতা বুঝিয়া ওঠা ভার। অতি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে এই অপদেবতার অত্যাচারের কথা শুনিতে পাইতেছি। বাংলার কথাসাহিত্যে যাহা চলিতেছে, তাহা 'আর্ট' না 'ডার্ট', তাহা নিয়া রসিকমহলে কলরবের অন্ত নাই। সাহিত্যে নির্ব্বিচারে আদিরসের আবির্ভাব ঘটানো যে দোষের নয়, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ধুরন্ধর সাহিত্যিকেরা ফ্রয়েডকে সাক্ষী মানিয়াছেন। ফ্রয়েড বলেন, জগতে যত চিত্তের প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই এই আদিরসের ধাক্কা, লিবিডোর বিজৃম্ভণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কামশক্তি অবরুদ্ধ থাকিয়া আধারকে বিদীর্ণ করিয়া তির্য্যক পথে যখন বাহির হয়, তখনই জগতে ফুটিয়া উঠে সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা, ধর্ম্ম, শৌর্য্য, বীর্য্য ইত্যাদি। ফ্রয়েডের এই তত্ত্বের দোহাই দিয়া রসিকেরা বলিতেছেন, আদিরসই যদি সবার আদি, তাহা হইলে সাহিত্যেরও সেটা আদি; আর যাহা আদি তাহাকে বে-আবরু করিয়া দেখানোতে দোষ কি? —ফ্রয়েড এবং ফ্রয়েডপন্থীর সকল কথাই মানিয়া লইতে রাজী আছি; জগৎটা যে কামের বিজৃম্ভণ, তাহাও না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম (যদিও গীতার সেই "অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ

কামহেতুকং", ১৬।৮ শ্লোকটা কানে বাজিতেই থাকে।) কিন্তু তবুও দেখি, নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! ইউরোপের অবরুদ্ধ কাম সৃষ্টি করিল একটা উগ্র, প্রচণ্ড, জ্বালাময় সভ্যতা, যাহার সন্তাপে আমাদের বরফের মত ঠাণ্ডা রক্তও আজ টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে সুরু করিয়াছে। আর আমাদের অবরুদ্ধ 'লিবিডো' আর কিছু সৃষ্টি করিবার পথ না পাইয়া শেষকালে কথা-সাহিত্যের আসরে আদিরসের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়া সকলকে রসে চুবাইয়া তুলিল? ইউরোপের সাহিত্যে আদিরসের বিকার দেখা গিয়াছে, অতএব আমাদেরও তাহা অনুকরণ করা প্রয়োজন, নতুবা স্বাতন্ত্র্য (!) ফুটিবে কি করিয়া?

*

আকস্মিক কারণে কাম অবরুদ্ধ হইয়া জগতে শিব-সুন্দরের আবির্ভাব ঘটায়, ফ্রয়েডতন্ত্রী বিস্মিত জগৎকে এই বার্ত্তা শুনাইয়া কামেরই জয়ধ্বনি দিতেছেন। কথাটা মূলে সত্য হইলেও কিন্তু দৃষ্টির দোষে সত্য কিরূপ বিকৃত আকার ধারণ করে, ফ্রয়েডতন্ত্র তাহার এক চমৎকার উদাহরণ। প্রেমেরই বিকার কাম, না কামেরই বিকার প্রেম, ইহার মীমাংসা কোথায়? স্মরজিৎ মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া ইহার সমাধান কে করিবে? কিন্তু একটা কথা মনে হয়, আকস্মিক কারণে কাম অবরুদ্ধ হইলে যদি সুন্দরের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে যাহারা জানিয়া-শুনিয়া, স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে এই কামকে অবরুদ্ধ করিবার সঙ্কেতের অনুশীলন করে, অর্থাৎ আমাদের সনাতনী-ভাষায় যাহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করে, তাহারা আকস্মিক-নিরোধীদের চেয়ে নিশ্চয়ই চতুর এবং উন্নত শ্রেণীর জীব। সাহিত্যে অবাধ কামচর্চ্চা চালাইতেছি, বলিতেছি, কাম হেয় নয়, উহা অবরুদ্ধ হইলেই সত্য-সুন্দরের প্রকাশ ঘটে; আবার যাঁহারা শ্লীলতা ও সংযমের দোহাই দিয়া এই কাম-চেষ্টাকে সংরুদ্ধ করিবার উপদেশ দিতেছেন, তাঁহাদিগকে বেরসিক রুচিবাগীশ বলিয়া গালি পাড়িতেছি;—এই বিচিত্র মনোভাবের তো কোনও কূল-কিনারা পাইলাম না। ইহা যে লিবিডোর কোন্ নমুনা, তাহা ফ্রয়েডই বলিতে পারেন। গৌরব যে কামজয়ের, কামের নয়—এ কথা তো ফ্রয়েড মানিয়াও অক্লেশে বলা চলে,; তাহাতে বিজ্ঞান শাস্ত্র অশুদ্ধ হইয়া যায় না। তবুও যে আমরা কামেরই জয়ধ্বনি করি, তাহারই যৌক্তিকতার প্রমাণ করিবার জন্য ফ্রয়েডকে সাক্ষী মানি, ইহাতে শুধু এই প্রমাণ করে, এই বীর্য্যহীন জাতির অবরুদ্ধ লিবিডো আর কোনও পরীবাহ (outlet) খুঁজিয়া পায় নাই—একটী ছাড়া! এ কথা ভাবিয়া হাসিব না কাঁদিব!



সত্যকাম

--*--

(৯)

রাত ক্রমেই গভীর হয়ে চলেছে। কিন্তু আজ আর কারু চোখে ঘুম নাই। সত্যকাম মায়ের বুকে ফিরে এসেছে, কিন্তু সে যে কি বার্ত্তা নিয়ে এসেছে, তা কি মা জবালা জানেন না?···আশা-আকাঙ্ক্ষায় মায়ের মন দুল্‌ছে—কি জানি, কি খবরই বা শুনতে হয়!—আর সত্যকাম?···কোথা হতে একটা সঙ্কোচের বোঝা তার বুকেও যেন চেপে বসেছে—সে কিছু জানে না, কিছু বোঝে না, তবুও মুখ ফুটে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতেও তো সাহস হয় না। মাকে জড়িয়ে নিস্তব্ধ হয়ে সে পড়ে আছে; সমস্ত রাতের মাঝে মা যে দুটী চোখের পাতা এক করতে পারেন নি, তা কি আর সে জানে না?—তারও পোড়া চোখে যে আজ ঘুম নাই!

ভোরের পাখী গেয়ে উঠল। প্রতিদিনকার অভ্যাসমতই মা জবালা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠ্‌লেন, "গুরো, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!"—সত্যকাম একটু নড়েচড়ে আরও নিবিড়ভাবে মাকে জড়িয়ে ধর্‌ল।

মা তাকে বুকের কাছে টেনে এনে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "ফিরে এলি কেন, বাপ?" তাঁর কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই।

সত্যকাম মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে বল্‌ল, "তুমি তো আমার গোত্র-পরিচয় বলে দাওনি মা!"—এ কথায় লজ্জা পাওয়ার কি আছে, তা সে জানে না, তবুও তার সমস্ত শরীর যেন লজ্জায় মীইয়ে গেল।

আর তো সংশয় জমিয়ে রাখবার অবকাশ নাই। এই যে একটুখানি আগেও কি এক অজানা আশঙ্কায় মায়ের বুক কেঁপে উঠ্‌ছিল, মুহূর্ত্তের মাঝে সে যেন বরফের মত হিম আর পাথরের মত নিথর হয়ে গেল। মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে একটা তুষারশীতল স্পর্শ যেন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে আকাশময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়্‌ল, আর তারই সাথে সাথে মায়ের সুচিরসঞ্চিত সকল দাহ নিমেষের মাঝে জুড়িয়ে গেল।

একটী কথাও না বলে সত্যকামের হাত ধরে মা কুটীর হতে বেরিয়ে এসে অঙ্গনে দাঁড়ালেন। আঁধারের তখন বিদায়-বেলা; সবিতার দূত তখনো এসে পৌঁছায়নি, কিন্তু বনানীর শির তার চরণ-পাতের অস্পষ্ট প্রতীক্ষায় ধূসর হয়ে উঠেছে। স্তব্ধ তরু-শ্রেণীর ফাঁকে দূরের পাহাড় ঘন-নীল হয়ে দেখা যাচ্ছে—আর তারই শিখরে শিখরে অরুণের আভাস ঢেউয়ে ঢেউয়ে দিগন্তের কোলে লুটিয়ে পড়ছে।

আলো-আঁধারের এই মিলন-বেলায় একটী নিস্তরঙ্গ জ্যোতিঃশিখার মতই তার তপ-

স্বিনী মায়ের মূর্ত্তিখানি! একবার সে প্রশান্ত অথচ প্রদীপ্ত মুখের পানে তাকিয়ে তার ক্ষুদ্র বুক জুড়ে যেন জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি আলোড়িত হয়ে উঠ্‌ল!—সে বেদনা, সে ব্যাকুলতা বোঝাবার মত ভাষা সে জানে না।—এই তো তার মা—এমনি করে এই মায়েরই হাত ধরে সে যুগ-যুগান্তর আলোর স্রোতে ভেসে এসেছে—এই মা-ই যে তার চিরারাধিতা ইষ্টা, বরদা, কল্যাণী!—

সত্যকামের দু'চোখ বাষ্পে ছেয়ে এল।

প্রভাতের তরলিত সমীরণকে কম্পিত করে মা ডাক্‌লেন, "সত্যকাম!"

আকুলকণ্ঠে সত্যকাম উত্তর করল, "মা!"

জবালা তেমনি সুরে প্রশ্ন করলেন, "বল্ দেখি, আমি তোর কে?"

দুই হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে বাষ্পাকুল দুটী চোখ মায়ের মুখের পানে তুলে সত্যকাম বল্‌ল, "তুমি মা—আমার মা!"

স্নিগ্ধকণ্ঠে মা বললেন, "হাঁ বাবা, আমি তোর মা, তুই আমার ছেলে।—আমি মা, তুই ছেলে—এর চেয়ে নির্ম্মল সম্বন্ধ আর কি হতে পারে?—এই পরিচয়ের চেয়ে তোর আর কি পুণ্যতর গোত্রপরিচয় থাক্‌তে পারে বাপ্!"

সত্যকাম আর একটী কথা না বলে অনিমেষ চোখে মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে রইল। প্রভাতী তারার মত স্নিগ্ধোজ্জ্বল মায়ের দুটী চোখ হতে অজস্র স্নেহ ক্ষরিত হয়ে তার দেহের অণু-পরমাণুকে প্লাবিত করছে যেন। তার দুটী কাণ ভরে প্রণব-ঝঙ্কারের মত বাজতে লাগল শুধু—"আমি মা—তুই ছেলে!"—"আমি মা—তুই ছেলে!"

পরমস্নেহে ছেলের কপাল থেকে এক গুচ্ছ কেশ সরিয়ে দিয়ে মা ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগলেন, "আমি তো জানি না বাবা, তোর কি গোত্র! আমি ছিলাম পরিচারিণী। বহু পরিচর্য্যা করে যৌবনে তোকে আমি পেয়েছি—তোকে পেয়ে আমার বুক ভরে উঠেছে, বিগতদিনের সকল জ্বালা সকল গ্লানি নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে—এর-পর তো আর আমি জানি না বাপ, জান্‌তে চাইনিও কোন দিন—তোর গোত্র কি! শুধু এইটুকু জানি, আমার নাম জবালা; আর তুই সেই অভাগিনী জবালার চোখের মণি সত্যকাম।—সংসারে এই মাত্র তোর পরিচয়। অসঙ্কোচে বল্‌তে পারবি না বাবা, গুরুর কাছে—মা জবালার ছেলে আমি সত্যকাম!"—বল্‌তে বল্‌তে ছেলের মুখের উপর মায়ের মুখখানি নুয়ে পড়্‌ল। কি সুগভীর আর্ত্তি মাখা ছিল মায়ের এই শেষের কথা কয়টীতে—অপরিসীম বেদনায় সত্যকামের বুকের ভিতরটা যেন টন্‌টন্ করে উঠ্‌ল।

ক্ষুদ্র বাহুখানি দিয়ে মায়ের কণ্ঠ বেষ্টন করে, মায়ের কপোলে কপোল রেখে সত্যকাম বল্‌ল, "চিরদিন এই কথাই তো জানি গো—তুমি আমার মা, আর আমি তোমার ছেলে! আর কোনও পরিচয়ে আমাদের প্রয়োজন কি মা!"

কি অনির্ব্বচনীয় সোহাগ আর সান্ত্বনা

সে কণ্ঠের সুরে! সে স্বরে, সে স্পর্শে মায়ের বুকে রুদ্ধস্রোত জাহ্নবীর ধারা উথলে উঠ্‌ল যেন। ঝর্‌ঝর্‌ করে মায়ের দু'চোখ হতে অশ্রু ঝরতে লাগ্‌ল।—এমনি বিশ্বস্ত নির্ভরতা যেখানে, সেখানে কি ছলনার অবকাশ হতে পারে?—মা জবালার মন মুচ্‌ড়ে কেঁদে উঠ্‌ল। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু শুধু মায়ের পরিচয়েই তো ব্রহ্মচারীর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না, বাবা। তোর যে পিতৃ-পরিচয় চাই। সে পরিচয় আমি কি করে দেব!"

অতিকষ্টে জবালা এই শেষের কথা কয়টি উচ্চারণ করলেন।—আবার প্রলয়-তাণ্ডব সুর হয়েছে তাঁর বুকে!

তেমনি করে মাকে জড়িয়ে থেকেই সত্যকাম বল্‌ল "তুমি জান না মা, আমার পিতা কে?" সন্তানের এই নিঃসঙ্কোচ সরল-কণ্ঠের জিজ্ঞাসা শাণিত অসিফলকের মতই মায়ের বুক বিদ্ধ করল যেন।

মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে মা বল্‌লেন, "হয় তো জানি, হয় তো জানি না। কি করে সে কথা তোকে বলি!"—এ তো কথা নয়—এ যেন আর্ত্তনাদ!

ধীরে-ধীরে মায়ের বাহুবন্ধন হতে নিজকে মুক্ত করে তাঁর হাত ধরে সত্যকাম উষালোকের পানে মুখ করে দাঁড়াল। তারপর অবিচলিত কণ্ঠে বল্‌ল, "কোনও প্রয়োজন নাই মা আমায় সে কথা বল্‌বার। তুমি মা—আমি ছেলে, জগতের কাছে এই পরিচয়ই আমাদের যথেষ্ট। এই রোচমানা উষা আর শুচিব্রত সবিতাকে সাক্ষী করে বল্‌ছি, জগতের কারু কাছে আমার মাকে আমি হেঁট হতে দেব না।—ব্রহ্মবিদ্‌ আচার্য্য আমার হৃদয় জানেন, ব্রহ্ম হতে তিনি আমায় নিরাকৃত করবেন না, এ শ্রদ্ধা আমার আছে। আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁকে বল্‌ব তোমার কথা, বল্‌ব, 'তুমিই আমার পিতা, জবালা আমার মাতা—এই আমার গোত্র-পরিচয়—এই অধিকারে তোমার কাছে এসে আমি দাঁড়িয়েছি।' বল্‌ব, 'পিতা নোহসি—পিতা নো বোধি।' "

পূবের আকাশ ভেঙে ধীরে ধীরে উষার অরুণিমা চার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তারই এক ঝলক্‌ আলোক এসে মাতা-পুত্রের মূর্ত্তিকে শান্ত তপোবনের প্রাঙ্গনে চিত্রবৎ প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে। সত্যকামের কথা শুনতে শুনতে কি একটা মোহে যেন জবালাকে আবিষ্ট করে তুল্‌ল। তিনি দেখলেন, এ তো তাঁর সে কুমার বালক নয়, এ যে কোন্‌ জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষির বিদ্যুৎছটা তার চোখে, সামের ঝঙ্কার তার কণ্ঠে, ব্রহ্মবর্চ্চসের দীপ্তি তার সুকুমার তনুর রেখায় রেখায়!

পা দুটী অবশ হয়ে আস্‌ছে যে! নতজানু হয়ে ছেলের কাঁধে মাথা রেখে মা জবালা স্রোতের বেগে বেতস-কাণ্ডের মত থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। অস্ফুটস্বরে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল—"বাবা!"

সত্যকাম অরুণালোকে পাষাণপ্রতিমার মত দাঁড়িয়ে রইল। (ক্রমশঃ)

———

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

সকলকে আপন করবে শুধু বাইরে কথাবার্ত্তায় মেলামেশায় নয়—তা করে সাধারণ লোকে। সাধু নিঃসঙ্গ থেকে আপন সত্তায় সবাকার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন—তিনি কাউকে আবাহনও করেন না, বিসর্জ্জনও করেন না। সকলকে ভালবাসেন বলে তিনি কেবল গলাগলি করেই বেড়ান না, বা কারও বিরাগে মর্ম্মাহত হয়ে চিরদিন তার সঙ্গে অহিনকুলের সম্পর্ক স্থাপন করেন না। তাঁর কাছে অহিনকুলের চির বৈরিভাবও যেমন ত্যাজ্য, কুকুরের মত কেবল পরপদলেহনও তেমনি ত্যাজ্য। সাধু থাকবেন সর্ব্বগর্ব্বরহিত, অথচ স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

যা হওয়ার তা আপনি হবে, বা যিনি হওয়াবার ভার নিয়েছেন, তিনিই হওয়াবেন। কিন্তু তা বলে কি কেউ বসে থাকতে পারে? জীবনে সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মের রূপ যদি নাও ফোটে, তবু তা ফোটাবার চেষ্টাটুকু তো নষ্ট হবে না! ইহকালে বা বর্ত্তমানে দেখছি, এতে বেশ আনন্দে সময় কাটান যায়—আর পরকালে বা ভবিষ্যতের জন্য এই যে তীর ছুঁড়ে রাখছি, এ তো লাগবে গিয়ে কোথায়ও! কেননা কোনও প্রচেষ্টাই তো বিনষ্ট হয় না—বিশেষতঃ যেখানে পরের জন্য জীবন উৎসৃষ্ট, সেখানে তা তো সফল হয়েই রয়েছে। ওই সঙ্কল্প বা চিন্তাই যে মানুষকে এগিয়ে দেয়।

অশেষ কল্যাণ-গুণ সম্পন্না অনন্ত শক্তিকে যাঁরা বুকে পেয়েও স্থির হয়ে রয়েছেন—তাঁদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা না থাকলেও স্বভাবতঃই সে শক্তি অপরের মঙ্গলে নিয়োজিত হয়। সাধু জগতের হিত করেন এইরূপে—বিক্ষোভ সৃষ্টি করে নয়।

মেঘলা দিনে আকাশ মায়ের মত প্রশান্ত হয়ে আছে, আর মেঘগুলি তার কোলের ওপর ক্ষণিক শান্ত থেকে একটু পরেই মহা দাপাদাপি সুরু করছে—ভাবছে বুঝি তারাই সমস্ত আকাশকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে! আসলে কিন্তু ব্যতিব্যস্ত হয়েছে নিজেরাই। আকাশ যেন দেখছে আর বিজলীর রেখায় মুচকি মুচকি হাসছে। ভগবান বা ব্রহ্মজ্ঞ আকাশ, আর আমরা তাঁর কোলের মেঘ। কাম্য কোনটা?

আমাদের জীবনদ্বারাই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হবে—এই দৃঢ় বিশ্বাস মনে রেখে যে কোনও অবস্থা আসুক দৃঢ়চিত্তে তার মাঝ দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। হয়ত দেখছি প্রায় বারো আনা জীবনই এই আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে কেটে গেছে—ফলোপধায়ক হয়নি কিছুই, তবুও ওই কথাই মনে আঁকড়ে থাকতে হবে। কে জানে কোন মুহূর্ত্তে আমার দ্বারা কোন্ শুভ কাজ হবে বা হয়ে রয়েছে; হয়ত তারই ফল শতবর্ষ পরে দেখা দেবে। আমাদ্বারা সাময়িক অশুভটা যদি জীবনব্যাপী ফলপ্রসূ হয়, তবে সাময়িক শুভকাজটাই কেন তা হবে না? নামরূপওয়ালা আমিটা এমনি ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত হয়ে থাক্। আসল "আমি" সব নিয়ে—সবার অতীত—ঊর্দ্ধে।

আশ্রম-সংবাদ —শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ বর্ত্তমান পুরী ধামেই অবস্থান করিতেছেন।

দানপ্রাপ্তি

(বাহুল্যভয়ে ১৲ টাকার অনধিক দাতাগণের নাম পৃথক্ প্রকাশিত হইল না।)

—*—

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠে

শ্রীমান রমণীমোহন রায়, টাইপিষ্ট, গোলাঘাট, ৭৷৷/০ ঐ ৫৲।

মণিপুর-ইম্ফল

শ্রীযুক্ত দর্পহারী দাস এম, এ, সহকারী হেড্‌মাষ্টার জনষ্টন হাই স্কুল, ৫৲ শ্রীমনমোহন কুণ্ডু, রেজিষ্ট্রার পলিটিকেল এজেন্টের অফিস, ৫৲ শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুপ্ত ওভারসিয়ার, ৪৲ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হিল অফিস্, ৩৲ শ্রীযুক্ত যামিনী সুন্দর গুহ হেড্‌মাষ্টার জনষ্টন হাই, ২৲ শ্রীযুক্ত নিথরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একাউণ্টেণ্ট হিল অফিস্ ২৲ শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় হেড্-ক্লার্ক রেভিনিউ অফিস্, ২৲ শ্রীযুক্ত জীবকান্ত শর্ম্মা একাউন্টটেণ্ট ব্যাটালিয়ন, ২৲ শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র দে১৲ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চৌধুরী ১৲ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস ১৲ শ্রীযুক্ত প্রিয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ১৲ শ্রীযুক্ত যুগলহরি চট্টোপাধ্যায় ১৲ শ্রীযুক্ত বলিরাম দাস ১৲ শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায় ১৲ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲ শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দেবশর্ম্মা ১৲ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৲ শ্রীযুক্ত গুণময় মৈত্র ১৲ শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারা রেভিনিউ অফিস হইতে সংগৃহীত ৫৲ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন হেড্ ক্লার্ক দ্বারা মাড়োয়ারি সম্প্রদায় হইতে সংগৃহীত ২৫৲।

(ডিমাপুর)

জনৈক হিতৈষী ২৲ শ্রীযুত নবকুমার দাস ওভারসিয়ার ২।০ শ্রীযুত নবকুমার দাসের সহধর্ম্মিণী ১৲ জনৈক বন্ধু (ডাক বাঙ্গালা) ১৲ শ্রীযুত পরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৲।

(কহিমা) নাগাহিল

শ্রীযুত চন্দ্রকুমার বরুয়া হেড্‌মাষ্টার ১০৲ রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত সীতানাথ বড়বড়া ৩৲ শ্রীযুত ইন্দ্রকুমার দত্ত একাউণ্টটেণ্ট ২।৵০ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পোষ্টমাষ্টার ২ সুবেদার গোপালসিংহ রায় ১।০ থার্ডআসাম রাইফেলস্ সুবেদার মেজর ঐ ১৲ ঐ হনস্‌পাল ১৲ ঐ পদম সিং, ঐ ১৲ ঐ ফটিক ঐ ১৲ জমাদার উপিন সিং, ঐ ১৲ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ওভারসিয়ার ১৲ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দত্ত ঐ ১৲ শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন আদিত্য ১৲ শ্রীযুক্ত কনকচন্দ্র শর্ম্মা ১৲ শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত বরুয়া ডাক্তার ১৲ শ্রীযুক্ত নদীয়াবাসী পাল ১৲ জনৈক হিতৈষী ১৲ শ্রীযুক্ত আনন্দরাম বেজবরুয়া ১৲ কেপ্টেন কুমুদিনীকান্ত বন্দোপাধ্যায় ১৲ জমাদার এড্‌জুটেণ্ট থার্ড এ, আর কাজিমান ক্ষেত্রী ১৲ আশ্রম-হিতৈষী ১৲ শ্রীযুক্তা সংরাম দাস ১৲ খুচরা সংগ্রহ ২৲

ডিমাপুর হইতে কহিমা যাইবার এক জন প্রচারকের মটরলড়ি ভাড়া জনৈক পাঞ্জাবী সাধুভক্ত প্রদত্ত ১৲ কহিমা হইতে ইমফল যাইবার এবং কহিমা হইতে ডিমাপুর আসিবার ২ জনের ভাড়া শ্রীযুক্ত চন্দ্রধর বরুয়া দ্বারা প্রদত্ত ৪৲ ইমফল হইতে কহিমা আসিবার দুই জনের লড়ি ভাড়া ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রদত্ত ৪৲।

মধ্য বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে—

একটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত উকিল এস সি চাটার্জ্জি, তারকদাস মজুমদার, রায় নলিনীমোহন লাহিড়ী, বীরেন্দ্রমোহন গুহ, বিনোদবিহারী সরকার, সন্তোষকুমার মুখার্জ্জি,

হরিচরণ সরকার, অমূল্যচরণ ঘোষ, নন্দলাল মল্লিক, লাবণ্যময় ঘটক, কুঞ্জবিহারী দত্ত, এইচ মজুমদার, প্রফেসার হীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, প্রফেসর জি এন মৌলিক, প্রফেসর হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য, প্রফেসর অনিলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ডাঃ এস কে মিত্র, গোপেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, হৃষীকেশ সেন, নির্ম্মলচন্দ্র চাটার্জ্জি, ইউ এন বল, ডাঃ পান্নালাল, এন গোহাইল, গুড্ সাইমন্, এডভোকেট দুর্গাদাস খুন্নার, দুনীচাঁদ কাপুর মতিরাম, দিভান্না স্ব কোম্পানী, জগৎ সিং, বলদেও দাস, সি এল আনন্দ, এডভোকেট এইচ সি কুমার, ব্রিজনাথ চোপড়া, লালা ত্রিলোক চাঁদ, মিঃ সিংহ, মিঃ চাকলা, দয়ানাথ ভাল্লা, জনৈক হিতৈষী, খুচরা সংগৃহীত ৯৲।

অমৃতসর—(পাঞ্জাব)

শ্রীযুক্তা প্রিয়বালা দেবী ২৲ শ্রীযুক্ত এস্ রাজসিং কল্যাণসিং ২৲।

একটাকা করিয়া—

শ্রীযুক্ত এন্ বানার্জ্জি, এস সি মুখার্জ্জি, পি সেনগুপ্ত, বি সি চাটার্জ্জি বুটারাম, শ্রীযুক্ত সেলামত রায়, প্লিডার (হুসিয়ারপুর)।

জম্মু—(কাশ্মীর)

শ্রীযুক্ত পতিরাম চাটার্জ্জি ইঞ্জিনিয়ার ১৲ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু প্রফেসার ১৲।

পুরুলিয়া—(মানভূম)

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য ২৲ শ্রীযুত নীলকণ্ঠ বাগ্‌চী মুন্সেফ ২৲ শ্রীযুত জীমূতবাহন সেন চেয়ারম্যান মিউনিসিপালিটি ২৲ শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ বানার্জ্জি ১৲ মিঃ এ এম বানার্জ্জি ১৲ শ্রীযুত যদুনাথ গাঙ্গুলী ১৲ প্রিয়নাথ মুখার্জ্জি ১৲ শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ মিত্র মুন্সেফ রঘুনাথপুর ২৲।

দক্ষিণবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে—

(আকিয়াব)

এম্ এম্ পি এল্ পালানিয়াপ্পা চেটিয়ার ১০৲ চৌধুরী এণ্ড কোং ১০৲ শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র সোম ৫৲ শ্রীযুক্ত প্রাণহরি ধর ৫৲ মিঃ পারুমল ৫৲ মিঃ চুনীলালজী ৫৲ ভি সি টি এন্, রামনারায়ণ ৫৲ ভিঃ এল্ ৫৲ শ্রীযোগেশচন্দ্র ধর ৫৲ শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন ৫৲ শ্রীক্ষেত্রমোহন দাস ৫৲ শ্রীমোহিনীমোহন বসু ৫৲ শ্রীকালীভূষণ বসু ও শ্রীসুবোধচন্দ্র বসু ৫৲ ডব্লিউ, জে, ল্যোন্ ৫৲ শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ ৫৲ শ্রীনন্দলাল সিংহ ৫৲।

শ্রীকামিনীকুমার চৌধুরী ৩৲ শ্রীশ্যামাচরণ মহাজন ৩৲ মিঃ বি চক্রবর্ত্তী ৩৲ শ্রীদেবেন্দ্রকুমার দে ৩৲ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌচুরী ৩৲ শ্রীকুমুদবন্ধু ৩৲ ভি, সি, টি, ভি, ৩৲ এম্ আর্ এম্ ভি এস্ ৩৲ শ্রীইন্দুলাল নন্দলাল ৩৲।

দুই টাকা করিয়া—শ্রীঅপূর্ণচরণ ধর, শ্রীরেবতীকান্ত চৌধুরী, শ্রীযামিনীরঞ্জন দেব, শ্রীমনীন্দ্রনাথ মিত্র, ডাক্তার এন্ বি নাথ, এস্ এন্ সেন, শ্রীহিমাংশু বিমল, শ্রীযামিনীমোহন পাল, শ্রীঅতুলচন্দ্র লোধ, শ্রীধীরেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত, শ্রীচন্দ্রকুমার শীল, শ্রীনকুলেশ্বর বসু, মিঃ কে এম্ সাহা, মিঃ এ এস্ চাটার্জ্জী, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায়, শ্রীশীতলচন্দ্র দে, মিঃ এন্ এম্ পি এল্ চাটার্জ্জী, সি টি আর্ এস্ রামনাথ চটিয়ার, শ্রীভরতচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনিশীথচন্দ্র সদাগর, শ্রীরামচন্দ্র দাঁ, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাসগুপ্ত, মিঃ আর্ কে বানার্জ্জী, শ্রীশচীন্দ্রকুমার রায়, শ্রীরসিকচন্দ্র মহাজন, শ্রীব্রজহরি, মিঃ জে এম্ সরকার, শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীবরদাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীনলিনী চাটার্জ্জী, শ্রীহরেন্দ্রলাল ধর, শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মজুমদার, সতীশচন্দ্র দাস, মিঃ জে এম্ দাস, শ্রীসতীশ হাজারী।

খুচরা সংগৃহীত ১৭৭৸৶।

(চট্টগ্রাম)

শ্রীমহেন্দ্রলাল বণিক ৫৲ রাজা ভুবনমোহন রায় ৩৲ শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুদার ৫৲ শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাল ৫৲ জি এণ্ড্ কোং ৩৲।

দুইটাকা করিয়া—শ্রীসত্যচরণ বানার্জ্জী, শ্রীজ্ঞানরঞ্জন গুহ, শ্রীঅনাদিচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীকালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী. শ্রীআশুতোষ গুহ, মিঃ এস্ সি দাস।

খুচরা সংগৃহীত—৫৫৶০।

(কক্সবাজার)

মিঃ এ ভি পি এল্ ৫৲, এম্ টি টি ভি ৫৲ শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বরুয়া ও নারায়ণপ্রসাদ শর্ম্মা ৫৲ শ্রীললিতমোহন রায় ৪৲ শ্রীরজনীকান্ত মজুমদার ৪৲ শ্রীসুজা সর্দ্দার ৩৲ শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ৩৲ শ্রীআশুতোষ ধর ৩৲ শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দাস পোষ্টমাষ্টার ৩৲।

দুইটাকা করিয়া—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সান্যাল, শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত, মিঞা আমির আলি চৌধুরী, শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র পাল, শ্রীনদীয়াবাসী দাস শ্রীষষ্ঠীচরণ পাল, শ্রীরমণীমোহন সেনগুপ্ত শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীপাঁচকড়ি চৌধুরী. শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র।

খুচরা সংগৃহীত—১২৸৶০।

(ত্রিপুরা—ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী কুণ্ডু ৲ শ্রীযুত অচ্যুতানন্দ—যোগেশ চন্দ্র সাহা ২ , শ্রীযুত জয়গোবিন্দ সাহা ২৲।

খুচরা সংগৃহীত—২২৶১০।

(খুলনা)

শ্রীযুত রতিকান্ত ভৌমিক ২॥০ শ্রীযুত পঞ্চানন ব্যানার্জী ২৲ শ্রীযুত কামাখ্যাচরণ নাগ প্রিন্সিপাল ২৲ শ্রীযুত ভূধরচন্দ্র মজুমদার ২৲ শ্রীযুত ললিতমোহন সরকার ২৲ পি, মুখার্জী ২৲ রায় সাহেব শ্রীযুত অনাথবন্ধু চ্যাটার্জী ২৲ মিঃ কে এম সেন সিভিল সার্জন ২৲ শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেন উকিল ২৲ মিঃ ডি এন ভট্টাচার্য্য ২৲ মিঃ শরৎ দাস উকিল ২৲ শ্রীযুত গুরুদয়াল পাল ২৲।

খুচরা সংগৃহীত—৮১।৶১০।

(ঢাকা)

শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন বসু ৫৲।

খুচরা সংগৃহীত—৩৮॥৶০।

(পাবনা)

খুচরা সংগৃহীত—১৮৸০।

(বিভিন্ন স্থান হইতে)

শ্রীযুত পশুপতি ভাণ্ডারী ৩৬।৶৫ শ্রীমতী বাদামমণি দাসী ২৫৲ শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মিত্র ১৫৲ শ্রীযুত কালীপদ দাস ১৫৲ শ্রীযুত গগনচন্দ্র ভড় ১১৲ শ্রীযুক্তা অনিলবালা দাসী ১৩৶০ শ্রীমতী সরোজিনী দেবী ১০৲ শ্রীযুত ব্রজকিশোর বন্দোপাধ্যায় ১০৲ শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র নন্দী ৭৲ শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ৫৲ শ্রীযুত নৃপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ৫৲ শ্রীযুত নফর চন্দ্র খাটা ৫৲ শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র ৫৲ শ্রীযুত রাসবিহারী নন্দী ৫৲ শ্রীযুত মণিলাল বন্দোপাধ্যায় ৪৲ মিঃ কে কে চ্যাটার্জী ৪৲ শ্রীযুত কালীপদ রায় ৪৲ শ্রীযুত অমৃতলাল ভাদুড়ী ৩।০ শ্রীযুত মণীন্দ্রকুমার রায় ৩৲ শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ৩৲ শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৲।

দুইটাকা করিয়া—শ্রীযুত হেমেন্দ্র কুমার দত্ত, শ্রীযুত সন্ন্যাসীচরণ প্রামাণিক, শ্রীযুত সন্তোষকুমার ঘোষ, শ্রীযুত গোপালচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত বৈদ্যনাথ দত্ত, শ্রীযুত অক্ষয়কুমার দত্ত, শ্রীযুত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

খুচরা সংগৃহীত—৮৮।০।

মধ্য বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে—

গয়া—(বিহার)

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মল্লিক ২৲ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ২৲ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সান্যাল, ম্যানেজার ২৲। শ্রীযুক্ত প্রিয়গোপাল মজুমদার ১৲ জেল ডাঃ অজিত চন্দ্র মিত্র ১৲ জেইলার শ্রীযুত কালীদাস পাল ১৲। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক ২৲ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ দাস ১৲।

লক্ষ্ণৌ

মিঃ এ, পি, ব্যারিষ্টার ৩৲।

পাটনা—(বিহার)

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন ইঞ্জিনিয়ার ৩৲ শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সাহা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিহার উড়িষ্যা কাউন্সিল ২৲ মিঃ এস কে ঘোষ দস্তিদার ২৲ মিঃ কে

এস রাও ২৲ মিঃ জে প্রসাদ, জজ্ ২৲ শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র রায় ১৲।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় ১৲ মিঃ জি পি হাজারী প্রফেসর বি, এন কলেজ ১৲ মিঃ নিরঞ্জন নিয়োগী প্রফেসর পাটনা কলেজ ১৲ মিঃ রজনী গুপ্ত প্রফেসার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ১৲ মিঃ ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৲ মিঃ বিনয়ভূষণ রায় চৌধুরী ১৲। জেলা ময়মনসিংহ :—শ্রীযুক্ত হরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲ জেলা ঢাকা :—জনৈক হিতৈষী ৫৲।

পরলোকতত্ত্ব

পূর্ব্ব বাঙ্গালা সারস্বত মঠ হইতে—

ব্রহ্মচারী শ্যামদাস দ্বারা

সম্পাদিত।

পরলোক সম্বন্ধে বহু দার্শনিক বিচারের ও আধ্যাত্মিক তথ্যের সমাবেশ ও সংগ্রহ।

(যন্ত্রস্থ)



২১শ বর্ষ | ১ম খণ্ড

আষাঢ়—১৩৩৫

সমষ্টি সং ২১৯ | ৩য় সংখ্যা

বৈশ্বানরায়

—*—

ঋগ্বেদ সংহিতা—৪।৫।১-৭

—*—

[বামদেব ঋষিঃ—অগ্নির্দেবতা—ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ]

বৈশ্বানরায় মীড়্হুষে সজোষাঃ
কথং দাশেমাগ্নয়ে বৃহদ্ভাঃ।
অনূনেন বৃহতা বক্ষথেন
উপস্তভায়ৎ উপমিৎ ন রোধঃ॥

অগ্নি তিনি মহাভানু কল্পতরু—মোরা সব ভাই;
কেমনে সে বৈশ্বানরে সঁপি হবিঃ, ভাবিতেছি তাই!
পরিপূর্ণ, সুবিশাল বপু তাঁর ছেয়েছে সকল—
দুকূল ছাপায়ে যথা ছুটে চলে বরষার জল!

মা নিন্দত য ইমাং মহ্যং রাতিং
দেবো দদৌ মর্ত্ত্যায় স্বধাবান্।
পাকায় গৃৎসো অমৃতো বিচেতা
বৈশ্বানরো নৃতমো যহ্বো অগ্নিঃ॥

মর্ত্ত্য আমি; তবু মোরে দেবতা যে দিয়াছেন দান,
নিন্দিওনা তাই বলে; জেনো তাঁরে শ্রেষ্ঠ, স্বধাবান।
আমিও অবোধ নহি; জানি তিনি মেধাবী, অমর,
নিখিল-নায়ক অগ্নি, প্রজ্ঞাবান্, দেব বৈশ্বানর।

সাম দ্বিবর্হা মহি তিগ্মভৃষ্টিঃ
সহস্ররেতা বৃষভস্তুবিষ্মান্।
পদং ন গোরপগূড়্হং বিবিদ্বান্
অগ্নির্মহ্যং প্রেদু বোচন্মনীষাং॥

অগ্নি তিনি তীব্রজ্বালা, দুই লোকে আসন বিতত,
বৃষভ সহস্ররেতা বলি তাঁরে, আছে তাঁর কত!
গোপদের মত গূঢ় যাহা, তারো জানেন সন্ধান,
গাবেন না সাম-গাথা মোর কাছে মহামনীষার দান?

প্র তাঁ অগ্নির্বভসৎ তিগ্মজম্ভ-
স্তপিষ্ঠেন শোচিষা যঃ সুরাধাঃ।
প্র যে মিনন্তি বরুণস্য ধাম
প্রিয়া মিত্রস্য চেততো ধ্রুবাণি॥

বিশাল বিভব তাঁর; তপ্ততম বেড়িয়া শিখায়,
তীক্ষ্ণদন্তে কড়মড়ি তাহাদের দহে যেন কায়—
প্রজ্ঞাতনু বরুণের প্রিয়ধামে হিংসা করে যারা,
ধ্রুবব্রত মিত্রদেবে নাহি মানে—এমনি বেয়াড়া!

অভ্রাতরো ন যোষণো ব্যন্তঃ
পতিরিপো ন জনয়ো দুরেবাঃ।
পাপাসঃ সন্তো অনৃতা অসত্যা
ইদং পদমজনতা গভীরম্।

ভাই-বন্ধুহারা নারী ঘুরে মরে যথায়-তথায়,
পতিহন্ত্রী কুলটারা শঙ্কাহীন কুপথেতে ধায়;
অসত্য-অনৃতসেবী সেই মত পাপে ডুবে মরে;
সুগভীর এই খাত রচিয়াছে আপনার তরে।

ইদং মে অগ্নে কিয়তে পাবকা-
মিনতে গুরুং ভারং ন মন্ম।
বৃহদ্দধাথ ধৃষতা গভীরং
যহ্বং পৃষ্ঠং প্রয়সা সপ্তধাতু॥

ঠেলি নাই ব্রত তব, হে পাবক, আমি অকিঞ্চন;
গুরুভার ভাব যদি, আমারেও দিও কিছু ধন;—
গভীর সম্পদ তব, সুবিশাল, শত্রুনিষূদন—
অন্নে পূর্ণ সুপ্রচুর, আছে তায় সপ্ত উপায়ন।

তামিন্‌ন্বেব সমনা সমানম্
অভি ক্রত্বা পুনতী ধীতিরশ্যাঃ।
সসস্য চর্ম্মন্নধি চারু পৃশ্নে-
রগ্রে রুপ আরুপিতং জবারু॥

রচিয়াছি পুণ্যগাথা তাঁরি তরে, পাতিয়াছি যাগ—
দ্যুলোকে শয়ান তিনি, এরা তাঁর পাবে নাকি লাগ?
ধরনীর আগে দেখি রূপায়িত হল ধীরে ধীরে
সুচারু আলোক-বিম্ব—চড়িল সে দ্যুলোকের শিরে।

যৌবনের জয়

—•—

যেখানে শক্তি, যেখানে সৌন্দর্য, সেখানে আপনা হইতেই প্রাণ লুটাইয়া পড়ে। শৈশবকে আমরা স্নেহ করি, বার্দ্ধক্যকে সম্ভ্রম করি, কিন্তু পূজা করি যৌবনের। ভারতের প্রাণপুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি যৌবনের রাজা, উন্মেষিত নব যৌবন দিয়া তাঁহার পূজা। হিন্দু পৌরাণিক যখন দেবলোকের সন্ধান পাইলেন, তখন বলিলেন, এখানে দেখিতেছি, অপরিণত শৈশব নাই, অপচীয়মান বার্দ্ধক্যের লোলতা নাই, আছে কেবল স্ফুরন্ত যৌবনের ছটা; দেবতারা চির-তরুণ, দেবীরা চির-তরুণী—কার মায়ামন্ত্রে যৌবনের বিদ্যুৎ দেবলোকে অচপল হইয়া বাঁধা পড়িয়াছে!

যৌবনের পূজারী সবাই, কিন্তু তাহার স্বরূপ চিনিয়াছে কে? দেহের কানায় কানায় মত্ততা যখন উচ্ছ্বসিয়া উঠে, তখন স্থিতধী হইয়া তাহাকে ধারণ করিবার, বিচার করিবার শক্তি রাখে কে? চিরকাল ধরণীর বুকে তরুণ-তরুণীর রভস-লীলা বানের মুখে আনন্দ-কল্লোলে সব ভাসাইয়া লইয়া যায়; কিন্তু ইহাদের মত্ততার বেগ অনুভব করিয়া যে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, সে বুঝি থাকে একটু দূরে। আমি সুন্দর, আমি শক্তিমান্—কিন্তু সে কথা যে আমি বুঝি না, আমাকে যে আমি ভোগ করিতে পারি না—ইহাই আমার অভিশাপ। আমার পরিচয় লইবার ক্ষমতা যদি আমার থাকিত, তাহা হইলে যৌবনের জোয়ারে কখনও ভাটা পড়িত না।

শুনিতেছি, তরুণ জাগিয়াছে; আরও শুনিতেছি, বাংলার তরুণীরাও নাকি আর ঘুমাইয়া নাই। কথাটা হেঁয়ালীর মত ঠেকিতেছে। তারুণ্যের স্বরূপই তো জাগরণ; জগতে তরুণের দল কবে কোথায় ঘুমাইয়া কাটাইয়াছে, তাহা তো জানি না। প্রকৃতির সুপ্তশক্তির পরিপূর্ণ উদ্বোধনই তো যৌবন; সুতরাং যৌবন যে চির-জাগ্রৎ। আজ যদি কেহ ডাক-হাঁক করিয়া বলিতে চায়, ওই দেখ, তরুণের দল জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, নির্ব্বিশেষ তারুণ্যের স্ফূর্ত্তিকে সে লক্ষ্য করিতেছে না—যৌবনের জোয়ার দিয়া একটা মৎলব হাঁসিল করিবার ফিকিরে সে আছে বলিয়াই তাহার এই চাটুবাদ!

ভূরী-ভেরী দামামা বাজাইয়া বসন্ত শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসে না; তাহার লীলায়িত স্পর্শে শীতের সঙ্কোচ কি করিয়া কাটিয়া যায়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এমনি সহজ ও অনাড়ম্বর শ্রীতে যদি আমাদের যৌবন উপচিত হইয়া উঠিত!—একটা কলরব, একটা উত্তেজনা, একটা বিশিষ্ট অধিকারের মোহ যেখানে উদ্দাম হইয়া দেখা দেয়, সেখানে প্রকৃতির স্নিগ্ধ প্রকাশ দেখি না, দেখি বিকৃতির বিভীষিকা।

অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন; কলরব ছাড়া আর কোনও উপায় যে মাথায় ভিড়িতেছে না, তাহা বুঝি। কিন্তু ইহাকেই বড় বড় নাম দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতে অন্তর সঙ্কুচিত হয়। মনে হয়, এ তো আমাদের সত্য পরিচয় নয়। গভীর সঙ্কল্প যেদিন বাক্যে উপচিয়া উঠিবার অবকাশ পাইবে না, কাজের সুরু সেই দিন। সে দিন কবে আসিবে, তাহারই প্রতীক্ষাতেই দিন গুণিতেছি।

এমনি ধারা নির্ব্বিশেষ বলিয়াই যৌবন একটা ভয়াল রহস্য। তাহাকে একটা বিশিষ্ট সঙ্কেতে চিহ্নিত করিতে সঙ্কোচ হয় বটে, অথচ সর্ব্বসমঞ্জস পরিপূর্ণতার দিকেও তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া

তো পারি না। যৌবনের যে বিচারহীন মত্ততা, একশ্রেণীর লোক স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তাহাকেই আজ বাহবা দিয়া ফাঁপাইয়া তুলিতেছে ; স্থৈর্য্য, প্রশান্তি, বিবেক আজ বার্দ্ধক্যের বলিচিহ্ন বলিয়া তাহাদের কাছে উপহসিত। তারুণ্যের স্ফূর্ত্তিকে ভয় করি না—ভয় করি এই ছদ্মহিতৈষী কূটোপদেশকের দলকে।

যেমন করিয়াই হউক, ভোগ-সামর্থ্যের সঙ্গে যৌবনের জুড়ি মিলাইয়া দিয়া যৌবনের একটা কদর্থ করা আমাদের মজ্জাগত সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ভোগের দিক দিয়া যৌবনকে বুঝিতে চাই বলিয়া যেমন আমরা তাহাকে সংশয়ের চোখে দেখিতে অভ্যস্ত, তেমনি অবিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যৌবনের মাঝে বিচারহীন স্পর্দ্ধা জাগাইয়া তুলিবার জন্যও আমরাই দায়ী। যুবা ভোগী, এই কথা সে পরের মুখে শুনিয়া নিজেও বিশ্বাস করিয়া আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে।

আমরা বলি ইহাই তো যৌবনের সত্যকার পরিচয় নয়। ভোগই কি একমাত্র শক্তি? ত্যাগ কি শক্তি নয়? যৌবন কি শুধু ভোগেই দুর্দ্ধর্ষ, ত্যাগে কি সে মহৎ নয়? ভোগের শক্তি যখন অক্ষুণ্ণ, ত্যাগের তীব্র-মধুর আস্বাদন তো তখনই পাওয়া যায়। অপরিণত-শক্তি বা গলিতেন্দ্রিয়ের ত্যাগে বীর্য্য কোথায়?

এই কথা স্মরণ করিয়াই মনু বলিয়াছিলেন, "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ।" আজকাল যে হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে কথাটা তর্জ্জমা করিয়া বলিতে ভয় হয়। যৌবনের সঙ্গে ধর্ম্মের যেন অহিনকুলের সম্পর্ক! যাহারা বিদেশীয়ানার ভক্ত, তাহারাই যে একথা বলে, তাহা নয়; যাহারা খাঁটী স্বদেশী, তাহাদের মুখেও ওই কথা। সকলেরই এক রায়—"ধর্ম্ম-কর্ম্মের সময় পরে পাওয়া যাইবে, যৌবন ভোগের কাল।"

ইহারা ধর্ম্মেরও স্বরূপ জানে না। ধর্ম্ম অর্থে ইহাদের কাছে কৃচ্ছ্রতা, আর যৌবন অর্থে সহজ ইন্দ্রিয়-তর্পণ। উভয়েরই যে একটা নির্ব্বিশেষ রূপ আছে এবং সেইখানেই যে উভয়ে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত, এ কথা তাহারা জানে না। জানে না বলিয়াই যৌবনকে তাহারা বীর্য্যহীন এবং ধর্ম্মকে দুঃখময় করিয়া তোলে।

শুধু দেহের গণ্ডীতে আমি আবদ্ধ নই, আমার বেষ্টনীর চেয়েও আমি বৃহৎ—এই বীর্য্যশালী বোধই ধর্ম্ম। শক্তির সার্থকতাও এই ধর্ম্মবোধে। অতএব ধর্ম্ম আর যৌবনে বিরোধের আশঙ্কা অমূলক। যৌবন অনায়াসে আপনাকে ছাপাইয়া উঠে, কাহারও উপদেশের অপেক্ষা রাখে না। এই উচ্ছ্বসিত শক্তিকে সুকৌশলে আপন ঘর চিনাইয়া দেওয়াই যথার্থ যৌবনের আরতি। সে অনুশীলন, সে আবহাওয়া আজ কোথায়?

যৌবন আসে ; এক হাতে তার বিষ, আর এক হাতে অমৃত ; একদিকে ভোগ, আর একদিকে ত্যাগ। উভয়ের সামঞ্জস্যও ঘটে তাহার মাঝে অতি সহজে, প্রকৃতির অন্তঃপ্রেরণায়। কিন্তু কূটবুদ্ধি মানুষই স্বার্থের তাড়নায় সব ভণ্ডুল করিয়া দেয়।

এমনই সঙ্কট জাতির ভাগ্যে আজ দেখা দিয়াছে। যৌবনকে আত্ম-বিস্মৃত করিবার মন্ত্রণার অভাব নাই ; আত্মসমাহিত তপস্যার আসন হইতে তাহাকে বিচলিত করিয়া প্রমাদের পথে উদ্দাম করিয়া ছুটাইবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে—এবং ইহারই নাম রাখা হইয়াছে জাতির জাগরণ।

অনেক কিছুই করিবার আছে ; মানুষের মত বাঁচিতেও হইবে বটে ; যাহা অসত্য, তাহাকে নির্ম্মম হইয়া বিসর্জ্জনও দিতে হইবে।—কিন্তু তবুও বলিব আপনাকে ভুলিতে হইবে, এ কথা সত্য নয়।

ধর্ম্মই জাতিকে বাঁচাইয়াছে এবং ধর্ম্মই ইহাকে সঙ্কট হইতে বাঁচাইবে, এ কথা বৃদ্ধের প্রলাপোক্তি নয়। যেমন মত্ততা জাগে যৌবনে, ভোগ-লালসা জাগে যৌবনে—তেমনি ধর্ম্মের প্রেরণাও জাগে এই যৌবনেই। বলিতে সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি, বুঝি এইখানেই যৌবনের সার্থকতা। আত্ম-প্রসারণ যদি মানুষের ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে এ কথা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা নাই।

যাহারা নিরঙ্কুশভাবে ভোগ করিয়াছে, জাতির বিবর্ত্তনে তাহারা অপরিহার্য্য হইলেও তাহারাই জাতিকে অগ্রগামী করিয়া দেয় নাই। জাতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে—যাহারা রিক্ত, যাহারা ত্যাগী। তাহারা সকলেই তরুণ, সকলেই তাপস। তারুণ্যের এই বিজয়শ্রী দেখিবার সৌভাগ্য আমরা হারাইতে বসিয়াছি; তাই দুঃখ হয়, শঙ্কা জাগে।

একবার অতীতের পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখ, কাহার স্মৃতি ভারতবাসীর মনের মন্দির আলোকিত করিয়া রহিয়াছে?—মনে পড়ে, অযোধ্যার রামের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বাহ্নের কথা; মনে পড়ে, চিত্রকূটে ভরত মিলনের কথা; মনে পড়ে, চতুর্দ্দশ বর্ষব্যাপী রামচন্দ্রের বনবাস-কাহিনী। যদি বলি, এ গুলি যৌবনশ্রীর আলেখ্য, বিশ্বাস করিবে কি? যে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আদর্শ রামায়ণে অমর হইয়া আছে, সহস্র বিক্ষোভের ঝড়-বর্ষণেও যাহার বর্ণসুষমা ভারতবাসীর হৃদয়ে আজও বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই, সেই ধর্ম্মের অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠা একমাত্র তরুণের তপস্যাদ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল। তরুণ রাম রাজার ছেলে হইয়াও তপস্বী, তরুণী সীতা রাজার মেয়ে হইয়াও তপস্বিনী—ভোগের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা থাকিতেও উভয়ের এই অটুট বৈরাগ্যই না আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। রাম-সীতার ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী লেশমাত্র কামনার স্পর্শহীন দাম্পত্যজীবনের বিরাট গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য ভাবিতে গিয়া আত্মহারা হইয়া যাই। লক্ষ্মণের বিপুল আত্মত্যাগ ও সুদৃঢ় ইন্দ্রিয়সংযম, রাজনন্দিনী ঊর্ম্মিলার পাষাণীর মতই নীরব ধৈর্য্য ও খেদোক্তিহীন আত্মবিসর্জ্জনের কথা যখন মনে পড়ে, তখন শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। আর নিথর হইয়া যাই, যখন রাজতপস্বী ভরতের কথা মনে পড়ে। ভোগের সুযোগ বা সম্ভাবনার কোথায়ও অপ্রতুলতা ছিল কি? তবুও কেন এই স্বেচ্ছাকৃত তপশ্চর্য্যা? একবার ভাবিয়া দেখ, তরুণী মাণ্ডবীর কথা! কিসের প্রেরণায় তাহাকে যৌবনে যোগিনী সাজাইল? রাম-সীতার ব্রতাচারের পেছনে পাই তপোবনের পরিপেক্ষা; কিন্তু রাজভবনে অগণিত ভোগোপকরণের মাঝে এই তরুণদম্পতীর একনিষ্ঠ বৈরাগ্য-সাধনার আর তুলনা মিলে না। ঋষি-কবি বাল্মীকি বলেন, এই রাজতপস্বীর বৈরাগ্যের সাধনা তাঁহার পরিজনবর্গের হৃদয়কেও এমন গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিল যে তাঁহারাও স্বেচ্ছায় যুগব্যাপী মুনি-ব্রত মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন।

হয়ত ইহা ইতিহাস নয়, ইহা কবির কল্পনা।—কিন্তু কি শক্তি সে কল্পনায়! রামায়ণে যে গার্হস্থ্যধর্ম্মের জয় চিত্রিত হইয়াছে, সে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা একমাত্র অযোধ্যার রাজপরিবারের তরুণ ও তরুণীদের তপস্যার উপরে। গৃহস্থের ধর্ম্মকে যাহারা যশস্বী করিতে চাও, তাহারা এই ব্রতচারী তপস্বী তরুণ-রাজদম্পতীর পুণ্যকথার অনুধ্যান করিও, কামনার দাহ মিটিয়া যাইবে, শক্তিতে-ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হইবে, গৃহস্থের আশ্রমে যৌবনের বিজয়-বৈজয়ন্তী সমুচ্ছিত হইবে।

সহস্রাধিক বর্ষ পরে আর এক তরুণ রাজদম্পতীর কথা মনে পড়ে। তরুণ সিদ্ধার্থ আর তরুণী যশোধরাকে ভারতবর্ষ ভুলিতে পারিবে

কি? ভরা-যৌবনের মাঝে কিসের আহ্বান এই রাজকুমারকে গৃহ-হারা উদাসীন করিয়াছিল? চতুর্ব্বিংশতিবর্ষীয় যুবক সিদ্ধার্থের প্রাণ জগতের দুঃখ-দৈন্যে আকুল হইয়া উঠিল, যৌবনের ভোগ-সম্ভার প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন—অমৃতের সন্ধানে। দ্বাদশবর্ষ পরে যেদিন তিনি পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন, সেদিনের কথা স্মরণ কর। তপস্বিনী যশোধারার বুক জুড়িয়া তুফান বহিতেছে, কিন্তু তিনি পাষাণ প্রতিমার মত নিশ্চল। পুত্র রাহুল জিজ্ঞাসা করিল, মা, আমার পিতা কোথায়? যশোধরা বলিলেন, ওই যে জনসঙ্ঘের মাঝে যাঁহার মস্তক সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত দেখিতে পাইতেছ, তিনিই তোমার পিতা। রাহুল জিজ্ঞাসা করিল, কি বলিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিব? যশোধরা বলিলেন, পিতার ধন পুত্রের অধিকার; তুমি তাঁহার নিকট হইতে পিতৃধন চাহিয়া লও। পুত্র নতজানু হইয়া পিতার নিকট পিতৃধন যাচ্ঞা করিল। অমিতাভ বলিলেন, এই ভিক্ষাপাত্রই আমার সর্ব্বস্ব, ইহাই তোমাকে দিলাম। পুত্রও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। যশোধরা নির্ব্বাক হইয়া তাহা দেখিলেন। সম্যকসম্বুদ্ধ যখন কাছে আসিলেন, একবার শুধু বলিলেন, এই বিরহের আগুণে আমাকে চিরকাল সন্তপ্ত হইতে হইবে, ইহাই কি তোমার ইচ্ছা? স্নিগ্ধ-গম্ভীরস্বরে শাস্তা বলিলেন, তোমার আমার বিরহ-কাহিনী শুনিয়া জগৎবাসী যে অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে, ইহাতেই তাহাদের ভোগক্লিন্ন হৃদয় শুচি ও নির্ম্মল হইবে, আমাদের বিরহই তাহাদিগকে নির্ব্বাণের পথে প্রচোদিত করিবে; এই সুমহান্ আত্ম-ত্যাগের মহিমা অনুভব করিয়া জীবনকে সার্থক মনে করিতে পার না কি? আর একটী কথাও না বলিয়া তরুণী তপস্বিনী সেই তরুণ তাপসের পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

আরও সহস্রাধিকবর্ষ পরে দেখ, দীপ্ত সূর্য্যবৎ আর এক তরুণ তাপসের অভ্যুদয়। কিশোর শঙ্করের কর্ণে ত্যাগের দুন্দুভি মন্দ্রিত হইয়া উঠিয়াছে—আর কে তাহাকে ঘরে রাখিতে পারে? বিদ্যা-জ্বালা বুকে পুরিয়া শঙ্কর ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তারপর ষোড়শবর্ষ ব্যাপিয়া দুঃসহ যৌবনাবেগে প্রমত্ত এই তপস্বী উল্কাপিণ্ডের মত সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা করিয়া বেদান্তের ভেরী নিনাদে দেশবাসীকে জাগাইয়া তুলিলেন। এই ষোড়শবর্ষ ধরিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার বিশ্রাম নাই, আরামের অবকাশ নাই; জ্ঞান-কর্ম্মের অসমুচ্চয়বাদী এই জ্ঞানমূর্ত্তি তরুণ জীবন-ব্যাপী অবিশ্রান্ত কর্ম্মদ্বারা বেদের সমগ্র রূপটী ভারতের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শঙ্করের বাক্য আর জীবন—এই দুই মিলাইয়া তাঁহার দর্শনের পূর্ণতা। এত প্রচণ্ড শক্তির আবির্ভাব, এমন নির্ম্মল অবদানের স্ফুরণ মানবের ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায় না। এই প্রচণ্ড-জ্বালা-বিচ্ছুরিত তপস্বীও তরুণ, এই দীপ্তি তারুণ্যেরই তপস্যার দীপ্তি—এই কথাই স্মরণে রাখিতে বলি।

আরও কয়েকশতবৎসর পরে দেখি, বাঙ্গালীর ঘর আলো করিয়া অমিতাভের মতই অমৃতাভের আবির্ভাব। দুই সহস্র বৎসর পরে মনে হয়, আবার সেই বুদ্ধের বিপুল আত্ম-ত্যাগের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে—এই অধুনা আত্মসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীরই গৃহাঙ্গনে। সেই আকুলতা, সেই সংসারের সমস্ত ভোগ প্রত্যাখ্যান করিয়া অমৃতের পিপাসায় ছুটিয়া বাহির হওয়া—তরুণ সিদ্ধার্থ আর তরুণী যশোধরার তপস্যা আবার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তরুণ নিমাই আর তরুণী বিষ্ণুপ্রিয়ার মাঝে। লেখনীর মুখে হৃদয়ের রক্ত ক্ষরাইয়া মহাজনেরা সে পুণ্যবিরহকাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। শেষ-সাক্ষাতের দিন অবগুণ্ঠিতা বিষ্ণুপ্রিয়া তরুণ সন্ন্যা-

সীর পায়ে লুটাইয়া বলিলেন, জগতের সবাই তোমাকে পাইতে পারে, কোন অপরাধে কেবল আমাকেই তুমি বঞ্চিত করিলে? কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে মহাপ্রভু বলিলেন, আমার আনন্দ আমি জগৎকে বিলাইয়া দিতেছি; কিন্তু যে অপরিসীম বেদনা আমার বুকে, সে ব্যথার ভাগী তোমাকে ছাড়া আর কাহাকে করিব? আমি যে তোমাকেও ছাড়িয়া গিয়াছি, এই দুঃখে গলিয়া যদি জগৎ আমার কথা শোনে! এই বিরহের ব্যথা বহন করিয়া যে তুমি আমার ধর্ম্মের সহায়, আমার কর্ম্মে শক্তিস্বরূপিণী!

এই সেইদিনও বাংলার এক তরুণ বেদান্ত-কেশরী সত্যের দুন্দুভিনাদে জগৎ কম্পিত করিয়াছিলেন। একটা বিদ্যুৎচমকের মত তাঁহার কর্ম্ম ও প্রেরণা এখনও হীনজ্যোতিঃ বাঙ্গালীর নয়নকে ধাঁধিয়া রাখিয়াছে। একজন ভাবুক বলিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণদেব যে বিশেষ করিয়া তরুণদের সঙ্গেই মিশিবার আগ্রহপ্রকাশ করিতেন, তাঁহার একটা তাৎপর্য্য আছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার বাণী বহন করিবার ইহারাই উপযুক্ত বাহন। তাই ইহাদিগের মাঝে তাঁহার ভাব অনুপ্রবিষ্ট করিবার জন্য তাঁহার যত্নের সীমা ছিল না। আর তাঁহার এই চিহ্নিত তরুণেরা যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে নিষ্কলুষ থাকে, তাহার জন্য তিনি শিশুর মত ব্যাকুল হইয়া মায়ের কাছে প্রার্থনা করিতেন। যিনি নিজের জন্য কোনও দিন কিছু চাহিতে পারেন নাই, ইহাদের জন্য তাঁহার এই আর্ত্তি একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বটে।

এমনিতর কত কাহিনী!—যে দিকেই চাহিয়া দেখ, যৌবনের জয় সর্ব্বত্র; এবং সে জয়ের মূল ভোগ নয়—ত্যাগ। মনু মিথ্যা বলেন নাই, "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ" যাহারা যুবা, ত্যাগ করিবার শক্তি তো তাহাদেরই আছে!

কিন্তু আমাদের মনোবৃত্তি দাঁড়াইয়াছে যাত্রাভিনয়ের অনুরূপ। পাকা চুল-দাড়ি না হইলে যাত্রার দলে শিব হয় না, নারদ হয় না, মুনি ঋষি হয় না। এক শুকদেবের চুল-দাড়ি কাঁচা ছিল বলিয়া কৌপীনবিভ্রাটে তাঁহাকে অধিকারীরা নাকাল করিয়া ছাড়িয়াছে!—বার্দ্ধক্যে পলিতকেশ স্খলিতদন্ত না হইলে ত্যাগ-বৈরাগ্য শোভা পায় না, এই মনোভাব অলক্ষ্যে আমাদের শিল্পরসজ্ঞানকে পর্য্যন্ত বিকৃত করিয়াছে। নারদের অসংখ্য ছবির মাঝে একবার একটী মাত্র চিত্রকর তাঁহার তরুণমূর্ত্তি আঁকিয়া শাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছিলেন, নারদ বৃদ্ধ নন, চিরযুবা। আমরা বুঝিতে পারি না, শিবও চিরতরুণ, মৃত্যুঞ্জয়—ব্যাবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থ অশীতিপর বিষ্ণুশর্ম্মার জীর্ণসংস্করণ নয়!

"অমীঘূঁট্"

—*—

একটী প্রদীপ হইতে আলোকশিখা যেমন আর একটী প্রদীপে সঞ্চারিত হয়, অধ্যাত্মানুভবও তেমনি মানুষ হইতে মানুষে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, অধ্যাত্মজগতের ইহা একটী উপলব্ধ সত্য। কেন হয়, তাহার যুক্তি দেখাইবার স্থান ইহা নহে। এই সত্যের উপরই হিন্দুর গুরুবাদের ভিত্তি। ইহা শুধু হিন্দুরই মত নয়—খৃষ্টধর্ম্মে, ইস্‌লামধর্ম্মে, বৌদ্ধধর্ম্মেও মধ্যস্থের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইয়াছে। নানা কারণে ইউরোপের প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয়ানেরা এই মধ্যস্থস্বীকারের প্রতিবাদী হইয়া দাঁড়ায়। অনেক বিজাতীয় সংস্কারের ন্যায় এই প্রোটেষ্টাণ্ট-সংস্কারও আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মাঝে ঢুকিয়া গিয়াছে। সন্ত্‌বাণী আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক গুরুস্বীকরণমূলক কথাগুলি চাপিয়া যাইতে চেষ্টা করেন। যেখানে গুরুবাদকে নিতান্ত ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সেখানে একমাত্র সত্যসনাতন পরমপুরুষই গুরু এইরূপ ব্যাখ্যাও দিয়া থাকেন। নিজের সংস্কার ও জেদ বজায় রাখিবার জন্য, ইতিহাস, সাধনা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির মুণ্ডপাত করিয়া এইরূপ কষ্ট-কল্পনার কি যে গৌরব, তাহা বুঝিতে পারি না। তুমি-আমি আজকাল যতটুকু অধ্যাত্ম-সাধনা করি, তাহাতে গুরুর প্রয়োজনীয়তা না থাকিতেও পারে; কিন্তু যে সমস্ত সন্ত-পুরুষেরা সাধন-সমুদ্রের গভীর দেশে ডুব দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দেখি গুরুস্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের বাণীতে গুরুর মহিমা কীর্ত্তন করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। গুরু করা শুধু শিষ্যেরই গরজ নয়; শিষ্য করাও গুরুর গরজ হইতে পারে। আমার ভাব অপরের মাঝে ছড়াইয়া পড়ুক, এ আকাঙ্ক্ষা অত্যাধুনিক শিক্ষিতদের মাঝেও দেখিতে পাই। সেখানে ইহা উগ্ররূপেই ফুটিয়া উঠে দেখি। যেখানে দানের আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র, সেখানে গ্রহীতা থাকা অনুচিত, এ কথা ভাবিয়া দাতা স্বস্তি অনুভব করিবেন কি? আদান-প্রদান জগতের শাশ্বত সত্য। স্বজাতি(মনুষ্য)বিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়া ইহার অপলাপ করা সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক নহে।

যাহা হউক, কেশবদাসের গুরু ছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবং তাঁহার বাণীতে গুরুর কথা বহুবার তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। গুরুর সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কি দাঁড়াইয়াছিল, আমরা তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার গুরুর নাম, য়ারী-সাহিব। য়ারী-সাহিব একজন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ, তাঁহার পরিচয় আমরা বারান্তরে দিব। য়ার (ইয়ার) অর্থ বন্ধু; য়ারী অর্থে প্রেম। গুরুর নামের এই অর্থকে আশ্রয় করিয়া কেশব-দাস ভগবানের সহিত তাঁহার মধুর ভাবের একটী সুমিষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। পরমপুরুষ কান্ত এবং সাধক কান্তা—ইহা একটী সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ ভাব। কেশবদাসও এই ভাবের ভাবুক ছিলেন এবং কান্তসমাগমে গুরুকে বলিয়াছেন সখা বা দূত। গুরুর "য়ারী" নাম এইখানে দ্ব্যর্থ্যবোধক হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেবও বলিতেন, "গুরু যেন কুটনী। নাগরের সঙ্গে নাগরীকে মিলাইয়া দেও-য়াই যেন তাঁহার কাজ। দুইজনকে এক ঠাঁই করিতে পারিলেই গুরু সরিয়া পড়েন।" আর একজন মহাপুরুষ এই ভাবটী এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"প্রিয়তমের রূপ-গুণের কথা বলিয়া

গুরু সাধকের লোভ ও আসক্তিকে উত্তেজিত করিয়া তাহাকে ইষ্টের সন্ধানে নিযুক্ত করেন। অনেক গহন পার হইয়া পরম ধামে আসিয়া সাধক গুরুকে সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করে, তুমি যাহাকে দেখাইবে বলিয়াছিলে, কই, সে কোথায়? গুরু একটু হাসিয়া একপাশে হেলিয়া বলেন, ওই যে! আর অমনি গুরুমূর্ত্তির অন্তরালে ইষ্টমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে, আর গুরুও ইষ্টের সঙ্গে মিলাইয়া যান।" সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ গুরুবাদী মোটেই নন, এ কথা সবাই জানেন; কিন্তু তাঁহার "অচলায়তনের" ঠাকুরদাদা, "ফাল্গুনী"র সর্দ্দার "বার"-গুরুর অতি চমৎকার চিত্র। মতের দিক দিয়া তিনি গুরু মানেন না, তাঁহার "চতুরঙ্গে" সে কথা খোলাখুলিই বলিয়াছেন; কিন্তু যখন সত্য-কথা বলিতে গিয়াছেন, তখন গুরুর কথা ঢাকিতে পারেন নাই—এমন কি "চতুরঙ্গেও" না!—আশ্চর্য্য বটে।

কেশবদাস বলিতেছেন—

> জগজীবন ঘট ঘট বসৈ, করন করাবন সোয়।
> বিন সতগুরু কেসো কহৈ, কেহি বিধি দরশন হোয়॥

—জগতের জীবন প্রতি ঘটেই রহিয়াছেন, কর্ম্মও করাইতেছেন তিনিই; তথাপি সদ্‌গুরু ছাড়া কি করিয়া তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে?

কিন্তু শুধু সদ্‌গুরু থাকিলেও হয় না। উত্তম বৈদ্যের মত গুরু না হয় বুকে হাঁটু দিয়া ঔষধ গলায় ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু গিলিতে হইবে যে তোমাকেই—

> সতগুরু মিলো তো কা ভয়ো, ঘট নহিঁ প্রেম প্রতীত।
> অন্তর কোর ন ভীজঈ, জোঁ পথল জল ভীত॥

—সদ্‌গুরু পাইলেই বা কি হইবে, যদি তোমার মাঝে প্রেম না থাকে?—পাথরকে জলে ডুবাইয়া রাখিলেও তো তাহার মাঝে কোথাও এতটুকু ঠাঁই ভিজিয়া উঠে না।

কিন্তু তনু-মন-প্রাণ যেখানে প্রিয়সমাগমের অনুকূল, সেখানে—

> পাঁচ সখী মিলি মঙ্গল গাবহিঁ, অনদ তুর বজাঈ হো।
> প্রেমতত্ত্ব দীপক উঁজিয়ারো, জগমগ জোতি জগাঈ হো॥
> সাধ-সন্তো মিলি কিয়ো বসীঠী, সতগুরু লগন লগাঈ হো।
> দরস পরস পতিবরতা পিয় কী, সিব ঘর সক্তি বসাঈ হো॥

—পাঁচ সখীতে মিলিয়া সেখানে বিবাহের মঙ্গল-গাথা গায়, আনন্দের বাদ্য বাজিয়া উঠে; প্রেমের প্রদীপ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, জ্যোতির ছটায় চারিদিকে ঝিকিমিকি জাগে। সাধু-সন্তেরা মিলিয়া করেন ঘটকালী, আর সদ্‌গুরু শুভলগ্নে মিলন করাইয়া দেন। এমনি করিয়া পতিব্রতা প্রিয়তমের দরশ-পরশ পায়—শিবের ঘরে শক্তির অধিষ্ঠান হয়।

এইখানেও পাইলাম সদ্‌গুরুর দূতীয়ালী। গুরু এখানে শুধু পরমাত্মা নন, ইনি মানুষও বটে।

সাধনার মাঝে মূর্ত্তির স্থান কতটুকু, ইহা লইয়া একটা তর্ক আছে। রূপ আর অরূপ, দুয়ের মাঝে সাধকেরা একটা অলঙ্ঘ্য সেতুর রচনা করিয়াছেন। "দ্বিভুজ মুরলীধর" আর "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম" এই দুইয়ের মাঝে বনিবনাও হওয়ায় সম্ভাবনা বড় কম। সাধকদের মাঝে যাঁহারা রূপ স্বীকার করেন, তাঁহারা রূপকে একান্ত ঘরোয়া ভাবেই পাইতে চাহেন, তাহার মাঝে বিন্দুমাত্র অরূপের ইঙ্গিত সহিতে পারেন না; আবার যাঁহারা অরূপ-সেবী, তাঁহারাও রূপকে কোনক্রমে বরদাস্ত করিতে পারেন না বলিয়াই শোনা যায়। কিন্তু অরূপকেও যে ঠিক মানুষের প্রীতিটুকু সঁপিয়া দেওয়া যায়, তাঁহাকে নিয়াও রসবৈচিত্র্যের তুফান জাগানো যায়, এ ভাবটা অতি অল্পদিন হইল রবীন্দ্রনাথের প্রভাববশতঃ বাংলা সাহিত্যে ঢুকিয়াছে। বাঙ্গালীর কাছে ইহা তন বলিয়া অনেকে ইহাকে বিদেশের

আমদানী মনে করিয়া সন্দেহের চোখে দেখেন। কিন্তু হিন্দুস্থানী সন্তদের সহিত পরিচয় নিবিড় হইলে দেখিতে পাইতেন, এ ভাবটা বিদেশী তো নহেই, বরং সম্পূর্ণ স্বদেশী। অরূপের প্রতি কান্তভাব বিদেশের সাহিত্যে অতি অল্প স্থানই জুড়িয়াছে; কিন্তু ভারতীয়-সাহিত্যে ইহার অপ্রতুলতা মোটেই নাই।

সহজিয়া মতের একটা স্থূল ধারার সহিতই বাঙ্গালীর পরিচয় আছে—সেটা একান্তভাবে রূপকে ঘেঁষিয়া। এমন কি, সে সহজ বলিতে অনেক সময় আমরা প্রাকৃত ভাব ছাপাইয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারি না। কিন্তু অরূপকে নিয়াও একটা সহজিয়া মত আছে; তাহার পরিচয় পাই সন্ত্-বাণীতে। ইহা যে একান্ত অর্ব্বাচীন ভাব, তাহাও বলিতে পারি না। ইহার মাঝে পুরুষ ও প্রকৃতি—দুই ভাবেরই আরোপে সাধনা করিবার সঙ্কেত দেখিতে পাওয়া যায়। কবীর, গরীবদাস, চরণদাস, কেশবদাস প্রভৃতির বাণীতে প্রকৃতিভাবের আরোপ দেখিতে পাই। বেদান্ত-সাধনার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, "অরূপ"-সহজিয়া মতে পুরুষভাবের আরোপ বৈদান্তিকদের মাঝে হওয়া স্বাভাবিক। তন্ত্রে ইহার প্রাধান্য যথেষ্ট; বেদান্তেও নিতান্ত অপ্রতুল নয়। সাংখ্যে ইহার চমৎকার প্রয়োগ দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে প্রসিদ্ধ আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুর লেখা পড়িতে বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, "স্ত্রিয়ম্ অথ উপাসীত"—এই বেদবাণী ইহার বীজ; এবং বৈদিক কালেও এই সাধনার অপ্রতুলতা ছিল না। এ কথা অবশ্য প্রমাণসাপেক্ষ।

এই "অরূপ"-সহজিয়ামতের মনস্তত্ত্ব কি, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত সন্তদের বাণী আলোচনা করিয়াই বুঝিতে পারা যায়। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা, যাঁহারা জ্ঞানপন্থার অনুশীলন করেন, তাঁহারা বুঝি একেবারে ব্যোমস্বরূপ হইয়া যান, রস বলিতে কিছুই তাঁহাদের অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু তাহা হইলে যে জীবন্মুক্তি কথাটার সমস্ত তাৎপর্য্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। অথচ ভক্তি-পথিক "রূপের সহজিয়া" বলিয়া মুক্তির পথ মাড়াইতে একেবারেই নারাজ, সুতরাং "জীবন্মুক্তির" প্রতি তাঁহাদের লোভ না থাকারই কথা। কথাটা তাহা হইলে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে? অরূপ সহজিয়াবাদীরা ইহার জবাব দিয়াছেন।

কেশবদাস বলিতেছেন,

অবিনাশী দুলহ মন মোহ্যো জাকো নিগম বতাবৈ নেত।

—বেদ যাঁহাকে নেতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই অবিনাশী বঁধু আমার মন ভুলাইয়াছে।

এ ঠিক দ্বিভুজ মুরলীধরের উপাসনা নয়; আবার জ্ঞানবিচারের সাধনাও নয়। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য নিরঞ্জন পুরুষকেই মানুষের প্রেম-প্রীতি সঁপিয়া দেওয়া—ইহাই অরূপবাদীর সহজিয়া মত। ইহার অনুভব বৈদান্তিকের অবিদিত নহে। যেমন দেহকে নিয়া সহজ ভাব জাগিতে পারে, তেমনি বিদেহকে নিয়াও সহজের উৎস উথলিয়া উঠিতে পারে।

কেশব বলিতেছেন—

নিরমল কন্ত সন্ত হম পায়া।
কোটি সুর জাকী নির্ম্মল কায়া॥
সত্য পুরুষ ধুতি অতি উজিয়ারী,
কোটি ভানু-সসি ছবি পর বারী।
তেজপুঞ্জ নির্গুণ উজিযারা,
কহ কেসো সোই কন্ত হমারা॥

—কোটী সূর্য্যে যাঁর নির্ম্মল কায়া গঠিত, এমন নির্ম্মল কান্ত আমি পাইয়াছি। সেই সত্য-পুরুষের উজ্জ্বল রূপ কোটী রবি শশীর ছবিকেও হটাইয়া দিতেছে। ওই যে নির্গুণ উজ্জ্বল তেজপুঞ্জ, কেশব বলেন, সেই আমার কান্ত!

এই কান্ত যে ঠিক মাটীর মানুষ নন, সে কথা বলাই বাহুল্য। কেশব আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

ছায়া কায়া তেঁ প্রভু ন্যারা,
ধরণি আকাসকে বাহর পারা।

—হে প্রভু, তোমার ছায়া এবং কায়া অন্য-রকম; সে আমাদের এই ধরণী ও আকাশেরও বাহিরে।

অগম অপার নিরন্তর বাসী,
হলৈ ন টলৈ অগম অবিনাসী।
রূপ কই অদ্ভুত রূপ ন রেখা
অগম পুরুষ প্রভু সব্দ অলেখা।
নিজ জন জায়, তহাঁ প্রভু দেখা,
আদি ন অন্ত, না হি কছু ভেখা!

—তিনি অগম, অপার, অবিনাশী, নিরন্তর স্তব্ধ হইয়া আছেন—হেলিয়াও পড়েন না, টলিয়াও পড়েন না। রেখাহীন সে কেমন অদ্ভুত রূপ! —অগম পুরুষ তিনি, অলেখ শব্দ তিনি। নিজ-জন যাহারা সেখানে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাহারা না পাইয়াছে তাঁহার আদি, না পাইয়াছে অন্ত, না দেখিয়াছে কোনও বেশ!

দীজিয়ে চিত রীঝিকে উত, বহুর ইতহিঁন আইয়ে।
জহঁ তেজ পুঞ্জ অনন্ত সূরজ, গগনমেঁ নত ছাইয়ে॥

—ভালবাসিয়া ওইখানেই তোমার চিত্ত ঢালিয়া দাও, বাহুড়িয়া আর এখানে আসিও না; অনন্ত-সূর্য্যের তেজঃপুঞ্জ যেখানে, সেখানে আকাশে তোল তোমার ডেরা!

লিয়ে ঘট-পট খোলিকৈ প্রভু, অগম গতি তব গতিকরী
বঢ়ী অধিক সুহাগ কেসো, বাছুরত নহি হক ঘরী॥

—তাঁহার পানে চাহিয়া যখন এই প্রপঞ্চের দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইবে, তখনই সেই অগম দেশে পহুঁছি-বার পথ পাওয়া যাইবে। প্রিয়তমের সোহাগ তখন আরও বাড়িয়া যাইবে, একদণ্ডের জন্যও তখন ছাড়াছাড়ি হইবে না।

অলেখকে ধরিতে হইলে নিজকেও রিক্ত করিতে হইবে—এখানকার সমস্ত জঞ্জাল আঁকড়িয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। হয়ত লোকে তোমাকে বুঝিতে পারিবে না, তাহাতে তোমার কি?—

অদ্ভুত ভেখ বনায় অলেখ মনাইয়ে।
নিসু বাসর করি প্রেম তো কণ্ঠ লগাইয়ে॥

—অপরূপ বেশ পরিয়া সেই অলেখকে বশ কর; তারপর নিশিদিন তাঁহাকে ভালবাসিয়া বুকে জড়াইয়া রাখ।

অপরূপ বেশের কথায় মনে হইতে পারে, এ তো তাহা হইলে সহজ নয়!—কিন্তু এ যে সহজ, সেই কথাই কেশব বারবার বলিতেছেন। তবে কিনা সহজকে পাইতে হইলেও সাধনা চাই—এবং সহজের মাঝে কঠিন যদি কিছু থাকে, তাহা এই সাধনারই কাঠিন্য। সর্ব্বত্রই সিদ্ধি সহজ; সাধনাও সহজ, রসিকেরা এ কথা কোথাও বলেন নাই। কিন্তু আমাদের ভুল হয় এইখানেই; আমরা মনে করি, সাধনাও বুঝি সহজ। বাংলার রূপবাদীদের যে সহজিয়া মত প্রচলিত রহিয়াছে, একেবারে এই দেহকে ধরিয়া তাহার সাধনা সুরু হইলেও সহজিয়া তন্ত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করি-য়াছেন, তাঁহারা জানেন, সে সাধনা সহজ তো নহেই, বরং গীতা-কথিত অব্যক্তের উপাসনার চেয়েও কঠিন। সাধনাকেও সহজ করিতে গিয়াই আজ সর্ব্বত্র সহজিয়া মতে (কি রূপবাদী, কি অরূপবাদীর মাঝে) সর্ব্বত্র ব্যভিচার ঢুকিয়াছে। অবলীলাক্রমে আমি লিখিয়া যাইতেছি—লেখার এই সিদ্ধি আমার কাছে খুব সহজ; কিন্তু তাই বলিয়া যেদিন হাতে খড়ি হইয়াছিল, সেদিন লেখাটা সহজ হয় নাই। এই জন্যই সাধনার যে স্তর হইতেই আমরা কথা বলি না কেন, রূপান্তর যে একান্ত প্রয়োজন, এ কথা কিছুতেই এড়াইতে পারি না। যেখান হইতে সুরু করিয়াছি,

তাহাকে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া যাওয়াই সাধনা—এই গতিই সাধনা। সুতরাং সাধনা স্বীকার করিলে রূপান্তর অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহার মাঝে কিছু-না-কিছু কাঠিন্য থাকিবেই। সহজিয়ার সাধনা কঠিন, কিন্তু তৃপ্তি সহজ, দৃষ্টি সহজ, অনুভূতি সহজ, অনুভবের উপকরণগুলি অতি সহজ। এইজন্য নিজকে অপরূপ বেশে সাজাইতে বলিয়াও কেশবের সহজ-প্রীতিটুকু নষ্ট হয় নাই।

এই সহজের স্বরূপ কি?—কেশব বলিতেছেন—

নহিঁ জহি দুর হজুর সাহিব, ফুলি সব তনকে' রহো।
অমর অছয় সদা জুগন জুগ জক্ত দীপক উগি রহো॥

—হে প্রভু, তোমার এই ভৃত্য দূরে যাইবে না; তাহার এই তনুতেই তুমি ফুটিয়া থাক। যুগ হইতে যুগান্তর যে উজ্জ্বল দীপ অমর অক্ষয় হইয়া আছে, তাহারই মত তুমি জ্বলিতে থাক।

তনুত্যাগের প্রয়োজন নাই, জগতের প্রতি মুখ ফিরাইবার প্রয়োজন নাই — এ কথা সত্য। কিন্তু কখন সত্য?—যখন তাঁহাকে পাইয়াছি। নতুবা এক সময় "নেবৃছাবর করি দেহ"—এই দেহ উৎসর্গ করিবারও প্রয়োজন ছিল। সাধনা যখন সিদ্ধি নামিয়া আসিল, তখন "সেই অদ্ভুত রূপ অবিনাসী" এই দেহের মাঝেই ঢুকিয়া গেল। ইহাই সহজ স্থিতি। তাই কেশব বলিলেন—

নিরখি দসৌ দিসি সর্ব শোভা, কোটি চন্দ সুহারন'।
সদা নিরভয় রাজ নিত সুখ সোঈ কেসো ধারন'।

—দশ দিকের সকল শোভার পানে চাহিয়া দেখি, কোটী চন্দ্রের মাধুর্য্য ছলকিয়া পড়িতেছে। নির্ভয় নিত্য সুখ চিত্তে সর্ব্বদা লহরিত হইয়া উঠিতেছে। আমি তাহারই ধ্যান করি।

পূরণ সর্ব্ব নিধান, জানি সোই লীজিয়ে।
নির্ম্মল নির্গুণ কন্ত তাহি চিত্ত দীজিয়ে॥

—তিনিই সমস্ত পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, এই কথাই জানিও। তোমার বঁধু নির্ম্মল ও নির্গুণ, তাঁহাকেই চিত্ত সঁপিয়া দাও।

আরও স্পষ্ট কথা—

ফুলি রহো সব ঠাঁর, তৌ ধরনি অকাস মেঁ।
সো ত্রিভুবনপতি নাথ, নিরখি লিয়ো আপমে॥

—এই ধরণীতে, এই আকাশে তিনিই যে ফুটিয়া রহিয়াছেন। ত্রিভুবনের পতি যিনি, তিনিই তোমার বঁধু; তাঁহাকে তোমার মাঝে নিরখিয়া লও!

বাহিরে যিনি প্রকাশ, তিনি আমার মাঝেই —ইহাই চূড়ান্ত সহজ কথা।

একদিন এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া কবীর-জীও বলিয়াছিলেন, "তিনি যে কোথায়, তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব? যদি বলি তিনি অন্তরে, তাহা হইলে বাহির যে লজ্জায় মুসড়িয়া পড়ে। আবার যদি বলি, তিনি বাহিরে, তাহা হইলে অন্তর যে আঁধার হইয়া যায়!"

এই ভাবদ্বৈতেই মীমাংসা শেষে এই হইয়াছিল— "আমার কোথায়ও যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আমি সহজ সমাধিতে বিভোর হইয়া থাকিব—আমাকে আর আঁখিও মুদিতে হইবে না, কাণও রুধিতে হইবে না।"

কেশবও সেই কথাই বলিতেছেন

নিরখি আপু আঘাত নাহী' সকল সুখরস সানিয়ে।
পিরহি অমৃত সুরতি ভর করি—

—নিজকে দেখিয়া আর যেন তৃপ্তি হইতেছে না— এমনি করিয়া সকল সুখের রস ছানিয়া লও—আকণ্ঠ পূরিয়া পান কর অমৃতের ধারা—

আমার মাধুরীতে আমিই বিভোর—একদিন রাসরসিকের মুখ দিয়া বৈষ্ণব কবি এই কথাই বলাইয়াছিলেন—

দর্পণান্তে হেরি প্রিয়ে আপন মাধুরী—
আস্বাদিব মনে করি আস্বাদিতে নারি!

— কিন্তু এই অপরূপ বেদনা যে বৈদান্তিকের মাঝেও ফুটিয়া উঠিতে পারে, বাঙ্গালার ভাবুকতার সাহিত্যে সে কথার ইঙ্গিত পাই না।

অসীমের মাঝে আপনাকে বিস্তার করিয়া যে আনন্দ, তাহার আস্বাদন পাই কেশবের এই কথায়—

কোটি বিষ্ণু অনন্ত ব্রহ্মা
সদা সিব জোহি ধ্যারহী'।
সোহি মিল্যো সহজ সরূপ কেসো,
অনন্দ মঙ্গল গারহী'।

—কোটী বিষ্ণু, অনন্ত ব্রহ্মা ও অনন্ত শিব যাঁহার ধ্যান করেন, তাঁহাকেই পাইলাম সহজ স্বরূপে— আনন্দমঙ্গল গান কর কেশব! (সমাপ্ত)

দেশের দশা

আমাদের মাঝে সম্প্রকার অভেদ, অমায়িক উদার ভাব আছে বলেই যে ভেদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন, উদাসীন তা নয়, সত্য সত্যই আমাদের মাঝে প্রাণশক্তির অভাব ঘটেছে; কোন কিছুতেই নিষ্ঠা নেই, তাই জড়ত্বে আমাদের অভিভূত করে ফেলেছে। এটা জাতীয় উন্নতির পক্ষে মহা কণ্টক। নিষ্ঠা না থাকলে, নিজের জাতীয়ত্ববোধে গৌরব অনুভব না করলে কোন্ জাতি নিজের বন্ধন মোচন করে অপরের কাছে উন্নতশিরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে? আমাদের জাতিটা ত্যাগের মন্ত্র পেয়ে, সব ত্যাগ করে ফতুর হয়ে গেল! এমন কি শেষে আপন ব্যক্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত। তার ফলে কি হয়েছে? যে দিকে তাকাই, দেখি সকলেরই প্রকৃতি-লীন অবস্থা।

ত্যাগ করতে পারে কারা?—যাদের যথেষ্ট সঞ্চয় আছে। ফকির আবার অপরকে বিলাবে কি? তার নিজের অভাব-অভিযোগই যে সে মিটাতে পারছে না। হিন্দুর ত্যাগের বিশেষত্বই এই—"প্রাণপণে উপার্জ্জন কর, কিন্তু নিজের জন্য সব জমিয়ে রেখো না; সকলকে বিলিয়ে দাও।" তারা উপার্জ্জন করেই বিসর্জ্জন দিত—প্রাণপণে কর্ম্ম করেই কর্ম্ম হতে মুক্তি পেত। কিছু না করে পরের ধনে পোদ্দারী তাদের মাঝে কখনই দেখা যায়নি। "কিছু না করেই সব পাব" এ অলস ভাবনায় আজ আমাদের নিশ্চিন্ত, নিশ্চেষ্ট করে দিচ্ছে। কাজেই জাতির মাঝে কর্ম্মতৎপরতা না ফুটে কর্ম্মবিমুখীনতাই বেশী করে প্রকাশ পাচ্ছে। এটা ভেবে দেখি না, আমরা যে ত্যাগী বলে অভিমান করি—আমাদের আছে কি? ত্যাগের কিছু নাই অথচ ত্যাগী, তেমনি সংযম নাই মোটেই অথচ আমরা ভোগী! আমাদের শক্তি, সামর্থ্য, বীর্য্য কিছুই নাই অথচ ভোগের প্রতি একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়ে গিয়েছে। দেশের যে দুর্ব্বল খার্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার উপর অহর্নিশ এই অত্যাচার, উদ্দণ্ড নৃত্য সহ্য হবে কিনা, তা একবার "যাদের কিছু নাই অথচ ত্যাগী" তাদের একটু ভেবে দেখা উচিত।

এমনি একটা হাওয়া এসেছে যে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, জাতির প্রতি নিষ্ঠা ত্যাগ করে, অপর জাতির অনুসরণ করে চলাই যেন শিক্ষিতের লক্ষণ। কতখানি অন্তঃসারশূন্য হলে জাতির এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে, তা চিন্তার বিষয়। অনেক সময় এরূপ প্রশ্ন হয়, "আমাদের অভাব-অভিযোগ মিটাতে পারে, এমন যথোচিত আয়োজন আমাদের সমাজে দেখতে পাইনে, তাই অভাব মিটাতে অপরের কাছে যাই; এতে দোষ কি? আর ওরূপ সঙ্কীর্ণভাব পোষণ করলেই বা চলবে কি করে? এখন যে সবার সঙ্গে ঐক্যের যুগ এসেছে!" মানি, কোন বিষয়ে হয়ত জাতির মাঝে অভাব থাকতে পারে, তা না হয় অপরের কাছ থেকে মিটিয়ে এলাম; কিন্তু সকল বিষয়েই যে অপরের পদলেহন করেই চলতে হবে এ কেমন অদ্ভুত কথা? তা হলে ভগবান আলাদা করে একটা জাতির সৃষ্টি করতেন না। আর অনুকরণ করতে গিয়ে তাদের ধাঁচেই করতে হবে, এই কি খাঁটী কথা? নিজের ব্যক্তিত্বের অভিমানটুকু বজায় রেখেও কি অপরের জিনিষ আমাদের করে নিতে পারি না?

একেবারে ছোটবেলা হতেই আমাদের এ

ভাবটা বদ্ধমূল হয়ে এসেছে—আমাদের যেন কিছুই নাই—আমরা ফকির। নিজের প্রতি নিজেরই যদি অবিশ্বাস হয়, নিজেই যদি নিজের নিষ্ঠার মূলে কুঠারাঘাত করি, তবে আর উন্নতি হবে কিসে?

শ্রদ্ধার, নিষ্ঠার অভাব হলেই জাতির মাঝে এমনি একটা কর্ম্মহীন নিরুৎসাহ 'বৈদান্তিক' ভাব আসে। বলতে কি, এখন এ ব্যাধিটাই যেন আমাদের বিশেষ করে আক্রমণ করেছে। তাই আমাদের দেশে ধনী হতে আরম্ভ করে নিতান্ত দরিদ্র, যার কিছুই নাই, সেও ত্যাগীর অভিমান রাখে! বড়র সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকতালে অনেক ছোটও বেঁচে যায়। কিন্তু আজ যে আমাদের সকলেরই এক দশা—মিছে অভিমান করায় "বাঘ ও রাখালবালকের" মত আমাদের কথায় কেউ বিশ্বাস করতে চায় না, আমাদের ভ্রূকুটি দেখে কেউ ভয় পায় না।

স্বাতন্ত্র্য যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন অবশ্য পরস্পরের মিলন সম্বন্ধে আশঙ্কা জাগে। বাস্তবিক এ জায়গায়ই যত বিপদ; স্বাতন্ত্র্যও বজায় থাকবে, অথচ পরস্পরের মধ্যে যাতে বিরোধের সৃষ্টি না হয়, তাও দেখতে হবে। তা হলেই পরস্পরের মাঝে সহানুভূতি চাই—স্বার্থশূন্য হয়ে উভয় পক্ষের কথা উভয় পক্ষেরই বেশ বিচার করে মেনে নেওয়া প্রয়োজন। এমন অনেকের কথা শুনেছি, হয়ত একজন তার আপন জাতের মর্য্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে অপর সমাজ ঢুক্‌তে চেয়েছে, আর অমনি সেই দলের নেতাও তাকে দলপুষ্টির জন্য বেশ আগ্রহে তাদের মাঝে স্থান দিয়েছেন। এটাই কি চূড়ান্ত আদর্শের কথা, মেলামেশার প্রকৃষ্ট পথ? আপন সমাজশাসনে থেকেও কি পরস্পরের মাঝে মিলন হতে পারে না? মিলনের উপায় যে কেবল বাইরে, তা তো নয়। অথচ আমাদের ধারণা, এই করেই পরস্পরের মাঝে সহজে মিলন হবে। মিলন কথাটা অন্তরের—তাতে হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, পরকে নিজের মতে আনবার জন্য জোর-জুলুম নেই, যার যার জায়গা থেকেই যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আসক্তিহীন স্বার্থশূন্য টান—এটাই হচ্ছে মিলনের প্রকৃষ্ট উপায়। এতে কোন কিছু ভেঙ্গেচুরে নূতন একটা উৎকটের সৃষ্টি করতে হয় না।

দু'ধরণের লোকই দেখতে পাই। এক ধরণের লোক আছেন, যাঁরা নিজের বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে উদার বলে পরিচয় দিচ্ছেন—শুধু ভাবে নয়, কর্ম্মে, খাওয়া-পরা, চালচলন ইত্যাদিতেও। আর এক ধরণের লোক আছেন, যাঁরা নিজের বিশিষ্টতাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণদৃষ্টিতে দেখেন। দুটার কোনটাই আমাদের আদর্শ হতে পারে না। তাই বলছি, সাংখ্যের বিবেকজ্ঞানকে ভিত্তি করে বেদান্তের ভাবে ছড়িয়ে পড়লে আর অধঃপতনের আশঙ্কা থাকে না। এখনও অনেকের ধারণা আছে—তাদের নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়া মুক্তির অন্য কোন পথই নাই। এটা নেহাৎ গোঁড়ামী। গোঁড়ামী আর নিষ্ঠা দুটো কথার তাৎপর্য্য তো এক নয়। গোঁড়ামীতে সঙ্কীর্ণভাব আসে, নিজকে ছেড়ে আর কাউকে সে দেখতে পায় না; আর নিষ্ঠাতে নিজকে তো দেখা যায়ই, সঙ্গে সঙ্গে অপরের প্রতিও একটা টান আসে, তাতে প্রাণে ব্যাপ্তি-বোধ জাগে।

সংশয় জাগাটাকে আমরা মন্দ বলছি না। আর আজকাল সবাই 'কেন' এ প্রশ্নটা না করে কোন কাজে নামতে চায় না। কিন্তু 'কেন'র তত্ত্ব নিরূপণ কর্‌বার মত আমাদের জাতির মাঝে কয়টা আত্মত্যাগী বীর-পুরুষের সন্ধান পাওয়া

যায়? আর তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্ত কয়টী লোকেরই বা ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধা দেখ্‌তে পাওয়া যায়?

জাতিটা অধঃপাতে গিয়েছে, এই কথা বলে দূর থেকে নিশ্চেষ্টভাবে আজ সকলেই দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তাঁদের দুঃখের কথা জানাচ্ছেন আর সমবেদনা প্রকাশ কর্‌ছেন; কিন্তু প্রতীকার হয় কি করে, এ কথা ভাবছেন কয় জন? এর প্রতীকার কর্‌তে হলে বহির্ম্মুখীনতাকে, উচ্ছৃঙ্খলতাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে, অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে সমস্তই বিশ্লেষণ কর্‌তে হয়; তা হলেই বাইরের খোলস অতিক্রম করে এমন একটা সত্যবস্তুর উপলব্ধি পাওয়া যায়, যার কল্যাণময় শক্তিতে আপনি একটা নিষ্ঠার ভাব আসে। জাতীয় মিলনের পক্ষে এ ভাবটা যে কত অনুকূল, তা বলবার নয়।

পতনের আর একটি কারণ হচ্ছে, আমরা নিজকে নিজে বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। যাই করছি, তাতেই থেকে যাচ্ছে কেবল সন্দেহ, অতৃপ্তি, আর যা ভিতরে পাবার তাকে কেবল বাইরে খুঁজে মরছি। আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছি—কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পরিধিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাইরের রূপেই মুগ্ধ হয়ে রূপের তত্ত্ব জানছি না। যে যা বলছে, বিচারহীন হয়ে তা লুফে ধরছি। একটা শক্তি অবশ্য আমাদের মাঝে জাগছে, কিন্তু উপযুক্ত চালকের অভাবে তার যথেষ্ট অপব্যয় ঘট্‌ছে। এ দুর্দ্দিনে বিষম সঙ্কটে কে আমাদের রক্ষা করবে? প্রতীকার কি অপরের হাতে, না নিজের হাতে? আমরা নিজে-নিজে যে এক উদ্ভটের সৃষ্টি করছি, তাই আমাদের পক্ষে ভাল, না আমাদের পূর্ব্ব মুনি-ঋষিদের সাধ্য-সাধনা দ্বারা যে সত্য-অনুভূত বাণী, তাই সত্য? নিজের ভাল-মন্দ তো নিজেই বোঝ, বিচার করে বুঝে-শুনে দেখ না। পদে পদে যে ঠেকছ, এ কথা তো তোমায় স্বীকার করতেই হবে। তৃপ্তি পাচ্ছ না—অতৃপ্তিই বেড়ে চলছে। তাই বলছি, প্রবৃত্তির রসনা সংযত করে একবার ভেবে দেখ। উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠে সহজে, এমন অনেক লোকই পাওয়া যাচ্ছে, এখন একদল সাধকের, তপস্বীর—যারা বর্ত্তমানকে ছেড়েও ভবিষ্যতের কিছু দেখছেন, এমন আত্মত্যাগী বীর-পুরুষের প্রয়োজন। পরের দ্বারে ভিখারী সেজে যা খুঁজে মরছি, তা আমাদের কাছেই রয়েছে। নিকটে রয়েছে বলেই দেখতে পাই না। ঘাসের রুটি খেয়ে প্রতাপসিংহ আর কিছুও যদি না করে থাকেন, তবুও তাঁর মাঝে যে আত্মপ্রত্যয় এবং নিষ্ঠার ভাব প্রবল ছিল, তা স্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে গিয়েছেন। জাতীয় উন্নতি যদি আমরা চাই, তবে আমাদের সেই অবিচল নিষ্ঠা, দৃঢ় বিশ্বাস, এ দুটোই অর্জ্জন করতে হবে প্রথমে। তার পরে যদি কিছু শ্রেয়ঃ থাকে, তা আপনি আসবে। এক কথায় বলতে গেলে প্রবঞ্চক ভাবুকের চেয়ে. নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মীর এখন বিশেষ প্রয়োজন।

নীতির মূল্য

—*—

শিশুরা মন্দাকিনীর স্রোতে ভেসে আসা সোণার পারিজাত—এমন একটা কথা কবিরা রটিয়েছেন এবং এতদিন পর্য্যন্ত আমিও তাই বিশ্বাস করে এসেছি। কিন্তু সে বিশ্বাস আর টেঁকানো বুঝি দায় হয়ে উঠ্‌ল।

রমেনের আব্দার, অত্যাচার, সোহাগ, আধ-আধ কথা, সবই মিষ্টি; বাস্তবিক যখন-তখন হাসির লহর তুলে ও যখন এসে গলা জড়িয়ে ধরে, তখন কি এক আবেশে আত্মহারা হয়ে যাই যেন; মনে হয়, শিশু যে স্বর্গের পারিজাত, এ শুধু কবি-কল্পনা নয়, একেবারে নির্ভেজাল সত্য।

কিন্তু ও তরফটাও আছে যে!

আমার কাছে রমেন যতখানি আদুরে এবং কমনীয়, তার সমবয়সীদের প্রতি কিন্তু সে তার চাইতে বেশী উগ্র এবং নিষ্ঠুর। কারণে-অকারণে যে এসে আমার কাছে অমন করে সোহাগে গলে পড়তে পারে, সে যে কি করে আবার সুযোগ পেলেই দুর্ব্বলের টুঁটি চেপে ধরে, এটা আমি কিছুতেই ভেবে পাই না। অজস্র পেয়েও যে কি করে ওদের মাঝে ঈর্ষ্যা-কুটিলতা জাগে, তা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য ঠেকে।

অনেক ভাবনার পর আবিষ্কার করেছি, শিশু-চরিত্র একটা নিরেট্ নির্ল্লজ্জ স্বার্থপরতা; ওদের যে স্বর্গের পারিজাত বলি, সেটা শুধু ওদের কাছ থেকে আমাদের স্নেহ-বুভুক্ষার খোরাক পাই বলে; ওটা আমাদের স্বার্থপরতা মাত্র। নইলে সমগ্রভাবে এবং অপক্ষপাতে বিচার করতে হলে বল্‌তেই হয়—ওদের মত স্বার্থপর জাত আর দুনিয়ায় নাই। আদায় করবার বেলায় মুঠো-ভরা নেবে, কিন্তু দানের বেলায় অতি কষ্টে নখের আগায় ভেঙে এতটুকু দেবে।

কথাগুলো যখন ভাবি, কল্পনার স্বর্গ তখন চুরমার হয়ে যায়, মনটায় বিষম বাজে; এবং তার ফলে বিশুদ্ধ পরহিতৈষণার অঙ্কুরটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পল্লবিত হয়ে ওঠে। "আহা, ছেলে-মানুষ অমন হয়-ই; বড় হলেও কি আর অমন একলসেঁড়ে ভাব থাক্‌বে?"—গৃহলক্ষ্মীদের এই স্নেহ-মূঢ় প্রশ্রয়ের ভাষায় মোটেই আশ্বস্ত হতে পারি না। ভাবি, তা কেন? সব শিক্ষাই কি জান্তব-প্রকৃতির হাতে ছেড়ে রেখেছি? কালে যা ফুটত, মানব-প্রকৃতির মহত্ত্বের উপর আস্থা রেখে অকালে তা ফোটাবার চেষ্টা কি শিশুর বেলাতেও করি না এবং তাকেই শিক্ষা বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করি না?

একদিন দেখি, রমেন রাগে ফুঁস্‌ছে। গায়ে হাত বুলিয়ে কথাটা আদায় করলাম। যতীনের কাছে ঘা কতক খেয়ে এসেছে আজ। ঝগড়া-ঝাঁটী দুজনে প্রায়ই হয়, কিন্তু এতটা কোনও দিন গড়ায় না। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে সমস্তটা কাহিনী রমেন নিজের অনুকূলে বিবৃত করে উপসংহারে যতীনের উপর একটা নির্ম্মম প্রতিশোধ নেবার সদিচ্ছাটা ব্যক্ত করল। জানি, ছেলেটা বদ্‌রাগী। তাই একটু আশঙ্কা হচ্ছিল, কি জানি কি করে বসে!—বুদ্ধের নীতি, খৃষ্টের নীতি 'কোট' করে ক্ষমাধর্ম্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কত বক্তৃতাই করলাম, কিন্তু রমেন একেবারে পাকা গীতাধ্যায়ী—"সে আমায় মারবে, আর আমি তাকে ছেড়ে কথা কইব?"—এই হচ্ছে তার সেরা যুক্তি। কলসীর কাণা মারলে পরেও কেন যে প্রেম বিলাতে হবে, এটা কিছুতেই তার মাথায় ঢুক্‌তে চায় না। আমরা বলি, ছেলে-বুদ্ধি; কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? যেমন জোরে আঘাতটা

আসে, তার দ্বিগুণ জোরে সেটাকে ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছাটাকে কি আমরাই মেরে ফেলতে পেরেছি?—এ ক্ষেত্রে আমরা ডিপ্লোমাট, আর রমেন স্পষ্টবক্তা, এই যা তফাৎ। বাস্তবিক, বড় বড় Moral lawগুলি বোধ হয় কখনও যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না।

মনটা বড় দমে গেল।—অগত্যা গীতা স্মরণ করে "উদাসীনবদাসীন" হয়ে রইলাম। খানিকক্ষণ পরে রমেন ধীরে ধীরে কাছে এসে গা ঘেঁসে বস্‌ল। আমি সাড়া দিলাম না। আস্তে-আস্তে আমার একখানা হাত তুলে নিয়ে খেলা করতে লাগল। আমি তবুও কথা কই না। তারপর হঠাৎ দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, "আমার ওপর রাগ করেছ?"—আচ্ছা মায়াবীর জাত!

বল্‌লাম, "না।"

"তবে কথা কইছ না যে?"

গলা হতে হাত দুটী ছাড়িয়ে দিতে দিতে বল্‌লাম, "ভাল লাগছে না।"

বুকের ওপর মাথাটী কাৎ করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে আবার আমায় জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনার সুরে বল্‌ল, "আচ্ছা, আমি আর ওকে কিছু বল্‌ব না—তুমি অমন মুখ ভার করে থেকো না? তাকাও—তাকাও আমার দিকে!—হাঁ, এই হয়েছে!—এখন একটু হাস—হাস!"

হাসতেই হল। আমাকে হাস্‌তে দেখে খানিকক্ষণ একথায়-ওকথায় আমায় ভুলিয়ে খেলা করতে চলে গেল।

বসে বসে ভাবতে লাগলাম, বাস্তবিক বুদ্ধনীতিই তো শেষকালে জয়ী হল। "অক্রোধেন জিনে ক্রোধং"—অক্রোধ দ্বারাই ক্রোধকে জয় করতে হয়—এই শাসনবাণীই তো অবশেষে সত্য হল। অবশ্য আমি যেদিক দিয়ে আশা করেছিলাম, সেই দিক দিয়ে নয়, কিন্তু আমার অক্রোধই তো শেষ পর্য্যন্ত রমেনের ক্রোধকে পরাভূত করল। এই হতে শিক্ষার একটা সূত্র আবিষ্কার করা যায় না কি? হয়ত করা যায়, কিন্তু এতখানি ধৈর্য্য আমাদের আছে কি?

আর একদিন আমাদের মাঝে তর্ক হচ্ছিল।

রমেনের হাতে কিছু মিষ্টান্ন—মহা উৎসাহে সে তার সদ্ব্যবহার করছে। ইলা তার সামনেই দাঁড়িয়ে, লোলুপ দৃষ্টিতে দাদার খাওয়া দেখ্‌ছে। ইলার দিকে তাকিয়ে রমেন চোখ-মুখের যে সব বিচিত্র ও অননুকরণীয় কসরৎ করছে, তা যে ইলার কাছে মোটেই উপাদেয় ঠেক্‌ছে না, তা ওর মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পারলাম।

রমেনকে বল্লাম, "বোনটীকে দাও না একটুখানি!"

ইলা তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল, "না, আমার ভাগ তো আমি খেয়েছি!" ছোট হলে কি হবে, ইলার ন্যায়বিচার ও আত্মসম্মান-জ্ঞান বেশ টন্‌টনে।

রমেন ঘাড় কাৎ করে এক চোখ বুঝে আর এক চোখে ইলার পানে তাকিয়ে বল্‌ল, "ইস্‌, কেন দেব? সেদিন যখন আমের আচার হয়েছিল, তখন দিয়েছিল আমায়?"

ইলা আহত হয়ে বল্‌ল, "তুমি তো তখন বাড়ীতেই ছিলে না!"

আমি বল্‌লাম, "কেউ যদি তোমায় কিছু নাই দিল, কি দিতে ভুলেই গেল, তাহলে তাকে কিছু দিতে নাই নাকি?"

রমেন গম্ভীর হয়ে বল্‌ল, "না।"

আমি গম্ভীরতর হয়ে বল্‌লাম, "তাহলে আমারও তো তোমায় কিছু দিতে নাই, কেননা তুমি আর আমাকে কোন্ দিন কি দিয়েছ?—

অথচ আমি তো তোমাকে কত কিছু অমনি দিই।”

এ কথার জবাব ছিল না, তাই রমেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষুণ্ণস্বরে বল্‌ল, “বাঃ, তুমি আমায় না দিলে আমি পাব কোথা থেকে?”

হাসি চেপে রেখে গম্ভীর হয়ে বল্‌লাম, “ওটা তো যুক্তির কথা হল না। কথা হচ্ছিল, যে আমাকে দেবে, তাকেই শুধু আমি দেব; আমাকে যে দেবে না, আমিও তাকে দেব না। সুতরাং তুমি যখন আমাকে কিছু দাও না, তখন আমারও তোমাকে কিছু দেওয়া তো উচিত নয়। কিন্তু ছেলের কাছে কিছু না পেয়েও মা-বাপ ছেলেকে দেয় কেন?”

এবার শেষের কথাটায় রমেন যেন একটু থৈ পেল। ফস্ করে বলে বস্‌ল, “ছেলে বড় হয়ে মা-বাপকে দেবে বলেই মা-বাপ এখন ছেলেকে দেয়।”

কথাটা যে শাস্ত্রীয়, তা স্বীকার করতেই হবে। সংসারের স্বার্থপরতা সম্বন্ধে অনেক বৈরাগ্যভরা বাণীই কণ্ঠস্থ আছে। রমেন তার মূল সুরটা এত সহজেই আয়ত্ত করে ফেলেছে দেখে পুলকিত হলাম।

তবুও বল্‌লাম, “কথাটা কি ঠিক হল? বাপ-মা তা হলে মেয়েকে দেয় কেন? মেয়ে তো বড় হয়ে পরের ঘরে চলে যায়, বাপ-মাকে তো সে কিছু ফিরিয়ে দিতে পারে না।”

রমেন স্বীকার করল, এ কথাটার জবাব সে দিতে পারছে না। আমি বললাম, “আরও দেখ, তোমার হিসাবে কত ভুল। পাখী তার ছানাগুলিকে কোথা থেকে খাবার সংগ্রহ করে এনে খাওয়ায়। ছানাগুলি বড় হয়ে মা-বাপকে কি দেয়? সেদিন বুধীগাইর বাছুরটাকে ধরতে গিয়েছিলে বলে সে তোমায় গুঁতোতে এসেছিল। বুধী যে তার বাচ্ছাকে এত ভালবাসে, দুধ দেয়, বাচ্ছাটা বড় হয়ে তাকে কি দেবে?”

রমেন মাথা চুল্‌কাতে লাগ্‌ল।

আমি বল্‌লাম, “পশু-পক্ষীতে যা করে না, সন্তানের সঙ্গে মানুষ সেই ব্যবহার করে, তা হলে মানুষ কি জানোয়ারের চেয়েও হীন?”

রমেন লজ্জিত হয়ে বল্‌ল, “আমার ভুল হয়েছিল।”

“হাঁ, ভারি বিশ্রী ভুল হয়েছিল তোমার। দিলে পর যে দেয়, সে তো ব্যবসাদার। সে কি কখনো ভালবাসতে পারে? তুমি না চাইতেও মা তোমাকে দুটো পয়সা দিলেন খাবার কিনতে; তুমি দোকানীকে পয়সা দুটো দেওয়াতে সে তোমায় এক ঠোঙ্গা খাবার দিল। কে তোমায় ভালবাসে—মা না দোকানী?—কে বড়?”

রমেন কথা কইল না, সলজ্জভাবে একটু হাসল শুধু।

আমি বললাম, “কেউ তোমাকে কিছু না দিলেও তুমি অপরকে দেবে, কেননা দিয়ে তুমি আনন্দ পাও যে! যাকে দিচ্ছ, সে হয়ত তোমায় কিছু ফিরিয়ে দিচ্ছে না, কিন্তু ভগবান্ তোমার বুকে থেকে আনন্দরূপে সে দান ফিরিয়ে দিচ্ছেন।—এ কথাতে তো আর ভুল নাই যে প্রাণ খুলে কাউকে কিছু দিলে আমরা আনন্দ পাবই পাব? সেদিন কাঙ্গালীভোজন হয়েছিল; তুমি ছুটোছুটী করে পরিবেশন করেছিলে। তারা কি তোমায় কিছু দিয়ে গেছে, না তাদের জন্য খেটে তোমার কষ্ট হয়েছিল?—সন্ধ্যাবেলায় বসে একবার সারাদিনের হিসাব নিয়ে দেখো দেখি, কোন্ কথাগুলি মনে পড়ে তোমার মন আনন্দে ভরে ওঠে, নিজকে বড় বলে মনে হয়? অমুককে মেরেছি, অমুকের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, অমুকের কথা শুনিনি—এইগুলি মনে করেই গর্ব্ববোধ হয়, না অমুককে ভালবেসেছি, অমুকের সেবা করেছি, অমুককে

খুসী করেছি, এই কথাগুলি মনে করে আনন্দ হয় ?”

এই একটা পথ। পাপ-পুণ্যের পুরস্কার অন্তরে। যুক্তি দিয়ে ভাল-মন্দ প্রমাণ করা বড় কঠিন। অন্তরের চিত্রটী দিন দিন উদ্‌ঘাটিত করতে শিখাও, সম্ভবতঃ আত্মবিচার দ্বারাই ছেলেরা দুর্নীতি-সুনীতির প্রভেদ বুঝতে পারবে। ছেলেরা নিছক্ ভাল বা নিছক মন্দ—এ কথা আমি বলি না। আমি বলি, ভাল-মন্দের মিশ্রণে ওরা অপরূপ; ভাল-মন্দটা আলোছায়ার ঝিকিমিকির মত অতি দ্রুত ওদের মনের উপর দিয়ে খেলে যায় বলে ওদেরকে এত ভাল লাগে। নইলে সত্যকথা বল্‌তে গেলে—ওরা বর্ব্বর, অতএব অনুপম। অনুশীলনদ্বারা ওদের হৃদয়ের আলোকবিন্দুগুলো উজ্জ্বল করে তোল—কালোর কাজল আপনি মুছে যাবে।

সওয়াল-জবাব

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আর একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, “আপনার কি জাত? আপনি কি হিন্দু ব্রাহ্মণ?” রাম বল্‌লেন, “না।” “তবে কি আপনি ইহুদী, না খৃষ্টান? আপনি কোন সমাজের, কোন ধর্ম্মের লোক?” কারু একটা কিছু থাকলে সেটা হয় তার সম্পত্তি। একটা জিনিষ, কি একটা জানোয়ার তোমার সম্পত্তি হতে পারে, তখন বলা যেতে পারে ‘তোমার অমুকটা।’ কিন্তু রাম তো কোনও অচেতন পদার্থ বা জানোয়ার নন যে তিনি কারু সম্পত্তি হতে যাবেন। তিনি কোনও দলের সমাজের বা ধর্ম্মের হতে যাবেন কেন? গোটা জগৎটাই যে তাঁর—তিনি তো কারু নন। আমেরিকা রামের—তোমাদের আত্মাই রাম। তোমরা সবই আমার, ভারতবর্ষও আমার—খৃষ্টধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম, ইহুদীয়ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, বেদান্ত—সব আমার।

যাদের ক্ষুদ্র হৃদয়, তারাই স্বাধীনতা বেচতে পারে, তোমরা তা পার না।

লোকে বলে, এদেশে তারা স্বাধীন। হয়ত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তাদের আছে, কিন্তু আমেরিকায় ধার্ম্মিক দাসত্ব—সামাজিক দাসত্ব !! রাম তোমাদের কাছে মুক্তির বাণী নিয়ে এসেছেন—ভাবের মুক্তি, কর্ম্মের মুক্তি। রাম যে ধর্ম্ম তোমাদের শোনাতে এসেছেন, তার উপনাম দেওয়া হয় বেদান্ত। কিন্তু উপনাম দিয়ে তাকে লাঞ্ছিত করা উচিত নয়। যথার্থ বেদান্ত তো শুধু বেদে আবদ্ধ নয়। সে বেদান্ত যে তোমাদের হৃদয়ে! তাই রাম সনির্ব্বন্ধে তোমাদের জানাতে চান, তাঁকে শুধু ভারতবাসী বলে মনে করো না—তিনি আমেরিকানও বটে; রাম শুধু হিন্দু নন, তিনি খৃষ্টানও; মনে করো না, রাম এ মত বা ও মতের দাস নন। রাম তোমাদের আত্ম-স্বরূপ — রাম স্বরাট্।

আর একজন লোক বল্‌ল, "আপনি যদি ব্রহ্ম, তা হলে তো আপনি খৃষ্টের মতই। খৃষ্ট এই-এই সিদ্ধাই দেখিয়েছিলেন'; আপনিও তাই করে দেখান, তবে আমরা আপনাকে মান্‌তে পারি।" রাম বল্লেন, "ভায়া, খৃষ্ট সিদ্ধাই দেখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে কেউ মানেনি; তাঁকে অত্যাচারে জর্জ্জরিত করে ক্রুশে ঠুকে মেরেছিল। সিদ্ধাই দেখলেই কি কারু বিশ্বাস জন্মে? —কিছুতেই নয়।"

তারপর সিদ্ধাই দেখানোটা কি? এই দেহটা দিয়ে যদি ঝুড়ি-ঝুড়ি সিদ্ধাই দেখাই, তাতে আমার ব্রহ্মত্বের গৌরব একচুল বাড়বে কি? আমি তো এই দেহ নই; আমি তোমার আত্ম-স্বরূপ। এই দেহে সিদ্ধাই দেখালে কি হবে, আমার ওই দেহে তো তখন সিদ্ধাই দেখানো হচ্ছে না—অথচ আমি তো তারও আত্ম-স্বরূপ। যদি এই দেহ দিয়ে সিদ্ধাই দেখাই তাহলে তোমরা দেহটাকে ঈশ্বর বানাবে—যেটা নাকি ঈশ্বরত্বের জঘন্যতম অংশ। রাম বলেন, তোমার আত্মস্বরূপে ঈশ্বরত্বের অনুভব কর, দেহকে ঠাকুর বানিও না। সিদ্ধাই দেখিয়ে তোমাদের ঘাড়ে একটা বিশেষ ব্যক্তিত্বের বোঝা চাপিয়ে তোমাদের পরাধীন করতে তো রাম চান না। আগের নবীদের মত রাম তোমাদের স্বাধীনতা হরণ করে তাঁর দাস বানাতে চান না।

তোমরা চাও, এই দেহ দিয়ে সিদ্ধাই দেখাই, কিন্তু এই দেহ তো আমি নই। যে ব্রহ্ম এই জগৎরূপী সিদ্ধাই সবার সামনে মেলেই রয়েছেন. আমি সেই ব্রহ্ম।—সোঽহম্! এই জগৎটাই আমার সিদ্ধাই—যার কারুকার্য্য এই জগৎ, আমি সেই।

ভারতবর্ষে এই দেহটা (নিজকে দেখিয়ে) যেখানে ছিল, সেখানে একটা ছোক্‌রা ছিল বাড়ীর চাকর। ছোক্‌রাটা রামের কাছে সর্ব্বদা থাকতে থাকতে রামের ছোঁয়াচ পেয়ে গিয়েছিল। একদিন সে ঘরের ছাদে উঠে চীৎকার করে বল্‌তে লাগ্‌ল—"সোঽহম্—অহং ব্রহ্মাস্মি।" পাশের বাড়ীর লোকেরা তাকে বল্‌ল, "কি আবোল-তাবোল বলছিস্ ছোক্‌রা? তুইও ব্রহ্ম হলি নাকি? ব্রহ্ম হলি তো ছাদের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়্ না দেখি, গায়ে লাগে কি না। যদি চোট না পাস তো বুঝব, তুই ব্রহ্ম; আর যদি চোট পাস, দেখবি মজা, তোকে খুনই করে ফেলব তাহলে। যত সব বাজে বকুনী! ওতে পাপ হয় জানিস্? তুই ব্রহ্ম কব্‌লাবার কে রে?

ছেলেটার তখন ভাবোন্মাদ এসে গেছে; সে বল্‌তে লাগল, "হে আত্মস্বরূপ, আমি এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজী আছে। অতলগহ্বরে, মহাসমুদ্রের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে বল তো আমি রাজী; কিন্তু তার আগে আমায় দেখিয়ে দাও, কোথায় আমি নাই। কেননা, কোথাও ঝাঁপিয়ে পড়তে হলে, যেখানে আমি আগে ছিলাম না সেখানে তো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তাই এমন একটা জায়গা আমায় দেখাও যেখানে আমি নাই। আমি সর্ব্বময়; কোথায় আমি নাই, দেখিয়ে দাও—এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়ছি। যে সর্ব্বব্যাপী হয়ে ছড়িয়ে আছে সব ঠাঁই, সে কি করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে? যে সান্ত, এখানে আছে তো ওখানে নাই, সেই তো ঝাঁপাতে পারে!"

প্রতিবেশী বল্‌ল, "তুমি সেই ব্রহ্ম নাকি গো? তুমি তো দেহ।" ছেলেটা জবাব করল, "এই দেহ তো তোমাদের কল্পনা মাত্র—আমি তো দেহ নই। তোমার সওয়াল-জবাব তো আমার কাছে পৌছুতে পারে না—ওসব তোমারই কল্পনা

শুধু। যে সর্ব্বব্যাপী, তার গতি কি করে সম্ভব? এমন স্থান নাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, যেখানে সে নাই। আমিও সেই সত্যস্বরূপ। আমি যদি এই দেহেই আবদ্ধ থেকে থাকি, তোমার দেহেও যদি আমার অধিষ্ঠান না হয়ে থাকে তো আমার ব্রহ্মত্বের দাবী পূর্ণ করবার জন্য এই দেহের আশ্রয়ে অঘটন ঘটাবার দায় আমার থাকতে পারে। সব দেহই আমার; তারা আমার জন্য তৈরী হয়েই আছে। আমার শুধু অধিষ্ঠান হলেই হল—আর কিছুই করতে হবে না নূতন করে, সব করেই রেখেছি।"

আর একজন জিজ্ঞাসা করল, "বেদ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? বেদকে কি মনে করেন?" রাম জবাব করলেন, "বেদকে আমরা ধাতুবিদ্যার মত দেখি।" "আপনি বেদ বিশ্বাস করেন?" রাম জবাব করলেন, "আমি বেদ জানি, তোমায় তা অধিগত করতে বলি।" "আমরা বাইবেলকে যে চোখে দেখি, বেদকেও কি সেই চোখে দেখব?" "বাইবেলের তো তোমরা দফা সারা করেছ। বেদকে সেই চোখে দেখো না; জ্যোতিষ শাস্ত্রের বা ধাতুবিদ্যার একখানা বই যে নজরে দেখ, বেদকেও সেই নজরে দেখবে। অন্ধের মত সব বিশ্বাস করে বসো না—যেমন কোনও কোনও হিন্দু করে থাকে। ধাতুবিদ্যার একখানা বই যখন পড়তে যাও, তখন এটা লাভোসিয়ে বা লিবিগের রচা শাস্ত্র বলে কি সব বেমালুম বিশ্বাস করে যাও? কেউ বললেই কি তা মানতে হবে? লোকের মুখে শুনে যে বিশ্বাস জন্মায়, তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না কিন্তু। তুমি নিজে পরীক্ষা করে দেখবে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করে দেখবে, বৈজ্ঞানিকের মত বিচার করবে; স্বাধীনতা বেচোনা—নিজকে নির্ম্মুক্ত রাখবে! এই ভাবে যদি বেদ পড় তো তার ভাব ধরতে পারবে, না হলে সব ফস্‌কে যাবে। বেদের শিক্ষা কোনও সংশয় বা সমালোচনার তোয়াক্কা রাখে না। তোমাদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এসে তাকে জেরা করুক না কেন। পশ্চিমের আলোক আসুক না তার রশ্মিমালার চমক নিয়ে, (যদিও কিনা আলো আসে পূব থেকে, সে কথাটা মনে রেখো—না হয় এই আলো পাশ্চমের আলোই হল) বরাননা শ্রুতিকে উদ্ভাসিত করে তুলুক, কোথাও এতটুকু কলঙ্কের দাগ দেখতে পাবে না কিন্তু। বেদের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ নাই; তোমাদের এই যুগের আবিষ্কার আর উদ্ভাবন দিয়ে কেবল শ্রুতি-রাণীরই পাদপ্রক্ষালন করেছ। এতে বেদান্তের সত্যই দিন দিন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে।

সংস্কার-মুক্ত চিত্তে যে কেউ বেদ পড়েছে, সেই বেদের জয়গান না করে পারেনি। শোপেনহাউর কখনও কোনও দর্শনের প্রশংসা করেন নি; নিজের দর্শনটী ছাড়া আর সব দর্শনের উপর গালি-গালাজ বর্ষণ করেছেন শুধু। কিন্তু সেই শোপেনহাউরই বেদ সম্বন্ধে বলেছেন, "জগতে উপনিষদের মত চিত্তের উন্নায়ক ও উপকারী গ্রন্থ আর নেই; উপনিষদ জীবনে আমায় স্বস্তি দিয়েছে, মরণেও স্বস্তি দেবে।"

মোক্ষমূলর শোপেনহাউরের এই উক্তির উপর টিপ্পনী করেছেন, "স্বাধীনচেতা দার্শনিকের মতবাদকে সমর্থন করবার যদি প্রয়োজন থাকে তো সমস্ত জীবন ব্যাপে আমি যে জগতের সমুস্ত ধর্ম্ম অধ্যয়ন করেছি, ইউরোপের সমস্ত দর্শন পড়েছি, সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে শোপেনহাউরের উক্তিকে সমর্থন করছি। দর্শন অধ্যয়ন যদি মৃত্যুর সুখময় ভূমিকা রচনার জন্যই প্রয়োজন হয়, তাহলে উপনিষদের চেয়ে এ বিষয়ে কোনও শ্রেষ্ঠতর দর্শন আছে কিনা জানি না।"

আর একজন এসে বল্‌লে, "আপনার বেদান্ত তো কেবল ভারতবর্ষের চতুঃসীমানাতেই আবদ্ধ।"

এ সব বিষয়ের আলোচনায় গুরুত্বও যেমন, আমোদও তেমনি। বলা হয়, খৃষ্টধর্ম্ম আজ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে, অথচ বেদান্ত শুধু ভারতবর্ষের চতুঃসীমানাতেই আবদ্ধ—তাও আবার শিক্ষিত সমাজেই তার প্রচার, সাধারণ লোকের মধ্যে নয়। রাম বলেন, যদি বাস্তবিকই খৃষ্টধর্ম্ম ইউরোপে আজ প্রচারিত থাকৃত, তাহলে তা কল্যাণের কারণ হত—রাম তাতে খুবই খুসী হতেন। কিন্তু ইউরোপ বা আমেরিকায় তো খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত নয়, প্রচলিত হচ্ছে চার্চ্চের ধর্ম্ম। ও ধর্ম্ম ক্রিশ্চিয়ানিটী নয়, চার্চ্চিয়ানিটী।

আর যদি তোমার বাস্তবিকই এই ধারণা হয়ে থাকে যে যথার্থ ক্রিশ্চিয়ানিটীই জনসাধারণের মাঝে প্রসার লাভ করেছে এবং এটাই তোমার তর্কের অনুকূল প্রমাণ, তাহলেও বলি, ভায়া, অমন করে ভুল পথ মাড়িও না। খৃষ্টের ধর্ম্মের চেয়ে সয়তানের ধর্ম্মের গ্রাহক বেশী। পাপাচার, কু-বাসনা, শত্রুতা, ঘৃণা, অসংযম, ইন্দ্রিয়পরতা—এইগুলিই তো সয়তানের ধর্ম্ম? তা ক্রিশ্চিয়ানীটীর চেয়ে সয়তানীর প্রভাব নিশ্চয়ই বেশী।

পার্লামেণ্টে একজন বড় বক্তাকে একবার সবাই "দুয়ো—দুয়ো" করেছিল। তিনি কি বলেছিলেন জান? বলেছিলেন, "মাথা-গুণ্‌তিতে তোমাদের দলে বেশী লোক আছে তো কি হয়েছে? মতের ওজন দেখ্‌তে হবে, মাথা-গুণ্‌তিতে কি আসে-যায়?" বেশী লোক এক দলে থাকলেই সেটা সত্য—এমন কোনও কথা নাই।

এক সময় গ্যালিলিও কোপার্নিকাসের মত সমর্থন করে বলেছিলেন, পৃথিবীই ঘুরছে, সূর্য্য নয়। তাঁর দলে তিনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। সমস্ত জগৎ ছিল তাঁর বিপক্ষে। আর এখন? মাথা-গুণ্‌তিতে কম-বেশী হওয়াতে কি আসে-যায়? এক সময় রোমান্ ক্যাথলিকদের দলে ছিল সবাই; আবার এক সময় সবাই তাদের বিপক্ষ দলে গিয়ে ভিড়্‌ল। একসময় ক্রিশ্চিয়ানিটী ছিল মোটে খৃষ্টের এগার জন শিষ্যের মধ্যে আবদ্ধ। আবার এক সময় মনে হল, ক্রিশ্চিয়ানিটী ওরফে চার্চ্চিয়ানিটীর দলে সবাই। তাই বল্‌ছিলাম, মাথা-গুণ্‌তিতে বেশী-কম হলে কিছুই আসে-যায় না। আমরা দাঁড়াব অটল ভূমিতে, আমরা দাঁড়াব সত্যের ওপর; সত্য স্বতঃই প্রকাশ হবে।

আর একজন বল্‌ল, "আচ্ছা দেখুন তো, ক্রিশ্চিয়ান জাতিগুলিই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত কেন? একমাত্র তারাই তো উন্নতি আর সভ্যতার পাণ্ডা দেখ্‌তে পাচ্ছি।" রাম বলেন, "ভায়া, রাজনীতিতে আর সমাজনীতিতে আজ যদি ভারতবর্ষ-চীন-জাপানের চেয়ে ইউরোপ বেশী অগ্রগামী হয়ে থাকে, সে তো ক্রিশ্চিয়ানিটীর কোনও গুণ নয়। মিথ্যা তর্ক করো না ভাই। জগতের যত বৈজ্ঞানিক উন্নতি আর সভ্যতার নিদান যদি ক্রিশ্চিয়ানীটীই হবে, তা হলে গালিলিও যখন ওই আবিষ্কারটুকু করেছিলেন, তখন ক্রিশ্চানেরা তাঁর প্রতি কি ব্যবহারটা করেছিল? ক্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল! কে তাঁকে মেরেছিল?—ক্রিশ্চিয়ানিটী, ক্রিশ্চিয়ানিটী! হাক্সলী, স্পেন্সার, ডারুইনের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল ক্রিশ্চিয়ানিটী! তাঁদের আবিষ্ক্রিয়া, জ্ঞানের বিস্তার বা মতবাদের স্বাধীনতাকে ক্রিশ্চিয়ানিটী কোনও কালেই আমল দেয়নি; ক্রিশ্চিয়ানিটী তাঁদের পিষে ফেল্‌তে চেয়েছে, তবু তাঁরা মাথা উঁচু করে আছেন। শোপেনহাউরের কি দশা হয়েছিল?—তিনি কি করে বেঁচেছিলেন জান কি? তাঁকে খৃষ্টের মতই আত্মবলিদান করতে হয়েছিল। খৃষ্ট তাঁর মতের দরুণ মরেছিলেন আর শোপেনহাউর তাঁর মতের দরুণ বেঁচেছিলেন। বুঝ্‌তেই পার, মতের দরুণ মরার চেয়ে বাঁচা বড়। শোপেনহাউরের স্বাধীন চিন্তাকে

আহত করেছিল কিসে? তাঁর প্রথম জীবনের লেখাতে যে জোর ছিল, শেষকালে সে জোর আর ছিল না। হেগেল আর কাণ্টের দর্শনে যে দুর্ব্বলতা ছিল, তারও মূলে ক্রিশ্চিয়ানিটী। ফিক্টেকে কেন অধ্যাপকের পদ ছেড়ে দেশ হতে নির্ব্বাসিত হতে হয়েছিল, তা জান?—এই ক্রিশ্চিয়ানিটীর দরুণ। গোড়া হতেই যা কিছু উন্নতি ইউরোপের হয়েছে, তা ক্রিশ্চিয়ানিটীর আনুকূল্যে নয়, তার সঙ্গে লড়াই করে। ভুল বিচার করো না ভায়া।

একজন এংলোইণ্ডিয়ান কিছুদিন ভারতবর্ষে থেকে ইংলণ্ডে ফিরে তার স্ত্রীর কাছে তার সাহস আর শক্তির বড়াই কর্‌ছিল। তারা ছিল দেশের বাড়ীতে। একদিন হঠাৎ একটা ভালুক এসে হাজির। ভালুককে দেখেই স্বামীপুঙ্গব একটা গাছে চড়ে বস্‌লেন। স্ত্রী একটা বন্দুক নিয়ে ভালুকটা গুলি করে মেরে ফেলাতে তখন তিনি নেমে এলেন। লোকে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, ভালুকটা মার্‌ল কে? স্বামী বল্‌লে. আমি আর আমার স্ত্রী দুজনে মেরেছি। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। কাজেই একটা কিছু হলে সেটা আমার গুণে হয়েছে বা ক্রিশ্চিয়ানিটীর দৌলতে হয়েছে বলা তো ঠিক নয়।

ইউরোপ আর আমেরিকায় দর্শন আর বিজ্ঞানে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, সবই হয়েছে বেদান্তের ভাবকে কার্য্যে পরিণত করার দরুণ। বেদান্ত অর্থে মুক্তি—স্বাধীনতা। যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তার মূলে আছে চিত্তের স্বাধীনতা, দেহাত্মবোধের বিসর্জ্জন। এর দরুণ ইউরোপের উন্নতি হয়েছে—আর এ হচ্ছে অজ্ঞাতসারে বেদান্তেরই অনুশীলন। তোমরা একে যথার্থ ক্রিশ্চিয়ানিটীও বল্‌তে পার। সত্যিকার ক্রিশ্চিয়ানিটী বেদান্ত হতে পৃথক্ নয়—যদি বুঝ্‌তে পেরে থাক। বলা হয়, আমরা পৃথিবী হতে দাসত্ব-প্রথা দূর করে দিয়েছি, কত সংস্কার করেছি। রাম বলেন, হাঁ ভাই, দাসত্ব দূর করা হয়েছে বটে; যদি সত্যিসত্যিই সবরকম দাসত্ব তোমরা দূর কর্‌তে পার্‌তে! যদি এ কথা মেনেও নিই, তবুও ক্রিশ্চিয়ানিটীর দরুণ তা হয়েছে বল্‌তে পারি না। ক্রিশ্চিয়ানীটীই যদি দাসত্বপ্রথা দূর করে থাকে, তাহলে এই ১৭০০ বচ্ছর ধরে সে তা করেনি কেন? তাহলে ক্রিশ্চিয়ানিটী ছাড়া এর মাঝে আরও কিছু ছিল। ইউরোপের লোক আমেরিকায় আস্‌ছিল; এ দেশ সে দেশ ঘুরে ফির্‌ছিল; অপরাপর জাতির সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছিল; তার ফলে তাদের চিত্ত শিক্ষিত, উদার হচ্ছিল। এই তো হচ্ছে বাস্তব বেদান্ত। এতেই দাসত্ব দূর করেছে, ক্রিশ্চিয়ানিটীতে নয়। সমাজ এবং রাষ্ট্রের বিপ্লবে মানুষের চিত্তকে উদ্বেলিত করেছে বলে এ সব হয়েছে। যদি বল, যত কিছু ভাল সব হয়েছে ক্রিশ্চিয়ানিটীর কল্যাণে—তাহলে ইনকুইজিশন, ডাইনী পোড়ান, গিলোটীন—আর জানই তো ইন্‌কুইজিশন্ ব্যাপারটা কি—এক সময় সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে তার একাধিপত্য ছিল—মানুষের বুক চিরে রক্ত নেওয়া—উঃ, কি ভীষণ, কি ভয়ানক—ও সব কথা আর বল্‌তে পারা যায় না—তা হলে এ সবগুলো হত কার কল্যাণে?

(সমাপ্য)

হিন্দু-সঙ্গীত

—❋—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শাশ্বত বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বলেন, এই নাদবিদ্যার উপাসনার দ্বারাই শেষে সেই অনাহত নাদরূপীর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হতে পারে এবং সেই অপার আনন্দ-পারাবারে ডুবে নিত্যানন্দরস আস্বাদন করতে করতে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যেতে পারে। "সকলকলোপাখ্যকুলঃ সংখ্যাবন্নাথমেঙ্গনাথজনেঃ মৃদ্গানস্বরেস্তনুজঃ" সুধী সোমদেব তাঁর সুবিখ্যাত রাগবিবোধ গ্রন্থে বলেছেন—

পুরুষার্থসার্থসিদ্ধ্যৈ সিবেবয়িষুরপি বিরিঞ্চিহরিগিরিশান্।
নদেমুপাসীত সুধীর্যদি মে গদিতান্তদাস্মানঃ॥

অর্থাৎ সুধীজন যদি পুরুষার্থসমূহ সিদ্ধ্যর্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশের সেবা করতে অভিলাষ করেন, তবে নাদকেই উপাসনা করবেন। কারণ দেবগণ ঐ নাদাত্মক বলেই সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত। বস্তুতঃ ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদিতেও বলা হয়েছে—

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবং॥
নাদরূপং পরজ্যোতির্নাদরূপঃ স্বয়ং হরিঃ॥

শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন—

শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতে বিষ্ণোরংশা মহাত্মনঃ।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্মৃতিশাস্ত্রে লিখে গিয়েছেন যে সঙ্গীত-সাধক "অপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গঞ্চ গচ্ছতি।" আবার এই অপার সঙ্গীতশাস্ত্রের অন্যত্র দেখতে পাওয়া যায় যে—

গীতেন প্রীয়তে দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পার্ব্বতীপতিঃ।
গোপীপতিরনন্তোঽপি বংশীধ্বনিবশং গতঃ॥

আবার দেখুন—

অজ্ঞাতবিষয়াস্বাদো বালঃ পর্য্যঙ্কিকাগতঃ।
রুদন্ গীতামৃতং পীত্বা হর্ষোৎকর্ষং প্রপদ্যতে॥
বনেচরস্তৃণাহারশ্চিত্রো মৃগশিশুঃ পশুঃ।
লুব্ধো লুব্ধকসঙ্গীতে গীতে ত্যজতি জীবিতং॥

—অজ্ঞাতবিষয়াস্বাদ শিশু সঙ্গীতশ্রবণে রোদন পরিত্যাগ করে প্রফুল্ল হয়। ক্রূর-সর্প বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে অহিতুণ্ডিকের নিকট ধরা দেয়। মৃগগণ ব্যাধের সঙ্গীতলোভে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে।—সঙ্গীত এমনই মহামহিমময়! আর সঙ্গীতের শক্তি? আপনারা জানেন যে এই সঙ্গীতের সাহায্যেই দেবাদিদেব মহাদেবদ্বারা বৈকুণ্ঠপতিকেও গলিয়ে দ্রবময়ী পতিতপাবনী সুরধনীর উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। নৃত্যগীতের দ্বারাই দেবাদিদেবের মনোরঞ্জন করে আমাদের বাংলার বেহুলাও মরা-পতিকে বাঁচিয়ে ধন্যা-সতীশিরোমণিগণের মধ্যে গণ্যা হয়েছিলেন। প্রেমিকা মীরাবাঈ, হিন্দী কাব্যজগতের সূরসদৃশ সুরদাস, ভক্তকবি তুলসীদাস, বাংলার সহজিয়া সাধক চণ্ডীদাস প্রভৃতি অনেক মহাজনই সঙ্গীত সাহায্যে প্রেমময়ের উপাসনা করে পূর্ণকাম হয়েছিলেন। আর মাতৃভক্ত সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত "মা—মা" বলে মালসীগান করেই যে মায়ের কোলে স্থান পেয়েছিলেন, মা যে তাঁর গান শুনবার জন্য ছদ্মবেশে এসে তাঁর বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন, এ তো বড় বেশীদিনের কথা নয়? ভগবৎপ্রেমিক সুফী সম্প্রদায়ও সঙ্গীতের দ্বারা ভগবানের উপাসনা করে কৃতার্থ হয়েছিলেন।

তথাকথিত প্রত্যক্ষবাদী পশ্চিমদেশবাসীর সাক্ষ্য যাঁদের নিকট মূল্যবান্, তাঁরাও দেখবেন—গ্রীক্-পুরাণে কথিত আছে যে অর্ফিয়াসের পত্নী মৃত্যুরাজ প্লুটো কর্ত্তৃক অপহৃত হলে অর্ফিয়াস সঙ্গীতের দ্বারাই মৃত্যুর অধিপতিকে তুষ্ট করে তাঁর

প্রিয়াকে ফিরিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের সূক্ষ্মদর্শী কবি এবং মনীষিগণও সঙ্গীতের জয়গান করতে কুণ্ঠিত হন নাই। মহাকবি মিলটন ধর্ম্মমন্দিরের সঙ্গীতের মধ্যে অনুভব করেছিলেন যে—

Dissolve me into ecstacies,
And bring all heaven before mine eyes.

সুকবি William Congreve বলেছেন—

Music hath charms to soothe the savage beast
To soften rocks or bend a knotted oak.

মানবহৃদয়রহস্যবিৎ শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য কবি সেক্স্‌পীয়র আবার সঙ্গীতের এমন ভক্ত ছিলেন যে, The man that has no music in himself, তাকে তিনি সর্ব্বপ্রকার দোষের আকর বলে বর্ণনা করে শেষে বলেছেন যে Let no such man be trusted. আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে সঙ্গীতের উপযুক্ত প্রয়োগে ব্যাধি ধ্বংসের বিষয় উল্লিখিত আছে। আমি নিজেই তাহা প্রত্যক্ষ করেছি।

যে আর্য্যসঙ্গীতের এমন মহিমা, এত শক্তি যে জগৎপতি থেকে বনবিহারী পশু পর্য্যন্ত তার বশ, সেই সঙ্গীতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় কি দুঃখ হয় না?

অনেকে বল্‌তে পারেন, "দেশের দুর্দ্দিন ও জাতির এই দুরবস্থার মধ্যে গানের দিকে মন দিবার অবসর কোথায়?" কিন্তু আমার সসম্ভ্রম জিজ্ঞাসা এই যে, যে সঙ্গীত আমাদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে সর্ব্বতোভাবেই প্রধান অবলম্বন, আমাদের জাতির বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতিকল্পে তার কি কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই? আমি বলি আছে। আমাদের জাতিকে অধঃপতন থেকে রক্ষা করে উন্নত করবার ব্যাপারে এই সঙ্গীতের প্রধান প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে যে এত বিবাদ, বৈষম্য ও দলাদলি—সেগুলির নিবারণকল্পে সঙ্গীতের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। সঙ্গীতের মহামিলনক্ষেত্রে আচণ্ডাল সমস্ত জাতিই এক সমতালে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে ভাই বলে জেনে সকলের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চল্‌তে পারে। তাইতো প্রেমের ঠাকুর ন'দের গোরাচাঁদের পক্ষে হরিসংকীর্ত্তনের সাহায্যে সর্ব্বজাতি সমন্বয়পূর্ব্বক "শান্তিপুর ডুবু-ডুবু" করে দিয়ে ন'দে ভাসিয়ে প্রায় সমস্ত ভারতময় প্রেমের বন্যা বহান সম্ভব হয়েছিল। পাশ্চাত্যের মহামতি Mr Halvey বলেন,—

Music is an art, that God has given us, in which the voices of all nations may unite their prayers in one harmonious rhyme.

এ অধমও হয়ত সময় ও সুযোগ পেলে দৃষ্টান্তের সাহায্য আপনাদের দেখিয়ে দিতে পারত যে,—সঙ্গীত আমাদের সমাজসমস্যা সমাধানকল্পেও অনেকটা সাহায্য করতে পারে, বিশেষতঃ সে গীত যদি সর্ব্ব-শক্তিমান্ শ্রীভগবানের নাম সংযুক্ত হয়।

ভারতবর্ষ এককালে এমন উন্নত ছিল যে, সেকালের কথা স্মরণ করে ভারতবর্ষকে সমগ্র প্রাচ্যদেশের গৌরব বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। এই ভারতীয় সঙ্গীতের গৌরব সম্বন্ধে আমি আপনাদের এই একটী কথাই নিবেদন করতে চাই যে—এই সঙ্গীত আজ অধঃপতিত হলেও পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশের সঙ্গীত অপেক্ষা বহু উচ্চেই অবস্থিত আছে। অন্যান্য দেশে ভারতীয় সঙ্গীতকলা প্রদর্শন করে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করতে এই সঙ্গীতের অপরিণত সাধকও যে সমর্থ, এ দৃষ্টান্ত আজও বিরল নয়। ভারতবাসী আর্য্যগণের 'হিন্দু' নামের সম্বন্ধে কোন কোন মনীষীর মত এই যে, হিব্রুভাষায় 'হুন্দ্‌' শব্দ থেকেই এ নামের উৎপত্তি। শুনেছি হিব্রু-

ভাষায় 'হন্দ্' শব্দের অর্থ,—বিক্রম, তেজঃ, শক্তি, গৌরব ইত্যাদি এবং তাঁরা ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত দেশ বলে জেনেই তাকে এ নামে অভিহিত করেছিলেন। এদেশে সে শক্তি ও গৌরবের দেখা পাওয়া যায় কি, যা আমাদের জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী বলে প্রমাণিত করেছিল? আজ-কাল আমাদের জীবনে যেন কেবল পেলবতার সাধনই দেখা যাচ্ছে। সেইজন্যই বোধ হয় বন্ধনীমধ্যে পুং-পরিচয় ধারণ করে সাহিত্য-ক্ষেত্রে লালিমা পালের আবির্ভাব, এবং পথে-ঘাটে যেরূপ দেখা যায় তাতে আশঙ্কা হয় যে, অচিরভবিষ্যতে বাস্তব-জীবনেও আমরা ঐ প্রকার পুরুষের দর্শনই বেশী লাভ করব। কিন্তু আপনারা সকলেই বোধ হয় একবাক্যে স্বীকার করবেন যে এখন আমাদের বীর্য্যের, পৌরুষের এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধনা প্রয়োজন। তাই বুঝি দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন "আবার তোরা মানুষ হ।" কাব্য-জগতের রবি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বড় দুঃখে বলেছিলেন—

সাতকোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননি,
রেখেছ বাঙ্গালী ক'রে—মানুষ করনি।

এই শৌর্য্য, বীর্য্য ও মনুষ্যত্বের জাগরণের জন্যই মহাশক্তিমান ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রয়োজন। সঙ্গীত সাধনায় যে সরলতা, নির্ভীকতা ও ঔদার্য্য লাভ হয়,—একথা শুধু আমার নয়, বহু মহাজনই একথা বলেছেন। তাই নির্ব্বন্ধ সহকারে আপনাদের বলি,—জাগুহি।

অতীতকালের কাহিনী আমাদের ব'লে দেয় যে, সঙ্গীত সাধনায় বাঙ্গালী কখনও পশ্চাতে পড়ে থাকে নি। পক্ষান্তরে "কীর্ত্তন গান" ভারতীয় সঙ্গীতে বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট দান। শোনা যায় যে আকবর সাহেবের সময় বঙ্গদেশের অবস্থা অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁর একজন কর্ম্মচারী বলেছেন যে,—

সাজা, বাজা, কেশ, তিনে বাংলামে বেশ।

দেখুন সেদিনেও বাঙ্গালী বাদনবিদ্যায় কতখানি উন্নত ছিল!

আমাদের বগুড়ার সঙ্গীত-সাধনার কোনও ক্রমবদ্ধ ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই। কিন্তু কালের অন্ধকার-গর্ভ থেকে অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বগুড়ার ইতিহাসের যে সামান্য অংশ উদ্ধার করেছেন—তার মধ্যেই পাওয়া গেছে যে এই বগুড়ারই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ জয়ন্তের রাজত্বকালে স্কন্দদেবের মন্দিরের দেব-দাসী কমলার নৃত্য-গীতপটুত্বে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের রাজা মহাশূর জয়াদিত্যও মোহিত হয়েছিলেন। তারপর যোগীকাচ ইত্যাদি গানের বিষয় লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি যে, সঙ্গীত সাহায্যেই যখন একটা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হত, তখন সঙ্গীত তাদের অবশ্যই অতি প্রিয় ছিল। এই সামান্য নিদর্শনেও আমরা এ জেলার সঙ্গীতের প্রভাবের একটা ধারণায় উপনীত হতে পারি যা আমাদের গৌরবেরই কারণ ছিল। কিন্তু এখন এ জেলায় সঙ্গীতের অবস্থা কিরূপ তা আপনারা জানেন। এই ক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে নিবেদন করে রাখি যে, আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্য পেলে হয়ত এই ক্ষুদ্র বগুড়াও সঙ্গীত-সাধনার গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। আপনারা দেশের হিতকর ও গৌরববর্দ্ধক বহু সৎকর্ম্মই করেছেন,—এই লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতের উদ্ধারকল্পে অগ্রণী হয়ে আপনারা অবনত ভারতের দৈন্য দুঃখ ও অধোগতি নাশের জন্য পুরোহিতের কার্য্য গ্রহণ করুন। ব্রহ্মচর্য্য, নিষ্ঠা, দৃঢ়সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় সাহচর্য্যে সঙ্গীতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে এদেশের প্রাণের উদ্বোধন করুন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলেছেন,—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

কিন্তু আজ এদেশে ভগবদ্ভক্তিমূলক সঙ্গীতের বিলোপ হবার লক্ষণই সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। তাই বুঝি ভগবানও দূর হয়ে পড়েছেন। আমরা যে ত্রাণকারিণী গায়ত্রীকেও ভুল্‌তে বসেছি। এই মরণের মাঝে কোন্ ভগীরথ আবার সঙ্গীতের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করে আমাদের মৃত-প্রাণ সঞ্জীবিত করে তুলবেন? সেদিন কি আসবে? আপনাদের নিকট কি এসম্বন্ধে কোনও আশা কর্‌তে পারি? আশা কর্‌তে পারি আর না পারি, শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি,—হে বাঞ্ছাকল্পতরু, আমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ কর। আমরা যেন মরণ জয় করতে পারি; আবার যেন আমরা অমৃতের অধিকারী হয়ে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলে সমস্ত বিশ্ববাসীকে আহ্বান করে সত্যসত্যই অমৃত বিতরণ করতে পারি। দেশহিতকারী মহাসুরিগণের কণ্ঠকম্বুর নির্ঘোষ ছাপিয়ে আমার এই ক্ষীণকণ্ঠা বীণার ধ্বনি যে সহজে দেশবাসীর কর্ণে পৌছতে পারবে না, তা জানি। কিন্তু অগণ্য কপিসৈন্যগণের মধ্যেও সেতুবন্ধনহেতু বালুকাকণা আনয়নকারী কাষ্ঠ-বিড়ালেরও একটু স্থান ছিল,—তার সামান্য কাজেরও সার্থকতা ছিল, এই ভরসা ও সান্ত্বনা পেয়েছি বলেই আমার এই প্রচেষ্টা।

বন্ধুগণ, আমার মত অকিঞ্চনের এত কথাও যে আপনারা ধীরভাবে শুন্‌বেন, এ আশা আমি করতে পারিনি। কিন্তু দেখছি, আপনাদের অন্তরে আমার প্রতি যে স্নেহ আছে, তাই বিজয়ী হয়েছে। এই স্নেহবশেই আপনারা আমার কথা ধীরতা সহকারে শুনেছেন, শুষ্ক ধন্যবাদ দিয়ে এ স্নেহের অপমান করবার মত দুর্ব্বুদ্ধি আমার নাই। কেবল উপসংহারে এই অনুনয় করি, আমার নিবেদিত বিষয় সম্বন্ধে আপনারা অবহিত হোন্ এবং আশা করি আমার প্রতি আপনাদের এই স্নেহ চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে। আর, ক্রিয়াবসানে শান্তিকর্ম্ম উপলক্ষ্যে, হে গৌরবান্বিত রাজরাজেশ্বর, তোমার চরণে আমার কাতর প্রার্থনা,—

"আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়পদ্মদলে।"

সর্ব্বেভ্যো নমঃ

(সমাপ্ত)

ভক্তিতে সাম্যবাদ

নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদি ভেদঃ—যতস্তদীয়াঃ— তাহাদের মাঝে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন ও ক্রিয়া প্রভৃতির দরুণ কোনও ভেদ নাই, যেহেতু তাহারা সকলেই তাঁহার।

জ্ঞান ও ভক্তি আত্মার চিদানন্দস্বভাব, এই কথা যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে উপরি-উক্ত ঋষিবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে কষ্ট পাইতে হইবে না। স্বরূপ মুক্তি, বিরূপ সংসার। স্বরূপে অভেদ, বিরূপে ভেদ। প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই।

এই বৈচিত্র্যের হেতু কি, তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া মনীষীরা বলিয়াছেন, জীবের কর্ম্মই বৈচিত্র্যের হেতু। জ্ঞানী বলিবেন, অবিদ্যাই বৈচিত্র্যের হেতু। ভক্ত বলিবেন, বৈচিত্র্য তাঁহার লীলা।

যে কথাই মানিয়া লই না কেন, একদিক দিয়া বৈচিত্র্য বজায় রাখিবার জন্য যেমন আমাদের একটা মর্ম্মান্তিক চেষ্টা রহিয়াছে, অপর দিকে তেমনি সমস্ত বিভেদ ঘুচাইয়া একরস সত্তায় ডুবিয়া যাইবার তৃপ্তিও আমাদের নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে। জীব ঘড়ির দোলকের ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে এই দুইটাতেই সাড়া দিতেছে।

যাহারা স্বরূপান্বেষী, তাহারা চায় ভেদ ঘুচাইয়া দিতে। ভক্তও তাহা চান, জ্ঞানীও তাহা চান। উভয়ে দেখেন—দুইটা জগৎ সম্মুখে প্রসারিত; একের মাঝে ভেদ, মূলে দুঃখ; অপরের মাঝে অভেদ, মূলে আনন্দ। দুঃখ আর কাহার পুরুষার্থ হইবে? অতএব সকলেই আনন্দের মাঝে ভেদের রেষারেষি ডুবাইয়া দিতে ব্যাকুল!

ভেদের মূল হেতু কর্ম্ম বা অবিদ্যা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অবান্তর হেতুগুলি কি?—উহারা জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন, ক্রিয়া, গুণ, যশ, অভিমান—আরও কত কি! এক কথায় বলিতে পারি, ইহারা সমস্তই কর্ম্মফল। এই ভেদবীজ অবলম্বন করিয়া জীবের সুখদুঃখের তারতম্য হয়, অবস্থার উঁচুনীচু হয়—এবং তাহাতেই সংসারে অশান্তির কলরব সৃষ্টি হয়।

ইহা স্বভাব, ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু এই স্বভাবের পীড়নে যখন আমার স্বরূপাবাপ্তির পথে বিঘ্ন উপস্থিত করে, তখনই জ্বালা; এই জ্বালা যেন মরণতুল্য—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।"

তাই জ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ—সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবে, ব্রাহ্মণে, গোতে, হস্তীতে, কুক্কুরে, চণ্ডালে সর্ব্বত্র আত্ম-স্বরূপকেই প্রতিফলিত দেখিবে। ভক্তিশাস্ত্রেরও উপদেশ—সর্ব্বজীবে তাঁহারই অধিষ্ঠান জানিয়া সকলকেই নমস্কার করিবে, কাহাকেও লঙ্ঘন করিবে না।

দুয়ের একই কথা—উভয়ত্রই সাম্যবাদ। বহিঃপ্রকৃতিতে সাম্যবাদ নয়, কেননা তাহা অসম্ভব, যেহেতু উহা কর্ম্মপ্রসূত; সাম্য অন্তঃপ্রকৃতিতে। যথার্থ সাম্য অন্তরে—সে সাম্য হয়ত বা মৈত্রীর সাম্য, নতুবা স্বাধীনতার সাম্য; প্রাচ্য পরিভাষায়, হয়ত বা ভক্তির বিকাশ, নতুবা জ্ঞানের স্ফুরণ।

সাম্যের হেতু কি?—জ্ঞানী বলিবেন, যতস্থৎস্বরূপা অতো মৎস্বরূপাঃ—যেহেতু সমস্তই তাঁহার স্বরূপ অতএব আমারই স্বরূপ; ভক্ত বলিবেন, যতস্তদীয়া অতো মদীয়াঃ—যেহেতু সমস্তই তাঁহার আপন জন, অতএব আমারও আপন-জন। ঠিক একই তত্ত্ব দুইটী ভঙ্গীতে প্রকাশ করা হইতেছে না কি?

এই যে অভেদবাদ, ইহার সার্থকতা কি?—উভয়ত্র সার্থকতা আত্মপ্রসাদ, স্বরূপাবাপ্তি। বিরহের বেদনায় এই জগৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটী পরমাণু হইতে আর একটী পরমাণু বিকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তার স্ফুরণে জগতের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক সর্ব্বাবগাহী অনন্ত চেতনার মাঝে সমস্তই সমাহিত রহিয়াও এ উহার বিরহ-বেদনায় গুমরিয়া মরিতেছে—একটী পরমাণু আত্মহারা হইয়া আর একটী পরমাণুর মাঝে মিশিয়া যাইবার জন্য সতত ব্যাকুল। যে ভূমানন্দে সকলে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে আপনার মাঝে অনুভব করিতে পারে নাই বলিয়া অথবা আপনাকে তাহার মাঝে নিমজ্জিত জানিতে পারে নাই বলিয়াই জগৎ জুড়িয়া এই আর্ত্তি—এই বিরহের তপ্তশ্বাস। জ্ঞানের প্রতিষ্ঠায়, ভক্তির তন্ময়তায় এই বিরহের দাবদাহন নিভিয়া যায়—তখন জানি, তিনিই সব বা তাঁরই সব; অথবা আমিই সব বা আমারই সব!

এই পর্য্যন্ত হইল অনুভবের কথা। এই অনুভব ঠিক সাধনও নয়, সিদ্ধিও নয়—পদ্মগুলি যেমন দলে দলে ফুটিয়া উঠে, তেমনি চিত্তও স্তরে স্তরে বিকশিত হইতে থাকে—কলিতে উহা যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত দশায়, তেমনি সুন্দর পূর্ণ-প্রস্ফুটনে। কিন্তু সিদ্ধির চেয়ে সাধন যখন বড় হইয়া উঠে, তখন এই সৌন্দর্য্যের সুষমা পরাভূত করিয়া জাগে দ্বন্দ্ব সংঘাত। এইবার তাহার কথাই বলিব।

কথাটা অধিকারী-বিচার লইয়া। একটা চল্‌তি কথা আছে, জ্ঞানের অধিকার যাচাই করিতে হয়, কর্ম্মের অধিকার যাচাই করিতে হয়, কিন্তু ভক্তিতে আচণ্ডালের অধিকার; অতএব ভক্তিপথই শ্রেষ্ঠ। এই কথাটী সত্য বটে, কিন্তু অর্দ্ধেক সত্য, অতএব মিথ্যার চেয়েও ভয়ানক। এই জন্য ইহার পরখ প্রয়োজন।

অনুভবের যে মূল সূত্র ধরিয়া আমরা শাস্ত্র বুঝি, তাহাতে প্রথমতঃই দেখি, কথাটা অবৈজ্ঞানিক। জ্ঞান এবং ভক্তির যে স্বরূপ আমরা পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে সহজেই প্রমাণ হয়, কি সাধন হিসাবে, কি সিদ্ধি হিসাবে উভয়ের উৎকর্ষা-পকর্ষ বা উঁচুনীচু প্রভেদ কিছু থাকিতেই পারে না। ভক্তি সহজ, এই কথাটা আমরা চট্ করিয়া বুঝিয়া ফেলি; কিন্তু জ্ঞানও যে সহজ হইতে পারে, এ কথাটা বুঝিতে দেরী হয়। পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি, যুগপ্রভাবে এক এক বিভাবের অত্যধিক স্ফুরণই ইহার জন্য দায়ী। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, যোগবিদ্যার কথা। আজ বিশ বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিলাম, যোগের হাজার হাজার উমেদার থাকা সত্ত্বেও রাজ-যোগে প্রাণায়ামের অধিকারী একটীও মিলিল না—হঠযোগের অধিকারী তো দূরের কথা। অথচ যখন মধ্যযুগের মৎস্যেন্দ্র-গোরক্ষনাথের কথা স্মরণ করি, কিম্বা পৌরাণিক যুগের ইতিহাস পাঠ করি, তখন দেখি, যোগবিদ্যা যেন সর্ব্বসাধারণের করামলকবৎ। আজ যাহা কঠিন, একদিন তাহা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ ছিল। তেমনি জ্ঞানের একটা সহজিয়া যুগ গিয়াছে। বৌদ্ধযুগে তাহার চরম পরিণতি—যদিও সেখানে সহজের মাঝে বুদ্ধ-দেবের জীবদ্দশাতেই বিকৃতি সুরু হইয়াছিল। জ্ঞানের যথাযথ সহজ স্ফুরণ দেখিতে পাই ঋষিযুগে। সে যুগের স্মৃতি যাঁহার উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তিনি অনুভব করেন, যে জ্ঞান কৃচ্ছ্রসাধনা-সিদ্ধ বলিয়া যুগে যুগে বিজ্ঞাপিত, তাহা কেমন করিয়া অনায়াস ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইতে পারে।

এই অনুভবের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া বলিতে পারা যায়, জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই তুল্যরূপে সহজ; যাহা কিছু কাঠিন্য, তাহা কর্ম্মের। দৈব-বিপাকে জ্ঞানের সাধনা যদি কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, তাহার অধিকারী বাছাই যদি দুর্ঘট হয়, তবে ভক্তিরও সেই দশা ঘটিতে কিছুমাত্র বাধা নাই—ইহা জ্ঞান-ভক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক বিচারে বলিতে পারা যায়। "জ্ঞানের অধিকারী দুর্ল্লভ"—এই কথা বলিবার সময় জ্ঞানের চরম স্ফুরণকে লক্ষ্য করা হয়; আবার "ভক্তির অধিকারী সর্ব্বত্র সুলভ"—এই কথা বলিলে যে অকৈতব প্রেম-ভক্তিকে লক্ষ্য করা হয়, এ কথা কি কেহ বলিবে? যেখানে এই প্রকার লক্ষ্য অর্থের ভেদ রহিয়াছে, সেখানে বিচার নিরপেক্ষ হইল কি করিয়া বলিব?

বাস্তবিক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বলিতে হয়, জ্ঞান ও ভক্তি যখন আত্মার স্বভাব, তখন উভয়ই সিদ্ধ বস্তু; সিদ্ধ বস্তুকে হৃদয়ে প্রকট করিবার কাঠিন্য বা সাধনা উভয়ের মাঝে তুল্যভাবে বর্ত্তমান। যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী যেমন দুর্ল্লভ, যথার্থ ভক্তির অধিকারীও তেমনি দুর্ল্লভ; সামান্যতঃ জ্ঞান যেমন সকলেরই আছে, সামান্যতঃ ভক্তিও তেমনি সকলেরই রহিয়াছে;

স্বরূপ-জ্ঞান যেমন গুণে আবরিত হইয়া জীবে বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়, স্বরূপ-ভক্তিও তেমনি গুণাচ্ছন্ন হইয়া আসক্তিরূপে ফুটিয়া উঠে। ভক্তি-পথেও সিদ্ধব্যক্তিদের আবির্ভাব যেরূপ জাতি কুলাদির আভিজাত্যের অপেক্ষা রাখে না, জ্ঞানপথে সিদ্ধ-ব্যক্তি-দেরও আবির্ভাবও সেইরূপ আভিজাত্যাদি-নিরপেক্ষ, ইহা ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হইতে পারে। এই সমস্ত বিষয় অপক্ষপাতে বিচার করিলে বুঝিতে পারি, জ্ঞান ও ভক্তিতে বিরোধ-কল্পনা করিয়া উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ কেবল সাম্প্রদায়িকতার পরিচায়ক এবং উহা কাল-মাহাত্ম্য ছাড়া আর কিছুই নহে।

ঋষি-সূত্রে যে ভেদের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহা বিরূপের ভেদ. স্বরূপ-সম্বন্ধে উহা কোনও মতেই প্রযুজ্য হইতে পারে না। কর্ম্মফলে যে এই ভেদ সৃষ্টি হয়, শুধু তাহাই নহে। এই ভেদ ধরিয়া কর্ম্মমূলক সাধনার প্রযোজকাদিও নিরূপিত হইতে পারে এবং এই ক্ষেত্রেই কর্ম্ম-সাধনা হইতে জ্ঞান বা ভক্তির সাধনা উৎকৃষ্ট। সূত্রে যদি উৎকর্ষাপকর্ষের কোনও ইঙ্গিত থাকিয়া থাকে তো তাহা এই দিক দিয়া বুঝিতে হইবে।

কর্ম্ম-সাধনাকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—প্রথমতঃ বৈদিক কর্ম্মসাধনা, দ্বিতীয়তঃ যৌগিক কর্ম্মসাধনা। প্রথমটী কর্ম্মের স্থূল সাধনা, দ্বিতীয়টী সূক্ষ্ম-সাধনা। যৌগিক-সাধনাকেও দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—রাজযোগ এবং হঠযোগ। পূর্ব্বেরটী যোগের সার্ব্বভৌম সূক্ষ্ম পথ, পরেরটী বিশিষ্ট অধিকারীর স্থূল পথ। এই সমস্ত সাধনার মাঝে বৈদিক-কর্ম্ম ও হঠযোগে অতি সাবধান হইয়া অধিকারী নির্ব্বাচন করিতে হয়—যাদৃচ্ছিক নির্ব্বাচন এখানে একেবারেই অচল। যেমন বুদ্ধি খাটাইয়া সংসার চালাইতে বা স্ত্রী-পুত্রকে ভালবাসিতে কাহারও সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় না—এ সমস্ত বিষয়ে জীবের স্বভাব-দত্ত অধিকার থাকে, তেমনি জ্ঞান-ভক্তিতেও আমাদের বিধিদত্ত অধিকার। কিন্তু যেমন নির্ব্বিচারে সকলকেই সৈন্যবিভাগে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া যায় না, যুদ্ধবিদ্যায় একেবারে অনধিকারী লোক থাকাও বিচিত্র নহে, তেমনি বৈদিক কর্ম্মে বা হঠযোগেও নির্ব্বিচারে সকলকে অধিকার দেওয়া চলে না। ইহাদের মধ্যেও আবার কায়িক যোগাদিক্রিয়ার অধিকার অপেক্ষা বৈদিক কর্ম্মের অধিকার আরও সঙ্কুচিত। ঋষিসূত্রে যে সমস্ত ভেদগুলি সূচিত হইয়াছে, বৈদিক কর্ম্মে অধিকার নিরূপণ করিতে তাহার সমস্তগুলিই পরখ করিয়া দেখিতে হয়।

প্রথমতঃ, যেমন জাতি। ত্রৈবর্ণিক ছাড়া আর কাহারও যজ্ঞাদিতে অধিকার নাই। তার-পর বিদ্যা। অধীতবেদ ছাড়া কেহ যজ্ঞাধিকারী হইতে পারে না। রূপও বেদাধিকারের প্রয়োজক; মীমাংসাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি যজ্ঞে অনধিকারী। কতকগুলি বৈদিক অনুষ্ঠান কুলগত, কতকগুলি মন্ত্রের প্রয়োগও তাই। বৈদিক যজ্ঞ-মাত্রই ব্যয়সাধ্য, সুতরাং শুধু ফুলবেলপাতা দিয়া নমোনম করিয়া সারিবার উপায় নাই, উহাদের অনুষ্ঠানে বিত্তসামর্থ্যেরও প্রয়োজন। পুরাণে পাই, যজ্ঞ করিতে রাজারা কুবেরের ভাণ্ডার পর্য্যন্ত হানা দিতেন। যজ্ঞে ক্রিয়ার ভেদ তো সুস্পষ্ট—ইহাও কর্ম্মে অধিকারের প্রয়োজক।

ইহার সমস্ত ভেদগুলি হঠযোগাধিকার নিরূপণের প্রয়োজক না হইলেও উহা মুখ্যতঃ কায়িক যোগ্য-তার উপর নির্ভর করে; সুতরাং উহাও কর্ম্ম-তন্ত্র, সন্দেহ নাই। কেবল রাজযোগে কর্ম্মের অতি উন্নত ও সূক্ষ্মস্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে; এইজন্য উহা জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েরই অঙ্গীভূত।

অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তি যখন সাধ্য, তখন সেই সাধনা শুদ্ধ রাজযোগের সঙ্কেতসমূহের প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নহে।

এইরূপে কর্ম্ম তাহার সাধন-কাঠিন্যে অধিকারী-ভেদ সৃষ্টি করিয়া একদিকে যেমন রুচি ও সামর্থ্যানুযায়ী সকলেরই ইষ্টলাভে সুযোগ করিয়া দিয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ নানা জটিলতা ও আবর্জ্জনাতেও সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতেই বলা হয়, কর্ম্ম অশেষ গুণের নিদান হইলেও কখনও দোষস্পর্শমুক্ত হইতে পারে না। জ্ঞান ও ভক্তি এইখানেই কর্ম্মের চেয়ে বড়। ঋষিসূত্রে যে ভেদের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা কর্ম্মসাধনার অধিকার-নিরূপক ভেদ, ইহাই বুঝিতে হইবে।

শিক্ষা-প্রসঙ্গে

সমগ্রভাবে দেখ্‌তে গেলে মানুষের সম্বিৎ বোধ হয় শিথিল ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন তার মাঝে দেখার উত্তেজনা অবশিষ্ট থাকে না বলেই সেটা যেন কতকটা না দেখারই সামিল বলে মনে হয়। পারিপার্শ্বিকের ঔদার্য্য হতে বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনা যখন রিপোর্টারের কল্যাণে তীক্ষ্ণ ও শাণিত হয়ে দেখা দেয়, তখনই তার আঘাতে মানুষের মন বিস্ময়ে-বেদনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে; অথচ প্রতিদিনকার জীবনে যে এর চেয়ে কত বড় বিস্ময় ও বেদনা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, চেতনাকে অখণ্ডভাবে তার সঙ্গে যুক্ত রাখ্‌তে হয় বলেই মানুষ সে সম্বন্ধে বেশী অচেতন।

শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের খণ্ডবোধের এই দৌরাত্ম্যটা বোধ হয় সব চেয়ে বেশী। শিক্ষা মানেই কোথা-না-কোথা হতে একটা আঘাত পেয়ে তারই অনুপাতে কড়িতে বা কোমলে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠা। আমরা যারা শিক্ষকতার ব্যবসাদারী করি, তারা জানি না যে আমাদের পরামর্শের কোনও অপেক্ষা না রেখেই প্রকৃতি মানুষকে লীলাচ্ছলে অবিশ্রাম অজস্র আঘাত করছে এবং তার অত্যন্ত চড়া সুরে বাঁধা বলেই মানুষ সে সবগুলিতেই বিচিত্রভাবে সাড়া দিচ্ছে। আমরা বীণকার নই—মুগ্ধ শ্রোতার আসনে বস্‌বার অধিকারটুকু মাত্র লাভ করেছি—বড় জোর দু'একটা বহুশ্রুত রাগিণীর একটা বিকল স্বরলিপি কর্‌তে পারি।

এটা আমাদের প্রাণের কথা হলেও হাটের মাঝে এই কথা বিজ্ঞাপিত করে ব্যবসা মাটী কর্‌তে চাই না। ঠকাবার লোলুপতার চেয়ে ঠক্‌বার আগ্রহ যে মানুষের বিন্দুমাত্র কম নয়, তা বেশ জানি। ঠক্‌বার সম্ভাবনা জেনেও মানুষ সংস্কারের বাঁধা-পথ হতে এতটুকু আউট্‌লাইন্ হতে চায় না যখন, তখন তাকে যথাসম্ভব ঠক্‌বার সুবিধা করে দিয়েই দু'চারটা সত্য কথা বল্‌বার চেষ্টা কর্‌তে হয়। এর পর যা বল্‌ব, তার সঙ্গে যদি গোড়ার সাফাইএর কোনও সঙ্গতি না থাকে, তাতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বিস্মিত হবার কোনও কারণ থাক্‌বে না আশা করি।

শিক্ষার মামুলী ধারার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেছিলেন বোধ হয় রুসো। নথের বেষ্টনী ছাড়াও যে নাসিকার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে, এই কথাটা তিনিই প্রথমে জোর করে বোঝাতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁর দর্শনের মাঝে স্বভাববাদের ঝাঁঝটা একটু বেশীমাত্রায় উগ্র ছিল বলেই অনেক সময় মনে হয়, শিক্ষার অছিলায় মানুষের মাঝে মনুষ্যত্বের সাধনের চেয়ে বর্ব্বতার প্রসাধনেই তাঁর বিশেষ রুচি ছিল। রুসোর চেয়ে স্পেন্সার আরো স্পষ্ট হয়ে এলেন—তিনি বললেন, শিক্ষাকে অলঙ্কারবর্জ্জিত করতে হবে বটে, কিন্তু তার একটা ধারা চাই, একটা বিজ্ঞান চাই। অতএব শিক্ষাকে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এই তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যাক্। এ বিভাগ যে অসম্পূর্ণ তা স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। তাই পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা স্পেন্সারের পাদপূরণ করে চলেছেন এবং যদিও শিক্ষা একটা পূর্ণ বিজ্ঞানে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবুও তার জন্য বুধমণ্ডলীর চেষ্টার বিরাম নাই। শিক্ষাবিজ্ঞানের অপূর্ণতার হেতু এই, মানুষের জৈবিক, চৈত্তিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত ইতিহাস যে পর্য্যন্ত আমাদের অধিগত না হচ্ছে, সে পর্য্যন্ত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার আদর্শ আবিষ্কার করা বড় কঠিন।

এই সম্পর্কে ভারতবর্ষের পক্ষ হয়ে দুটো কথা বলবার আছে। মানুষের সম্বন্ধে অপরের অজ্ঞাত অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা আবিষ্কার করেছি. সুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞানের পুষ্টিকল্পে আমাদের অভিজ্ঞতার একটা মূল্য আছে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তত্ত্বকে বাস্তবে পরিণত করবার আর্ট সম্বন্ধে আমরা এত আনাড়ি যে বৌদ্ধ-পাতঞ্জল মনোবিজ্ঞান কণ্ঠস্থ রেখেও শিক্ষা-শিল্পে আমরা এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনও প্রতিভার পরিচয় দিতে পারি নি। আমরা সাতপুরুষের বনিয়াদী দালানে বাস করি বলে গর্ব্ব করছি, কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যে যে তাতে নোনা লেগেছে, অসত্যের শিকড়ে তার দেওয়ালে ফাট ধরেছে, আস্তর খসে পড়েছে, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেবার অবকাশই নাই।

পূর্ণ শিক্ষাবিজ্ঞান গড়ে তোলা যে কতখানি দুরূহ, তার আভাস দিয়েই বৈজ্ঞানিকতার দাবীকে সসম্মানে দূরে ঠেকিয়ে রাখছি। খণ্ডের মাঝে যে পূর্ণের আভাস থাকে, তারই রশ্মিপাতে দু'একটী চিন্তাকে আমরা আলোকিত করে তুলতে পারি মাত্র—নইলে পূর্ণকে প্রকাশ করবার ধৃষ্টতা ও বর্ব্বরতা আমাদের নাই।

ভূষণ ও প্রহরণ বলে প্রকৃতি মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন, অপক্ষপাতে তার সমস্তই উজ্জ্বল ও শাণিত করে তোলা প্রয়োজন—এটা নিশ্চয়ই শিক্ষাবিজ্ঞানের একটা মূলসূত্র। দ্বিতীয় সূত্র এই, শিক্ষার কালের কখনও উদয়াস্ত থাকতে পারে না; মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে শ্বাস-যন্ত্রকে সক্রিয় করবার প্রথম চেষ্টায় শিশু যে কান্না সুরু করেছিল—এটা যেমন প্রকৃতির পাঠশালায় তার বিদ্যারম্ভ, তেমনি শেষের সে দিনে চক্ষুতারাকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে শ্বাস-মোচনের চরম কসরৎটাও হচ্ছে সেই বিদ্যালয়ের অন্তিম পাঠ বটে। কিন্তু প্রমোশনের সম্ভাবনা তাতে তিরোহিত হয়নি; সুতরাং চরমপত্র যে কোন্‌দিন পাওয়া যাবে, সে সম্বন্ধে কোনও স্থিরতা নাই। এই নিরবধি পাঠ্যপঞ্জী ও নিরবধি পাঠকালের মাঝে শুধু দিগ্‌দর্শনস্বরূপ দু'চার কথা বলা ছাড়া তো আমাদের উপায় নাই।

কতকটা স্পেন্সারের অনুসরণ করেই একটা ছক্ করা যাক্—তাতে মোটামুটী একটা ধারণা দেবার সুযোগ হবে।

প্রথমেই কথা হয় দেহ নিয়ে। দেহটা এত

প্রয়োজনীয় সত্ত্বেও তার হিতাহিত সম্বন্ধে আমরা এত অনবহিত যে যুধিষ্ঠির-কথিত পরমাশ্চর্য্যের চেয়েও বোধ হয় এটা বেশী বিস্ময়কর। বাংলার ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে পরীক্ষকেরা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক মন্তব্য পাশ করেছেন; বিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষেরা গেম্, জিম্ন্যাষ্টিক্‌স্ ইত্যাদির প্রবর্ত্তনে মনোযোগী হয়েছেন; কোনও কোনও স্কুলে স্বল্পমূল্যে বিশুদ্ধ খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। এ সমস্তই ভাল বটে, কিন্তু অপচয়ের পরিমাণ এত ভয়াবহ যে তার তুলনায় এই প্রতীকারচেষ্টাটুকু সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর মত। কাজ আরও গোড়া হতে সুরু হওয়া দরকার। গর্ভ-বিজ্ঞান, গর্ভিণী-বিজ্ঞান, প্রসূতি-পরিচর্য্যা, শিশু-পরিচর্য্যা—এইগুলো সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা। ছেলেকে মানুষ হবার সুযোগ দেবার দায় সরকারেরও নয়, ইস্কুল-মাষ্টারেরও নয়, দায় বাপ-মায়ের। কিন্তু শিশুর জন্ম হতে যতদিন পর্য্যন্ত মায়ের আশ্রয় তার পক্ষে অপরিহার্য্য, ততদিন পর্য্যন্ত কয়টা মা তার কল্যাণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ও অভিজ্ঞ? এ বিষয়ে আমাদের মায়েদের বৈজ্ঞানিক-শিক্ষা কতটুকু? বিজ্ঞানের নাম শুনলেই অনেক অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, মনে করেন এই বুঝি আমরা পাশ্চাত্যের দাসত্ব সুরু করলাম; কিন্তু দাসত্ব যদি অশ্রদ্ধেয় হয়, তাহলে অন্ধভাবে প্রাচ্যের দাসত্বও তুল্য-পরিমাণ অশ্রদ্ধেয়। "চিরকাল এই ভাবে চলে আসছে"- এটা স্থবিরত্বের নিদর্শন, প্রাণের যুক্তি নয়; প্রমাণ, প্রস্ফুরৎপ্রাণ কোনও শিশুর জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলকে কোনও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত ওই কথায় দমিয়ে রাখতে পারেন নি। "আগুনে চিরকাল হাত পুড়ে এসেছে", শিশু এই অত্যন্ত সনাতন সত্যকেও যাচাই করে নিতে কুণ্ঠিত হয় না। আর বাস্তবিক, সত্যকে এমনি ভাবে যাচাই করলে তাতে সত্যের কোনও মর্য্যাদা হানি হয় না, তবে যাঁরা সত্যের পাণ্ডা, তাঁদের মর্য্যাদানাশের আশঙ্কা আছে বটে।

দৈহিকচর্চ্চা সম্বন্ধে আর একটা গলদ হচ্ছে এই যে আমরা শুধু দেহকে আরামে রাখবার কৌশলগুলিই যত্নপূর্ব্বক শিখাই, কিন্তু দেহকে ভদ্রভাবে পীড়ন করবার কসরৎগুলি উপেক্ষা করি। সময় সময় দৈহিক চর্চ্চাও একটা ফ্যাসান বা আর্ট হয়ে দাঁড়ায়। আর্টটা হচ্ছে প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত অংশ। যেখানে নিত্যব্যয়ের প্রতুলতা সম্বন্ধেই সন্দেহ, সেখানে বাজে খরচ করবার যৌক্তিকতা কোথায়? এর ওপর বিলাসব্যসন তো আরও ভয়ানক। পঞ্চভূতের সংস্পর্শে এলেই আত্মারাম যেখানে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, সেখানে তাঁর মর্য্যাদা যে খুব বেশী, তা তো কখনও মনে হয় না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানীদের মাঝে দেখেছি, দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ঘণ্টা দুয়েক ধরে তৈল মর্দ্দনো-পলক্ষে চটকিয়ে এক কাঁসী জলের মাঝে রেখে রৌদ্রে শুকুতে দেওয়া হয়েছে; বাংলার পল্লীতেও পূর্ব্বে এমনি ধারা একটা ব্যবস্থা দেখেছি বলে স্মরণ হয়। দেখেছি রৌদ্রে পুড়ে ছেলে-টার রং কটা হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু তার শরীরটা হয়েছে লোহার ভাঁটার মত। দশ-এগার বছর পর্য্যন্ত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের একটী মাত্র কৌপীন বা ঠেঁটীর আচ্ছা-দন বরাদ্দ করে দেখা গিয়েছে, তারা নিউমোনিয়ায় মারা যায়নি। মা-লক্ষ্মীরা ছেলেমেয়েকে খাইয়ে পেট টিপে দেখেন, পেট ভরেছে কিনা; পেটটী উকুন মারবার উপযোগী কাঠিন্য লাভ করলে তবে তাঁরা নিঃসংশয় হন। কিন্তু শিশুকে ক্ষুধা সহ্য করতে শেখানরও যে প্রয়োজন আছে, তা তাঁরা মনে করতে পারেন না। পরিমিত আহারের সঙ্গে মাসে একাদশী-অমাবস্যা-পূর্ণিমা উপলক্ষে দু

চারটা করে উপবাস দেওয়ানোর ফলে দেখা গিয়েছে, পেট-রোগা, ঘা-পুঁজওয়ালা ছেলেও টনটনে হয়ে উঠেছে এবং বছরের পর বছর ধরে সামান্য জ্বর বা মাথাধরাটুকু পর্য্যন্ত তাদের কাছে ঘেঁসেনি।

ব্যায়াম সম্বন্ধে আমরা হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু পাশ্চাত্য মেথড্ও আমদানী হচ্ছে। ইদানীন্তন দেশী কসরতেরও কিছু কিছু প্রচলন হচ্ছে। কিন্তু যোগশাস্ত্রে আসন ও মুদ্রার উপদেশ ব্যপদেশে যে সমস্ত অঙ্গচালনার মহোপকারী বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রয়েছে, তার দিকে আমরা এখনো দৃষ্টি দিইনি। যাঁরা এই সমস্ত ক্রিয়া অভ্যাস করেছেন এবং করিয়েছেন, তাঁরা জানেন, এ সমস্ত ক্রিয়ার কি আশ্চর্য্য এবং অব্যর্থ শক্তি। পাশ্চাত্য ব্যায়াম বিদ্যায় শুধু পেশীর অনুশীলনের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়, শরীরের সমগ্র যান্ত্রিক বিধান বা নাড়ীচক্রের ওপর দৃষ্টি রাখা হয় না। দেহ যে শুধু কতকগুলি পেশীর সমষ্টি নয়, অতি সূক্ষ্ম নাড়ীর যোগে তা যে একটা মনেরও আধার ও নিয়ামক, প্রাচ্য যৌগিকক্রিয়ায় আমরা দেহ সম্বন্ধে এই অখণ্ডদৃষ্টির পরিচয় পাই। এই সমস্ত বিদ্যার বর্ত্তমান বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখিয়ে তাদের পুনঃ প্রবর্ত্তন করাও দরকার। সুখের বিষয়, এ দেশের কেউ কেউ সে চেষ্টাতেও ব্রতী হয়েছেন।

একটা উদাহরণ দিয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শরীরচর্চ্চার প্রণালীর ভেদটুকু দেখিয়ে দিচ্ছি। যৌগিক আসনের একটা মূলনীতি হচ্ছে সমস্ত দেহের স্থৈর্য্য—স্থিরসুখমাসনম্। যোগী বল্ছেন, স্পন্দমেজয়ত্ব যে দেহের ধর্ম্ম অর্থাৎ যে দেহ স্পন্দমান, তাকে স্থির করার আয়াসটা কম নয়। বরং অঙ্গচালনার আয়াসের চেয়ে যে সেটা বেশী, তা যে কেউ পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন। প্রচুর অঙ্গবিক্ষেপে যে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হয়, একটা সুস্থির আসন বা মুদ্রাতেও তাই হতে পারে। অথচ আমার উপরন্তু লাভ এইটুকু, দেহের এই স্থৈর্য্য আমার মনকেও স্থির করে দেবে—যা নাকি মানসিক শ্রান্তি-অপনয়নের এবং মনের স্বাস্থ্যরক্ষার একমাত্র নিদান। এই দৃষ্টান্ত হতে বুঝতে পারি, প্রাচ্য যোগীর দৃষ্টি কেমন সমগ্র ও সম্পূর্ণ। তিনি শুধু পজিটিভ দিক্‌টাই দেখছেন না, গভীরভাবে তলিয়ে গিয়ে পজিটিভ-নিগেটিভ দুটো দিকই দেখছেন।

শারীর-চর্চ্চার মূলে যে কেবল একটা জৈব-প্রেরণার চাঞ্চল্যই বর্ত্তমান, তা নয়; সমগ্র-জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এর একটা শ্রী আছে, সার্থকতা আছে। জৈবপ্রেরণার চাঞ্চল্য আকস্মিক বলে তার উত্তেজনায় একটা মাদকতা আছে এবং সেই জন্যই তাকে আমরা আটপৌরে বলে গ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু সমগ্রভাবে জীবনে শ্রী এবং সার্থকতাকে আমরা অতি সহজভাবেই গ্রহণ করে থাকি। অধুনাপ্রচলিত গেম্-জিমন্যাষ্টিক্স্-এর আতিশয্য আমাদের মদবিহ্বলতারই সূচনা করে। শারীরচর্চ্চার এই পোষাকী দিকটাকে আটপৌরের মর্য্যাদা দেওয়াতে শিক্ষাক্ষেত্রের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। যে সমস্ত শরীরচর্চ্চাতে একটা সৌম্য ও লীলায়িত শ্রী উন্মোষত হয় কিম্বা মানুষকে সামাজিকের অধিকার লাভের সুযোগ দেয়, সেগুলিকে আমরা সাধারণতঃ অনাদরের দৃষ্টিতেই দেখে থাকি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বস্বার, দাঁড়াবার, চলবার ভঙ্গীটীও যে সুঠাম হতে পারে এবং তার কলাকৌশল আয়ত্ত করাও যে আয়াস-সাপেক্ষ হওয়া সম্ভব, এ বিষয়ে আমরা কি সচেতন? একজনের হাতে একটা জিনিষ দিতে, কি একজনার হাত থেকে একটা জিনিষ নিতে, একজনকে নমস্কার করতে, পাঁচজনের সম্মুখে

একখানা আসন গ্রহণ করতে যে শিল্পজ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সেটুকু আমাদের আছে কি? না, এ সব বিষয়ে আমরা ছেলেপিলেদের কোনও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি? ছেলে-দের কারিকুলামে ড্রিল বাধ্যতামূলক; কিন্তু নৃত্য নির্ব্বাসিত কেন (ক্রমশঃ)

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হৃষীকেশে হনুমানজীর মন্দিরের সম্মুখে একটি কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডে প্রথমে স্নান করে পরে গঙ্গা-স্নান করা বিধি। ত্রিবেণীসঙ্গমে গঙ্গাস্নান করে হনুমানজীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে, ভরত-জীর মন্দিরে ভরতজীকে দর্শন করতে হয়। দ্বাপরযুগে ভরতজী এখানে থেকে সাধন করে-ছিলেন বলে প্রবাদ আছে। মন্দিরটী অতি সুন্দর। এ ছাড়া রঘুনাথজীর মন্দির, নারায়ণের মন্দির, কুব্জাকুণ্ড, তপোবনের সাধু-সমাজ ও পাঞ্জাবী ছত্রটী দেখা উচিত। পাঞ্জাবের বহু সাধু-মহাত্মার দ্বারা এ সুবৃহৎ পাঞ্জাবী ছত্র ও ধর্ম্ম-শালা প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া আরও কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে। এখানে দাতব্য ঔষধালয়, হাঁস-পাতাল, ডাকবাঙ্গালা, থানা, পোষ্টাফিস, বড়বাজার সর্ব্বপ্রকার খাবারের দোকান প্রভৃতি সমস্তই আছে।

কেদারবদরী যাবার যানবাহনাদির বন্দোবস্ত এখানেই করতে হয়। এখান হতে বদরীর পথের অন্যান্য জিনিষগুলি যা বাকী ছিল, তা সংগ্রহ করে নিলাম। চিদানন্দদাদা ও বিহারীদাদা একটী করে ছুঁচোল লাঠী কিনে নিলেন। পার্ব্বত্য লাঠী ছাড়া পর্ব্বত আরোহণ করা উচিত নয়। লাঠিটী হালকা অথচ বেশ শক্ত হওয়া চাই। অনেক সময় এর সাহায্যেই বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করতে হয়। একে যাত্রীর তৃতীয় চরণ বলা যেতে পারে। সাধারণতঃ সমতল রাস্তায় চলবার সময় লাঠির বিশেষ দরকার হয় না, কিন্তু পার্ব্বত্য-প্রদেশের রাস্তায় চলতে লাঠীর একান্ত আবশ্যক। চড়াই উৎরাই করতে এবং বরফের উপর দিয়ে চলবার সময়ে লাঠি একটা লোকের কাজ করে। ছুঁচোল লৌহসংযুক্ত লাঠি ভিন্ন বরফে বিশেষ অসুবিধা হয়। লাঠি উচ্চতায় মাথার সমান হওয়া চাই। হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের 'তেজবল' গাছের লাঠি ধারণ করলে নাকি শরীরে তেজ ও বলের বৃদ্ধি হয়। গাছগুলির সারা গায়ে কাঁটায় পূর্ণ, কিন্তু খুব শক্ত। প্রবাদ, ঐ লাঠি ঘরে থাকলে সাপ আসে না। রাস্তার ধারে পাহাড়ীরা এ লাঠি বেচতে আনে। 'তেজবল' গাছের সরু ডাল দিয়া দাঁতন করলে দন্তশূল নিবারিত হয়।

পরিচ্ছদ দুই প্রস্থ নেওয়া উচিত। দিনের বেলায় টিহরী বা শ্রীনগর পর্য্যন্ত অত্যন্ত গরম বলে শীতের পোষাক ব্যবহার করা চলে না। এ সব স্থান শীতকালে যেমন অত্যধিক শীত, তদনুযায়ী গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরম বা বর্ষাকালে অত্যধিক বর্ষা অর্থাৎ প্রত্যেক ঋতুই

সেখানে প্রবল। হৃষীকেশেও তাই দিনের বেলায় অত্যধিক গরম হলেও রাত্রিবেলা কম্বল, লেপ-তোষকের দরকার হয়ে পাড়। কাজেই কাজেই গরম কাপড়-চোপড় পরে দিনের বেলায় পথ চলা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের অবশ্য সমস্ত এক প্রস্থই ছিল। শীত গ্রীষ্মে এক জিনিষই ব্যবহার করেছি। শীতবস্ত্রগুলিও যত হালকা এবং গরম হয় ততই সুবিধা। তিব্বতী-দের সেই জগদ্দল কম্বলের আলষ্টার চাপিয়ে পাহাড় চড়বার শক্তি বাঙ্গালীর আদৌ নাই, কাজেই যতদূর পোষাক হাল্কা এবং গরম হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। কাপড় পরিষ্কার করবার জন্য সাবান, এবং গায় মাখবার জন্যও সাবান নেওয়া উচিত। পাহাড়ীদেশে কিছুদিন থাকার পরই 'পিশু' জাতীয় চাম-উকুন হবে। সেগুলি দেখতে খুব সাদা, কিন্তু তার কামড়ে বড়ই যন্ত্রণা দেয়, এমন কি ঘা হয়ে যায়। ২।১ দিন পর পরই গরমজলে জামা পরিষ্কার করা এবং কারবলিক সাবান বা Sulpher soap দিয়ে শরীর পরিষ্কার করা উচিত। আমাদের সঙ্গে এ সব জিনিষ ছিল না, আমরা তার জন্য বিশেষ অসুবিধাও ভোগ করেছি।

গরমের সময় চোখে পরবার জন্য ঠুলি-চশমা, রাস্তার জন্য কিছু ঔষধ সঙ্গে রাখা বিশেষ দরকার। তাতে নিজের, সঙ্গী লোকের এবং অন্যান্য যাত্রীদেরও বিশেষ উপকার হয়। জিনিষ-পত্র প্যাক করে নেবার জন্য একটি বড় থলে চাই। সমস্ত জিনিষ থলের ভিতর পূরে ওপরে অয়েলক্লথ দিয়ে ঢেকে দিতে হয়, নতুবা বৃষ্টিতে ভিজে গেলে জিনিষের ক্ষতি হয় এবং রাত্রে শীতে নিজেও কষ্ট পেতে হয়।

হৃষীকেশে ভাল দোকান নাই। আমরা বিহারী-দার কৃপায় কতক কতক দরকারী জিনিষ হৃষীকেশ হতে কিনব বলে এসেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, হৃষীকেশে সব জিনিষ মিলে না, মিললেও দাম খুব বেশী। আমাদের বাধ্য হয়ে বেশী দাম দিয়েই জিনিষ কিনতে হয়েছিল। রাস্তায় সাধারণতঃ ৩।৪ রকমের আটা, উরুদ, মুগ ও অরহর ডাল, লঙ্কা, হলুদ, লবণ, ঘি এবং লাকড়ি মিলবে। অরহর ডাল ভাল; উরুদ ও মুগ ডাল খোসা শুদ্ধ—বাঙ্গালীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত জিনিষ—কাজেই অরুচির সম্ভাবনা। কোনরকম তরি-তরকারী মিলে না, মাঝে মাঝে আলু পাওয়া যায়। সরিষার তৈল, গাওয়া ঘি সাধারণতঃ মিলবে না, মাঝে মাঝে সহরে সরিষার তৈল মিলতে পারে। মুসুরীর ডাল কখনও কখনও পাওয়া যায়। রামফলটি খুব মিলে। রামফল কাকে বলে বোধ হয় জানেন না। রামফল অর্থাৎ পেঁয়াজ; সে দেশে হিন্দুর, এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীরও পেঁয়াজ খাওয়া নিষেধ নাই। আমরা অবশ্য কখনও খাই নি। লসুনও ওদেশে খুব খায়।

বিকালবেলা হরিদাসভায়ার সঙ্গে মহাদেব-দেবী নেপালী ছত্রে নেপালীবাবার সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি ঐ ছত্রে দোতালায় একটা ছোট কুঠুরীতে থাকেন। তাঁর নাম শ্রীশ্রী ১০৮ শ্রীমৎ স্বামী অনন্তানন্দজী পরমহংসদেব। তাঁকে প্রণাম করে কাছে বসলাম। অনেক কথাবার্ত্তা হল। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন আমার কেদারবদরীর যাওয়ার সঙ্কল্প ছিল না, তখন একদিন শ্রীমৎ যোগানন্দ মহারাজের সঙ্গে কয়েকজন গুরুভাই মিলে হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, স্বর্গাশ্রম, কৈলাসাশ্রম দেখে এসে-ছিলাম, সেদিনও বেলা প্রায় ২টার উক্ত মহাত্মার সঙ্গে দেখা করে এসেছিলাম। তাঁকে প্রথমে দেখলেই স্ত্রী সাধু বলে মনে হয়। স্বভাবটীও বালকের মত সরল, কিন্তু কেউ অন্যায় কাজ করলে দুর্ব্বাসা ঋষির মত তেজীয়ান। দাড়ি-গোঁফ আদৌ জন্মে নি, মাথার চুল, সবই

পেকে গিয়েছে। তিনি উর্দ্ধরেতা। তাঁর মুখখানি ছেলেমানুষের মত এবং সর্ব্বদাই হাস্যযুক্ত। কোন বাসনা-কামনার ছবি তাঁর মুখে নাই। কৌপীন, ধুতি ও কম্বল ভিন্ন অন্য কিছুই ব্যবহার করেন না। তাঁর শোইবার খাটখানি অদ্ভুত। চারপাশে ৮ খানা ইটের উপর চারপাশে চারখানা বাঁশ, মাঝখানে কয়েকটী সরু বাঁশ, একখানা ইট বালিসের কাজ করছে; সেই বাঁশের খাটিয়ার ওপর বসে থাকেন, শরীর অসুস্থ হলেও অন্য কিছু আবশ্যক মনে করেন না। তাঁর বয়স কত জিজ্ঞাসা করাতে বললেন,—"য়হ্ শরীর বহুত পুরাণা হৈ, জব্ মৈঁ সংসার ছোড়্ কে আয়া, তব্ জাহাজ, রেলগাড্ডী বগৈরহ্ কুছ্ নহীঁ হুএ। একদফে বঙ্গাল মেঁ কালীমাঈকা দর্শন করনেকো গয়া রহা, উসবক্ত্ বরাবর পৈদল চলনে পড়া। উসবক্ত্ কালী-ঘাট মেঁ বিলকুল জঙ্গল থা, অঙ্গরেজ লোগোঁকী বাত ভী কিসীনে নহীঁ সুনী। ফির কালীঘাটসে পৈদল জগন্নাথজীকা দর্শন করনেকো গয়া রহা, ৱহাঁ ভী সাহেব লোগোঁকা নাম ভি নহীঁ সুনা। জব মৈঁ সংসার ছোড়কে আয়া, উসসে বহুত সাল পিছে অঙ্গরেজ লোগ য়হ্ মুলুক মেঁ আয়ে। য়হ্ শরীর বহুত পুরাণা হৈ।" তাঁর কথা শুনে বুঝা যায় তিনি বোধ হয় দু'শ বৎসরের সাধু হবেন। হৃষীকেশে শত শত সাধু-মহাত্মা থাকতেও তাঁকেই সকলে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আমাদের ওপর তাঁর অফুরন্ত স্নেহের কথা ভেবে এখনও প্রাণে কত শান্তি পাই। আমরা সাতদিন হৃষীকেশে ছিলাম, প্রত্যহ দুবেলা তাঁকে দর্শন করতে যেতাম; এখনও তিনি অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত করেন নি, মাঝে মাঝে তাঁর আশীর্ব্বাদী পত্র পেয়ে থাকি।

৪।৫ দিন হল তাঁর জ্বর হয়েছে। পিত্ত-প্রকোপের জন্য হাত, পা, চক্ষু, পেট জ্বালা করছে এবং বমিবমি ভাব হয়েছে, অধিকন্তু সর্দ্দি লেগে খুব কাশছেন। তাঁর অসুস্থ শরীর দেখে তিনি ঔষধ সেবন করেন কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। জানতে পারলাম, এত বয়স হলেও আজ পর্য্যন্ত তিনি কোন ঔষধ ব্যবহার করেন নি। তাঁর শরীর খুবই অসুস্থ দেখে, ঔষধ সেবনের জন্য আমি বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। আমার বিশেষ আগ্রহ দেখে, তিনি ঔষধ সেবন করতে স্বীকার করলেন। আমি তখনই আমাদের ধর্ম্মশালার বাসায় এসে কিছু ঔষধ নিয়ে গেলাম। ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ, মধু ও বাসকপাতার রস সহ তখনই খাইয়ে দিলাম। রাত্রে সেবনের জন্য আমাদের ক্ষেপাদাদার জ্বররাহু বটিকা এবং তাঁরই জোলাপের ঔষধ দিলাম। রাত্র ৯॥টা পর্য্যন্ত তাঁর কাছেই থেকে কয়বার ঔষধ খাইয়ে বাসায় ফিরে এলাম। তাঁর সঙ্গে আমাদের আশ্রম সম্বন্ধে অনেক কথা হল; তিনি আমাদের আশ্রমগুলির ও ঋষি-বিদ্যালয়ের কথা শুনে খুব আনন্দিত হলেন। বললেন, "এ ভাবে কাজ না করলে ভারতের উন্নতি হবে না, ভারতের উন্নতির এবং মুক্তির এই একমাত্র সনাতন পথ।" আমাদের এ সকল প্রতিষ্ঠানে তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

তাঁর আদেশে পাঞ্জাবের একজন ভক্ত একটী ছত্রশালা খুলে সাধু-মহাপুরুষদের বিকালের আহার যুগিয়ে থাকেন। ভক্তটীর নাম দাস চেতরামজী। তিনি ছত্রের নীচে একটা ঘরে বাস করছেন। তিনি নেপালীবাবার শিষ্য এবং অতি সজ্জন। আমরা যখন প্রথমেই নেপালীবাবার কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন নেপালী-বাবা বারান্দায় বসে-ছিলেন। প্রত্যহ বিকালবেলা সাধু-মহাত্মাদের রুটী দেওয়ার সময় তিনি বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেন। আজ শরীর অসুস্থ বলেও সে নিয়মের

ব্যতিক্রম করেন নি। আমরা তাঁর কাছে বসবার পর আমাদের রুটী খাওয়ার জন্য আদেশ করাতে আমরা নীচে গিয়ে রুটী খেয়ে উপরে চলে এলাম। হৃষীকেশে অনেক ছত্র আছে, কিন্তু এ ছত্রের মত রুটী এত সুন্দর আর কোথায়ও হয় না। সমস্ত কাজের তদারক নেপালী-বাবা নিজেই করে থাকেন।

১৭ বৈশাখ, ৩৪
শনিবার

সকালেই নেপালীবাবাকে দেখতে গেলাম। আমি এখন তাঁর চিকিৎসা বনে গেছি। আমা-রই কি ভুল! যাঁর কণামাত্র কৃপাতে আমরা ধন্য হ'য়ে যাই সেই সব জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদেরও মায়ার বশে আমা-দের মত সাধারণ জীব মনে করে ঔষধ খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। শুধু অনুরোধ নয়, নিজে কাছে বসে থেকে সমস্ত ঔষধগুলো খাইয়ে এসেছি, পাছে ভুলে গিয়ে ঔষধ না খেয়ে আরও বেশী ভোগেন। কাল রাত ভোরে এই বিষয় চিন্তা করেছি, এ আমার মায়া, না প্রেম? নেপালীবাবা আমার কে? জীবনে কখনও তাঁকে দেখি নি, তিনি আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ নন, তিনি আমার কোন গুরুভাই নন, তবুও জানি না কেন তাঁর প্রতি প্রাণের একটা প্রবল টান হয়ে গেছে, তাঁহার সুস্থ সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রাণটা হু'হু করে জ্বলছে। তাই অতি সকা-লেই তাঁর কাছে যেয়ে হাজির হলাম। গত রাত্রে তাঁকে জোলাপের ঔষধ দিয়ে এসেছি, তার কোন ফলই হয় নি, আজ বাহ্য হয় নি। মনে করলাম, খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দিই, একটু পরেই বাহ্য হয়ে যাবে। তখনই গরম দুধ খাইয়ে দিলাম। তাতেও বাহ্য হল না, তবে অন্যান্য উপসর্গ কমে গেছে। জ্বর নাই, সকালে বাসকপাতার রস ও মধু সহ মকরধ্বজ দিলাম। দুপুরে তিত-তরকারী দিয়ে ভাত খেতে বললাম। আমা-দের দেশে জ্বর হলে সাবুদানা, বার্লি, দুধ, রুটী প্রভৃতি লঘুপথ্য দেওয়া হয়, ওসব দেশে জ্বর হলে ভাত খেতে দেওয়া হয়, অধিকন্তু খিচুরীই সে দেশের জ্বরের পথ্য। আমার কথামত তিনি ভাত খেতে স্বীকার হলেন।

তিক্ত জিনিষের মধ্যে সে দেশে করল্লা মিলে, আমি মনে করেছিলাম, বোধ হয় করল্লার শুক্ত পাক করিয়ে, তাই দিয়ে তিনি ভাত খাবেন। আমি বসে আছি, তাঁকে ভাত খাইয়ে চলে আসব। বেলা প্রায় ১০॥ টার সময় তাঁর জন্য ভাত, করল্লাভাজা, অরহর ডাল এল। দেখি, আমার জন্যও অন্য একটা থালাতে ঐ রকম ভাত, করল্লাভাজা এবং অরহর ডাল এসে হাজির হয়েছে। ভাতে হাত দিয়ে দেখি, ভাতগুলি ঘিয়ে চব্ চব্ করছে, এবং করলার ভিতর নানাপ্রকার মসল্লা পূরে ঘৃতে ভেজে দিয়েছে। করল্লাও ঘিয়ে ভর্ত্তি। আমি ত অবাক! তাঁর অসুখের জন্য Light food-এর ব্যবস্থা করে উল্টো ফল দাঁড়াল! সেই ঘি-মাখা ভাত, তার উপর আবার মসল্লাযুক্ত করল্লাভাজা, এ সব দেখে আমি একেবারে বোকা বনে গেছি। চুপ করে খেতে লাগলাম। তিনি অতি সামান্য ভাত করল্লা-ভাজা দিয়ে খেয়ে নিলেন। আমাকেও সামান্য ভাত আনিয়ে দেন, আমি সেগুলো খেয়েই উঠে পড়বো মনে করছিলাম, এমন সময় ঘিয়ে ভাজা পরোটা কয়েকখানা আনিয়ে পাতে দিয়ে দিলেন।

এ সব কাজ তাঁর সেই শিষ্য, এই ছত্রের ম্যানেজার চেৎরামজী করছেন। চেৎরামজী তাঁর স্ত্রীর সহিত সেখানে থেকে সাধন-ভজন করেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সদাচারী, অমায়িক লোক। তাঁর কয়দিনের ব্যবহারে আমার বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি।

বেলা ১১॥ টার সময় নেপালীবাবার নিকট হতে ধর্ম্ম-শালায় ফিরে এলাম। বিকাল বেলা ৪টার সময় হরিদাস ভায়ার সঙ্গে পুনরায় তাঁর কাছে গেলাম। আমি চলে আসার পর এই সময়ের মধ্যে তাঁর তিন বার পায়খানা হয়ে অনেক বদমল, পিত্ত প্রভৃতি পড়ে গেছে, এখন শরীর খুব ভাল আছে। কাশীও খুব কমে গেছে। এখন আর তাঁর কোন অসুখ আছে বলে মনে হয় না। তবুও বিকাল বেলা আবার বাসকপাতার রস ও মধু সহ মকরধ্বজ একমাত্রা খেতে দিলাম। খল, মধু, ঔষধাদি সব পকেটে করে সঙ্গে নিয়ে যাই, আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসি। কলকাতা হতে জানকী দাদা এক শিশি Peps কাশীর জন্য পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে সেটা দিয়ে দিলাম। তিনি কিছুতেই নিতে চান না। একরকম জোর করেই দিয়ে এলাম। জ্বরের জন্য ক্ষেপা দাদার "জ্বররাহু" দিচ্ছি। কোন অসুখ না থাকলেও শরীর খুব দুর্ব্বল আছে।

তাঁর কাছে রাত্রি ৯॥ টা পর্য্যন্ত ছিলাম। তিনি তাঁর ঘরে কোন লোককেই ১০।১৫ মিনি-টের বেশী বসতে দেন না। অল্পক্ষণ পরেই বলে দেন, "যাও সাধন-ভজন কর গিয়ে।" আমি কিন্তু আজ সমস্ত দিনে প্রায় ১১ ঘণ্টারও বেশী সময় তাঁহার বিছানার পাশে বসেছিলাম। সেখা-নেই আমার বসবার জায়গা তিনিই করিয়ে দিয়ে-ছিলেন। তাঁকে শাস্ত্র সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করি এবং কিসে মুক্তি লাভ করা যায় জিজ্ঞাসা করি। তিনি বেদ, উপনিষদ, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র পড়তে বললেন। এ ছাড়া প্রায়ই বলছিলেন, "বিনা জ্ঞানসে মুক্তি নহী হোগী।"

বিকাল বেলা ছত্রে ভিক্ষা করতে হল না। আমি নীচে গিয়ে গতকালের মত ছত্র হতে রুটী খেয়ে নেব মনে করেছিলাম, কিন্তু তার পূর্ব্বেই দেখি চেৎরাম ভায়া আমার জন্য থালার মধ্যে ৫।৬ খানা রুটী, ডাল ওপরে এনে দিয়ে গেলেন। নেপালীবাবার অহেতুক কৃপাতেই তাঁর নিজের কাছে স্থান দিয়াছেন, অথচ সমস্ত দিন তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনা করছি দেখে চেৎরাম ভায়াও হয়ত আমাকে কেষ্ট-বিষ্টু কিছু ঠাওরিয়ে থাকবেন! সর্ব্বদাই আদেশপালনের জন্য ব্যস্ত! আমার কিন্তু এ সব ভাল লাগে না, আমি শুধু যাতে নেপালীবাবা শীঘ্র ভাল হয়ে উঠেন, সেই জন্যই বেশী সময় তাঁর কাছে থাকি। কৃষ্ণ-পক্ষীয় চতুর্দ্দশীতিথি, রাস্তা-ঘাট ঘন অন্ধকারে আবৃত হয়েছে। নেপালীবাবা আলো সহ সঙ্গে লোক দিতে চেয়েছিলেন, আমি একাই যেতে পারব বলে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে বাসায় এসে পৌছলাম। এদিকে সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। রাত্রিবেলা গঙ্গার ধারে উন্মুক্ত প্রান্তরে পাথরের বিছানায় খুব আরামে আকাশের তারা গুণতে গুণতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, তা তিনিই জানেন।

(ক্রমশঃ)

আদি-কথা

—✱—

উপনিষদ্ বলছেন, যিনি উপর-নীচ দুই-ই, তাঁকে দেখলে পর হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ হয়ে যায়, সমস্ত সংশয়ের ছেদ হয়ে যায়, কর্ম্ম ঝরে পড়ে। এগুলি পর পর হয়। হৃদয়ের গ্রন্থি মানে চৈতন্য আর জড়ে যে গাঁঠছড়া বাঁধা রয়েছে তাই। এ বাঁধনটা আল্‌গা হয়ে গেলেই আর সংশয় থাকে না, কেননা তখন ভেদ-জ্ঞানও থাকে না বা অপ্রাপ্তির বেদনাও থাকে না; তখনই বাস্তবিক কর্ম্ম-ক্ষয় হয়। এই শেষের কথাটাই নিদারুণ। কর্ম্ম-ক্ষয় বাইরে হয় না, হয় ভিতরে। স্তোকবাক্য নয়—এটা সত্য কথা। যার কর্ম্মক্ষয় হয়, সে তো বুঝ্‌বে? তার চোখ দুটো তখন কোথায়?—সে যে তখন "আবৃত্তচক্ষু"—চোখ দুটো তার ভিতরপানে; তাই কর্ম্ম-ক্ষয় সে দেখছে ভিতরে—বাইরে নয়। বাইরে হয়ত তার কাজ-কর্ম্ম পুরাদমেই চলছে। হয়ত বলছি এই জন্য যে, কাজ চলবে কি চলবে না—এই ভাবনাটুকুও থাকে না; যে বাস্তবিক কর্ত্রী, তারই গরজে কর্ম্ম চলবে কি না চলবে। শিব নিশ্চিন্ত। তাই তাঁর কাজ থাকলেও নাই। এইটাই হল কর্ম্মক্ষয়—ভিতরে ভিতরে ক্ষইয়ে গেছে, বাইরে থেকে তা বুঝবার যো নাই।

আমরা কিন্তু সাধন করি উলটো দিক থেকে। অমুক লোকটার ধর্ম্মে মতি হয়েছে। কি করে বুঝলে?—না, আজকাল ঘর-সংসার কিছুই দেখে না, দুবেলা দুটো খায়, আর সারাদিন কেবল হরিনাম করে। অর্থাৎ দশজনের রায়ে, আগেই তার কর্ম্মক্ষয় হয়ে গেছে।—হাঁ, কর্ম্মক্ষয় হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু খাওয়া-শোয়াটা বন্ধ হয়নি—আসলে হাত পড়েনি। কত উমেদারই আসছে; জিজ্ঞাসা করি, কেন এসেছ?—সাধু হব।—কি করে সাধু হবে?—ভগবানের নাম করব।—সংসারে থেকে তা পারতে না?—ঝঞ্জাট বড়!—খেতে হবে তো?—আজ্ঞে ঠাকুরবাড়ীতে এসে কি দুটো প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হব?—সঙ্গে কিছু এনেছ?—না, একবস্ত্রে বেরিয়ে এসেছি।—ভেবে দেখ দেখি, কত বড় অধিকারী! সাধু হবে কি, হয়েই এসেছে। কর্ম্মত্যাগ করেছে, ছাতা, জুতো, কাপড় সব ত্যাগ করেছে, কেবল কথা ছাড়তে পারেনি, খাওয়া ছাড়তে পারেনি—আর ছাড়তে পারেনি ঘুম! দুদিন পরেই দেখতে পাবে, আজকে এটা কালকে সেটা করে তার সবই লাগছে, দশদিন পরে দিব্যি সংসার দিয়ে নিজকে ঘিরে নিয়েছে; যা ছেড়েছিল, সব এসে গরজের মাথায় হাজির হয়েছে, কেবল কর্ম্ম ছাড়া। কর্ম্মের কথা বললে এখনও বাবাজীর চক্ষুর তারা স্থির হয়ে যায়—সমাধির লক্ষণ প্রকট হয়ে পড়ে আর কি!—ঠাট্টা করছি না—এই জ্বালা ভুগতে হচ্ছে দিনের পর দিন—দেশটা এমনি অধঃপাতেই গেছে।

ধর্ম্ম-সাধনার ছকটা কি জান?—ওই যা বললাম, আগে কর্ম্মত্যাগ হোক অর্থাৎ কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে পরের ঘাড়ে বসে খাওয়ার নির্লজ্জতাটা অভ্যস্ত হোক! তারপর হবে সংশয় নাশ। কি করে?—দশজনে মিলে বসে ঘোঁট কর, তর্ক কর, পাঁচখানা পুথি জড় কর—এ শাস্ত্রের ল্যাজের সঙ্গে সে শাস্ত্রের মুড়ো জুড়ে দাও—ব্যস্, সংশয় একতিল থাকবে না। নিজের সংশয় থাক্ না থাক্, পরের সংশয় তো বিলকুল

থাকবে না। তোমার কাছে এসে প্রশ্ন করে সংশয় নিয়ে কেউ ফিরে যাবে, এ অসহ্য! যেমন করে হোক, তাকে পেড়ে ফেলতেই হবে, তোমার বুঝ তাকে বুঝিয়ে দিতেই হবে, তার মনের কালী মুছে ফেলতেই হবে। একেই না বলি সংশয় ছেদ! সেটা আত্মনেপদী না হয়ে যতই পরস্মৈপদী হবে ততই না জগতের কল্যাণ।

এমনি করে নিজের কর্ম্ম ক্ষয় আর পরের সংশয় নাশ করে সারাদিনের মাঝে একদণ্ড ফুরসুৎ পাওয়া যাবে কোথায় যে হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হল কিনা তার খবরদারী করা যাবে!

আরম্ভ করতে হত বাস্তবিক উল্টো দিক হতে। আগে বুকের মাঝে যে গেরোটা রয়েছে, তাকেই আলগা করতে হবে। সংশয় থাক্‌না, তাতেই বা কি আসে যায়? কর্ম্মই বা যাবে কেন?

চৈতন্য আর জড়ে যে গ্রন্থি আছে, তা বুঝবো কি করে, ছাড়াবই বা কি করে? শুধু কথার মার-প্যাঁচে এগুলো বোঝা যায় না, ফল দেখে বুঝতে হয়। গ্রন্থি যে আছে তার প্রমাণ পাই গুণের ক্রিয়ায়। প্রথমেই ধর প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা। ঘুম কমাও, কুড়েমি দূর কর, হুঁসিয়ার হও। আগের দুটো বা কতক বোঝা যায়, শেষেরটার তত্ত্ব পাওয়াই মুস্কিল। কি করে যে তিলে তিলে মানুষ বেহুঁষ হয়ে যায়, তা তো বোঝবার যো নাই। এক কাজ করা যেতে পারে। এক একটা ভাব বা আচার নিয়ে মনকে এক একটা চুক্তিনামা দেওয়া যায়। যেমন বাজে বকার অভ্যাস আছে, ছাড়াতে হবে; ভোর বেলায় একটু স্থির হয়ে বসে মনের ওপর খুব কড়া হুকুম চালিয়ে দিলাম, আজ সারাদিনের মাঝে হাঁ-না ছাড়া বাজে কথা একদম বন্ধ। বার বার কথাগুলো খুব জোরের সঙ্গে আওড়াতে হবে, যে মনটা তন্দ্রাতুর থেকে সংস্কারবশে সব অকাণ্ড ঘটায়, তাকে চেতন করবার জন্য। তারপর তদারক করবার দরুণ দিনের মাঝে দু'চার ঘড়ি সময় নির্দ্দিষ্ট করে দিতে হবে। অবশেষে রাত্রে শোয়ার আগে সমস্তটা দিনের ইতিহাস মনে মনে আওড়িয়ে যাচাই করে দেখতে হবে, কথার খেলাপ কোথায় কোথায় হল, কেনই বা হল। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হবে, অবসাদ আসবে, বিরক্তি জন্মাবে—নানা হাস্যকর অজুহাত এবং আবদারের সৃষ্টি হবে। কিন্তু কিছুতেই কান দিতে নাই—তাতে অন্য দিক দিয়ে ক্ষতি হয় হোক্—এমনি একটা জেদ বজায় রাখ্‌তে হয়। এই করে তবে মনের তলায় সুপ্ত আছে যে কর্ত্তা মন বা বুদ্ধি. সে জেগে উঠ্‌বে। একটা আদেশ বা ভাব বুদ্ধির মাঝে একবার প্রবেশ করতে পেলেই অনায়াসে তা আয়ত্ত হয়ে যায়—সংযম তখন খুবই সহজ মনে হয়। নানা বিষয়ে বুদ্ধিকে যে এমনি সজাগ করতে পেরেছে, তার কখনও প্রমাদ ঘটে না, সে সর্ব্বদাই হুঁসিয়ার।

মনটা এমনি সজাগ হয়ে গেলেই অর্দ্ধেক কাজ হাঁসিল হয়ে গেল বুঝ্‌তে হবে। মনের জোর আগে না করে শুধু বড় বড় ভাব তার ওপর চাপালে কি হবে? ধারণা করবার শক্তি চাই। যে তারটা চড়া সুরে বাঁধা থাকে, তাতে একটা আঘাত দিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেটা ঝন্ ঝন্ করতে থাকে; আর ঢিলা তারে ঘা দিলে সেটা শুধু ঢ্যাব ঢ্যাব করে। মনকেও তেমনি চড়া করে বাঁধতে হবে, তবে ভাবের ছোঁয়াচ লাগ্‌লে তাতে বিলম্বিত ঝঙ্কার তোলা যাবে।

আর একটা বিপদ—উত্তেজনা,রজের ক্রিয়া। হাঁস ফাস করার স্বভাব অনেকের আছে—অল্পেই তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এটা কিন্তু সজীব

মনের লক্ষণ নয়। প্রমাণ, ছট্‌ফটানীর পর অবসাদটা সহজে আসে, প্রমাদে ক্রমে ঘিরে ধরে। সচেতন মনের উদ্দীপনার সঙ্গে ঘুলিয়ে যেতে পারে বলে কথাটা এখানে বলে রাখা। চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর করবার কোনও নির্দ্দিষ্ট কসরৎ বাৎলে দেওয়া বড় কঠিন। প্রমাদ যার কতকটা দূর হয়েছে, ইষ্টের সম্বন্ধে বুদ্ধি সজাগ হয়েছে, চিত্তকে নিরোধ করবার ক্ষমতা তার আপনা হতেই জমতে থাকে। গীতায় ভগবান বলেছিলেন, অভ্যাস আর বৈরাগ্যের কথা। অভ্যাসে চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর হয়, এই কথার অর্থ প্রায় এই যে চিত্তের চঞ্চলতা দূর হতে হতেই দূর হয়ে যায়। প্রাণায়ামে চিত্ত স্থির হয়, এটা যোগীর কথা, সাধারণ মানুষের সাধ্য উপদেশ নয়। তবে এ থেকেও একটা সঙ্কেত পাওয়া যেতে পারে। সাধারণতঃ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস খুব অনিয়মিত হয়; স্বভাবতঃই তালে তালে শ্বাস পড়ছে, এমন মানুষ খুব কম। একটু শ্বাসের প্রতি নজর রাখলে এ দোষটা ধরা পড়ে; তখন একটু মাত্রাজ্ঞান নিয়ে চললে সামান্য চেষ্টায় শ্বাস সহজেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে। এই নিয়ন্ত্রণ কোনও যোগের কৌশল নয় বা বিশেষ আয়াস-সাধ্য বা বিপজ্জনক কিছুই নয়। একটু হুঁসিয়ারী মাত্র। কিন্তু তাতেই সমস্ত মনের ওপর বেশ একটা সুস্পষ্ট ক্রিয়া হয়। আবোল তাবোল চিন্তাগুলো মন থেকে দূর হয়ে যায়, একটা কিছুতে হঠাৎ চমকে ওঠবার অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে যায়। মোটের উপর চিত্তের পক্ষে এটা বেশ একটা রসায়ন।

এ ছাড়া দিনের মাঝে নির্দ্দিষ্ট সময় ধরে কতক্ষণ স্থির হয়ে বসে একটা অভিমত বিষয় নিয়ে চিন্তা করবার অভ্যাস করা, মেরুদণ্ড সোজা করে বসে নাভির পানে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে কিছুক্ষণ বসে থাকা, অথবা খুব বিশেষ আয়াস না করে দুটী ভ্রূর মাঝে দৃষ্টি আর মনকে নিবদ্ধ করা—এই সমস্ত সাময়িক কৌশলগুলিও বেশ উপকারী। একটা বাজে উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলে পর চোখের সামনে যেমন "সরষে-ফুল" ভেসে বেড়াতে দেখা যায়, তেমনি চোখ বুজলে পরও একটা অনতি-উজ্জ্বল বিন্দুকে সাধারণতঃ চোখের সামনে নেচে বেড়াতে দেখা যায়। ওই বিন্দুটার ওপর মন দিয়ে ওটাকে এক যায়গায় স্থির রাখবার চেষ্টা করলেও বায়ু ও মন সহজেই স্থির হয়ে আসে এবং তাতে শারীরিক ও মানসিক শ্রান্তিও সহজে দূর হয়ে যায়। এ সব কিছু বড় সাধন নয়—টোট্‌কামাত্র। যাদের কাজ-কর্ম্ম করতে হয়, দশ জনের সঙ্গে চল্‌তে ফিরতে হয়, অথচ মনের ওপর একটা আধিপত্য রাখবার আকাঙ্ক্ষা আছে, তারা এই সমস্ত নির্দ্দোষ কৌশলগুলি প্রাথমিক ক্রিয়া হিসাবে সহজেই গ্রহণ করতে পারে। তবে এ কথা বলে রাখা ভাল, এ সব চিত্তস্থৈর্য্য-সাধনার সহায়ক মাত্র—এই করলেই যে সব হয়ে যায়, এমন কোনও গ্যারান্টি দেওয়া চলে না। আগেই তো বলেছি, গীতায় ভগবান্ মনস্থির করবার যে দুটি বড় বড় উপায় বলে দিয়েছেন, যথা অভ্যাস আর বৈরাগ্য, সে দুটি চিত্তস্থৈর্য্যের সার্ব্বভৌম এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন হলেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম আয়াস-সাপেক্ষ। সাধারণতঃ আমরা বুঝ্‌তে পারি না যে কোথা থেকে কাজ সুরু করব। মন নিয়ে সবাই চিন্তা করে বটে, কিন্তু মনের প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করে খুব কম লোকেই। মনের সম্বন্ধে চিন্তা না করলে মনকে চিন্‌তে পারা যায় না. আর না চিন্‌তে পারলে বশও করা যায় না। এইজন্য আমাদের মন বশ করতে কতকগুলি বাইরের অবলম্বন দরকার হয়। একটা স্থূল কিছু পেলে তা ধরে কাজের পত্তন করা

চলে। যে দু'একটা কৌশলের কথা বলা হল, সেগুলোর উপযোগিতা এইটুকু মাত্র—নইলে ওই যে বলেছি, "মন স্থির করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মনকে স্থির করবার বার বার চেষ্টা করা!"

মন কতকটা স্থির হয়ে আসলে পর আপনি মনে আনন্দ জন্মাবে। এই আনন্দের প্রথম আবেগে একটা বিহ্বলতার সৃষ্টি হয়, একটা ছলকে পড়ার ভাব আসে। আনন্দ কাম্য হলেও এই ছলকে পড়ার ভাবটা কিন্তু সর্ব্বনেশে। এই-টাই হচ্ছে সত্ত্বের গুণক্রিয়া। একটা শূন্য পাত্রে ওপর থেকে জল ঢেলে দিলে পাত্রের তলায় আঘাত পেয়ে জলটা চারদিকে ছিটকে পড়ে। কিন্তু পাত্রের তলায় কিছু জল জমা হলে পর আর জল ছিট্‌কায় না। তার পর পাত্র ভরে গেলে এমনও হয় যে নিঃশব্দে পাত্রের গা বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, কেউ টেরও পায় না। স্থির চিত্তে আনন্দকে এমনি করেই ধারণা করতে হয়। একটু কিছু পেতেই চ্যাঁচামিচি করতে নাই—মনের খবর যেখানে-সেখানে ভাঙ্‌তে নাই, তাহলে দু'দিনে ফতুর হয়ে যাবে। যে চিত্ত-স্থৈর্য্য অবলম্বন করে আনন্দ এসেছিল, এই বার-ফট্‌কা ভাবে সে স্থৈর্য্য নষ্ট হয়ে আবার সে আনন্দ দূর হয়ে গিয়ে পুনর্মূষিক হতে হবে। আনন্দ জমাতে হবে, তবে সে একদিন পাত্রভরে উপ্‌চে পড়বে।

এ পর্য্যন্ত হল গুণের ক্রিয়া। মন যখন এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হবে, তখন বুঝ্‌তে পারবে, চৈতন্যের সঙ্গে জড়ের গ্রন্থি কোথায়—একটা আমিতে কি করে দু'টো আমি চণকের দলের মত ভাগা-ভাগি হয়ে আছে। আমার এই দুটো আমির মাঝে দণ্ডে মিলন, দণ্ডে বিরহ—সে এক অপরূপ লীলা! নিত্যমিলনের ভূমিকায় দেখছি—এই হাসি, এই কান্না—এই অভিমানে মুখ বাঁকিয়ে আবার পরমুহূর্ত্তে সোহাগে ঝাঁপিয়ে পড়া! আমিই আমাকে কত বিচিত্র উপায়ে আস্বাদন করছি—ছিন্নমস্তার রুধিরধারার মত আমা হতে উৎপন্ন আনন্দের লীলায়ন আমার পরিচর্য্যাতেই নিঃশেষিত হচ্ছে।

বাস্তবিক লীলার সুরু এবং শেষ আমাতেই। সব মায়া—শুধু দেখ্‌ছি—আমিই স্থির আছি। এই আমি দিয়েই আমার তুমি গড়ে তুল্‌ছি—সে পালাবে কোথায়?—চোখ দিয়েছে, মেলতেই যে চোখে পড়ে! মন দিয়েছে—মেলতেই যে মনের জালে এসে ধরা পড়ে। কিন্তু বড় চঞ্চল—পেয়ে তাই লালসা, অতৃপ্তি আরও বাড়ে—কিন্তু সংশয় আর আসে না। এই দেহ-মনের ফাঁদে তো ধরা পড়েনি—আত্মস্বরূপ আত্মারই ফাঁদে ধরা পড়েছে—দেহের বাঁকে মনের বাঁকে তার আলো সাত-রঙা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে—এইমাত্র তফাৎ। কেউ কিছু গড়েনি—যা চিরকাল আছে—ছিল, তারই প্রকাশ হয়েছে, বৃত্তির স্ফূর্ত্তিতে রসের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সত্তা প্রমাণিত হয়েছে শুধু! এই হচ্ছে সহজস্থিতি—পর এবং অবর নিয়ে।

আলোচনা

—*—

কংগ্রেস যখন স্বাধীনতার ক্রীড্ ঘোষণা করিলেন, তখন কোনও কোনও খবরের কাগজে এমনই একটা নিরীহ আস্ফালন প্রকাশ পাইতে লাগিল যেন এইবার ভারত উদ্ধারের আর বড় বেশী বাকী নাই। রক্তচক্ষু হইয়া কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, পরাধীনতাই আমাদের সমস্ত ব্যাধির মূল এবং কংগ্রেসমণ্ডপে বসিয়া এই অবিষ্কারটা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কারের সমতুল্য। বচনে-রচনে আত্মতৃপ্তি অনুভব করিবার অধিকার অবশ্য সকলেরই আছে—বিশেষতঃ কাজের ন্যূনতা যেখানে বচনের প্রাচুর্য্য দিয়া পূরণ করাই বিধি। তবুও কথাগুলি শুনিয়া চিত্ত নানা ভাবনাতেই আন্দোলিত হইতে থাকে। পরাধীনতা নিশ্চয়ই ব্যাধি, কিন্তু এই ব্যাধির নিদান, প্রকৃতি ও বিসর্পণের ইতিহাস আমরা অধিগত করিয়াছি কি? শুধু রাষ্ট্রে নয়, কতদিক দিয়া যে আমরা পরাধীন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনে হয়, পরাধীনতা তো দৈন্যের হেতু নয়, হেতু শক্তিহীনতা। জগতে একজন অপরজনকে দাবাইয়া রাখিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টা করিবেই এবং সেই চেষ্টার ফলে শক্তিহীনের পরাধীনতা সুনিশ্চিত। পরাধীনতার আদিম বীজ, মনের দুর্ব্বলতায়, তামসিকতায়, আরামপ্রিয়তার। শুধু রাষ্ট্রে কেন, বাণিজ্যে, শিল্পে, সাহিত্যে, সমাজে, ধর্ম্মে কোথায় আমরা পরাধীন নই? এই সমস্ত ক্ষেত্রেই পরাধীনতা কি শুধু বৈদেশিক শাসনের ফল? তাহার চেয়ে বরং মানসিক ক্লীবত্বকেই ইহার জন্য বিশেষ করিয়া দায়ী করা উচিত নয় কি? এযাবৎ উন্নতির দরুণ আমাদের নিজেদের তরফ হইতে যত চেষ্টা হইতেছে, যে সমস্ত বিধি অবলম্বিত হইতেছে, তাহার মাঝে বারো-আনাই হুবহু ইউরোপের নকল; ইউরোপ যাহা চিন্তা করিয়াছে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া চিন্তা করিবার শক্তি আমাদের কত অল্প! ইউরোপীয় আদর্শ আমাদের চিন্তারাজ্যকে ছাইয়া ফেলিল; কালের এই অপ্রতিহত অভিযানকে আমরা কি ভাবে গ্রহণ করিতেছি? আমাদের কাছে দুইটী বাঁধিগৎ মাত্র আছে; একদল বলিতেছেন, উহাদের সব ভাল, আর একদল বলিতেছেন, সব মন্দ! কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক, বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার চেষ্টা ও ক্ষমতা কোথায়ও বড় দেখা যায় না। চিত্তের এই যে অসাড়তা বা atrophism ইহাই আমাদের দুর্গতির প্রধানতম বীজ। ইউরোপীয় আলোকে চঞ্চল হইয়া আমরা ভাবি, বুঝি চিত্তে আমাদের সাড়া পড়িয়াছে। কিন্তু কোথায় সাড়া, কোথায় প্রাণের স্ফুরণ? নিতান্ত জড়েরও যে স্বতঃপ্রতিঘাত করিবার একটা শক্তি রহিয়াছে, একি তাহার চেয়ে একটা বেশী কিছু? মরা-মানুষ চিতার উপর শুইয়াই আগুনতাতে হাত-পা খিঁচায়, সে কি জীবনের চিহ্ন না জড়ের আক্ষেপ মাত্র? জীবন্ত মানুষের মাঝে একটা গলিত শব ফেলিয়া রাখিলে তাহা যেমন সর্ব্ব-সাধারণের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়, তেমনি আমাদের শবসাধনার ক্ষেত্রে আজ শবটাই শুধু পচিয়া-গলিয়া জগতের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতেছে—সাধক কোথায়?

*

একজন প্রথিতনামা সাহিত্যিক মন্তব্য করিলেন, দেশে নারীর শিল্পচেষ্টাকে জাগ্রত করিতে হইবে, তা না হইলে আর জাতির মুক্তি নাই; বেদান্ত প্রচার দ্বারা কিছু হইবে না। কথাটা নূতন নয়; এই কথাই ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া নানা জনে নানা

ভাবে বলিতেছেন। দেশে যে স্বাধীনচিন্তার খরস্রোত বহিতেছে, ইহা বুঝি তাহারই পরিচয়। দেশের সাধারণ লোক এখনও বেদবেদান্তের নামে গতানুগতিক কায়দায় মূর্চ্ছা যায়; কাজেই যাঁহারা অসাধারণ, তাঁহারা অসাধারণ একটা কিছু বলিয়া মূর্চ্ছাভঙ্গের আয়োজন না করিলে শোভা পাইবে কেন? নারী-জাগরণ, শিল্পোন্নতি, কোনও কিছুই মন্দ নয়; কিন্তু তাহা করিতে গেলেই যে বেদান্তের গালে ঠোনা মারিতে হইবে, এই বা কেমন কথা? ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ একটা বিদ্বেষ ও তাচ্ছীল্যের ভাব প্রকাশ করা দেশহিতৈষণার একটা নূতন ফ্যাসান হইয়াছে। ইহা স্বাধীনচিন্তার ফল, এ কথা যদি কেহ মনে করেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের ধাত বুঝিতে পারেন নাই। ছোটবেলায় ইতিহাসে পড়িয়াছি, প্রকৃতির প্রতিকূলতা না থাকায় এবং অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য্য হেতু আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষেরা অন্য কোনও কাজ না পাইয়া অবিরাম গঞ্জিকায় দম মারিয়া কেবল বেদ-বেদান্তের ধূমোদ্গার করিয়া গিয়াছেন; এবং বড় হইয়া বেদান্ত-দর্শনের ইংরেজী ভাষ্যে পড়িয়াছি, জগৎটাকে মায়া বলিয়া আফিমের নেশায় বুঁদ হইয়া থাকাই বেদান্তের শিক্ষা! অপরিণত মস্তিষ্কে এই যে আজগুবি উপন্যাসের ছাপ পড়িয়াছে, ইহার প্রভাব যাইবে কোথায়? নিজেদের সম্বন্ধে আমরা কতখানি অজ্ঞ এবং এই বিরাট অজ্ঞতা সত্ত্বেও নির্ল্লজ্জভাবে মুরুব্বিয়ানা করিতে যে কতখানি অভ্যস্ত, তাহা ভাবিতে গেলে অবাক হইতে হয়। ছোটবেলা হইতে শুনিয়া আসিয়াছি—আমরা অর্দ্ধসভ্য জাতি, আমাদের চিন্তা-প্রণালী অবৈজ্ঞানিক, এবং মাত্র এই দেড়শ' বৎসর ধরিয়া শ্বেতদ্বীপের কল্যাণে আমরা একটু-আধটু করিয়া সভ্য ও বৈজ্ঞানিক হইতে শিখিতেছি! এই আত্মাবমাননা—এবং সে অবমাননাও পরের আরোপিত মিথ্যাপবাদ মাত্র—যাহাদের জাতীয় প্রগতির মূলধন, তাহাদের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ নহে।

*

ইউরোপের চিন্তাবীরেরা আজকাল ধর্ম্মের গলায় ফাঁসী পরাইবার আয়োজন করিতেছেন। বিজ্ঞান ও যুক্তির সঙ্গে খ্রীষ্টিয়ান্ থিওলজি মোটেই খাপ খাইতেছে না, তাই এই অসন্তোষের সৃষ্টি। স্কলাষ্টিক-যুগে বিশ্বাস আর যুক্তিতে যে সন্ধি হইয়াছিল, বহু পূর্ব্বেই রেনেসাঁসের প্লাবনে তাহার ভাঙ্গন ধরিয়াছিল; সেই ভাঙ্গন বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া সম্পূর্ণ হইল। জগতের বড় বড় সমস্যার সমাধান খৃষ্টধর্ম্মের দোহাই দিয়া হয় নাই, বরং মুখে খৃষ্টনীতিকে মানিয়া কাজে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াই আজ ইউরোপের এই উন্নতি—নিট্‌শে হইতে রাসেল পর্য্যন্ত সকলেই এই কথাই বলিতেছেন। ইউরোপের এই অসন্তোষ আমাদের মাঝেও দিন দিন ছড়াইয়া পড়িতেছে। কার্য্যকারণ বিচার না করিয়া আমরাও সুর ধরিয়াছি, ধর্ম্মকে বরখাস্ত না করিলে দেশের জড়ত্ব দূর হইবে না! ধর্ম্ম ঘাঁটিয়া এই কথা কেহ বলিলে মানাইত ভাল; কিন্তু এতখানি পরিশ্রম স্বীকার করিবার তো কোনও প্রয়োজন নাই। মৃত্যুভয়ে জর্জ্জরিত যে দেশ, অমৃতের বার্ত্তা ছাড়া সে দেশকে উদ্বুদ্ধ করিবে কে, তাহা তো বুঝিতে পারি না! আমরা তো জানি, মৃত্যুঞ্জয় হইবার সঙ্কেত যদি কেহ শিখাইতে পারে তো সে বেদান্ত। দেহাসক্তি দূর না করিয়া কে কবে কোথায় বড় হইতে পারিয়াছে? আর বেদান্তের প্রথম অভিযানই তো এই দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে। স্বদেশী-যুগের স্মৃতি যাঁহাদের হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় নাই, তাঁহারা বোধ হয় জানেন, গীতার গুটীকয়েক শ্লোকের অপব্যাখ্যা বিপ্লববাদীদের চিত্তকে

যেরূপ ধূমায়িত করিয়া তুলিয়াছিল, বাইবেলের বুলি আওড়াইয়া তাহা সম্ভবপর হইত না। দেশের নেতারা দেশের মঙ্গলের জন্য জাতিভেদ দূর করিতে চান, গুরু-শিষ্য ভাব দূর করিতে চান, পিতামাতার প্রতি বশ্যতা দূর করিতে চান। যদি বলি বেদান্তও এই সমস্ত দূর করিতে চান, তাহা হইলে সেটা চমকাইয়া উঠিবার মত কথা হইবে কি?—কিন্তু বেদান্ত এখানেই থামেন নাই—তিনি আরও অগ্রসর হইয়া গিয়া তোমার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য, হর্ষ শোক, বন্ধন-মুক্তি সমস্ত ভেদই যে ঘুচাইয়া দিতে চান—কেননা বেদান্তের সাম্য তো বিশেষ প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য সুবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা নয়, সে যে আত্ম-প্রত্যয়ের জ্বলন্ত অনুভূতির মুখোমুখী হওয়া! ইউরোপ আজ বেদান্তের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া খৃষ্টানীর মাথায় লাঠি মারিতেছে, দেখাদেখি আমাদের দেশের স্বাধীনতার নায়কেরাও বেদান্তের মাথায় লাঠি মারা সুরু করিয়াছেন! —এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় কখন? যখন একজন থাকে প্রভু, আর একজন হয় তার গোলাম। আমরা কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত, তাহাও বলিয়া দিতে হইবে কি?

*

আরও একটা কথা। একটা না একটা নেশা মানুষের চাই-ই, নতুবা সে কাজ করিতে পারে না। মদ-ভাঙের নেশাই যে একমাত্র নেশা তা নয়, মানুষের ভাবের নেশাও আছে। ধর্ম্মকেও যদি নেশার সামিল করিয়া নিই, তাহা হইলে বলিতে হয়, এই নেশা বোধ হয় জগতের সর্ব্ব-প্রাচীন, সার্ব্বভৌম এবং সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী নেশা। এ নেশা ছুটাইবার যত চেষ্টাই করা হউক না কেন, কিছুতেই ঘোর কাটিবার নয়। দুই-চারিটি কার্ল মার্ক্স অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে পারেন, কিন্তু নেশাখোরের সর্ব্বংসহ ধৈর্য্য তাহাতে টুটিবে না। যিনি চতুর, তিনি নেশার মৌতাত বজায় রাখিয়াই নেশাখোরকে দিয়া কাজ করাইয়া নেন। প্রমাণ মুসলমান মোল্লাদের ধর্ম্ম-নীতি। মোল্লারা খাঁটী বৈদান্তিক; কি করিয়া কাজ হাঁসিল করিতে হয়, তাহা বেশ বোঝেন। হিন্দুরাও যে এ চেষ্টা না করিয়াছে, তাহা নয়; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; দেখিয়া মনে হয়, অতি ঔদার্য্যে হিন্দুর নেশার ঘোর বোধ হয় কাটিয়া গিয়াছে। হিন্দুর ঠাকুরদেবতাদের লাঞ্ছনা কিছু কম হয় নাই; কিন্তু তাহাতে তাহাকে বিশেষ বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। যাঁহারা ধর্ম্মের উচ্ছেদ-কামী, তাঁহারা হয়ত হিন্দুর ধর্ম্মবোধ সম্বন্ধে এই অসাড়তা দেখিয়া দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হইবেন। আমাদের চিত্তে কিন্তু বিপরীত ভাবের উদয় হয়। নেশাই যাহাদের সম্বল, তাহারা যদি হঠাৎ নেশা করিবার ক্ষমতাটুকু হারাইয়া স্থাণু হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা আশঙ্কার কারণ হয় না কি? শঙ্করাচার্য্যের যা খাঁটী মত, তাহাতে নেশার কোনও বালাই নাই; কিন্তু সেই শঙ্কর যখন সর্ব্বসাধারণের মাঝে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছেন, তখন নেশার মাহাত্ম্য কোথাও বিস্মৃত হন নাই। একদিক দিয়া যেমন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া সকল নেশা ফুঁকিয়া দিয়াছেন, আর এক দিক দিয়া তেমনি নূতন হিন্দুয়ানীর নেশায় দেশকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছেন। দেব-দেবীর স্তোত্র রচিতে এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মুণ্ডপাত করিতে তাঁহার সমান উৎসাহ এবং নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, এইটুকু নেশার কাজ! আমাদের মনে হয়, হঠাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতিমাত্রায় ঔদার্য্য বীর্য্যের নিশানা না হইয়া ক্লীবত্বের নিশানাও তো হইতে পারে? বিশ্বাস ছিল, নিরীহ হিন্দুজাতি সব সহিবে, কিন্তু

ধর্ম্মের অপমান কখনো সহিবে না এবং এই কথা বলিয়া সে এতদিন অপরকে ধমকাইয়াও আসিয়াছে; কিন্তু কার্য্যকালে যখন দেখা গেল, ধর্ম্মের নিদারুণ অবমাননাতেও হিন্দুর বড় বিশেষ কিছু মাথাব্যথা হয় না এবং তাহার নেতৃবৃন্দও রাতারাতি ধর্ম্মসম্বন্ধে অত্যুদার হইয়া উঠেন, তখন সন্দেহ হয়, এ জাতটা বাঁচিয়া আছে, না মরিয়া গিয়াছে! ইউরোপ ধর্ম্মের নেশা ছাড়িয়া বিজ্ঞানের নেশা ধরিয়াছে; আমাদের সে বালাইও নাই! নেশাখোর মৌতাত ভুলিয়া গিয়াছে, ইহা জীবনের লক্ষণ—না মরণের?

*

দেশের রঙ্গমঞ্চে এক এক সময় দুর্ব্বোধ প্রহসনের অভিনয় হয়। জাতি-পাতি নিয়া আজকাল বেশ অভিনয় চলিতেছে। একটা কথা সকলেই স্বীকার করিয়া লইতেছেন, জাতি-ভেদ সকল অনিষ্টের গোড়া। এই হইল ন্যায়ের প্রথম অবয়ব। দ্বিতীয় অবয়ব, যেহেতু জাতি-ভেদ নীচুজাতকে নীচু করিয়া রাখিয়াছে, এবং উচুজাতকে উঁচু করিয়া রাখিয়াছে। আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া নৈয়ায়িক বলিতেছেন, অতএব নীচু জাতিকে উঁচু এবং উঁচু জাতিকে নীচু করিবার ব্যবস্থা করা হউক, তাহা হইলেই সাম্য হইবে। আজকাল বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনগুলি বোধ হয় এই সূত্র ধরিয়া চলিয়াছে। জাতিভেদ অনিষ্টকর, এই সূত্রের সমর্থন করিতে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সকল জাতিই উদগ্রীব। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে, জাতিভেদ সমর্থন করিতে একদিক দিয়া যেমন ব্রাহ্মণ-সভা গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য কায়স্থ-সমিতি, সাহা-সমিতি, তাম্বুলী-সমিতি, মাহিষ্য-সমিতি, নমঃশূদ্র-সমিতি ইত্যাদি বহু সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ অন্যান্য জাতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নাই, তাই এই সমস্ত উৎপীড়িত জাতি স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাদ্বারা ব্রাহ্মণ-প্রবর্ত্তিত জাতিভেদেরই প্রতিবাদ-কল্পে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে; ইহাই সম্ভবতঃ এই সব নবজাগরণের মূল কথা। এই সমস্ত সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠা যে প্রকারান্তরে জাতিভেদেরই প্রতিবাদ, তাহা আর এক কারণ হইতে অনুমিত হয়। যাঁহারা বিশেষ নাম উল্লেখ না করিয়া সরাসরিভাবে জাতিভেদের নিন্দা করেন, তাঁহারা আবার এই সমস্ত সমিতি প্রতিষ্ঠারও অনুমোদন করিয়া থাকেন দেখিতে পাই। প্রত্যেক জাতি নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টিত হইবে, স্ব-সম্প্রদায়ের সকলকে সংহত করিবে, এ তো খুব ভাল কথা; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা এজন্য সম্প্রদায়ের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের নিয়তি ভাবিয়া আমরা অবাক্ হইয়া যাই। এই সমস্ত জাতীয় সমিতিদ্বারা সার্ব্বভৌমভাবে জাতিভেদের প্রতিবাদ হইতেছে, না জাতীয় ভেদগুলি আরও দৃঢ় হইতেছে? এই সমস্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা হয়, তাহাতে অল্পাধিক পরিমাণে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ প্রকট হইতে দেখা যায়; সম্ভবতঃ সমাজ-সংস্কারকগণের কাছে ইহাই রুচিকর মনে হয় বলিয়া তাঁহারা এই সমস্ত সমিতিকে জাতিভেদের উচ্ছেদক ভাবিয়া খুসী হইয়া উঠেন। কিন্তু আসলে ইহাদের দ্বারা জাতীয় ভেদগুলি আরও পরিপুষ্টিলাভ করিতেছে না কি? যাঁহারা জাতিভেদের সার্ব্বভৌম উচ্ছেদকামনা করেন, তাঁহারা আবার এই সমস্ত জাতীয়সঙ্ঘের কি করিয়া সমর্থন করেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কোন কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় জাতিভেদ স্বীকার করেন না; তাঁহাদের সেই অস্বীকারের মাঝে সরল যুক্তি আছে। তাঁহারা যেখানে ভেদ স্বীকার করেন না, সেখানে কোনও প্রকার ভেদবুদ্ধিকেই

আমল দেন না। কিন্তু যাঁহারা জাতিভেদকে গালি দেন, অথচ খণ্ড খণ্ড জাতের গণ্ডী বেশ পোক্ত করিয়া তুলিতে সাহায্য করেন, তাঁহাদের বুদ্ধির মাঝে কোনও যুক্তি দেখিতে পাই না। অবশ্য জাতিভেদ আর ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ যদি একার্থক হয়, তাহা হইলে এই শেষোক্ত মত খুবই যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। মনে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিভেদ তুলিয়া দেওয়ার অর্থ এর চেয়ে বিশেষ ব্যাপক নয়। জাতিভেদ ভাল কি মন্দ, সে নিয়া আমরা কোনও কথাই বলিতেছি না, কিন্তু ঈর্ষ্যাপরায়ণ জাতির পক্ষে ভেদের গণ্ডী কাটিয়া উঠা যে কতখানি শক্ত, তাহাই ভাবিতেছি।

*

ধর্ম্মবোধ সম্বন্ধে রসজ্ঞতা বিষয়-বৈচিত্র্যের অনুধাবনে না অনুভূতির গভীরতায়, ইহা একটা সমস্যা। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ-কথামৃত যে বর্ত্তমান যুগের একখানি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ, এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকা সম্ভব নয়। অথচ এই কথামৃত সম্বন্ধেই বহুবার বহু ধর্ম্ম-পিপাসুর কাছে শুনিয়াছি, "ও একখণ্ড পড়লেই চারখণ্ড পড়ার কাজ হয়ে যায়—প্রথম-খণ্ডে যে কথা, শেষের খণ্ডগুলিতেও তাই—নতুন কিছু নাই।" একজন ধর্ম্ম-প্রবক্তার বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়াও আমরা অসঙ্কোচে মন্তব্য করিয়া বসি—"কই, নূতন কথা আর কি শোনা গেল?" ধর্ম্মকথা সম্বন্ধে আমাদের এই মনোভাবে যে পরিমাণ ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, সে পরিমাণ শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না। ধর্ম্ম যদি কথার কথা হইত, তাহা হইলে সেই কথায় বৈচিত্র্য না থাকিলে উহা বিস্বাদ লাগা সম্ভব এবং ক্ষমার্হ হইত। কিন্তু যাহা মুখের কথা নয়, অন্তরের অনুভূতি, তাহার মাঝে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বৈচিত্র্য খোঁজা কি নিষ্ঠার পরিচয়, না সিদ্ধির সঙ্কেত? কথামৃতের প্রথম খণ্ড পাঠের পর দ্বিতীয়-খণ্ডের একই কথার পুনরাবৃত্তিতে যাহারা সুখ পায় না, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, প্রথম খণ্ডের কয়টা কথাকে তাহারা অন্তরে অনুভব করিতে পারিয়াছে, কয়টা কথা তাহাদের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে? গীতা খুব বড় বই-ও নয়, পাঠান্তরও খুব বেশী নয়; তাহা সত্ত্বেও নিত্য গীতা-পাঠের রেওয়াজ আমাদের দেশে আছে। যাঁহারা নিয়মিত গীতা-পাঠী, তাঁহারা জানেন একই শ্লোক অবস্থাভেদে কত বিচিত্র অর্থের দ্যোতনা লইয়া পাঠকের মানসপটে ফুটিয়া ওঠে—"ও আর নূতন কথা কি" বলিয়া তাহাকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিবার জো নাই। যাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিত্যনূতন কথার ভক্ত, তাহাদের ধারণাশক্তি যে কত ক্ষীণ, চিত্ত যে কত উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়ায়, তাহা তাহারা নিজেরাই জানে না। প্রতিদিনই তো সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্ত হইতেছে; এই খেলাটুক দেখাইবার দরুণ প্রকৃতি গোটা-কয়েক রং আর থানকয়েক মেঘমাত্র পুঁজি করিয়া আসরে নামিয়াছেন; কিন্তু তবুও তো এই নিরাড়ম্বর চিরপুরাতন মায়ার খেলায় কবির মন নিত্যনূতন ভাবে বিভোর হইয়া যায়! জগতের বৃহত্তম সত্য ও সুন্দর ভাবগুলি চিরকাল এইরূপে অনাড়ম্বর মহিমায় বার বার আত্ম-প্রকাশ করিয়া আসিতেছে, তবুও তাহাদের আবির্ভাবের প্রয়োজন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না! নিজের মনকে নিয়া যাঁহারা নাড়া-চাড়া করেন, তাঁহারা জানেন, প্রাতিভ জ্ঞানের স্ফুরণে একটা ভাব যখন হৃদয়ে বিদ্যুতের মত চমকিয়া যায়, তখন সেই চপলাকে অচপল করিবার জন্য একই কথাকে কতবার আওড়াইয়া তবে তাহাকে মজ্জাগত করিতে হয়। বহিঃপ্রকৃতিতে একঘেয়ে ভাব অরুচিকর হইতে পারে, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিতে উহাই যে প্রয়োজন। দণ্ডে দণ্ডে নূতন কথা শুনিবার বায়না

ছাড়িয়া একটা কথাই যে তোমাকে বার বার শুনিতে হইবে, তবে সে কথার শক্তি প্রকট হইবে। প্রাচীনেরা এই সত্য জানিতেন বলিয়াই দেখিতে পাই হিন্দুর উপনিষদে, বুদ্ধের বাণীতে একই কথায় এত পুনরাবৃত্তি।

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

অভাব যেখানে, ঈর্ষা সেখানে। যে কারো মুখ চেয়ে চলে না, কারো সুখে সে অসুখী হবে না। অভাব নাই অর্থাৎ যার একান্ত কিছু চাইবার নাই।

*

যে অভাব আমাকে কেন্দ্র করে অনুভূত হচ্ছে, সেই অভাবকে সকলের হয়ে অনুভব করাই সহানুভূতি। প্রেমই সহানুভবের ব্যাপক; তবে প্রেম পূরণাত্মক, সহানুভূতি হরণাত্মক।

*

দুঃখকে আমরা স্বভাবতঃই পর করে রেখেছি। কিন্তু সব জায়গায় আপন গরজটাই বড় হবে কেন? সুখ চাই আপন গরজে—তার কাছে বিমুখ হতে আমাদের বাধে; তেমনি দুঃখ যখন আপন গরজেই আসছে, তাকেই বা বিমুখ করা কেন? মহত্ত্ব তো আর বায়না দিয়ে পাবার জিনিস নয় যে দামটা সময়মত চুকিয়ে দিলেই হবে! ক্ষণে ক্ষণে প্রতি কর্ম্মে তিল তিল করে আত্মত্যাগ—যে যত দুঃখ সইতে রাজী হবে, সে তত মহৎ হবে। সুবিধা বেছে চল্‌তে গেলে আখেরে ঠকে যেতে হয়।

*

কোন উচ্চ আশার কাছে নিজকে বেঁধে রাখ্‌তে চাই না—যতটুকুতে তিনি বেঁধেছেন, তাতেই যদি বুক ভরে ওঠে—তবে তাই কি আমার চরম ভাগ্য নয়? তাঁর মুখ চেয়ে তাঁর সোহাগের মায়াও যে এড়াতে হবে আমাকে—এই আমার গরব আর এই তাঁর গৌরব!

*

নিরহং অবস্থায় যা তোমাদ্বারা হয়ে যায়, তাই স্বাভাবিক, আর কর্ত্তা সেজে যা কর্‌তে যাও, তাই অস্বাভাবিক। একটী স্বধর্ম্ম, আর একটী পরধর্ম্ম; একটীর ফল শ্রেয়ঃ, শক্তি—অপরটীর ফল ভয়, দুর্ব্বলতা।

*

নির্ভরের এক অর্থ, পরের উপর নির্ভর না করা; আর এক অর্থ, যে অহংটী নিয়ে বিচার করে কূল পাচ্ছ না, ভেবে সারা হচ্ছ, পরের সঙ্গে এবং নিজের সঙ্গে চুলোচুলি করে মরছ, সেটীকে নিঃশেষে তাঁর পায়ে সঁপে দেওয়া।—নৈষ্কর্ম্ম্যও নয়, জড়তাও নয়। নির্ভর সত্ত্বশুদ্ধ চিত্তের সহজ অনুভূতি; নির্ভর হচ্ছে সকল শক্তির কেন্দ্র—অফুরন্ত সন্তোষ-স্বরূপ পরম প্রেমমধুর ভাবের নিয়ত আস্বাদন।

*

বুঝে ফেলাটা বুঝ্‌তে পাওয়ার বাধা। বুঝে ফেলেছি মনে করাটাই অহং। অহং যত কম্‌বে, জ্ঞান, স্ফূর্ত্তি তত বাড়্‌বে।

প্রবৃত্তিকে হঠাৎ সামলাতে না পার—একটু বিচারের বালি-কাঁকর মিশিয়ে দাও তাতে। ষোল আনা কর্ত্তৃত্ব জগতের সকলেই চায়—ঐটীতে বাধা ঘটালে প্রবৃত্তি আপনি পর্য্যুদস্ত হবে। তোমার ওপর কর্ত্তৃত্ব সবখানি তো তোমারই হওয়া উচিত—তাতে অপরে বাদ সাধতে পাবে কেন?

*

বাইরের কোন বিশেষণে মানুষকে বড় করে দেয় না—মানুষ যথার্থ বড় হয় ভিতরটা খাঁটী হলে। কাজেই চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়ে নিজ চেষ্টায় যখন আমরা বিশেষণ কেড়ে আন্তে যাই, তখন ভুল করি বইকি!

যদি মনে হয় জীবন অপূর্ণ থেকে গেল—তাতে আমার ক্ষতি কি? আমার অপূর্ণতা যখনি আমি দেখ্তে পেয়েছি, তখন থেকেই সে কুণ্ঠিত। কেননা আমি আর আমার জীবন তো এক জিনিষ নয়।

*

আনন্দ পেয়ে তাঁকে ভুলে যেতে নাই; অর্থাৎ অন্তরের আনন্দের একটী কেন্দ্র চাই, নইলে প্রণতি হয় না।

*

তুমি সেইখানেই খাঁটী—যেখানে কি তোমার কি অপরের, কারো উদ্বেগই তোমাতে এসে প্রশ্রয় পাচ্ছে না।

সংবাদ ও মন্তব্য

শ্রীশ্রী ঠাকুর মহারাজ বর্ত্তমানে পুরীধামেই অবস্থান করিতেছেন।

সংঘস্থিত গুরুভ্রাতৃগণের অবগতির জন্য জানাইতেছি, আগামী ভাদ্রমাসে ঝুলন-পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজের জন্মমহোৎসব কুতুবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে সার্ব্বভৌম ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। উৎসব সম্পর্কিত অন্যান্য কথা শ্রাবণের পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

শ্রীরুক্মিণীরঞ্জন আচার্য্য নামে জনৈক ব্যক্তি—"শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমের নাম করিয়া আকিয়াবে প্রচারও অর্থসংগ্রহাদি করিতেছেন। উক্ত রুক্মিণী-রঞ্জন বা তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রমের সহিত আমাদের মঠের বা আশ্রমগুলির কোনও সম্পর্ক নাই।

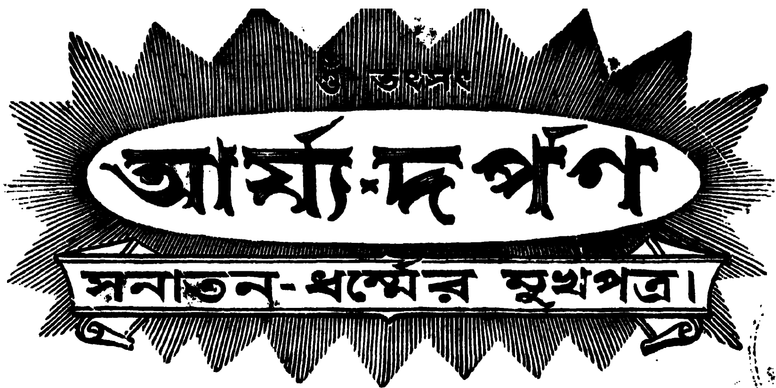
শ্রী অনন্তলাল বন্দোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবক মঠের সেবকশ্রেণীভুক্ত ছিল। সে স্বেচ্ছায় মঠ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহার সহিত আমাদের মঠের বা আশ্রমের কোনও সম্বন্ধ রহিল না।

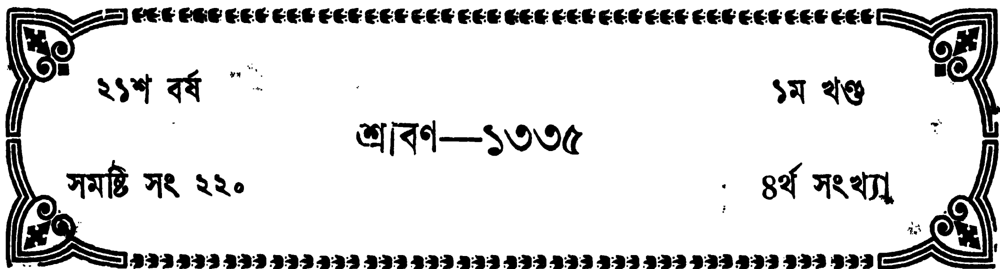
গ্রাহকগণ লক্ষ্য রাখিবেন, আর্য্য-দর্পণ এই বৎসর হইতে প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে প্রকাশ হইতেছে। পত্রিকার নিয়মাবলীর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রমে
দান-প্রাপ্তি

কোহিমায়—জনৈক হিতৈষী ১১২৲, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ বড়ুয়া ৫৲, শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবন্ধু বন্দোপাধ্যায় ২৲, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲, শ্রীযুক্ত অবনীশচন্দ্র দত্ত ২৲, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ২৲, খুচরা সংগৃহীত ৭।০।

গোলাঘাটে—শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস ১০৲, শ্রীসত্যদাস গোস্বামী শ্রীপরেশচন্দ্র ঘোষাল ৫৲, শ্রীমহেশচন্দ্র গুপ্ত ১।০; ডিমাপুরে—শ্রীনবকুমার দাস ৩।০, জনৈকা হিতৈষিণী ৸০; মণিপুরে—কতিপয় বন্ধু ৫৲; ময়নামতী সার্ভে-স্কুল—শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় ৬৲, রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, জনৈক ডাক্তার ১৲; জলপাইগুড়ি—জনৈকা হিতৈষিণী ৫৲, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র খাঁ ৬৲, শ্রীনিকুঞ্জলাল পাকড়াশী ৫৲, জনৈক হিতৈষী ২৲, শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র সেন ২৲, শ্রীদেবেশচন্দ্র ঘোষ ২৲, শ্রীমহরী লাল মুখোপাধ্যায় ২৲, রাজকাচারী হইতে ২৲, এক টাকা করিয়া খুচরা সংগৃহীত ৩৯৲; রংপুর—তাজহাট রাজষ্টেট্ হইতে ৫৲, মোহান্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী ২৲, এক টাকা করিয়া খুচরা সংগ্রহ ৫৲।





বৈশ্বানরায়

—*—

ঋগ্বেদ সংহিতা—৪।৫।৮-১৫

—*—

[বামদেব ঋষিঃ—অগ্নির্দেবতা—ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ]

প্রবাচ্যং বচসঃ কিং মে অস্য
গুহা হিতমুপ নিণিগ্ বদন্তি।
যদুস্রিয়ানামপ বারিব ব্রন্
পাতি প্রিয়ং রুপো অগ্রং পদং বেঃ

ইদমু ত্যন্মহি মহামনীকং
যদুস্রিয়া সচত পুর্ব্ব্যং গৌঃ।
ঋতস্য পদে অধি দীদ্যানং
গুহা রঘুষ্যদ্ রঘুযদ্ বিবেদ॥

কে তারে ঠেলিতে পারে, এই যাহা বলিনু বচন—
বলেছে তাহার কথা, যে অমিয়া ছিল সঙ্গোপন,
ক্ষীরধারা গো-মাতার ধারাসারে দুহিয়াছে তারা,
রূপসী ধরারে কেবা করিয়াছে সবাকার বাড়া!

এই সেই জ্যোতির্ঘন পুঞ্জীকৃত দেবের মহিমা,
ক্ষীরস্রাবী যজ্ঞধেনু পশিয়াছে যার পূর্ব্বসীমা;
ঋতের আসন জুড়ি সে রহস্য করে ঝলমল,
থর্ থর্ কাঁপে ওই, লঘুগতি—জেনেছি সকল।

অধ দ্যুতানঃ পিত্রোঃ সচাসা-
ঽমনুত গুহ্যং চারু পৃশ্নেঃ।
মাতুষ্পদে পরমে অন্তি যদ্ গো-
র্বৃষ্ণঃ শোচিষঃ প্রযতস্য জিহ্বা॥

দ্যুলোক-ভূলোক ছাপি দ্যুতি তার চৌদিকে ছড়ায়
ধেনুর রহস্য চারু আস্বাদিতে রসনা বাড়ায়,
গোমাতার পালানে যে সঙ্গোপন রহিয়াছে সুধা,
টের পেয়ে জ্যোতিষ্মান্ সংযমীর বাড়িয়াছে ক্ষুধা।

কা মর্য্যাদা বয়ুনা কদ্ধ বামম্
অচ্ছা গমেম রঘবো ন বাজং।
কদা নো দেবীরমৃতস্য পত্নীঃ
সূরো বর্ণেন ততনন্নুষাসঃ॥

কোথা সীমা, কি রহস্য, কেমন সে কামনার ধন?—
ছুটে যাব তারি পানে, রণে-মত্ত তুরঙ্গ যেমন!
অমৃতের পত্নী ঊষা আমাদের দিবেন প্রেরণা,
দীপ্তি তাঁর গোটা পথ আলোকিয়া ছড়াবে না সোণা?

ঋতং বোচে নমসা পৃচ্ছ্যমান-
স্তবাশসা জাতবেদো যদীদং।
ত্বমস্য ক্ষয়সি যদ্ধ বিশ্বং
দিবি যদু দ্রবিণং যৎ পৃথিব্যাম্॥

জিজ্ঞাসে যে তারে কহি সত্য কথা—করি নমস্কার!
তোমারি প্রসাদ সব, জান তুমি, যা কিছু আমার;
তুমিই মালিক এর, বিশ্বে যাহা সবার ঈশ্বর—
দ্যুলোকে যে ধন তারো—আরো যাহা পৃথিবীর 'পর।

অনিরেণ বচসা ফল্গ্বেন
প্রতীত্যেন কৃধুনাতৃপাসঃ।
অধা তে অগ্নে কিমিহা বদন্ত্য-
অনায়ুধাস অসতা সচতাম্॥

দেয় নাই হবিঃ যারা. মিছামিছি বলিয়াছে কথা,—
কে চায় সে কৃপণতা, তার মাঝে তৃপ্তি বল কোথা?
ঘিরেছে তোমারে দেখি, বৈশ্বানর!—এখানে কি বলে?
অনায়ুধ যোদ্ধা যত!—হেথা কেন?—যাক্ রসাতলে!

কিং নো অস্য দ্রবিণং কদ্ধ রত্নং
বি নো বোচো জাতবেদশ্চিকিত্বান্।
গুহাধ্বনঃ পরমং যন্নো অস্য
রেকু পদং ন নিদানাঃ অগন্ম॥

জ্ঞান সবি জাতবেদা, বল তবে আমাদের কাছে,
দিয়েছ যা, প্রতিদানে দিব হেন কিবা ধন আছে?
গোপন রহস্য যাহা এ পথের তাও বল প্রভু,
বহি শিরে নিন্দাভার, একা পথে চলি নাই কভু!

অস্য শ্রিয়ে সমিধানস্য বৃষ্ণো
বসোরনীকং দম আ রুরোচ।
রুশদ্বসানো সুদৃশীকরূপঃ
ক্ষিতির্ন রায়া পুরুবারো অদ্যৌৎ॥

সমিদ্ধিত কল্পতরু, যজমানে করুন কুশল!—
পুঞ্জীভূত তেজে তাঁর যজ্ঞভূমি করে ঝলমল!
আলোক-বসনে তাঁর ফোটে রূপ কিবা কমনীয়,
রত্নপ্রভা ধরা হেন শোভে দীপ্তি সর্ব্ব-বরণীয়!

পথ-নির্দ্দেশ

সৌরজগতে গ্রহ-উপগ্রহের সংখ্যা কিছু কম নয়; কিন্তু তাহাদের নিয়া বৈজ্ঞানিককে ভাবনায় পড়িতে হয় না। যত কিছু ভাবনা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে ধূমকেতুতে; ইহারা আইন মানে না, কানুন মানে না, বাঁধা রাস্তায় চলিতে জানে না—অদ্ভুত আকার এবং ততোধিক অদ্ভুত আচার লইয়া সৌরজগতে আসিয়া বিপ্লবের সৃষ্টি করে। মানুষের মাঝেও এমনিধারা ধূমকেতুর অসদ্ভাব নাই। ইহাদিগকে লইয়া ভব্য ব্যক্তির শান্তিতে দিন কাটানো কঠিন।

প্রথম প্রথম ভাবিয়াছিলাম, ধূমকেতু বুঝি দুইটা-একটা—কালে-ভদ্রে একবার দেখা দিতে আসিয়া পুচ্ছ দোলাইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু এখন দেখি, ধূমকেতুতে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে; বোধ হয়, আর দুদিন পরে সংখ্যায় ইহারা শান্ত-শিষ্ট গ্রহ-উপগ্রহদিগকেও ছাড়াইয়া যাইবে। সন্দেহ হইতেছে, ওই সমস্ত শান্তশিষ্ট গ্রহ-উপগ্রহের মাঝেও বুঝি একটা করিয়া ধূমকেতু স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে; কোন্‌দিন যে সে পুচ্ছ আন্দোলন করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে, তাহা কে জানে?

মানুষের কথাই বলিতেছি। দেখিতেছি, সুখ-শান্তি দিনের পর দিন মরীচিকার মত কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে; চারিদিকে বিক্ষোভ, সোর-গোলের অন্ত নাই। হঠাৎ যেন গোটা মানবজাতি-টাই ক্ষেপিয়া উঠিয়া পরস্পরকে দংশন করিয়া ফিরিতেছে। এই চ্যাঁচামিচি, ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি—ইহার লক্ষ্য কি? আমরা চাই কি?

এ কথার জবাব দিবার মানুষ দিন দিন দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে। ভগবান চাই, মুক্তি চাই, সিদ্ধি চাই—এইগুলি এতদিন আমাদের দেশের বড়-বড় বনিয়াদী চাওয়া ছিল বটে; কিন্তু আজ এই সমস্ত চাওয়ারও জাত যাইতে বসিয়াছে। কত উমেদারই দেখি;—কেউ রাজযোগের উমেদার, কেউ হঠযোগের উমেদার; কেউ চায় শবসাধন, কেউ চায় চিতাসাধন; হনুমান সাধনার আবদারও কেউ কেউ করে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, এই সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধনায় কোন্ প্রাংশুলভ্য ফলটা যে ইহাদের হাতে আসিয়া পড়িবে, সে কথা কেহই বলিতে পারে না। সাধনার আড়ম্বর আছে, কিন্তু সাধ্য যে কি, তাহা কেহই জানে না। শুধু ধর্ম্মসাধনার বেলাতেই নয়, সমস্ত সাধনার মূলেই ওই গলদ।

কেউ কেউ বলেন, এই যে উদ্দেশ্যহীন ছট্‌ফটানী এই তো প্রাণের পরিচয়; মানুষ তো জড়পদার্থ নয়. সে চুপ থাকিবে কি করিয়া?—আমি যখন দর্শকের আসনে স্থির হইয়া বসিয়া থাকি, তখন দেশজোড়া এই ছট্‌ফটানী দেখিতে বাস্তবিকই আমোদ লাগে; কিন্তু নিজকে ওই ঘূর্ণাবর্ত্তের মাঝে কল্পনা করিতে গেলে মেরুমজ্জা পর্য্যন্ত আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে!

লক্ষ্যহীন চর্চ্চাটা আজকাল আর্টের সামিল; যেখানে কোনও ডিজাইন্ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেইখানেই নাকি শিল্পপ্রতিভার চরম স্ফুরণ। এ কথা মানিয়া অন্তরের পিপাসা মিটিয়াছে না বাড়িয়াছে, তাহা বলা কঠিন। আমার তো মনে হয়, পিপাসা বাড়িয়াই চলিয়াছে; শেষ কোথায়, কে জানে?

এই বিক্ষোভ যে জীবের আদিম স্বভাবের প্রেরণা, তাহা স্বীকার করিতে আপত্তি নাই। কিন্তু মনে হয়, ইহাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া না মানিয়া

আমাদের দেশ ইহারই একটা সুসঙ্গত পরিণতি চাহিয়াছিল এবং পাইয়াও ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার এইখানেই তফাৎ। দর্শন-শাস্ত্র স্বাধীন-চিন্তার লীলাভূমি; প্রাচ্য দর্শনেও মতবৈচিত্র্যের অন্ত নাই; কিন্তু সে দর্শন কোনও লক্ষ্যহীন দর্শন নয়। লাভ-লোকসান না খতাইয়া আমাদের দেশের দার্শনিকেরা চিন্তার বাজে খরচ করিতে মোটেই রাজী নন। তাই প্রত্যেক দর্শনের গোড়ায় পাই একটা প্রয়োজন-সিদ্ধির কথা, পুরুষার্থের কথা। পাশ্চাত্য-দর্শনের মত শুধু আলোচনার সুখের জন্যই আলোচনা—ইহা আমাদের দেশে ধাতসহ হইয়া উঠে নাই।

কিন্তু আজ আমরা পুরুষার্থের কথা ভাবিতে ভুলিয়া যাইতেছি। কি চাই তাহা জানিনা, কেন চাই তাহা বুঝিনা—কিন্তু চাওয়ার আর বিরাম নাই।

সাধ্যের কথা ভুলিয়া শুধু সাধনের পিছনে ছুটাছুটী করিয়া যাহারা হয়রাণ হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে জেরা করিলে কখনও কখনও একটা সত্যিকার চাওয়া তাহাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। হয়ত কেউ বলে, কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না, আমি শান্তি চাই। কেউ বা বলে, মনটাকে কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছিনা, কি করিয়া মনস্থির হয়, তাহাই জানিতে চাই।

যোগ চাই, তপ চাই, মুক্তি চাই ইত্যাকার ভাসা-ভাসা চাওয়ার চেয়ে এই চাওয়া গোড়া-ঘেঁসা চাওয়া বটে। কিন্তু এই চাওয়ার যে জবাব, তাহা দিয়া তো মানুষকে খুসী করিতে পারা যায় না। "কিসে শান্তি পাওয়া যায়?"—জানি, এ প্রশ্নের যথার্থ কোনও জবাব নাই। "কিসে মন স্থির হয়?" —এ কথার উত্তর মানুষের মন দিতে পারে না, কেননা ইহার জবাব মানুষের মনে ধারণা করিতেও পারে না।

কেন জবাব হয় না, তাহার কারণ আছে। অজ্ঞাত রাজ্যের প্রশ্নকে জ্ঞাত রাজ্যের সীমায় নামাইয়া আনিলে তাহার রং বদলাইয়া যায়। আলো দিয়া অন্ধকার পরখ করা যায় না। যাহার জবাব তিলে তিলে মানুষের মাঝে গড়িয়া উঠে, কথার ফুৎকারে এক লহমায় তাহার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব।

অশান্তি, অস্থৈর্য্য কিছু তোমার হঠাৎ-সৃষ্টি নয়। অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তালগাছের শিকড়ের মত কাণ্ডটী বাড়িবার পূর্ব্বে তাহার শিকড় জীবনের গভীরতম স্তরে বাড়িয়া চলিয়াছে। একদিনে ইহার প্রতিকার অসম্ভব। সমস্তই আমারই কৃতকর্ম্মের ফল; আকস্মিক ঘটনাকে ইহার জন্য দায়ী করা বৃথা। যাহা পরিণত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছ, তাহার পেছনে কার্য্য-কারণের সুদীর্ঘ পরম্পরা বিদ্যমান। সেই-গুলিকে আয়ত্ত করিতে পারিলে তবে হয়ত আজিকার উদ্যত সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

মনের তত্ত্ব না জানিলে মনকে বশ করা যায় না, জীবনের তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিলে জীবনে শান্তি-লাভ করিবার চেষ্টা বৃথা। আত্মচিন্তা ভিন্ন কোনও সমস্যার মীমাংসা হয় না। আবার শুধু চিন্তাই নয়, চিন্তার অনুকূল আচারও চাই। আমাদের অস্বস্তির একটা প্রধান কারণ আচার-শৈথিল্য। জানি, আজকাল যুক্তির দোহাই দিয়া আচারকে নিরর্থক বলিয়া তিরস্কৃত করিবার একটা রেওয়াজ আসিয়াছে। যাহা কিছু করিব, তাহা বুঝিয়া সুঝিয়া করিব—ইহার মত বুদ্ধিমানের কথা আর নাই, তাহাও স্বীকার করি। কিন্তু বোঝা-পড়াকে অনন্ত কালের জন্য মুলতুবী রাখিয়া কাহারও সহিত আড়ি করিয়া বসা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের পরিচয় নয়। আমাদের হইয়াছে তাই। যাহারা বুঝিয়া-সুঝিয়া করিবার ধমক শোনায়, তাহাদের মাঝে অধিকাংশ চিত্তে স্থবির,

অথচ তাহাদের স্পর্দ্ধা অপরিসীম। কোনওরকম আয়াস স্বীকার করিতে তাহারা রাজী নয়, কাজের কথা পাড়িলেই তাহারা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া দায় এড়াইতে চায়। লক্ষ্যের প্রতি যে ইহাদের দৃষ্টি নাই, ইহা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য মনের সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া ভাসিত, তাহা হইলে তাহাকে লাভ করিবার জন্য কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট পথকে আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টাটাও ঐকান্তিক হইত এবং তখন বুঝিয়া-সুঝিয়া করিবার অজুহাতটাও সার্থক হইত। আচারকে প্রত্যাখ্যান করিবার হেতুস্বরূপ যে তেজস্বিতার অভিনয় করা হয়, অধিকাংশ স্থলেই তাহা একটা প্রকাণ্ড ফাঁক ছাড়া আর কিছুই নয়—নিজের কর্ম্মবিমুখীনতাকে আবৃত করিবার ইহা একটা সস্তা কৌশল মাত্র।

জ্ঞান এবং কর্ম্মে বিরোধ রাখিয়া জীবনে শান্তির সন্ধান করা বৃথা। নিজকে জানিতেও হইবে, নিজকে গড়িতেও হইবে—ইহা একান্তভাবে আমারই সাধনা, অপর কেহ ইহার মাঝে হস্তক্ষেপ করিলেও আমার বড় বিশেষ লাভ নাই। কিন্তু আমরা যখন পরমুখাপেক্ষী হই, তখন সকল বিষয়েই নিজকে আলগোছে সরাইয়া রাখিতে চাই। তাই এখানে সেখানে ছুটাছুটি করিয়া একে-তাকে ধরিয়া এমন অদ্ভুত আবদারও করিয়া বসি—কি করিয়া শান্তি পাই, তাহার একটা উপায় করিয়া দাও। যেন শান্তিলাভের একটা স্বপ্নলব্ধ মাদুলী কাহারও কাছে গচ্ছিত রহিয়াছে, কোনও রকমে সেইটা বাগাইয়া নিতে পারিলেই হয়! কেহ আসিয়া আবদার ধরিল, তুমি আমার মনটা ভাল করিয়া দাও।—যদি কোনও রোগ আরাম করিতেও বলিত, তাহা হইলেও না হয় একটা পথ ছিল, কিন্তু মনকে আরাম করা যায় কি করিয়া?—যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, মেকী তেজস্বিতা দিয়া একদল লোক কর্ম্মবিমুখীনতাকে ঢাকা দিবার চেষ্টা করে, তেমনি আর একদল কুঁড়ের বাদশা বনিতে চায় মেকী নির্ভরতা দেখাইয়া।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া একটা সুসমঞ্জস লক্ষ্যও আবিষ্কার করা চাই এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার দরুণ একটা কাজের ছকও চাই। তার পর কাজে লাগিয়া যাওয়া; ফলাফল ভগবানের হাতে। মনে হয়, এই কয়টা কথা রপ্ত হইয়া গেলেই বোধ হয় জীবনের বারো আনা ছটফটানী দূর হইয়া যায়।

অবান্তর লক্ষ্য অনেকই থাকে, তাহা নিয়া কথা হইতেছে না। অন্তর্জীবনে অবগাহন করিয়া এমন একটা ধ্রুববিন্দু আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া জগতের সমস্ত অবান্তর লক্ষ্যগুলিই আবর্ত্তিত হইতে পারে। এই ধ্রুববিন্দুটা কি?—জীবন-রসিকেরা বলেন, ইহা আত্মার তুষ্টি।—আত্মার তুষ্টি মিলিবে কি করিয়া?—জবাব হইতেছে, আত্মজ্ঞান দ্বারা।

আমি জগতের মাঝে নিরর্থক নই, প্রকৃতির একটা খেয়াল নই। আমার জন্মদিনেই বিশ্বের সঙ্গে একটা সন্ধিপত্রে আমার স্বাক্ষর হইয়া গিয়াছে। এই পত্রের পাঠোদ্ধার করাই আমার প্রাথমিক কর্ত্তব্য। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির দ্বন্দ্বে সঙ্কুল আমার জীবন; ইহাদের মাঝে সকলকেই আমি চিনি না, তাই জগতে আমার যথার্থ স্থানটী কোথায়, তাহাও স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। যখন যাহা চোখের সামনে বড় হইয়া ভাসিয়া উঠে, নিজের সামর্থ্য-অসামর্থ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তাহাতেই প্রমত্ত হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ি। কবিত্বের বীজ ভিতরে না থাকিলেও ছন্দকে খোঁড়া করিয়া কবিতা লিখি, হয়ত ভাবি,

কালিদাস, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আমিই বা কম কিসে?

অশান্তির বীজ এইখানে। নিজকে চিনিতে পারি না বলিয়াই জগতের সঙ্গে বনিবনাও হয় না, নিজের অন্তর্দ্দাহেরও নিবৃত্তি হয় না। এই জন্যই প্রয়োজন—আত্মানুশীলন। আমার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, শক্তি-অশক্তি, জাতি-কুল সব বিচার করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে, আমি কতটুকু, আমার দ্বারা কিই বা সম্ভব। প্রত্যেকের মাঝেই একটা সনাতন জাতিবীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; দার্শনিকেরা তাহাকে বুদ্ধি বা সত্ত্ব আখ্যা দিয়াছেন। এই বুদ্ধি বা সত্ত্ব আমার জন্ম-জন্মান্তরের ক্রমিক অভিব্যক্তির মূল আদর্শ। আমি যত চেষ্টাই করি না কেন, এই আদর্শকে অতিক্রম করিয়া একটা নূতন কিছু করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমার জাতি নিত্য। জীবে জীবে এইরূপ নিত্য জাতিভেদ বর্ত্তমান। এই জাতির আবিষ্কার করিতে পারিলে তবে মানুষ নিজের সম্বন্ধে যথার্থ নিশ্চিন্ত হইতে পারে।

সংঘর্ষ ছাড়া জীবনের বিকাশ হইতে পারে না। জাতিবীজকেও ফুটিয়া উঠিবার জন্য অহরহ পারিপার্শ্বিকের সহিত লড়াই করিতে হয়। বিভিন্নমুখী শক্তিতে আমাকে বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদিগের কাহাকেও আত্মসাৎ করিয়া, কাহাকেও বা নির্জ্জিত করিয়া আমাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে। এইজন্য জীবনে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। এই দ্বন্দ্বের ফল অধিকাংশের নিকট অনিশ্চিত বলিয়াই তাহারা সুখে-দুঃখে বা জয়-পরাজয়ে অতি অল্পেই অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া পড়ে। কিন্তু নিজের সত্ত্বতনুর পরিচয় লাভ করিতে পারিলে ফল সম্বন্ধে একটা দৃঢ়নিশ্চয়ের ভাব আসিয়া পড়ে, জীবনে তখন দ্বন্দ্বের অবসান হইয়া সামঞ্জস্যের আবির্ভাব ঘটে। তখন বাস্তবিকই দেখা যায়—আমার কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু নাই, অথচ কাজ আছে। এই দৃষ্টিতেই মানুষের সোয়াস্তি মিলে।

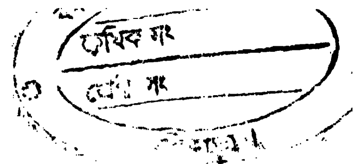
এই সামঞ্জস্য হইল অন্তর্জীবনের কথা। ভিতরে সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে আর বাহিরের জন্য ভাবনা হয় না। কিন্তু তবুও বাহিরের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিতে হয় বই কি। আমার কাছে আমি অপরূপ—এমনটী আর কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া ভার; আর এই অনির্ব্বচনীয় অপরূপত্বেই আমার পরম তৃপ্তি। কিন্তু বহির্জগৎ চায় একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়া আমাকে চিহ্নিত করিয়া লইতে, নতুবা আমাকে লইয়া তাহার ঘরকন্নায় পদে পদে বাধা ঘটিতে থাকে। তাই আবার যুগভেদে, বয়োভেদে, সমাজভেদে, দেশভেদে আমার এক একটা পেটেন্ট রূপ। হিন্দু যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা বলে, উহা বহির্জগতে মানুষের সার্ব্বভৌম ছাপ—Universal patent। মানুষকে গ্রূপ করিবার ইহাই বোধ হয় সব চেয়ে উদার মাপকাঠি। কিন্তু এই ধর্ম্মের মাঝেই মানুষের সমস্ত প্রগতি নিরুদ্ধ হইয়া যায় নাই। বাহিরের কতগুলি লক্ষণ মিলাইয়া কতকগুলি মানুষের একটা গ্রূপ সৃষ্টি করিতে পারিলেই মানুষের চরম পরিচয় দেওয়া হইল না। তাই এই অত্যুদার বর্ণাশ্রমধর্ম্মের শ্রেণীবিভাগের মাঝেও মানুষকে নিজের আত্মগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য একটু ঠাঁই করিয়া লইতে হয়। ইহাকেই গীতাকার স্বধর্ম্ম আখ্যা দিয়াছেন। এই স্বধর্ম্ম বর্ণাশ্রমধর্ম্মেরও উপরে।

এই স্বধর্ম্মের স্বরূপ ও অধিকার না বুঝিতে পারিয়াই বর্ত্তমান যুগে আমরা অশান্তির সৃষ্টি করিতেছি। একশ্রেণীর লোক স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে অচেতন; বর্ণাশ্রমের পেটেন্ট মার্কাটাকেই একান্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহারা অসামঞ্জস্যের পীড়ায় নিজেরাও দুঃখ পাইতেছে, অপরকেও দুঃখ

দিতেছে। আবার একশ্রেণীর লোক স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যধিক মুখর; স্বধর্ম্মের মাঝে যে একটী স্নিগ্ধ ঔদার্য্যের ভাব রহিয়াছে, যাহা বিরোধকে আঘাত করে না, অনায়াসে তাহা অতিক্রম করে—সেই প্রশান্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া উগ্র মনোবেগকেই স্বধর্ম্ম ভাবিয়া স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা ব্যাকুল। এই দুই শ্রেণীর মানুষই, যোগভ্রষ্ট, অনাচারী, কোথায়ও বা অত্যাচারী এবং অশান্ত।

আমারও একটা ধর্ম্ম আছে, আবার জগতেরও একটা ধর্ম্ম আছে। উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। নিজকে না চিনিতে পারিলে, আত্মানুশীলন ও আত্মানুসন্ধান না করিলে এই সামঞ্জস্য ঘটানো অসম্ভব। আত্মজ্ঞান জীবনের ভিত্তি। ইহাকে উপযুক্ত আচারে বা কর্ম্মে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই পথ।

সওয়াল-জবাব



[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনেকগুলো সওয়ালজবাব রাম ছেড়ে যাচ্ছেন এখন, অন্য সময় না হয় সেগুলোর আলোচনা করা যাবে।

আর একটা প্রশ্ন, "রাজনৈতিক হিসাবে ভারতবর্ষের এই দুরবস্থা কেন?" লোকে বলে, বেদান্ত ধর্ম্মেই ভারতবর্ষের এই অধঃপতন ঘটিয়েছে। মোটেই তা নয়। বরং বেদান্তের অভাবেই ভারতবর্ষের এই দুর্দ্দশা। জানই তো, রাম বলেন, তিনি সব দেশের মানুষ। রাম তো হিন্দু বা ভারতবাসী বা বৈদান্তিকরূপে তোমাদের কাছে আসেন নি। রাম এসেছেন রাম হয়ে—অর্থাৎ সর্ব্বময় বিভু হয়ে। রাম তোমাদের তোষামোদ করতে চান না, ভারতবর্ষেরও না। রাম ভারতের বা আমেরিকার বা অন্য কিছুর জিম্মাদার হয়ে আসেন নি; তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে সত্য—পূর্ণ সত্য। এই সত্যের ভূমিতে দাঁড়িয়েই তাঁর যা কিছু বলবার তিনি বলেন।

সত্য কথা হচ্ছে এই, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের জনসাধারণের মাঝে বেদান্তের প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল, ততদিন ভারতেরও গৌরবের দিন ছিল। ভারতবর্ষ তখন সবার মাথার মণি, তার সমৃদ্ধির অন্ত নাই। তারপর একটা যুগ এল, বেদান্ত গিয়ে বন্দী হল একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের হাতে, জনসাধারণের মাঝে তার প্রচার রুদ্ধ হয়ে গেল; তারপর থেকেই ভারতবর্ষের পতন! বেদান্তকে আর সর্ব্বসাধারণের আসরে নামতে দেওয়া হত না। জনসাধারণে ধর্ম্ম-বিশ্বাস তখন দাঁড়াল এই—"আমি গোলাম, আমি গোলাম—হে ভগবান, আমি তোমার গোলাম।" এ ধর্ম্ম কিন্তু ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আমদানী হয়েছে। তথাকথিত ঐতিহাসিক

আর দার্শনিকের দল কথাটা শুনলে চমকে উঠবে হয়ত, ইউরোপবাসীরা অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু রাম না ভেবে-চিন্তে এ কথা বলছেন না। এ কথা প্রমাণ করা যায়, গণিতের মত অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায়। যে ধর্ম্মে নিজকে অশ্রদ্ধা করতে শেখায়, যে ধর্ম্মে লোককে বলায়, "আমি কীট, আমি অধম, আমি পাপী"—সে ধর্ম্ম আমদানী হয়েছে ইউরোপ থেকে। আর যখন থেকে এই ধর্ম্ম ভারতের গণধর্ম্ম হল, তখন থেকেই ভারতবর্ষের পতন হল।

আর ইউরোপ এবং আমেরিকার কি হল? তারও তো গোলামীর উপাসক, তারাও তো বলে, "হে ভগবান, আমরা তোমার দাস!" তাহলে ভারতবর্ষ রাষ্ট্রে এবং সমাজে যে এত হীন, ইউরোপ বা আমেরিকা তেমন হীন নয় কেন? অভিব্যক্তিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে একটা গল্প বলেন, তা থেকে কথাটা বোঝান যেতে পারে। তাঁরা বলেন, অযোগ্যতাই অনেক সময়ে জীবনযুদ্ধে জয়ের কারণ হতে পারে; সব সময় যোগ্যতমেরই যে উদ্বর্ত্তন হবে, এমন কোনও কথা নাই।—ওম্!

কতকগুলি পতঙ্গ একদিকে উড়ে যাচ্ছিল। তাদের মাঝে কতক পাখা খসে পড়ে গেল, বাকীগুলি অক্ষত শরীরে চলতে লাগল। যেতে যেতে পাহাড়ের ওপর একটা আগুনের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা মারা গেল। এখানে যারা দুর্ব্বল তারাই বেঁচে গেল, আর যারা ছিল সবল, তারাই মারা গেল।

ভারতবাসীরা একটা কথা যখন বলে, তখন সেটাকে যথাযথই বলে। তারা অকপট। ধর্ম্মকে তারা সর্ব্বস্ব বলে জানে। তাই প্রার্থনায় যখন তারা বলে,"হে হরি, আমি তোমার গোলাম, হে হরি আমি অধম, আমি মহাপাপী", তখন তারা মন-মুখ এক করেই কথাটা বলে। ভারতের গণশক্তি যখন গোলামীর ভাবনায় তন্ময় হয়ে গেল, তখন তারা অকপটভাবেই এই প্রার্থনা করেছিল। কাজেই কর্ম্মের নিষ্ঠুর, অখণ্ডনীয় বিধানের বশে তাদের বাসনাও পূর্ণ হল। তারা একেবারে আস্ত গোলামই বনে গেল।

তাদের গোলাম বানাল কে? বলবে, ভগবানই তাদের গোলাম বানিয়েছেন। ভগবানের কি কোনও আকার আছে? নিরাকার ভগবান্ তো আর আসেন নি ভারতবর্ষের ওপর প্রভুত্ব করতে! ভগবান এলেন বটে, কিন্তু কোন ভগবান? যিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ, যিনি গোরা! গোরা ইংরাজরূপ ধারণ করে তোমাদের গোলাম বানিয়েয়েছেন। এই হচ্ছে ব্যাপার। খৃষ্টানীকে ভুল বুঝেছ বলেই আজ তোমাদের এই অবস্থা।

একবার ভারতবর্ষে গিয়ে সেখানকার হালচাল বুঝে এস, তাহলে রামের কথায় তোমাদের প্রত্যয় হবে। আর আর স্বামীরা বা সাধুরা তোমাদের যা শোনান, শুধু তাই যদি তুমি বিশ্বাস কর, তাহলে ভুল হবে। ভারতের অধঃপতনের কারণই হচ্ছে বেদান্তের অভাব। গোলামীর ধর্ম্মে ইউরোপকে গোলাম বানায় নি কেন? ইউরোপ ধর্ম্মের চেয়ে ধনের কদর করে বেশী। আগেই তোমাদের বলেছি, ইউরোপের ধর্ম্মে ভগবান একটা ফাউ; তাঁকে দরকার ঘর ঝাঁট দেওয়ার দরুণ। ধর্ম্ম হচ্ছে বৈঠকখানার আসবাব বা ছবি। ইউরোপের অন্তর থেকে যে প্রার্থনা জাগছে, তা গোলামীর প্রার্থনা নয় --ধন-কনক-কান্তার প্রার্থনা। তাই তাদের এই উন্নতি। এটা কর্ম্মেরই বিপাক। ইতিহাস বলছে, যতদিন বেদান্ত ভারতের গণধর্ম্ম ছিল, ততদিন তার সমৃদ্ধির অন্ত ছিল না।

এক সময় ফিনিসীয়েরা মহাপরাক্রমী ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করবার সাহস তাদের হয়নি। মিশর খুব উচুঁতে উঠেছিল, কিন্তু ভারতবর্ষকে নামাতে পারেনি। পারস্য এক সময় রাজচক্রবর্ত্তী হয়েছিল, কিন্তু ভারতের দিকে বক্রকটাক্ষ করবার সামর্থ্য তার হয়নি। রোমের ঈগল-পতাকা বল্‌তে গেলে সমস্ত জগতের ওপর ডানা মেলেছিল, কিন্তু ভারতকে নমিত করবার স্পর্দ্ধা তার হয়নি। শত শত বৎসর ধরে গ্রীক-জাতি মহাশক্তিশালী ছিল, কিন্তু ভারতের দিকে তারা কুনজর দিতে পারেনি। তারপর এল আলেকজাণ্ডার নামে এক রাজা—লোকে মিছামিছি তাকে "আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট্" বলে। তখনও বেদান্তের ভাব সর্ব্বসাধারণের মজ্জাগত ছিল, বেদান্ত-ধর্ম্ম হতে ভারতের গণ-শক্তি তখনো বিচ্যুত হয়নি। আলেকজাণ্ডার ভারতে যাওয়ার পূর্ব্বে সমগ্র জগৎ জয় করেছিলেন। মহাপরাক্রমী আলেকজাণ্ডার এলেন ভারত জয় করতে, পারস্য-বাহিনী তাঁর সহায়, ঈজিপ্টের সেনা তাঁর অনুবর্ত্তী। কিন্তু ভারতে এসে পুরু নামে একজন ক্ষুদে রাজার কাছে তিনি খতমত খেয়ে গেলেন। এই ভারতীয় নরপতি "মহামহিম" আলেকজাণ্ডারকে হেঁট্ করে দিলেন, বাহিনী নিয়ে তাঁকে বিদায় হতে হল। তাঁর সমস্ত সেনা পর্য্যুদস্ত হয়ে গেল, তিনি পিছু হটতে বাধ্য হলেন। কেমন করে এ সম্ভব হল? তখন ভারতের জনসাধারণের মাঝে বেদান্তের প্রভাব জাগ্রৎ ছিল। তার প্রমাণ চাও কি? তাহলে তখনকার গ্রীকরা ভারতবর্ষের কি বিবরণ রেখে গেছে, যারা আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে এসেছিল তারা কি বলে গেছে, তা পড়ে দেখো। দেখো ভারতবাসী তখন কেজো বৈদান্তিক ছিল, তাই তার শক্তিও ছিল; আলেকজাণ্ডারকে তাই হটতে হয়েছিল।

তার পরের যুগে গজনীর মামুদ বলে এক নগণ্য দস্যু এসে ১৭ বার ভারত লুটে নিয়েছে; ১৭ বার সে ভারতে এসে যা কিছু পেয়েছে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে। তখনকার জাতীয় ইতিহাস পড়ে দেখো, দেখবে, সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম একেবারে বেদান্তের বিপরীত। বেদান্ত তখনও চল্‌তী—কিন্তু বাছা বাছা দু'চার জন লোকের মাঝে। সাধারণে তার চর্চ্চা ছেড়ে দিয়েছে—তাই ভারতের এই দুর্দ্দশা।

লোকে বলে, তুমি তো ত্যাগধর্ম্মের মহিমা গেয়ে বেড়াও, ত্যাগে না মানুষকে দুর্ব্বল করে! —কে বল্‌লে? সত্য বটে, বেদান্তের সত্য উপলব্ধি করতে হলে বনে যেতে হবে, হিমালয়ের গভীর দেশে যেতে হবে; কিন্তু তা বলে বেদান্ত কখনো এমন কথা বলে না যে তোমাকে তার দরুণ চিরজীবন তপস্বী থাকতে হবে।—কিছুতেই নয়। বনে যাওয়াটা হচ্ছে ছাত্রদের কলেজে যাওয়ার মত। একটা বিজ্ঞান বা দর্শন অধ্যয়ন করতে হলে তোমাকে নির্জ্জন খুঁজতে হয় না? যেখানে কোনও সোরগোল থাকে না, এমন জায়গায় যেতে হয় না? তোমাকে পড়া-শোনার দরুণ এমন জায়গা বেছে নিতে হয়, যেখানে নীরবে, একান্তে আপন কাজ নিয়ে থাকতে পার। ভারতবাসী যদি বনে যায় তো এই জন্য যে সেখানে একান্তে যাতে সর্ব্ববিদ্যার সার বেদান্তের তত্ত্বকে অধিগত করতে পারে। জানই তো, বেদান্ত ধাতু-বিদ্যার মতই পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান। ধাতু-বিদ্যায় পরীক্ষা না করে এক পা এগুবার উপায় নাই। তেমনি যে বুদ্ধিদ্বারা বেদান্ত-জ্ঞান আহরণ করেছে, সে যদি হাতে-কলমে তার পরীক্ষা না করে, তাহলে বেদান্তের সে কি জেনেছে? পরীক্ষার দ্বারা বুদ্ধিগত জ্ঞানকে যাচাই করে নেবার জন্যই বনে যাওয়া।

বন হল যেন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ। এই কলেজে বেদান্ত শিখে তারা জগতে এসে তা প্রচার করে, দৈনন্দিন-জীবনে তাকে ব্যবহারে লাগায়, কি করে মানুষ বেদান্তকে কাজে লাগাতে পারে সকলকে তার হদিশ বলে দেয়। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-সন্তানকে বা হিন্দুকে অন্ততঃ পাঁচ বছর বনে থেকে এই জ্ঞান অর্জ্জন করতে হত, আর তা অর্জ্জন করে আবার লোক সমাজে এসে প্রচার করতে হত; কাউকে কাউকে সংসার-ধর্ম্মও গ্রহণ করতে হত। বেদান্ত-জ্ঞান লাভ করে সবাইকে সন্ন্যাসী হতে হবে, এমন কোনও কথা নাই। এই যেমন কত ছাত্রই তো দর্শনে-বিজ্ঞানে এম্-এ পাশ করে, কিন্তু তা বলে সবাই কি অধ্যাপক হয়? কেউ হয়ত ম্যাজিষ্ট্রেট হয়, কেউ ব্যবসা করে, আবার কেউ অধ্যাপকও হয়।

যদি বেদান্তজ্ঞান অধিগত হয় তো সমস্ত জগৎ-টাই তোমার কাছে স্বর্গের নন্দন-কানন হয়ে যাবে; তখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার লীলা-নিকেতন, জীবন একটা আস্বাদন করবার মত জিনিষ। যারা বলে বৈদান্তিক হতে হলেই তপস্বী হতে হয়, তারা বেদান্তকে অপরের কাছে বিকৃত করে প্রচার করে। ও কথা মোটেই সত্য নয়। যাঁরা বাইরেও সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করেন, তাঁরা যেন এম-এ পাশ করে আচার্য্যের পদ নিলেন বলা যেতে পারে।

এমনও তো দৃষ্টান্ত রয়েছে, বিষয়কর্ম্মে যারা লিপ্ত, এমন ব্যক্তিরাও বেদান্ত প্রচার করছেন। বেদান্ত দুঃখবাদ নয়। যারা বলে বেদান্তে কেবল দুঃখের বার্ত্তা, তারা বেদান্তকে ভুল বোঝায়। ও সব বাজে কথা, বেদান্ত সুখবাদের চরম আদর্শ।

বেদান্ত এই বলেন, সংসারসমুদ্রে এই যে দেহ-তরীকে ভাসিয়েছ—না আছে তার হাল, না আছে পাল, না আছে তার কম্পাস, না আছে তার বাষ্প বা বিদ্যুৎ; এতে তো নৌকাডুবি হবেই, কারণ তুমি যে ঝড়-জলের খপ্পরে! বেদান্ত বলেন, জগতে এত দুঃখদৈন্য কেন জান?—অবিদ্যার দরুণ। অবিদ্যাই একমাত্র পাপ। অবিদ্যাই তোমার সকল দৈন্যের হেতু। যতক্ষণ তুমি অবিদ্যাগ্রস্ত ততক্ষণই তোমার দুঃখ। যদি অবিদ্যা দূর করে জ্ঞান লাভ করতে পার, আত্মজ্ঞানী হতে পার, তাহলে এই ভবকারাই তোমার কাছে নন্দন-কানন হয়ে যাবে, জীবন সুখের হবে, তাতে অস্বস্তি থাকবে না, খুঁৎ-খুঁতি থাকবে না, বেতালে পা পড়বে না, চিত্তস্থৈর্য্য নষ্ট হবে না, ঘাড় ভেঙ্গে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকত হবে না। এটা কি তোমার কাম্য নয়? এই কি সত্য নয়? এই বেদান্ত কি দুঃখবাদ? বেদান্ত বলছেন—"জীব, জগৎকে যে তুমি নরক করে তুললে! জ্ঞান অর্জ্জন কর—জ্ঞান অর্জ্জন কর!" এই হচ্ছে বেদান্তের ধর্ম্ম, দুঃখবাদ এ মোটেই নয়!

আবার দেখ, এই বেদান্ত যাঁরা প্রচার করেছেন, তাঁরা সংসারে ছিলেন, কৃচ্ছ্র তপস্বী তাঁরা মোটেই ছিলেন না, অথচ তাঁরা সবাই ছিলেন ত্যাগী।

একবার ভারতবর্ষের এক রাজা সংসারধর্ম্ম ছেড়ে বনে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাঁর গুরু—তিনি এই দেহেরই পূর্ব্বপুরুষ, তাঁকে এই বেদান্তের উপদেশ দিতে লাগলেন। ত্যাগের মর্ম্মরহস্য আয়ত্ত করে এবং যথার্থ ত্যাগী হয়ে রাজা শেষকালে একজন মহাবিক্রমী নরপতিরূপে রাজ্য পালন করেছিলেন।

অর্জ্জুন একজন মহা যোদ্ধা; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তিনিই প্রধান নায়ক। তিনিও সংসার-কর্ত্তব্য ছাড়বার জোগাড় করেছিলেন। তাঁর কর্ত্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ করা; কিন্তু যুদ্ধ ছেড়ে তিনি তপস্বী হতে চেয়েছিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁর কাছে বেদান্ত ব্যাখ্যা সুরু করলেন। বেদান্তের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম

করে অর্জ্জুনের লুপ্ত শৌর্য্য আবার ফিরে এল, তাঁর মাঝে তেজ ও শক্তি সঞ্চারিত হয়ে প্রাণবন্ত কর্ম্মশক্তি স্ফুরিত হয়ে উঠল—তিনি সিংহবিক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে মহাশূরের খ্যাতি লাভ করলেন।

বেদান্ত তোমায় দেয় শক্তি ও তেজ—দুর্ব্বলতা আনবে কেন? বেদে এক জায়গায় আছে, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—যে দুর্ব্বল সে কখনো আত্মাকে লাভ করতে পারে না। বেদান্ত দুর্ব্বলের ধর্ম্ম নয়; যারা হৃদয়ে দুর্ব্বল, দেহে দুর্ব্বল, প্রাণে দুর্ব্বল, তারা কখনো বৈদান্ত-জ্ঞান অধিগত করতে পারে না।

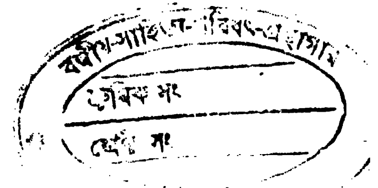
এক রাজা রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়েছিলেন আত্মজ্ঞান লাভ করতে। আত্মজ্ঞান লাভ করে আবার তিনি সংসারে ফিরে এসে রাজ্যাধিকার গ্রহণ করলেন। এই জ্ঞানলাভের পরেই বাস্তবিক তিনি রাজসিংহাসনের শোভা বর্দ্ধন করেছিলেন, তার পূর্ব্বে নয়।

ত্যাগ অর্থ যদি কৃচ্ছ্রসাধন না হয়, তাহলে ত্যাগ কি? অতি গুরুতর প্রসঙ্গ। আর এক সময় এর আলোচনা করা যাবে।

হিন্দুশাস্ত্রের এই একটী কথা। কেউ কেউ বলে হিন্দুরা মাংস খায় না, কেননা তারা ভাবে ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন। হিন্দুরা মাংস খায় না বটে, বৈদান্তিক মাংশাসী জীব নয় বটে, কিন্তু তার কারণ যা বললে তা নয়। এর অন্য হেতু আছে। এখন সে সব আলোচনা করবার আর সময় হবে না।

কঠোপনিষদে একটা কথা আছে—অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়—

"যে হত্যা করে সে যদি মনে করে, আমি মেরেছি আর যাকে হত্যা করে, সেও যদি ভাবে, আমি মরেছি, তাহলে দুজনের কেউ আসল কথা জানে না। আত্মা কাউকে মারেনও না, মরেনও না।" (সমাপ্ত)



ভারতীয় দর্শন

—(*)—

ভারতবর্ষে আস্তিক-দর্শন ছয়টী। ছয়টী দর্শনকে তিনটী প্রস্থানে ভাগ করা হইয়াছে—ন্যায়প্রস্থান, সাংখ্যপ্রস্থান ও মীমাংসা প্রস্থান। ন্যায়প্রস্থানে গৌতমের ন্যায় ও কণাদের বৈশেষিক, সাংখ্যপ্রস্থানে কপিলের সাংখ্য ও পতঞ্জলির যোগ এবং মীমাংসাপ্রস্থানে জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা ও ব্যাসের উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। এই ছয়টী দর্শনের কথা জানিলেই ভারতীয় চিন্তাধারার সমগ্ররূপ জানা যায় না। বৌদ্ধ দর্শন ও জৈন-দর্শন না জানিলে ভারতীয় দর্শনের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কেহ কেহ ছয়টী আস্তিক দর্শনের পাশে ছয়টী নাস্তিক দর্শনের কল্পনা করিয়াছেন। ছয়টী নাস্তিক দর্শন এই—চার্ব্বাক-দর্শন, চারিটী বৌদ্ধ-দর্শন (মাধ্যমিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও বৈভাসিক) এবং আর্হত বা জৈন দর্শন। ইহা ছাড়া মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে আরও কয়েকটী প্রতিষ্ঠিত দর্শনের বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই ভারতীয় দর্শনের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ হই-

য়াছে বলা যায় না। আস্তিক মতাবলম্বীরা দৈব-মীমাংসা বলিয়া একটী তৃতীয় মীমাংসার কথা বলিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-দর্শনও ভারতীয় চিন্তা-জগতের নিতান্ত কম জায়গা জুড়িয়া নাই। এই বিভাগে বাঙ্গালীর কৃতিত্বও অসাধারণ। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের দ্বারা প্রাচীনকালে ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে কত দার্শনিক মতবাদের যে প্রচার হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রণিধান করিয়া দেখিলে বোঝা যায়, অতি আধুনিক কালেও দর্শন উদ্ভাবনের বিরাম হয় নাই; বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষে নূতন নূতন চিন্তাধারা দিন দিন উন্মেষিত হইতেছে। তবে হয়ত তাহাদের ইতিহাস রাখিবার প্রয়োজন এখনও উপস্থিত হয় নাই।

গোড়ায় আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন বলিয়া দুইটী ভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই দুইটী নামকরণের একটু তাৎপর্য্য আছে। যে সমস্ত দর্শন বেদকে ভিত্তি করিয়া রচিত বলিয়া প্রকাশ, তাহারাই আস্তিক দর্শন; আর যে সমস্ত দর্শন স্পষ্টতঃ বেদবাহ্য, তাহারাই সাধারণতঃ নাস্তিক বলিয়া কথিত। এই ভেদকল্পনা কতক পরিমাণে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব হইতে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ন্যায়প্রস্থানের দুইটী দর্শনেই বেদের প্রসঙ্গ অতি সামান্য। মধ্যযুগে যখন বৌদ্ধ-দর্শনের সহিত হিন্দুদর্শনের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন ন্যায়দর্শন বেদরক্ষার ব্রত লইয়া বিশেষ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রঙ্গপীঠে আবির্ভূত হয়। ব্যাখ্যাকারেরা তখন একেবারে বেদের গোঁড়া। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ন্যায়ের প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি অতি সামান্যভাবেই বৈদিক চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়াছে। বৈশেষিক দর্শন আপ্তপ্রমাণই স্বীকার করে না, অথচ তাহাও বৈদিক! সাংখ্যের তত্ত্ব বেদে, উপনিষদে, পুরাণে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে, পাতঞ্জল সাংখ্যেরই অনুসরণ করিতেছে। সুতরাং সাংখ্য-দর্শন নিরীশ্বর হইয়াও বেদদ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে আটকায় নাই। অথচ যে বৌদ্ধদর্শনের সহিত সাংখ্যের, পাতঞ্জলের ও ন্যায়ের এত ঘনিষ্ঠতা, যে নির্ব্বাণ বৈদান্তিকের ও বৌদ্ধের সাধারণ সম্পত্তি, তাহা অবৈদিক! ইহা রহস্য বটে।

কিন্তু এই রহস্যের পেছনে একটা অতি অদ্ভুত অথচ অতি সত্য মনোভাবের প্রেরণা রহিয়াছে। হিন্দুর মাঝে জাতীয়তার বীজ নাই, এই কথাই শুনিতে পাই। কথাটা সত্য কিনা জানি না। জাতীয়তা বলিতে ইহাই বুঝি মানুষ এমন একটা অতীন্দ্রিয় সত্তাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, যেখানে আঘাত করিলে তাহার সমষ্টি চেতনা বেদনার সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। ব্রিটনের নাম করিতে ইংরেজের বুক ফুলিয়া উঠে; ইসলামের নামে মুসলমানের রক্তস্রোত খরতর হইয়া বহিতে থাকে। তেমনি বেদ বলিতে হিন্দুর প্রাণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সকলেই বলে, বেদ মানবীয় চিন্তাধারার সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন। একটা সাহিত্যকে (?) সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অবিকৃত ভাবে বাঁচাইয়া রাখিবার এমন অদ্ভুত প্রচেষ্টা জগতের কোনও জাতিই আজ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। মিশরের হাইরোগ্লিফিক, আসীরিয়ার ক্যুনীফর্ম্ লিপিতে সাহিত্যের যে খর্ব্ব নিদর্শন এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ধারা বিস্মৃতির মরুপ্রান্তরে কবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া এগুলিকে সুসংবদ্ধ সাহিত্য-প্রচেষ্টাও বলা চলে না। কিন্তু সিন্ধুর বিপুল জলধারার ন্যায় বৈদিক সাহিত্য কোন অনাদিযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত অবিরাম বহিয়া আসিয়াছে! তাহার বাণী নশ্বর ইষ্টকফলকে লিপিবদ্ধ হয় নাই—মানুষের কণ্ঠে, চিত্তে, স্মৃতিতে তাহা অমর হইয়া রহিয়াছে।

যতদিন জাতি বাঁচিয়াছে এবং বাঁচিবে, ততদিন এই অপরূপ সাহিত্যকেও তাহারা বাঁচাইয়া রাখিবে। এই অতি সভ্য বিংশ-শতাব্দীতেও মানুষের চিন্তারাশি বানের জলের মত চারিদিক ছাপাইয়া চলিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহার সমস্তই অস্থির, চঞ্চল—বানের জলের মতই ইহার কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট গতিপ্রবাহ দেখা যায় না। আজ এমন কথা বলা যায় না যে সমগ্র সভাজগৎ অবান্তর ভেদ থাকা সত্ত্বেও বিশেষ করিয়া এই একটী চিন্তাপ্রণালীরই অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু সেই দূরতম অতীতকালে সভ্যমানুষ তাহার চিন্তাকে একটা নির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করিয়া শুধু সেই চিন্তার দ্বারাই এক অপরূপ স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করিয়া এক অদ্ভুত জাতি গড়িয়া তুলিয়াছিল, যে জাতিসত্তার বীজ এখনও নির্ব্বীর্য্য হইয়া যায় নাই। এই জন্যই বলিতেছিলাম, বেদ আর্য্যজাতির জাতীয়তার অপূর্ব্ব নিদান। বেদের রসে জাত, পুষ্ট ও বিধৃত বলিয়া বেদের প্রতি বাস্তব কিম্বা কাল্পনিক অবজ্ঞার আভাস পাইবামাত্রই আর্য্যচিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। এইরূপে বেদের দোহাই দিয়া অনেক অবৈদিক তত্ত্বও বেদপন্থীদের মাঝে ঢুকিয়া গিয়াছে; আবার বেদের প্রতি নামে বিদ্রোহ করিয়াও বেদোপজীবী দর্শন-গুলি নাস্তিক বলিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ ছয়টী আস্তিক বা বৈদিক দর্শন লইয়াই আলোচনা হইয়া থাকে। এই ছয়টী দর্শনের মাঝে পরস্পর কি সম্পর্ক, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

কোন্ দর্শনের সূত্রগুলি আগে রচিত হইয়াছে, কোন্গুলিই বা পরে রচিত, তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। দর্শনের তত্ত্বগুলির চেয়ে সূত্রগুলি যে অর্ব্বাচীন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জীবনে সমস্যার উদ্ভব স্বভাবতই হয়; তাহার মীমাংসাও হয় সহজে। কিন্তু সেই মীমাংসাগুলিকে যুক্তিতে পরিশুদ্ধ ও দৃষ্টান্তে পরিপুষ্ট করিয়া সূত্রের আকারে বাঁধিয়া ফেলিতে বহুশতাব্দীর আয়াস ও আলোচনার প্রয়োজন এইজন্য এমনও হওয়া অসম্ভব নয়, যে দর্শনের সূত্র নিতান্ত অর্ব্বাচীন, তাহার তত্ত্ব হয়ত বহু প্রাচীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাংখ্যের সূত্রগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রবচনসূত্রকে নিতান্ত অর্ব্বাচীন বলিয়া সকলেই নিঃসংশয়িত মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যের তত্ত্ব যে অতি সুপ্রাচীন, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নাই।

এইজন্য বাহিরের কতগুলি অবান্তর প্রমাণ ধরিয়া নয়, মানব চিত্তের আভ্যন্তরীণ বিবর্ত্তনের ধারাকে অনুসরণ করিয়া, জাতীয় চেতনার অভি-ব্যক্তির ক্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দর্শনগুলির পর-স্পরের মাঝে কি সম্বন্ধ, তাহাই নিরূপণ করা প্রয়োজন।

বেদ ও উপনিষদাদি আলোচনা করিলে যে জাতীয় চেতনার সহিত আমাদের পরিচয় হয়, তাহা একটা জাতির সুস্থ, সবল, সহজ, সরল ও অকুণ্ঠ শৈশবের চিত্র। বৈদিক ঋষি যখন দেবতার কাছে গো-হিরণ্য-অন্ন-তোক-তনয় কামনা করিতেছেন, তখন তাঁহার সে চাওয়ার মাঝে বিন্দুমাত্র দৈন্য বা কুণ্ঠার আভাস নাই; দেবতা সম্বন্ধে চিত্তের সংশয় বা আন্দোলন নাই; দেবোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহে অনাস্থা বা অযৌক্তিক ভাবের লেশমাত্র ইঙ্গিত নাই; কর্ম্ম নিয়া যেখানে মীমাংসা বা বিচার হই-তেছে, সেখানেও যুক্তির আড়ম্বর নাই;—আছে কেবল নিঃসংশয়ে, অকুণ্ঠিতচিত্তে এবং বলিষ্ঠ আত্ম প্রত্যয়ের সহিত নিজের মনোভাবকে অবিসংবাদিত-রূপে প্রখ্যাপন করা। শিশুর চাওয়াতে যেমন সঙ্কোচ নাই, প্রাপ্তিতে যেমন সংশয় নাই, মতব্যক্তির মাঝে যেমন যুক্তির দুর্ব্বলতা নাই—এ-ও যেন ঠিক তেমনি। যেমনি সরলতা ও সবলতা কর্ম্মকাণ্ডে,

তেমনি দেখি জ্ঞানকাণ্ডে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিচারের খচ্‌খচি নাই, পূর্ব্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ নাই—একেবারে করামলকবৎ যাহাকে প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে, তাহাকেই নিঃসংশয় দৃঢ়তায় ঋষি প্রকাশ করিতেছেন, কেহ মানিবে কি না মানিবে, সে আশঙ্কা মুহূর্ত্তের জন্যও চিত্তে ছায়াপাত করিতেছে না।

বেদের এই অকুণ্ঠ আত্মপ্রত্যয়কেই আমরা মনে করি আর্য্যজাতির স্বরূপাভিব্যক্তি। পরবর্ত্তী কালের হিন্দুরা যে তাহাদের বিশ্বাসকে "সনাতন-ধর্ম্ম" আখ্যা দিয়াছে, তাহা এই সংশয়লেশহীন আত্মপ্রত্যয়কেই লক্ষ্য করিয়া। যজ্ঞ এবং ব্রহ্ম সিদ্ধ-সম্পদরূপে আর্য্য-জাতির জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাই হিন্দুর জাতিবীজ; ইভলিউশানের মাপকাঠি দিয়া মাপিয়া ইহার বয়স চিনিবার কোনও উপায়ই নাই। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মেণ্টাল ইভলিউশানের থিয়োরী খাড়া করিয়া বৈদিক চিন্তারাশির পৌর্ব্বা-পর্য্য নিরূপণ করিতে যান। তাঁহারা বলেন, অমুক সূক্তে অদ্বৈত-বাদ, অতএব তাহা অতি আধুনিক; অমুক সূক্তে বহুদেবতা-বাদ, অতএব তাহা সুপ্রাচীন। যাঁহারা শুধু বেদের ভাষা আলোচনা করিয়াছেন, বৈদিক চিন্তাধারা ও সাধনাদ্বারা অনুপ্রাণিত নহেন, তাঁহাদের নিকট ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু সমস্ত সংস্কার বর্জ্জন করিয়া গভীরভাবে যাঁহারা বেদার্থ অনুধ্যান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন একটী বেদ-বচনে মানবাত্মার যে সুগভীর ও সুদুর্দ্দর্শ স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে, ইউরোপের সমস্ত দার্শনিক ইভ-লিউশান ঘাঁটিয়াও তাহার তত্ত্ব মিলিবে না। অর্দ্ধ সভ্য (!) আরণ্যক জাতির হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের এই অপরূপ প্রকাশ ইভলিউশানের অপেক্ষা রাখে নাই, একেবারেই পূর্ণযৌবনে প্রস্ফুটিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইভলিউশনের গোলকধাঁধায় ঘুরিতে ঘুরিতে ভবিষ্যতের মহাসভ্য জাতিরাও একদিন বল্ক-ভূষণ ঋষির একটী অনতিস্ফুট বচনের কাছে সমস্ত গুমান বিকাইয়া দিয়া শান্তি পাইবে, ইহাও দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। এইজন্যই বলিয়াছিলাম, যজ্ঞ ও ব্রহ্ম আর্য্যজাতির সিদ্ধ-সম্পদ্। চিনির মিষ্টত্ব যেমন আগন্তুক নহে, পরন্তু সহজাত, ইভলিউশনের থিয়োরী যেমন এখানে অচল, যজ্ঞনিষ্ঠা ও ব্রহ্মনিষ্ঠাও তেমনি আর্য্যজাতির সহজাত। ইহাই তাহার জাতি-বীজ।

সহজ ধর্ম্মে যুক্তির স্থান নাই; মধু মিষ্ট, নিম তিত, ইহার মাঝে কোনও যুক্তির বালাই নাই। সনাতন যজ্ঞদর্শন ও ব্রহ্মদর্শনেও তেমনি কোনও যুক্তির ঠাঁই নাই। ইহাকেই হিন্দুর পরিভাষায় বলা হয় বেদবচনের অলঙ্ঘনীয়তা। বেদ বলিয়াছেন, তাই ইহা করিতে হইবে, কিম্বা বেদ বলিয়াছেন, তাই ইহা মানিতে হইবে—এটা আজকাল জবরদস্তী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একদিন তাহা মনে হইত না, কেননা তখন আমিই যে ছিলাম বেদ। অন্তরের প্রেরণায় অবলীলাক্রমে যেমন কত কাজ করিয়া যাই, তেমনি একদিন বেদাত্মরূপী আমারই প্রেরণায় যজ্ঞ-ফল লাভ করিয়াছি, ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদন করিয়াছি—যুক্তির প্রয়োজন হয় নাই, সংশয় আসিয়া ভ্রূকুটী করে নাই। কর্ম্ম সহজ, জ্ঞানও সহজ; দু'এক-জনের পক্ষেই সহজ নয়, একটা জাতির পক্ষে সহজ। ইহা রচা কথা নয়, প্রত্যক্ষ-দর্শনের কথা।

বেদকে ভিত্তি করিয়া যে দুইটী সহজ দর্শ-নের ইতিহাস পরবর্ত্তী যুগে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সনাতন ধর্ম্মের তাহারাই মেরুদণ্ড। তাহারা কোনও প্রয়োজন-বশে উদ্ভূত হয় নাই, তাহারা চিরকালই ছিল, এখনও আছে। তাই তাহাদের নাম মীমাংসা—যুক্তির মীমাংসা নয়, জীবনের মীমাংসা। দুইটী মীমাংসা-দর্শনের কথা আমরা জানি, জৈমি-নির পূর্ব্বমীমাংসা আর ব্যাসের উত্তরমীমাংসা। এই দুইটী মীমাংসাই সমগ্র বৈদিক জীবনের সহজ

আত্ম-প্রকাশ; হিন্দুর জাতি-বীজ ইহাতেই নিহিত। ইহারাই আদি-দর্শন। অন্যান্য সমস্ত দর্শনকেই একটা কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে, একটা প্রয়োজন দেখাইতে হইয়াছে। ন্যায় বলিয়াছে, জগৎ দুঃখময়, আমি তোমার দুঃখ ঘুচাইব, তোমাকে **অপবর্গ** বিলাইয়া দিব, উহাই তোমার নিঃশ্রেয়স কিনা সমস্ত শ্রেয়ের উত্তম শ্রেয়ঃ। বৈশেষিক বলিল, আমিও ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিয়া দুঃখের হাত হইতে তোমাকে বাঁচাইব, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভের সঙ্কেত শিখাইয়া দিব। সাঙ্খ্য বলিল, দুঃখ অবিসংবাদী সত্য, ইহা হইতে বাঁচিবার পথ চাই-ই; আর-কিছুতেই তা হইবার নয়; আমি তোমাকে বিবেকের কৌশল শিখাইয়া দিতেছি, ইহাতেই তোমার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইবে। পাতঞ্জল বলিতেছে, চিত্তবৃত্তির চঞ্চলতাই যত দুঃখের কারণ, আমি তোমাকে বৃত্তি-নিরোধের উপায় কহিতেছি, দুঃখ এড়াইতে পারিবে, কৈবল্য লাভ হইবে। মীমাংসার মাঝে কিন্তু এমন কোনও অজুহাত নাই—দুঃখের দায় এড়াইবার প্রচেষ্টাও নাই। পূর্ব্ব-মীমাংসা বলিলেন, "অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা—চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ।"—তুমি কৃত-বিদ্য অধিকারী, ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভের ইচ্ছা তোমার স্বাভাবিক; কর্ম্মের যাহা সিদ্ধপ্রেরণা, তাহাই ধর্ম্ম। উত্তরমীমাংসা একই সুরে বলিলেন, "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা—জন্মাদ্যস্য যতঃ"—তুমি কৃতকর্ম্মা অধি-কারী, অতএব ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা তোমার স্বাভাবিক; সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের যাহা সিদ্ধ আধার, তাহাই ব্রহ্ম।—প্রথম দুইটী সূত্রেই সমস্ত জটিলতার মীমাংসা হইয়া গেল। ইহার মাঝে কোথাও দায়ের কথা নাই, কি পাওয়া যাইবে না পাওয়া যাইবে, তাহা নিয়া দরাদরি নাই। জাতীয়-জীবনের ধারা অনুসরণ করিলে, বেদ-পন্থায় চলিলে এই প্রশ্ন তোমার স্বাভাবিক; তাহার এই উত্তরও স্বাভাবিক। যাহা আছে, তাহাই বলিতেছি, কিছুই বানাইয়া বলিতেছি না। আর দুঃখের কথা?—দুঃখ কি জানি না; জানি জীবন আনন্দময়, জীবন অমৃত। যজ্ঞে সোমপান করিয়া অমর হইয়াছি। তোমরাও অমৃতের পুত্র; সেই বার্ত্তাই তোমাদের শুনাইতে আসিয়াছি। তোমরা অমৃতপানে অমর হও। আনন্দ হইতে সঞ্জাত তোমরা, আনন্দে বিধৃত, প্রয়াণকালে আবার আনন্দেই লীন হইব। এই আনন্দ অমৃতের সেতু হইয়া সমস্ত চরাচরকে অসংভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে—তুমিই সেই আনন্দ-স্বরূপ।—আনন্দের এই উচ্ছল অভিব্যক্তিই আর্য্যধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম, মানবজাতির আদি দর্শন, জীবনের আদি **মীমাংসা**।

পূর্ব্ব ও উত্তরমীমাংসাই যে জাতির আদি দর্শন, তাহা শুধু অনুভব হইতে নয়, জাতীয় সাধনার ধারা হইতে যুক্তি দিয়াও প্রমাণিত হইতে পারে। কিন্তু তাহার দরুণ একটু পূর্ব্বাভাস রচনা করা প্রয়োজন।

পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা ভাল, ভারতবর্ষের দর্শন আর পাশ্চাত্য 'ফিলসফি' এক বস্তু নয়। 'ফিল-সফি' অর্থে জিজ্ঞাসা—অন্তহীন জিজ্ঞাসা; কেবলই জানিতে চাহিতেছি, কিন্তু জানার শেষ হইতেছে না। ইহা ফিলসফির পক্ষে ন্যূনতা নয়, বরং ইহাই তাহার গৌরব, পাশ্চাত্য ফিলসফার ইহাই বলিয়া থাকেন। বহির্ম্মুখী বিচারে কখনও কোন বিষয়ের অন্ত পাওয়া যাইবে না, সুতরাং শেষ-প্রশ্নের জবাব কোনও দিনই মিলিবে না, ইহা যুক্তিযুক্তও বটে। পাশ্চাত্য ফিলসফি এই বহি-র্মুখী ধারাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু ভারতীয় দর্শনের অর্থই হইল অন্তরের অনুভব। ফিলসফি এবং দর্শন—এই দুইটী শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিয়াও আমরা ইহাই বুঝিতে

পারি। বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির যোগ সাধন করা উভয়েরই উদ্দেশ্য, কিন্তু ফিলসফার যে ভাবে জগতের সমস্ত বিরোধের সমাধান করিতে চান, তাহাতে গোটা জগৎটাই জ্ঞেয়রূপে তাঁহার বাহিরে পড়িয়া থাকে। 'ফিলসফারের' 'আমি' একেবারে একটা স্বতন্ত্র জিনিষ, আমিত্বের চরম প্রসারেও কোথাও মিলিয়া-মিশিয়া যাওয়ার কল্পনা প্রতীচ্য ফিলসফার সহিতে পারেন না। প্রাচ্যকন্দসম্ভূত স্পিনোজা ফিলসফিতে অভেদ-বাদ আনিয়া ইউরোপীয় সমাজে যে কিরূপ আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা ইতি-হাসজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন। মোট কথা, খৃষ্টিয়ান্ ভক্তিবাদ ও গ্রীক্ সৌন্দর্য্য পূজার প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত পাশ্চাত্য ফিলসফি বিশ্ব ও আমির সম্বন্ধ নিরূপণে সর্ব্বত্রই দ্বৈতভাবের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

ভারতীয় দর্শন কিন্তু গোড়া হইতেই অদ্বৈতবাদী। এই দর্শনে বিশ্ব আমা হইতে পৃথক নহে, বিশ্ব আমারই অন্তর্ভূত। অবশ্য আমরা পরবর্ত্তী যুগের বিবেক দর্শনগুলির কথা বলিতেছি না। যে মীমাংসা-দর্শনের বীজ বেদে ও উপনিষদে, যাহাতে আর্য্য-জাতির মনোময় প্রতিরূপের পূর্ণ অবয়ব দেখিতে পাইতেছি, তাহাকেই ভারতীয় দর্শনের আদি বলিয়া তাহারই কথা আলোচনা করিতেছি। শঙ্করা-চার্য্যের হাতে অদ্বৈতবাদ যে অপরূপ বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে কর্ম্মকাণ্ড-দর্শন বা পূর্ব্বমীমাংসা অদ্বৈতবাদের বিরোধী বলিয়া বহু কটাক্ষ আছে। কর্ম্মকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে এই সমালোচনা অবশ্য অসমঞ্জস হয় না। কিন্তু যাঁহারা প্রণিধানসহকারে বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ড ও বেদসূক্তাদির আলোচনা করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, বৈদিক দেবতার সহিত বৈদিক ঋষির যে সম্বন্ধ, তাহা সেব্য-সেবকভাবমূলক দ্বৈত-সম্বন্ধ নহে। বেদে দেবতার সপর্য্যা বা পূজা নিগূঢ় ভাবে অদ্বৈত-ভাব দ্বারাই অনুপ্রাণিত। যে বিশ্বযজ্ঞের অনুকরণে নিখিল যজ্ঞের উদ্ভব, তাহাতে যজ্ঞকর্ত্তা পুরুষ আপনাকে আহুতি দিয়া বিশ্বের সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ পুরুষই ব্যষ্টিতে আত্মোৎসর্গ করিলেন। আর মানুষ সেই যজ্ঞেরই অনুকরণে আপনাকে আহুতি দিয়া পুরুষরূপে ফুটিয়া উঠিয়া চাহিতেছে, ইহাই বৈদিক যজ্ঞের মর্ম্মরহস্য। দেবতাকে আত্মসাৎ করিয়া আমি স্বয়ং দেবতা হইলে তবে আমার পূজা সার্থকতা লাভ করিবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সোমযাগের যে বিবৃতি রহিয়াছে, তাহাতে যজমানের এই দেব-জন্মই নানা অনুষ্ঠানে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। 'সোমম্ অপাম, অমৃতা অভূমঃ'—আমরা সোম পান করিয়াছি অতএব অমর হইয়াছি—দেবতার সঙ্গে এমন স্পর্দ্ধোচ্ছ্রিত সান্নিধ্য ভক্তিপথিক কল্পনাই করিতে পারেন না। বৈদিক ইড়াভক্ষণ ও খৃষ্টির ইউকেরিষ্ট-এ কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য এবং উভয়ে কিরূপ অদ্বৈতবাদের দ্যোতক, তাহা মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর দেখাইয়া গিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, উভয়ত্রই অদ্বৈতবাদ বিশেষ করিয়া প্রাচ্যজাতির সম্পত্তি। মূলতঃ প্রাচ্য খৃষ্টানধর্ম্মে ইহার বীজ থাকা সত্ত্বেও পরবর্ত্তী দ্বৈতবাদমূলক ভক্তিধর্ম্মে উহাকে অঙ্কুরিত হইতে দেয় নাই।

কর্ম্মকাণ্ডে যে দ্বৈতের অভিনয় রহিয়াছে. যজমানের বানপ্রস্থদশায় তাহার মূলোচ্ছেদ করিবার সঙ্কেত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—ইহাও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। আরণ্যকে পাই, বানপ্রস্থী যজ্ঞে আহুতি দিতেছেন, কিন্তু নিজকে অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া; তিনি অনুভব করিতেছেন, "এই যে আমার অন্ন, ইহাই বিশ্বের অন্ন হউক; আমার তর্পণে বিশ্বের তর্পণ হউক।" এই অনুভূতি বিশ্ব এবং আমার ঐক্য ছাড়া আর

কিছুই নহে। গার্হস্থ্যের আধিদৈবিক যজ্ঞ বানপ্রস্থে আধ্যাত্মিক রূপ ধারণ করিয়া যতি-দশায় অদ্বৈতানুভূতির পথকেই সুগম করিয়া দিতেছে।

বৃক্ষের কোটরে অগ্নি থাকিলে তাহা চারিপার্শ্বের বায়ুমণ্ডলকে সন্তপ্ত করিয়া কিম্বা ছিদ্রপথে উঁকি দিয়া আপনার সত্তাকে প্রমাণিত করে; বেদোপনিষদের রাজ্যে বিচরণ করিবার সময়, কি কর্ম্মকাণ্ডে, কি জ্ঞানকাণ্ডে সর্ব্বত্রই এইরূপ অদ্বৈতবাদের উত্তাপ অনুভব করিয়া থাকি। বেদের সূক্ত বা উপনিষদের বাক্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, সর্ব্বত্রই অদ্বৈতবাদকে সঙ্কেতিত করিয়া শব্দের সুচারু বিন্যাস। এমন অনায়াস তাহার প্রকাশ যে আজ মেকী দর্শনের আলোচনায় দ্বৈতবাদের গোলোকধাঁধায় যাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের সংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধিতে অদ্বৈতের প্রকাশ এত নিঃসংশয় ও সুস্পষ্ট বলিয়াই যেন বিশেষ করিয়া সংশয়ের উদ্রেক করে। এই দর্শন পূর্ণ প্রভায় ঝলসিয়া উঠে কাহার হৃদয়ে?—বৈদিক-ঋষির মতই যে পরবর্ত্তী যুগের বিবেক-দর্শন দ্বারা বা অত্যাধুনিক ইউরোপীয় দ্বৈতচিন্তা দ্বারা মোটেই স্পৃষ্ট নয়, তাহার হৃদয়ে। ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি।

বৈজ্ঞানিক বলেন, পৃথিবীর এমন একটা যুগ গিয়াছে, যখন অতিকায়ের আবির্ভাবই স্বাভাবিক ছিল। অতিকায় বৃক্ষলতা, অতিকায় স্থলচর, অতিকায় জলচর, অতিকায় পক্ষী সরীসৃপ ইত্যাদিতে প্রকৃতি জুড়িয়া প্রাণের অতিচর স্ফুরণই ছিল নাকি রীতি। আমরা বলি, মানবের চিন্তারাজ্যেও তেমনি একটা অতিকায়ের যুগ চলিয়া গিয়াছে। আজ আমরা দেহে এবং মনে সর্ব্বত্রই বামন। একদিন মানুষের অতিকায় মন মহাকাব্য সৃষ্টি করিয়াছিল, কল্পনার মাঝে আতিশয্যের ছড়াছড়ি ছিল। গ্রীক বা হিন্দুপুরাণ আজও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের কথায় তখন মানবের মন আন্দোলিত হইত না—সহস্রশীর্ষ দানবের সঙ্গে না লড়িতে পারিলে তাহার শৌর্য্য পরিতৃপ্ত হইত না, দুর্গমস্থানে দুঃসাধ্য-সাধন না করিলে তাহার মনে হইত 'হায় কিছুই হইল না'; লাখ, কোটা না হাঁকিতে পারিলে তাহার কথা বলিয়া সুখ ছিল না। আজ আমরা সব দিক দিয়াই ছোট হইয়া গিয়াছি—দেহে-মনে, পারিপার্শ্বিকে, কল্পনায়, সব দিক দিয়া আজকাল ছোটর আদর। বৃহৎ গোষ্ঠী চাই না, বৃহৎ কাব্য চাই না, বৃহৎ ইতিহাস চাই না, অতিকায় বাহন চাই না, কবরের উপর মিশরের পিরামিড গড়িয়া উঠুক ইহাও চাই না। দেহধর্ম্মে, মনোধর্ম্মে বামন হইয়া অতিকায়ের মর্য্যাদা অনুভব করা আজকাল কঠিন হইবেই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, যে যুগে পৃথিবী জুড়িয়া এত অতিকায়ের ছড়াছড়ি, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কল্পনায় এক আতিশয্যের বাড়াবাড়ি, সে যুগে মানুষের দর্শনও যে বিরাট হইবে, ভূমানন্দ যে তাহার কাছে করামলকবৎ সহজলভ্য হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? সব জিনিষও যেমন ছোট হইয়া আসিয়াছে, তেমনি বিশ্বব্যাপ্ত বিরাট আমিও আজ গুটাইয়া সাড়ে তিনহাত হইয়া গিয়াছে। কল্পনাতেই হোক আর বাস্তবেই হোক, একদিন স্বর্গ্য আর মর্ত্ত্যে ব্যবধান ছিল এ পাড়া আর ও পাড়া। আর আজ বাষ্পায়যান ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটিয়াও দেশের সহিত দেশের ব্যবধান ঘুচাইতে পারিতেছে না। তবুও পারসিউসের পক্ষ-পাদুকা বা কামচারী দেববিমান আজ অতীতের স্বপ্ন!

আর এক কথা। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, পৃথিবীর যে যুগের অতিকায়ের আবির্ভাব, সেই যুগে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে হইতেও শামুক-গেঁড়ি-গুগ্‌লীরও

আবির্ভাব। একেবারে বড়র কাছে একেবারে ছোটকে স্থান দিতে প্রকৃতির লজ্জা নাই। আধিভৌতিক রাজ্যে যদি ইহা সত্য হয় তো আধ্যাত্মিক রাজ্যেই বা হইতে বাধা কি?

মানবের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের আদি-অন্ত খুঁজিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক কেবল এনিমিজম্, ফেটিশিজম্ আর টোটেমিজম্-এরই সন্ধান পাইয়াছেন—কাদা ঘাঁটিয়া কেবল গেঁড়ি-গুগলিই আবিষ্কার করিয়াছেন; কিন্তু কখনও মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখেন নাই, তাঁহার পাশেই অতিকায় দানবও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর্য্যজাতির "প্রকৃতি-পূজা" একটা গালি নাও হইতে পারে। এই তথাকথিত প্রকৃতি-পূজার মূলে দেখিতে পাই, বস্তু হইতে ভাবকে আচ্ছিন্ন (abstracted) করিয়া তাহাকে উদারভাবে ব্যাপ্ত করিবার এক অপূর্ব্ব প্রতিভা। ফেটিশিজম্ ইত্যাদিতে তাহার বিপরীত; সেখানে মানবাত্মা ক্ষুদ্র পরিসরে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। আর বৈদিক ঋষির চিত্ত সহজেই জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ছড়াইয়া পড়িতেছে—"বিশ্বে ভুবনানি" —বেদের একটা বহু পুরাতন বুলি। পশ্চিমের বেদজ্ঞেরাও স্বীকার করিয়াছেন, বেদে যখন যে দেবতার স্তুতি সুরু হইয়াছে, তখনই তাঁহাকে সবার সেরা বলিয়া খাড়া করা হইয়াছে। এই মনোবৃত্তিকে একটা বিদঘুটে লাটিন নাম দিয়াই তাঁহারা খালাস পাইয়াছেন, কিন্তু ইহার মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। বাষ্পের মত যে মন সঙ্কীর্ণ আয়তন হইতে ছাড়া পাইবামাত্রই আপনাকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দিতে চায়, সে মন অত্যাধুনিক "বিশ্বভাবুক" মনের চেয়ে খাটো কিসে? যাহা-কিছু ক্ষুদ্র, তাহাকেই একক এবং অতিকায় করিয়া তোলা যে মনের স্বভাব, সে মন সুদূরতম অতীত যুগে আবির্ভূত হইয়াও অদ্বৈতবাদী। এখানে ইভলিউশনের থিয়োরী না খাটিয়া ইন্‌ভলিউশনের থিওরীই খাটিবে।

এই বিরাট্ অনুভব কি করিয়া ক্রমে গণ্ডী কাটিয়া ছোট হইয়া গেল, তাহার ইতিহাস এখন আলোচ্য। বেদান্তদর্শনের তিনটী পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। তত্ত্ব বা বাণী প্রথমতঃ গুরুমুখে শুনিতে হইবে। ইহাতে একটা মোটামুটী জ্ঞান জন্মাইবে মাত্র। তারপর নিজের মনে যে সমস্ত তর্ক বা সংশয় উঠিবে তাহার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে হইবে; ইহাই হইল মনন। তারপর সেই তত্ত্বকে ধ্যানের প্রবাহে ঢালিয়া দিয়া আপনার মাঝে অভেদে ধারণা করিতে হইবে, ইহাই নিদিধ্যাসন। শ্রবণ মননাদির এই ক্রমই সাধারণ্যে প্রচলিত। আমাদের কাছে এখন ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হয়ত একদিন ইহার বিপরীত ক্রমটাই স্বাভাবিক ছিল। সেই কথাই এখানে বলিতেছি।

এই প্রসঙ্গে অধিকারী বিচারের কথা আস্‌ছে। তাহাতেই ব্যাপারটা পরিস্ফুট হইবে। বেদান্ত বলেন, যাঁহার শ্রবণ মাত্র জ্ঞান সিদ্ধ হয়, তিনি উত্তম অধিকারী। যাঁহার শ্রবণের পরও মননের প্রয়োজন হয়, তিনি মধ্যমাধিকারী। আর যাঁহার মননেও কুলায় না, পাতঞ্জলের ভাষায় দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর সৎকার সহ আসেবিত হইলে তবে যাঁহার জ্ঞান দৃঢ়ভূমিক হয়, তিনি অধম অধিকারী।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাও দাঁড়াইয়াছে ইহাই, অথবা ইহার চেয়েও নীচু। আমাদের নিদিধ্যাসনেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে চাহে না। ইহা মানুষের মস্তিষ্কের উন্নতির লক্ষণ না অবনতির লক্ষণ, তাহাই বিবেচ্য।

বেদে পাই সহজের কথা, যেখানে যুক্তি-তর্ক নাই—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সহজ যতই

জটিল হইয়া আসিয়াছে, ততই মানুষ মননশীল হইয়াছে। ফলে উপনিষদের সহজ উক্তিতে কুলায় নাই, ব্রহ্মসূত্রের প্রয়োজন হইয়াছে; তাহাতেও মনের ধাঁধা মিটে নাই. ভাষ্য টীকা দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত হইয়া অনুভবের পথকে কণ্টকিত করিয়াছে। মনের এই অতিচার সভ্যতার উৎকর্ষ না অপকর্ষ, তাহা সুধীগণের চিন্তার বিষয়।

শারীর-বিজ্ঞানবিদ্ বলেন, মানুষের চিন্তাজগতে যতই কম্প্লেক্স্ বা জটিলতা দেখা দিতে থাকে, ততই তাহার মস্তিষ্কের কনভলিউশন বা পেঁচ বাড়িতে থাকে। বুদ্ধিজীবী অন্যান্য ইতর-প্রাণীর তুলনায় মানুষের ব্রেণে কন্‌ভলিউশন অনেক বেশী; মানুষের মাঝেও যাহারা যত মননশীল, তাহাদের মস্তিষ্কে তত কনভলিউশন; শিশুর চেয়ে প্রৌঢ়ের ব্রেণে কনভলিউশন বেশী। এই তথ্য হইতে বুঝি, আমাদের মস্তিষ্কে যদি এত প্যাঁচ না থাকে, তাহা হইলে আমরা বোকা বনিয়া যাই, আমাদের বুদ্ধি জড় হইয়া যায়। অবশ্য ইহা কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। কিন্তু মস্তিষ্কের ক্রিয়াদ্বারা যদি অদ্বৈতানুভবের পরিমাপ করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়, অদ্বৈতদ্রষ্টার মস্তিষ্ক মোটেই গ্রন্থিল নয়—তাঁহার সিম্পল ব্রেণ; অথচ তাহার অনুভূতির ব্যাপ্তি জড়বুদ্ধি প্রাণীর চেতনাকে নিশ্চয়ই অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। মনস্তত্ত্ববিদ বলেন, অভ্যাসে যে সমস্ত কাজ সহজ হইয়া আসে, তাহাদের প্রতিক্রিয়া মূল মস্তিষ্ককেন্দ্র পর্যন্ত পৌছায় না, সংক্ষেপ রাস্তায় আজ্ঞাবহা নাড়ী দিয়া পেশীতে নামিয়া আসে এবং ইহার ফলে মস্তিষ্কের সেই সমস্ত কেন্দ্রে জড়ত্ব উপস্থিত হয়, অথচ এদিকে কাজও চলিতে থাকে। যে অনুভূতি অতি সহজ, তাহাতেও এইরূপ মস্তিষ্কের অসাড়তা উৎপন্ন হওয়া সম্ভব এবং আমাদের অতিমাত্রায় চঞ্চল মস্তিষ্ক-পরমাণুগুলিকে আমরা ধ্যান-ধারণা-সমাধি দ্বারা এইরূপে অসাড় করিবারই চেষ্টা করিতেছি, ইহা বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না। তাহা হইলে ইভলিউশনের শেষ ধাপে যখন আমরা অদ্বৈতানুভূতির সন্ধান পাইতেছি বলিয়া গৌরব করিতেছি, তখন আসলে কি ব্যাপার হইতেছে?—মস্তিষ্কের সমস্ত জটিলতা চরমে পেঁছিয়া আবার চরম সরলতার দিকে—নিভাঁজ গড়নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। অর্থাৎ আমরা একটা খুঁটিতে দড়ি পেঁচাইয়া আবার পেঁচ খোলাটাকেই বাহাদুরী বলিয়া মনে করিতেছি। ইহা একটা অদ্ভুত ব্যাপার নহে কি?

মূল আর্য্যজাতির যে সমস্ত শাখা-প্রশাখা আজ জগৎময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে. তাহাদের মস্তিষ্কের কনভলিউশন যতই জটিল হউক না কেন, মননের দিক দিয়া তাহারা যতই অগ্রসর হউক না কেন, অধ্যাত্মানুভবের দিক দিয়া আজ তাহারা অত্যন্ত খাটো হইয়া গিয়াছে—যে ভূমানন্দ সহজ ছিল, অসাধনের ধন ছিল, তাহা আজ কঠিন হইতে কঠিনতম ও বহু আয়াসসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা উৎকর্ষ নহে, অপকর্ষেরই পরিচয়। মস্তিষ্কের কনভলিউশন বেশী না থাকিলে আধুনিক বিজ্ঞানবিদের মতে মানসিক অবনতির সূচনা করে; মস্তিষ্কহীন জীব প্রাণিতত্ত্ববিদের মতে জীবপর্য্যায়ের অধমাধম স্তরে রহিয়াছে। কিন্তু এমনও তো হইতে পারে আর হইতে পারেই বা বলি কেন, দেখিতেছি হইয়া আছে—মস্তিষ্কের ক্রিয়ার উপর গিয়া দাঁড়াইতে পারিলে বাধা-বন্ধহীন সর্ব্বোচ্চ অনুভূতি, সর্ব্বোচ্চ আনন্দে মানুষ আনখশিখ পরিপূর্ণ হইয়া বিশ্বময় উপচিয়া পড়িতে পারে? এই অনুভব যে কেবল গিরিকন্দরবাসী তপস্বীরই একচেটিয়া তাহা নয়, সাধারণ মানুষের কাছেও কখনও কখনও অকারণে এই রহস্যের কপাট

খুলিয়া যায়—একেবারে কিছু না করিয়াও মানুষ ভূমার সন্ধান পাইয়া আত্মহারা হইয়া যায়। এই হঠাৎ পাওয়া অবস্থাগুলিকে মনোবিজ্ঞানবিদ্ অতিচর অনুভূতি (Transcendental Experience) নাম দিয়া, ইহাদের সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু আমরা বলি, এই অতিচর অনুভবই একদিন সচরাচর ছিল। কেন বলি?—যখন দেখি, বহু সাধ্য-সাধনায় আমরা আজ যাহা পাই, তাহা বেদে, উপনিষদে স্তবকে স্তবকে অশোকমঞ্জরীর মত অনায়াস আনন্দে ফুটিয়া রহিয়াছে!—যখন দেখি, কোনও নিমিত্তের অপেক্ষা না রাখিয়া কোন্ অরূপলোকের কিরণপাতে আমাদের চেতনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, কৃচ্ছ্র-সাধ্য ভাব নখদর্পণের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—আলোকের সঞ্চারের মত ভাবের সঞ্চার অতি সহজ, অতি অনায়াস হইয়া গিয়াছে।

ভারতের নারীশক্তি যুগযুগান্তর সুরক্ষিত হইয়া ছিল বলিয়া প্রেমের সহজ প্রকাশ যেমন আজিকার দুর্দ্দিনেও যেখানে সেখানে চোখে পড়ে, তেমনি সুরক্ষিত পৌরুষের মহিমায় একদিন জ্ঞানও অনায়াস হইয়া ফুটিয়াছিল, বিচার-বিতর্কহীন সহজ অনুভবে আত্মাকে বিশ্বে ব্যাপ্ত দেখিতে ঋষিচিত্ত একদিন কোথায়ও কুণ্ঠিত হয় নাই। সে যুগে আনন্দের উপকরণ ছিল সামান্য, কিন্তু আনন্দ অনুভব করিবার ক্ষমতা ছিল অভাবনীয়; আর সে আনন্দ বর্ব্বরের পাশব আনন্দ নয়, ভূমার স্পর্শে দিব্যাবদান ঋষির সহজানন্দ। আজ আনন্দের উপকরণ জুটাইবার আয়াসে সমগ্র মানবজাতি শ্রান্ত, পীড়িত, অবসন্ন—জটিলতা-কুটিলতার অন্ত নাই; ইহাই নাকি তাহার সভ্যতা—ইহাই নাকি তাহার মেণ্টাল ইভলিউশন! একদিন এই মেণ্টাল ইভলিউশনের তাড়নায় সহজদর্শনের পরেও এই ভারতে বিবেকদর্শনের সৃষ্টি হইয়াছিল, আর আজ তাহারই জের দেখিতেছি—দর্শনের আলোকে নয়, চারিদিকে সংশয়ের নিবিড় অন্ধতায়। ব্রেণের কনভলিউশন নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে, নতুবা মানুষ চোখ বুজিয়া আলোর প্রমাণ লইয়া এত তর্ক করিবে কেন?

দর্শনের যে সহজ স্ফুরণের কথা বলিলাম, ইহা যে শুধু জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধেই খাটে, তাহা নয়। কর্ম্মকাণ্ডেও ইহার প্রভাব আমরা দেখিতে পাই। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হইতে আমরা বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছি; বিশেষতঃ যে মন্ত্রসংহিতা বেদোক্ত যজ্ঞের প্রাণ, তাহাতে উপযুক্ত স্বরসঞ্চার করিয়া উচ্চারণ করিবার বিদ্যা অধুনা লুপ্ত। সুতরাং এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া বিশেষ কিছু বলা কঠিন। তবে তান্ত্রের মন্ত্ররহস্য ও মন্ত্রের কম্পন-তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের কাছে বৈদিক মন্ত্ররহস্য নিতান্ত দুর্ব্বোধ হইবে না। আমরা সেদিক দিয়া বিশেষ কোনও ইঙ্গিত না করিয়া কথাটা আর এক দিক হইতে উপস্থিত করিতেছি।

দুইটী মীমাংসার মাঝে একটী পূর্ব্ব, একটী উত্তর—একটী আগের, একটী পরের। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলেন, এই দুইটী দর্শন মিলিয়া জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ মীমাংসা। শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানকাণ্ডের যে মীমাংসা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে কর্ম্মের প্রতি একটা দুর্দ্ধর্ষ ভাব অনেক স্থানেই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। অবশ্য শঙ্কর-দর্শনের মূল কথাটী বুঝিতে পারিলে ইহা অসমঞ্জস বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু তথাপি রামানুজ প্রভৃতির মতে ইহা ব্রহ্ম-দর্শনের সুস্থ ব্যাখ্যা নয়। রামানুজ ঋষি বৌধায়নের মত অনুসরণ করিয়া বলিতে চাহেন, কর্ম্ম এবং জ্ঞান দুই-এ একটা সগোত্র সম্পর্ক ও পূর্ব্বাপর ভাব আছে। উভয়ে মিলিয়া জীবন পূর্ণ। এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্ক

না তুলিয়া আমরা মোটামুটী একটা কথা বুঝিয়া নিতে পারি। ঋষিজীবনের আদর্শে যে চতুরাশ্রম বিভাগ ছিল, তাহার সহিত পূর্ব্বোত্তর মীমাংসার একটা সম্পর্ক ছিল, ইহা স্পষ্টই বোঝা যায়। বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেকের জীবন যদি বেদ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেদের পর্ব্ববিভাগের সহিত জীবনের পর্ব্ব বিভাগের একটা মিল দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাস্তবিক দেখাও যায় তাহাই। ব্রহ্মচারীর পক্ষে প্রয়োজন বেদের সংহিতা-ভাগ, গৃহস্থের জন্য ব্রাহ্মণ, বানপ্রস্থীর জন্য আরণ্যক ও যতির জন্য উপনিষদ্। প্রথম দুইটী লইয়া পূর্ব্বমীমাংসা আর শেষের দুইটী লইয়া উত্তর মীমাংসা। সমগ্রভাবে দুইটীতে জীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূপ। ইহাই ঋষিজীবনের আলেখ্য।

বেদই যে জীবনের একমাত্র নিয়ামক, ইহা বুঝাইবার জন্য বেদ-পন্থীদের মাঝে একটী অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত ছিল। বেদপন্থীর যাগ-যজ্ঞে বিকলাঙ্গ অনধিকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মীমাংসা ইহার ব্যাখ্যা এই দিয়াছেন, যে বিকলাঙ্গ সে যথাযথ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও করিতে পারিবে না, কিম্বা পারিলেও যজ্ঞফল যথাযথ ভোগ করার সামর্থ্য তাহার নাই। বিকলাঙ্গকে এইরূপে যজ্ঞাধিকার হইতে বঞ্চিত করায় বেদপন্থীকে পরবর্ত্তী যুগে তীর্থিক আচার্য্যদিগের নিকট গঞ্জনা সহিতে হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, বেদ অনুদার, উহার অনুষ্ঠান সকলের জন্য নহে; কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম কত উদার; দুর্ব্বল, বিকলাঙ্গ সকলেরই ঠাঁই এখানে আছে।

কথাটা বেদপন্থীর নিকট আপশোষের বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইহার একটা মীমাংসা মনুতে পাই। বেদপন্থীর মনে এই একটা স্পর্দ্ধা চিরজাগ্রৎ ছিল যে বেদ দ্বারা সে জন্ম, আয়ু, ভোগ সমস্তই শাসন করিতে পারে। জন্মশাসন নিয়া যে আজকালই একটা সোর-গোল উঠিয়াছে, তাহা নয়; সংহিতায়, আরণ্যকে, উপনিষদে জন্মশাসনের বহু প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। গর্ভাধানকে বৈদিক যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা শাসিত করিবার চেষ্টায় যে অকুণ্ঠ সাহস প্রকটিত হইয়াছে, তাহা এই অত্যাধুনিক "অলজ্জ বৈজ্ঞানিকের" যুগেও বুঝি বা দুর্লভ। এই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মনু বলিতেছেন—ইহাদের দ্বারা "ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ"—এই দেহকেই ব্রহ্মধারণার উপযোগী করা হয়। আমার সবখানিকে ব্রহ্মময় করিয়া তুলিব, ব্রহ্মবিদের আত্মাহুতিতে ব্রহ্মবিদের আবির্ভাব ঘটিবে—ইহা কম স্পর্দ্ধার কথা নয়। দেহকে ব্রহ্মময় করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় আইডিয়ালিজম ও মেটেরিয়ালিজমের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় করা হইয়াছে, জীবনের যে অখণ্ড আস্বাদনের সূচনা করা হইয়াছে, তাহা আধুনিক যুগের ভাবুকদিগেরও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসী দার্শনিক পল্ রিশার বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে মানুষের ভাব যে পরিমাণে বিকশিত হইতে চাহে, দেহ সে পরিমাণে ফুটিতে চাহে না—এই দ্বন্দ্বে প্রকৃতিতে একটা পীড়া সঞ্চিত হইতেছে। সুতরাং প্রকৃতি এই পঙ্গু মানবজাতিকে ধ্বংস করিয়া অভিনব বীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত এক অতিমানবের ধারা সৃষ্টি করিবে; বর্ত্তমান যুগের বিপ্লবসমূহ। সেই অভিনবের আবির্ভাবকালে প্রকৃতির গর্ভবেদনা রিশারের এই কল্পনার সহিত মনুর উক্তি মিলাইয়া দেখিলে সম্ভবতঃ ইভলিউশনবাদী বৈজ্ঞানিক বৈদিক-যুগ সম্বন্ধে একটা নূতন চিন্তার ইঙ্গিত পাইবেন। আমরাও বলিতে চাই, বেদে দেহে এবং দেহাতীতে ব্রহ্মেরই সহজ স্ফুরণের ইঙ্গিত স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে—উহাই যথার্থতঃ অতিমানবের যুগ।

দেহ, মন, আত্মা—এই তিনটী সত্তা লইয়া মানবের আবির্ভাব। ইহার মাঝে দেহকে ব্রাহ্ম করা পূর্ব্বমীমাংসার কাজ; আর আত্মাকে ব্রাহ্ম করা উত্তরমীমাংসার কাজ। মন অবান্তর—সহজ স্ফুরণে উহা বাধা। মনটা বাড়িয়া গিয়া দেহ এবং আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া বিকারের সৃষ্টি করে, মায়ার সৃষ্টি করে। পূর্ব্বমীমাংসা দেহের দিব্যদর্শন, উত্তরমীমাংসা আত্মার দিব্যদর্শন। মাঝে মনকে লইয়া আর চারটী অবান্তর দর্শনের সৃষ্টি; ক্রমবিবর্দ্ধমান মনকে কি করিয়া মারিয়া ফেলা যায়, এই যুক্তিই তাহারা দেখাইতেছে। উহারা মানবাত্মার সুস্থ প্রকাশ নয়, মানবের মনের বিকার মাত্র। এই বিকারে আমরা এতই অভিভূত রহিয়াছি যে আজ মন ছাড়া আমরা এক পা অগ্রসর হইতে পারি না—মেদ-রোগীর মত স্ফীত মনের ভার নিয়া চলিতে গিয়া গলদ্-ঘর্ম্ম হইয়া পড়ি। রসশাস্ত্রে শুনি, **চিন্ময় বিগ্রহের** কথা, শুনি **অন্তশ্চিন্তিতস্বাভীষ্ট দেহের** কথা—শুনি দেহ আর দেহীর অনাদি প্রেমের অন্তহীন মাধুরীর কথা—ইহার মাঝে মন আসিল কোথা হইতে? যাহা মনের অগোচর অথচ একাধারে দেহ এবং দেহী—তাহাই পুরুষোত্তম-সত্তা; এই সত্তারই আদি প্রকাশ আর্য্য-জাতিতে—ইহার তত্ত্বই নিহিত বেদে, আর ইহারই বিবৃতি কর্ম্ম ও ব্রহ্মমীমাংসায়। পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, সেখানে মনের কারসাজী নাই, অতএব মেণ্টাল ইভলিউশনের থিয়োরী একেবারে অচল। আমরা যে মনের বেড়াজাল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছি, বেদের ঋষি সহজেই তাহা হইতে মুক্ত। তাই সে ঋষির দর্শন সহজ দর্শন। মনোময় জগতের ক্রমাভিব্যক্তিকে মনোময় মানুষ সভ্যতা বলিয়া বড়াই করিতে পারে, কিন্তু সহজ মানুষ সহজানন্দের আস্বাদ পাইয়া সে কথা স্বীকার করিতে চাহিবে কেন?

এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহা "শ্রবণের" এলাকা। দুইটী মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য শুধু শুনিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। শুনিলাম আর মানিলাম, ইহাতেই এই দর্শনের পরিসমাপ্তি।

ইহার পর দেখা দিল বুদ্ধির জটিলতা। সহজ কর্ম্মপ্রেরণা, সহজ জ্ঞান কুটিলতার পাংশুজালে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। তখন হইতেই জিজ্ঞাসুর মনে প্রশ্ন জাগিল, কেন, না বুঝিয়া-সুঝিয়া বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করিব কেন? পাশ্চাত্য ফিলসফার ডেকার্ট বলিয়াছিলেন, ফিলসফির আরম্ভ সংশয়ে। ঠিক অনুরূপ কথা পাই প্রাচ্য ন্যায়দর্শনে—সংশয়িতে অর্থে ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে। বলা বাহুল্য এখানে ন্যায় কতকটা ফিলসফির সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোট কথা, সহজ ভাব যখন হইতে ছুটিয়া গেল, মনের চক্র ভূর্ণবেগে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল, তখন হইতেই মননমূলক দর্শনগুলির সৃষ্টি। এগুলিকে ফিলসফি না বলিয়া দর্শনই বলিতে চাই এইজন্য যে, ফিলসফি কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আমাদের পৌছাইতে চায় না, দার্ঢ্য সহকারে সে এমন কথা বলিতে পারে না যে, যাহা বুঝাইলাম, তাহাই তোমার নিঃশ্রেয়স। কিন্তু মননমূলক দর্শনগুলিতে সে দার্ঢ্য, সে গুরুত্ব পাই। তাই সহজ না হইলেও তাহাদিগকে দর্শন বলিতে কোনও আপত্তি নাই।

এই মননমূলক দর্শনের বিষয় বিভাগ আছে। একটা ন্যায় বা যুক্তিপরম্পরা, আর একটা সাংখ্য বা শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান। ইহার মাঝে সাংখ্যই পূর্ব্ববর্ত্তী। সহজ জ্ঞান বা বেদ বেদান্তের মাঝে যেটা বোধের দিক বা প্রেরণার দিক, তাহাই মীমাংসা, যাহা বুদ্ধির দিক, তাহাই সাংখ্য। উপনিষদে সাংখ্যতত্ত্বের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে; কিন্তু যুক্তির ছাঁচে ঢালাই করিবার কোনও চেষ্টাই

নাই। দর্শন উদার ও ব্যাপ্ত হইলে বুদ্ধির বিকাশ আপনা হইতেই হইবে। সমাহিত চিত্তে স্বভাবতঃই অনেক কিছু ফুটিয়া উঠে, তাহাতে যুক্তির স্পষ্টতঃ প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু অযৌক্তিক কিছু থাকে না। একটা মেসিনের ভাঙ্গা অংশগুলি যদি অনায়াসে একটার পর একটা ঠিক জুড়িয়া যায় তাহা হইলে ফিটার-মিস্ত্রীর যেরূপ একটা অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি জাগে—এই সাংখ্যের জ্ঞানও তেমনি। দার্শনিক পরিভাষায় বেদান্তে সাংখ্যে মিলিয়া এ যেন একটা অপরূপ সমন্বয়। কিন্তু উপনিষদের সাংখ্যকে এমনি করিয়া ভাগাভাগি করিয়া দেখা সাম্প্রদায়িকের অভ্যাস, নতুবা অনুভবিতার কাছে একটা পূর্ণ দর্শনেরই ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের কোনও সার্থকতাই নাই।

উপনিষদে যে সাংখ্য পাই, তাহা বুদ্ধির সহজ স্ফুরণ। কিন্তু এই সহজের লীলাটুকু শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকে নাই। অলৌকিক রহস্য সম্বন্ধে মানুষের মন ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতির অধঃপরিণামের গুণে চৈতন্য ও জড়ের বন্ধন ক্রমশঃ আঁট হইয়া বসিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দেহ-দেহীর যে অনাবিল চিন্ময় প্রীতির কথা বলিয়াছিলাম, পরিণামের আবর্ত্তে পড়িয়া তাহা ক্রমেই পঙ্কিল ও জটিল হইয়া গিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক। শৈশব-সরলতা চিরকাল বজায় থাকে না; হয়ত বা ব্রেণের কন্‌ভলিউশনই ইহার জন্য দায়ী! আজও দেখি, মস্তিষ্কের 'গর্ডিয়ান' গ্রন্থিকে সেকেন্দারসাহের ন্যায় সহজানুভবের শাণিত কৃপাণে খণ্ডিত করিয়া কখনও কখনও বা বিদ্যুতের স্ফুরণের মত ভূমার সহজানন্দ কাহারও মাঝে নিমিষের তরে ফুটিয়া উঠে!

বন্ধন যখন নিবিড় হইয়া আসিল, তখনই বিবেকজ্ঞানের আবির্ভাব হইল—যুক্তি-জটিল সাংখ্যের তখনই উদ্ভব। এই সাংখ্যের প্রতিজ্ঞা—কিছু না মানিয়া, কিছু না বিশ্বাস করিয়া, শুদ্ধমাত্র চারিদিকে যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহা হইতেই কি করিয়া গোটা জগতের একটা আদল গড়িয়া তোলা যায়। এই অদ্ভুত প্রচেষ্টার ফলেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ছক। কেবল মাত্র 'সমের আকর্ষণ' ও 'সজাতীয়ের আপেক্ষিকতা' এই দুইটী সার্ব্বভৌম নিয়মকে মানিয়া আশ্চর্য্য কৌশলে সাংখ্য ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত পর্য্যন্ত জগৎটা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সাংখ্যের অপরূপ নির্ম্মাণ-কৌশল আলোচনা করিলে স্তম্ভিত, মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়; মানবের বুদ্ধি যে এত সূক্ষ্মদর্শী, এত ব্যাপক হইতে পারে, ইহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। অমনি পুথি যথেষ্ট বাড়িয়া যাইতেছে, সুতরাং কপিলের যুক্তিজাল বিশ্লেষণ আপাততঃ মুলতুবী থাকুক।

সাংখ্যের মাঝে দুইটী বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম কথাই হইতেছে দুঃখবাদ। দুঃখ থাকিলেই মুক্তিপিপাসা থাকিবে। সুতরাং মোক্ষদর্শন বলিতে সাংখ্যকেই আদি মোক্ষদর্শন বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মীমাংসা-দর্শন আগাগোড়া আনন্দের সহজ স্ফুরণ। সে আনন্দ কোথাও বা ভোগের আনন্দ, কোথাও বা দর্শনের আনন্দ। বিবেক যাহাকে বন্ধন বলে, ঋষির সহজ দৃষ্টিতে তাহাও আনন্দ—জন্মও আনন্দ, স্থিতিও আনন্দ, প্রয়াণও আনন্দ। সুতরাং এই দর্শনে বন্ধন-মোক্ষের বালাই কিছুই নাই। পাঠক শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বাণষটকের শেষ চরণ স্মরণ করিবেন।

কিন্তু প্রকৃতির পরিণামে অলক্ষ্যে সৃষ্টিতে ক্লেদ সঞ্চিত হইতে থাকে। অবশেষে একদিন সহজের গতি রুদ্ধ হইয়া যায়, নটরাজের নৃত্যে আচম্বিতে তাল ভঙ্গ হয়—আনন্দের নিটোল বিম্ব ভাঙ্গিয়া দেখা দেয় সুখ-দুঃখ আলো-আঁধারের দ্বৈত। এই দ্বৈতের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিলেন কপিল।

কপিল জগতের প্রতি একটা দুর্দ্দম বিদ্রোহের প্রকাশ—এই হইল সাংখ্যদর্শনের দ্বিতীয় মূলকথা! সাংখ্যের ব্যাখ্যাকারেরা বলেন, কপিল ধর্ম্ম, জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ এবং তাঁহার আবির্ভাব নৈমিত্তিক নয়, স্বাভাবিক। প্রাচেতস প্রভৃতি ঋষিরা যেমন সাধিয়া জ্ঞান পাইয়াছেন, কপিল সেরূপ পান নাই; তিনি একেবারেই পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ ঐশ্বর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। অনুধ্যান করিয়া দেখিলে এই উক্তির মাঝে গভীর রহস্য নিহিত রহিয়াছে বুঝিতে পারা যায়। কপিল আদি গুরু। পতঞ্জলির ঈশ্বরও আদি গুরু। সাংখ্য ঈশ্বর মানেন না বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; অথচ কপিলে পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ! যিনি ঈশ্বর নন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য—এ একটা হেঁয়ালী। বুদ্ধিমানেরা এই হেঁয়ালীর মীমাংসা করুন, আমরা শুধু এইখানে এইটুকু ইঙ্গিত দিয়া রাখিলাম।—বেদে যে আচার্য্যবাদ, তাহার শেষ স্ফুলিঙ্গ বুঝি বা এই কপিল। এইজন্যও লোকায়ত ঈশ্বর না হইয়াও তাঁহার এত ঐশ্বর্য্য!

জড় আর চেতনে জড়াইয়া গিয়াছে; কপিল আসিয়া আঘাত করিয়া বলিলেন, আত্মানং বিদ্ধি—বিবিক্ত হও—ফারাক হও—প্রকৃতি, তফাৎ! এই তো মানব-মনের আদি বিদ্রোহ। অমরত্বের অধিকার হইতে চ্যুত হইয়া ভ্রষ্ট দেবশক্তি একদিন দধীচির অস্থি দিয়া বজ্র গড়িয়া বৃত্র বধ করিয়াছিল। যাহা আবরণ করে, তাহাই বৃত্র (বৃ+ত্র); বৃত্র অবিদ্যা; বৃত্র সেই জড় আর চেতনের সংমিশ্রণে মূঢ়ভাব। কপিল আদি বৃত্রহন্তা; সাংখ্যই বজ্র—যে বজ্রের প্রতিষ্ঠা তপস্যায়, ত্যাগে, বৈরাগ্যে!—আঁৎকাইলে চলিবে না, বজ্রধর হওয়া ছাড়া আজ আর গতি নাই; মানুষ Fallen Angel; অধিকারচ্যুত ইডেনের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলে আর কি হইবে? এই তার আদি অভিশাপ—"মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া" তাহাকে বাঁচিতে হইবে, আদি মানব-জননী "দুঃখেই সন্তানকে জন্ম দিবেন, দুঃখেই তাহাকে পালন করিবেন।" এই দুঃখ-সাগর সন্তরণ করিবার একমাত্র উপায়—দধীচির বজ্র। ইহাই কপিলের বিবেক দর্শন। বলিতে গেলে ইহাই জগতের সমস্ত সম্প্রদায়ের মোক্ষদর্শনের মূল কথা। হয়ত বা ইহা Philosophy of the Pigmies—বামনের ফিলসফি।

মননের ফলে বিষয় আর বিষয়ী বিবিক্ত হইয়া দেখা দিল; সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মাঝে ফুটিয়া উঠিল প্রমাণ-সত্তা বা চিত্ত। এই সমস্তকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াই অবান্তর দর্শনের সৃষ্টি। বিষয়ীর তত্ত্ব ঘাঁটিয়া বাহির হইল বিশ্লেষণমূলক বেদান্ত—নেতি-নেতি করিয়া যাঁহাকে পাইতে হয়, তাঁহারই কথা। আর বিষয় ঘাঁটিয়া সাংখ্য সূক্ষ্মের তরফ হইতে বাহির করিলেন চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বসমন্বিত অব্যক্ত। এবং স্থূলের দিকটা দেখাইতে গিয়া বৈশেষিক-কার কণাদ বাহির করিলেন সপ্ত পদার্থ।

সাংখ্য আর বিশ্লেষণ-বেদান্তের তফাৎটা আগে বোঝ। সাংখ্য চাহিলেন "কেবল" হইতে; কিন্তু তাহার দরুণ তাঁহাকে প্রকৃতির তত্ত্বই মহা আড়ম্বরে বিশ্লেষণ করিতে হইল, প্রকৃতির ধাপে ধাপে চিত্ত লয় করিয়া তিনি কত রহস্যই না আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু পুরুষ সম্বন্ধে তিনি একপ্রকার নির্ব্বাক। পুরুষ যেন প্রকৃতির প্রতিবাদ। এই বিদ্রোহের ভাব, এই নিরোধের বীজ ভিতরে রাখিয়া সাংখ্য তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন।

যদি বিচারের ধারা ধরিয়াই চলিতে হয়, তাহা হইলে বলিব, সাংখ্য যেখানে আসিয়া ইতি বলিলেন, বিশ্লেষণ-বেদান্ত সেইখান হইতে সুরু করিলেন। বেদান্তের কাছে প্রকৃতির চর্চ্চা অবান্তর; বেদান্তের আরম্ভই পুরুষ হইতে। এই পুরুষকে বিশ্লেষণ

করিয়া তিনি পাইলেন তাঁহার সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। তিনটী পৃথক্ করিয়া বলিবার নয়, তবুও পৃথক্ করিয়া বলিবার ভঙ্গীটুকু বজায় থাকিয়াই যাইতেছে। সাংখ্যের ছাপ হইতে, বিবেকের তাড়না হইতে, মনের বিকার হইতে বেদান্ত এখানে কিছুতেই মুক্তি পাইতেছে না। এই যে বিবেক-ঘেঁষা বেদান্তের বক্র আভাস, ইহাকে নিয়া পরবর্ত্তী বৈদান্তিকদের অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই সহিতে হইয়াছে। ইহাকে আশ্রয় করিয়া অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়াই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যকে আজ পর্য্যন্ত কতজনার বাক্যবাণ সহিতে হইতেছে। তাই স্বামী রামতীর্থ অভিমান করিয়া আচার্য্য শঙ্করকে বলিয়াছিলেন, "তুমি সহজে যে কথা বুঝিয়াছিলে, তাহা কেন লোককে বুঝাইতে গিয়া কুটিলার গঞ্জনা সহিলে? তোমার সহজ তোমাতেই না হয় থাকিত, ফুলের সৌরভের মত আপনা হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া যাইত!"

বিশ্লেষণ-বেদান্তের ভিতর দিয়া মেঘের ওপারের সেই জ্যোতির্ম্ময় রহস্যমণ্ডলের দিকে একবার অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়াই আচার্য্য শঙ্কর সরিয়া পড়িলেন। মাটীর মানুষ আবার মাটীর দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আকাশ নিতান্তই ফাঁকা, সেখানে ঘর বাঁধা যায় না; সেখানে তার আর কি প্রয়োজন? আমরাও সেই ফাঁকার কথা ছাড়িয়া দিয়া আবার মাটীর কথাই বলিব।

সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের তত্ত্বে-তত্ত্বে যে সমাধি হয়, বিশ্রাম মিলে, এইটা একটা খুব বড় কথা এবং এই কথাটা ফলাও করিয়া বুঝাইয়াছেন তন্ত্র। তন্ত্র জড়শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবশক্তি, ব্রহ্ম-শক্তি কিছুই বাদ রাখেন নাই। সে এক বিরাট্ সাধনা—মানবাত্মার অদম্য সাহস, অপরিসীম কৌতূহল, ফিলসফির অনুপম সায়ান্স! সে কথা আর আজ নয়। শুধু এই বলি, সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্ব আর তন্ত্রের শক্তিবাদ একত্র মিলাইয়া বুঝিলে বিষয়তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও সূক্ষ্ম রহস্যই বোধ হয় আর অজ্ঞাত থাকে না।

এর পরেই আসে বিষয়তত্ত্বের স্থূল বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ করিয়া বৈশেষিককার কণাদ পাইলেন পরমাণু। উহা প্রকৃতির স্থূল বিভাব। প্রাণশক্তিকে, ইন্দ্রিয়শক্তিকে বৈশেষিক দর্শন অতি স্থূল উপায়ে এই সমস্ত পরমাণুপুঞ্জ হইতে নিষ্কাশন করিয়াছেন। বিস্তারের স্থান এখানে নয়, শুধু কথাটা ইঙ্গিতে বলিয়া রাখিলাম।

আর একটা কথা। পরবর্ত্তী বৈশেষিক-সম্প্রদায় বলেন, তাঁহারা শক্তি মানেন না। কথাটা বিশ্বাস করি না। ওটা শুধু সাম্প্রদায়িক ঝগড়া। বৈশেষিকের বিশেষ পদার্থই যে শক্তি। এই বিশেষ আর উপনিষদের "নানা", বেদান্তের ভেদজ্ঞান, সাংখ্যের বহুবাদ—একেবারে এক পর্য্যায়ের জিনিষ। পরমাণু হইতে পরমাণুকে ঠেলিয়া রাখে কে? —বিশেষ। এইটী একটী থাপছাড়া পদার্থ—বিশ্বের উপাদান-তত্ত্বের বাইরের কথা। এইটীই না বৈশেষিকের "অদৃষ্ট"?—ঠিক সাংখ্যের "অব্যক্ত", আর বিশ্লেষণ-বেদান্তের "অনির্ব্বচনীয়" নয় কি? তা ছাড়া আর এক দিক দিয়া বিচার করিলে উভয় পক্ষের কথাই বজায় থাকে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিনটা পরিণামের মাঝে শক্তি-বিচার; কিন্তু নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে সূক্ষ্মের প্রতি, তাই সেখানে শক্তি না মানিয়াও তাঁহারা স্থূলের মীমাংসা করিয়া দেন। কিন্তু শক্তি যে কারণরূপিণী আর শক্তিবাদী দার্শনিকেরা যে শক্তির এই চরমরূপেরই উপাসক, এ কথা না বোঝাতেই এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি। এই দিক দিয়া ন্যায়-বৈশেষিককেও শক্তি স্বীকার করিতে হইয়াছে, তবে কিনা ভিন্ন নামে।

বিষয়-তত্ত্বের দর্শন এইখানে পর্য্যবসিত হইল। ইহার পর আসে বিষয় আর বিষয়ীর মাঝে

উদ্ভূত প্রমাণের কথা। এইখানেই ন্যায়-দর্শনের উপযোগিতা। ন্যায়ের ষোড়শ-পদার্থের গোড়াতেই প্রমাণ। প্রমাণ ছাড়া মনন হয় না। অতএব মনন-শাস্ত্র যদি কাহাকেও বলিতে হয় তো ন্যায়কে। মানুষের মনে তর্ক উঠিয়াছে. সংশয় জাগিয়াছে—এই ন্যায়কেই অবলম্বন করিয়া। পুরাণাদিতে ন্যায়ের যে সমস্ত যশঃকথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে ন্যায়বিদ্যার ফিলসফির দিকটাকেই বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে। ন্যায়ের এক নাম আন্বীক্ষিকী। অন্বীক্ষা কাহাকে বলে?—অনু অর্থে পরে, ঈক্ষা মানে আলোচনা। সোজা কথায়, একটা কিছু দেখিয়া আসিয়াও যে **মনে মনে বিচার চলে**—কি দেখিলাম, কেন দেখিলাম ইত্যাদি, তাহাকেই বলে অন্বীক্ষা। ব্রহ্মদর্শনের পরেও বিচার থাকে, যদি মন জাগে; তখনই ন্যায়ের স্ফূর্ত্তি। সহজদর্শনের পর এই জটিলতা, জটিলতার গ্রন্থি-মোচন করিয়া সহজ-দর্শন নয়—এমন অপরূপ ব্যাপার বহুবার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এইটাই স্বভাবের পথ। কিন্তু আমরা বুঝি উল্‌টা।

উল্টা বুঝ এই রকম। একটা বচন আছে, "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ"—আগে শ্রুতিবাক্য হইতে শুনিতে হইবে, তারপর উপপত্তি বা যুক্তি সহকারে মনন করিতে হইবে। এই সেই গোড়ার ত্রিধারার কথা। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কথাটার ধরণ উল্‌টা। শুনিলাম, কিন্তু কিছু বুঝিলাম না, তারপর যুক্তি খাটাইয়া বিচার করিয়া মননের দ্বারা বুঝিলাম—দর্শনের আদি যুগ এমন নির্ব্বোধের যুগ নয়। শুনিলাম কি জানিলাম—মাঝে আর কোথাও ফাঁক নাই; যুক্তি যদি প্রয়োজন হয় তো সে পরের কথা—এইটাই হইতেছে আসল ধরণ। শঙ্করাচার্য্য এই কথাটা বুঝাইবার জন্যই এত করিয়া মাথা কুটিয়া গিয়াছেন; জ্ঞানকে স্বরাট্ করিবার দরুণ তাঁহার যেন একটা খুন চাপিয়া গিয়াছিল। দশমন্যায়, মণিপ্রাপ্তিন্যায়, প্রত্যভিজ্ঞা—ইত্যাদি কত যুক্তিরই না অবতারণা তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। কিন্তু গোড়ার কথাটা ওই। শোনাতেই সব শেষ; তারপর যদি যুক্তি দ্বারা মননের কথা আসে তো সেটা অবান্তর।

কিন্তু এখন তো মনন ছাড়া আর উপায় নাই। ঋষি প্রতিভা ম্লান হইয়া গিয়াছে, নির্ম্মল আদর্শে কলঙ্ক পড়িয়াছে, মার্জ্জনা না করিলে আর সত্য তাহাতে প্রতিফলিত হইবে না। তাই প্রয়োজন ন্যায়ের। তাই "জ্ঞান-বিচার" বলিয়া একটা সোণার পিতলকলসের সৃষ্টি। ন্যায়ই বলিবেন, জ্ঞানের বিচার হয় না, অজ্ঞানেরও বিচার হয় না, বিচার হয় সংশয়ের। ন্যায় বড় গলা করিয়াই এই কথাটা বুঝাইয়াছেন।

ন্যায়ের একটা বড় থিয়োরী—"মানাধীনা মেয়শুদ্ধিঃ।" কথাটা ভাঙ্গিয়াই বলি। চারিটী বড় বড় পদার্থই ন্যায় গোড়ায় সাজাইয়াছেন।—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন। প্রথমেই প্রমাণের কথা কেন?—ওইটাই যে মায়া। প্রমেয় বা জ্ঞেয় কি?—এ প্রশ্ন অদ্বৈততত্ত্বে নাই। প্রমেয় ও প্রমাতা সেখানে এক। আমা হইতে বিশ্ব। দুয়েই এক। কিন্তু যখন দুই দুই হইয়া দাঁড়াইল, তখন মাঝে জাগিল মন—সমস্ত প্রমাণের রাজা। মন আসিয়া প্রমেয় আর প্রমাতার মাঝে কেবলই সংশয়ের কুয়াশা সৃষ্টি করিতে লাগিল। কেন, তাহারই বা এই মাথাব্যথা কেন?—ইহার জবাব দেওয়া কঠিন। ন্যায় শুধু সংক্ষেপে বলিলেন—পেছনে যে প্রয়োজনের প্রবর্ত্তনা রহিয়াছে। ওই তো লীলাময়ীর লীলা—বাজীকরের মেয়ের আজব বাজী! সমস্ত বিশ্বতত্ত্ব ন্যায় ওই চারিটী পদার্থ দিয়া ছাঁদিয়া লইলেন—**প্রয়োজনের**

প্রবর্ত্তনায় অদ্বৈত **প্রমেয়কে প্রমাণ** করিতে গিয়া অহরহঃ **সংশয়ের** সৃষ্টি করিতেছি—এইটাই আমাদের জীবন, জগতের পরিণাম।—গরজ বড় বালাই কিনা!

এই আপদের হাত হইতে বাঁচি কি করিয়া? ন্যায় বলিলেন, যত বিপাক ঘটায় ওই প্রমাণ-তত্ত্ব। প্রমাণ যতই ঘোরালো হয়, প্রমেয় ততই অস্পষ্ট, আবিল, অশুদ্ধ হইয়া উঠে। প্রমাণকে স্বচ্ছ কর, প্রমেয় শুদ্ধ হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। প্রমাণ চরম স্বচ্ছতায় লীন হইয়া যায়, পতঞ্জলির ভাষায়, নিরুদ্ধ বা পরিশুদ্ধ চিত্ত স্বকারণে লীন হয়। প্রমাণ লীন হইয়া গেলে থাকে শুধু অভেদ, এক, অদ্বিতীয়; তাহাকে প্রমেয়ও বলিতে চাই না, কেননা তাহা হইলেই আবার প্রমাণের জের টানিয়া আনিতে হয়। অদ্বৈতকে কোনও কিছু নাম দিতে ন্যায়ের আপত্তি। তাই প্রমাণের তরফ হইতে একটা নিগেটিভ সংজ্ঞা দিয়া বলিলেন—ওটা দুঃখ-নিবৃত্তি। আমরা বুঝি উহাকেই সহজদর্শনে পজিটিভ করিয়া বলা হয় আনন্দ। কিন্তু বলিয়া রাখি, এ আনন্দ প্রমাণ-বহির্ভূত। প্রমাণসম্মিত আনন্দ কিন্তু পঞ্চকোষের চরম কোষ—আনন্দময় কোষ। প্রমাণ-বৃত্তি রুদ্ধ হইলে আনন্দময় কোষও খসিয়া যায়—তখন "হিরণ্ময়ে পরে কোশে. বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।"—এই দিক দিয়া ন্যায় আর বেদান্তে গলাগলি।

ন্যায় ঠিক মনন-শাস্ত্র, প্রমাণ নিয়াই তাহার কারবার, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রথম চারিটী পদার্থ ছাড়া ন্যায়ের আর বারটী পদার্থই শুধু মনের ধাঁধাঁ। ন্যায়ের প্রতিপাদ্য হইলেও উহারাই ন্যায়ের লক্ষ্য নহে। ন্যায়ের লক্ষ্য প্রমাণের শুদ্ধি। ন্যায় বলিতেছেন, তুমি প্রমেয়কে চিনিবে কি করিয়া? প্রমাণ শুদ্ধ কর, প্রমেয় আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিবে। দর্শনের এই ধারা বুদ্ধদেবও অনুসরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবকে পরমার্থ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কেহ কোনও প্রশ্ন করিলে তিনি হাঁ-না কিছুই বলিতেন না; কিন্তু কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান, অকুশল কর্ম্মের পরিহার ও চিত্তের শুদ্ধি—এই তিনটীই ছিল বুদ্ধের শাসন। অর্থাৎ বুদ্ধদেব প্রমেয় সম্বন্ধে চুপ, কিন্তু প্রমাণশুদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহার প্রশস্ত নির্দ্দেশ। ন্যায়ে আত্মার প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু সে আত্মা অনুমেয়; অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধে লোকায়ত (Popnlar) মতকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা ন্যায়ে দেখা যায় না। প্রকারান্তরে বলিতে গেলে চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে ন্যায়ের ভাবটা নিগেটিভ; বুদ্ধদেবেরও তাই। নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে উভয়ে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। মোটকথা ন্যায় ও বৌদ্ধ-দর্শনে ঘনিষ্ঠতা অসাধারণ; সে কথা আর আজ নয়।

ষড়-দর্শনের টীকাকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছিলেন, ন্যায় প্রাথমিক দর্শন। দেহ ব্যতিরিক্তও কিছু আছে—এইটুকু প্রতিপাদন করিয়াই ন্যায় চুপ করিয়া গিয়াছেন, পরমার্থতত্ত্বের কোনও সংজ্ঞা দিবার চেষ্টা করেন নাই। কথাটা খুবই গভীর।

ন্যায় পর্য্যন্ত গেল মননের এলাকা। ইহার পরে আসে তৃতীয় উপায়—নিদিধ্যাসন। চৈতন্য ও জড়ের গ্রন্থি এত নিবিড় হইতে পারে যে শুধু মননেও আর কুলায় না, শুধু প্রমাণশুদ্ধিতেই সব হয় না—অভ্যাস-যোগের প্রয়োজন হয়। এইখানেই পাতঞ্জলের উপযোগিতা। পাতঞ্জল বলিতেছেন, হয়ত সব শুনিলে, সব বুঝিলেও—নিমেষের মত একবার চরমতত্ত্বের ঝলক অন্তরে বিদ্যুৎশিখার মত কাঁপিয়া গেল, কিন্তু তবুও তাহাকে ধরিয়া রাখার সাধ্য তোমার হইল না। তখন উপায়?—উপায় যোগাভ্যাস। কেন ধারণা হয় না জান?—জড়ের আকর্ষণ অতি প্রবল

বলিয়া। তুমি তাহার বাহুর বাঁধন ছাড়াইতে চাও, কিন্তু পার না—কারণ ঠিক ঠিক গুণের প্রতি তোমার বিতৃষ্ণা উৎপন্ন হয় নাই; তোমার **বৈরাগ্য** অভ্যাস হয় নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর যত্নসহকারে বৈরাগ্যের অভ্যাস করিলে তবে যদি ধারণা স্থির হয়। এই স্থৈর্য্যের উপায়ই পাতঞ্জল নানা ভঙ্গীতে বর্ণনা করিয়াছেন। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন, মন স্থির করা যায় কেবল মাত্র অভ্যাস দ্বারা ও বৈরাগ্য দ্বারা। পাতঞ্জলে যে সমস্ত যোগবিঘ্নের উল্লেখ আছে, তাহাদের আলোচনায় বোঝা যায়, জড় ও চৈতন্যের মিশ্রণ কতখানি নিবিড় হইলে তবে তত্ত্ব-দর্শনের পক্ষে নিদিধ্যাসন প্রয়োজন হইতে পারে।

যোগেরও আবার দুইটী ভাগ—রাজযোগ আর হঠযোগ। ইহাদের এক একটা পারিভাষিক অর্থ আছে বটে, কিন্তু শুধু মৌলিক অর্থের দিকে চাহিয়া বিচার করিলে একটী হয় অনায়াস, আর একটী সায়াস। রাজযোগ সার্ব্বভৌম, হঠযোগ জবরদস্তী। রাজযোগের তত্ত্বগুলি সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে সংগ্রহ করা; হঠযোগে বিশেষ কৌশল প্রয়োজন। রাজযোগের চেয়ে হঠযোগের অধিকারী আরও স্থূলসেবী। তাই আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছিলেন, "অশক্তো রাজযোগে স্যাৎ হঠযোগেঽধিকারবান্।"—রাজযোগ করিবার মত দার্শনিক ব্রেণ যাহার নাই, শরীরের কসরৎ করিয়া হঠযোগ সাধন তাহারই উপযোগী। অবশ্য হঠযোগে যে প্রচণ্ড পুরুষকার রহিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু চৈতন্য ক্রমেই জড়দ্বারা সম্পুটিত হইয়া মুক্তির উৎকট চেষ্টায় কিরূপ আকুলিবিকুলি করিতেছে—তাহাই বুঝাইবার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা। সাধনা যতই জটিল হয়, ইভলিউশনবাদী (কি আধিভৌতিক, কি আধ্যাত্মিক) ততই খুসী, কেননা তাহার কাছে ইহাই উন্নতির নিশানা।

মূল পাতঞ্জলে হঠযোগের প্রসঙ্গ অতি সামান্য। কিন্তু পরবর্ত্তী আচার্য্যেরা অমানুষিক পরিশ্রমে যে সমস্ত অসামান্য কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের আলোচনা করিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। এই প্রসঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের কীর্ত্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উৎকট সাধনা এইখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। এখন পর্য্যন্ত সমাজের অতি নিম্নস্তরে যে সমস্ত অতি অদ্ভুত অথচ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ সাধনার প্রচলন রহিয়াছে, তাহাদের কথা ভাবিতে গেলে মানুষের অদম্য কৌতূহল ও দুঃসাহসিকতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। কিন্তু সকলেরই মূলে সেই এক গলদ—ভাতের গ্রাস সোজাসুজি মুখে না তুলিয়া মাথার চারিদিকে ঘুরাইয়া তোলা! আর এইটাতেই দেখি আজকাল লোকের আমোদ বেশী।

এতক্ষণে নিদিধ্যাসনের পর্ব্ব সমাপ্ত হইল। সাধনার কেরামতিতে সহজ কি করিয়া কুটিল হইয়াছে, তাহার একটুখানি আভাস দিলাম। আমাদের মূল বক্তব্য এই—ভারতীয় দর্শনের ধারা ইভলিউশনের থিয়োরী মানে না; যদি সে কোনও বৈজ্ঞানিক থিয়োরী মানে তো সে ইনভলিউশনের। বহির্জগতে যে আইনটা বলবৎ, অন্তর্জগতে হয়ত তাহার বিপরীতটাই চলে। ইতিহাসের বিচারে, সাহিত্যের বিচারে, ভাষাতত্ত্বের বিচারে দর্শনের অভিব্যক্তির পরম্পরা যাহাই দাঁড়ায় না কেন, অন্তর্দর্শীর কাছে ভারতীয় দর্শনের এই একটী মাত্র পথ অতিবাহন করা ছাড়া নান্যঃ পন্থাঃ। এই কথাটা বুঝিতে পারিলে যাহারা ভারতবর্ষের গোঁড়া কিম্বা যাহারা নিন্দুক, উভয়েরই কল্যাণ হইবে।

আর একটা কথা বলিয়া এই সুদীর্ঘ আলোচনার শেষে পাঠকদিগের নিকট হইতে বিদায় লইব। বেদমূলক যে সহজ মীমাংসার কথা প্রথ-

সেই বলিয়াছিলাম, পরবর্ত্তী যুগে তাহার অনবদ্য স্বরূপটী মানুষের চিত্তে আঁকিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন আচার্য্য শঙ্কর। একদিক দিয়া শঙ্কর সত্যের অর্দ্ধেকখানা মাত্র বলিয়াছেন, কেননা তাঁহাকে সহজ প্রবক্তারূপে নয়, সংস্কারকরূপে আবির্ভূত হইতে হইয়াছিল। তাই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বিশ্লেষণের পথ ধরিতে হইয়াছে, পদে পদে লড়াই করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। তবুও তাঁহার অন্তরে যে সুরটী বাজিতেছিল, তাহা খাঁটী বৈদিক সুর। তাহার দুইটী প্রমাণ মাত্র উপস্থিত করিব।

শঙ্কর-দর্শনের মাঝে একটা জবরদস্তির ভাব আছে। জ্ঞান এবং কর্ম্মে কখনও সন্ধি হইতে পারে না—এটা শঙ্করের প্রসিদ্ধ উক্তি। সমুচ্চয়-বাদ আর অসমুচ্চয়বাদে বেদান্তের চিরকেলে ঝগড়া। শঙ্কর কোথাও সমুচ্চয়বাদের আমল দিতে চান না। তিনি বলেন, জ্ঞানকে মানসী ক্রিয়াও বলিতে চাই না—জ্ঞান, মোক্ষ, ব্রহ্ম, আত্মা—সব পর্য্যায় শব্দ—সমস্তই স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ বস্তু—আবার যাহা আত্মচৈতন্যের সহিত অভেদে বর্ত্তমান, তাহার দরুণ তো কোনও প্রমাণও প্রয়োজন হইতে পারে না। শঙ্কর বলেন, ঠিক তাই। তাহা হইলে শাস্ত্র রচনা কেন? শঙ্কর বলেন, ওটাও সেই অবিদ্যারই অন্তর্গত; যতক্ষণ অজ্ঞান, ততক্ষণই শাস্ত্র জ্ঞান। তবুও শাস্ত্রের একটা সার্থকতা আছে—দুটা কথা বলিয়া ভুল ভাঙ্গাইয়া দেওয়া। প্রত্যক্ষ হইলে তো ভালই, নতুবা অন্যের প্রত্যক্ষকে আমাতে সঞ্চারিত করা, গুরুর প্রত্যক্ষ শিষ্যের মাঝে ঢুকাইয়া দেওয়া। এ ছাড়া আর কোনও প্রমাণ এখানে খাটে না। অনুমানাদি মনের কারসাজি, ও সব অচল। তাই বেদান্তে শেষপর্য্যন্ত দুইটা প্রমাণই মাত্র কাজে লাগে—এক প্রত্যক্ষ আর এক আপ্ত। তুমি বলিলে, আমি শুনিলাম—'আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা'—'ইতি ধীরেভ্যোঽনুশুশ্রুমঃ' (উপনিষৎ) এই হইল সহজে পাওয়া।

এইখানেই মনে হয়, স্বরূপ ফিরাইয়া দেওয়া তো সোজা কথা নয়; 'তুমি ব্রহ্ম' বলিলেই কি কথাটা চট্ করিয়া বুঝিয়া ফেলি? এইখানে আসে অধিকারী-বিচারের কথা। শঙ্কর হাল ছাড়িবার পাত্র নন; বলিলেন, ঠিক যদি অধিকারী হয়, তবে শোনামাত্রই চট্ করিয়া বুঝিয়া ফেলিবে বই কি। সে অধিকারী কেমন?—তার আছে বিবেক, আছে বৈরাগ্য, আছে শম-দমাদি ষট্‌ক-সম্পত্তি, আছে মুমুক্ষুত্ব। এই যে অধিকারীর চারিটী গুণ বলা হইল, এ কিন্তু এক একটী দর্শনের চরম। সাংখ্যের শেষ কথাই ছিল বিবেক; পাতঞ্জলের চরম দান, গুণবৈতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য; ন্যায়ের চরম দান প্রমাণশুদ্ধি বা ষট্‌কসম্পত্তি; আর মুমুক্ষুত্ব হইল ভক্তি। (এটা শঙ্করেরই নিজের মুখের কথা—বিবেকচূড়ামণিতে আছে।) তাহা হইলে দেখা যায়, বেদান্তের যে যথার্থ অধিকারী, সে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়-বৈশেষিক ও ভক্তিদর্শন পার হইয়া আসিয়াছে। এতগুলি দর্শনের তত্ত্বে যে পরিপক্ব, সে মহাবাক্য শোনামাত্র স্বরূপ বুঝিয়া ফেলিবে—নদী-তীর্ণ দশম ব্যক্তির ন্যায়, কিম্বা হৃতমণি ব্যক্তির স্বীয় কণ্ঠে মণি দর্শনের ন্যায়। এই দিক দিয়া কথাটা অত্যন্ত কঠিন; শঙ্করের প্রতিজ্ঞাও যেন প্রায় অসম্ভব; মনে হয়, আশী মণ তেলও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না। কিন্তু এই কথাটা উল্টা-ইয়া দিলেই আর একটা তত্ত্ব পাই—এতগুলি দর্শন পার হইলে যদি বেদান্ত মিলে, তো যাহার অসাধনে বেদান্ত মিলিয়াছে, তাহার ভিতর হইতেই তো এই দর্শনগুলি বাহির হইয়া আসিবে। অসাধনে বেদান্ত মিলে কিনা, সেইটাই প্রশ্ন।

তাহার জবাব এতক্ষণ ধরিয়া দিয়া আসিয়াছি। দেখিয়াছি মিলে; এর উপর আর কথা নাই।

শঙ্করদর্শনের আর একটী কথা—শঙ্কর অভিমন্যুর মত ব্যূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বাহির হইতে পারিয়াছিলেন কি? কারণ, বাহির হইবার সঙ্কেত জানা না থাকিলে সহজের কথা বলাই যে ঝকমারি। জানি, বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। দার্শনিক সেটা বুঝিতে পারেন কিনা জানি না, কিন্তু কবি বোঝেন। যাঁহার কৌতূহল হয়, আনন্দ-লহরী পড়িয়া দেখিতে পারেন—হয়ত বা ওপারের সহজ কথার আভাস তাহাতে পাইবেন। আর সব চেয়ে বড় প্রমাণ শঙ্করের জীবন। জ্ঞান-কর্ম্মে অসমুচ্চয়বাদীর মাঝে এত কর্ম্ম কি করিয়া জমা ছিল, সেটা একটা পরম বিস্ময়! শঙ্করের দার্শনিক ব্যাখ্যাকারের চেয়ে বাঙ্গালার "নটো" গিরিশ শঙ্করকে যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহার বুঝি আর তুলনা মিলে না। শঙ্কর যে সহজের পসারী, সে কথাতে আর কোনও সংশয় থাকে না যখন গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য্য' পড়ি। রামকৃষ্ণের বেদান্ত বুঝি এমন করিয়া আরও কাহারও মাঝে ফলিয়া উঠে নাই!

অধিকার

—(∗)—

সর্ব্বত্রই অধিকারী-বিচার দেখতে পাই। এমন কি ঋষি-যুগেও দেখা যায়, উপযুক্ত অধিকারী না হলে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিতে ঋষি নিষেধ করছেন। যদিও তাঁরা উদার, সার্ব্বভৌম আদর্শবাদী, তবু তাঁদের মাঝেও অধিকার-নির্ব্বাচনের প্রতি একটা বিশেষ লক্ষ্য রয়েছে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমের প্রবর্ত্তন হল শুধু এই উদ্দেশ্যেই। ছোট-বড়, অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ, যোগ্য-অযোগ্য—এ চিরকালই থাকবে, এ বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। ছোট যে চিরকালই ছোট থাক্‌বে এ কথা তো কেউ বলছে না, সময়ে যে সেই বড়র স্থান অধিকার করে বসবে। সবাই যদি পরস্পরকে পরস্পরের সহায়ক বলে মনে করে, নিজকে সঙ্ঘ হতে, সমাজ হতে পৃথক বলে অনুভব না করে, তবেই আর কোথায়ও বিরোধের সৃষ্টি হয় না। নিজকে যখন বৃহতের সংস্পর্শ হতে নিঃশেষে বিচ্ছিন্ন ভাবতে যাই, তখনই যত দুর্ব্বলতা আর অভাব জেগে ওঠে। অভাবটাই তখন বিশেষ করে নজরে পড়ে বলে এক রাত্রেই বড় হবার ফিকির খুঁজি, শক্তির চেয়ে প্রলোভনেই বেশী প্রলুব্ধ হয়ে পড়ি। ঈর্ষ্যায় মানুষকে নীচে নামিয়ে নিয়ে আসে, বড়কে দেখলে তার মন বড় হবার জন্য উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না, তাকে কেন ছোট করে রাখা হল এই হয় তার নালিশ। বড়কে স্বার্থপর ভাবছ, কিন্তু সে তো কোনো দিকে তোমার পথ অবরুদ্ধ করে বসে নি। লোভী ছেলে মায়ের ন্যায্য বণ্টনে সন্তুষ্ট হয় না, ছোট হয়েও সে বড়র ভাগ কেড়ে আনতে চায়। যার পেটে যেমন ধরে মা তাকে তেমনি পরিবেশন করেন—

এতে কি প্রমাণ হয়, মা ছোট ছেলেকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, আর বড় ছেলেকে বেশী আদর করেন? ছোটর অভিমান হতে পারে কোন জায়গায়?—সে যদি প্রতি পদে-পদে আহত হয়—তাকে যদি উপযুক্ত স্বাচ্ছন্দ দেওয়া না হয়। গাছের চারদিকে বেড়া দেওয়া হয়; এখন গাছ যদি মনে করে, কেন আমাকে আটকিয়ে রাখা হল, তবে তো আর তার বাড়া চলে না। তাহলে যে অপরের কবলে পড়ে তার জীবনটী পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়। ঈর্ষ্যা-প্রণোদিত হয়েই যদি ঋষিরা অধিকার-নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করতেন, তবে ভাল আদর্শটাও দাঁড় করাবার কি প্রয়োজন ছিল? আমি যাকে ঘৃণা করি, তার মঙ্গলের জন্য তো আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে না। ঋষিদের মাঝে তো সে পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাই না; তা হলে অতি পাষণ্ডও কি করে মুক্তিলাভ করতে পারে, এ চিন্তাই বা তাঁদের হবে কেন? সময় হলে কেউ অপরকে গায়ের জোরে আটকিয়ে রাখতে পারে না—এই হল আসল কথা। বিরোধ ঘটে অতিব্যস্ততায়।

সকলে এক সঙ্গে গড়ে উঠবে, এরূপ অন্যায় আব্দার ও দুরাশা করে, অনর্থক নিজকে অস্বস্তির মাঝে ফেলা ছাড়া আর কোন লাভ দেখতে পাই না। অনেক সময় যে অকারণ বেদনা পাই, তার ষোল আনাই বোধ করি নিজের অতিষ্ঠ গরজের কারসাজিতে। এক এক সময় মনে এত বল পাই, তখন আর নীচের খুঁটীনাটী বিষয়ের প্রতি মোটেই লক্ষ্য থাকে না, কাজেই গায়ের জোরে সকলকে নিজের স্তরে না আনা পর্য্যন্ত কিছুতেই যেন প্রাণে স্বস্তি পাই না। অহঙ্কারের তীব্রতায়, অন্ধ-দৃষ্টিতে আপন বুঝটাই সব চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তখন সবই ছোট, ঘৃণ্য, হেয়, আর আমিই কেবল একজন আদর্শ পুরুষ—এ ভাব মনের মাঝে গজ্ গজ্ করতে থাকে। নূতন পথ উদ্ভাবনের চেষ্টা হলে, মন রীতিমত ভয় পায়। কি জানি শত্রু এসে কোথা দিয়ে আক্রমণ করে বসে! এ আশঙ্কায় আগে থেকেই দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়ে যায়। রোগ যাতে না হয়, মূলে তার প্রতিকারের চেষ্টার প্রয়োজন, না আগে থেকেই রোগীর জন্য সহরে, গ্রামে, অসংখ্য হাঁস-পাতাল তৈরী করাই হিতৈষীর কর্ত্তব্য? বিদ্রোহ-বিপ্লব, অসুখ-অশান্তির সৃষ্টি যাতে না হয়, তা না করে, বিপ্লব যদি বেধে যায়, তার কি করে প্রতিকার করতে হবে—এ চিন্তাটাই আমাদের মাথায় খেলে বেশী। আগেকার যুগে দেখতে পাই, বাইরের বাহুল্যের চেয়ে ভিতরের সত্যকে তাঁরা বেশী করে শ্রদ্ধা করতেন। পরস্পরের প্রতি একটা সহানুভূতি ছিল—যা করেছিলেন রয়ে-সয়ে, বিচার বিবেচনা করে। সে যুগে সকলেই যে ব্যাস-বশিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন এমন তো নয়—মন্দ-কুৎসিৎ তখনও ছিল। দণ্ডকে তারা ক্ষুণ্ণ মনে গ্রহণ করেনি; বামন হয়ে চাঁদ ধরবার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষাটা তখন তাদের মনে খুব কমই জাগত। নিজের মনকেই তারা শুধু জানত না, অপরের মন অধ্যয়ন সম্বন্ধেও যথেষ্ট নিপুণতা ছিল। তাঁরা যা গড়ে গিয়েছেন, তিলে তিলে—কোন সময় বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায়নি। ভাব পেয়েই পথে ঘাটে তা ছড়াতে থাকেন নি।

সকলের রুচি তো আর সমান নয়—তাই গীতাকার বলেছেন, অজ্ঞানীর ভেদবুদ্ধি জন্মাতে নাই। তারা তাতে হিতে বিপরীত বোঝে। যিনিই সমাজের, দেশের মঙ্গল করতে গিয়ে তাঁর শুভ-প্রয়াসকে অতি দ্রুত ফলাও করতে চেয়েছেন, তাঁকেই ঘাত-প্রতিঘাতের দারুণ পীড়নে নাকাল হতে হয়েছে, শেষে হয়ত ব্যর্থ-জীবনের হাহাকার নিয়েই প্রাণ দিতে হয়েছে; এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল

নয়। আমি একা আছি, আমার আদর্শ হয়ত খুব উঁচুদরের; কিন্তু সমষ্টির মনোভাব উল্টো থাকলে, আমার আদেশ উপদেশে কোন ক্রিয়াই তো করবে না তাদের ওপর। জগতের পেছনে কি সোজা শক্তি ক্রিয়া করছে? কই, হঠাৎ তো জগৎশুদ্ধ লোকের মনের গতি কল্যাণের পথে নিয়োজিত হচ্ছে না? ক্ষুদ্র আশা কিনা আমাদের, তাই আশানুরূপ ফল না পেলে যেন বুক ভেঙ্গে যেতে চায়। এ সময় কেউ হাত-পা গুটিয়ে আত্মস্থ হয়ে গহ্বরে ঢোকেন, আর কেউ বিরুদ্ধ-শক্তির সঙ্গে আমরণ পর্য্যন্ত কেবল লড়াই করতে থাকেন। বলতে দুঃখ হয়, বিচার-শক্তির অপ্রতুলতা হেতু বহু ধনের অধিকারী হয়েও দুদিন পরে দেউলিয়া সাজতে হয় আমাদের।

সভা বুঝে কীর্ত্তন করতে হয়। আমার উপলব্ধি, যা সত্যের ওপর ভিত্তি করে অনায়াস হয়ে ফুটে উঠেছে, তা শত শত বাধা-বিপত্তির মাঝেও অটল থাকবে, তাই বিরুদ্ধে যথেষ্ট শত্রু থাকলেও আমার কি আসে যায়? আমি আজই দেশের স্রোতের বিরুদ্ধে আমার প্রত্যক্ষ সত্য উপলব্ধির কথা প্রচার করতে থাকব, এটা যেমন উদার প্রাণের কথা—তেমনি একে একদেশদর্শিতাও বলা যায়। জঙ্গলী হাতীকে একদিনে পোষ মানানো যায় না—তিলে তিলে অঙ্কুশের আঘাতে তার উগ্র, প্রচণ্ড স্বভাব সোজা হয়ে আসে।

মানুষের মঙ্গল করবার জন্য যে একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে, বিচার করে দেখতে গেলে তা নিজের বুদ্ধির, ব্যষ্টি আত্মার পরিতৃপ্তি বই আর কিছুই নয়। এটাও তো একটা কামনা। সত্যান্বেষী সন্ন্যাসীকে এও ত্যাগ করতে হবে। শুধু তাঁর মাঝে থাকবে শুভ-চিন্তা, প্রয়োজন হলে আপনি তার ভাবরাশি আকাশ-বাতাসে প্রচার হতে থাকবে। নির্ব্বাক, মৌনভাবে জগতের উপকার করছেন এমন লোক কি নাই? কিন্তু এ ধৈর্য্যটুকু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না দেখতে পাই। শক্তি আসে অনেকের মাঝে কিন্তু তাকে হজম করে সুনিয়ন্ত্রিত করে চালাবার ক্ষমতা অনেকেরই নাই। তাই অনেকে পেয়েও কিছু করতে পারে না। ক্ষণে-ক্ষণে আমাদের উৎসাহ হয়, প্রচার করতে হবে। আবার হঠাৎ অনুতাপ হয়—কই কিছুই তো করছি না। যেন করাটাই সবচেয়ে বড়—কি করব, শক্তিই বা কতটুকু আছে, এটা যেন একটা ভাববারই কথা নয়। কত কিছু করতে পারতাম, এ দুরাশাই বহুদিনের সংযমের বাঁধকে কল্পনার বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এতেই স্থান-পরিবর্ত্তন, এটা ভাল লাগছে, ওটা ভাল লাগে না—এমনিতর একটা অস্বস্তিপূর্ণ চঞ্চলভাব মনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে বসে।

উপস্থিতমত একটা কিছু চাইতে গিয়ে ভয়ানক ফাঁকিতে পড়তে হয়। দাতা-গ্রহীতা উভয়েই সেইজন্য সতর্ক হলে মঙ্গল হয়। শুকদেবের মত তেজস্বী বীর্য্যবান্ যুবকেরও জনকের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল—ব্রহ্মবিদ্যা লাভ। ঋষিরা অপাত্রে সব বিলিয়ে যাননি বলেই আজও হিন্দুধর্ম্ম এত ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝেও টিকে রয়েছে।

বৃন্দাবনলীলা মধুর বটে—কিন্তু এর জন্য কত সাধ্য-সাধনা করতে হয়েছে, তা ভেবে দেখেছ কি? কত যুগ-যুগান্তরের সাধনার ফলে একই সময় এতগুলো আধার এক সঙ্গে ফুটে উঠেছিল—তবে না তাদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা এমন জমেছে। আমাদের লক্ষ্য পড়ে কেবল বাইরটাই, ভিতরে তলিয়ে দেখি খুব কম। সন্তানের মুখ দেখতে গিয়ে দশ মাস দশ দিন মাকে কত কঠোর যন্ত্রণাই ভোগ করতে হয়, সে

কেবল সন্তানপ্রসবিনী জননীই জানেন। জগতে যা কিছু সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে, তার মূলেই সংযম-তপস্যা দুঃখ-কষ্ট রয়েছেই—এ ধরাবাঁধা কথা। ভিত পাকা না হলে যেমন কোন কিছুর স্থায়িত্ব হয় না, তেমনি মূলে কঠোর সংযম না থাকলেও ভাবের প্রতিষ্ঠা হয় না।

ভক্তিতে বিধি-নিষেধ

——(:০:)——

বাদো নাবলম্ব্যঃ—যে ভক্তিপথের পথিক, সে কখনও বাদ অবলম্বন করিবে না।

বাদ ন্যায়ের কথা। চিত্তে সংশয় উৎপন্ন হইলে তাহার প্ররোচনায় যে সমস্ত কথার সৃষ্টি হয়, ন্যায়ে তাহাকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। তন্মধ্যে তত্ত্ব জানিবার জন্য যে কথার অবতারণা করা হয়, তাহাকে বলা হয় বাদ। বাদও তর্ক বটে, কিন্তু কুতর্ক নহে। মনু ইহাকে অনুকূল তর্ক বলেন। গুরুর কাছে উপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে নানা প্রশ্নোত্তর দ্বারা চিত্তের সংশয় দূর করিয়া নেওয়া ইহার উদ্দেশ্য। আচার্য্যেরা এই প্রকার কথার অনুমোদন করিয়া থাকেন। পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন, "তর্ক্যতাং, মা কুতর্ক্যতাম্"—তর্ক কর, কিন্তু কুতর্ক করিও না।

আর দুইটী কথা বাদ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। অপর পক্ষকে নির্জ্জিত করিয়া নিজের পক্ষ স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে যে কথা হয়, তাহাকে জল্প বলে। আর নিজের পক্ষ কিছুই সমর্থিত হইল না, কেবল পরকে ভুলাইয়া দিবার জন্য যে কথার সৃষ্টি, ইহাকে বলে বিতণ্ডা।

ভক্তিতে বিতণ্ডার স্থান তো হইতেই পারে না। অন্তরের ধন অন্তরে লুকাইয়া আস্বাদন করা যাহার স্বভাব, সে যে অপরকে আহত করিবার জন্য বাচালতা করিবে, ইহা অসম্ভব। যে নারী সতী, সে অপর সতীর হৃদয় বোঝে, সুতরাং অপরের প্রতি বক্র দৃষ্টি করিবার তাহার অবকাশই হয় না। আমি আমার ঠাকুরকে ভালবাসি আমার মত, তুমি তোমার ঠাকুরকে ভালবাস তোমার মত; তোমার হৃদয় আমি বুঝি; বিতণ্ডা করিব কি লইয়া? ঠাকুরে ঠাকুরে তুলনা হয় না; তোমার ঠাকুরের নিন্দা করিলে তাহাতে আমার ঠাকুরকেই খাটো করা হয়। এই হেতু কারো ঠাকুর লইয়া বিতণ্ডা তো দূরের কথা, জল্পের সৃষ্টিও হইতে পারে না।

তবে ঠাকুরের কথা লইয়া বাদ হইতে পারে কিনা, ইহাই বিবেচ্য। মনে সংশয় উৎপন্ন হইলে তত্ত্বনিরূপণের জন্য বাদ-কথার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঠাকুরের তত্ত্ব জানিবার জন্য নির্দ্দোষ বাদকথায় আপত্তি কি?

ঋষি বলেন, না, ঠাকুরকে নিয়া বাদ কথারও সৃষ্টি করিতে নাই, কেননা **বাহুল্যাবকাশ-ত্বাদনিয়তত্বাৎ**, বাদে বাহুল্যের অবকাশ আছে, এবং উহা অনিয়ত। ভক্তের সরল প্রাণ, ঐকান্তিক বিশ্বাস; বেশী কথা ফেনাইয়া তুলিবার অবকাশ কোথায়? তোমাকে আমার ভাল লাগে; কেন লাগে তাহা জানি না—জানিতে ইচ্ছাও হয়

না; তোমার আবার তত্ত্ব কিগো? তুমি আমার, আমি তোমার,—এর চাইতে বড় তত্ত্ব আর কি আছে? রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ছেলে যেমন বলে, আমি জানি না, আমার মা জানে! একদিন মাষ্টার মাটীতে খড়ি পাতিয়া ন্যায়ের ফাঁকী বুঝাইতেছিলেন; একটু দেখিয়াই রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, ও সব রেখে দাও, আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে! উপমা দিয়া বলিতেন, কলসী, জলে পূর্ণ হইলেই চুপ, বুচি পাকিয়া আসিলেই চুপ। মা ছেলের তত্ত্ব বোঝে নাড়ীর টানে, কিশোর-কিশোরী পরস্পরের তত্ত্ব বোঝে আঁখির চপল ইঙ্গিতে; বুকের মূকভাষা থাকিতে আবার মুখের ভাষা কি গো?

তারপর তোমার বাদও অনিয়ত। মানিলাম, বিনীত, শান্ত হইয়াছি, সংশয় নিরসনের দরুণ গুরুর কাছে কথা উঠাইয়াছি—নিজের বুদ্ধির কেরামতী দেখাইব, এমন ইচ্ছাও নাই। কিন্তু তবুও কথাকে বড় ভয়। কি কথার পিঠে কি কথা আসিয়া পড়িবে, তাহা কে জানে? সংশয় মনের উত্তেজনা। কথায় কখনও বাস্তবিক সংশয় যায় না। পানাপুকুরের পানার মত এই দিক দিয়া সরাইয়া দিলে তো ওই দিক দিয়া হাজির! কথা দিয়া যাহা ব্যক্ত করিবার নয়, তাহার সম্বন্ধে সংশয় হইলেই যে কথায় তাহা দূর হইবে, বিশেষতঃ তর্ক-কথায়—এ তো এক রকম অসম্ভবই বটে।

তাহা হইলে কি কোন কথাই বলিতে নাই? যাহাকে ভালবাসি, তাহার চর্চ্চাও কি দোষের?

সে কথা তো বলিতেছি না।—**ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদ্বর্দ্ধক কর্ম্মাণ্যপি করণীয়ানি**—ভক্তি শাস্ত্রের মনন করিতে হইবে; ভক্তির বর্দ্ধক কর্ম্মও করিতে হইবে।

কথাটা কি জান, কলসী ভরিয়া গেলে পর জল উপচিয়া পড়ে, কলরব করিয়া পড়ে না, কলসীও মুখর হইয়া উঠে না বটে, কিন্তু তাহার সমস্ত শরীর আপ্লুত করিয়া, তাহাকে ভিজাইয়া-কাঁদাইয়া জল উপচিয়া পড়ে। তেমনি প্রাণ পূর্ণ থাকিলে ইষ্ট-গোষ্ঠি হয় না কি?—বাক্যের ছটা দিয়া মা ছেলের তত্ত্ব বুঝাইতে পারে না, কিন্তু ইটি-সিটি কত খুঁটী-নাটী কথা তুলিয়া কত অফুরন্ত রসের ফোয়ারা ছুটাইতে পারে। স্বামী-সোহাগিনী, সখীর কাণে কাণে স্বামী-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে না বটে, কিন্তু গত রজনীর তুচ্ছতম চটুলতাটুকুও এমন চমৎকার ভঙ্গী করিয়া বলিতে পারে যে দুই সখীর হৃদয় তরল হইয়া মিশিয়া যায় যেন, অতীত সুখের স্মৃতিও বর্ত্তমানের চেয়ে জীবন্ত হইয়া উঠে!

এমনি ধারা যখন হয়, অর্থাৎ কথা বলিবার মানুষ যখন থাকে, তখন কথা শুনিবার মানুষই বা থাকিবে না কেন?—ওই করিয়াই তো শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। যে জানিয়াছে, তাহারও কিছু বলিবার আছে—যদিও বলিয়া বুঝাইবার উপায় তাহার নাই। তেমনি যে আস্বাদন করিয়াছে, তাহারও বলিবার আছে। সে বলে, আর লোলুপ ব্যক্তি তাহা শোনে। একজন ভোজ খাইয়া আসিয়া গল্প করিতেছে; আর এক লোভী ছেলে থাবা পাতিয়া বসিয়া অবাক্ হইয়া তাহা শুনিতেছে। শুনিতে শুনিতে জিভে আর জল মানে না, হয়ত বা মুখের লালা একটু গড়াইয়া পড়িল, চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল, লুচি-মণ্ডার স্তূপ সে চোখের সাম্‌নে দেখিতে লাগিল;—সে ভোজের কথা শুনিতেছে না ভোজই গিলিতেছে, তার আর হুঁস্ নাই!—

সংশয় নিয়া নয়, এমনিতর লোভ নিয়া ভক্তিশাস্ত্রের মনন করিতে হয়।

আর ভক্তিবর্দ্ধক কাজও করিতে হয়। সেবায় প্রেমকে প্রকট করিবার ইচ্ছা তো স্বভাবতঃ হইবেই। তবুও চিত্তের মালিন্য-বশতঃ কাহারও

ভাবের অভাব হইতে পারে, তাহাকে কর্ম্মদ্বারা চিত্তের মালিন্য দূর করিতে হইবে, তবেই ভক্তির স্ফুরণ হইবে।

সাধনার কথাই যদি উঠিল, তাহা হইলে এখানে সে সম্বন্ধে আরও দুই চারিটা কথা বলিয়া রাখা ভাল।

প্রথমতঃ, সাধনায় কখনও ফাঁক দিতে নাই।—**সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তে কালে প্রতীক্ষ্যমাণে ক্ষণার্দ্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ম্**— তুমি প্রতীক্ষা করিয়া আছ, এমন দিন তোমার কবে হইবে, যে দিন তোমার বিষয়ের সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা বা লাভ ইত্যাদি কিছুই থাকিবে না; তাহা হইলে সে সময়কে সন্নিকট করিবার জন্য এক ক্ষণের অর্দ্ধেকাংশ কালও বৃথায় যাইতে দিও না।

মহাজনেরা ইহার পরিভাষা করিয়াছেন, অব্যর্থকালত্ব। ভক্তি-শাস্ত্রে ইহাকে একটী ভাবাঙ্কুর বলে।

সঙ্গে আরও সাধনা আছে।—**অহিংসাসত্যশৌচদয়াস্তিক্যাদিচারিত্র্যাণি পরিপালনীয়ানি**।—অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া, আস্তিক্য প্রভৃতি-চরিত্রগুণসমূহ পালন করিয়া চলিতে হইবে। এইগুলি সমস্ত সাধনারই গোড়ার কথা, চিত্ত শুদ্ধির উপায়। পরিভাষাভেদে কোথাও বা ইহাদিগকে শম-দম, কোথায়ও বা পরিকর্ম্ম, কোথাও বা ষট্‌কসম্পত্তি ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সাধনার বনিয়াদ ইহাদের দ্বারা পাকা না হইলে ভাবের ইমারত ধ্বসিয়া পড়ে।

সর্ব্বদা সর্ব্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈর্ভগবানেব ভজনীয়ঃ—সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানেরই ভজনা করিবে। খুব খোলাখুলি কথা—যুক্তির মারপ্যাঁচ কোথায়ও নাই। তবে কিনা এর মাঝেও একটু রহস্য আছে। "নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানেরই ভজন করিবে।"—**ভগবানেরই** ভজনা করিবে, আর কারু নয়, এমনি একটা জোরের কথা। ভক্তি-ভালবাসা তো প্রাণের সহজ স্ফুরণ; তার মাঝে এই জোরটুকু কেন? জোরটুকু সাধনতত্ত্বের দিক দিয়া নয়, বস্তুতত্ত্বের দিক দিয়া। অর্থাৎ তোমাকে যে নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানকেই ভালবাসিতে হইবে, এমন কোন জেদ করা হইতেছে না। আসল কথা কি জান, মানুষ যদি ঠিক ঠিক নিশ্চিন্ত হয়, তাহা হইলে ভগবান ছাড়া আর কিছুকেই যে সে ভালবাসিতে পারে না। জগতে ধন বল, জন বল, স্ত্রী-পুত্র, মান-যশ, যাই কিছু বল না কেন, অবান্তর যে বস্তুকেই তুমি ভজনা করিতে যাইবে, তাহার সঙ্গেই আসিয়া জুটিবে সর্ব্বগ্রাসিনী চিন্তা। আর কারু গোলামী করিয়া চিন্তার হাত হইতে এড়ান যায় না—এক ভগবান ছাড়া। একমাত্র তাঁর চরণ ছুঁইতে পারিলেই সকল চিন্তার হাত হইতে বাঁচা যায়। এইটুকু ইঙ্গিত করিবার জন্যই ঋষি বলিলেন, ভগবানকেই ভজনা করিবে, আর কাউকে নয়।

ভগবানের ভজনায় নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কেন? —জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুলিলে সে কেমন করে?—তার ছট্‌ফটানীর আর অন্ত থাকে না। আবার তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিতেই সে পাখা কাঁপাইয়া আনন্দে সাঁতরাইয়া বেড়ায়। জলই তার জীবন, জলে সে নিশ্চিন্ত। আমাদেরও যে ভাবনা-চিন্তার এত ছট্‌ফটানী, তা ওই দরুণ। বাসনার তাড়নায় জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছি। যত কিছু আকুলি-বিকুলি, তা বাস্তবিক বিষয়ের জন্য নয়, বিষয়ের মাঝে আড়াল হইয়া আছেন যে রসস্বরূপ, তাঁহারই দরুণ। আমরা চাই সুখ, বিষয় নয়। আর সুখের অবধি ভগবান্। তাই যত কিছু চাওয়া

তাহাতে লক্ষ্য ভগবান, উপলক্ষ্য বিষয়। উপলক্ষ্যেই চিন্তা বাড়ায়, লক্ষ্য পাইলেই নিশ্চিন্ত হইয়া যাই।

ভজনার একটা খুব সহজ সঙ্কেত আছে—"**স কীর্ত্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবত্যনুভাবয়তি ভক্তান্**—তাঁর কীর্ত্তন করিলে তিনি শীঘ্রই আবির্ভূত হন, ভক্তদিগকে তাঁহার অনুভব করাইয়া দেন। ভক্তের শ্রেষ্ঠ ভজন কীর্ত্তন।—নাম-কীর্ত্তন গুণ-কীর্ত্তন, লীলা-কীর্ত্তন।—পর পর অধিকার বুঝিয়া কীর্ত্তন করিতে হয়। যাহার চিত্ত কিছুতেই স্থির হইতেছে না, সে একতারে উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তন করিয়া যাক্, ক্রমে সমস্ত মেঘ কাটিয়া মনটী শরতের আকাশের মত নির্ম্মল হইয়া উঠিবে। তারপর গুণকীর্ত্তন আছে—সাধ্যের সঙ্গে সাধকের সম্বন্ধ কি তাহারই বিচার। আর চিত্ত সম্পূর্ণরূপে কামনাবর্জ্জিত হইলে, সখীভাবের স্ফূরণ হইলে লীলাকীর্ত্তন।

কীর্ত্তনের যে কত বড় শক্তি, তাহা আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিব কি! মহাপ্রভু যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছিলেন, আজও তাহার তরঙ্গে দেশের আকাশ-বাতাস কাঁপিতেছে। মহাপ্রভুর পর কত সম্প্রদায় উদ্ভব হইল, কত ধর্ম্মমত প্রচার হইল—কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সকলেই কীর্ত্তনকে ভজনার অন্যতমরূপে গ্রহণ করিয়াছে—এমন কি খৃষ্টান মুসলমান পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। কীর্ত্তন একটা যুগধর্ম্ম।

কেন এমন হয়?—মানুষের স্বভাবটীকে বজায় রাখিয়া অথচ সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া আর একটী আনন্দময় ভজনার সঙ্কেত আবিষ্কার কর দেখি!—ঢুঁড়িয়া দেখ, এমনটী আর পাইবে না।

মানুষ একলা হইতে ভয় করে—পাহাড়ের গহ্বরে বসিয়া বিবিক্ত সাধনা তাহার কাছে অস্বাভাবিক, উৎকট জবরদস্তী। কিন্তু কীর্ত্তনে তো সে ভয় নাই—তোমার আপন জনকে লইয়া কীর্ত্তন কর। আনন্দ আরও জমিবে ভাল।

তুমি ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে চাও?—কীর্ত্তন কর। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় নিরোধের ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় আর নাই। আর এ নিরোধ হইতেছে শুকাইয়া মারা নয়, পূর্ণ তৃপ্তি দিয়া নিরোধ। কেমন করিয়া তাহা বলিতেছি।

পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাঝে শ্রেষ্ঠ হইতেছে চক্ষু ও কর্ণ। রূপ দেখিয়া আত্মহারা হই, সুর শুনিলে গলিয়া যাই। তার মাঝেও আবার চোখের চেয়ে কাণকে বলি বড়। ময়ূর দেখিয়া মন মজে, কিন্তু যেই তার কণ্ঠে শুনি কের্কশ কেকা-রব, অমনি চিত্তটা বিরূপ হইয়া উঠে। আবার কালো কোকিলের পঞ্চম স্বরে সব ভুলাইয়া দেয়; কোকিল যে কুরূপ, সে কথা খেয়ালই করি না। শ্রীমতী বাঁশী শুনিয়া মজিয়াছিলেন, শেষে কালো দেখিয়া আপশোষ করিতে হয় নাই।—দেখ, ন্যায়ের যুক্তি দিয়া প্রমাণ করিয়া দিলাম, রূপের চেয়ে ধ্বনি বড়। আর সেই ধ্বনির ফোয়ারা উৎসারিত হয় কীর্ত্তনে—অতএব কর্ণরসায়ণ কীর্ত্তন বাস্তবিকই সর্ব্বেন্দ্রিয়তর্পী। আরও গূঢ় কারণ আছে; তবে কিনা সে সব দর্শন-বিজ্ঞানের কচ্‌কচি, সে এখন থাক্।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মাঝে শ্রেষ্ঠ বলিবে, বাক্। আজ জগৎ যদি নির্ব্বাক্ হইয়া যাইত, তাহা হইলে এ যে মরুভূমি হইয়া পড়িত। দশকে এক করিবার সাধন এই বাক্। ইন্দ্রিয় দিয়া যে আনন্দ উপভোগ করি, অপরকে তাহার আভাসটুকু দিবার চেষ্টা করি এই বাকের সহায়ে। রূপ দেখিয়া ডাকিয়া বলি, ওরে দেখে যা! আমার কণ্ঠের ধ্বনি শুনিয়া অপরে চমকিয়া উঠে—ছুটিয়া আসে, ভাবে, না জানি কি! খোলে আঘাত পড়িল না বুকের মাঝে ঘা পড়িল; গানের পদ

কানে বাজিল, আর এক অপরূপ জগৎ চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিল। সে আনন্দময় জগতে আমি একা নই—সবাইকে নিয়া সে কি মত্ততা, সে কি আনন্দ! বাক্‌ আর কর্ণ, বলা আর শোনা—এই হইল জগতের সেরা সুখ। কীর্ত্তনে সেই সুখ সম্পূর্ণ, কেননা সেখানে সবাই বলে এবং সবাই শোনে, আর যা বলে, তা সুরে রূপায়িত করিয়া। শব্দের সুর—যেন ব্রহ্মের মায়া! মায়া কত মধু! সেই মধু উপচিয়া পড়ে কীর্ত্তনে।

আর কীর্ত্তনে নৃত্য!—আনন্দের পূর্ণাভিব্যক্তি। রুচির অঙ্গবিক্ষেপে ভাবের অপরূপ ব্যঞ্জনা, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তি। কীর্ত্তনে সবাই নাচে; কে দেখে তা জানি না, কিন্তু সবাই নাচে। নৃত্য যে দেখে, তার কাছে তো সুন্দর বটেই. কিন্তু সে দ্রষ্টৃ পুরুষের কথা বলিতেছি না। যে নাচিয়া গলিয়া পড়ে—সে যে নিজের কাছেই কত সুন্দর, কত অপরূপ!

যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, কীর্ত্তনের মত ভজনের এত বড় আর্ট, আর এমন সহজ, স্বাভাবিক, সর্ব্বজনবোধ্য, সামাজিক আর্ট বুঝি আর নাই। অন্ততঃ আমি তো ভাবিয়া পাইতেছি না, ভবিষ্যৎ যুগে এর চেয়ে সর্ব্বজনোপযোগী অথচ ইন্দ্রিয়মাদন ভজন-পন্থা আর কি আবিষ্কৃত হইতে পারে।

সকলকে নিয়া ভজনা - সে পাইয়াছিলাম বেদে, আর পাইতেছি এই কীর্ত্তনে। বেদের ঋষি একলার কথা বলেন না, বলেন সবার কথা। গায়ত্রীমন্ত্র একা আমার কথা নয়, **আমাদের কথা**। এই সহজ ভাবটুকু আবার পাই কীর্ত্তনে। মাঝে গিয়াছে একান্তীর বিবেক-সাধনা। তার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু সে সহজ নয়।

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

——(°*°)——

১৮ বৈশাখ
১ মে রবিবার

বেলা ৮ টার সময় বাবা কালীকম্বলীওয়ালার ওখানে চিঠি পাওয়া যাবে রাষ্ট্র হয়েছিল, কাজেই আমরা কয়েকজন চিঠি আনবার জন্য সকাল হতে বেলা ৯ টা পর্য্যন্ত বাবা কালীকম্বলীওয়ালার ছত্রশালায় বসে ছিলাম। যখন আজ চিঠি পাওয়া যাবে না জানতে পারলাম, তখন নেপালীবাবাকে দেখতে গেলাম। নেপালীবাবাকে দেখতে যেতে দেরী হচ্ছে বলে পূর্ব্ব হতেই উদগ্রীব ছিলাম। আজ তিনি ভাল আছেন। তবুও তাঁকে রীতিমত ঔষধ দিচ্ছি।

বেলা ২ টার সময় আবার শুনতে পেলাম, সদাব্রতের চিঠি বিলি হচ্ছে। তখনই আবার ছুটলাম। ঘণ্টা দুই বসে থেকে চিঠি না পেয়ে বাসায় ফিরে এলাম। শুধু সদাব্রতের চিঠির জন্যই আমরা বদরীর পথে রওনা হতে পারছি না। বাসায় নেপালীবাবার কথা সকলের কাছে

গল্প করাতে সকলেই নেপালীবাবাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছেন। আজ বাসার সকলকে সঙ্গে করে বিকালবেলা নেপালীবাবার কাছে গেলাম। তাঁর আর কোন অসুখ নাই, শুধু দুর্ব্বলতাটুকু আছে। কাজেই অন্য সকল ঔষধ বন্ধ করে শুধু মকরধ্বজ দিলাম। তিনি কিন্তু ঔষধ খেতে নারাজ। আমি যাবার পূর্ব্বেই চেৎরামকে "আর ঔষধ খাব না" বলে রাখেন, অথচ আমি যেয়ে যখন আব্দার করে ধরে বসি. তখন না খেয়ে থাকতে পারেন না। আর কারু কথা না শুনলেও কিন্তু আমার আব্দার সর্ব্বদাই রক্ষা করেন। আমি দু'বেলা গিয়েও সদাব্রতের চিঠি পাইনি বলে তিনি বলিলন, "উনকী ধর্ম্মশালা ঔর ছত্রশালামেঁ বহুত হী ধর্ম্মকা ব্যভিচার হো রহে হৈঁ। ইস লিয়ে সাধারণ সভা-সমিতিয়োঁ কে তরফ সে জোর আন্দোলন হোনা চাহিএ। ঔর কোঈ শিক্ষিত বঙ্গালী জব্‌তক্‌ ইনকা মৈনেজর্‌ নহী হোঙ্গে, তব্‌ তক্‌ ইস্‌ ব্যভিচারোঁ কা কুছ সুধার নহী হো সক্‌তা হৈ।" তিনি বাঙ্গালীর বিশেষ পক্ষপাতী, প্রায়ই বলতেন, "বঙ্গালিয়োঁকে মাফিক জ্ঞান কিসী কা নহী হৈ, বঙ্গালী ভারতবর্ষকা লাট হৈঁ, উনকা দিমাগ বহুত অচ্ছা হৈ।" মায়েরা সঙ্গে ছিলেন বলে তিনি বেশী সময় থাক্‌তে দিলেন না, এ দিকেও রাত্রি হয়ে এসেছে, অমাবস্যা রাত, কাজেই আমরাও দেরী না করে শিগ্‌গির বাসায় চলে এলাম। নেপালীবাবা বলিলেন, "আপকো চিঠ্‌ঠি কাল মীল জায়গী।"

খুব সকালেই উঠে বাবা কালীকম্বলীওয়ালার

১৯ বৈশাখ
২ মে সোমবার

ওখানে যেয়ে উত্তরাখণ্ডের চারিধামের ৪৬টী সদাব্রতের চিঠি পাওয়া গেল। আমাদের আর কেউ চিঠি পেলেন না, এত বেশী ভিড় হয়েছিল যে চিঠি আনতে প্রাণান্ত হয়েছিল। নেপালীবাবার. কথা ফলে গেল। চিঠি নিয়ে নেপালী ছত্রে গিয়ে নেপালীবাবাকে বলে এলাম। আগরা হতে একজন ফটোগ্রাফার হৃষীকেশে এসে ফটো তুলছে, Card size ফটো তুলে দেয়। আমাদের ইচ্ছা হল, নেপালীবাবা সিদ্ধ মহাপুরুষ, তাঁর ফটো তুলে নিয়ে যাব। ফটো তোলবার জন্য তাঁর আদেশ নিয়ে এলাম। বিকাল বেলা হরিদাস ভায়ার সঙ্গে ফটো তোলবার জন্য ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে নেপালী ছত্রে যাই। দু'রকম ফটো তোলা গেল। একখানাতে শুধু নেপালীবাবা বসে আছেন, আর একখানাতে নেপালীবাবার পেছনে দক্ষিণে আমি, মাঝখানে তাঁর শিষ্য ছত্রের ম্যানেজার চেৎরামজী, তারপর হরিদাস ভায়া, আমরা তিনজন দাঁড়িয়েছিলাম, তিনি বসেছিলেন। ফটো তুলে দু'রকম দুখানা তাঁকে দিলাম। গতকল্য আমার সামান্য জ্বর ও সর্দ্দি হওয়াতে শরীরে খুব ব্যথা হয়েছে। আজও বিকাল বেলা অসুখ হওয়াতে আমি তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্য ব্যস্ত হলাম। তিনি আমার অসুখের সংবাদে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়্‌লেন এবং তখনই চেৎরামকে গরম চা করে আন্‌বার জন্য আদেশ দিলেন, আমাকে আস্‌তে দিলেন না। আমার চা খাওয়া অভ্যাস নাই, কিন্তু তাঁর আদেশে খুব গরম গরম চা প্রায় তিন পোয়া পরিমাণ খেলাম। আমাদের বাঙ্গালা দেশের মত তাঁরা চা পান করেন না, দুধ, চিনি ও তার সঙ্গে আখরোট, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, শুঁঠ, জাফরান প্রভৃতিও দেওয়া হয়। তাতে চায়ের রং এবং স্বাদ খুব সুন্দর হয়ে থাকে।

তাঁর আদেশানুসারেই চেৎরামজী একটী প্রকাণ্ড কাশ্মীরী কম্বল এনে দুই ভাজ করে আমাকে এমন ভাবে জড়িয়ে দিলেন যে ১০ মিনিটের মধ্যে ঘামে নেয়ে উঠ্‌লাম। তখনই জ্বর ছেড়ে

গেল এবং গায়ের ব্যথা কমে গেল। আমি বাসায় ফিরে আসার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তখনও আমাকে আস্‌তে দিলেন না। পুনরায় আমি বাসায় আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়াতে তিনি রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় তাঁর ছত্রের দুজন লোক দিয়ে আমাকে বাসায় পাঠিয়ে দিলেন।

আমরা আগামী কাল কেদারবদরীর পথে রওনা হব স্থির করেছি। নেপালীবাবাকে আগামী কাল রওনা হওয়ার কথা বলেছিলাম, এবং যাতে রাস্তায় কোন বিপদাপদ বা কোন অসুবিধা না হয় এবং নির্ব্বিঘ্নে দর্শন হয়, তার দরুণ প্রার্থনা করেছিলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ করে অভয় দিয়েছিলেন এবং রাস্তা-ঘাটের সমস্ত বিবরণ, কি ভাবে চলা-ফেরা করতে হবে সব বলে দিয়েছিলেন। আমাদের পথের উপযোগী সমুদয় জিনিষপত্র কেনা হয়ে গেছে। বিহারীদাদাও আজ বিকাল বেলা চিঠি পেয়েছেন। চিদানন্দ দাদা ও হরিদাস ভায়া চিঠি পান নি, তাঁরা আগামী কাল সকালে চিঠি পান ভাল, নতুবা অমনিই রওনা হওয়া যাবে স্থির হল। আমরা শুধু বাবা কালীকম্বলী-ওয়ালার সদাব্রতের চিঠির জন্যই অপেক্ষা করছি। সদাব্রতের চিঠি পেলে খুব কম খরচে এ কঠিন প্রদেশের তীর্থযাত্রা সম্পন্ন হয়ে যায়। গত বৎসর বৃন্দাবনের কয়েকজন মা এই সদাব্রতের চিঠি নিয়ে মাত্র ৭৲ টাকা খরচে কেদারনাথ বদরীনারায়ণ ঘুরে রামনগর পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। তাঁরা খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ কঠোরতা করেছিলেন। আমাদের সঙ্গে টাকা পয়সা কম, অধিকন্তু এ পার্ব্বত্য-প্রদেশে কোথাও ভিক্ষা মিলে না। বল্‌তে গেলে, প্রায় রিক্ত হস্তেই আমরা এ দুরতিক্রম্য বন্ধুর পার্ব্বত্যভূমি অতিক্রম করতে যাচ্ছি। রাতটা নানা ভাবনাচিন্তায় গেল। কি যে মনের ভুল, এ ভুল যে কেন সংশোধন হয় না, তাও ভাবি। যাঁর অহেতুক কৃপায় শত শত বার বিপদ হতে উদ্ধার পেয়েছি, যাঁর কৃপায় এবার হরিদ্বারে অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, যাঁর কৃপায় এ মায়াময় ভীষণ সংসারসমুদ্রের পরপারে যাবার জন্য আজ এ পথে দাঁড়িয়েছি, যিনি প্রতি-মুহূর্ত্তে আমাদের সর্ব্বদা মঙ্গলের পথে টেনে নিচ্ছেন, যাঁর ইচ্ছা ভিন্ন এক মুহূর্ত্ত কিছু করবার শক্তি আমার নাই, তাঁরই আদেশ এবং আশীর্ব্বাদ নিয়ে এ বন্ধুর পথে নেমেও আমাকে ভাবতে হয়; অধিকন্তু আজ বিকালবেলাতেও একজন সিদ্ধমহাপুরুষের আদেশ ও আশীর্ব্বাদ নিয়ে এসে ভাবতে বসেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মনে হওয়া মাত্রই প্রাণে বল এল, চিন্তার বোঝা মাথা থেকে নেমে গেল।

বিহারী দাদা রামনাথজীর নিকট হতে উত্তরা-খণ্ডের চার ধামের চিঠিই জোগাড় করেছেন।

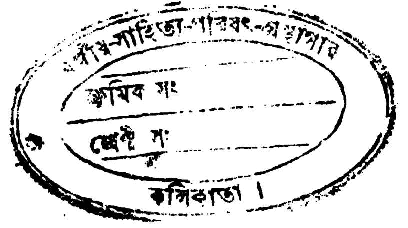
২০ বৈশাখ
৩ মে মঙ্গল বার

হৃষীকেশ হতে কেদারবদরী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। সকাল সকাল রান্না করে খাওয়া গেল। জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেলা ১টার সময় রওনা হলাম। চিদানন্দ দাদা ও হরিদাস ভায়া চিঠির জন্য বাবা কালীকম্বলীওয়ালার শিষ্য রামনাথজীর কাছে যেয়ে হাজির হলেন। তিনি ছত্রশালা ও সদাব্রতের চিঠি দেবার কর্ত্তা। তাঁরা দুজনে অনেক চেষ্টার পর সদাব্রতের চিঠি পেলেন। তাও শুধু কেদারনাথ-বদরীনারায়ণের চিঠি। কেদারবদরীর চিঠি নিতে হলে ১০৲ টাকা তহবিল দেখাতে হয়, টাকা না দেখাতে পারলে চিঠি মিলে না। সমস্ত জায়গার চিঠি নিতে হলে ২৫৲ টাকার তহবিল দেখাতে হবে। উদ্দেশ্য, এ সদাব্রতের চিঠিতেও সমস্ত খরচ শেষ

হয় না, সঙ্গে কিছু টাকা থাকা আবশ্যক যাতে যাত্রী নির্ব্বিঘ্নে নেমে আস্‌তে পারে।

রঘুনাথজীর ধর্ম্মশালায় এতদিন আমরা ছিলাম। প্রত্যেক ধর্ম্মশালায় তিন দিন থাকার নিয়ম। আমরা বৃহস্পতিবার হতে ছিলাম, রবিবার দিনই ম্যানেজার এসে ধর্ম্মশালা ছেড়ে যাবার জন্য বড়ই উত্যক্ত করছিলেন। পরে তাঁরই হাতে রঘুনাথজীর ভোগের দরুণ দুটী টাকা দেওয়াতে আর কোন গোল হয়নি। সে টাকা দুটী খুব সম্ভব রঘুনাথজীর ভোগে না লেগে তাঁর নিজের ভোগেই লেগে থাক্‌বে। তখন অন্য কোন ধর্ম্মশালায় জায়গা না থাকায়, অধিকন্তু গঙ্গার উপর এমন সুন্দর স্থান হৃষীকেশে আর না থাকায় আমরা খুসী হয়েই তাকে দুটী টাকা দক্ষিণা দিয়েছিলাম। আমাদের পাণ্ডা রামপ্রতাপ নম্বরদার যেতে দেরী হবে বলে তাঁর কর্ম্মচারী সুরেশানন্দকে আমাদের সঙ্গে রেখে রবিবার দিনই চলে গেছেন। আমরা বেলা ১২টায় বের হয়ে ১২৷৷-টার সময় মহাদেবদেবী নেপালী ছত্রে এসে উপস্থিত হলাম। আমরা আজ যাচ্ছি বলে নেপালী বাবা বাইরে এসে রৌদ্রের মধ্যে বসে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে প্রণাম করে চরণধূলি মাথায় নিতেই তিনি আশীর্ব্বাদ করে বলিলেন, "রাস্তায় কোন বিপদ হবে না।"

নেপালী কুলি মণিরাম আমাদের জিনিষ নিয়ে চলল। আমরা ক্রমে ভাগিরথী দক্ষিণ হাতে রেখে পশ্চিম তীর দিয়ে উত্তর দিকে চল্‌তে লাগ্‌লাম। রাস্তা ক্রমে উপর দিকে গিয়েছে। যতই অগ্রসর হতে লাগলাম, ততই হিমালয়ের গম্ভীর সৌন্দর্য্য সামনে ফুটে উঠতে লাগল। ক্রমে গঙ্গা ছেড়ে অনেক উপরে উঠতে লাগলাম। হৃষীকেশ হতে বের হয়েই চন্দ্রভাগা নদী পার হয়ে আসতে হয়েছে। সে নদীতে জল নাই, বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে জল হয়, এখন শুধু রাশি রাশি পাথরে নদীটি পূর্ণ। গঙ্গার উচ্চ পাড় হতে দেখছি কেবল ছোট, মাঝারী, বড়, নানা রঙের রাশি রাশি পাথর দূরে—দূরে—সুদূরে স্তরে স্তরে পাহাড়ের গায় মিশে রয়েছে। বাঁ-হাতে কৈলাসাশ্রম দেখা যায়। আশ্রমটি কেদারবদরীর রাস্তা হতে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। আমরা ক্রমে সিড়ি বেয়ে বেয়ে উপরে উঠ্‌তে হাঁপিয়ে পড়লাম। একদিকে প্রচণ্ড রোদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তার উপর আবার পাহাড় চড়ে উঠতে হয়েছে। উপরে উঠে কিন্তু সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে হল। কি সুন্দর দৃশ্য! কলকাতার মনুমেণ্টের উপর উঠ্‌লে যেমন কলিকাতার চারদিকের দৃশ্যে মন প্রাণ বিমোহিত করে, তেমনি কৈলাসাশ্রমে আসলেও চারদিকের সৌন্দর্য্য চিরবিষাদময় জীবনেও ক্ষণিকের জন্য আনন্দের ঢেউ খেলে যাবেই। (ক্রমশঃ)



বেদান্তের খেয়াল

——(:০:)——

বেদান্তে খুব বড় বড় কথা আছে। কথাগুলো এত বড় যে লোকে তা শুনলেই আঁৎকে ওঠে, বিশ্বাস করা তো দূরের কথা। এই যেমন ধর, একটা রোগা-পটকা মানুষ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে; বৈদান্তিকের তো আর কাণ্ডজ্ঞান নেই, তিনি মাঝ-রাস্তায় তাকে দাঁড় করিয়ে হাঁকলেন, "দেখ, তুমি রোগী নও, দুর্ব্বল নও, তুমি সুস্থ, সবল, সুন্দর, তুমি অনন্ত প্রাণ!" শুনে লোকটা হাসবে কি কাঁদবে, ঠিক করতে পারে না। রোগের হামামদস্তায় পড়ে তার পৈতৃক প্রাণটুকু থেঁৎলে যাবার জোগাড় হয়েছে, আর ও লোকটা এসে কিনা বলছে, তোমার অদীন প্রাণ! মরণ আর কি!

এমনিতর যে একটা খট্‌কা উঠবেই, তা বৈদান্তিকেরা জানতেন। জানতেন বলেই তাঁরা একটা রফা করে গিয়েছেন। তাঁরা বলেন, তুমি এখন যা, সব সময়ে যে তুমি ঠিক তাই থাক, তা একদিক দিয়ে সত্যও বটে, আবার একদিক দিয়ে মিথ্যাও বটে। কেমন করে তা বলছি। ধর, ওই রোগা-পট্‌কা লোকটারই কথা। ও যে রোগে ধুঁকছে, হাত-পা খেলিয়ে চলবার শক্তিই যে ওর নাই, ওটা এখন ওর পক্ষে খুবই খাঁটী কথা। ওর কল্পনায় এখন ওর নিজের যে মূর্ত্তি জাগছে, সেটা ওর ষোলআনার উপর আঠারো আনা রোগের মূর্ত্তি। ও রোগ ছাড়া আর কিছুই দেখছে না, কিছুই ভাবছে না। কিন্তু মনে কর, এই সময় যদি ঘরে আগুন লাগে, কি একটা গুণ্ডা এসে ওর স্ত্রীকে আক্রমণ করে, কিম্বা ও হঠাৎ দেখতে পায় ওর ছেলের পরণের কাপড়ে আগুন ধরে গেছে অথচ ঘরে আর কেউ নেই, তাহলে কি হয়? মুহূর্ত্তের মাঝে ও তার রোগের কথা ভুলে যায়, রোগশয্যা থেকে ও ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপদের মাঝে, কোথা থেকে বাহুতে শক্তি আসে, জ্যোতিঃহীন চোখে বিদ্যুত চমকে ওঠে, ক্ষীণকণ্ঠে বজ্র গর্জ্জন করে ওঠে!—এ সব কোথায় ছিল, কোথা থেকে এল? এই যে বাহুর শক্তি, চোখের বিদ্যুৎ, কণ্ঠের বজ্রধ্বনি, দেহের তৎপরতা—এগুলো ধার করা, না তার নিজস্ব? তুমি যদি নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিকের আসনে বসে ব্যাপারটা দেখ, তাহলে অবাক হয়ে যাবে কিন্তু। সামনে একখণ্ড লোহা পড়ে আছে—নড়ে না, চড়ে না; কিন্তু যাই একটুকরা চুম্বক তার কাছে ধরলে, অমনি সে টক্ করে ঘুরে দাঁড়াল। এটা অবাক কাণ্ড নয়? তেমনি দেখছি, এই লোকটার বেলাতে। অসাড় হয়ে পড়েছিল ও; কিন্তু ভাবের চুম্বকে ছুঁয়ে যেতেই এমনি সাড়াই দিলে কে বলবে ও ছ'মাসের রোগী!

এখন নিরপেক্ষ হয়ে বল, কোনটাকে সত্য বলব। ওর রোগটাই সত্য বলব, না স্বাস্থ্যটাকেই সত্য বলব? বৈজ্ঞানিক বলবেন, দুটোই সত্য। বৈদান্তিক বলবেন, দুটোই মায়া। বাস্তবিকই এটা একটা ভোজবাজী যেন। এই যে অসাড় ছিল, সে প্রাণপণে সাড়া দিয়ে উঠল; আবার সে অসাড় হয়ে পড়ল, আবার হয়ত সাড়া দিল!

মোটকথা, তার সাড়া দেওয়াটা একেবারে মিথ্যা নয়। তাহলে তার রোগ আর স্বাস্থ্য, দুটোর মাঝে একটা রফা নিশ্চয়ই হতে পারে। সেইটে কোথায় হতে পারে, আমাদের তাই ভেবে দেখতে হবে।

দেখছি, ও এতক্ষণ ওর দেহটাকেই বড় বলে জেনে রেখেছিল। ওর দেহের রোগটাকেই ও নিজের রোগ বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু যাই একটা আচম্কা আঘাত পেল, অমনি ওর মনটা দেহ হতে ওপরে উঠে গেল, তখন আর দেহের রোগ-বোধ থাক্‌ল না—আত্মরক্ষা বা আর্ত্তত্রাণের চিন্তায় মনটা দেহের গণ্ডী পার হয়ে গেল—সেই মানুষটাই একেবারে বিপরীত মানুষ হয়ে গেল। তাহলে বুঝ্‌তে হয়, দেহটা ওর কিছুই নয়, শুধু কল্পনা মাত্র। এতদিন কল্পনায় দেহের মাঝে নিজকে আট্‌কে রেখে সখ করে রোগ ভোগ করা হচ্ছিল। আর আজ যে হঠাৎ এমন করে নড়ে-চড়ে উঠেছে, নিজকে শক্তি-সামর্থ্যবান্ বলে মনে কর্‌ছে—এ-ও তার একটা কল্পনামাত্র। আসলে যে সে কি, তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু দেখি, মানুষটার কল্পনার বেশ স্বাধীনতা আছে তো। হয়ত তোমরা এটাকে ঠিক স্বাধীনতা বল্‌তে চাইবে না, কিন্তু আমি আর এক দিক থেকে দেখছি বলে স্বাধীনতাই বল্‌ছি।

বাস্তবিক এই দেহটা কিছু না—ওটা বাঁধা আছে শুধু কল্পনার সূতায়। একটা সূতার আগায় ভার ঝুলিয়ে দিলে সমস্তটা ভারই ওই সূতাটুকুকে নির্ভর করে স্বচ্ছন্দে দুলতে থাকে। যে ভারটা মাটীতে পড়ে থাক্‌লে তোমার নাড়ানো-চাড়ানো অসম্ভব হতো, সেটাকেও যদি একটা শক্ত অথচ লম্বা সূতায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সূতার গোড়ায় সামান্য একটু আঙ্গুলের চাপেও তাকে এদিক থেকে ওদিক ইচ্ছামত ঘোরানো-ফেরানো যেতে পারে। ঠিক তেমনি তোমার এই জড় দেহটা তোমারই মনের একটা কল্পনার সূতায় বাঁধা আছে। মনটা একেবারে মাটী আঁকড়ে পড়ে থাকলেই দেহটা আর নড়তে চায় না, সেটা ভারী ঠেকে—তার রোগ, তাপ, দুঃখের আর অন্ত থাকে না। কিন্তু ওই মনটাকেই একটু ওপরে তোল, একটু নিরেট কল্পনা করতে অভ্যাস কর, দেখবে, এত ভারী জড় দেহটাও তোমার আয়ত্ত হয়েছে, তোমার মনের একটুখানি চাপে সেটাকে ইচ্ছামত এদিক-ওদিক ঘুরাতে পারছ।

এমনি করে নিজকে একটু উঁচুতে ধরে রাখ—এও কল্পনা—নিজের সম্বন্ধে উঁচু কল্পনা; হয়ত ভাবুকেরা বলবে, উচ্চ ভাব। কিন্তু বৈদান্তিক বলবেন, ও-ও তোমার কল্পনা; যেমন সাত বছর ধরে রোগ ভোগ করছ, এ-ও তোমার কল্পনা, তেমনি আজ যে নীরোগ মনে করছ নিজকে, ও-ও কল্পনা। বৈদান্তিক আরও বলবেন, তোমার স্বাধীনতাই তো কল্পনার জগতে। ছেঁড়া কাথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখাটাকে লোকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়; বৈদান্তিক বলেন, আমি তো ওর মাঝে ঠাট্টার কিছু দেখি না। ফল দেখে তো বিচার করতে হবে। ছেঁড়া কাথার ফল দুঃখ, এ তো স্পষ্টই অনুভব করছ। আর লাখ টাকার ফল সুখ, এ-ও জান। যখন লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছিলে, তখন দুঃখ হচ্ছিল, না সুখ হচ্ছিল? নিশ্চয় সুখ হচ্ছিল, আর ছেঁড়া কাথার কথা তখন বেমালুম ভুলে গিয়েছিলে। তাহলে ওই স্বপ্নটাও তো তোমার সত্য হল। কেননা যার লাখ টাকা আছে সেও যেমন সুখী, তেমনি আজ তুমি যে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছ, তুমিও তেমনি সুখী। এখন আমি যদি বলি, ভিখারীর লাখ টাকাটাই সত্য আর আর লক্ষপতির লাখ টাকাটা স্বপ্ন, তাহলে ক্ষতি হল কি?—ঠিক বৈজ্ঞানিকের মত নিরপেক্ষ থেকে জবাব দিও।—বাস্তবিক স্বপ্নটাই সত্য, না সত্যটাই স্বপ্ন, এও একটা রহস্য।

কল্পনা এমনি মজার যে সেখানে তোমার অফুরন্ত স্বাধীনতা। যা কিছু কল্পনা করে গেলেই হল, কেউ বাধা দেবার নেই। জগতের যত

বড় বড় কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, দেশহিতৈষী, সমাজসংস্কারক—এরা সব করছে কি? সবাই কল্পনার কারবার করছে—কল্পনার সুখে সবাই বিভোর হয়ে আছে। কালিদাস তাঁর উঠানে ছেঁড়া মাদুরে বসে অলকাপুরীতে যক্ষের সঙ্গে যক্ষিণীর মিলন ঘটাচ্ছেন, পুষ্পকরথে রাম-সীতাকে তুলে গোটা ভারতবর্ষ ঘুরিয়ে আনছেন। তখন তাঁর যে আনন্দ, তার কাছে ছেঁড়া কাঁথা তুচ্ছ হয়ে গেছে কোন্ কালে। যদি একটার পর একটা করে মন্দাক্রান্তার শ্লোক অনবরত ঝরেই পড়তে থাকে কবির কলমের মুখে, তাহলে এ কল্পনারও আর শেষ হবে না, সুখেরও আর অবধি থাক্‌বে না—মায়া হয়ে উড়ে যাবে তোমার ওই গোবরনিকানো আঙ্গিনাটুকু আর ছেঁড়া মাদুরখানা! ঠিক বেদান্তের ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যার আমেজ পাওয়া যাচ্ছে না কি?—তেমনি দশা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক, সবার।—সবাই আত্মহারা হয়ে গেছে, বর্ত্তমান অবস্থার স্থূল ও মলিন কল্পনাকে ভুলে বিরাটের আনন্দময় কল্পনায় বিভোর হয়ে আছে।

পিসিমা বালবিধবা, আজ বৃদ্ধা হতে চলেছেন। এখনও জ্বর হলেও তিন বেলা নাওয়ার কামাই নাই; হাসিমুখে সংসারের সব ঝামেলা সইছেন, আমাদের এতগুলো ভাইবোনকে মানুষ করে তুলেছেন। কি করে তাঁর পক্ষে এ সব সম্ভব হল?—তিনি গোড়া থেকেই কল্পনা করে রেখেছেন, তিনি ব্রতচারিণী, তিনি সর্ব্বংসহা। তাই তিনি আজ আমাদের সংসারে মূর্ত্তিমতী দেবী!—আধুনিক সমাজ-সংস্কারকের হিড়িকে পড়ে তিনি উল্টো কল্পনাও করতে পারতেন, তাতে জীবন সুখের হত কি না কে জানে?

দুঃখ-কষ্ট জগতে আছেই—এটা হল বস্তুবাদীর নিরেট কথা। কিন্তু তার সঙ্গে লড়তে হলে দুঃখ সহ্য করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই নাই—তিতিক্ষাই দুঃখের একমাত্র প্রতীকার। এটাও বস্তুবাদীর কথা। কল্পনাবাদী বৈদান্তিক বলেন, তার চাইতে একটা সোজা উপায় ধর না কেন! তোমার দুঃখটাও কল্পনা, সুখটাও কল্পনা। তাহলে মিছামিছি দুঃখটা কল্পনা করে দুঃখ পাওয়া কেন, সুখ কল্পনা করে সুখ পেলেই তো হয়! একটা লোক ঘুরতে ঘুরতে কল্পবৃক্ষের তলায় গিয়ে পড়েছিল। পরিশ্রান্ত হয়ে ভাবল, আহা, এক গ্লাস সরবৎ যদি হত। অমনি সরবৎ এসে হাজির। সরবৎ দেখে ভাবল, যদি একখানা শীতলপাটী আর একজন পাখা করবার লোক হত। অমনি শীতলপাটী আর পাঙ্খাওয়ালা হাজির। তার পর ভাব্‌ছে, একটী ষোড়শী সুন্দরী এসে যদি পা টিপে দিত। ষোড়শী সুন্দরীও এল। হঠাৎ তার মনে হল, এ সময় যদি বাঘ এসে পড়ে। অমনি বাঘও এসে টপ্ করে তাকে মুখে নিয়ে চলে গেল। বাঘের মুখে পড়ে, তার কি মনে হয়েছিল সে কথা আর গল্পে নেই; কিন্তু সেটা তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে।

একটা লোক গাছতলায় বসে হুস্‌হাস্ করছে। আর একজন এসে জিজ্ঞাসা করল, কি হে, অমন করছ কেন? সে বল্‌ল, ভাই দুদিন যাবৎ পেটে কিছু পড়েনি, কোথাও কিছু জোটাতেও পারিনি, তাই আজ গাছতলায় বসে বসে কল্পনা করছিলাম, যেন নবাববাড়ীতে বসে ভোজ খাচ্ছি। কিন্তু মাংসের ঝোলটায় এত ঝাল দিয়েছে ভাই যে নাকে-চোখে জল ঝরিয়ে ছাড়ল। আগন্তুক হেসে বল্‌ল বোকা, কল্পনাতেই যদি খেতে হয় তো ঝাল খেয়ে মরছিস্ কেন—রাবড়ী, ক্ষীর, সন্দেশ খেতে পারতিস না?

আলোচনা

—(:০:)—

ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, এ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে কথা উঠে। মহাত্মা গান্ধী যখন অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন চালাইতেছিলেন, তখন তাঁহার অহিংসানীতির প্রসঙ্গে এই কথাটা বিশেষ করিয়া উঠিয়াছিল। অনেকে তখন মত প্রকাশ করেন, ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সংস্রব না থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং এই কথাটা শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুরাই জোর গলায় বলিয়াছিলেন। কথাটার অনুকূলে এবং প্রতিকূলে দুই দিকেই কিছু বলিবার রহিয়াছে। ধর্ম্ম এবং রাজনীতি যখন খুব সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়, তখন উভয়কে এক হাঁড়িতে পুরিয়া জগা-খিচুড়ী তৈরী করাতে অনিষ্ট আছে বৈ কি। সাধারণতঃ আমরা ধর্ম্ম বলিতে বুঝি কতকগুলি আচার, আর রাজনীতি বলিতে বুঝি রাজা-প্রজার পরস্পরের প্রতি একটা আক্রোশ। এই দুইটা জিনিষকে এক সঙ্গে মিলাইয়া দিলে তাহার ফল যে কোথায় গড়াইবে, তাহা বলা কঠিন। স্বদেশী যুগে এক সময়—সাধারণভাবে শক্তি-চর্চ্চা নয়—বিশেষ করিয়া লাঠী খেলা, ছোরা খেলা, সামরিক কায়দায় ড্রিল ইত্যাদির দরুণ বহু সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হঠাৎ বাংলা দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, কিম্বা বাঙ্গালী হঠাৎ মা-বোনের সতীত্ব রক্ষার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই যে এই সমিতিগুলির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা নয়। রাজতন্ত্রের প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব লইয়াই এই সমিতিগুলির উদ্ভব হইয়াছিল, সুতরাং বলিতে গেলে এই সমিতিগুলির মূলে রাজনীতিক উদ্দেশ্য বর্ত্তমান ছিল। এই সমস্ত সমিতিতে গীতা ও চণ্ডীপাঠের খুব আড়ম্বর ছিল, শক্তি-পূজার প্রতিও একটা টান দেখা যাইত। গীতা-পাঠ, চণ্ডী-পাঠ, কালীপূজা ইত্যাদিকে ধর্ম্মাচরণ বলাও অসঙ্গত হইবে না বোধ হয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বদেশীযুগে ধর্ম্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছিল? গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচরেরা শুধু যে আনাচে-কানাচে বোমার সন্ধান করিত তা নয়, গীতা-চণ্ডীর সন্ধানও করতে। কোনও সন্দিগ্ধ-চরিত্র যুবকের কাছে গীতা পাওয়া গেলে আর রক্ষা ছিল না। মাঝে এমন একটা গুজবও উঠিয়াছিল যে বিপ্লববাদসম্পর্কিত পুস্তকের ন্যায় গীতাও গভর্ণমেণ্টের বাজেয়াপ্ত হইবে। যুবকদের মাঝে এই সময় হইতে বিলাসিতা বর্জ্জন, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন ইত্যাদির প্রতি খুব অনুরাগ দেখা যাইতে লাগিল। ইহার মূলে সর্ব্বত্রই যে বেদান্তোক্ত নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের ইচ্ছাটাই প্রবল ছিল, একথা ঠিক নয়। এই শক্তি-সঞ্চয়ের একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল এবং রাজতন্ত্রও তাহা অনুমান করিয়া উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান নিরীহভাবে আত্মানুশীলন বা দেশ-সেবার ব্রতে নিযুক্ত ছিল, তাহারাও রাজতন্ত্রের খরদৃষ্টি হইতে বাঁচিতে পারে নাই। এইজন্য "বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান"-গুলিকেও "আমরা রাজনীতির কোনও ধার ধারি না" বলিয়া আগে-ভাগেই বড় গলায় সাফাই গাহিতে হইত। ব্যাপারটা যে কিরূপ হাস্যোদ্দীপক তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝি! ধর্ম্ম এবং রাজনীতিকে গুলাইয়া ফেলার দরুণ

এরূপ মনোভাবের উদ্ভবও তখন সম্ভবপর হইয়াছিল, যদিও ধর্ম্ম এবং রাজনীতির অন্তরঙ্গ ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত অবস্থাকে বাস্তবিকই ধর্ম্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে কিনা সন্দেহ।

৪

স্বদেশীযুগে রাজনীতি ছিল একটা আনকোরা নূতন জিনিষ; উহার বাস্তবিক অর্থ যে কি, তাহা রাজা-প্রজা কেহই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে নাই। বিপ্লব বিদ্রোহের কল্পনা হইতে আবেদন-নিবেদন, কাঁদুনী-বক্তৃতা, বয়কট্-পল্লীসংস্কার—সমস্তই প্রজার কাছে রাজনীতির সামিল। রাজ-তন্ত্রও তখন এলো-পাথারি ভাবে দমন-নীতি প্রয়োগ করিতে সুরু করিয়া দিলেন। ঘরে হঠাৎ আগুন লাগিয়া গেলে গৃহস্থের যে অবস্থা হয়, রাজা-প্রজার তখন সেই রকম অবস্থা। আজকাল রাজনীতিক আন্দোলন সুদূর প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে, মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া কাজ চলিতেছে, রাজা এবং প্রজা মুখোমুখি বসিয়া ধীরে-সুস্থে দাবাবড়ের কিস্তির চাল চালিতেছেন। কাজেই আশা হইয়াছিল, ধর্ম্ম গো-বেচারীকে লইয়া এইবার আর টানা-হ্যাঁচড়া হইবে না। কিন্তু এখনও দেখিতেছি, দেশের লোকের বুদ্ধি-বিভ্রমের জের কাটে নাই। এক সময় দেশের শিক্ষিত-সমাজ মনে করিয়াছিলেন, নিত্য গীতাপাঠ করিয়া, তিলক কাটিয়া এবং প্রাণায়াম করিয়া তাঁহারা ইংরাজকে ভারত-সমুদ্রের পরপারে খেদাইয়া দিবেন। কিন্তু কনষ্টিটিউশ্যনাল আন্দোলনের সুযোগ এবং সম্ভাবনা দেখিয়া এখন তাঁহারা সে বুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ গীতাপাঠ আর এখন ভারতোদ্ধার স্কীমের অঙ্গীভূত নহে। কিন্তু তাঁহারা আর একভাবে ধর্ম্মকে রাজনীতিতে খাটাইতে সুরু করিয়াছেন। রাজনীতিকদের মধ্যে অবশ্য হিন্দু-মুসলমান দুইই আছেন, কিন্তু এই অভিনব নীতির উদ্ভাবক এবং প্রবর্ত্তক হিন্দুরাই। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ পাকিয়া উঠিবার পর মুসলমানের সমর-কৌশলের সহিত নিজেদের সমর-কৌশলের তুলনা করিতে গিয়া হিন্দু নেতারা আবিষ্কার করিলেন, হিন্দুরা দুর্ব্বল, পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তাহাদের মাঝে বাল্যবিবাহ আছে কিন্তু বিধবাবিবাহ নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও বোঝা গেল, রাজনীতিক আন্দোলনকে সফল করিতে হইলে, সমস্তটা দেশকে এককাট্টা করা দরকার; তাহার দরুণ হিন্দু মুসলমানকে এক করিতে হইবে (কোনও সুরসিক যাহার নামকরণ করিয়াছেন, "দাড়ী ঔর চুটিয়াকা মেল"); পতিত ও অভিজাতকে এক করিতে হইবে; ছত্রিশজাতিকে এক করিতে হইবে; স্ত্রী ও পুরুষকে এক করিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। মুসলমান ভাইদের কাছে শিখিয়াছি, মানুষ যদি ধর্ম্মে এবং আচারে এক না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিয়া দল বাঁধিবার চেষ্টা বৃথা। অতএব একটা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম এবং সার্ব্বজনীন আচার প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন। প্রবর্ত্তন করা যাইবে কাহাদের মাঝে? উচ্চশিক্ষিত ও আভিজাতদের মাঝে?—না, না, সেখানে অনেক হ্যাঙ্গামা, শিক্ষিত মানুষ-মাত্রেই অত্যন্ত ঠ্যাটা, উহারা কেবল তর্ক তুলিবে আর শেক্স্পীয়র্ ও পরাশরসংহিতা হইতে কোটে-শান ঝাড়িবে। প্রচারের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র হইতেছে নিম্নশ্রেণীর সমাজ। বিধবা-বিবাহ প্রচার করিতে হয় তো ওইখানে কর; খৃষ্টধর্ম্মের আলোক ফেলিতে হয় তো ওইখানে ফেল; ইসলামের রোশনাইও সব চেয়ে প্রয়োজন ওইখানে; ওই সমাজই শুদ্ধি ও সংগঠনের নির্ব্বিবাদ ক্ষেত্র। সমগ্র হিন্দু-সমাজ এককাট্টা করিবার প্রকৃষ্ট উপায় কোনও একটা সার্ব্বজনীন পূজা-অর্চ্চনার ব্যবস্থা করা। ধর, সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব করা গেল। জগজ্জননী তো সকলেরই মা; বলির পাঁঠা পূজার মন্দিরে

যাইতে পারে, আর তুমি ছোট-জাত বলিয়াই যাইতে পারিবে না? ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা এমনি করিয়া তোমাদিগকে বিচ্ছিন্ন দুর্ব্বল করিয়া রাখিবে, আর তোমরা তাহা নীরবে সহিয়া যাইবে?—কখনই নয়! এস, আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, কদাচারের বিরুদ্ধে, বামনাইর বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম করি—মা দশপ্রহরণধারিণী আমাদের সহায় হইবেন।

৮

যাঁহারা নিজে কোনও ধর্ম্মের ধার ধারেন না অর্থাৎ গীতাপাঠ, নিরামিষভোজন ও হঠযোগ দ্বারা ভারতোদ্ধার হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা এইভাবে ধর্ম্মকে রাজনীতিক সংগ্রামে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "বিশুদ্ধ" রাজনীতিতে "বিশুদ্ধ" অহিংসনীতির প্রয়োগ যতখানি দোষের না হউক, তাহার চেয়ে ধর্ম্মের নামে এই ভণ্ডামী ও রাজনৈতিক চালবাজী আরও বেশী দোষের বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্ম একটা সত্যিকার শক্তি এবং মানবের শাসক-শক্তিসমূহের মাঝে সব চেয়ে প্রাচীন এবং প্রভাবশালীও বটে। সুতরাং মানুষের যে কোনও প্রচেষ্টাতে যে ইহার ছায়াপাত হইবে, অর্থাৎ রাজনীতিও যে কোথায়ও ধর্ম্মদ্বারা অনুশাসিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু রাজনীতি যে ধর্ম্মের কোমরে শিকল পরাইয়া তাহাকে বাঁদরনাচ নাচাইবার সঙ্কল্প করিবে, ইহার চেয়ে বড় ব্যভিচার কল্পনা করিতে পারা যায় না। সম্মিলিত-উপাসনা, সার্ব্বজনীন পূজা-অর্চ্চনা যে দোষের, একথা যে বলিবে, সে পাগল। কিন্তু এই উপাসনার অর্থ উপাসনাই, অর্চ্চনার অর্থ অর্চ্চনাই—ইহার অর্থ গুপ্ত রাজনীতিক অভিসন্ধি সাধন কখনই নহে; এইভাবে ধর্ম্মকে দিয়া রাজনীতির ব্যাগার খাটাইলে উহা ধর্ম্মেরই অবমাননা, অতএব মানবাত্মারই অমর্য্যাদা ও হীনতার পরিচায়ক। ইহাও যদি ধর্ম্ম হয় তো ডাকাতের কালীপূজাও ধর্ম্ম, প্রতিবেশীর সর্ব্বস্বান্ত করিয়া মিথ্যা মোকদ্দমায় জিতিয়া জোড়া-পাঁঠা দিয়া মহামায়ার পূজা করাও ধর্ম্ম। দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে কেহ বলিতেছেন, সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব কর; কেহ বলিতেছেন, ব্রাহ্মণসেবিত দেবালয়গুলিকে বয়কট্ করিয়া একটা নূতন সার্ব্বজনীন মন্দির গড়িয়া তোল; দেশের অবস্থা আরও স্বচ্ছল হইলে হয়ত বলিতেন, শ্বেতদ্বীপে একটা সার্ব্বজনীন তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা কর। উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে একতা বাড়িতেছে না অনৈক্য আরও পোক্ত হইতেছে?—ধর্ম্মের অমর্য্যাদার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। অনৈক্যের বীজ যে আমাদের মাঝে আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর এক সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া কি এই অনৈক্যের প্রতীকার হইবে? বর্ত্তমান সমাজের এমন অবস্থা যে কেহই কাহারও কথা শোনে না, অথচ সকলেই কথা বলিবার জন্য ব্যগ্র। এরূপ অবস্থায় যাঁহারা সমাজপতি হইবার সামর্থ্য রাখেন না, তাঁহারা একটা নূতন আন্দোলনের বখেড়া আনিয়া হাজির করিলেই কি গোল মিটিবে? বরং এরূপ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত, যাহাতে অজ্ঞের বুদ্ধিভেদ না জন্মায় এরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া তাহাকে সার্ব্বজনীন কল্যাণের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করা। সার্ব্বজনীন ভাবের অনুষ্ঠান কি আমাদের দেশে ছিল না—না আজও নাই? পূজার মন্দিরে জাতিভেদ আছে স্বীকার করি, কিন্তু হরিসঙ্কীর্ত্তনে তো জাতিবিচার নাই, ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই নাই। হরিসঙ্কীর্ত্তন কিছু অতীতের কাহিনীও নয়; এখনও সমাজে তাহার জীবন্ত প্রভাব। গ্রামে গ্রামে হরিসভা প্রতিষ্ঠার দরুণ কিছুদিন যাবৎ হিন্দু জনসাধারণের যে প্রবল আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে, তাহা সার্ব্বজনীন ভাবেরই উন্মেষ; অথচ ইহার মূলে পলিটিক্যাল চালবাজী নাই, মানব-

হৃদয়ের সাধারণ ধর্ম্মবোধ ও সামাজিকতা হইতেই ইহার উদ্ভব। শিবপূজায় তো অধিকারভেদ নিয়া মারামারি নাই। জগন্নাথক্ষেত্রে জাতিবিচার নাই। অনুসন্ধান করিলে পল্লীগ্রামে এখনও এমন অনেক অনুষ্ঠান পাওয়া যাইবে যাহাতে শুধু হিন্দু নয়, হিন্দু-মুসলমানের পর্য্যন্ত এক সঙ্গে মিলিবার-মিশিবার প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে। এইগুলিকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে কিছু দেশের অহিত হইত না—রাজনীতিক প্রয়োজনও সিদ্ধ হইত, ধর্ম্মবোধও অপমানিত ও আহত হইত না।

রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম্মের আর একটা নূতন সম্পর্কের পত্তন করিয়াছেন সেদিন পণ্ডিত জবাহারলাল নেহরু। এই সম্পর্কটা একেবারে অহিনকুল সম্পর্ক। ক্ষিপ্ত কুকুরের জলাতঙ্কের কথা জানি, আসামের চাবাগানের সাহেবের ছত্রাতঙ্কের কথাও শুনিয়াছি, এইবার রাজনীতিকের ধর্ম্মাতঙ্কের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। শ্রীযুত নেহরু বলিয়াছেন, ভারতবাসীর ধর্ম্মপ্রবণতার কথা চিন্তা করিতে গেলে তাঁহার মেরুমজ্জা কণ্টকিত হইয়া উঠে, উন্মাদের লক্ষণ প্রকট হইয়া পড়ে। রাজনীতিকে ধর্ম্মের কবল হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে আর তাঁহার সোয়াস্তি নাই! এ কথাতে আমরাও সায় দিই। ধর্ম্মকে লইয়া রাজনীতিকেরা যেরূপ চাণক্যনীতির খেলা খেলিতে সুরু করিয়াছেন, তাহাতে পণ্ডিতজীর ধমক খাইয়া যদি তাঁহারা ধর্ম্মের সঙ্গে অসহযোগ করিয়া বসেন, তাহাতে দেশের কিছু অহিত হইবে না। কিন্তু দেশকে রাজনীতিক আন্দোলনের উপযোগী করিবার জন্য তাঁহাদের যদি ধর্ম্মের ষাঁড়কে ভাগাড়ের দিকে ঠেলিবার মৎলবটাই ভিড়িয়া উঠে, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ! নেহরু গোখাদকের দেশ হইতে তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং ধর্ম্মের ষাঁড়ের প্রতি তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হওয়াও বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ নব্য-তুরস্ক যে ভাবে ধর্ম্মের গলা টিপিতে সুরু করিয়াছে, এ দেশের খলিফাভক্ত মুসলমানেরা যদি তাহার অনুসরণ করিতে সুরু করেন, তাহা হইলে অন্ততঃ ইজ্জৎ রক্ষা করিবার জন্যও তো হিন্দুকে মহাজনের পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। পণ্ডিতজী তাঁহার বিশ্ব-দর্শনের এই অনুভবটী পূর্ব্বাহ্নেই দার্শনিক ভারত-বাসীর আসরে দাখিল করিয়া বড় ভাল কাজই করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহার মজ্জাকণ্টকী কি উপায়ে প্রশমিত হয়, তাহা দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

আচারই ধর্ম্ম নহে; আচার ধর্ম্মের অনুযায়ী মাত্র। ন্যায়ের ভাষায় বলিতে গেলে মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম্ম এবং ইহাই তাহার সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। এই সার্ব্বভৌম ধর্ম্মসাধনার সার্ব্বভৌম আচারও আছে—উহাই নীতি, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের মাঝে হিন্দু যাহার আদর্শ পূর্ণস্বরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। বুদ্ধদেবের শীলাচারও এই আদর্শকেই প্রকাশ করে। এই সার্ব্বভৌম আদর্শকে বর্জ্জন করিয়া চলা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। দেশ-সেবাই হউক, আত্মীয়সেবাই হউক, আর আত্মসেবাই হউক, ত্যাগ, সংযম, তপস্যা—এইগুলি সকলেরই ভিত্তি; আর হিন্দু বলে, ইহারাই মানবের সনাতন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের সঙ্গে জগতে কাহার বিরোধ হইতে পারে? আর মানুষের মনুষ্যত্ব উন্মেষক উপায়-গুলিকে বর্জ্জনপূর্ব্বক তাহাকে পুরুষার্থ-সাধনার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার কল্পনাই বা কে করিতে পারে? ধর্ম্ম সকলের মাথার উপরে, মানুষের সমস্ত চেষ্টার আদি প্রস্রবণ; এই অর্থে ধর্ম্ম ছাড়া রাজনীতি কেন, কোন নীতিই জগতে দাঁড়াইতে পারে না। অবশ্য সর্ব্বসাধারণের মাঝে

ধর্ম্মের এই সার্ব্বভৌম নির্ম্মল রূপটী সব সময় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। কতকগুলি অযৌক্তিক বিশ্বাস বিচার-বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া ধর্ম্মের নামে অনেক অকাণ্ড ঘটায়, ইহাও সত্য। কিন্তু ইউরোপের মত ভারতবর্ষের ধর্ম্ম কেবলমাত্র কল্পনা আর বিশ্বাসকেই আঁকড়াইয়া রহিয়াছে, যুক্তির আঘাত, বিচারের ঝক্কি সে সামলাইতে পারে না, এই কথা কি সত্য? অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস ও যুক্তি উভয়ই মানবমনের স্বাভাবিক উপজ। ইউরোপ এই দুয়ের সমন্বয় করিতে পারে নাই; তাই তাহার কাছে ধর্ম্ম হইয়াছে 'রিলিজন' বা বন্ধন (রিলিজনের মৌলিক অর্থই তাই), উহা যুক্তিহীন Faith মাত্র; আর অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সম্বন্ধে যুক্তি প্রত্যক্ষের আশ্রয় না পাইয়া হইয়া রহিয়াছে 'ফিলসফি' বা জিজ্ঞাসা; উহা Reason মাত্র, অনুভব নয়। কিন্তু ভারতবর্ষে বিশ্বাসে ও যুক্তিতে ভেদ দূর হইয়া গিয়া দার্শনিক মতবাদই ধর্ম্মের অনুভবের আকার ধারণ করিয়াছে—প্রত্যেক ধর্ম্মমতের মূলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাত্মক দর্শনের বনিয়াদ রহিয়াছে—এ তো আর নূতন কথা নয়। ভারতবর্ষ ধর্ম্মের এলাকায় শুধু একটী চার্চ্চ বা মসজিদ বা মন্দির খাড়া করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই, সমগ্র বিশ্বকে ধর্ম্মের অঙ্গনে আহ্বান করিবার মত উদার প্রেরণা তাহার আছে। তাহার কাছে ধর্ম্ম অর্থে বিশ্বের সঙ্গে আত্মার একটা বোঝাপড়া;—পাশ্চাত্য ফিলসফিরও ইহাই প্রতিপাদ্য এবং এই জন্য ফিলসফিকে "Science of sciences" এই গৌরবজনক খেতাব দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ধর্ম্ম হইয়াও অনায়াসে এই খেতাবের দাবী করিতে পারে। এই জন্য ধর্ম্মের তরফ হইতে কাহারও বিরোধ হইতে পারে না—এমন কি রাজনীতিরও নয়। হিন্দুর রাজনীতি চিরকাল ধর্ম্মের অঙ্গুলি-সঙ্কেত অনুসরণ করিয়াছে। মহাবৈদান্তিক বশিষ্ঠ আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের প্রাইম্ মিনিষ্টার, মহাভাগবত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পাণ্ডবদের সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্—ইহা হিন্দুর কাছে সুসঙ্গত বলিয়াই মনে হইয়াছে। মোক্ষধর্ম্মের পাশাপাশিই রাজধর্ম্মের স্থান করিয়া দিতে হিন্দু সঙ্কুচিত হয় নাই। হিন্দুর রাজনীতি রাজা ও প্রজার পরস্পরের প্রতি ও নিজের প্রতি কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে সজাগ রাখিবার প্রেরণাই জোগাইয়াছে, প্রেষ্টিজ আর রাইট্ নিয়া কাড়াকাড়ি করিতে শিখায় নাই, তাই যথার্থ ধর্ম্মের সহিত যথার্থ রাজনীতির কোনও বিরোধই হিন্দু দেখিতে পায় নাই। আমাদের এখন যে দশা, তাহাতে রাজার নীতি কি হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করার চেয়ে প্রজার নীতি কি হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার তাগিদটাই বেশী এবং এই নীতি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মানবজাতির সার্ব্বভৌম সনাতন ধর্ম্মের প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে যে অসীম অসংবদ্ধ সৌন্দর্য্যের লীলা চলছে, তাকেই বিশিষ্টতা দিয়ে ফুটিয়ে সুসম্বদ্ধ ভাবে মূর্ত্ত করে তুলে যিনি আমাদের সামনে ধরে দেন তাঁকেই বলব যথার্থ শিল্পী। একমাত্র ভগবানকেই যথার্থ শিল্পী বলা যায়। আমাদের চোখের সামনে এত স্পষ্ট করে অন্তর্নিহিত রহস্য আর কে ব্যক্ত করতে পারে বল দেখি?

*

সুখে আত্মহারা করে, আর দুঃখে মোহ টুটে। দুঃখ যাকে জাগিয়েছে, সে-ই জানে, এ দুনিয়ার সুখেও কত জ্বালা!

*

আপন জনের কথা মনে হতেই হৃদয় যেন আর্দ্র হয়ে আসে। আপন জন মানে যাকে ভালবাসি যার মঙ্গল চাই, অথবা যে আমার মঙ্গল চায়। অনেক সময় মঙ্গল চাওয়াটা কর্ত্তব্যবুদ্ধি; প্রকৃত প্রাণের টান থাকলে অত কথা মনে থাকে না। তখন কেন্দ্র থাকে প্রাণের টান বা প্রেম—আর যা সে করে তাতেই মঙ্গল হয়। লক্ষ্য তখন সাধ্যে; এদিকে সাধনা অজ্ঞাতসারে জগদ্ধিতরূপে ফুটে উঠতে থাকে। মোট কথা, মঙ্গল চাই বলে ভাল বাসি, না ভাল বাসি বলে মঙ্গল চাই তা জানি না; প্রাণ ঢেলে দিয়েছি যেখানে, কার্য্য-কারণ বিচার সেখানে তুচ্ছ।

*

যা মূলে, তাই স্থূলে—এই সহজ সত্যটুকু নিত্য-নিয়ত অনুভবের চেষ্টা—এরি নাম শ্রদ্ধা, বিশ্বাস।

*

তাঁর কাজ, তাঁর সেবা—এর মাঝে দেহ-মন-প্রাণ আহুতি দিতে হবে। প্রাণহীন অভিনয়ই বা কেন করব, পরের সঙ্গে তুলনাই বা কেন আসবে? অভিনয়ই তো বটে, সেরা অভিনয় মন মুখ এক করে অথচ কোথাও ধরা না দিয়ে; নিজে দ্রষ্টা হয়ে থেকে। যখন যার অভিনয় করব, তখন ঠিক তাই হয়ে যাব; অথচ জানব—হচ্ছি! সবি চোখ চেয়ে—বুজে নয়; তাই হচ্ছে স্বরূপ।

*

যা কথনো চাওনি, এমন কিছুই তুমি পাচ্ছ না; আর যা চাইছ, তাও নিশ্চয়ই পাবে। কাজেই দেখ, তোমার কাছে তুমি কত দায়ী!

*

জীবনের সমস্যা আর মীমাংসা একই সত্যের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। যতক্ষণ পর বলে ঠেলে রাখ্‌ব, ততক্ষণই আঁধার—আপন বলে বুকে তুলে নিলেই আর কোন গোল নাই। সমস্যা এলেই জান্‌তে হবে, মীমাংসাও আস্‌ছে—জ্ঞানের পরিধি-বিস্তার হচ্ছে। সমস্যা উষার আঁধার—জ্ঞানের আলোই তার শাশ্বত মীমাংসা।

*

কর্ত্তৃত্বাভিমান কিসে জন্মে জানি না, তবে সন্দেহ হয়, ফলাকাঙ্ক্ষা ভিতরে থাকতে ও জিনিষটা ভিতরে আসবার খুবই সম্ভবনা। তা ছাড়া সব সময় আমার মৎলবটাই আমার কাছে সুস্পষ্ট নয়—সুতরাং বিশ্বাস করি কাকে? কিসে থেকে কি হচ্ছে, কেউ জানে না—এইটুকু জানাই নৈষ্কর্ম্ম্য।

*

নিজে নিরপরাধী বনে গিয়ে কতসময় কতরকমে সবাইর ভালমন্দ বিচার করি। কিন্তু এতেই কি শক্তি পাব? হাত-পাকে আমিই খাটাব বটে, কিন্তু যিনি হাত-পা-ওয়ালাকে খাটাচ্ছেন, তাঁর কাছে যদি দীনাতিদীন রিক্ত তৃষিত-হৃদয় নিয়ে না দাঁড়াই, তাহলে ভরসা দেবে কে? শুধু অভিমানই কি আমায় চরমে পৌছিয়ে দেবে? ত্বদিকের সামঞ্জস্য হয় না বলেই প্রাণ সুনির্ম্মল হয় না—আকুল হয়ে ডাকতে পারি না, আবার ষোল-আনা ভার নিয়ে চলতেও আলস্য।

*

দোষ-গুণের বিচারই বিচার নয়—বিচার আত্ম-বিচার। বিচার করতে হবে, সকলের সঙ্গে আমার প্রাণের আদান-প্রদান কতটুকু এবং তা কোন সূত্রে। যদি তাই না হয়, তবে সব বৃথা। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে—বিভ্রাটের কারণ আমাতে কিনা!

*

অপরে ভুল বুঝেছে মনে করেই অনেক সময় ভেবে মরি, মন কালী হয়। বাইরে তার প্রতীকার খোঁজা ভ্রম অর্থাৎ প্রতীকারটা কাজে নয়—ভাবে। সবাই তো আর ভুল বোঝে না; একজনের যথার্থ ব্যবহারের দিকে তাকিয়ে দশজন অযথাব্যবহারকারীকে করুণার দৃষ্টিতে দেখা যায় তো?—বেশ, তাই কর না! আর যদি নিজের ভিতর গলদ থাকে তো আত্মপীড়ন না করলে মনের কালী মুছবে না।

*

সুখ খোঁজা মানে সুখ পাবার অধিকারকে খর্ব্ব করা। আমার খুসীমত হওয়াব কেন—তাঁর খুসীমত হোক্।

সংবাদ ও মন্তব্য

আগামী ১৫ই ভাদ্র শুক্রবার ঝুলনপূর্ণিমাতে কুতুবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী দেবের শুভ জন্ম-মহোৎসব হইবে। আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ও সেবকমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া উৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। যাঁহারা উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুধামের সেবাইৎ শ্রীমৎ রামানন্দ ব্রহ্মচারীকে অবিলম্বে জানাইলে বিশেষ সুবিধা হয় (ঠিকানা—শ্রীশ্রীগুরুধাম, কুতুবপুর, পোঃ কাথুলী, জেলা নদীয়া)। শ্রীশ্রীগুরুধামে যাইতে হইলে গোয়ালন্দ কলিকাতা লাইনে চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিয়া মোটরে ১৮ মাইল পথ মেহেরপুর যাইতে হয়। মোটরভাড়া জনপ্রতি ১৲, ১ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। মেহেরপুর হইতে আশ্রম ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে, নৌকাতে ২ ঘণ্টা কিম্বা মোটরে আধ ঘণ্টায় পৌছান যায়। মোটরভাড়া জনপ্রতি ৷০ আট আনা।

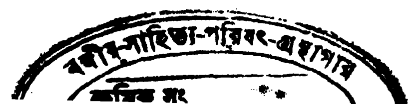
কুতবপুর—দাতব্য-চিকিৎসালয়ে

সাহায্যপ্রাপ্তি

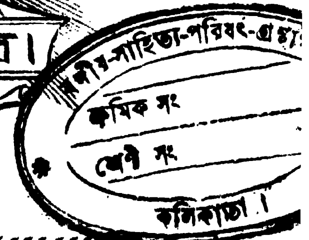
(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জনৈক হিতৈষী	১০০৲
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ রায়চৌধুরী	৫০৲
শ্রীযুক্ত সারদা ও বরদাচরণ দাস	৫০৲
" অশ্বিনীকুমার সরকার	২৫৲
" রাসমোহন চক্রবর্ত্তী	২৫৲
" কমলাকান্ত দলই	২৫৲
" প্রসন্নকুমার দাস	২৫৲
" রজনীকুমার দাস	২০৲
" গিরিশচন্দ্র দাস	১৫৲
" ললিতচন্দ্র সরকার	১০৲
" নবীনচন্দ্র রায়	১০৲
" নৃপেন্দ্রনারায়ণ বসুনিয়া	১০৲
" সুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত (১ম দফা)	১০৲
" দ্বারকানাথ সিংহ	১০৲
" আদিনাথ সূত্রধর	১০৲
" অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী (১ম দফা)	৫৲
" গোবিন্দচন্দ্র পুততুণ্ড (১ম দফা)	১৫৲
" ধরণী রুহিদাস	১০৲
" বালকদাস মাদলমিস্ত্রী	২০৲
শ্রীমতী নিশারাণী ও টুলটুলী বর্ম্মানী	২৲

(ক্রমশঃ)







২১শ বর্ষ — ১ম খণ্ড

ভাদ্র—১৩৩৫

সমষ্টি সং ২২১ — ৫ম সংখ্যা

অগ্নিহোতা

—*—

ঋগ্বেদ সংহিতা—৪।৬।১

—*—

। বামদেব ঋষিঃ—অগ্নি দেবতা—ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ ।

উর্দ্ধ উ ষু ণো অধ্বরস্য হোতর্
অগ্নে তিষ্ঠ দেবতাতা যজীয়ান্।
ত্বং হি বিশ্বমভ্যসি মন্ম
প্র বেধসশ্চিৎ তিরসি মনীষাম্॥

অধ্বরের হোতা অগ্নি, আমাদের যজনীয় তুমি,
দাঁড়াও উন্নত হয়ে আলোকিয়া এই দেবভূমি।
তোমারেই আছে ঘিরে জগতের যত না কামনা—
বিধাতারো মনীষারে উজলিতে জোগাও প্রেরণা।

অমূরো হোতা ন্যসাদি বিক্ষ্-
অগ্নির্মন্দ্রো বিদথেষু প্রচেতাঃ।
ঊর্দ্ধং ভানুং সবিতেবাশ্রেন্
মেতেব ধূমং স্তভায়দুপ দ্যাম্॥

বসেছেন হোতা অগ্নি জনমাঝে—মূঢ় তিনি নন,
যজ্ঞভূমি আলোকিছে ওই তাঁর আনন্দ-কিরণ।
ঊর্দ্ধ পানে দীপ্তি তাঁর ঝলকিছে সবিতার মত—
দ্যুলোকের কোলে ওই ধূম্ররাশি হয়ে আছে নত।

ভদ্রা তে অগ্নে স্বনীক সংদৃক্
ঘোরস্য সতো বিষুণস্য চারুঃ।
ন যত্তে শোচিস্তমসা বরন্ত
ন ধ্বস্মানস্তন্বী রেপ আধুঃ॥

তোমা হেরি ভোলে আঁখি, সুমঙ্গল, শিখা-সুশোভন,
ঘোর-ব্যাপ্ত তবু তব চারুমূর্ত্তি হরে মোর মন!
অন্ধকারে ঝাঁপিল না দীপ্তি তব, সেই লাগে ভালো
তোমার তনুতে, কই, রক্ষঃকুল লেপিল না কালো!

স্তীর্ণে বর্হিষি সমিধানে অগ্না
ঊর্দ্ধো অধ্বর্য্যু র্জুজুষাণো অস্থাৎ।
পর্য্যগ্নিঃ পশুপা ন হোতা
ত্রিবিষ্ট্যেতি প্রদিব উরাণঃ॥

বিছানো রয়েছে কুশ, সমিদ্ধ আছে বৈশ্বানর,
অধ্বর্য্যু, উন্নতকায় বসে আছে সেবায় তৎপর;
চিরন্তন হোতা অগ্নি আহুতির মহিমা বাড়ায়—
রাখালের মত তারে তিনবার ঘুরে দেখে যায়।

ন যস্য সাতু র্জনিতোরবারি
ন মাতরা পিতরা নূ চিদিষ্টৌ।
অধা মিত্রো ন সুধিতঃ পাবকো
ঽগ্নির্দীদায় মানুষীষু বিক্ষু॥

জনিতা জানি যে তাঁরে; তাঁর দান কে কোথা নিবারে?
দ্যুলোক ভূলোক দোঁহে মিত্র তাঁরি; তারাও কি পারে?
বন্ধু জেনে অগ্নিদেবে ভাল করে দাও না আসন—
মানুষের মেলামাঝে দীপ্ত হোক তাঁহার কিরণ!

পরি ত্মনা মিতদ্রুরেতি হোতা
অগ্নির্মন্দ্রো মধুবচা ঋতাবা।
দ্রবন্ত্যস্য বাজিনো ন শোকা
ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনা যদভ্রাট্॥

আসে হোতা মিতগতি, আহুতিরে ধীরে ঘিরে যায়,
ঋতপতি অগ্নি আজ মধুমুখে সবারে মাতায়।
ছুটে যায় দীপ্তি তার চারদিকে যেন তুরঙ্গম—
জ্বলে উঠে যবে, হেরি কাঁপে ভয়ে স্থাবর-জঙ্গম।

যে হ ত্যে তে সহমানা অয়াস-
স্ত্বেষাসো অগ্নে অর্চ্চয়শ্চরন্তি।
শ্যেনাসো ন দুবসনাসো অর্থং
তুবিষ্বণাসো মারুতং ন শর্দ্ধঃ॥

ওই ছোটে খরদীপ্তি অর্চ্চি তব ঘনঘন কাঁপি—
কে না চেনে তাহাদের?—রুদ্রবেগে অরাতিরে ঝাঁপি
অশ্ব হেন ছুটে যায়—কেড়ে নেয় সবাকার নতি—
ঘনঘোর-গর্জ্জনেতে মরুতের এ যেন সংহতি!

আলো ও ছায়া

—(:০:)—

এই জগৎটা নাকি মায়া!—আলোকে ঝলমল সুনীল আকাশ, তাহার কোলে বর্ণে-গন্ধে-গীতে, সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় বিচিত্র ব্যাকুল এই অপরূপ মায়া—দুই চোখ মেলিয়া যখন পরিপূর্ণ আগ্রহে ইহাকে গ্রহণ করি, তখন আপশোষ করিবার মত তো কিছু পাই না। কিন্তু অমানিশার আঁধারে যখন চারিদিক ছাইয়া ফেলে, সঙ্গীহীন প্রান্তরে অগণিত নক্ষত্রের নিমেষবিহীন কঠিন দৃষ্টির তলে নিঝুম হইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে ক্রমে অন্ধকারে ভিতরটা পর্য্যন্ত যখন পাথরের মত কঠিন ও কালো হইয়া জমিয়া উঠে, তখন সে আঁধারকে মায়া বলিতে বুকটা যেন আতঙ্কে কাঁপিয়া ওঠে।—আলোকের মায়া আনন্দ, তাহাকে অভিনন্দিত করি; আর আঁধারের মায়া অব্যক্তের রুদ্ধশ্বাস—সে আনে ভয়, বিষাদ, তন্দ্রা।

আলো আর আঁধার দুই-ই না পাশাপাশি চলিয়াছে। বিবিক্ত হইয়া যে ইহা দেখিতে পারে, সেই মায়ার মধু আস্বাদন করে। কিন্তু আলো আর আঁধারের মাঝে যে ঘুর-পাক খাইয়া ফিরিতেছে, তাহার আর নিস্তার কোথায়? পৃথিবীর বুকে দিন যায়, রাত্রি আসে। প্রত্যেকটাই আমাদের কাছে একান্ত, তাই সোয়াস্তি পাই না—নিষ্ঠুর আবর্ত্তনে হাঁপাইয়া উঠি! কিন্তু আজ যদি সবিতৃমণ্ডলে থাকিয়া দেখিতাম, বিষ্ণুর শ্যামল বক্ষে কৌস্তভের মত অনন্ত সুনীল আকাশের বুকে এই আলোকবসনা ধরণীর ঝিকিমিকিটুকু—তাহা হইলে বুঝি সুখ হইত।

আলোক আর আঁধার যদিও বা নিয়তি, তবুও প্রাণের অর্ঘ্য দিয়া আলোকেরই আরতি করি, আঁধারকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চাই। ইহাই আমাদের স্বভাব। কিন্তু দেখি, কখনও স্বভাবেরও ভুল হয়। যাহারা আলোকের দুলাল, তাহারাও আঁধার খুঁজে।

অবসন্ন হইয়া বলি, কিছুই হইবার নয়, কিছুই হইল না!—একা আমিই এ কথা বলি কিনা জানি না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।—তখন মনে হয়, আমাদের যা কিছু সমস্তই বুঝি অতল আঁধারে তলাইয়া যাইতেছে, রুখিবার সাধ্যও কাহারও নাই, ইচ্ছাও বুঝি নাই।—এই আঁধারের এক মায়া।

বেশ আছি তো!—সরল, সহজ জীবন—দিন আনি, দিন খাই, সারাদিন খাটিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলায় খাটিয়ার উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া পরম আয়েসে আলবোলার নলটা মুখে তুলিয়া লই; আবার ভোর হইতেই ঘানির জোয়ালে নির্ব্বিকারে কাঁধ পাতিয়া দিই, কোথায়ও সংশয় নাই, তর্ক নাই—বেশ তো! এই আঁধারের আর এক মায়া!

সহজ জীবন বটে, কিন্তু এ জীবনে উত্তাপ কই? সহজ সুষমায় বনের কোলে ফুল ফুটিয়া থাকে বটে; কিন্তু সে সৌন্দর্য্যেও আছে একটা মাদকতা, একটা সম্মোহন; তাই কোথা হইতে ভ্রমর আসিয়া ফুলের কানে কানে কি রহস্য গুঞ্জন করিয়া ফিরে, মধু-গন্ধের অর্ঘ্যটুকু উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারে না—আর সেই ফুল মরিয়া সহস্র ফুলের সম্ভাবনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া যায়। জীবন স্বল্পে তৃপ্ত হউক না কেন, কিন্তু তাহার পরিসর অল্প হইলে বাঁচিব কি করিয়া? গরুর দুধ দুহিয়া, বনের ফল পাড়িয়া, গাছের বাকল

পরিয়া ঋষির গৃহস্থালী অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়া যাইত; কিন্তু সর্ব্বজনসুলভ আলো-বাতাস হইতে দুর্দ্দম প্রাণকে শোষণ করিয়া বনস্পতি যেমন সকলকে ছাপাইয়া আকাশের পানে অসঙ্কোচে ঠেলিয়া ওঠে, তেমনি এই স্বল্পে তৃপ্ত জীবনই এক-দিন শত শত প্রাণে আরতির দীপ জ্বালিয়া দিয়া-ছিল—আজ সহস্র বৎসর পরেও সে প্রাণের সম্মোহন তো কাটিল না!—সহজ জীবন চাই বটে, কিন্তু সে জীবন কি কুণ্ঠিত, অলস, পঙ্গু? সঞ্চ-য়ের উচ্ছ্বাসে উপচিয়া উঠিয়া সে জীবন কি ডাক ছাড়িয়া বলিতে জানে না—"শোন দিব্যধাম-বাসী অমৃতের পুত্র যত!"

সহজ হইতে চাই, সমস্ত সংস্কার ও অধী-নতা হইতে মুক্ত হইতে চাই, প্রচণ্ড ঔদার্য্যে, সর্ব্বাবগাহী স্নিগ্ধতায় আত্মপ্রকাশ করিব বলিয়া —এই তো মানুষের পরিচয়। নহিলে পশুর মত সমস্ত দিন মাঠে চরিয়া এবং সারা রাত্রি জাবর কাটিয়া পরম পবিত্র নিষ্ঠায় জীবনটাকে কাটাইয়া দিয়া ভাগাড়ে চরম বিশ্রাম লাভ করাই কি হইবে সহজ জীবনের আদর্শ?

আত্ম-প্রকাশের কথাই যখন উঠিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া রাখি। আত্মপ্রকাশই সত্য, আত্মপ্রচার কিছুই নয়। অর্থাৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া যদি নিজকে বড় করিয়া ছড়াইয়া দিতে পারি, তাহাই শিব; কিন্তু আস্ফালন করিয়া, কোলাহল করিয়া আসর গরম রাখিবার চেষ্টায় সোয়াস্তি নাই।

এইখানে ভুল হয় জানি। বলিতেছিলাম, শুদ্ধ সত্ত্বের কথা; শুদ্ধ তমঃ হইতে তাহাকে বাছিয়া লওয়া বড় কঠিন। বাহিরে দুয়েরই সমান দশা —এ-ও শুদ্ধ, ও-ও শুদ্ধ। এই যেমন আমাদের দেশে। দাওয়ায় বসিয়া ঝিমাইতেছি, এতটুকু সহিষ্ণুতা নাই, উৎসাহ নাই, ঔদার্য্য নাই; আর ভাবিতেছি, পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ই মানুষের সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্ম যদি আজ কেবল দেহে-মনে উৎসন্ন যাইবার পথটাকেই প্রশস্ত করিয়া দিয়া থাকে, তো অধর্ম্মের ক্রিয়া কোন্‌টা?

কেহ বলেন, এই তমোভাব দূর করিবার দরুণ রাজসিকতার উত্তেজনা চাই; অতএব আস্ফালন, দাপাদাপি, এ-ও প্রয়োজন বই কি! নিতান্ত জড়স্বভাব হইতে যে সত্ত্ব জাগিতেছে, তাহার পক্ষে রজোভাবের উত্তেজনা প্রয়োজন হই-লেও হইতে পারে। কিন্তু সে ব্যক্তিগত কথা, বিশেষতঃ প্রাণে সত্য স্ফুরণের কথা। কিন্তু পরের নকল করিয়া কি জাগরণ অভ্যাস হইতে পারে কখনও? নকলনবিশ যে পরিমাণে হাত-পা ছুঁড়িবে, সেই পরিমাণে অবসাদ আসিয়া তাহাকে আরও আড়ষ্ট করিয়া দিবে না?

বাহির দেখিয়া কিছু বিচার করিতে বলি-তেছি না। বলি, অন্তর্ম্মুখী হইতে। যে নিতান্ত দীনহীন, সর্ব্বাঙ্গ যার গলিয়া-খসিয়া পড়িতেছে, সে-ও এক জায়গায় রাজরাজেশ্বর হইতে পারে, তার অনুভবও এক জায়গায় মুক্ত। এই সত্য-কেই আঁকড়িয়া ধরিতে বলি, স্থির হইয়া বসিয়া একবার নিজের মাঝে ডুবিয়া গিয়া আত্ম-মহিমার আস্বাদন করিতে বলি।—আপনাকে চিনিতে হইবে; নিজকে যা ভাবিয়া দুঃখ পাইতেছি, আমি আসলে তা না-ও হইতে পারি!

আমি ছোট নই কিছুতেই। হয়ত বা আমার সামর্থ্য অল্প, দশাননের মত কৈলাস পর্ব্বত ধরিয়া নাড়া দিবার স্পর্দ্ধা হয়ত রাখি না, কিন্তু তা বলিয়া নিজকে মহৎ বিভু বলিয়া জানিতে বাধা কি? আকাশ যেমন নড়িয়া-চড়িয়া বেড়ায় না, অথচ সকলকে বুকে জড়াইয়া রহিয়াছে, আমিও তো তেমনি থাকিতে পারি। এই দিক দিয়া, নিতান্ত যে কাঙ্গাল তাহারও পথ আছে। কেহ হয়ত

ব্যঙ্গ করিয়া বলিবে—হাঁ, আছে—রাজ্যচ্যুত রাজার কৌলীন্যের গর্ব্বও তো একটা পথ। আমি বলি, তাই বা মন্দ কি?—রাজা আর সবার মতই মানুষ; কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে জানে আমি রাজা—এখন তার রাজ্য থাক্ আর নাই থাক্!

শুনিয়াছি, রাণী মদালসা তাঁর ছেলেদের দোলনায় দোলাইয়া ঘুম পাড়াইবার যে গান গাহিতেন, তাহার অর্থ ছিল, "বৎস, তুমি জড় মাংসপিণ্ড নও, তুমি অভয়, অজর, অমৃত, শিবস্বরূপ।" মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কাছ হইতে এই প্রেরণা পাইয়া ছেলেরা আত্মস্বরূপ চিনিতে পারিয়া মহারাজ্যেশ্বর হইয়াছিল। তুমি বলিবে, তাহাতে আর লাভ কি হইল?—একটা রাজ্য ছারেখারে গেল। লাভ কি হইল, তাহা রাজপুত্রেরা বোঝে, তাহাদের রায়ের মূল্য তোমার-আমার রায়ের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী।

এই যে মনোভাব, বাহিরে ইহার কিরূপ প্রকাশ হইবে, সে কথা ভাল করিয়া জানি না; যার যেমন প্রারব্ধ, যার যেমন রুচি। কিন্তু ভিতরটা এমনি অগ্নিময় হইয়া জ্বলিতে থাকিবে—এই চাই। মরিয়া শব হইয়া শ্মশানে সব এক হয় শুনি; কিন্তু জীবন্তে সংসারে থাকিয়া শিব-স্বরূপে সবাই এক হইতে পারে না কি?

জগৎটাকে যে মায়া বলিয়াছিলাম, তাহার অর্থ কি দাঁড়াইবে, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে আমাকে দেখিয়া। জগৎটা মায়া, তাহার কত রকমই অর্থ হয়। কেউ বলে, মায়া মানে ফাঁকি, কিছুই না। এটা গায়ের জোরের কথা হইল না? জগতের তত্ত্ব আমি কি জানি? একটা ঘাসের শিষের মাঝে যে কত রহস্য, তার খবরই বা কি রাখি? আর আজ পাকামি করিয়া বলিব, এই সব ফাঁকি? যদি সবই ফাঁকি হয় তো আমার এই ফাঁকি বলাটাও তো একটা ফাঁকি!—আর বোধ হয় এইটাই সত্যকার ফাঁকি, কেননা এটা একেবারে আমার মনগড়া সৃষ্টি, আর সৃষ্টিটা সৃষ্টিকর্ত্তার মনগড়া। সেটা তাঁর কাছে ফাঁকি হইতে পারে, কিন্তু সৃষ্ট-জীবরূপী আমার কাছে ফাঁকি নিশ্চয়ই নয়।

তাহা হইলে দেখি, জগৎকে ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিতে গেলে ঠেকিয়া যাই। যাহার উপর আমার বিন্দুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহাকে ফাঁকি বলিবার আমার কি অধিকার আছে? এ শুধু দায় এড়াইবার দুর্ব্বুদ্ধি, কুড়েমীর মন্ত্র।

কিন্তু মিথ্যা অর্থে তুচ্ছ হইতে পারে। এইটাই সত্য কথা। জগৎটা আমার কাছে মায়া—মানে তুচ্ছ। উপেক্ষা করিবার অধিকার আমার আছে—আর সেইটাই আমার যথার্থ পৌরুষ। সবার মাঝে উপেক্ষা-রূপ দুঃসহ তেজ বর্ত্তমান। আমি পথের ভিখারী, গায়ের জোরে, টাকার জোরে রাজার সঙ্গে টক্কর দিবার সামর্থ্য আমার নাই, কিন্তু আমি যদি আজ রাজাকে উপেক্ষা করিয়া তুচ্ছ করিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াই, রাজার সাধ্য নাই যে আমার মাথা নোয়ায়। আমার ভিক্ষাপাত্রের গৌরবের কাছে তখন রাজ-সিংহাসন তুচ্ছ—সত্যি সত্যিই তুচ্ছ—এ আর ফাঁকি নয়। বর্ত্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রেও মহাত্মা গান্ধী নিঃসম্বল হইয়াও এই উপেক্ষার দুঃসহ বীর্য্যে সন্ধুক্ষিত হইয়া সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরের সম্মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

আবারও বলি, জগৎ আমাকে পীড়িয়া মারুক, আমাকে লইয়া যা খুসী তাই করুক—আমার কিছুই করিবার শক্তি হয়ত নাই, কিন্তু উপেক্ষা করিবার, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিবার শক্তি আমার আছে; আর এই উপেক্ষা-শক্তির সীমা পরিসীমা নাই। শুনিয়াছিলাম সতীদাহ নিবারণের

আইন হওয়ার পূর্ব্বে একবার এক সতীদাহের সময় একজন ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারী শ্মশানে উপস্থিত থাকিয়া সতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মানুষ কি স্বেচ্ছায় আগুনে পুড়িয়া মরিতে পারে? তোমার এই আত্মহত্যার পেছনে অপরের প্ররোচনা নাই তো?" সতী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "সাহেব, দেখিবে, মানুষ স্বেচ্ছায় পুড়িয়া মরিতে পারে কিনা?" এই বলিয়া জলন্ত প্রদীপে নিজের তর্জ্জনীটী ধরিয়া দিলেন। আঙ্গুলের মাংস পুড়িয়া হাড় পুড়িয়া বাঁকিয়া গেল, কিন্তু সতীর প্রসন্ন মুখমণ্ডলের একটী রেখাও কুঞ্চিত হইল না। সাহেব স্তম্ভিত হইয়া গেল। এই সতীর হৃদয়ে যে প্রেমের আগুন জ্বলিতেছিল, তাহার কাছে ভৌতিক আগুন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। আগুনের দাহিকাশক্তি ফাঁকি নয়, তার হিসাবে সে সত্য বটে, কিন্তু আত্মার দীপ্তির কাছে সে তুচ্ছ, সে মায়া!

লাফালাফি, দাপাদাপি নয়—এমনি গম্ভীরবেদী হইয়া আত্মার ভাস্বর মহিমায় অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় হইয়া জগৎটাকে তুচ্ছ করিতে শেখ। ফাঁকি কিছুই নয়—বাইরের এই এতগুলি চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্রের মেলা ফাঁকি কিছুতেই নয়—কিন্তু "সূত্রে মণিগণা ইব" উহারা আমার মাঝে গাঁথা রহিয়াছে। আমার কায়ার দিকে তাকাইলে ওরা ছায়া মাত্র—অতএব তুচ্ছ।

আর একদিক দিয়া জগৎ ফাঁকিও হইতে পারে—সে কিন্তু আমার নিজের মনগড়া জগৎ—যে ভয়ের জগতে দাসত্ব করিতেছি, ভাবনার জগতে ঝুরিয়া মরিতেছি। জান না, এই তোমার কল্পিত জগতই বাহিরের জগতের উপর প্রতিফলিত হইয়া উহাকে এমন বিকট করিয়া তুলিতেছে। শ্যামাকান্ত বাঘকে জাপটাইয়া ধরিতে ডরাইত না, তুমি বাঘের নাম শুনিলেও আঁৎকাইয়া মর। একই বাঘের তাৎপর্য্য দুইজনের কাছে ভিন্ন কেন? লোকে বলে, বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়। মনের বাঘটাই মিথ্যা, ফাঁকী; এই ফাঁকিটাকে এক তুড়িতে উড়াইয়া দিতে পারিতেছ না বলিয়াই বনের বাঘটাকে তুচ্ছ করিতে পারিতেছ না। এমন ছেলে আছে যাহাকে জুজুর ভয় দেখাইলে সে জুজু দেখিতে চাহে; বুঝিতে হইবে, ইহার মনের ফাঁকি কাটিয়া গিয়াছে; এখন জুজু থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই বা কি!

তেমনি ভয় দিয়া, ভাবনা দিয়া, আসক্তি দিয়া, ক্ষুদ্রতা দিয়া—অর্থাৎ কুৎসিৎ কতকগুলি কল্পনা দিয়া যে একটী মনের জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছ তুমি নিজে, যে মনোময় পরকলার ভিতর দিয়া এই জগৎটাকে কুব্জপৃষ্ঠ কাচে প্রতিফলিত বিম্বের মত বিকট করিয়া তুলিয়াছ, সেই মনের ফাঁকিকে গুটাইয়া লও—তবেই সত্যি সত্যি জগৎ মিথ্যা হইয়া যাইবে!

এমনি করিয়া তোমার মনোময় জগৎ যদি ফাঁকি হয়, আর সেই জগতের ছাঁচে ঢালা এই তুমি-নিরপেক্ষ জগৎটা যদি তুচ্ছ হয়—অন্তরের অন্তরে এই বিশ্বাস যদি শুক্তির বুকে মুক্তার মত কঠিন হইয়া জমিয়া থাকে, তবে আর ভয় কি বীর!—অফুরন্ত বীর্য্যে কর্ম্মপ্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়—রুদ্ধশক্তির পূর্ণ প্রকাশ ছটায় ছটায় জগৎময় ছড়াইয়া পড়ুক। ঘরের কোণে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবার মানুষ তুমি নয়, 'হায় কি হইল' বলিয়া বিলাপ করিবার তোমার কিছু নাই;—তুমি স্বরাট্, তুমি বিভু, তুমি পূর্ণ। এই খণ্ড দেহ-মন তোমার সেই পরিপূর্ণ অমৃতস্বরূপ আস্বাদন করিবার পেয়ালা মাত্র—এই দেহের পেয়ালা, মনের পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া প্রকৃতির পরিবেশিত অমৃতরস আকণ্ঠ

পান কর—সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় তোমার কাছে একাকার হইয়া যাক্—তোমার অর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত শিব-নেত্রের উর্দ্ধদৃষ্টিতে ত্রিপাদের অমৃতজ্যোতিঃ চিরন্তন হইয়া ফুটিয়া উঠুক্! ভোলানাথের ঢুলুঢুলু নয়ন এই জগৎকে দেখিতে পায় কি না পায় কে জানে? হয়ত অমৃতের নেশায় বিভোল দৃষ্টিতে আব্ছায়ার মত একটা কিছু ভাসিয়া বেড়ায় —সেটা থাকিয়াও নাই, না থাকিয়াও আছে। সে কি আর মানুষের মেলা—ভূত-প্রেত-প্রমথের তাণ্ডব ওখানে—সবাই বিকৃত, বিভীষণ—মানুষ একমাত্র শিবস্বরূপ। তবু ওই ভূতকেই ভালবাসেন ভূতনাথ, শঙ্করের বিকার ওরা, শঙ্করীর স্নেহাকুল হৃদয়ের তির্য্যক প্রতিচ্ছবি ওরা!

এই জগৎ-রহস্য—এই বেদান্ত। আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি এইখানেই।

তীর্থরামের গৃহস্থালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—(*)—

"যদিদং হৃদয়ং মম—"

তীর্থরাম ও তাঁহার পত্নীর মধ্যে বয়সের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। উভয়েরই ছেলেবেলায় বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। বিবাহের পর তীর্থরাম ভকতজীর তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া করিতে গুজরণ-ওয়ালায় চলিয়া আসেন; তাঁহার পত্নী বালিকাবয়সেই শ্বশুরবাড়ীতে শ্বশুর-শাশুড়ীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার পর পিতার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও যখন তীর্থরাম কলেজে পড়িবার সঙ্কল্প করেন, তখন তাঁহার পিতা পুত্রকে জব্দ করিবার দরুণ পুত্রবধূকে লাহোরে পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দেন। বাধ্য হইয়া এই দুইটী অনভিজ্ঞ ও অল্প-বয়স্ক প্রাণীকে একটা সংসারের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইতে হইয়াছিল। প্রচলিত দেশাচার অনুসারে তীর্থরামের পত্নী গৃহকর্ম্মে নিপুণা হই-লেও লেখাপড়া বিশেষ জানিতেন না। তাঁহার স্বভাবটী একান্ত নিরীহ এবং নিতান্তই স্বামীর ছন্দানুবর্ত্তী ছিল। আর দশজন মেয়ের যেমন স্বামীসৌভাগ্য হইয়া থাকে, তাঁহার স্বামীসৌভাগ্য তো তেমন ছিলই না, বরং তাঁহার এই খেয়ালী ও ক্ষ্যাপাপারা স্বামীটীকে লইয়া অতি সন্তর্পণেই তাঁহাকে সংসার চালাইতে হইত। সংসারের প্রতি স্বামীর ঔদাসীন্যে কিম্বা তাঁহার কুলপ্লাবী বেদান্ত-চর্চ্চায় তিনি কোনও দিন মুহূর্ত্তের তরেও অস্বস্তি অনুভব করেন নাই বা আত্ম-সুখের কামনায় স্বামীর উচ্চ আকাঙ্ক্ষার হন্তারক হন নাই। সংসারে উদাসীন হইয়াও স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন নাই, এমন যে দুই-চারিটী মহাপুরুষের কথা আমরা জানি, তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীর মতই তীর্থ-রামের সহধর্ম্মিণী লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া স্বামীর ধর্ম্মপথে যে কতখানি সহায় হইয়াছিলেন, তাহা বলিবার নয়। একে তীর্থরামের বাল্যকালে বিবাহ; স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বয়সের ব্যবধান অতিসামান্য; তারপর কৈশোরের সীমানায় দাঁড়াইতে না দাঁড়া-ইতেই দুজনের একত্রবাস; তাহার উপর তীর্থ-

রামের প্রবল মনোবেগ (তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁহার মনোবেগ অতি প্রবল ছিল, তাহা তিনি নিজেই ভকতজীর নিকট এক পত্রে ব্যক্ত করিয়াছিলেন) ; এতগুলি ইন্ধন থাকা সত্ত্বেও যে তীর্থরাম সংসারের বেষ্টনীর মাঝে থাকিয়াই তাঁহার আবাল্য ব্রহ্মানুভাবিত জীবনটী ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন, ইহার মূলে তাঁহার ঐকান্তিকতা যতটুকু, তাঁহার পত্নীর সংযম ও আত্মত্যাগও তাহার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। বিশেষতঃ এই মমতাময়ী মৃদুস্বভাবা নারী যদি অন্নপূর্ণার ন্যায় তীর্থরামের মত ভোলানাথের সংসারে অধিষ্ঠিতা না থাকিতেন, তাহা হইলে অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী সভায় অপর্য্যাপ্ত ক্ষীরপানের সহিত বেদান্তের মজলিস্ জাঁকিয়া উঠিত কিনা, সন্দেহের বিষয় ! তীর্থরামপত্নী যদি একান্তই স্বামীর অনুগতা না হইতেন, তাঁহার ভাবে ভাবিতা না হইতেন, তাহা হইলে নিমিষের প্রতিকূলতায় সংসারে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া তীর্থরামকে দেশান্তরী করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া কৈশোরাবসান হইতে এই দুইটীতে, সুখে না হউক সোয়াস্তিতে একটী বৃহৎ সংসার অনায়াসে বহন করিয়া আনিয়াছেন, এবং তীর্থরামপত্নী বানপ্রস্থ দশায় পর্য্যন্ত তাঁহার স্বামীর সঙ্গিনী হইতে পারিয়াছেন। নারীশক্তির অপরিমেয় নিগূঢ় প্রভাব তীর্থরামের পক্ষে অনুকূল না হইলে ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারিত না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তীর্থরাম তাঁহার স্ত্রীর প্রতি উদাসীন ছিলেন না। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি সাম্য না থাকে, তাহা হইলে সংসার সুখের হয় না, ইহাও সত্য। তীর্থরামও এই সাম্যের উপাসক ছিলেন বটে, কিন্তু আজকাল যে ভাবে নারী-পুরুষের সাম্য ঘটাইবার প্রয়াস চলিতেছে, তিনি কিন্তু সেদিক মাড়ান নাই।

আজকাল স্ত্রীপুরুষের মাঝে সাম্য সংঘটনের প্রয়াস প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বটে। শুধু স্ত্রীলোকেরাই সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সমান হইতে চাহিতেছে, তাহাই নয় ; পুরুষও স্ত্রীলোককে কতকটা পৌরুষেয় গুণের সমাবেশ দ্বারা নিজেদের সমান করিয়া নিতে চাহিতেছে। এই প্রচেষ্টার মাঝে ভাল-মন্দ দুই তরফই আছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সমাজের যে অবস্থা ছিল, এখন সে অবস্থা নাই। ক্রমবিকশমান সমাজে নারীর অধিকার নূতন করিয়া নিরূপিত হইবার দিন আসিয়াছে। এখন চারিদিকে যে বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে, তাহা পরিণতির পূর্ব্বাভাস মাত্র, এই অবস্থাই যে চিরস্থায়ী হইবে তাহা নয়। আধুনিক গৃহস্থালী পরিচালনার দরুণ নারীকে নারীত্বের সনাতন ধর্ম্মের অনুসরণ তো করিতেই হইবে, তাহা ছাড়াও যুগোপযোগী কতকগুলি আগন্তুক ধর্ম্মের অনুশীলন না করিলেও আর তাহার পক্ষে সোয়াস্তিতে সংসার করা সম্ভবপর হইবে না। তীর্থরামের গৃহস্থালী প্রায় ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বের ; সুতরাং অতি-আধুনিক অনেক সমস্যারই সেখানে সাক্ষাৎ মিলে না। কিন্তু গৃহস্থালীর মূল সুরটী সেখানেও অব্যাহত রহিয়াছে, এবং আমাদিগকে তাহাই আবিষ্কার করিতে হইবে।

তীর্থরাম স্বয়ং মহা বিদ্বান্—শুধু বিদ্বান্ নন, তিনি একজন বিদ্যা-ব্যসনী। কিন্তু তাঁহার পত্নী বিদুষী ছিলেন না। এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এতবড় বিদ্বান্ স্বামী এই স্বল্প-শিক্ষিতা স্ত্রীর বিদ্যার ন্যূনতা নিয়া কোনও দিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই। বিদ্বানের স্ত্রীকে বিদুষী হইতে হইবে, ইহা যদি সর্ব্ববাদিসম্মত রীতি হয়, তাহা হইলে তীর্থরামের স্ত্রী তাঁহার মনের মতন নন বলিয়া উভয়ের মাঝে প্রীতির বন্ধন নিবিড় না হওয়ারই কথা। মনের মতন স্ত্রী সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে সকল পুরুষেরই কামনার ধন হইয়া রহিয়াছে।

সুতরাং তীর্থরাম যে তাঁহার স্ত্রীকে মনের মতন করিয়া পাইতে চাহিবেন, ইহাও খুবই সম্ভব। আর বাস্তবিক তীর্থরাম তাহা চাহিয়াও ছিলেন। কিন্তু তিনি গণিতশাস্ত্রে এম্-এ বলিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে ট্রিগণমেট্রির সমস্যার সমাধান চাহেন নাই। স্বার্থপর পুরুষের মত (!) স্ত্রীর নিকট হইতে দাসী-সুলভ সেবা পাইবার দরুণ জুলুমবাজীও (!) করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। অথচ তিনি চাহিয়াছিলেন—মনের মতন স্ত্রী। হেঁয়ালী কিছুই নয়; তীর্থরামের মনটী যে ভূমিকায় ছিল, তাঁহার স্ত্রীকেও তিনি সেই ভূমিকায় পাইতে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহার অপরিমিত সৌভাগ্য যে সেথানে তিনি তাঁহাকে পাইয়াও ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাঝে আত্মস্বরূপকে প্রতিফলিত দেখিয়া আত্ম-সম্পূর্ত্তি লাভ করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার দাম্পত্য-জীবনের আদর্শ। এই আদর্শে স্ত্রীকে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়া তাহাতে তিনি সফলকামও হইয়াছিলেন। উভয়ের পরস্পরা-শ্রিত নির্ম্মল সাধনার কাহিনী তিনি একাধিক স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রী পুরুষের এই সনাতন সাম্যই হিন্দুর গৃহ-স্থালীর মূল ভিত্তি। সৎপুরুষ এবং সতী-স্ত্রী বলিতে হিন্দু ইহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। যে যাহাই বলুক না কেন, অধ্যাত্মসিদ্ধির জন্য আকুলতা হিন্দুর মজ্জাগত। এই আকুলতায় যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে সমভাবে আপ্লুত না করে তাহা হইলে গৃহস্থালীতে যথার্থ শ্রী কখনই ফুটিতে পারে না। রামকৃষ্ণদেবও বলিতেন, স্ত্রী যদি অনুকূল হয় তো অমন সতী-স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে নাই। তিনি নিজের জীবনেও তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। অপরপক্ষে, যে স্ত্রী অধ্যাত্ম-সাধনার পরিপন্থী, তাহাকে তিনি স্পষ্টতঃই নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এক নবানুরাগী ভক্ত একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্ত্রী যদি বলে, দেখ্‌ছ না, তুমি অমন করলে আমি গলায় দড়ি দেব—তাহলে কি করব?" রামকৃষ্ণদেব দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "তা দিক্‌গে—অমন অবিদ্যা-স্ত্রীর মুখ দর্শন করতে নাই।"

মোট কথা, মানুষ যখন যে ভূমিকায় থাকে, তখন সেই ভূমিকার উপযোগী সঙ্গীরই সন্ধান করে। হিন্দুর গৃহস্থালীতে ধর্ম্মের প্রভাবই প্রবল। সুতরাং প্রাচীন পরিভাষায় মনোমত স্ত্রী বলিতে যে বিশেষ করিয়া স্ত্রীর আধ্যাত্মিক যোগ্যতাকেই লক্ষ্য করা হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। এখনকার যুগের মত ফ্যাসানের শিক্ষা বা প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা কেহ স্ত্রীর কাছে পাইতও না—চাহিতও না। অথচ ইহাতে যে দাম্পত্যজীবন সুখের হইত না, তাহা অবিশ্বাস্য। এখনও পুরুষ মনের মত স্ত্রীই চায় বটে, কিন্তু তাহার মন অধ্যাত্ম-চিন্তা হইতে বিষয়-চিন্তার দিকে একটু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; সুতরাং সাংখ্যের সিদ্ধান্তানুযায়ী পুরুষের ঔৎসুক্যের অনু-রূপ নারীকেও আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত হইতে হই-তেছে এবং এইজন্যই হয়ত গ্রাজুয়েট্ স্বামীর নিদান পক্ষে ম্যাট্রিকুলেট্ পত্নী ছাড়া মন উঠিতে চাহে না। অবশ্য আধুনিক সমাজ ও সংসার অনুযায়ী স্ত্রী-জাতির শিক্ষা-দীক্ষার পরিবর্ত্তন যে নিষ্প্রয়ো-জন, সে কথা বলিতেছি না। আমাদের আদর্শ-গত পরিবর্ত্তনে যে রুচির পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে এবং তাহার ফলে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্প-দের প্রতি ঔদাসীন্য সৃষ্টি করিয়া কল্পিত অভা-বের তাড়নায় আমাদিগকে পীড়িত করিতেছে, তাহার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। বর্ত্তমান নারীপ্রগতির আন্দোলনের মূলে পুরুষের যে প্রেরণা রহিয়াছে, আমাদের বিশ্বাস তাহার মাঝে পুরুষের দৃষ্টিবিভ্রম আছে।

এইখানে তীর্থরামের দাম্পত্যজীবনের একটী

ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করি। একবার কোনও আত্মীয়ের বিবাহোপলক্ষ্যে তীর্থরাম-জায়ার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তিনি তখন লাহোরে। লাহোরের বাসায় নিতান্ত সাদা-সিধা ভাবেই তিনি থাকিতেন। স্বামীর স্বভাব তিনি জানিতেন; সুতরাং কাপড়-চোপড় গহনা-গাঁটীর জন্য কোনও দিন স্বামীর কাছে আবদার করিতেন না। তাহা ছাড়া কৈশোর হইতে তীর্থরামের রিক্ততা ও তপশ্চর্য্যার ভাগও তাঁহাকে লইতে হইয়াছে, সুতরাং বিলাস-ব্যসনের দিকে তাঁহার চিত্ত ঝুঁকিয়া পড়িবার কথাও নয়। কিন্তু নিতান্ত কাঙ্গালিনীর বেশে উৎসব-সভায় যাইতেও তাঁহার মন সঙ্কুচিত হইতেছিল। সবাই জানে, তাঁহার স্বামী যথেষ্ট উপার্জ্জন করেন, দেশে তাঁহার খ্যাতিও অল্প নয়। এমন বড়ঘরের গৃহিণী হইয়া অনাথার মত লোকের সামনে বাহির হইতে সঙ্কোচ অনুভব করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে তিনি স্বামীর কাছে নিমন্ত্রণে যাওয়ার উপযোগী একখানা সাড়ী চাহিলেন। তীর্থরাম বোধ হয় তখন বেদান্তের কোন্ সু-উচ্চ শিখরে আরূঢ় ছিলেন, কথাটা তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। স্বামীর কাছে কোনও দিন কিছু চাহেন নাই, তাই আজকার এই প্রত্যাখ্যান তীর্থরামপত্নীকে বড়ই বাজিল। তিনি আর কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া গৃহকার্য্যে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার মনের ভার লঘু হইল না। সন্ধ্যাবেলা আহারে বসিয়া তীর্থরাম পত্নীর বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিতেই সকালবেলার ঘটনা মনে পড়িয়া গেল, বুঝিলেন, তখনকার প্রত্যাখ্যানে তাঁহার স্ত্রী প্রাণে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছেন। সস্নেহে তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনের মেঘ কি এখনও কাটিল না?" স্ত্রী মুখ ভার করিয়া উত্তর দিলেন, "ক্রিয়াকর্ম্মের বাড়ীর লোকে কি বলিবে, তাহার খেয়াল রাখ?" তীর্থরাম কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রশ্ন করিলেন, "কি বলিবে শুনি?" স্ত্রী বলিলেন, "লোকে বলিবে, স্বামী এত টাকা উপায় করে অথচ স্ত্রীর গায়ে না ওঠে একখানা ভাল গহনা, না একখানা ভাল কাপড়। এতে লোকের চোখে তোমাকেই তো খাট হইতে হইবে।" তীর্থরাম হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ, সম্ভ্রম নষ্ট হয় তো আমারই হইবে, তোমার তো নয়। তুমি কোন চিন্তা করিও না। আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমার সম্ভ্রম নষ্ট হইবে বলিয়াই বুঝি তুমি এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলে। কিন্তু এখন তো দেখিতেছি, ব্যাপার তাহার উল্টা। তুমি তো আমার সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্যই সাজগোজ করিতে চাহিয়াছিলে? কিন্তু আমি এমন করিয়া লোকের কাছে সম্ভ্রম বজায় রাখিতে ঘৃণা বোধ করি। তুমি আমার মন রাখিয়া চলিতে চাও, না লোকের মন রাখিয়া চলিতে চাও?" স্বামীর এই প্রশ্নের উত্তরে স্ত্রী তাঁহার জল-ভারাক্রান্ত চক্ষু দুটী স্বামীর মুখের পানে তুলিয়া ধরিলেন। তীর্থরাম একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শান্তভাবে বলিলেন, "যাহারা বাহিরের সাজসজ্জা দেখিয়া লোকের দর যাচাই করে, তাহাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধই নাই। একমাত্র পরমাত্মাই আমাদের তন্-মন্-ধন্ সব। এই গৃহস্থালীতেও তো দেখিতেছ, আমরা কত আবশ্যক জিনিষ পর্য্যন্ত ব্যবহার করা ছাড়িয়া দিয়াছি। আমরা যাইব সাজ পোষাক দিয়া দেহকে সাজাইতে? যাও, যেমন সাদা-সিধা কাপড় চোপড় এখানে পর, তেমনি পরিয়াই নিমন্ত্রণ রাখিতে চলিয়া যাও—তোমার শুভ্রতা ও পবিত্রতার প্রভাব অপরের উপরও পড়ুক!" তীর্থরামপত্নীর জলভরা চোখেও হাসি ফুটিয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

সাধনার প্রয়োজন

—(:০:)—

মনটীর মতন স্থূল দেহটীকেও ভাবের বাহন করে নিতে হবে। মনের মাঝে তো অশুভ চিন্তার উদ্রেক হবেই না, এমন কি স্থূল দেহটী পর্য্যন্তও যেন অজ্ঞাতসারে কোন অনাচারে লিপ্ত না হয়, তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখাও সাধক-জীবনে একান্ত প্রয়োজন। শুভ কর্ম্মে যেমন আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, অশুভ কর্ম্মের বেলায়ও যেন তেমনি ঘৃণায় শরীর কুঞ্চিত হয়ে যায়। এর পরথ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের জীবনে দেখিয়ে গিয়েছেন। সাধন-সহায়ে স্থূল দেহটাকেও চিন্ময় দেহের সঙ্গে এমনি সুরেই বেঁধেছিলেন যে স্থূলদেহ হতেই তিনি চিন্ময়ের অনুভূতি আহরণ করতে পারতেন। এ অবস্থা তিনি সহজেই লাভ করেন নি, এর জন্য কত সাধ্য-সাধনা করতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আন্তরিক পরিশুদ্ধির ফলেই মানুষের এরূপ উন্নত অবস্থা আসে। রসগোল্লার আস্বাদন পেলে কেউ সামান্য মিষ্টিতে তৃপ্ত থাকতে চায় না। ভূমার সঙ্গে একবার যার যোগ হয়েছে, তার মন সেই দিব্য-অনুভূতির স্তর হতে নীচে নেমে এসে কিছুতেই বাঁচতে পারে না। ভাবের অনুকূল করে দেহটীকেও গড়ে তুলতে হবে। উচ্চ ভাব এসে অপরিশুদ্ধ আধারে দাঁড়াতে পারে না। অবিদ্যায় অভিমানে মানুষের বুক উঁচু হয়ে থাকে, তাই অনেক সময় তাঁর অহেতুক কৃপারাশি এসেও ব্যর্থ হয়ে যায়। যা হতে চাই, তার ভাবনায় সর্ব্বদা আমাদের ভাবিত থাকতে হবে—এ সুযোগটুকু না দিলে যাকে চাই, সে কেমন করে আমায় তার আপন করে নেবে? একেই বলে আত্ম-সমর্পণ—তাঁর আনাগোনার পথ যেন সংশয় দ্বারা অবরুদ্ধ না হয়। সাধন-ভজন, যোগ-যাগ যত কিছু কেবল পথ পরিষ্কার করা—কি জানি কোন পথে তাঁর আগমন হয়! সকল দিকের দুয়ারই আমাদের উন্মুক্ত রাখতে হবে। তাই সাধন পথে তৌষ্টিকের ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তিতে অভিভূত হয়ে পড়লে চলবে না—কেবল অবিশ্রান্ত গতি, সাধনার সচেষ্ট আবেগ প্রতিনিয়ত চিত্তকে ব্যাকুলিত করে তুলবে—তবে না বুঝব আমি সাধক। যে-দিন দেখব, আমার মাঝে সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়ে গেছে, সেদিনই জানতে হবে লক্ষ্যে পৌছেছি, এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আকুলি-বিকুলি, অভাবের পীড়ন—এসব তো থাকবেই।

যাকে নিয়ে আমি সাধন করব, সে যদি আমার বিরোধী হয়, তবে লক্ষ্যে পৌছতে সময় লাগবেই তো। দেহের অসুখ-বিসুখে মনও বিগড়ে যায়, তাই দেহকেও সুস্থ-স্বস্থ রাখতে হবে। দশজনকে নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে একের গণ্ডগোলে সকলকে কিছু-না-কিছু পায়ই। দেহটা আমাদের পূর্ব্ব সংস্কার দিয়েই গঠিত। সকলের যে মনের গতি একই পথে ধাবিত হচ্ছে, তা তো নয়। চোরের মাঝে জন্মার্জ্জিত সংস্কার রয়েছে, তাই চুরীর দিকেই তার মন ছোটে; তেমনি সাধু সাধুত্বের দিকে, লম্পট লাম্পট্যের দিকে—এই ভাবেই জগৎ চলছে। কিন্তু মানুষ স্বীয় চেষ্টায়, মনের বলে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুঝতে পারে। তাই আজ যে চোর, ইচ্ছা করলে সে সাধুও হতে পারে। আমি যা নই, তা হতে চাইলেই সাধনার প্রয়োজন। আজ ব্যভিচারী আছি, হয়ত দুষ্টশক্তি আমায় অভিভূত করে রেখেছে, ভাল-মন্দ বুঝে উঠতে পারছি না,

কিন্তু দুদিন পর যখন চেতনা জাগবে, ভাল হবার জন্য ভিতরে আপ্রাণ চেষ্টা হবে—তখনই তো সাধনার প্রয়োজন। স্বভাবের কথা আলাদা; কয়জনের মাঝে স্বাভাবিকই ধর্ম্মের দিক আন্তরিক টান থাকে? অধিকাংশেরই জোর করে নাম নিতে নিতেই ভক্তির উদয় হয়। সে এক যুগ গিয়েছে, জ্ঞান যখন স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছিল—এখন তো আর অতীত গৌরবের কল্পনা নিয়ে বসে থাকলেই চলবে না।

তপস্যার ফলে সংযম অনায়াস হয়ে ওঠে। আজ হয়ত কুকার্য্য হতে নিবৃত্ত হতে সকল ইন্দ্রিয়ের প্রতি কড়া নজর রাখতে হচ্ছে, কি জানি কোন সময় আমায় ফাঁকি দিয়ে কি করে ফেলে তারা! আবার ইন্দ্রিয়সংযম হলে, আমার তেমন লক্ষ্য না থাক্‌লেও প্রলোভনের বিষয় হতে ইন্দ্রিয় আপনি প্রতিনিবৃত্ত হয়ে যাবে। শুধু সাধনার ফলেই এ শক্তিটুকু করায়ত্ত হয়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলতেন, "নারী দেখলে আমারও আগে কামভাবের উদয় হত, কিন্তু এখন কাম যে কি তা চেষ্টা করেও স্মরণে আনতে পারি না।" আগে হ'ত, এখন হয় না—কেন? ইন্দ্রিয়ের আগে পাশবিক শক্তি ছিল, সাধনার প্রভাবে এখন তাদের মাথা নত—তারা নির্জ্জিত। স্বভাব যাকে বলছি, সে-ও তো ক্রমাগত সাধনারই ফল। সাধনা আর সিদ্ধিতে যে অঙ্গাঙ্গিভাব। বিরোধ যারা দেখতে পায়, তারা অলস, নিষ্কর্ম্মা—ভাবে, ফাঁকতালে একটা কিছু পেয়ে যাবে; এই ভরসায়ই বেঁচে আছে। অভাবগ্রস্ত অসহায় জাতির পক্ষে নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্ক্রিয়ভাব কি করে সম্ভব হয় তা তো বুঝি না। বৈদিক যুগে দেখতে পাই, ঋষিদের মাঝে কি আন্তরিক যোগাযোগ ছিল। কোথায় কোন ঋষি একটু উঁচুদরের জিনিষের সন্ধান পেয়েছেন, আর অমনি একদল গিয়ে তাঁর কাছে হাজির হলেন, জ্ঞানপিপাসা মিটাবেন বলে। ঋষিও যা পেয়েছেন, প্রাণ খুলে তা বলতে লাগলেন। নির্গুণতত্ত্বই ছিল তাঁদের লক্ষ্য—কিন্তু তাঁরা তো নিষ্ক্রিয় হয়ে যান নি। তখনকার সাধনা ছিল সহজ, কিন্তু তপস্যাও যে বরবাদ হয়ে গিয়েছিল এমন প্রমাণও তো পাই না। কিছু না করেই সব হবে, এ হল সহজ সম্বন্ধে নূতন রকমের একটা অদ্ভুত আইডিয়া। এজন্যই নিষ্কর্ম্মা-বৃকোদর সহজপন্থীর সংখ্যাই দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সহজ মানে—সাধন-ভজনের নাম গন্ধও নিতে হবে না এমন নয়; যা সহজাত, যার সঙ্গে বিরোধ কিছুরই নাই তাই "সহজ।" যেমন শঙ্করের বেদান্তজ্ঞান ছিল সহজ। সিদ্ধি সহজ বটে, কিন্তু সাধন সর্ব্বত্রই কঠিন; আর অসাধনের সিদ্ধি বা সহজভাব একটা অশ্বডিম্ব।

সাধন করলেই সিদ্ধি হবে, ভগবান্‌কে ডাক্‌লেই ভগবান্ দেখা দিতে বাধ্য, এরূপ গ্যারান্টি আধ্যাত্মিক জগতে দেওয়া চলে না। দেখা দেওয়া না দেওয়া তাঁর খুসী—তাঁর খেয়াল। সাধন করেও তাঁকে পাওয়া যায়, আবার অসাধনেও তাঁর দর্শন মিলে; এ ভাবটা যদি আমাদের মাঝে থাকে, তাহলে দিন দিন আকুলতা বাড়বে অথচ সাধনের অভিমান জাগবে না। বড়লোক আসবে বলে, মানুষ রাস্তাঘাট ময়লা-আবর্জ্জনা ঝাঁট দিয়ে দূর করে পরিষ্কার করে রাখে, কিন্তু আমি রাস্তাঘাট পরিষ্কার করছি বলেই যে উনি আসতে বাধ্য এমন তো নয়। পরিষ্কার করা, পবিত্র রাখা এটা আমাদের কর্ত্তব্য; এমন কর্ত্তব্য, যা না করে পারছি না, কেননা তাঁকে আনতে হলে যে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতেই হবে—সেটা আমারই গরজ, যদিও কিনা আসা না আসাটা তাঁর গরজ। সাধন-ভজনও ঠিক এই ভাবটা বজায় রেখে যদি করা যায়, তাহলে আর

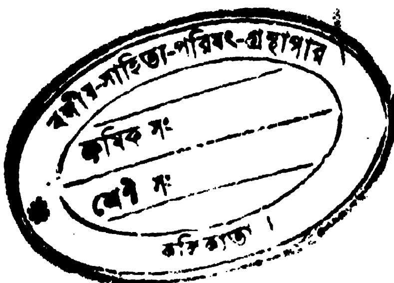
গণ্ডগোল বাধে না। আধ্যাত্মিক উন্নতি নাই বা হোক, তপস্যায় অন্ততঃ স্থূল শরীরটাকে তো রোগ-শোক থেকে মুক্ত করা যায়। এটাও কি ব্যাধিগ্রস্ত জাতির পক্ষে কম লাভ? স্থূল শরীরে যদি কোন বিপ্লব না ঘটে, তবে মনকে নিয়ে অনেক উচ্চ চিন্তায় নিয়োজিত করা যায়। বেশীর ভাগ লোককেই তো শরীর নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করতেই দেখতে পাই—আধ্যাত্মিক চিন্তা করার সময় তাদের কোথায়?

গ্যারান্টি দেওয়া চলে না অবশ্য, কিন্তু প্রায়ই শুদ্ধ আধারেই তাঁর আবির্ভাব দেখতে পাই। এতেই মনে হয়, সাধন-ভজনের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রয়েছে। সংযমের পর যা ফুটে ওঠে, তাই সুন্দর হয়—ব্যভিচারের দান অসুন্দর, অপ্রিয়। বিকার প্রত্যেক জিনিষের মাঝেই থাকে, তাই তাকে শোধন করে নিতে হয়। সত্য অবান্তরের আবরণে লুকিয়ে থাকে; তাই সাধনা করা তাঁকে পাওয়ার জন্য নয়, পাওয়ায় যত বাধা আছে তা থেকে নিজকে মুক্ত করার জন্য। কাজেই সাধনা আমাদের চিরসঙ্গী। অকালে নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি দেখে আশঙ্কা হয় বৈকি! অভাবে মানুষকে সচেষ্ট করে তোলে, আত্মবোধ জাগিয়ে দেবার সাহায্য করে। ক্ষুধা আছে অথচ ক্ষুধানিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে যে আমরা উদাসীন, অভাব আছে অথচ অভাবপূরণ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট, এটা একটা অদ্ভূত রহস্য নয় কি?

অনুসন্ধিৎসাটাকে আমরা সংশয় বলে অনেক সময় অবজ্ঞার চোখে দেখি। এরূপ কুধারণায় জাতির মাঝে একটা নির্জ্জীব ভাব সহজেই আমদানী হয়ে পড়েছে। জ্ঞানীকে আজ সবাই কটাক্ষ করে, কেননা সে বিচার করে, "অভিনিবেশ"-ধর্ম্মটা তার মাঝে খুব কম। লক্ষ্যটাকে আমরা উপায়স্বরূপ বলে গ্রহণ করে নিয়েছি। শঙ্কর-প্রচারিত নির্গুণ তত্ত্ব আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু খাটাচ্ছি তাকে উপায়ে। আমরা সব জানি, সব করতে পারি, কিন্তু করি না—এইটাই যেন আমাদের গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। "এরোপ্লেন" বের হল, আর অমনি আমরা বল্‌তে লাগলাম, ওঃ, এটা আর একটা বিশেষ কি, আমাদেরও তো পূর্ব্বে পুষ্পক রথ ছিল; কামান তৈরী হল—এটাই বা বিশেষ কি, আমাদের এমন অস্ত্র-শস্ত্র ছিল যা সপ্ত-পাতাল পর্য্যন্ত ভেদ করে যেত! সেদিন জগদীশ বসু উদ্ভিদে যে প্রাণলীলা আছে তা প্রমাণ করলেন, আর একদল বলে উঠলেন, এতে আর বিশেষ কৃতিত্ব কি, এ তো মহাভারতেই সব লেখা আছে! কিন্তু দুঃখের বিষয়, মান্ধাতা কালের কেতাব-পত্র রোদে না দেওয়ায় যে উইয়ে সব ধ্বংস করে দিল! আমাদের শাস্ত্রে সব লেখা আছে—এ তো আমাদের গৌরবের বিষয়ই, কিন্তু মাঝে মাঝে তো এর প্রমাণ দেওয়াও আবশ্যক। যারা বুঝতে চায়, তাদের না বুঝিয়ে যোগ্যতা নিয়ে বসে থাকা তো বিচক্ষণ ব্যক্তির লক্ষণ নয়। আমাদের মত শোনা মাত্রই যে সকলেরই মেকী ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যাবে, এমন আশা করা তো ঠিক নয়। জ্ঞান-পিপাসুর মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগবে, তা মিটাতে হলে বাইর-ভিতর উভয় দিকে পূর্ণ হওয়া চাই। প্রয়োজনে না খাটাতে পারলে এমন যোগ্যতা দিয়েই বা কি হবে, তা-ও তো বুঝি না। বেদান্ত নিয়ে খুব আলোড়ন-বিলোড়ন চলছে কিন্তু সংগ্রামের বেলায় যে অর্জ্জুনের মত "গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্যতে"—এ ভাবটাই কি খুব প্রশংসনীয় হল? "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" —শ্রীকৃষ্ণের এ উপদেশটা তো একবারও মনে

জাগে না। প্রয়োজন হলে সব ক্ষেত্রে যিনি সমানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন, তাঁকেই না বলব যোগ্য ব্যক্তি! আদর্শ থাকলেই হয় না, মাঝে মাঝে ভাবকে বাস্তবে খাটিয়েও আদর্শকে সপ্রমাণ করতে হয়। জ্ঞান বস্তুটা এক, কিন্তু উপলব্ধির প্রণালী বিভিন্ন। যিনি পূর্ণ হতে চান, তাঁর বিচিত্র রকমের সাধনপন্থা অবলম্বন করতে হয়—তিনি নিজকে তো তুষ্ট করেনই অপরের জন্যও তাঁর যথেষ্ট সঞ্চয় হতে থাকে। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ বর্জ্জন করে সাংখ্যের "কেবল" হয়ে থাকা এ যুগে অসম্ভব; তাই ভিতরের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে হবে। এর জন্য তপস্যা চাই—সাধনা চাই। জ্ঞান লাভ হয়ে গেলে সাধককে যাতে লাগিয়ে দাও, তাতেই তিনি উৎরে যাবেন। ভোগী হতে চাও যদি, তাতেও যে শক্তি-সঞ্চয়ের প্রয়োজন! তাহলে তপস্যাকে বাদ দেবে কেমন করে?

উপনিষৎ বলছেন—"স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বমসৃজৎ যদিদং কিঞ্চ।" তিনি তপ করলেন, তপ করেই যাহা কিছু সৃষ্টি করলেন। আবার তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ, তা না হলে উপনিষদের "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—আনন্দ হতেই ভূতসকল উৎপন্ন হয়েছে—এ কথার সামঞ্জস্য হয় কি করে? আনন্দ ছাড়া সৃষ্টির এত সব শোক-দুঃখ বহন করবে কে? দুঃখকে সবাই স্বীকার করছেন, তবে তাকে আনন্দের তুলনায় তুচ্ছ বলে জেনেছেন। এ কথা মানুষ জানে, দুঃখই চরম নয়, এর ওপরেও আরো কিছু আছে। মা জানেন প্রসব-বেদনাই তাঁর চরম নয়—দুঃখের ভিতর দিয়ে যাকে বহন করেছেন, সেই এসে দুঃখের ভার লাঘব করে দেবে; তা না হলে দশমাস দশদিন দুঃখকে লালন করেন মা কিসের শক্তিতে? দুঃখকে স্বীকার করেই সুখোপলব্ধি হয়—বাদ দিয়ে নয়। কাজেই জগৎ-রহস্যের মূলে দুঃখ যেমন খাঁটি, সুখও তেমনি। সাংখ্য-বেদান্ত সমান্তরালভাবে পাশাপাশি হয়ে চলছে। দুঃখকে অস্বীকার করে যারা সুখ চায়, তারা সুখের মর্ম্মই বোঝে না। দুঃখ যে চিরন্তন সত্য, একে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। আজ যাকে সহজবাদী বলছ, তার মাঝে যে জন্মজন্মান্তরীণ তপস্যার তাপ সঞ্চিত নাই, এ কথাই বা কে জানে? এ জগতে থেকে, স্থূলশরীরেই সব সিদ্ধ হতে পাবে—কেবল তপস্যা চাই, সাধনা চাই।



নিয়তির নিয়ন্তা

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

——(॰*॰)——

নরনারীরূপী বিশ্বরাজ !—

মানুষ নিয়তির নিয়ন্তা—এই হল আজকার বক্তৃতার বিষয়। মানুষের পরমার্থস্বরূপ নিয়ে কিন্তু আলোচনা হচ্ছে। আসল মানুষ হচ্ছে ব্রহ্ম-স্বরূপ—তা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই আসল মানুষটী শুধু দেহের কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা সে। বেদান্ত "সূক্ষ্মদেহ" শব্দটী যে অর্থে ব্যবহার করে থাকেন, সম্প্রতি মানুষ শব্দটীও আমরা সেই অর্থে প্রয়োগ করব। তাহলে মানুষ বলতে আমরা বুঝব, বাসনাযুক্ত পুরুষ, কামময় পুরুষ। এই সঙ্কীর্ণ অর্থে ধরতে গেলেও কিন্তু মানুষ তার নিয়তারও নিয়ন্তা। কথাটার নানা দিক আছে। এক রাতের মাঝে সবগুলোর আলোচনা সম্ভব নয়; আমরা শুধু দেহ ভাণ্ডের দিক থেকেই সমস্যাটীর আলোচনা করব।

মানুষ জন্মাবার পর তার অবস্থার কতকটা নড়চড় করতে পারে, এ কথাটা বোধ হয় স্বীকার করতে তত আপত্তি হবে না। যে কোনও পারিপার্শ্বিকের মাঝে মানুষের জন্ম হোক্ না কেন, এ কথা মানতে অবশ্য কোনও বাধা নেই যে সে কতক পরিমাণে তার পারিপার্শ্বিককে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, তার ওপর তার কর্ত্তৃত্ব চলতে পারে। প্রতিকূল অবস্থাকে মানুষ অতিক্রম করতে পারে—মানুষের শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব। নিতান্ত কাঙ্গাল অবস্থা থেকে মানুষ ক্রোরপতি হতে পারে; এমন কত মানুষই তো হয়েছে। দীনহীনও এ জগতে যশ লাভ করেছে, সম্পত্তি অর্জ্জন করেছে। নিতান্ত নগণ্য দশায় জন্মেও মানুষ মহোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। ধর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, সেক্‌সপীয়র বা লণ্ডনের মেয়র হুইটীংটন; চীনের প্রধান মন্ত্রী এককালে দরিদ্র কৃষক ছিলেন। সুতরাং এ কথা প্রমাণ করা সহজ, জন্মগ্রহণ করার পর জীবদ্দশাতেই আমরা আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে পারি।

এটা প্রমাণ করা সহজ বটে, কিন্তু বেদান্ত যখন বলেন, তোমার জন্মও তোমার নির্দ্দেশের অপেক্ষা করে, তোমার পিতামাতা তোমারই স্ব-নির্ব্বাচিত, তখন কথাটাকে প্রমাণ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। কবির ভাষায়, শিশু যুবার বাবা কেন, শিশু তার বাবারও বাবা; এটা প্রমাণ করা শক্ত বটে, কিন্তু বেদান্ত বলছেন, সমস্যার যে দিক থেকেই দেখনা কেন, তুমি যে তোমার নিয়ন্তা এটা ঠিক। অন্ধ হয়ে যদি জন্মে থাক তো সে তোমারই নিয়ন্ত্রণ, তুমিই নিজকে অন্ধ বানিয়েছ; গরীব বাপ-মার ঘরে যদি জন্মে থাক তো সেও তোমার ইচ্ছাতেই হয়েছে, তুমিই দরিদ্র পিতা-মাতা নির্ব্বাচন করে নিয়েছ। নিতান্ত দৈন্যদশায় যদি জন্মে থাক তো সেও তোমারই খুসী, তোমারই কীর্ত্তি। এমন কি জন্মগ্রহণ করবার সময়ও তুমিই তোমার নিয়ামক। আজ সমস্যাটার এই দিকটাই আমরা আলোচনা করব। মানুষ কি করে পিতামাতা নির্ব্বাচন করে? অর্থাৎ আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে কিছু-দূর আলোচনা চলবে; পুরোপুরি নয়, কতকটা আলোচনা করা যাবে।

কেউ কেউ মনে করে, মানুষ যখন মরে, তখন সে একেবারেই মরে যায়। আবার কারু কারু বিশ্বাস, মানুষ একেবারে মরে

না; তার কারণ, অমরত্বের সংস্কার মানুষের মজ্জাগত, সহজাত; তা ছাড়া এটাও তার আন্তরিক ইচ্ছা যে তার আত্মীয়-স্বজন কখনো না মারা যায়; চোখের সামনে বন্ধুবিচ্ছেদ সে সইতে পারে না; তাই প্রয়োজন, মরার পরও একটা স্থানের কল্পনা করা, পরলোকের কল্পনা করা—যার বাস্তব প্রমাণ কখনো এ জগতে দেওয়া সম্ভবপর নয়। এই ধরণের চিন্তায় কেউ কেউ অভ্যস্ত। এদের এই ধারণার মূলেও কতকটা সত্য আছে; এই 'হলে'ই সে সম্বন্ধে আর একদিন কিছু কিছু আলোচনা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই কথাটাই সব নয়। মরার পর তুমি স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে সেইটাই শেষ কথা নয়। কথাটার যাচাই তো এইখানে হওয়া প্রয়োজন—এই ভূলোকে। তোমার অধ্যাত্মজগতের আইন যে আধিভৌতিক জগতের ওপর জুলুম করবে তাতো হবার নয়। একটা লোককে কবর দিয়ে বললে, "মাটী মাটীতে মিশাক্" ইত্যাদি। রসো—দেহটা মাটীতে মিশে গেল বটে, কিন্তু নষ্ট হল না তো; তার একটা পরিবর্ত্তন হল শুধু। দেহের ভৌতিক উপাদানগুলি রূপান্তরিত হল, তারা নষ্ট হলে না তো। তোমার বন্ধুর দেহটাই একদিন কবরের ওপর গোলাপগুচ্ছ হয়ে ফুটে উঠবে কিম্বা ফলফুলে শোভিত বৃক্ষ হয়ে দেখা দেবে। দেহটার ধ্বংস হয়নি তো।

আচ্ছা, আমাদের সংশয় হচ্ছে কোথায়? আত্মা বা ব্রহ্মবস্তু বা সৎপদার্থের ধ্বংস হয়েছে কি?—না না, তার তো কখনও ধ্বংস হতে পারে না। আসল মানুষটা কখনও খোয়া যায় না, তাকে কেউ কখনও ধ্বংস করতে পারে না। তবে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে কোনখানটায়? সংশয় সূক্ষ্ম দেহকে নিয়ে—মনের কামনা, বাসনা, অনুভব, আবেগ, উচ্ছাস, অভিলাষ ইত্যাদি নিয়ে। এ গুলির কি হয়? মানুষটাকে মাটীচাপা দিলে এগুলিকেও কি মাটীচাপা দেওয়া হয় নাকি? না, সেটী তো হবার যো নেই। তাহলে ওগুলোর কি হল? কথা হচ্ছে তোমার সূক্ষ্মদেহ নিয়ে—যা থেকে তোমার মনের শক্তি, উচ্ছ্বাস, আবেগ, বাসনা-কামনা ইত্যাদির উদ্ভব হচ্ছে। এই সমস্ত মনোবৃত্তির সংঘাতে উৎপন্ন বস্তুটীর কি হল? যদি বল, ওটা একটা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক লোকে চলে যায়, সেটা তোমার ধারণামত সত্যি হতে পারে কিন্তু আধিভৌতিকের আইন দিয়ে তুমি যার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পার না, তাকে মানি কি করে? বিজ্ঞান চায় আধিভৌতিক হিসাবে এই শক্তির কি গতি হয় তারই একটা প্রমাণ। বিজ্ঞান এক সার্ব্বভৌম, অপরিহার্য্য, নিঃসংশয় নিয়ম স্থাপনা করেছে—কোনও বস্তুরই ধ্বংস নাই জগতে, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। এই হচ্ছে পদার্থের অবিনাশবাদ বা শক্তির অন্বয়বাদ। তাতে বলে, কোনও কিছুরই ধ্বংস নাই জগতে। আচ্ছা, দেহটা যদি ধ্বংস না হয়, শুধু তার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, আত্মার যদি বিনাশ না হয়, তা যদি শাশ্বত, অব্যাহতই থাকে, তাহলে আমাদের বাসনা-কামনাযুক্ত এই মনো-জগৎটারই বা ধ্বংস কেন হবে? শক্তির অন্বয়বাদে প্রমাণ করবে, চিত্তশক্তি রূপান্তরিত হতে পারে, কিন্তু নষ্ট হতে পারে না কিছুতেই—বিনাশকে কিছুতেই তুমি প্রমাণ করতে পার না। মরলে পরেও মনোবৃত্তিগুলি থেকেই যাবে। তাদের স্থান পরিবর্ত্তন হতে পারে, অবস্থার পরিবর্ত্তন হতে পারে, কিন্তু তবুও তারা থাকবেই, তাদের সমূলে বিনাশ কিছুতেই হতে পারে না। একটা বাতি জ্বাললে পর দেখা যায়, আধঘণ্টা পর তার আর কিছুই নাই, মোম, পলতে সব ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু ধাতুবিদ্যা প্রমাণ করেছে যে কিছুই নষ্ট

হয় নি। একটা বাঁকা "টেষ্ট টিউবের" ভিতর কষ্টিক্ সোডা এবং আর একটা রাসায়নিক পদাথ দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে মোমবাতিটার যা কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছিল, তা আবার ওই টেষ্ট্ টিউবে ধরা পড়ছে। একটা সরায় জল রেখে জ্বাল দিলে তার সবটুকু বাষ্প হয়ে উড়ে যায়; লোকে বলবে, জলটা নষ্ট হয়ে গেল। পদার্থবিদ্যা বলবে, নষ্ট হয়নি। পরীক্ষা করে দেখানো যেতে পারে যে জলটা বাতাসে আছে—ওটা নষ্ট হতে পারে না।

মানুষ যখন মরে, তখন তার চিত্তের শক্তি বাসনা-কামনা ইত্যাদি যেন আপাততঃ ক্ষয় হয়ে যায় মনে হয়, কিন্তু বেদান্ত তার আধ্যাত্মিক ধাতুবিদ্যার সহায়ে প্রমাণ করবে, তা হয় নি, হতে পারে না। তাই যদি না হল তো কি হল? গণিতের প্রশ্ন আমরা যে ধারায় মীমাংসা করি, তেমনি করে এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করতে চাই। একটা সমস্যা নিয়ে প্রথমে আমরা দেখি, তার স্বীকার্য্যই বা কি আর উপপাদ্যই বা কি; কি কি আমরা পেলাম আর তা থেকে কি কি বার করতে হবে। আমরা দুদিকই চিন্তা করি। কখনও স্বীকার্য্য বিষয় থেকে আমরা উপপাদ্য বিষয়টা ভেবে বার করি, কখনও বা উপপাদ্য বিষয়টা নিয়েই ভেবে ভেবে স্বীকার্য্য বিষয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কি, তাই আবিষ্কার করি। এখন দেখা যাক, উপস্থিত সমস্যায়, স্বীকার্য্যই বা কি আর উপপাদ্যই বা কি? —জীবন এবং মৃত্যু, এই হল স্বীকার্য্য এবং উপপাদ্য। জীবন-ব্যাপার এই হল স্বীকার্য্য আর মৃত্যু-ব্যাপার হল উপপাদ্য; কিম্বা বিপরীত-ক্রমেও এ দুটীকে ধরা যেতে পারে। সংসারে কত লোক জন্মাচ্ছে আর কত লোক মরছেও। যারা আপাতদৃষ্টিতে মরছে, তাদের বাসনা কামনাদি চিত্তবৃত্তি যদি তাদের সঙ্গে সঙ্গে মরে যায় বলে ধরা হয়, তাহলে বিজ্ঞানের যে সমস্ত আইন রয়েছে, তুমি তার বিপরীতক্রমে কোনও একটা সিদ্ধান্ত দাঁড় করাচ্ছ বলে বুঝ্তে হবে। যদি মনের শক্তি নষ্টই হয়ে যায়, তাহলে বুঝ্তে হবে যে একটা কিছু নাস্তিতে 'লীন হয়ে গেল। কিন্তু সে তো অসম্ভব। যা কিছু, তা নাস্তিতে লয় হতেই পারে না। এই আপত্তি নিরাকরণের দরুণ, তোমাকে স্বীকার করতেই হয় যে মৃত্যুর পর মনের বাসনা কামনা ইত্যাদি শূন্যে লীন হয় না। এই কথা আগে স্বীকার করতে হবে; তার পরের প্রশ্নই হচ্ছে তাহলে সেটা যায় কোথায়?

তারপর আর এক কথা। জন্মব্যাপারের আলোচনা করে এখন আমরা বুঝ্ব, মানুষের মনোবৃত্তিগুলোর কি দশা হয়। এ জগতে নানা রকম শক্তি ও প্রতিভা নিয়ে, নানা রকম আকৃতি গঠন নিয়ে কত লোকই তো জন্মাচ্ছে—দেখ্ছি, রকম রকম মস্তিষ্কের গঠন, কারু ভারী, কারু পাত্লা, কারু মাথা গোল, কারু লম্বাটে। কি করে এ সব হয়? এক বাপ-মায়ের সন্তান, অথচ তাদের একেবারে বিপরীত মনোবৃত্তি। একই ঘরে রাবণ আর বিভীষণের, ধৃতরাষ্ট্র আর বিদুরের জন্ম হচ্ছে কি করে? ছেলেরা একই কলেজে পড়ছে, একই ছাত্রাবাসে থাক্ছে, একই অধ্যাপকের কাছে পড়ছে, অথচ তাদের ভিন্ন ভিন্ন রুচি—কেউ গণিত পড়ে, কেউ বা ইতি-হাস, কেউ বা হয় কবি, কেউ বা হস্তীমূর্খ। লোকের রুচিতে, মনোবৃত্তিতে ফারাক্ আছে কি না? নিশ্চয়ই আছে। তুমি কিছুতেই তা অস্বীকার কর্তে পার না। কোনও ছেলে হয়ত একেবারে ইঁচড়ে-পাকা হয়ে জন্মায়, সে শৈশবেই বেজায় চটপটে; কেউ হয়ত ছোটবেলা হতেই ভারী

কুড়ে। বেদান্ত জিজ্ঞাসা করছেন, এই রুচি-বিভিন্নতার মূল হেতু কি? যদি বল, এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ তাঁর সৃষ্টি, তাহলে সে তো কোনও জবাব হল না, ও শুধু প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়া হল। আর, একটা প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া কখনও দার্শনিকের দস্তুর নয়, প্রকারান্তরে তাতে অজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হয়। বিজ্ঞানের জানা আইনমতে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা কর। যদি বল, ঈশ্বরের ইচ্ছা যে শৈশব হতেই তারা ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করুক, তাহলে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আইন লঙ্ঘন করছ। স্পষ্টই তুমি বলছ, কিছু-না থেকে কিছুর উৎপত্তি হচ্ছে, যা একেবারে মিছে কথা। এই ফ্যাসাদ থেকে বাঁচতে হলে তোমাকে স্বীকার করতে হয়, শিশু যে তার বিভিন্ন রুচি নিয়ে আসে তা অপর কোনও এক জগৎ হতে আমদানী। এই বৈচিত্র্য শূন্য হতে আসে না, একটা সত্যিকার কিছু থেকে আসে। বহু আগে থেকেই তারা ছিল, তাই আজ দেখা দিয়েছে। অল্পকথায় বলতে গেলে, জন্মের সময় যে সমস্ত বাসনার স্ফুরণ হয়, তা পূর্ব্বগামী কোনও বাসনা থেকেই উৎপন্ন; কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও এই বাসনা-কামনা কোথায়ও-না কোথায়ও ছিল। এখানে মৃত্যু হচ্ছে আমাদের স্বীকার্য্য আর জন্ম হচ্ছে উপপাদ্য। বেদান্ত দুটোকে জুড়ে দিয়ে বলছে, মানুষ মরবার সময়ও তার অপূর্ণ বাসনাগুলো তো মরে না।

একজন অচেনা পথিক এলো তোমার ঘরে বিচিত্র মনোবৃত্তি নিয়ে। তার মনোবৃত্তিগুলি তো আর শূন্য থেকে পড়েনি। এমনও তো হতে পারে, অপূর্ণ বাসনা নিয়ে যে লোকটা মরেছিল, তাকে মাটীচাপা দেওয়ায় পরও তার বাসনা-কামনাগুলো এই নূতন রূপ ধরে তোমার ঘরে ফুটে উঠেছে! যদি এই মত স্বীকার কর, তাহলে কিছু-না থেকে কিছু হয়, বা সত্তা শূন্যে মিলিয়ে যায়—এই দুটী ভয়ঙ্কর যুক্তির ভুল আর তোমায় করতে হয় না। একেই হিন্দুরা বলে কর্ম্ম-বিধান। কর্ম্মবাদ স্বীকার করলে আর এই ধাঁধাঁয় পড়তে হয় না—জন্ম আর মরণ তখন এত স্বাভাবিক বলে মনে হয়, যেন তারা প্রাকৃতিক আইনে বাঁধা, বিশ্বজগতের আইনের সঙ্গে তারা একসুরে গাঁথা। (ক্রমশঃ)

ভক্তির জয়

—*—

ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী—
ত্রিসত্যের ভক্তিই সকলের সেরা।

ভক্তি সম্বন্ধে খুঁটিয়া খুঁটিয়া যাহা বলিবার, দেবর্ষি তাহা বলিয়াছেন। এইবার বিহঙ্গাবলোকনের ন্যায় সাধারণ ভাবে কয়টি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিবেন।

ত্রিসত্য বলিতে বুঝি ভগবানকে। তিনি ত্রিসত্য কেন? কোনও রসিক বলিলেন, ত্রিকালেই তিনি নিত্য, অতএব তিনি ত্রিসত্য। অথবা বলা যাইতে পারে, চতুর্ব্ব্যূহের নিদানীভূত তাঁহারই আশ্রয়ে ব্যূহত্রয়ের প্রকাশ, অতএব তিনি ত্রিসত্য। ত্রিগুণের তিনিই সত্য স্বরূপ, অতএব তিনি ত্রিসত্য। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণের অতীত মহা-কারণ-স্বরূপ তিনি, অতএব তিনি ত্রিসত্য। অথবা এত বিচার না করিয়া সোজাসুজি বলি, জগতে সমস্তই মিথ্যা, কেবল তুমিই সত্য, সত্য, সত্য—অতএব তোমাকে বলি ত্রিসত্য।

ত্রিসত্যের প্রতি ভক্তিই শ্রেষ্ঠতর পন্থা। আরও পথ আছে, অধিকারভেদে তাহাদের উপযোগিতাও আছে। তবুও বলি, কালের বিচারে এই পথই সহজ পথ। ভক্তিধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যুগধর্ম্মও মানিতে হয়। যুগান্তরকারী মহাশূরবীর যাঁরা, তাঁরা যুগ-ধর্ম্মকে ইচ্ছানুরূপ নূতন ছাঁচে গড়িয়া দিয়া যান; তাঁহারা মহাবৈদান্তিক; ব্যক্তিধর্ম্মই তাঁহাদের মাঝে প্রবল। কিন্তু যাহারা অনুগধর্ম্মী, যাহারা সেবক, তাহাদের কাছে ব্যক্তিধর্ম্ম নিষ্প্রভ। নির্ব্যক্তিক হওয়াই তাহাদের সাধনা। সুতরাং তাহারা যুগধর্ম্ম রূপ মহাপ্লাবনে পরিপ্লাবিত। ভক্তি এই যুগধর্ম্ম—ইহাই বর্ত্তমানের গণধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকে যাহারা পরিত্যাগ করিয়াছে, এই যুগে তাহারাই নাস্তিক। আর্য্যেরা বলিবেন, তাহারা বিরোচনের অনুচর, স্পর্দ্ধা এবং আস্ফালনের সীমা নাই তাহাদের, কিন্তু এমনি অন্তঃসারশূন্য সে আস্ফালন! নাস্তি-ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া একটা নিরালম্ব ভাবের মহাপ্রকাশ ঘটিতে পারে কিন্তু তাহার আধার কোথায়? একটী দুইটী ব্যক্তিতে ক্বচিৎ স্ফুরণ তো নয়, যুগপৎ বহুকে নিয়া কোথায় সেই নিরালম্বের যৌথ প্রকাশ? গণধর্ম্মকে ঠেকাইয়া রাখিবার স্পর্দ্ধা কাহার হইবে?—তাই অশক্তের পক্ষে ভক্তিই আজ যুগধর্ম্ম বা যূথধর্ম্ম।

"অশক্তের পক্ষে ভক্তি" কথাটা শুনিয়া শক্তি-মদমত্ত নাস্তিক বিদ্রূপের হাসি হাসিবে। তা হাসুক; সে ভাবিতেছে, ভক্তি বুঝি অশক্তের সান্ত্বনা; তা নাও হইতে পারে। হয়ত ভক্তিই অশক্তের শক্তি, কাঙ্গালের ধন, দুর্ব্বলের বল। এক ফোঁটা চোখের জল, অতি সুকুমার দুটী বাহুর বাঁধন, একটি কচিমুখের এতটুকু আবদার, নাস্তিকের বজ্রকঠিন হৃদয় চূর্ণ করিয়া দিবার পক্ষে প্রকৃতির এই সুকোমল প্রহরণই যথেষ্ট।

আর এটা হইল প্রকৃতি-অধ্যুষিত যুগ—মিথ্যা যেখানে প্রচণ্ড, আর সত্য অতি সুকুমার, অতি সুকোমল। প্রাকৃতসৃষ্টির আদিতেই তাই দেখি, বেপথুমানা বেদবাণী মধুকৈটভের বজ্রহুঙ্কারে মূক বিপর্য্যস্ত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সত্যদ্বেষী নাস্তি-কেরই পরাভব ঘটিল, বিনা প্রহরণে সুকুমারী ভক্তি-রই জয়লাভ হইল। নাস্তিক সূচনা দেখিয়া উপহাস করে, পরিণাম ভাবিয়া শিহরিয়া উঠে না।

দুই একজনের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু জনসঙ্ঘকে ডাকিয়া বলিতেই হইবে—ভক্তিরেব গরীয়সী। মিছামিছি মদমত্ততার অভিনয় করিয়া আর কি হইবে বল!—নিজের শক্তি-সামর্থ্য যাচাই করিয়া তো দেখিয়াছ, তোমার সব আস্ফালনই একেবারে ফাঁকা। প্রবৃত্তির কাছে পরা-ভূত হইয়া তাহাকেই ভাবিতেছ বাহাদুরী। ওসব ভণ্ডামি ছাড়িয়া দিয়া একবার প্রাণ খুলিয়া অক-পটে স্বীকার কর—ভক্তিরেব গরীয়সী। ইহাই যুগধর্ম্ম। যাঁহারা যুগান্তরকারী, যাঁহারা মহাবীর্য্য-শালী, যাঁহারা জনগণমন-অধিনায়ক, সেই মহা-বৈদান্তিকেরা তারস্বরে ইহাই ঘোষণা করিবেন—ভক্তিরেব গরীয়সী। চিত্তকে কঠিন করিও না, উপকরণের সঞ্চয়ে স্ফীত হইয়া উহাকেই সিদ্ধি মনে করিয়া প্রবঞ্চিত হইও না—একবার মাথা নত করিয়া স্বীকার কর—ভক্তিরেব গরীয়সী। দাম্ভিক বিরোচন-সভ্যতায় তোমার ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিতেছে, নাস্তিকতায় চিত্ত ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই ভাবিতেছ সামর্থ্য, প্রকৃতির প্রবল প্রকাশকেই পৌরুষের দীপ্তি বলিয়া ভুল বুঝিতেছ—তাই বলি সাবধান, যুগধর্ম্মকে লঙ্ঘনকরিও না। দেখিতেছ না, মহাবিনাশ তোমার সম্মুখে!

তোমার এই নাস্তিকতাসম্ভূত মিথ্যাবলদৃপ্ত ভোগবাদ দিয়া ঋষি ভক্তির স্বরূপ বুঝাইতেছেন। জ্ঞান, ভক্তি আর আসক্তি মূলে একই জিনিষ?—চমকাইয়া উঠিও না। ভক্তি আর আসক্তি উভয়েই প্রকৃতিরই ধর্ম্ম—প্রকৃতির পরধর্ম্ম আর

অবর ধর্ম্ম। পরধর্ম্ম ভক্তি, আর অবরধর্ম্ম আসক্তি। অশুদ্ধা প্রকৃতির যে ন্যক্কার, তাই আসক্তি; শুদ্ধা প্রকৃতির উদ্দীপনাই ভক্তি। কুন্তী বলিয়াছিলেন, হে ভগবান, বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর যে অনপায়িনী রতি, তোমাতে যেন আমার সেই রতিই হয়। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, সতীর পতির প্রতি টান, মায়ের ছেলের প্রতি টান, আর কৃপণের ধনের প্রতি টান, এই তিন টান একত্র হইলেই হইল ভক্তি। সংস্কৃতে ছাতুকে বলে সক্তু; (আসক্তিটাও ছাতুইবটে!) সচ্ ধাতু হইতে কথাটার সৃষ্টি; সচ্ ধাতুর অর্থ মিলনাকাঙ্ক্ষা। সক্তুর রেণুগুলি যখন শুকাইয়া নীরস হইয়া রহিয়াছে, তখন তাহারা পরম বিরক্ত—একটি রেণুও আর একটি রেণুর গায়ে গায়ে লাগিয়া নাই। একটু নিঃশ্বাসেই উড়িয়া যাইবার ভয়, পাথরের দানার মত এ উহাকে জড়াইয়া ভার হইয়া চাপিয়া নাই। কিন্তু এই সক্তুর রেণুগুলির প্রাণে প্রাণে তৃষ্ণার কি প্রবল দাহ! এক ফোঁটা রস তাহাদের মাঝে ফেলিয়া দাও, অমনি বৈরাগ্যের মুখোস খসিয়া পড়িবে, এ উহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ফুলিয়া-ফাঁপিয়া তাল পাকাইয়া উঠিবে। এই সক্তু হইতেছে আসক্তির প্রতিরূপ। দুয়েরই ধাতু এক। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত তাহা প্রমাণ করিবেন।

আবার যখন রসের দিক দিয়া দেখি, তখন বলি এই তো ভক্তিরও রূপ! রসবিগ্রহকে আশ্রয় করিয়া এই তো মহারাসের স্ফুরণ। এই যে ফুলিয়া-ফাঁপিয়া ওঠা, এ কেন? অণুতে অণুতে রসের ছোঁয়াচ পাইয়াছে বলিয়া না!"তোমারি গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমারি রূপে।" বৈরাগ্যের সাধনা কিসের জন্য? রসময়কে নিবিড় করিয়া পাইবার জন্যই এই রিক্ততা।

একই কথা। কেবল বিষয়ে বা অল্পে যে পরম প্রেম, তাহাই আসক্তি; আর বিষয়ী বা ভূমাতে যে পরম প্রেম, তাহাই ভক্তি।

হে ভোগবাদী, মদান্ধ, নাস্তিক! তুমি বিরোচনের উপদেশ অনুসরণ করিয়া আসক্তিকেই ইষ্টদেবী করিয়াছ? ভালই করিয়াছ। এই আসক্তির পিছনেই রহিয়াছে ভক্তি। যেহেতু তোমাতে আসক্তি এত প্রবল, অতএব তোমার প্রকৃতিই ভক্তির অনুকূল। বিরোচন, তুমি আর্য্য কি অনার্য্য, তাহা জানি না। তবে এইটুকু জানি, তুমি প্রজাপতির উপদিষ্ট; দৈত্য তুমি, আদিত্য ইন্দ্রেরই অপর পিঠ।—ইন্দ্র যে বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন, তুমি তাহা অধিগত করিতে পার নাই বলিয়াই তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছিলে। ইন্দ্রভক্তেরা বলেন, তুমি আসক্তির সেবা করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিলে। আমার তাহা মনে হয় না। তোমার সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। আসুর ভারতে বিরোচনের বংশধরেরাই একদিন আসক্তি মন্থন করিয়া ভক্তির অমৃত প্লাবন বহাইয়াছিল। ইন্দ্র আর বিরোচন—উভয়ের মাঝে বিন্ধ্যের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল, সে বহু অতীত যুগের কথা। কিন্তু মহাপ্রেমিক, মহাবৈদান্তিক, অদীনপ্রাণ অগস্ত্য একদিন সে বাধা অপসারিত করিয়াছিলেন। গণধর্ম্মের স্রোত অভিজাত ধর্ম্মের স্রোতের সঙ্গে মিশিয়া সেইদিন গঙ্গাযমুনার সঙ্গমতীর্থ সৃষ্টি করিয়াছিল কিনা কে জানে? সে কোন্ স্মরণাতীত কালের কথা—মনে করিতে গেলে কুয়াসায় সব ছাইয়া যায় যেন!

তাই আজ বিরোচন সভ্যতার এই দৃপ্তি দেখিয়া, এই হুহুঙ্কার শুনিয়া মনে হইতেছে—পুরাণ-কথার এবার পুনরাবর্ত্তন ঘটিবে না কি? এই হুঙ্কার কিন্তু আমার কানে পিপাসিত ভক্তহৃদয়ের আর্ত্তনাদরূপেই বাজিয়া উঠিতেছে। তাই সাহস করিয়া বলিতে চাই—এই প্রধূমিত নাস্তি-

কতার যুগে, এই বিরোচনমার্গসেবীদের পক্ষে —ত্রিসত্যস্থ ভক্তিরেব গরীয়সী !

আসক্তিরই একাদশটী রূপকে ভক্তির একাদশ বিভাবরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, দেবর্ষি নারদ। রসপিপাসুর হৃদয়ে আসক্তিরূপে স্ফুরিত ভক্তির সেই একাদশটী রূপ এই—

গুণমাহাত্ম্যাসক্তি।—গুণে আকর্ষণ হয়, ইহা সহজ কথা। কিন্তু গুণের মাহাত্ম্য বা অবধি যেখানে, সেখানে আকর্ষণ চরমে উঠে। উহাই শ্রীভগবতত্ত্ব। রসিকপ্রবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গুণমাহাত্ম্য সনাতনশিক্ষায় বিবরিয়া বলিয়াছেন। চরম বিবৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ "আত্মারাম" শ্লোকে। যাঁহারা চৈতন্য ও জড়ের গ্রন্থিভেদ করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মারাম, অতএব যাঁহাদের সম্মোহন কিছুই থাকিতে পারে না, তাঁহারাও সেই রসিক-রতনকে দেখিয়া ভাবে গলিয়া পড়েন—অকারণে—এই তাঁর গুণের মাহাত্ম্য—"ইত্থম্ভূত গুণো হরিঃ।" গুণাসক্ত ভক্তের উদাহরণ পুরাণে রাজা পরীক্ষিৎ, পৃথুরাজ প্রভৃতি। বর্ত্তমান যুগের দার্শনিকেরা Perfect Personality বা আদর্শ পুরুষ খোঁজেন ; ইহাঁরাও গুণাসক্ত।

রূপাসক্তি।—গুণে বিচার আছেও বা ; রূপে সে বালাই নাই। রূপাসক্তি আবেগে টলমল ; সাধারণ লোকযাত্রায় বিবেকীদের কাছে উহা নিন্দিত। প্রাকৃতে যাহা বিকার, অপ্রাকৃতে তাহাই রতির নিদান, রসের স্ফুরণ। দেহ-দেহীর একান্ত-সন্নিকর্ষলক্ষণা প্রীতিতে ফুটে রূপের আস্বাদন ; সহজভাবের এই তো নিশানা—এই সেই রূপ, যাহার পিপাসায় ব্যাকুলিত হৃদয় ফুকারিয়া উঠে—"মদনদহনে ঝুরি গেনু !"—রূপের কাঙ্গাল সবাই —যারা ব্রজবাসী তারা তো বটেই ; পশুপক্ষী পর্য্যন্ত অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া আছে রূপের পানে— কি দেখিয়াছে, কি বুঝিয়াছে, তাহারাই জানে !

পূজাসক্তি।—ইহাই সুন্দরের উপাসনা। পরাশরনন্দন ইহাকেই বলিয়াছেন ভক্তির লক্ষণ। প্রথমাধিকারীর কথা—তাই একটু ব্যবধান, একটু দূরত্ববোধ, একটু সম্ভ্রম আছেই। তুমি তো আছই, আমিও আছি ; আর আমার মনের মতন করিয়া সাজানো এই জগতও তো রহিয়াছে। পরিসর ক্ষেত্র বটে ; কিন্তু সেই জন্যই যেন একটু ফিকা। পুরাণ বলেন পৃথুরাজার কথা।

স্মরণাসক্তি।—একবার অনুভব না হইলে স্মৃতি থাকে না। অতএব উপনিষদ যে বলিয়াছেন, বিদ্যুতের স্ফুরণের মত, চক্ষুর নিমেষের মত তাঁর দর্শন, সেই দর্শনকে অন্তরের মাঝে লুকাইয়া আস্বাদন করা—থাকিয়াও যেন নাই, না থাকিয়াও আছে, এমনি ঈষৎ বেদনাভারে পীড়িত যে রতি, তাই স্মরণাসক্তি। কথা-কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী ইত্যাদি তাহারই প্রপঞ্চ। গর্গ ইহাকেই ভক্তির লক্ষণ বলিয়া থাকেন।

দাস্যাসক্তি।—এইবার ভাবের স্ফুরণ। তুমি বিভু, আমি অণু ; তবুও তোমার-আমার অফুরন্ত প্রীতির বিলাস। তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি পিতা, আমি পুত্র, তুমি মা, আমি ছেলে— বিভু আর অণুর এই সম্বন্ধমাধুর্য্যকে প্রকট করিয়াছে দাস্যাসক্তি।

সখ্যাসক্তি।—আরও একটু নিবিড়। আরও অন্তরে ঢুকিয়াছি—কোথায়, তোমাতে আমাতে আকাশ-পাতাল তফাৎ তো নাই ! আমার ভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও যে বিভু হইতে গুটাইয়া আমার সমান হইয়া গেলে।—

বাৎসল্যাসক্তি।—প্রপঞ্চে ইহাই ভাবের চরম স্ফুরণ। বিরাট ছোট হইয়া গেলেন, ভক্ত হইয়া গেলেন বিরাট ; পরস্পরের রূপ পরস্পরে প্রতিফলিত হইয়া বিচিত্র লীলারসের সৃষ্টি। আসক্তির অসঙ্কোচ প্রকাশ এই বাৎসল্য।

কান্তাসক্তি।—ইহাকে বলি প্রপঞ্চাতীত ভাব। মাধুর্য্যের অবধি এই। এই মাধুর্য্যই শান্ত-দাস্যাদি সমস্ত ভাবে অনুস্যূত। অচিন্ত্য ভেদাভেদের লীলা-ভূমি—বাক্ মন যেখানে পরাহত, অথচ অতি পেশল মনোভব—কখন কি হয়, কিছুই বুঝিতে দেয় না—"ন সো রমণ ন হাম রমণী।"

আত্মনিবেদনাসক্তি।—নারদ ইহার প্রচারক। ইহার কথা বিস্তৃত রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

তন্ময়তাসক্তি।—ইহাই জ্ঞাননিষ্ঠের ভক্তি—অদ্বৈতভাব দ্বারা সম্পুটিত। কৌণ্ডিন্য, শুকদেব, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ইহার মহাজন।

পরম-বিরহাসক্তি।—ইহাই ভক্তির চরম প্রকাশ। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা প্রকট করিয়া পরম-পুরুষার্থের অবধি দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাই জ্ঞানীর হিয়ার মাণিক, ভক্তের রসায়ন। ইহার সম্মুখে লেখনী স্তব্ধ!

বহিরঙ্গ লোকেরা কি জল্পনা করিবে না করিবে, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া এক-বাক্যে এই ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন ভক্তিপথের আচার্য্যেরা।—তাঁহারা কে?

ইত্যেবং বদন্তি জন-জল্প নির্ভয়া একমতাঃ কুমার-ব্যাস-শুক-শাণ্ডিল্য-গর্গবিষ্ণু-কৌণ্ডিন্য-শেষোদ্ধবারুণিবলিহনুমদ্‌বিভীষণাদয়ো ভক্ত্যাচার্য্যাঃ।

শ্রীগুরুর অনুকম্পায় ও দেবর্ষির আশীর্ব্বাদে ভক্তি-সূত্রের সুদীর্ঘ আলোচনা এতদিনে পরিসমাপ্ত হইল। উপসংহারকালে দেবর্ষির কথারই পুনরুক্তি করিয়া বলি—

য ইদং নারদপ্রোক্তং শিবানুশাসনং বিশ্বসিতি শ্রদ্ধত্তে স ভক্তিমান্ ভবতি, স প্রেষ্ঠং লভতে প্রেষ্ঠং লভতে ইতি।—

যিনি নারদ-কথিত এই শিবকর উপদেশ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করেন, তিনি ভক্তিমান হন, তিনি প্রিয়তম বস্তুকে লাভ করেন—লাভ করেন।

ভক্ত, ভগবান ও ভগবতের জয় হউক।

ওঁ শান্তি—শান্তি—শান্তিঃ।

অমীঘুঁট্

—(:০:)—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি এই "দুই সতীনের পীরিতি" ঘটাইয়া "দিব্য ঘরে শোয়ার" আয়োজন করিয়া লইয়াছিলেন বাংলামায়ের দুলাল রামপ্রসাদ। এমনিতর ভাবদ্বৈতের মীমাংসা পাই সন্ত্ কবিদের মাঝেও। কেশবদাসও "অবিনাশী দূলহ্-দুলহিনের" মিলনের গান গাহিতে গিয়া বলিয়াছেন, এই অপরূপ মিলন-বাসরে—

সুরতি-নিরতি কি বাজন বাজে

—সুরতি আর নিরতি, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির বাদ্য বাজিতেছে!

যাহারা প্রবৃত্তির কবলিত, তাহারা উল্লসিত হইয়া বলিবে, দেখিয়াছ, প্রবৃত্তিকে ঠেকাইয়া রাখিবার সাধ্য সিদ্ধ-পুরুষেরও নাই। আর যাহারা

নিবৃত্তির সেবক, তাহারা আতঙ্কের সহিত বলিবে, সর্ব্বনাশ, এ কি কথা!—দিবা-রজনীর একঠাঁই বসতি; এ-ও কি সম্ভব ?

কিন্তু কথাটা তো পক্ষপাতের কথা নয়। প্রবৃত্তির কোলে বসিয়া নিবৃত্তিকে যে উপহাস করে, কিম্বা নিবৃত্তির পক্ষপুটে থাকিয়া প্রবৃত্তিকে যে ভ্রূকুটী করে, তাহাদের কোনও পক্ষই সহজ-আনন্দের তত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। এমন ঠাঁই আছে, যাহা প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তিরও অতীত; যেথানে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি তুচ্ছ—অতএব থাকিয়াও নাই—বাহিরের প্রকাশ যেথানে অবান্তর, ভিতরের রোশনাই যেথানে কাচাবরণের মত স্বচ্ছ দেহকে ভেদ করিয়া ছড়াইয়া পড়ে। এইখানে, এই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের অতীত ভূমিতে দাঁড়াইয়া কেশব দেখিতেছেন—

সুখ সাগর অনুভব ফূল ফূলী
জগমগ সুন্দর সেত।
নখসিখ পুরি রহে দসহূঁ দিসি
সব ঘট অবিগত জেত॥
অজর প্রকাস জোতি বিনু পারক
পরম নিরন্তর দেখ॥
অনন্ত ভানু সসি কোটিক নির্ম্মল
কেসো আতম লেখ॥

—আনন্দের সায়রে ফুটিয়া আছে অনুভবের কমল, তাহার শুভ্র সুন্দর জ্যোতি ঝক্‌মক্ করিতেছে, সেই অব্যক্ত জ্যোতিঃতে আমার নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত—এই দশ দিক—এই প্রতি ঘট পূরিয়া রহিয়াছে! আগুন নয়, অথচ জরা-মৃত্যুহীন যাহার প্রকাশ, সেই নিরন্তর পরমজ্যোতিঃ দেখিয়া কেশব বুঝিয়াছেন, আত্মার ছবি অনন্তকোটী শশী-ভানুর মতই নির্ম্মল!

যে অব্যক্ত জ্যোতিকে অনুভবের শুভ্র কমলকলি-রূপে অনন্তকোটী-চন্দ্রসূর্য্যের ছটারূপে কল্পনা করিয়া সান্ত মনবুদ্ধি দিশাহারা হইয়া পড়ে, তাহার দ্বারা তোমার আনখশিখ আনন্দ-বিজলীতে পুরিয়া উঠিলে, তবে বোঝা যায় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অতীত ভূমি কি!

কিন্তু এই দর্শনও শেষ নয়। চাই সহজ স্থিতি।—সে কেমন? মা কোথায়, মা কোথায় বলিয়া সাধক ফুকারিয়া মরিতেছে। কিন্তু ওই যে আট বছরের গৌরী আসিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া সুর-নরের অবোধ্য ভাষায় প্রলাপ বকিয়া তাহার মন কাড়িয়া নিবার আয়োজন করিতেছে, ওই যে তার মা নয়, তাই বা কে বলিল? রাম-কৃষ্ণদেব বলিলেন, "কাল দেখলাম মাকে, পাশের বাড়ীর কামারের নয় বছরের মেয়েটীর বেশে দেখা দিল; কিন্তু কি তার চাউনি, চাউনিতে যেন জগৎটা টল্‌ছে!" অভিমানে অন্ধ-সাধক কি করিয়া এই সহজ দর্শনের রস আস্বাদন করিবে, কি করিয়া সে বুঝিবে, মা আসিয়া দেখা দেয়, —কিম্ভূত-কিমাকার একটা কিছু হইয়া নয়, হয়ত এই চোখেই ধরা দেয় সে ওই পাশের বাড়ীর কামারের পাঁচবছুরের ন্যাংটা মেয়েটীর মাঝে; হয়ত বা দেখি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মর্ম্ম-গেহিনী আমার সামনেই কচুবনে ফড়িং ধরিয়া বেড়াইতেছে!—এ কথা বিশ্বাস করে কে?

এমন করিয়া বাঙ্গালী সহজিয়া যাহাকে লীলা-চ্ছলে বাহিরে প্রতিচ্ছুরিত করিয়া আনন্দে আত্ম-হারা হইয়া যাইতেছেন, হিন্দুস্থানী সহজিয়া তাহাকে নিবিড় প্রেমে বুকের মাঝে চাপিয়া বলিতেছেন, আমার নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত যে আনন্দজ্যোতিতে ছাইয়া গেল—

নিরখি রূপমন সহজ সমানা
মৈঁ তৈঁ মিটি গো ভর্ম্ম পরানা।—

—তোমার রূপ দেখিয়া আমার মন সহজের রসে রসিয়া উঠিল, তুমি আমির ভেদ যে ঘুচিয়া গেল!

তাই শুনি কেশবদাসের কণ্ঠে প্রেমের এই আনন্দকূজন—

পিয়, থারে রূপ ভুলানী হো!
প্রেম বগোরী মন হরো, বিনদাম বিকানী হো।

—হে প্রিয়, এমনই মনভুলানী তোমার রূপ গো! ও তোমার প্রেম, না বঞ্চনা? আমার মনটি নিলে চুরী করিয়া, তাই কিনা অবশেষে বিনামূল্যে তোমারই কাছে বিকাইয়া রহিলাম!

আমার এই অনুপম আনন্দের নিশানা পাইবে কি?

ভঁবর কঁবল রস বোধিয়া
সুখ-স্বাদ বখানী হো।
দীপক জ্ঞান পতঙ্গ সেঁা
মিলি জোতি সমানী হো!

—আনন্দের আস্বাদন বাখানিয়া বলিতে পারে সেই ভ্রমর, যে কমলের রস কি, তাহা বুঝিয়াছে। প্রদীপ কি তাহা জানে পতঙ্গ, যে জ্যোতির মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার সঙ্গে এক হইয়া যায়।

সহজিয়া এই আনন্দকে সহজ স্বরূপেই আস্বাদন করে বটে, কিন্তু পামরেরা তাহা পারে না। তাহাদিগকে ইহার সন্ধান দিতে হইলে বলিতে হইবে, চাতকের মত ঊর্দ্ধমুখী হও, তবে বুঝিবে, সহজানন্দ কি। তাই কেশবদাস বলিলেন—

সিন্ধু ভরা জল পুরনা
সুখ সীপ সমানী হো।
স্বাতী বুঁদ সেঁা হেতু হৈ
ঊর্দ্ধমুখ লগানী হো॥

—সিন্ধু ভরিয়া জল থৈ থৈ করিতেছে, তাহার মাঝে আনন্দ যেন একটী শুক্তির মত। সিন্ধুর জলে তাহার বাস বটে, এই জলই তাহার প্রাণ, তাহাও সে জানে। তবুও স্বাতী নক্ষত্রের একটী ফোঁটা জলের দরুণ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া আছে সে, নতুবা তাহার বুকে মুক্তা ফলাইবে কে?

কিন্তু তা বলিয়া মনে করিও না, এখানকার সহিত সেখানকার কোনও বিরোধ রহিয়াছে। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং"—ওই লোকও যেমন পূর্ণ, এই লোকও তেমনি পূর্ণ। বরং বলিতে পার, "পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে"—সেই পূর্ণ হইতে এই পূর্ণ উপচিয়া পড়িতেছে। উপরের অবতরণে নীচও যেন ধন্য হইয়া গেল। দেহ তো আর মৃন্ময় রহিল না, সে যে চিন্ময় হইয়া গেল—

নৈন শ্রবন মুখ নাসিকা
তুম অন্তর জানী হো।
তুম বিনু পলক ন জীজিয়ে
জস মীন অরু পানি হো॥

—তুমি আমার অন্তরের অন্তর, তুমি আমার সব এই তো জানি। তুমিই যে আমার নয়ন, শ্রবণ, মুখ, নাসিকা—সব। তুমি ছাড়া এক পলকও কি বাঁচিয়া থাকিতে পারি? জল ছাড়া মীন বাঁচে কি?

এই যে মিলনের আনন্দ ইহাকে কেশব বলিতেছেন আত্মরতি। যে ব্যাপকসত্তা দশদিশি পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাকেই প্রকটস্বরূপে চিনিয়া লওয়া—"ব্যাপক পুরন দসৌ দিসি পরগট পহচানী;" শুধু বাহিরে নয়, আমারও মাঝে তিনিই "নখসিখ পুরি রহে"—নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত জ্যোতিঃতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন—এই ভাবে তাঁহার সহিত আমার যে অদ্বৈতানুভূতি, তাহাই আত্মরতি।

এই অনুভবেরও বিলাস আছে—তাহার একটু আভাস পাঠক পূর্ব্বে পাইয়াছেন। কেশব বড় মধুর করিয়া এই বিলাসের আরতি-গাথা গাহিয়া গিয়াছেন। তবে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি, এখানে রূপ তত প্রকট হইয়া উঠে নাই, ভাব

নাকি ব্যঞ্জনায় যতটা নিবিড় হইয়া ফুটিয়াছে। হিন্দুস্থানী সন্তদের সহজানুভবের ইহাই বিশেষত্ব, একথা পুনরায় স্মরণ করিতে বলি। ব্যাপক-ভাবে যে লীলা জগন্ময় ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহাকেই একটি ভাবের দ্যোতনা দ্বারা আত্মসাৎ করা, ইহাই এই সহজভাবের বিশেষত্ব। এ যেন বাহিরকে অন্তরের :মাঝে পূরিয়া লওয়া। এই আকাশ বাতাস চন্দ্র-সূর্য্য পৃথিবী সমস্তই একটি বিচিত্র অর্থে মণ্ডিত হইয়া দেখা দিতেছে, তনু-মনও এক বিচিত্র আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, তাহাদের সকল হইতে আচ্ছিন্ন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবস্বরূপে আমার রতি নিবিষ্ট—ইহাই অরূপের সহজিয়া। অর্থাৎ এখানে মূর্ত্তি বিরাট এবং ভাব ঘনীভূত। বাঙ্গালীর সহজবাদ ইহার বিপরীত ধাঁরাকে অনুসরণ করিয়াছে —উহা অন্তর হইতে বাহিরে ভাব-তনুকে প্রতি-চ্ছুরিত করিয়াছে। এই বিচিত্র প্রকৃতি স্বরূপে আমার ভাবের উদ্দীপক নয়, পরন্তু আমারই পরিব্যক্ত ভাবতনুর লীলা-বিলাসের রঙ্গ-পীঠ। মূর্ত্ত এখানে সীমার মাঝে প্রকট, আর ভাব কলা-বৈচিত্র্যে উচ্ছলিত।

কেশব তাঁহার আত্ম-রতির বিলাসের গাঁথা এই ভঙ্গীতে গাহিয়াছেন—

ম্হারে হরিজুঁ সূঁ জুরলি সগাঈ হো।
তন মন প্রাণ দান দৈ পিয় কো
সহজ সরূপম পাঈ হো।

—আমার বঁধুর সঙ্গে কে যেন গাঁঠছড়া বাঁধিয়া দিল। আমার তনু-মন-প্রাণ দিয়াছ সেই প্রিয়তমকে, আর তাঁহাকে পাইয়াছি—সহজে—স্বরূপে।

কোথায় আমাদের এই বিবাহ-সভা, তাহা জান কি?—

অরধ উরধকে মধ্য নিরন্তর
সুখমন চৌক পুরাই হো।
রব্বি-সসি কুম্ভক অমৃত ভরিয়া
গগনমণ্ডল মঠ ছাঈ হো!

—উর্দ্ধে ওই আকাশ আর নিম্নে এই পৃথিবী—এই দুইয়ের মাঝে নীরন্ধ্র সৌন্দর্য্য দিয়া পূর্ণ করিয়া আমাদের বিবাহসভা রচনা করা হইয়াছে। গগন-মণ্ডলই আমাদের ডেরা—যেখানে রবি-শশী দুইটী ঘটকে অমৃতে পূরিয়া দুয়ারে রাখিয়া মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে।—অপরূপ বিবাহসভা বটে!

তারপর সদ্‌গুরু আসিয়া "লগন লাগাইয়া দিলেন"—প্রেম-তৃষাতুরা পতিব্রতা এতদিন পরে প্রিয়ের দরশ-পরশ পাইল, শিবের ঘরে শক্তির অধিষ্ঠান হইল।

কিন্তু এ কি শুধু আজকার ঘটনা? এই মিলন কি কাল দ্বারা খণ্ডিত? কেশব বলিতেছেন, তা নয়—

অমর সুহাগ ভাগ উজিঁয়ারো
পূর্ব্ব প্রীতি প্রগটাঈ হো,
রোম রোম মন রসকে বসি ভঈ
কেসো পিয় মন ভাঈ হো!

—অমর সে প্রিয়তমের সোহাগ, আর চির উজ্জ্বল সে প্রিয়তমার ভাগ্য। এ প্রীতি আজকার নয়—এ যে তাহাদের চিরন্তন পূর্ব্বপ্রীতিই আজ প্রকট হইয়া পড়িল। এ অসহ্য পুলক কি করিয়া সহ্য করিবে? হে কেশব, রোমে রোমে রসের নিষেকে যে তোমার মন এলাইয়া পড়িল; আর ওই দেখ তোমার প্রিয়তমের মনটীও এই আত্মনিবেদনে কেমন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে!

এই তো সহজ সুখ—

মিলি অঙ্গম সুখ সহজ সমায়া
যা বিধি কেসো বিসরী কায়া!

—অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া সহজানন্দে মিলাইয়া গেলে,

আর এমনি করিয়া হে কেশব, তোমার এই মৃন্ময় কায়াকে তুমি ভুলিয়া গেলে!

বিশ্বব্যাপী বিবাহসভায় প্রিয়তমের সহিত মিলন হইয়াছে। আবার দেখ, অন্তরের নিভৃত নিকুঞ্জে তাঁহার সহিত নিরন্তর হোলী খেলা চলিতেছে—

শ্রবন নৈন রসনা মিলো হৈ
আতম রামকে পাস।
ইক রংগ রূপ বনী সব সুন্দরি
সোভা বনো হৈ ঠাট,
বাজত তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝ ডফ
তিরবেনী কে ঘাট॥
আনঁদ কেলী হোত নিসুবাসর
বাঢ়ত প্রেম হুলাস।
অগর অবীর অখণ্ড কুমকুমা
কেসর সদা সুবাস॥
লঘু দীরঘ মিলি চাচরি জোরী
হোরী রচী অকাস।
পাৱক প্রেম সহজ সোঁ ফুঁকো
দসৌ দিসা পরকাস॥

—হোরী খেলিবে বলিয়া আত্মারামের কাছে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, শ্রবণ, নয়ন, রসনা —এরা সকলে মিলিয়া। এরা সবাই সুন্দরী, সমান তাহাদের রং, সমান রূপ—কি অপরূপ শোভাই না তাহারা করিয়াছে। ত্রিবেণীর ঘাটে মৃদঙ্গ-ঝাঁঝর-ডম্ফে বিচিত্র তাল বাজিয়া উঠিল। নিশি-দিন আনন্দকেলি হইতেছে, প্রেমের উল্লাস বাড়িয়াই চলিয়াছে—অগুরু, আবীর, কুঙ্কুম, জাফরাণের সুবাসের আর বিরাম নাই। ছোট বড় সকলে মিলিয়া হোলির চাচরি (যে বংশদণ্ডকে ঘিরিয়া হোরী খেলা হয়) রোপণ করিয়াছে—আকাশেও দেখি রঙের খেলা। সহজ প্রেমের আগুন ফুঁকিয়া কে জ্বালাইয়া দিয়াছে, আর দশদিক তাহাতেই আলো হইয়া উঠিয়াছে।

হোরীর এই মত্ততার মাঝে—

সহজ সুভাব কো খেল বন্যো হৈ
কথা বরনি ন জাত।
সুরতি-সুহাগিনি উঠি উঠি লাগহি
অবিনাসী কে গাত!

—সহজ প্রেমের লীলা চলিয়াছে, আমি কি করিয়া এই ফাগুয়ার কথা বিবরিয়া বলি!—ওই দেখ, সুরতি-সোহাগিনী বধূ বারবার উঠিয়া সেই অবি-নাশীর গায় ঢলিয়া পড়িতেছে!

এই সহজভাবের তত্ত্ব কেশব নিজে যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া আমরা এই আলোচনা সমাপন করিব।

সহজ-সিদ্ধির স্বরূপ কি?—কেশব বলিতেছেন—

অচ্ছর মাহিঁ নিঅচ্ছর দেখা
সোই সব জীবন কা লেখা।

—আমি **অক্ষরের মাঝে নিরক্ষরকে** দেখিয়াছি—বুঝিয়াছি তিনিই সকলের জীবনলেখা।

এই দুইটী ছত্রের মাঝেই সমস্ত সহজ-তত্ত্ব কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! গীতায় আছে পুরুষোত্তমের কথা। কেশবদাস, কবীর প্রভৃতির "নিঅচ্ছর" সেই পুরুষোত্তম।

চোখের সামনে যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাই চঞ্চল, বিনাশী। ইহাই ক্ষর। প্রাকৃতজন এই ক্ষরেরই উপাসক। যাঁহারা বিরাগী ও বিবেকী, ক্ষর নিয়া তাঁহারা তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। তাহারা চান—এক অচঞ্চল, কূটস্থ, ধ্রুব-সত্তা। তাহাই অক্ষর। এই অক্ষরসিদ্ধিকেই কেহ কেহ পুরুষার্থ বলিয়া জানেন। বাস্তবিক অক্ষরে প্রতিষ্ঠা ভিন্ন শাশ্বতী শান্তি লাভের আর কোনও উপায় নাই। কিন্তু এইখানেই সব শেষ হইয়া যায় নাই, ইহার পরেও কথা আছে।

হঠাৎ সূর্য্যের মণ্ডল চোখে পড়িলে মানুষের চোখ ঝল্‌সিয়া যায়—সে শুধু আলোর ছটা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না। কিন্তু ক্রমে যদি সূর্য্যবিম্ব চোখের কাছে সুসহ হয়, তখন তাহারই মাঝে দেখা যায় টল্‌টলে পারার মত জ্যোতিঃর জমাট মূর্ত্তি। তেমনি অক্ষরে

তদ্‌গতচিত্ত পুরুষও ক্রমে আবার সেই অক্ষরের মাঝেই দেখিতে পান অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত ক্ষরেরই দিব্যভাবময়ী অক্ষরা তনু। উহাই কেশবের "নিঅচ্ছর।" পূর্ণ হইতে এই পূর্ণ উপচিয়া পড়িলেও আবার পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে; এ সেই পূর্ণ। "নি-অচ্ছরের লেখা" যাঁহার জীবনে পড়িয়াছে, তিনিই যথার্থ সহজিয়া; চারিদিকে তিনি দেখিতে পান আত্মস্বরূপেরই প্রতিবিম্ব; সকলের জীবনেই দেখেন সেই "নি-অচ্ছরের" লেখা; এই প্রাকৃত জগতই তখন কৈলাসে রূপান্তরিত হয়। কচিৎ কখনও কোনও জ্ঞান-সহজিয়ার জীবনে এই "নি-অচ্ছরের লেখা" ফুটিয়া উঠে, ইহা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য বাঙ্গালীর হইয়াছে।

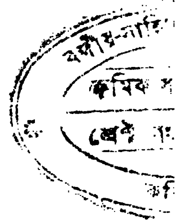
এই সহজিয়াদের আচার কিরূপ?—কেশব বলেন—

কহ কেসো ভীতর জোগ জগৈ
ইত বাহর ভোগমঈ তন হৈ।
মন হাথ ভয়ে জিনকে তিনকে
বন হী ঘর হৈ ঘর হী বন হৈ॥

—কেশব বলিতেছেন, এই সহজিয়াদের ভিতরে জাগিতেছে যোগ; এদিকে বাহিরে দেখ, তাহাদের তনু ভোগে লিপ্ত। যাহার মন বশ হইয়াছে, তাহার কাছে বনই ঘর, ঘরই বন।

ইহার উপর টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

(সমাপ্ত)



আশ্রমধর্ম্ম

—(:০:)—

আশ্রম শব্দের মৌলিক অর্থ আশ্রয়। শুধু দেহেরই আশ্রয় নয়, মনেরও আশ্রয়; একারই আশ্রয় নয়, সংহতিরও আশ্রয়। প্রাচীনকালের চতুরাশ্রমের কথা শুনি; আরও শুনি, সনাতন-ধর্ম্ম বর্ণ ও আশ্রমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সনাতনধর্ম্ম অর্থে যদি কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম না হয়, উহা যদি সমগ্র মানবজাতির সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে তাহার ভিত্তিমূলে যে চতুরাশ্রমের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহাও নিশ্চয়ই সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে মানবাত্মার সার্ব্বভৌম আশ্রয়ই হইবে। বস্তুতঃ আশ্রম শব্দটী এই অর্থেই পূর্ব্বে ব্যবহার হইত। একটা সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য এবং তাহার প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কতকগুলি সুচিন্তিত বিধি-নিষেধ দ্বারা স্বভাবতঃ চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল মানব-চিত্তকে আশ্রয় দেওয়াই আশ্রমের উদ্দেশ্য। তাই শুনি, ব্রহ্মচারী বা শিক্ষার্থীরও আশ্রম আছে, গৃহস্থেরও আশ্রম আছে, বর্ণী ও যতির তো কথাই নাই। অর্থাৎ জীবনের যে-কোনও অবস্থাতেই থাক না কেন, নিজের প্রতি ও দশের প্রতি তোমার কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, অতএব কতকগুলি বিধি-নিষেধ আইন-কানুনও আছে; জীবনে যখন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে, তখন তোমার সঙ্কল্পিত ব্রতের আদর্শ স্মরণ করিয়া এই সমস্ত বিধি-নিষেধ দ্বারা আত্ম-শাসন করিতে হইবে, যাহাতে পরার্থগৃধ্নু না হইয়া তুমি সর্ব্বভূতের হিতে রত হইতে পার —আশ্রমী হওয়ার ইহাই তাৎপর্য্য। এইজন্য বিদ্যার্থীও আশ্রমী, গৃহস্থও আশ্রমী, বিবিদিষাসন্ন্যাস-যুক্ত যতিও আশ্রমী। হিন্দুসমাজে সকলেরই আশ্রমী হওয়া কর্ত্তব্য—এক নিরাশ্রয় বা অনাশ্রমী হইতেছে অনুপনীত শিশু, আর বিদ্বৎসন্ন্যাসী পরমহংস। কর্ত্তব্যের চাপ শুধু জীবনের এই দুই প্রান্তেই

নাই—বিধি-নিষেধের গণ্ডী মানুষ শুধু এই দুই অবস্থাতেই এড়াইতে পারে; নতুবা আর সর্ব্বত্রই মানুষ আশ্রমী, ব্রতী। আশ্রম কথাটার ইহাই সারার্থ।

আবার আশ্রম এই স্থূল দেহের আশ্রয় বটে—তখন আশ্রম অর্থে ডেরা। এটা খুব সোজা অর্থ; কিন্তু আমাদের মনে এই অর্থের কতকটা সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। যে কোনও ডেরাকেই আমরা এখন আশ্রম বলি না। পাখীর বাসা কি বাঘের গুহাকে তো আশ্রম বলিই না, গৃহস্থের বাড়ীকেও আশ্রম বলিতে সঙ্কোচ অনুভব করি। সম্ভবতঃ আশ্রম শব্দটীর সহিত সংযম-সাধনার পূর্ব্বস্মৃতি জড়িত থাকায় নির্ব্বিচারে যেখানে-সেখানে এই শব্দটী ব্যবহার করিতে আমরা সঙ্কুচিত হই। সমাজে যখন অসংযমের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে, তখন সংযমকামীকে সমাজ হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের তেজ বা দুর্ব্বলতা যাহাই প্রকাশ পাক না কেন, সে নিয়া আমরা কোন তর্ক করিতেছি না। মোট কথা, সমাজের বহির্ব্যাপ্তি ও বাঁধুনীর শৈথিল্য-বশতঃ আশ্রম কথাটা ক্রমে সমাজবহির্ভূত হইয়া গিয়াছে এবং এখনও সমাজবহির্ভূতের ডেরা বুঝাইতে আশ্রম শব্দের স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাই সাধুর আশ্রম, সন্ন্যাসীর আশ্রমের পাশেই আছে অনাথাশ্রম, দরিদ্রাশ্রম, আতুরাশ্রম ইত্যাদি। ইহাতে আশ্রম শব্দের পূর্ব্বতন মর্য্যাদাও কতক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং সর্ব্বসাধারণের চিত্তে আশ্রম সম্বন্ধে একটা অনাত্মীয়তার ভাবও পুষ্ট হইতে চলিয়াছে। বর্ত্তমানে আশ্রম বলিতেই মনে হইবে, দশের সঙ্গে থাপ্‌ছাড়া একটা কিছুর কথা হইতেছে; পিঁজরাপোল-জাতীয় Asylum শ্রেণীর আশ্রমগুলি তো থাপছাড়া বটেই, ত্যাগী-সংযমীর আশ্রমও দিন দিন সমাজের মাঝে কেমন যেন বেখাপ্পা হইয়া উঠিতেছে। যে আশ্রম-ধর্ম্মের সহিত সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন যোগই সনাতন ধর্ম্মের লক্ষণ ছিল, সেই আশ্রমের এমনিতর অর্থসঙ্কোচ সমাজের পক্ষে হিতকর কিনা সন্দেহ। ত্যাগ-সংযম একদিন আমাদের মাঝে স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত ছিল, তপস্যাতে একটী প্রশান্ত শ্রীর দীপ্তি ছিল, তাই ব্রহ্মচারী হইতে যতি পর্য্যন্ত সবাই ছিল আশ্রমী। কিন্তু সামাজিক স্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্যবশতঃ ত্যাগধর্ম্ম আর আমাদের মাঝে সহজে জীর্ণ হইতে চাহিতেছে না বলিয়া তাহার উদ্গারও দিন দিন উৎকট ও বিভীষিকাময় হইয়া উঠিতেছে। পরের কাছে বড়াই করিবার বেলায় আমরা পূর্ব্বপুরুষের ত্যাগ-সংযমের দোহাই পাড়ি বটে, কিন্তু মনে মনে ত্যাগসংযমকে বাঘের মতই ভয় করি। তাই ত্যাগীর আশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমশঃ উপেক্ষা, অবিশ্বাস ও বিদ্রূপে রূপান্তরিত হইয়া চলিয়াছে; যাহারা অশক্ত ও দুর্ব্বল, তাহারা এই করিয়াই আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া থাকে বটে।

আশ্রমধর্ম্ম আমাদের কাছে যতই দুর্ব্বোধ ও থাপছাড়া হউক না কেন, বিংশশতাব্দীর জাতীয় অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে আশ্রমের পত্তনও হইয়াছে নিতান্ত কম নয়। মনে হয়, এ যেন বৈজ্ঞানিক ভারতের সহিত আধ্যাত্মিক ভারতের পাল্লা দেওয়া চলিতেছে। কোন্ মনোবৃত্তি হইতে এমনি করিয়া অলিতে-গলিতে আশ্রমের সৃষ্টি হইতেছে, সমাজ-পণ্ডিতের তাহা ভাবিয়া দেখার মত বিষয় বটে।

সমাজ আর এখন কোনও আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়; তাই আশ্রম গড়িতে হইলে সমাজের বাহিরে আসিয়া ডেরা গাড়িতে হয়। প্রধানতঃ ধর্ম্মবোধের প্রেরণাতেই আমাদের দেশের মানুষ সমাজের গণ্ডী ছাড়িয়া বাহিরে আসে। অতএব

সাধারণ দৃষ্টিতে আশ্রম বলিতেই বুঝি কোনও একটা ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলি আত্মনেপদী অথবা পরস্মৈপদী উভয় প্রয়োজনেই উদ্ভূত হইতে পারে। আমাদের দেশে আশ্রমনামধেয় বড় বড় প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান মুখ্যতঃ লোকের মাঝে ধর্ম্মবোধ সঞ্চারিত ও পরিপুষ্ট করিবার কেন্দ্র। প্রায়শই ইহাদের মূলে এখন কোনও মহৎ ব্যক্তির প্রেরণা নিহিত থাকে, যাঁর আত্মপ্রয়োজনে ধর্ম্মসাধনা পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, যিনি এখন ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক বা লোকগুরু। সমাজের বাহিরে গঠিত হইয়াও এই সমস্ত আশ্রম সমাজের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন নয়। কিন্তু ইহা ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে অনেক ছোট ছোট আশ্রম দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, যাহাদের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সামাজিক ব্যক্তির সন্দেহ হওয়া সম্ভব। ব্যক্তিগত প্ররোচনা হইতে এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। প্রায়ই দেখা যায়, ধর্ম্মপিপাসা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় জাগিয়া উঠিলেই আমাদের দেশের লোকেরা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া হয় রম্‌তা হইয়া লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, নতুবা খেয়ালমত গেরুয়া ধরিয়া কোথায়ও একটা আশ্রম ফাঁদিয়া বসে। এই শ্রেণীর রম্‌তা সাধু ও ভুঁইফোঁড় আশ্রম দ্বারা সমাজের বিশেষ কি উপকার হয়, তাহা বলা যায় না; তবে কিনা অলৌকিক এবং কিম্ভূতকিমাকারে বিশ্বাসালু অজ্ঞ জনসাধারণের ইহারা মোহ উৎপাদন করে বটে। সমগ্র দৃষ্টিতে সমাজের সহিত এই দুই শ্রেণীর আশ্রমেরই বা সম্বন্ধ কি, ইহাদের সার্থকতাই বা কোথায়, তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

আমাদের দেশের নীতিশাস্ত্র বলিতেছে, একমাত্র ধর্ম্মবোধই মানুষকে ইতর প্রাণী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। নতুবা আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন সমস্ত প্রাণীরই স্বাভাবিক বৃত্তি। উপনিষদেও আছে তিনটী এষণার কথা—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা; ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটী সমস্ত জীবে সাধারণ—ইংরেজীতে যাহাদিগকে বলে Propagation of species ও Self-Preservation; একমাত্র লোকৈষণা বা পরলোকে বিশ্বাস, অলৌকিকের প্রতি শ্রদ্ধা—ইহাই হইল মানুষের বিশেষত্ব। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড বোধ হয় মানুষের ধর্ম্মবোধপ্রসূত অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু, শোভন ও বনিয়াদী। সায়ন বলিতেছেন, ইহারও মূল কথা হইতেছে অলৌকিকের প্রতি যুক্তিনিরপেক্ষ শ্রদ্ধা। মোটকথা, ধর্ম্মবোধ মানুষের মজ্জাগত সংস্কার। এই ধর্ম্মবোধ যে শুধু তাহার সমস্ত প্রচেষ্টার সহিত জড়িত থাকিয়া প্রত্যেক কাজে একটা বিশেষ ভঙ্গীর আরোপ করে, তাহাই নয়; এই ধর্ম্মবোধ বিবিক্ত ও একান্ত হইয়া নিজস্ব কতকগুলি আচারের মাঝেও আত্মপ্রকাশ করে। গুরু-পুরোহিতের উপর আমরা আজকাল খাপ্পা হইয়া উঠি। কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে বুঝি, গুরু-পুরোহিত শুধু হিন্দুরই একচেটিয়া নয়। জগতের অতি অখ্যাত ও অবজ্ঞাত অসভ্য জাতির মাঝেও এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা বিশেষ কতকগুলি আচার ও অনুষ্ঠানের রক্ষী হইয়া সমাজে একটী বিবিক্ত স্থান অধিকার রহিয়াছে। ইহার জন্য আদিমানবের মজ্জাগত ধর্ম্মবোধ বা লোকৈষণাকেই দায়ী বলিতে হয়। হিন্দুর বাহাদুরী এই, এই বিবিক্ত ধর্ম্মবোধকে সমগ্র জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া-মিশাইয়া জীর্ণ করিয়া লইবার সাধনায় সে কতক-পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছিল। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এই জারণ-চেষ্টার শেষ দান। পূর্ণাভিব্যক্ত ধর্ম্মবোধকে নিঃশেষে অন্তঃশীল করিতে পারিলে তবে আমরা পাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগী। কর্ম্মযোগী আর দশজনের মতই চলে-ফেরে, কিন্তু দশের সহিত তাহার তফাৎ এই যে সে লোকসংগ্রহার্থ

নিযুক্ত, সে সর্ব্বভূতহিতে রত। অন্তরের অনুভবের দিক দিয়া যে সে কত বড়, তাহা বাহির দেখিয়া কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ; ইহা অবলীলাক্রমে সমাজের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতে পারে, কোথায়ও নিজের উগ্র স্বাতন্ত্র্য দ্বারা, লোকবহির্ভূত আচার দ্বারা দ্বন্দ্বের পীড়া উৎপাদন করিতে জানে না। আজকাল ধর্ম্মাচরণের উগ্র স্বাতন্ত্র্যকে মনুষ্যত্বের সহজ স্ফুরণের পরিপন্থী মনে করিয়া বৈজ্ঞানিক সভ্যতার আসর হইতে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। হিন্দু নিষ্কাম কর্ম্মযোগে ধর্ম্মবোধকে অন্তঃশীল করিয়া লইয়াছিল; তাহার সহিত তুলনা করিলে এই আধুনিক প্রচেষ্টাকে বালকোচিত নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

ধর্ম্মবোধ মানুষের মজ্জাগত এবং পরিপাকের তারতম্যানুসারে কোথায়ও তাহার প্রকাশ বিবিক্ত কোথায়ও বা অন্তঃশীল—এই দুইটী কথা যদি আমরা বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী আশ্রম-প্রতিষ্ঠার নিদান কথা বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না।

পারিবারিক, সামাজিক বা সাংসারিক কর্ত্তব্যের যত ভিড়ই হোক না কেন, তথাপি ইহার মধ্যেই একটু বিবিক্ত হইয়া ধর্ম্মসাধনার সুযোগ মানুষকে দিতেই হয়; যৌবনে না দিলেও বয়স ভাটী পড়িলে তাহাকে এই ছুটিটুকু দিতেই হইবে। অন্য দেশে এই বিবিক্ত সাধনার মূলোচ্ছেদ হইলেও এই দেশে হইবে না—কেননা নিছক্ রাজনীতির আন্দোলনকেও আধ্যাত্মিক করিয়া তুলিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা এদেশবাসীর আছে। এই বিবিক্ত ধর্ম্মসেরা একটু তীব্রতর হইলেই মানুষ ঘর ছাড়িবে। ঘর ছাড়িয়া সে যদি কিছু পায়, তাহা হইলে তাহা আর দশ জনকে বাঁটিয়া দিবার অদম্য প্রেরণায় আবার সে সমাজে ফিরিয়া আসিয়া গ্রামের এক প্রান্তে অন্ততঃ একটী কুটীর বাঁধিয়া হইলেও ধর্ম্ম-প্রচার করিতে সুরু করিবে। ধর্ম্মবোধের এই বিবর্ত্তন সহজ ও স্বাভাবিক। যুগে যুগে দেশে দেশে নানা আকারে এই একই ধারার পুনরাবৃত্তি দেখিতেছি।

ইহা হইতে প্রমাণ হয়, আশ্রম প্রতিষ্ঠাটা মানুষের একটা সাময়িক বাতিক মাত্র নয়, উহা তাহার একটা মজ্জাগত প্রেরণা। আজ যাঁহারা নূতন ভাব ও নূতন সভ্যতার মালমসালা দিয়া জীর্ণ সমাজকে নূতন করিয়া গাঁথিয়া তুলিতে চান, তাঁহারা এই মনোবৃত্তির উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেই যে বিশেষ কিছু ফল হইবে, তাহা মনে হয় না। যাহা মানুষের স্বভাব, তাহা কাহারও স্তুতি-নিন্দার অপেক্ষা রাখে না। তাহার সঙ্গে বোঝা-পড়া করিতে হইলে তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে, তাহাকে এড়িয়া গেলেও চলিবে না, ঠেলিয়া ফেলিলেও চলিবে না।

ধর্ম্মের বাতিক মানুষের থাকিবেই এবং সেই বাতিকের প্ররোচনায় সে সমাজের অঙ্গনে আশ্রমরূপী অসামাজিক ডেরা খাড়া করিবেই, নিরুপায়ভাবে ইহা মানিয়া লইয়া এখন দেখিতে হইবে, এই আশ্রমের স্বরূপ কি হইলে পর তাহা সমাজের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন যুগের চতুরাশ্রমের আইডিয়া যথার্থই উদার, সর্ব্বসমঞ্জস ও সামাজিক ছিল। গার্হস্থ্যের তো কথাই নাই, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-আশ্রমও তখন সমাজেরই অঙ্গীভূত ছিল। গৃহস্থাশ্রমকে বলা যাইত অন্যান্য সমস্ত আশ্রমের যোনি বা প্রতিষ্ঠা। গৃহস্থাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা, সকল আশ্রমীকেই দিনান্তে একবার তাঁহার কাছে হাত পাতিতেই

হইবে। আবার সমাজকে সুষ্ঠুভাবে বহন করিতে হইলে ভিক্ষাব্রতী ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও যতি ইহাদিগকেও তো পোষণ করিতে হইবে, ইহা-দিগকে গলগ্রহ মনে করিলে তো চলিবে না। ব্রহ্ম-চারীরা সমাজের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল, সুতরাং সমাজ তাহাদিগকে নিজের গরজেই পোষণ করিবে। যাহারা বানপ্রস্থী, তাহারা এত-দিন ধরিয়া সমাজের চাকরী করিয়া এখন পেন্সন লইয়াছে; এইবার সামাজিক কর্ত্তব্যের দায় হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি দিয়া ব্যক্তিগত আত্মানুশীলনের সুযোগ দেওয়াও সমাজের কর্ত্তব্য, অতএব সমাজ তাহাদিগকে প্রয়োজন হইলে পোষণ করিবে বই কি; এটা সমাজের কৃতজ্ঞতার দায়। আর সন্ন্যাসীর কাছে সমাজ কিছু পাইবার আশা করে; সমাজে যে কর্ম্মচক্র আবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন সন্ন্যাসী; কাজের মাঝে তাঁহারা ভাবের যোগানদার; নিঃস্পৃহ কর্ম্মত্যাগের তাঁহারা জ্বলন্ত আদর্শ; তাঁহাদের নির্ম্মুক্ত, নিরুদ্বেগ বাধা-বন্ধহীন জীবনের দিকে তাকাইয়া কর্ম্মজাল-জড়িত শ্রান্ত ক্লান্ত গৃহস্থও একবার সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবে কবে সেও এমনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে; আর অলক্ষ্যে এই ভাবনার সহিত তাহার নিত্যকর্ম্মেও নিঃস্পৃহতার ছোঁয়াচ লাগিয়া যায়।

এই হইল চতুরাশ্রমের আদর্শ ও প্রয়োজন। আজ বর্ণাশ্রম বর্ণাশ্রম বলিয়া কলরব করিতেছি, কিন্তু কোথায় সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্বআশ্রমের সমবায়ে পরিপূর্ণ আর্য্য-সমাজের নিদর্শন? দেশে আছে শুধু তেজোহীন ব্রাহ্মণ আর ক্ষয়গ্রস্ত শূদ্র, এই দুইটি মাত্র বর্ণাভাস; আশ্রমের মাঝেও তেমনি আছে দায়িত্বজ্ঞানহীন গার্হস্থ্য ও শিথিল সন্ন্যাস—এই দুইটী মাত্র আশ্রমের আভাস; তার মাঝেও আবার গৃহস্থ আশ্রম-বিশেষণে বিশিষ্ট হইতে নারাজ!

যদি সনাতন ভারতবর্ষকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হয়, তাহা হইলে বর্ণ এবং আশ্রমের ছকে যে ফাঁক পড়িয়াছে, সেগুলি পূরণ করিতে হইবে; ইহাদের মাঝে যে আবর্জ্জনা আসিয়া জমা হইয়াছে, তাহারও মার্জ্জনা প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই বর্ণ এবং আশ্রমকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে পুনর্গঠিত করিয়া না পারিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় ভাবধারার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব না হইলেও দুরূহ। পুনর্গঠনে বাধাও অনেক; আজ যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা এক বিরাট ধ্বংসস্তূপ; ভেজালও যে তাহার মাঝে কত ঢুকিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই। বর্ণসঙ্কর ও আশ্রমসঙ্করের লক্ষণ প্রায় সর্ব্বত্রই প্রকট। ইহাদিগকে গুছাইয়া-বাগাইয়া নেওয়াই এক অভিনব ব্যাসের কর্ম্ম। চাই মহাশক্তিধর সমাজপতির আবির্ভাব। যত-দিন পর্য্যন্ত শাস্তার অভ্যুদয় না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকেই কোনওরকমে এই পুনর্গঠনের উপযোগী মালমসলা জোগাইয়া যাইতে হইবে।

বর্ণসমূহের ব্রাহ্মণই গুরু বা আদর্শ; আবার সন্ন্যাসী এই ব্রাহ্মণেরও গুরু বা লোকগুরু। যে আকারেই হউক, এই গুরুপরম্পরা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিকার ও সঙ্কর ঘটিয়াছে যথেষ্ট, কিন্তু আদর্শের লেখা হৃদয় হইতে তো নিশ্চিহ্ন হইয়া ধুইয়া-মুছিয়া যায় নাই। অভিনব মূর্ত্তিতে ভবিষ্য সমাজকে প্রকটিত করিতে হইবে; সে দায় রহিয়াছে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ ও আশ্রমগুরু সন্ন্যা-সীর উপর। এই দুইটী গুরুপংক্তির ছায়াও যে এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য।

সমাজে বৈশ্য নাই, ক্ষত্রিয় নাই; ব্রহ্মচারী, গৃহস্থাশ্রমী বা বানপ্রস্থীর কঙ্কাল মাত্র পড়িয়া আছে। যথার্থ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন করিতে হইলে এই সকলের অভাবই পূরণ করিতে হইবে।

যাহাতে অনায়াসে আবার এই পূর্ণাঙ্গ লোকচক্র আবর্ত্তিত হইতে পারে, তদনুরূপ উপকরণ ও শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে।

আজকাল ব্রাহ্মণের বৃত্তির ব্যভিচার, সন্ন্যাসীর আশ্রমধর্ম্মের ব্যভিচারের কথা শুনিতে পাই। ব্যভিচার কোনও কালেই সমর্থনযোগ্য নহে, তাহা বুঝি। কিন্তু আর একদিক যখন চিন্তা করি, তখন এই ব্যভিচারেরও একটা হেতুবাদ পাই। ব্রাহ্মণ কেবল যজন-যাজন অধ্যয়ন-অধ্যাপন নিয়া কেন দিন কাটায় না, সন্ন্যাসীই বা কেন "অনিকেত" হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়ায় না, ইহা ক্ষোভের কথা বটে। কিন্তু সমাজের যে সুস্থ, সবল ও সমৃদ্ধ অবস্থায় ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত এবং নিরুদ্বেগ হইয়া গুরুগিরি করিতে পারিতেন, সেই সত্যযুগই বা কোথায়? শাস্ত্রে আছে, আপৎকালে বৃত্তির সাঙ্কর্য্য দোষাবহ নয়। আপদ্ধর্ম্মের সুযোগ লইয়া কত বড় বড় অবাঞ্ছনীয় কাণ্ডও যে সমাজে ঘটিয়া যায়, আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। সামাজিক প্রগতির পক্ষে এই আপদ্ধর্ম্মকে আমরা একটা ন্যূনতা বলিয়া মনে করি না। মৃত্যুর ভিতর দিয়া যেমন নবজীবনের উন্মেষ হয়, তেমনি এই আপদ্ধর্ম্মের ভিতর দিয়াও নূতন সামাজিক শক্তি আত্ম-প্রকাশ করে। আপদ্ বিপদও প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে; আপাতত অবাঞ্ছনীয় হইলেও তাহা একেবারে অপরিহার্য্যও নহে, কিম্বা অশিবকরও নহে।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে পূর্ণাঙ্গরূপে ফিরাইয়া আনিতে হইলে এই যুগে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণকে ও আশ্রমগুরু সন্ন্যাসীকে এমন অনেক-কিছু কাজই করিতে হইবে, যাহা হয়ত রেখায় রেখায় প্রাচীন ইতিহাসের সহিত মিলিয়া যায় না। এখনই এইরূপ আপদ্ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজন চারিদিকে মাথা কাঁড়া দিয়া উঠিতেছে দেখিতে পাইতেছি। ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী সকলের মাথার মণি; সেই জন্য তাঁহাদের দায়ও সব চেয়ে বেশী। যেখানে হতচেতন শূদ্র বা নবব্রতী ব্রহ্মচারী সঙ্কোচে পিছাইয়া আসে, সেইখানেই ত্যাগমাত্রৈকশরণ ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীকে অসঙ্কোচে অগ্রসর হইতে হইবে—অজ্ঞ জন-সাধারণের বহু ভ্রূকুটী ও নিন্দাবাদ সহ্য করিয়াও সমাজের পুনর্গঠনকল্পে হয়ত অনেক স্বাধিকারবহির্ভূত কাজও করিতে হইবে! বাড়ীর যিনি কর্ত্তা বা অফিসের যিনি বড় সাহেব, অধিকাংশ সময়ই দেখা যায়, তিনি কেবল অনুগত ব্যক্তির উপর আদেশ জারীই করেন, হাতে-কলমে বড় একটা কিছু করেন না। কিন্তু যদি দৈবাৎ এমন কোনও বিপদাপদ উপস্থিত হয়, যখন সামান্য একজন কর্ম্মীর অভাবে একটা যজ্ঞ পণ্ড হইবার উপক্রম হয়, তখন পদমর্য্যাদা ভুলিয়া বড় কর্ত্তা বা বড় সাহেবই সেই ছোট কাজে অসঙ্কোচে নামিয়া পড়েন—নিজের হাতে কোদাল ধরিলে বা হাতা-বেড়ী ধরিলে তখন তাঁহার আর সম্ভ্রম নষ্ট হয় না। যাহারা স্থূলদর্শী, তাহারা "আহা কি করেন, কি করেন"—বলিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসে; কিন্তু মহতের মহত্ত্ব যে কোথায় তাহা বুঝিতে পারে না। বর্ণের গৌরব বা আশ্রমের গৌরব ভুলিয়া অতি ছোট-কাজে ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী হাসিমুখে নামিয়া পড়িয়াছেন, আর অপেক্ষাকৃত হীনবর্ণ বা হীনাশ্রমী নিজের বর্ণাশ্রমের গৌরব লইয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিয়াছে, ইহাও তো কতবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

যে বিপুল সংগঠনকার্য্য আমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, যথার্থ ব্রাহ্মণকে ও সন্ন্যাসীকে একা তাহার ঝুঁকি সামলাইতে হইবে। এই কাজে প্রশংসা নাই, অথচ নিন্দা ও বাধা আছে যথেষ্ট; কিন্তু তাহাও তাঁহাদিগকে সহিয়া যাইতে

হইবে। ব্রাহ্মণের চেয়েও আবার দেখি, সন্ন্যাসীর দায় আরও বেশী। আত্মত্যাগ ভিন্ন এ জাতির আর উদ্ধার নাই। জগতে কোন মহৎ কাজই আত্মত্যাগ ছাড়া কখনও সম্পন্ন হয় নাই। পঙ্কিলভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ তো অনেকেই করিতেছে; তাহাতে তো দেশ অগ্রসর হইতেছে না; কেননা সহজ ভাবে, সুস্থ ভাবে, সবলভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াই দেশকে প্রগতির পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়ার মত যথেষ্ট শক্তি আর আমাদের সমাজে সঞ্চিত নাই। সব দিক দিয়াই আমরা ছন্নছাড়া, শিথিলস্বভাব। এই সমাজকে যথার্থ শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য একজন দুইজন নয়, শত শত সংসার-বিবিক্ত, ত্যাগব্রতী পুরুষ ও নারীর প্রয়োজন। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের অনুকূলে শ্লোক আওড়াইয়া বা সাধুগিরির জাঁক দেখাইয়া ফাঁকা বড়াই করিলে কিছুই হইবে না। এখন প্রয়োজন সংসারবিবিক্ত ত্যাগী সন্ন্যাসীর এক পল্টন; সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এমন কি সাম্প্রদায়িক অভিমানকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া এই ত্যাগী সন্ন্যাসীদিগকে সমাজের সমস্ত বিভাগে অদম্য উৎসাহে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ব্যবস্থার পঙ্কোদ্ধার করিয়া আবার সমাজস্রোতকে বহতা করিতে হইবে। যতদিন আবার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পূর্ণ প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়, ভারতের গৌরব যুগ ফিরিয়া না আসে—ততদিন পর্য্যন্ত এই সন্ন্যাসীদের আত্মমুক্তির চিন্তাও পাপ।

বাঙ্গালা সন্ন্যাসী-বিদ্বেষী ছিল। কিন্তু সেই বাঙ্গালাতেই এখন সন্ন্যাসাশ্রমের প্লাবন আসিয়াছে যেন। আশ্রম গ্রহণ করিলেই কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বিধি-নিষেধ স্বীকার করিতে হয়। বাঙ্গালী সন্ন্যাসী অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক নামটা স্বীকার করিয়াছে বটে, কিন্তু সম্প্রদায়ের আচরণকে সর্ব্বক্ষেত্রে গ্রহণ করে নাই। ফলে বাঙ্গালার অনেক মঠ বা আশ্রমের আদর্শ ঠিক শাস্ত্র-কথিত বা সাম্প্রদায়িক আশ্রমের আদর্শের সহিত মিলে না। ইহাতে বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে অনেক জায়গায় অপ্রতিভ হইতে হয়। তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসীদের গঞ্জনা তো সহিতেই হয়, ঘরের লোকেও না বুঝিয়া বাক্যযন্ত্রণা কিছু কম দেয় না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালী যে সন্ন্যাসাশ্রমকে একটা নূতন রহন দিয়াছে, ইহাতে বাঙ্গালীর দূরদর্শিতা ও স্বদেশ-প্রেমই প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু ধর্ম্মপ্রচার নয়, বাঙ্গালার সমাজ, বাঙ্গালার শিক্ষা, বাঙ্গালার রাষ্ট্র, বাঙ্গালার ব্যবসা-বাণিজ্য, কোথায় বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর হাত না পড়িয়াছে? এগুলিকে ব্যভিচার বলিব, না আপদ্ধর্ম্ম বলিব? সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছাড়া দেশের এই দুর্দ্দিনে এমন করিয়া আত্মোৎসর্গ কে করিবে? আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর এই সাম্প্রদায়িক স্খলনের (যদি ইহাকে স্খলন বলিয়াই গণ্য করা হয়) দরুণ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক মহাপুরুষেরা বাঙ্গালীর শিরে আশীর্ব্বাদই বর্ষণ করিবেন। "বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তঃ"—ইহা যে সন্ন্যাসীর আদর্শ, তাহা জানি। কিন্তু আজ দেশে না আছে যৌবন, না আছে আনন্দ; সন্ন্যাসী বসন্তের হাওয়া আনিবেন কি শ্মশানভূমিতে? দেশের শ্রী ফিরিয়া আসুক, দেশের লোক নিজের কাজ বুঝিয়া লউক, সমাজব্যবস্থা স্বয়ঞ্চল হউক্—সন্ন্যাসী আবার বিবিক্ত হইয়া কৌপীনমাত্রৈকসম্বল জ্ঞানানন্দ-বিগ্রহ হইয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা পালন করিতে থাকিবেন। বাঙ্গালা আশ্রমধর্ম্মকে যে নবরূপ দিয়াছে, তাহার প্রয়োজন ও সার্থকতা এইখানেই।

আদি-অন্ত

—*—

সাধনার সময় প্রলোভন থেকে নিজকে দূরে রাখতেই হয়। একটা কথা আছে, "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ"— বিকারের হেতু থাকা সত্ত্বেও যাঁদের চিত্তবিকার ঘটে না, তাঁরাই ধীর। খুব বাহাদুরীর কথা বটে, কিন্তু নিজের ওজন বুঝে বাহাদুরী করা চাই। আর চাই আত্মপ্রবঞ্চনা হতে মুক্ত থাকা। লোকের কাছে বাহাদুরী নেবার জন্য নির্ব্বিকারের ভড়ং করছি, অথচ এদিকে কামনা-বাসনায় কল্‌জে খুঁড়ে খাচ্ছে—এর মত দুর্গতি আর সাধকের কিছু হতে পারে না। একটু কিছু জম্‌তে না জম্‌তেই জাহির করবার ঝোঁকটা মানুষের বড় প্রবল; সেই ঝোঁকে নিজের সর্ব্বনাশ করেও সে ভূয়ো সম্মান বজায় রাখতে চায়। এটুকু বোঝা উচিত, তুমি যদি বাজে লোকের সার্টিফিকেটের ওপর নির্ভর করে ভাল হতে চাও, তাহলে সে ভাল হওয়ার মূল্য এক কাণা-কড়াও নয়; যাদের কাছে উঁচু হতে চাইছ, আর একদিক দিয়ে তো তাদের দুয়ারেই কাঙ্গালের মত হাত পেতে বসে আছ। অসমর্থ হয়েও যে আমরা সমর্থের ভাণ করি, গুণমায়ায় বেষ্টিত থেকে গুণাতীতের অভিনয় করি, এর মত মারাত্মক দুর্ব্বলতা আর কিছুতেই হতে পারে না। লোকসঙ্গই এর বীজ। এই জন্য সাধকের প্রয়োজন যথাসম্ভবতঃ জনসঙ্গ পরিহার করা। তুমি আপনাকে নিয়ে থাক। যে জায়গায় তোমার কোনও রকম দুর্ব্বলতা আছে জান, সে জায়গায় আত্মগরজেই সাবধান হয়ে চল, লোকের কাছে বাহবা নেবার জন্য বীরপুরুষ সাজবার কোনও খেয়াল যেন তোমায় পেয়ে না বসে।

এই হল যারা সখ করে প্রলোভনে মজে। কিন্তু যারা স্বভাবতঃ লোভী, তাদের উপায় কি? একটা সাধনা আছে বিপরীত-ভাবনা। যার মাঝে যে কুবৃত্তিটা প্রবল, সে অহরহঃ তার বিপরীত বৃত্তির স্মরণ-মনন করবে; যেমন কাম প্রবল থাকলে প্রেমের ভাবনা করবে, ক্রোধ প্রবল থাকে ক্ষমা ও মৈত্রীর ভাবনা করবে ইত্যাদি। কখনও কখনও এমন হয় যে শুধু বিপরীত-ভাবনাতেও ফল পাওয়া যায় না; এমন কি বিপরীত ভাবনাটা তখন মনের কাছে ঘেঁষতেই চায় না। তখন উপায় কি?—তিতিক্ষা ছাড়া আর তখন কোনও উপায়ই নাই। জিভ্ কামড়ে চোখমুখ বুজে কোনও রকমে পড়ে থাকা, এ ছাড়া আর কোনও গতি নাই। রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ কোনও দুর্গন্ধময় বা ধূমাচ্ছন্ন স্থানে এলে পর যেমন দমবন্ধ করে তাড়াতাড়ি নাকে কাপড় দিয়ে সে জায়গাটা পার হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না, এও তেমনি। প্রবৃত্তির ঢেউ অল্পাধিক সকলকেই নাচায়। তা নিয়ে আকাশ-পাতাল ভেবে কোনও লাভ নাই; বরং তাতেই ওরা আস্কারা পেয়ে যায়—ভাবে, আমরা তো তাহলে বড় রকমের একটা কিছু, তা না হলে লোকটাকে এমনি ধাঁধায় ফেলতে পেরেছি! আর যদি ওদের ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকিতে সাড়া না দাও তো ওরা অপ্রতিভ হয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে চলে যাবে। একটা গানে আছে—

মায়ামোহ ভোগ-তৃষা যখন তোরে দেবে তাড়া,
ক্ষ্যাপার মত থাক্‌বি বসে মন, সে কথায় না দিয়ে সাড়া।

এই হচ্ছে খাঁটী কথা। আকাশে কাল-

বৈশাখীও গর্জ্জে আসে, আবার তারাই বুকে ইন্দ্র-ধনু ফোটে, সোণালী আলোর হোরী খেলাও চলে। আকাশের তাতে কি?—সে তো আর তাদের ডেকে আনেনি!

এই ভাবটা থাক্‌বে মূলে—স্থূলে নয়। অর্থাৎ অসাড় হয়ে থাকতে বল্‌ছি বলে যে স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দিতে হবে, এমন কথা বল্‌ছি না। লড়াই নিশ্চয়ই করতে হবে, গোড়াতেই সে কথা বলে এসেছি—কিন্তু লড়াই করবে বেশ আয়েসে—যাত্রার দলের ভীম-দুর্য্যোধনের লড়াইর মতন আর কি! মনে মনে বেশ জানবে, এ আর কিছু প্রাণঘাতী ব্যাপার নয়—আসর জমা-বার দরুণ শুধু একটা কলরব মাত্র—সাজঘরে গেলে আবার সেই গলা-গলি, কোলাকুলি! মন্দ একটা কিছু ঘটতেই যারা ভড়্‌কে যায়, তাদের প্রাণে সাহস আনবার দরুণই তিতিক্ষার উপদেশ। লক্ষ্যটাই হল তোমার আসল কথা। যেদিন থেকে প্রাণে শুভেচ্ছা জেগেছে—সঙ্কল্প করেছ, আমি ভাল হব, সেদিন থেকেই তোমার আরজি মঞ্জুর হয়ে গেছে, তুমি প্রভুর চিহ্নিত দাস হয়ে পড়েছ। এর পর ভাল-মন্দ কত কিছুই আসবে-যাবে, আশা-নিরাশার দোলায় দুল্‌তে হবে, কিন্তু তবুও জানবে তোমার আর ভয় নাই; ওই শুভেচ্ছার বীজটুকুই তোমাকে সমস্ত সঙ্কট উত্তীর্ণ করে নিয়ে যাবে। পরিণাম সম্বন্ধে এমনিতর একটা ভরসার ভাব থাকলে মনটা খুব জোরালো হয়, তখন শেষের আশায় বর্ত্তমানের দুটা-চারটা চাট্‌ খেয়েও সয়ে যায়।

তিতিক্ষার সাধনটা এই দিক থেকে মেনে নিতে হবে; নতুবা লড়াই করবে না কেন? প্রবৃত্তি জাগ্‌লে তার টুঁটি চেপে ধরবে না কেন? যদিই সে তোমায় কাবু করে ফেলে, তবুও তাকে শাসিয়ে রেখো, আচ্ছা দেখো, আমি মাকে বলে দিচ্ছে, তখন বোঝা যাবে! তিতি-ক্ষার এই রূপ।

যতদিন দেহ আছে, ততদিন তার আকর্ষণও আছে। কিন্তু বৈদান্তিক তো দেহের সদসৎ বিচার করেন না, তাই তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়-বিকার আর ইন্দ্রিয়-নিরোধ দুই-ই তুল্যমূল্য, দুয়ের মাঝেই তিনি দেখছেন প্রকৃতিরই রঙ্গ, এই হল একদিককার কথা।

কিন্তু কার্য্যতঃ এ ব্যবস্থা কেমন দাঁড়াবে? প্রাচীন বৈদান্তিকের আদর্শ বিচার করে দেখ। যে অপ্রবুদ্ধ, অশান্ত, অদান্ত, তাকে কখনও বেদা-ন্তের অধিকার দেওয়া হত না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, অসৎকে ছেড়ে সৎকে গ্রহণ করিবার একটা উপযুক্ত অবসর যে জীবনে প্রয়োজন, এ কথা বৈদান্তিকও তো অস্বীকার করছেন না। সংস্কার তো সহজে মরে না। কিন্তু শান্তির সাধ-নায় যদি বীর্য্যলাভ হয় তো সেই শান্তবীর্য্য দিয়ে সংস্কারকে পরাভূত করবার জন্যই বেদা-ন্তীকে সদসতের অতীত হতে বলা হয়েছে। তুমি নিজের মাঝে খুঁজে দেখ, বেদান্তের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট অধিকার তোমার জন্মেছে কিনা, তোমার মাঝে বিবেক, বৈরাগ্য, শম-দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধি, শ্রদ্ধা, মুমুক্ষত্ব আছে কিনা। এই আয়ো-জনগুলো থাক্‌লে পর ভালমন্দকে নস্যাৎ কর-লেও কিছু আসে যায় না।

আর এই একটা গোঁ হয়েছে আজকাল। প্রবৃত্তিটুকু ভোগটুকু আমার বজায় থাকা চাই শেষ পর্য্যন্ত! সমন্বয়-ধর্ম্ম, পূর্ণ ধর্ম্ম, সহজ-ধর্ম্ম কত ধর্ম্মেরই বুলি শুনতে পাই; সবার মাঝে ওই এক চেষ্টা—কোনই রকমে এই ঠাটটীকে শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখতে পারা যায় কিনা। যে ধর্ম্মে তোমাকে সশরীরে নিত্যলোকে নিয়ে যাবার ভরসা দেবে, সেই ধর্ম্মই হবে সব চেয়ে বড়

আর ভালো—এত ছোট নজর হয়ে গেছে মানুষের! মেছুনীকে নিয়ে রাজবাড়ীতে তুলেছিল; সে সব ছাড়তে রাজী হল, কিন্তু শুঁটকী-মাছ বাঁধা ন্যাকড়ার পুঁটুলীটা কিছুতেই ছাড়লে না, বলে, তাহলে বাঁচবো কি করে? আমাদেরও সেই দশা। নিত্যবৃন্দাবনে যদি এখানকার হাঁড়িকুঁড়ি শুদ্ধ না তুলতে পারলাম তো বাঁচবো কি করে? সিদ্ধিলাভের পরও যদি তালের বড়া না খেতে পেলাম তো সহজ-জীবন হল কোথায়?—চিন্ময় জগৎ তোমার লক্ষ্য, ভূমার মাঝে অবগাহন করতে চলেছ; সে বিপুল আনন্দের সঙ্গে এইখানকার কণ্ডূয়ন-সুখের তুলনা হয় কখনো? লাখটাকার কারবারে এক পয়সার ঘাঁটতি ধরতে গিয়ে যারা সাতপয়সার তেল পোড়ায়, তারা চতুর হইতে পারে, কিন্তু দরাজ-মনের মানুষ নয় কখনো। ভূমাকে পেতে যদি এই জগৎ তুচ্ছই হয়ে যায় তো যাক্ নারে বাপু, তার জন্য এত কান্নাকাটী কিসের! না হয় এবারকার মত নরলীলাটা অসমাপ্তই থেকে গেল। বলবে, তাহলে পূর্ণতার অনুভূতি তো হল না! বলিহারি তোমার পূর্ণতা জ্ঞানের; অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের লীলাতেও পূরল না, এখন বৈকুণ্ঠের গুদামে তোমার ওই সরা-মালসা আর ছেঁড়া কাঁথা ভর্ত্তি করতে পারলে তবে বুঝি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূরবে!

নজরটা বড় রাখতে হবে। ওদিককার দরুণ এদিক যদি যায় তো যাক্ না; আবার ওদিকের দৌলতে যদি এদিক ফেঁপেই ওঠে, মান-যশের বন্যা বয়ে যায়, তাতেই বা কি! বেদান্তী যে কিছুই ছাড়েন না—মায় এ দেহটাকেও না, সেটা এমনি ভাবে। এর মাঝে তাঁর গরজ কিছুই নাই—যার গড়া দেহ—তিনি তার হাতেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। রাখতে হয় সে রাখবে, ভাঙ্গতে হয় ভাঙ্গবে। তবে প্রকৃতির একটা নিয়ম হচ্ছে এই, ওপার থেকে এপারে যদি কেউ ফিরে আসে, তবে তার দেহটাও আর মৃন্ময় থাকে না। ভূমাতে অবগাহন করলে সবই পূর্ণ হয়—যদিও কিনা সে পূর্ণতার ধরণটা কি, তা আমরা না বুঝতে পেরে রুচি আর প্রবৃত্তি অনুযায়ী কল্পনা-জল্পনা করে মরি। দেহেরও একটা সম্ভাব্যতা আছে, তারও একটা চরম বিকাশ আছে। সে বিকাশ কিন্তু শুচিতার দিকে, সংযমের দিকে, ইন্দ্রিয়বৃত্তির অমৃতময় পরিস্ফুরণে। বেদান্তী যখন আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ করেন, তখন তাঁর দেহও পূর্ণ, সেও চিন্ময় বিগ্রহে রূপান্তরিত হয়—যদিও সেটা কি, তা অনুভবের বিষয়।

গোড়া হতেই এই ভাবটাকে ধরে একটা সাধনা চলতে পারে; কিন্তু তাও উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, পরিপূর্ণ সংযমেরই সাধনা। চিত্তে যদি একটু ভাবের স্পর্শ থাকে, তাহলে সংযম সাধনা কত যে অনায়াস হতে পারে তা বলবার নয়। প্রথম প্রথম সংযম করতে গেলে কেবল নেতি-বিচারই আসে। তাতে শক্তির আভাস থাকে কিন্তু আনন্দ থাকে না। আর সংস্কারবশে মুহূর্ত্তের স্খলনের জন্যও তখন চড়া দাম দিতে হয়। কিন্তু সংযমের উপর যখন ভাবের স্নিগ্ধ আলোক ছড়িয়ে পড়ে, তখন সংযম বাস্তবিকই আনন্দের নিদান হয়ে ওঠে। তখন মনে হয় না এটা আমি স্বভাবের বিরুদ্ধে কিছু করছি; এ যেন আমার স্বভাবেরই আনন্দময় অভিব্যক্তি, এই অনুভূতিতেই চিত্ত তখন সরস থাকে।



হিমাচলের পথে

—(:০:)—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখানেই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের গদি প্রতিষ্ঠিত। চারদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির, ধর্ম্মশালা, নাট-মন্দির প্রভৃতি সমস্তই যেন আনন্দে হাসছে। হরিদ্বার ছাড়া পাহাড়ের ওপর এমন সুন্দর আশ্রম আর কোথাও দেখি নি। ভাগীরথীর ওপারেই একটু বাঁ দিকে আত্মানন্দজী প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান যুগের বিরাট্ সাধনক্ষেত্র "স্বর্গাশ্রম।" দক্ষিণ দিকে হৃষী-কেশ, ভীমগোদা, হরিদ্বার, মায়াপুর, কন্খল, জ্বালাপুর প্রভৃতি স্বপ্নের ছবির মত দেখা যায়। পশ্চিম দিকে স্তরে স্তরে পাহাড়, পশ্চিম-উত্তর কোণে সাদা হাঁসের মত ধব্‌ধবে টেহরিরাজের নূতন গ্রীষ্মাবাস "প্রতাপনগর" বা "নরেন্দ্রনগর" শোভা পাচ্ছে। চারদিকে অসংখ্য কালো পাহাড়ের ভিতর সাদা ধব্‌ধবে নরেন্দ্র-নগরের শোভা অতি মনোরম। উত্তর দিকে কেদারবদরীর রাস্তা ক্রমে উঁচু হয়ে লছমনঝোলায় মিশে পাহাড়ের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেছে।

যাঁরা কেদার-বদরী যান, তাঁরা সাধ্যানুসারে এই গদীতে প্রণামী দিয়ে যান। আমরা খানিকক্ষণ এখানে বিশ্রাম করে আবার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে কেদার-বদরীর রাস্তা ধরে ক্রমে উত্তর দিকে যেতে লাগলাম। কিছুদুর যেতেই শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থের আশ্রম। "আর্য্যদর্পণ"এর পাঠক-দের কাছে স্বামী রামতীর্থ অপরিচিত নন। আশ্রমটী ছোট হলেও খুব সুন্দর। অপর পারেই স্বর্গাশ্রম। রায় বাহাদুর সুরযমল শিবপ্রসাদজীর ব্যবস্থায় স্বর্গাশ্রমে যাবার জন্য ১০।১২ খানা বড় বড় নৌকা এখানে গঙ্গাতে পারাপার করছে। পারাপারের জন্য কিছু দিতে হয় না। গঙ্গা এখানে বেশ প্রশস্ত, গম্ভীর ও পুকুরের জলের মত স্থির। এখান হতে একটু-আধটু চড়াই করতে হবে। পেছনে গঙ্গাতীরে আমরা আরও অনেকগুলি মন্দির ও আশ্রম ফেলে এসেছি। শুনলাম, এইখানে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ করে বেদব্যাস উপাধি পেয়েছিলেন।

সামনেই "মৌনী কী রৈতির" সুন্দর তপোবন। পূর্ব্বে এখানে মুনি-ঋষিরা তপস্যা করতেন বলে মৌনী-কী-রৈতী "মৌনী-কী-রৈতী" নাম হয়েছে। ১॥ মাইল এখানে শত্রুঘ্নজীও তপস্যা করে-ছিলেন। শত্রুঘ্নজীর মন্দির আছে। আমাদের সঙ্গের কুলী ও অন্যান্য সকলে এখানে অপেক্ষা করছে দেখলাম। এখানে কুলীর জিনিষপত্র ওজন করার জন্য টেহরীরাজের একটী রেজেষ্ট্রী আফিস আছে। আফিসে আমাদের জিনিষপত্র ওজন করে কুলীর নামধাম ও আমার নামধাম লিখে, কুলীর টিপসই ও আমার দস্তখত নিয়ে রসিদ দেওয়া হল।

কেদার-বদরী যেতে হলে দেশীয় কোন প্রকা-রের যানই পাওয়া যায় না। পাহাড়ে চড়বার দরুণ কাণ্ডি, ঝাম্পান, ডাণ্ডি প্রভৃতি যান আছে, অশ্বারোহণেও যাওয়া যায়। হরিদ্বার বা হৃষীকেশ হ'তে তার ব্যবস্থা করতে হয়। কাণ্ডী একপ্রকার ঝুড়িবিশেষ, একজন তা পিঠে বহন করে নেয়। কাণ্ডীতে বসে দুহাতে দু'পাশের দুটী খুঁটী জোর করে ধরে থাকৃতে হয়, অন্যমনস্ক হলে পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে, সর্ব্বদাই পিছন দিকে চেয়ে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে হয়। খুব মোটা আরোহীকে কাণ্ডীআলা নিতে পারে না। তাদের জন্য ঝাম্পান বা দাণ্ডি আছে।

ঝাম্পান বসবার উপযোগী একটী চৌকো বাক্স বিশেষ। বাক্সটী বাঁশ ও দড়ি দিয়ে তৈরী করা। ঝাম্পানে কাণ্ডীর চেয়ে আরামে এবং নির্ভয়ে যাওয়া যায়। দাণ্ডি বসবার ইজি-চেয়ারের মত। উপরে ছাউনি আছে, তাতে রৌদ্র-বৃষ্টি লাগবে না। ঝাম্পান ও দাণ্ডি চারজন কুলীতে বয়ে নেয়। দাণ্ডিতে চেপে, খুব আরামে পা ছড়িয়ে শুয়েবসে যাওয়া যায়। এ সকলের ভাড়ার বাঁধাবাধি কোন নিয়ম নাই, সরকারী হারের চেয়ে সময় সময় কম-বেশী হয়ে থাকে। কাণ্ডী ও কুলীর ভাড়া সমান, ঝাম্পানে কেদার-বদরী ঘুরে আসতে গেলে ১৫০৲।২০০৲ টাকা লাগে। দাণ্ডিওয়ালাদের দাবী ঝাম্পানওয়ালার চেয়ে কিছু বেশী, এবার ২৫০৲ টাকা হয়েছিল। তবে দাণ্ডি নিজের কিনে নিতে হয়। নিকটেই দাণ্ডী তৈরী করার কারখানা আছে, নিজের ইচ্ছামত দেখে শুনে কিনে নিতে পারা যায়। দাম ২৫৲ হতে ৫০৲ টাকার মধ্যে।

গাড়োয়াল জেলার কুলী হরিদ্বার হতে রওনা হয়ে উত্তরাখণ্ড ঘুরে গাড়োয়াল জেলার শেষ প্রান্ত মেইলচৌরী পর্য্যন্ত যেয়ে থাকে। মেইলচৌরীর পর তারা যেতে রাজি হয় না। মেইলচৌরী হতে রামনগর রেল-ষ্টেশন ৭৬ মাইল। সেখানেও কুলী, দাণ্ডী, কাণ্ডী, ঝাম্পান, ঘোড়া প্রভৃতি পাওয়া যায়। তবে তারা চায় বেশী। আর যাঁরা হৃষীকেশের রাস্তায় ফিরে আসেন, তাঁরা আর আলাদা কুলীর বন্দোবস্ত করেন না। হরিদ্বার দিয়ে ফিরে আসাই সুবিধা, রামনগরের রাস্তায় মেইলচৌরীর পর ভাল চটী পাওয়া যায় না, থাকার অসুবিধা, তবে চড়াই-উৎরাই কম; অধিকন্তু আলমোরা জেলার শস্য-শ্যামল-ভূমি বাঙ্গালার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, হৃষীকেশের পথে সে আনন্দ নাই।

অনেক সময় কুলীরা দৈনিক এক আনা হিসাবে জলখাবার পেয়ে থাকে, সে কথা কুলীদের সঙ্গে পূর্ব্বেই বন্দোবস্ত করে নিতে হয়। এ ছাড়া প্রত্যেক প্রসিদ্ধ তীর্থে তারা বক্‌শিস পেয়ে থাকে এবং খিচুরী বাবৎ ১৲ টাকা নিয়ে থাকে; রসিদে এগুলির উল্লেখ থাকে না। অসুস্থ হয়ে পড়লেও প্রায় সব চটীতেই কুলী, ডাণ্ডী, কাণ্ডী পাওয়া যায়। চটীর চৌধুরী বা প্রধানকে বললেই সে ব্যবস্থা করে থাকে। অধিকন্তু কুলী কোনরকম খারাপ ব্যবহার করলে, রাস্তায় তাকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য ব্যবস্থা করা যায়। মোটের ওপর পূর্ব্বের মত রাস্তা-ঘাটে এখন কোন অসুবিধা নাই বললেই হয়।

আমরা ক্রমে চড়াই করে উঠ্‌তে লাগলাম। কালবৈশাখীর আকাশ পূর্ব্বেই মেঘে আবৃত হয়েছিল, আমরা ৫ মিনিট চলতে না চলতে প্রবলবেগে বৃষ্টি সুরু হল। বৃষ্টি কমে গেলে আমরা আবার চড়াই সুরু করলাম। চড়াই কাকে বলে, এখানে প্রথম তা অনুভব হ'তে লাগলো। পূর্ব্বে "চড়াই" "উৎরাই" কথা শুনতেই প্রাণ কেঁপে উঠত; এখন তা প্রত্যক্ষ অনুভব করতে লাগলাম। চন্দ্রনাথপর্ব্বত প্রভৃতি ছোট ছোট পাহাড় চড়তে যেমন সোজাসুজি উপরদিকে উঠে শৃঙ্গটী লঙ্ঘন করে অপর পাশে উৎরাই করতে হয়, হিমালয়ের চড়াই-উৎরাই সেরূপ নয়। ওরকম ভাবে চড়াই-উৎরাইকে "পাকদণ্ডী" বলে। হিমালয়ের ভিতর যথেষ্ট পাকদণ্ডী আছে, তবে সে রাস্তাগুলি পাহাড়ীরাই ব্যবহার করে থাকে; কেবল মাত্র গঙ্গোত্তরী হতে ত্রিযুগী নারায়ণে আসতে এবং যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্তরীর রাস্তায় আসতে খুব বড় দু'টী পাকদণ্ডীর রাস্তা পাওয়া যায়। অন্যান্য সব রাস্তাই নদীর ধার দিয়ে ক্রমে চড়াই হয়ে গেছে; সে চড়াই পাকদণ্ডীর মত কষ্টকর নয়।

সাধু সন্ন্যাসীদের মুখে শুনা যায়, পূর্ব্বে যাঁরা কেদার-বদরী দর্শনে হিমালয়ে অভিযান করতেন, তাঁরা হরিদ্বারে উপস্থিত হলে, তাঁদের কষ্টসহিষ্ণুতার পরীক্ষা করা হত। পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হতেন, তাঁদেরকে জীবনধারণোপযোগী ফল-মূল চিনিয়ে দেওয়া হত। আজকাল হিমালয়ের পথ মহাপুরুষদের কৃপায় রাজপথে পরিণত হয়েছে। স্থানে স্থানে পাহড়ের গা দিয়ে ক্রমে উপরে উঠ্‌তে হয়, কোন রাস্তা ঠিক খাড়া, কোথাও বা খানিকটা সমতল রাস্তাও পাওয়া যায়। উপত্যকার রাস্তাগুলি প্রায়ই সমতল। প্রথম প্রথম অনভ্যাসহেতু ক্রমোচ্চ চড়াই হলেও চড়াই করতে আমাদের কষ্ট হত—বুকে যাতনা হত এবং পা যেন অসাড় হয়ে যেত। লাঠিতে ভর দিয়ে চললে কষ্ট অনেকটা কম হয়। উৎরাই করবার সময় আরও বিশেষ সাবধানে নামতে হয়। চড়াইর চেয়ে উৎরাই বেশী কষ্টকর। মনে হয় যেন কেউ উপর থেকে ধাক্কা মেরে নামিয়ে দিচ্ছে, পা দুটী অচল অবশ হয়ে যায়, কোমর ধরে যায়। আবার একটু অসাবধান হলে মুখ থুব্‌ড়ে পড়বার সম্ভাবনা।

অল্প ক্ষণ চলবার পরেই বাঁ হাতে একটী রাস্তা গাড়োয়ালের রাজধানী "টিহরী" পর্য্যন্ত গিয়েছে, আমরা গঙ্গার পারের রাস্তা দিয়ে ক্রমে চড়াই করতে করতে লছমনঝোলার উপরের পাহাড়ে চড়ে একবার প্রাণভরে হৃষীকেশ, স্বর্গাশ্রম, কৈলাসাশ্রম, হরিদ্বার প্রভৃতি শেষ দেখা দেখে মনে মনে প্রণাম করে চলতে লাগলাম। পাহাড়ের উপর সমতলভূমিতে খানিকক্ষণ চলবার পর আবার উৎরাই। এ উৎরাইয়ে কোন কষ্ট নাই; রাস্তায় সিঁড়ি আছে। আমরা সিঁড়ি বেয়ে নেমেই সামনে লক্ষ্মণজীর মন্দির পেলাম। এই জায়গার নাম লছমনঝোলা। তখন বেলা ৩॥০ বেজে গেছে। পূর্ব্বে এই লছমনঝোলা পার হতে পারলেই

লছমন ঝোলা
১॥ মাইল

কেদারবদরী দর্শনে আর কোন বাধা থাকত না বলে প্রবাদ আছে। বাস্তবিকপক্ষে লছমনঝোলার পূর্ব্ব ইতিহাস যেরূপ বিবৃত আছে, তাতে কেউ লছমন-ঝোলা পার হতে পারলেই সে স্বর্গে যাবার অধিকার পেয়েছে বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়। এখন কিন্তু সে ঝোলা বা গঙ্গার সে উদ্দণ্ড নৃত্য মোটেই নাই। রামানুজ লক্ষ্মণ নাকি এই ভীষণ স্থান পার হবার জন্য দুগাছি লোহার সুদৃঢ় শিকল পর্ব্বতের মধ্যদেশে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। কালে লৌহার শিকল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দুগাছি দড়ি খুঁটীতে বেঁধে দেওয়া হয়। ঐ দুটী দড়ি হতে বিলম্বিত ছোট ছোট দড়িতে আবদ্ধ কতকগুলি কাঠের মই ঝুলান থাকত। মইয়ের উপর পা দিয়ে দু'হাতে দু'গাছি দড়ি ধরে লোক পারাপার হত। ঝোলার উপর উঠ্‌লেই ঝোলা এমন ঝুল দিতে থাকত যে, তাতে পড়ে যাবার ভয় ছিল। কত লোক পড়ে গিয়ে মারাও যেত। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার স্বনামধন্য শেঠ রায়বাহাদুর সূরযমল শিবপ্রসাদ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা তাঁর মাকে নিয়ে বদরিকাশ্রমে যেতে, যাত্রীদিগের পারাপারের বিশেষ অসুবিধা দেখে মায়ের আদেশে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটী সুদৃঢ় লোহার সেতু তৈরী করে বদরিকাশ্রম যাত্রীর আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করেছেন। ১৩৩২ সনের আশ্বিন মাসের প্রবল বন্যা উক্ত সেতু, লছমনঝোলার দু'পাশের পাহাড়, গ্রাম, চূর্ণবিচূর্ণ করে স্বর্গাশ্রম, হৃষীকেশ, হরিদ্বার প্লাবিত করেছিল; বহু সাধু-সন্ন্যাসীও সেই বন্যায় ভেসে যান। লছমনঝোলার দুপাশ ধসে যাওয়ায় ভাগীরথী প্রশস্ত হওয়াতে এখন আর তেমন স্রোত নাই। পারাপারের জন্য শেঠবাহাদুরের খরচে ৫০ খানা বড় বড় নৌকা চলছে। পুলটী তৈরী করবার জন্য আবার কাজ সুরু হয়েছে। (ক্রমশঃ)

শিক্ষাপ্রসঙ্গে

—*—

শারীর-চর্চ্চার মাঝে যেমন একটা সৌষ্ঠবের দিক আছে, তেমনি একটা সামাজিক যোগ্যতা অর্জ্জনের পথও আছে। স্পোর্ট ইত্যাদিতে আনন্দের আয়োজন আছে বটে, কিন্তু মানুষ তো শুধু আনন্দের মধুপান করেই বেঁচে থাকতে পারে না। সমাজের প্রগতি করতে হলে হাতে-পায়ে খাটতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে অধুনা ভদ্রতার একটা সগোত্র সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে এবং ভদ্রতার সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমের একটা অহিনকুল সম্বন্ধ। এটা স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত নয়। সমাজ যতই জটিল হয়ে এসেছে, ততই বাধ্য হয়ে তাকে শ্রম-বিভাগ করতে হয়েছে এবং তার ফলে এক শ্রেণীর লোক পুরুষানুক্রমে শুধু মানসিক পরিশ্রম করে যেমন দেহকে অপটু করেছে, তেমনি আর এক শ্রেণীর লোক শুধু কায়িক পরিশ্রম করে করে মনকে জড় করে ফেলেছে। এটা কি সমীচীন? আজকাল আমাদের মন এতই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে, যারা শিক্ষিত, তারা যে নিজহাতে কোদাল ধরবে, লাঙ্গল ঠেলবে, দাঁড় টানবে—এ যেন আমরা কল্পনাই করতে পারি না। আবার শিক্ষিতদের আরামপ্রিয়তার দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে কৃষক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, আমার তো চিরটা কাল খাটতে খাটতেই গেল, কিন্তু আমার ছেলেকে যাতে এই খাটুনী না খাটতে হয়, তার ব্যবস্থা করে যাব, তাকে লেখা-পড়া শেখাব!

আজকাল হাওয়া একটু ফিরেছে বটে। শিক্ষিতদের মাঝেও হাতে-হেতেড়ে যতটা না হোক, অন্ততঃ কাগজে-কলমে কৃষি, শিল্প ইত্যাদি উপলক্ষ্যে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা অন্নসংস্থান ও দেশের ধনবৃদ্ধির কথা আলোচিত হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি; তেমনি নিম্নশ্রেণীর মাঝেও শিক্ষার বিস্তার করে তাদের মানসিক জড়ত্ব দূর করবার জন্য একটু-আধটু চেষ্টা চরিত্র হচ্ছে। একে শুভ লক্ষণ বলতে হবে বটে। অবশ্য আভিজাত্যের একটা সম্মান বা গৌরব-বোধ মানুষের মাঝে থাকবেই, এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা থাকাও প্রয়োজন; কিন্তু তা হলেও শিক্ষিত-সমাজের মাঝে 'চাষা' এবং 'মজুর' এ দুটো কথা যে কেন গাল বলে গণ্য হবে, তার কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তিই তো খুঁজে পাওয়া যায় না। কায়জীবীদের যদি সমাজের নিম্নতম ধাপে স্থানে দিই, আর বুদ্ধিজীবীদের স্থান দিই সবার ওপরে, তবুও সমাজে এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার, যাতে যাঁরা মাথার ওপরে আছেন, তাঁরা জীবনটা সুরু করেন পায়ের তলা থেকেই। আমি এম্-এ ক্লাশে উঠেছি ধাপে ধাপে; আমার ছেলে যে একেবারেই এম্-এ ক্লাশের বিদ্যা নিয়ে জন্মাবে, তা নয়। তার যতই বুদ্ধি. প্রতিভা থাক্ না কেন, তাকেও সেই গোড়ার ক্লাশ থেকে সুরু করতে হবে। সমাজেও তেমনি যাঁরা অভিজাত, তাঁদেরও শিক্ষার মাঝে অনভিজাতের সাহচর্য্য ও তাদের জীবন-যাত্রার অনুসরণের ব্যবস্থা থাকা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেই প্রয়োজন। সমাজে সবাই একাকার হয়ে যাবে, এমন অসম্ভব আশা অবশ্য পোষণ করি না; কিন্তু যে বয়সটায় নাকি রাজার ছেলে আর ভিখারীর ছেলের মাঝে মানুষের স্পষ্ট ভেদগুলি মারাত্মক হয়ে প্রকাশ পায় না, সেই সময়টায় তারা একই স্তরে থেকে শিক্ষা পাবে না কেন?

বলা বাহুল্য, ঋষির আশ্রমের শিক্ষায় এই আদর্শটাই জাজ্জ্বল্যমান ছিল। ঋষির জীবন অনায়াস-স্বাবলম্বীর জীবন—তাতে প্রাকৃতিক সরলতা আছে, মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। অপক্ষপাতে তিন বর্ণের শিশুই যদি স্বভাবের এই অবারিত ক্ষেত্রে সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের উন্মেষক শিক্ষায় লালিত-পালিত হয়, যদি তারা হলকর্ষণ, বয়ন, সমিধ্-সংগ্রহ ইত্যাদি জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত হয়, তাহলে সমাজের সবাই দ্বিজ হয়ে যায়—পরিচর্য্যাকারী শূদ্ররূপ চতুর্থবর্ণের আর অস্তিত্বই থাকে না। আর সেই হয় যথার্থ আর্য্য-সমাজ, খাঁটী গাণতন্ত্রিক সমাজ। যে সমাজেই বেশী পরিমাণে শূদ্রের সৃষ্টি হবে, সেই সমাজই দ্রুত অধঃপতনের দিকে যাবে, এ হচ্ছে বিধির বিধান। আজ আমাদের এই আর্য্যভূমি শূদ্রে ভরে গেছে; একে আর তাহলে আর্য্যভূমি না বলে অনার্য্য-ভূমি বলাই উচিত নয় কি? এই শূদ্রেরা পরিচর্য্যা বা কায়িক পরিশ্রমমাত্র নিয়েই আছে; আর্য্যেরাই বলবেন, তাদের মন তমোগ্রস্ত, তারা হীন। দেশে এই তমোভাবের প্রাবল্য দেখেও আভিজাত্যের তুঙ্গশৃঙ্গে বসে আত্মপ্রসাদ অনুভব করার মাঝে কি কোনও নির্লজ্জতাই নাই? একশ্রেণীর লোক যদি সবরকম কায়িক পরিশ্রম বর্জ্জন করেই চলে এই অজুহাতে যে, তারা সমাজের মানসিক পরিশ্রমের দায়িত্ব নিয়ে আছে, তাহলে সেটা মিথ্যাচরণ হয় না কি? যারা শিক্ষিত ও অভিজাত, তাদের মানসিক পরিশ্রমের ফলে সমাজের কতটুকু উন্নতি হচ্ছে যে তারা কায়িক পরিশ্রমটা অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? খেতে-পর্‌তে সকলকেই হবে; সুতরাং চাষী-মজুরকে বাদ দিয়ে একদিনও চলবে না; অথচ আজ যারা শিক্ষা ও আভিজাত্যের গর্ব্বে শ্রমবিমুখ হয়ে পরের উপার্জনে পেট ভরাতে লজ্জাবোধ করছে না, তাদের বারোআনা বাদ দিলেও বোধ হয় সমাজ চলবে। সমাজের জন্য মাথাও খাটাতে হবে, শরীরও খাটাতে হবে। যারা শরীর খাটাচ্ছে, তাদের কিন্তু একদিনের দরুণ নিষ্কৃতি নাই; এ ক্ষেত্রে যারা শরীরও খাটাবে না, মাথাও খাটাবে না, তাদের নিলর্জ্জতাকে লজ্জিত করবার মত ভাষা অভিধানে নেই। আমাদের দেশের চাষী-মজুরেরা প্রাণের দায়ে খাটে, অথচ বেচারীদের বুদ্ধির উৎকর্ষের দরুণ কারু মাথা-ব্যথা নেই। আর দেশের শিক্ষিতেরা ও অভিজাতেরা অনেক সময় বনেদী সমাজ-ব্যবস্থার ফলে বুদ্ধি-পূর্ব্বক তাদের ঠকিয়ে খায়। এই বিসদৃশ ও প্রজা-ক্ষয়কর ব্যবস্থার প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন।

কৃষি, পশুপালন, বয়ন, স্থপতিবিদ্যা, পূর্ত্তকর্ম্ম, গৃহ-কর্ম্ম ইত্যাদি প্রত্যেক বিদ্যার্থীরই অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত। কেননা এ গুলোও বিদ্যা—বরং প্রাণধারণের হেতু বলে এরা মুখ্য বিদ্যা; বই মুখস্থ করাটা আবশ্যক হলেও আপাতত গৌণ। অথচ আমাদের অধীতব্যের তালিকায় এগুলোর নাম উঠে না। বিদ্যালয় বলতে শুধু ইস্কুলই বুঝছি না। বাড়ীও বিদ্যালয়। প্রত্যেক ইস্কুলে ফুটবল-ক্লাব থাকে, হকি-টীম থাকে; তেমনি শাকসব্জী উৎপাদনের দরুণ কৃষিক্ষেত্র থাকে না কেন? ইস্কুলের সৌষ্ঠব বাড়াবার দরুণ বাগান থাকে; কিন্তু সে বাগানের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয় উড়ে মালী; এটা অন্যায়। ইস্কুলের বাগানও ছেলেদের; তারাই তা পরিষ্কার করবে; ইস্কুলের পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করবে। কোনও কোনও ইস্কুলে বয়নের প্রচলন হচ্ছে, ভাল কথা। কিন্তু আরও অনেক কিছু চাই। ছেলেরা আজন্ম-কাল কেবল কলমকাটা ছুরীই ব্যবহার করতে জানে, তাও আবার সকলে জানে না। দা, কুঠার ধরতে জানে কয়জন? খড়-বাঁশ দিয়ে একটা

সামান্য খড়ো-ঘর তুলতেও কি শিখতে পারে না? যেমন নাকি মিউনিসিপালিটীর এরিয়াতে সমস্ত পূর্ত্তকর্ম্ম তাদের দায়িত্বেই নির্ব্বাহ হয়, তেমনি গ্রামের ইস্কুলেরও একটা মিউনিসিপাল এরিয়া থাকা প্রয়োজন; এর মাঝে রাস্তাঘাট বাঁধা, নালা-নর্দ্দমা পরিষ্কার করা ইত্যাদি পূর্ত্তকর্ম্ম সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে ছেলেদের দিয়ে বেশ করানো যেতে পারে। আর তাদের তরুণ প্রাণই এ বিষয়ে যথার্থ ভাবে হয়ে উঠতে পারে। একটু বড় হয়ে যখন পলিটিক্সের বুলি শিখবে, তখন মনের মাঝে ঘুণ ধরবে, তখন আর এ সব কাজে হাত-পা সরবে না। ইস্কুলে-ইস্কুলে সরস্বতী-পূজার কি ধুম লেগে যায় দেখি—ছেলেদের কি বিপুল উৎসাহ, কি অসাধারণ শ্রমশক্তি! এই উৎসাহটুকুই আর কলেজের ছেলেদের মাঝে দেখা যায় না—তারা অভিজাত হয়ে গেছে। ইস্কুলের ছেলেদের এই সঞ্চিত শক্তিটুকু সুষ্ঠুভাবে চর্চ্চিত হলে তাদের দিয়ে পল্লীসংগঠনের কত কাজ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে! এ বিষয়ে দেশের শিক্ষাবিভাগের দৃষ্টি পড়া উচিত। যেমন লেখাপড়া শিখবে, তেমনি হাতে-হেতেড়ে কাজ করতেও শিখবে; দুটাই বাধ্যতামূলক হবে এবং ইস্কুলের কারিকিউলামের অন্তর্ভুক্ত হবে—এ ব্যবস্থা করা শিক্ষাবিভাগের উচিত নয় কি? চাষার ছেলে কত রকমে বাপ-মাকে সাহায্য করে গৃহস্থালীর একটা আয়ের সংস্থান করে। আর আমাদের এই গরীব দেশ; অথচ এর কাজের জের জমেছে কত! এখানে আমাদের ছেলেদের সামনে কেবল ভারতবর্ষের ম্যাপটা মেলে না ধরে জীবন্ত দেশটাকে সামনে ধরে, তার দরদে তাদের উদ্বুদ্ধ করে দেশের দরুণ খাটতে শেখানোটা কি শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তব্য নয়? জার্ম্মানীর যখন-দেশের কাজে সৈন্যের প্রয়োজন হয়েছিল, তখন ইস্কুলে-ইস্কুলে মিলিটারী ট্রেনিং বাধ্যতামূলক করেছিল। আমাদেরও এখন দেশের কাজে সব চেয়ে প্রয়োজন—কোদাল, কুঠার, দা, কাস্তে, লাঙ্গল, তাঁত ইত্যাদির। এই সমস্ত প্রহরণ ব্যবহারের শিক্ষা কেন ইস্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলক করা হবে না, তার তো কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

বাড়ীতেও আমাদের ছেলেরা কায়িক-পরিশ্রম সম্বন্ধে কত উদাসীন ও উচ্ছৃঙ্খল! গৃহস্থালীর অধিকাংশ কাজ পড়ে দাস-দাসীর ওপর, অথবা গরীব গৃহস্থ হলে বাড়ীর মেয়েদের ওপর। ছেলে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কিছুক্ষণ পড়া মুখস্থ করল, নয়ত হল্লা করল, মারামারি করল, তারপর তাড়াতাড়ি কাকস্নান সেরে নাকেমুখে দুটো গুঁজে বই বগলে লাফাতে লাফাতে ইস্কুলে চলে গেল। তার মা-বোন-বৌদি এঁরা তার ঘর ঝাঁট দেবেন, বিছানা ঝাড়বেন, পড়ার ঘর গুছিয়ে রাখবেন, খাবার জোগাড় করবেন, স্নান করে কাপড়খানা ফেলে গেছে তা কাচবেন, এঁটো বাসন মাজবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এর সবই যে কেবল মেয়েদের কর্ত্তব্য, ছেলেদের নয়, এটা আমাদের একটা মজ্জাগত সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এটা কি সঙ্গত? অবশ্য আমি সাফ্রেজিষ্টদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ওকালতী করছি না; বিশুদ্ধ আর্য্য রীতিনীতির দোহাই দিয়েই বল্‌ছি—যে ছেলে নিতান্ত কচি খোকা নয়, ফুটবলে বেশ কসে কিক্ মারতে পারে এবং অষ্টম হেন্‌রীর রাণীদের নাম মুখস্থ বল্‌তে পারে, সে ছেলে কেন তার পূজনীয়া গুরুজনকে দিয়ে কাপড় কাচিয়ে এঁটো সারিয়ে বাসন মাজিয়ে নেবে, তা তো বুঝ্‌তে পারি না। স্নেহাতুরা জননীরাও এতে কোনও দিন আপত্তি করেন না, চিরাভ্যাসবশতঃ এর অকল্যাণ এবং অসঙ্গতি হয়ত তাঁদের নজরেই আসে না। মনুষ্যত্বের বিচারেই শুধু নয়, হিন্দুয়ানীর দিক দিয়েও তো এটা আমাদের কাছে

অন্যায় ঠেকে। স্ত্রী স্বামীর সেবা করবে, এটা বুঝি; কিন্তু ছেলে কেন মায়ের সেবা করবে না, গৃহস্থালীর কাজে মাকে সাহায্য করবে না, তা বুঝি না। যে কাজগুলির ওপর কারু ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে, সেগুলো কি ছেলে কি মেয়ে সকলের নিজেই করা উচিত। পুথি-পত্র গুছিয়ে রাখা, ঘর-দোর কাপড়চোপড় পরিষ্কার করা, এঁটো বাসন-কোসন পরিষ্কার করা এগুলো ছেলেদের নিজ হাতে করতে দেওয়া উচিত। রান্না-বান্না, সেলাই ইত্যাদি মেয়েদের বিশেষ কাজ বটে, কিন্তু এতেও ছেলেদের হাত পাকিয়ে রাখা উচিত। মেয়েরা তাদের পাকের কাজ করেও নিরর্থক ছেলেদের অতিরিক্ত পরিচর্য্যা করে কেন তাদের অকর্ম্মণ্য করে তুলবে, তার কোনও হেতুই নাই। এর মাঝে কতকটা আছে গতানুগতিক রীতি আর কতকটা নারী-সুলভ স্নেহমূঢ়তা। কিন্তু তাতে যদি ছেলেদের শারীরিক ও মানসিক অবনতি ঘটে, তাহলে এ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন। ছেলেদের অকর্ম্মণ্য করে তুলবার সাধনায় মেয়েদের যে সময়টুকু যায়, সেই সময়টুকু বাঁচলে তারাও জ্ঞানানুশীলন করে জননীর কর্ত্তব্যকে আরও সুষ্ঠু-ভাবে বহন করতে পারত। ছেলেদের জ্ঞানচর্চ্চার পথ বাধামুক্ত রাখবার জন্যই যে মেয়েরা তাদের এমনি ভাবে পরিচর্য্যা করে, এটাও ঠিক কথা নয়। এ জায়গায় ছেলেরা মেয়েদের ফাঁকি দিচ্ছে। লেখাপড়ার অজুহাতে ছেলেরা যত সময় নষ্ট করে, সেটা তারা মেয়েদের জীবন হতে ঠকিয়ে নেয়। আর এই প্রবঞ্চনাটা এতদূর অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে এর দরুণ কোনও পক্ষই কোনও দিন এতটুকু পীড়া বা সঙ্কোচ অনুভব করে না। কিন্তু প্রবল দুর্ব্বলকে বেশীদিন তো ঠকিয়ে রাখ্‌তে পারে না—কালের খাতায় দেনার অঙ্ক জমতেই থাকে; শেষে কপালে করাঘাত আর ক্রন্দন ছাড়া আর কোনও উপায়ই থাকে না। স্ত্রী-শূদ্রকে আমরা ছোট ছোট কাজে বেঁধে রেখেছিলাম বড় বড় কাজ করবো বলে; যতদিন আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেছি, ততদিন এই বন্ধনে কোনও অকল্যাণের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু যখন হতে আমরা বড় কাজ, বড় চিন্তা ছেড়ে দিয়েছি, অথচ অভ্যাসবশতঃ ছোটর সেবাকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হইনি, তখন হতেই জীবনযাত্রায় আমরা পদে পদে বিড়ম্বিত হয়ে চলেছি। স্ত্রী-শূদ্র আমাদের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা রেখে এখনো অম্লান-বদনে আমাদের সেবা করছে বটে, এখনো তারা স্বধর্ম্ম হতে চ্যুত হয়নি, কিন্তু আমরা আমাদের গুরুত্ব হারিয়েছি, ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছি। এখন এই সেবাই আমাদের পক্ষে নেশার মত হয়ে দিন দিন রসাতলের দিকে আকর্ষণ করছে।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

—•—

সিটী-কলেজের যুদ্ধের অবসানে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছি। মিটমাটের সর্ত্ত নির্দ্দেশে হিন্দু ও ব্রাহ্ম, শিক্ষক ও ছাত্র, উভয় পক্ষই স্বীয় আত্মসম্মান ও ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অথচ পরমতসহিষ্ণু হইয়া বিশেষ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। ছাত্র ও শিক্ষকের ব্যাপারের মাঝে রাজনীতিকদের হাতে পড়াতে এবং তাঁহাদের ইন্ধন প্রক্ষেপে নৈপুণ্য ও তৎপরতা দেখিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম, বুঝি আবার কোথা হইতে একটা নূতন ফ্যাকড়া বাহির হইয়া ছাত্রদের নূতন করিয়া চেতাইয়া তোলে। সৌভাগ্যের বিষয়, সেরূপ কোনও ঘটনা এখন পর্য্যন্ত ঘটে নাই, ঘটিবার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। দুর্ব্বিনীত ব্যবহারের দরুণ ছাত্রেরা যে শিক্ষকের নিকট নতি স্বীকার করিয়া ক্ষমাপন চাহিয়াছে, ইহা শোভন হইয়াছে। অনাবশ্যক রূঢ়তার দরুণ শিক্ষকমণ্ডলীর দুঃখপ্রকাশও আচার্য্যের গৌরবকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। রামমোহন রায় হষ্টেলে পূজা করার অধিকার সম্বন্ধে ছেলেদের মাঝে যে সমস্ত অন্যায় আব্দার উস্কাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এই আপোষে তাহা নিয়া কোনও পীড়াপীড়ি হয় নাই, হিন্দুছাত্রেরা ব্রাহ্ম কর্ত্তৃপক্ষের ধার্ম্মিক সংস্কারকে আঘাত করে নাই, ইহাতে হিন্দুর স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্যই প্রকাশ পাইয়াছে। শেষ অঙ্কে সত্যাগ্রহের ব্যাপারটা একটা ছেলেমানুষীই হইয়াছে। একদিকে বারদৌলির সত্যাগ্রহ আর একদিকে সিটি-কলেজের সত্যাগ্রহ, সমসাময়িক এই দুইটী সত্যাগ্রহের হেতু ও স্বরূপের বিভিন্নতা আমাদের জাতীয় চরিত্রের সবল ও দুর্ব্বল দুইটা দিকই ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সত্যাগ্রহ খুব বড় জিনিষ—পাশবশক্তির প্রতিকূলে প্রযোজ্য অবিসম্বাদী আধ্যাত্মিক শক্তি বটে; কিন্তু যেখানে-সেখানে এই উপায় অবলম্বন করিলে সত্যাগ্রহের মান থাকে না—এ যেন কতকটা "গোসাঘরে" ঢুকিয়া খিল দেওয়ার মত হইয়া উঠে। অপর পক্ষকে উদ্বেজিত করিবার জন্য কিম্বা কাহারও ন্যায়সঙ্গত অধিকার খর্ব্ব করিতে সত্যাগ্রহ করা কায়িক হিংসার আমলে না আসুক, মানসিক হিংসার আমলে আসে বই কি; বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে এইরূপ উদ্বেগ সৃষ্টি করার চেয়ে সাধু ও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে নিজের প্রতিকূল ইচ্ছাকে জ্ঞাপন করা যাইতে পারে। সত্যাগ্রহী সত্যনিষ্ঠ, সঙ্কল্পে দৃঢ়, মৈত্রীসম্পন্ন, সহিষ্ণু—কিন্তু নিরুপায়; সে ফিকিরবাজ নয়। কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সৃষ্টি হওয়ার পর হইতেই অনেক স্থলে উহা ফিকিররূপে ব্যবহৃত হইয়া সত্যগ্রহের গৌরবহানি ঘটাইয়াছে।

*

সামাজিক ব্যাপারে আইন করিবার একটা হিড়িক আসিয়াছে যেন। সতীদাহ, বিধবা-বিবাহ অসবর্ণ-বিবাহ, সহবাস সম্মতি, যৌবনবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিবার জন্য আমরা পুনঃ পুনঃ রাজদ্বারে ধন্না দিয়াছি। সতীদাহ নিবারণের আইন যখন হয়, সে সময় দেশের যে অবস্থা ছিল, এখন নিশ্চয়ই দেশের সে অবস্থা নয়। আমরা এখন বিশেষ করিয়া সচেতন ও "আলোকপ্রাপ্ত" হইয়াছি, রাজা-প্রজার অধিকার বুঝিয়া নিতে শিখিয়াছি, বিদেশী গভর্ণমেণ্টের অভিভাবকত্ব অস্বীকার করিয়া নিজের সাবালকত্ব দাবী করিয়া থাকি। কিন্তু স্বদেশের সমাজ-সংস্কার করিবার দরুণ ইদানীং আমরা যেমন ঘনঘন বিদেশী রাজার আইনের শরণাপন্ন হইতে

যাইতেছি, তাহাতে আমাদের পৌরুষের সত্তা সম্বন্ধে সংশয় হয়। রাষ্ট্র ও সমাজ দুইই যদি এক কন্দ হইতেই উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে সামাজিক ব্যাপারে রাজার হস্তক্ষেপ করা দোষাবহ হয় না, বরং তাহা রাজার কর্ত্তব্যই বটে। হিন্দু-রাজা হিন্দু-প্রজার সমাজ-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে; ইংরেজ রাজা ইংরেজ-সমাজের রীতি-নীতি সংস্কারের দরুণ আইন করিবে, ইহা স্বাভাবিক। হিন্দুর রাজনীতিতে পড়ি, রাজা, প্রজার সামাজিক অধিকার কেন, ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া তাহার বৈয়ক্তিক অধিকারে পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, এবং ইহা আমাদের কাছে অশোভনও মনে হয় না। ব্যভিচার সম্বন্ধে হিন্দু-রাজার আইন—আর ইংরাজের আইন, দুইয়ে কত তফাৎ! পরস্পরের সম্মতি সত্ত্বেও ব্যভিচার করিলে হিন্দু-রাজা স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে দণ্ডিত করিতেন—ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া, সমাজের দিকে চাহিয়া; কিন্তু ইংরেজ রাজা সে ক্ষেত্রে কাহারও বৈয়ক্তিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না—এ কেমন রাজনীতি? অথচ ইংরেজ-রাজের এই নিরপেক্ষতাকেও আমরা দোষ দিই না; আমরা বলি, আমাদের ঘর আমরা সামলাইব, সেই ভাল; অপরাধীকে আমরা সামাজিক শাসনে, শাস্ত্রীয় শাসনে পীড়িত করিব, তাহার ধোপা-নাপিত বন্ধ করিব, গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইব। রাষ্ট্রের মূলে বিদেশীরাজ; আর আমাদের সমাজের মূলে স্বদেশী রাজ; আমাদের অন্দরের কারবারে অনাত্মীয় বিদেশীর হস্তক্ষেপ সহিতে যাইব কেন? রাষ্ট্রে আমাদের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু সমাজে আছে; সমাজের এই স্বায়ত্তশাসনকে রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিতে যাইব কেন? তারপর বর্ত্তমানে যে রাজনীতিক আন্দোলন চলিতেছে, তাহার মূল সুরটা এই, বৈদেশিক শাসনের শ্রেষ্ঠতা আমরা স্বীকার করি না, আমরা স্বায়ত্ত শাসন চাই। অথচ সামাজিক ব্যাপারে আমরাই যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বৈদেশিক শাসনের আনুকূল্য ভিক্ষা করিতে যাই, তখন প্রকারান্তরে তাহাদেরই শ্রেষ্ঠতা মানিয়া লই না কি? যে সময় স্বরাজ-সাধনা তুমুল হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময় সামাজিক আইনের দরুণ বিদেশী বঁধুর সাধ্য-সাধনাও চরমে চড়িয়াছে—এ এক বিচিত্র প্রহসন বটে!

*

সর্দ্দা এবং গৌড়ের বিল সম্প্রতি চাপা পড়িয়াছে; আপাততঃ কিছু দিনের জন্য হিন্দুসমাজ হিতৈষীর আপ্যায়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিল। লোকের যত চোখ ফুটিবে, দেশে শিক্ষার বিস্তার হইবে, ততই সামাজিক দুর্নীতি আপনা হইতে দূর হইয়া যাইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ চালাইবার এবং বহুবিবাহ রোধ করিবার দরুণ আন্দোলন করিয়াছিলেন; বিধবা-বিবাহের আইন হইল কিন্তু প্রস্তাবিত বহুবিবাহ রোধের আইন হইল না। তাহাতে কিছু ক্ষতি হইয়াছিল কি? লোকের রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং দেশের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহুবিবাহ আপনা হইতেই অদৃশ্য হইতে চলিয়াছে। সর্দ্দার যৌবন-বিবাহ বিলের সমর্থন করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, "দেশকে বাঁচাইবার জন্য এইরূপ আইন করা নিশ্চয়ই প্রয়োজন; অন্ততঃ যাঁহারা নারী-কল্যাণকামী, তাঁহারা ইহার আশু-প্রবর্ত্তন দেখিতে চান; সতীদাহ নিবারণের আইন কত নারীকে যে যমযন্ত্রণা হইতে বাঁচাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই"—ইত্যাদি। সামাজিক আইন-প্রবর্ত্তনের পক্ষে সতীদাহ নিবারণের আইনটা একটা মস্ত নজীর হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বোঝা যায়, দেশ

হইতে সতীদাহ প্রথা যে উঠিয়া গয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের আইনের গুণে নয়, সামাজিক পরিস্থিতির উৎকর্ষই তাহার হেতু। জোর করিয়া মানুষকে পোড়াইয়া মারার মত বর্ব্বরতা নিশ্চয়ই আমাদের প্রকৃতিগত ছিল না। নতুবা সতীদাহের রেওয়াজ আমরা এত সহজে বিস্মৃত হইতে পারিতাম না। আজকাল সতীদাহ নিবারণের আইন আমাদের কাছে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা মাত্র; সতীকে পুড়াইয়া মারিবার কল্পনাই তো আমাদের মনে জাগে না, আর সেই পোড়ানোকে বাধা দেওয়ার দরুণ কোথায় যে একটা আইন খাড়া হইয়া রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন তো নই-ই। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া সতীদের প্রাণ বাঁচাইয়া আসিতেছেন, এ কথাটা একেবারেই অতিরঞ্জিত। তর্কের খাতিরে বলা যাইতে পারে, স্বাভাবিক উপায়ে এই অত্যাচার দূর হইতে কিছু সময় লাগিত, অন্ততঃ সেই সময়টুকুর মাঝে তো কতগুলি সতীর প্রাণ গভর্ণমেণ্ট বাঁচাইয়াছেন, তাহাই বা কম কিসে? একটী প্রাণ বাঁচানও নিশ্চয়ই পুণ্যের কাজ এবং গভর্ণমেণ্ট এ ক্ষেত্রে যে প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, সে কথা স্বীকার করিতে কোনও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু তাহাতে সামাজিক আইন-প্রণয়নের মূলনীতি সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য বিচলিত হয় না। একটা আইন প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে যাহাদের উপর সেই আইন প্রযুক্ত হইবে, তাহাদের মনোভাব, সংস্কার, পরিস্থিতি প্রভৃতি বিচার করিয়া দেখিতে হইবে; নতুবা মানুষের গড়া আইন মানুষকে কখনও বাঁধিতে পারিবে না। দেশ শুদ্ধ সব মেয়েই সতী হইয়া পুড়িয়া মরিত না, কিন্তু বিবাহ বলিতে গেলে সব মেয়েকেই করিতে হইবে; পুড়িয়া মরা আর বিবাহ করা, দুইটার গুরুত্বও এক নয়, সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের ব্যগ্রতারও তারতম্য ঘটিবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সতীদাহ নিবারণ আইনের নজীর খাটাইবার পূর্ব্বে এই বিষয়গুলি চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

*

শিক্ষায় মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তিকে উন্নত না করিতে পারিলে আইন করিয়া সুদূরপ্রসৃত কোনও সামাজিক প্রথার সংস্কার বা উচ্ছেদ সমীচীন নয়। বিধবা-বিবাহের খুব সরাসরি আইন করা হইল; কিন্তু অভিজাত হিন্দুনারীর মনোবৃত্তি ভোগকামী হইল না বলিয়া সে আইন বাতিল হইয়াই রহিল। যে যৌন ব্যভিচার নিবারণের দরুণ সহবাস-সম্মতির আইন পাশ করা হইয়াছিল, সমাজে এখনও সেই ব্যভিচার বজায় থাকা সত্ত্বেও আইনের কবলে একটী লোকও এ পর্য্যন্ত পড়িল না। কোকেন, আফিং প্রভৃতির গোপন ব্যবসা রোধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী গোয়েন্দা-বিভাগই খাটাইতেছেন, তবুও মানুষের নেশা করিবার সহজাত প্রবৃত্তি আইনকে ফাঁকি দিবার দরুণ কত যে অচিন্তিতপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মেয়েদের অকাল-মাতৃত্ব নিবারণ করিবার দরুণ যৌবনবিবাহ-আইনই না হয় পাশ হইল; কিন্তু মানুষ যদি অস্বাভাবিক যৌন লালসাকে সংযত করিবার শিক্ষা না পায়, তাহা হইলে বিবাহরূপ একটা সামাজিক আচার আইনের জোরে বন্ধ করিয়া দিলেই যৌন ব্যভিচার নিবারিত হইবে? ইউরোপে বাল্যবিবাহের রেওয়াজ না থাকাতে বিবাহের পূর্ব্বেই যে সমস্ত যৌনব্যভিচার ঘটিতে থাকে, আমাদের সমাজেও যে তাহা না ঘটিবে, তাহার নিশ্চয়তা আছে কি? আকালিক যৌন ব্যভিচারের দরুণ নারীকেই ভুগিতে হয় বেশী, সে কথা স্বীকার করি; কিন্তু মোটের উপরই আমরা স্ত্রী পুরুষ উভয়েই যৌনসম্পর্কে যে কতটা নামিয়া আসিয়াছি, পল্লীসমাজের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আইনকর্ত্তারা

তাহা মালুম করিয়াছেন কি? যে সমাজে "অরক্ষণীয়া মেয়ে" বলিতে নারীর আকাঙ্ক্ষাকে সূচিত না করিয়া হীনবৃত্তি পুরুষের লুব্ধ-দৃষ্টির কথাই শঙ্কাতুর পিতামাতার মনে জাগাইয়া দেয়, সে সমাজে বাল্যবিবাহ রোধ করিলেই কি দেশের যৌনসমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে? স্নেহের দুলালী কন্যাও পিতামাতার "দায়" হইয়া উঠে কেন? পুরুষের লোলুপতাই ইহার জন্য দায়ী নহে কি? পুরুষের এই লোলুপতাকে অব্যাহত রাখিয়া আইন গড়িলেই কি সব দিক রক্ষা হইবে? তাহার চেয়ে নারীর সুশিক্ষার ব্যবস্থা, তাহার আত্মসম্মান জ্ঞান ও তেজস্বিতাকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা, পুরুষের ও নারীর সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা—এইগুলিরই আগে প্রয়োজন নয় কি?

*

তা ছাড়া আমাদের মনে হয়, এই প্রসঙ্গে আইনকর্ত্তারা একটা পারিভাষিক গোলমালেও পড়িয়াছেন। ইংরেজের দেশে যৌবনবিবাহ প্রচলিত থাকায় এবং বিবাহ-ব্যাপারের পেছনে বহু যুগের পরম্পরাগত শাস্ত্রের অনুশাসন ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের প্রেরণা সুস্পষ্ট না থাকায় marraige ও consummation of marriage সমার্থক। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমাজে দাম্পত্য সম্বন্ধ যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ পোষণ করিবার কোন অবকাশ থাকে না। কিন্তু হিন্দুর কাছে বিবাহ আর সম্ভোগ তো একার্থক নয়; বিবাহ হইলেই যে সম্ভোগেরও যোগ্যতা ও অধিকার জন্মিল, এ কথা তো হিন্দু বলে না। অপরাপর দেশে যৌন ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার আন্দোলন এই সেই দিন মাত্র আরম্ভ হইয়াছে; চিরকালই সেখানে এ সম্বন্ধে সমাজ স্ত্রী-পুরুষকে অবাধ স্বাতন্ত্র্য দিয়া আসিয়াছে। বিশেষতঃ ইউরোপের মিথুন-পরিবার প্রথা যৌনস্বাতন্ত্র্যকে সামাজিক শাসন দ্বারা সঙ্কুচিত করিবার কোনও অবকাশই রাখে নাই। কিন্তু হিন্দুর বিবাহবিধি তো একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়; সমাজ ও ধর্ম্মই সেখানে মুখ্য, ব্যক্তি গৌণ। বাগ্‌দান, বিবাহ, দ্বিরাগমন, গর্ভাধান, পুংসবন—সমস্তই সেখানে এক বিবাহব্যাপারেরই অন্তর্গত এবং পদে পদে ধার্ম্মিক, সামাজিক ও পারিবারিক বিধি-নিষেধ দ্বারা শাসিত। যৌনবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ পুত্র ও বধূকে গৃহাধিষ্ঠাত্রী জননী পদে পদে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, এরূপ ব্যাপার এখনও হিন্দুর সমাজে একান্ত বিরল হইয়া যায় নাই। পূর্ব্বের অনেক বিধানই এখন হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু ইহার পেছনে যে বহু যুগের অভিজ্ঞতা, সুচিন্তা, সামাজিকতা ও আধ্যাত্মিকতা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার প্রতি অন্ধ হইয়া সরাসরি আইন করাটা দূরদর্শিতার পরিচয় নহে। পূর্ব্বতন বিধির যে সমস্ত অঙ্গ বিকল হইয়া পড়িয়াছে, সাধ্য হইলে দেশীয় উপায়ে চিকিৎসা দ্বারা সেই সমস্ত অঙ্গে বলাধান করিয়া একটা বিধিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কর। যদি আধুনিক জগতের সহিত অনিবার্য্য সংঘর্ষের ফলে পূর্ব্বের বিধি বজায় রাখা বা তাহার পুনর্গঠন সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে নূতন পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইবার ভার সমাজের মার্জ্জিত বুদ্ধির উপরই ছাড়িয়া দাও, সব দিক না বুঝিয়া জবরদস্তী একটা আইন পাশ করাইয়া নিজের পায়েই কুঠার মারিবার ব্যবস্থা করিও না।

*

বাংলার একটী প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকে বাংলারই একজন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের আচরণের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমরা ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছি। পণ্ডিত-মহাশয় মহাপ্রভুর কতিপয় আচরণের কথা উল্লেখ

করিয়া বলিতেছেন, "সে সব আচরণ সাধারণের শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয় নহে।" সাধারণভাবে ধরিতে গেলে ঐ কথায় অবশ্য কাহারও ক্ষোভ হইবার কিছু নাই। কারণ, মহাপ্রভুকে যাঁহারা ভগবান বলিয়া মানেন, তাঁহার আচরণের আলোচনায় তাঁহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুব্ধ হওয়ায় কথা। তাঁহারা মহাপ্রভুর আচরণকে সাধারণ আচরণের মধ্যে গণ্য না করিয়া লীলা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। লীলা কাহারও শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয় নহে, পরন্তু উহা আস্বাদনীয়। "ভজন্তে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"—এই কথাতেই লীলার স্বরূপ ও ফল ব্যক্ত হইয়াছে। যিনি লীলাময়, লীলা তাঁহার পক্ষে ক্রীড়া মাত্র; ক্রীড়া যেমন সহজ ও স্বচ্ছন্দ, দোষ-গুণের অতীত, লীলাও তাই। অথচ স্বভাবের এই সহজ প্রকাশ ভাবুকের চিত্তে জাগায় লীলাময়ের প্রতি তৎপরতা বা আকর্ষণ। এইজন্য লীলা বিশেষ করিয়া আস্বাদনের বস্তু। কাহাকেও শিক্ষা দিবার বা অনুকরণে প্ররোচিত করিবার মত আচরণ তাহা নয়। সুতরাং মহাপ্রভুর স্বগণকে যদি কেহ বলে, মহাপ্রভুর অমুক আচরণে শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয় কিছু নাই, তাহা হইলে তাহাতে তিনি অবশ্য ক্ষুব্ধ হইবেন না। যে চরিতামৃতের উক্তি উল্লেখ করিয়া মহাপ্রভুর আচরণের আলোচনা হইয়াছে, তাহার প্রণেতাও মহাপ্রভুর কার্য্যাবলীকে লীলারূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাপ্রভুকে না ভালবাসিতে পারিলে, তাঁহাকে আপনজন বলিয়া না জানিতে পারিলে তাঁহার লীলা আস্বাদন করিয়া অপ্রাকৃত সুখোদয় সকলের না-ও হইতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভুর আচরণ শিক্ষনীয় নহে, এই কথার অর্থ যদি হয় "অতএব তাঁহার আচরণ সমালোচ্য", তাহা হইলেই কথাটার বাড়াবাড়ি হয়। আমাদের মনে হয়, পণ্ডিতমহাশয় মহাপ্রভুর কতিপয় আচরণ উল্লেখ করিয়া যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে নিরপেক্ষ আলোচনার সুর না ফুটিয়া প্রতিকূল সমালোচনা বা খণ্ডবুদ্ধিই বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিতমহাশয় সম্প্রতি মহাপ্রভুর তিনটী আচরণ উল্লেখ করিয়া তাহার সমালোচনাক রিয়াছেন—"(১) গঙ্গাতীরে পূজানিরত কুমারীগণের নৈবেদ্য বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া ভোজন (২) দুই বার বিবাহ (৩) দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের সহিত বিচার।" এই তিনটী আচরণের মাঝে দিগ্বিজয়ীর সহিত বিচার সম্পর্কে পণ্ডিতমহাশয় যে বিচার করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। একই শ্লোকের দোষ-গুণ বিচার করিয়া খণ্ডনমণ্ডনের যথেষ্ট উদাহরণ অলঙ্কারিকদের গ্রন্থে আছে, সুতরাং একদল লোক যেমন মহাপ্রভুর পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন, অপর দল তেমনি দিগ্বিজয়ীর পক্ষ লইয়াও তর্ক করিতে পারেন। তর্কবিতর্ক দ্বারা যেখানে লীলার মাহাত্ম্য যাচাই কবিতে হয়, সেখানে ভাবুকের পক্ষে তর্কের পথ ছাড়িয়া দেওয়াই শ্রেয়স্কর। পণ্ডিত মহাশয়ের সম্ভাবন অনুসারে "পণ্ডিতমোহন লীলা" যদি কিম্বদন্তীই হয় এবং চরিতামৃত হইতে বাদও পড়ে, তাহাতেও লীলারসিকের বিশেষ দুঃখ করিবার কিছু থাকিবে না। কিন্তু অপর দুইটী আচরণ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। মহাপ্রভুর নৈবেদ্য-ভক্ষণরূপ আচরণ সাধারণের শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয় হইবার সম্ভাবনাই যে কোথায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মহাপ্রভু তখন শিশু; তাঁহাকে যদি সাধারণ শিশু বলিয়াই মনে করি, তবুও তাঁহার আচরণ তো বয়স্কদের শিক্ষা বা অনুকরণের আমলে আসিতে পারে না। কে কোথায় শিশুর আচরণকে শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয় বলিয়া মনে করে? শিশুর আচরণ শিশুর কাছে শিক্ষণীয় না হউক অনুকরণীয় বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু চৈতন্যদেবের এই শৈশব

আচরণের আলোচনা করেন বয়স্ক ব্যক্তিরা, শিশুরা নয়; বয়স্ক ব্যক্তিরা এই আচরণের আস্বাদন করিয়া মহাপ্রভুর প্রতি বাৎসল্যরসে গলিয়া যান; ইহা তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয় তো নয়ই, তাঁহাদের শিশুদের পক্ষেও যে শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয়, এ কথাও তো তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন না। তবুও মহাপ্রভুকে আদর্শচরিত্ররূপে দাঁড় করাইয়া মিশনারী ঢঙ্গে যদি তাঁহার সমালোচনা করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি গোপালের মত সুবোধ ছেলে ছিলেন না বলিয়া কটাক্ষ করা যায় বটে। মনে হয়, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ইঙ্গিতে তাহারও একটা জবাব দিয়া গিয়াছেন। নৈবেদ্য-ভক্ষণ বর্ণনা করিয়া তিনি বলিতেছেন, "এই মত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়। দুঃখ কারো নহে মনে সবে সুখ পায়॥" কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন, প্রথমতঃ মহাপ্রভুর এই আচরণ লোকদেখানো চাপল্য মাত্র; দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে যাহাদের আপত্তি হওয়া সম্ভবপর ছিল, কি এক নিগূঢ় আকর্ষণবশতঃ তাহাদের তাহা হইতেছে না, শিশুর এই অত্যাচারে তাহাদের বরং সুখেরই উৎপত্তি হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের চাপল্যে গোপীদিগের এইরূপ ভাবোদয়ের কথাও সর্ব্বজনবিদিত। এখানেও তাই। নিগূঢ় আকর্ষণই যে এখানে লীলার সূত্র, এইটুকু না ধরিতে পারিলে এই লীলাবর্ণনের উদ্দেশ্যই যে পণ্ড হইয়া যায়।

*

পণ্ডিতমহাশয়ের দ্বিতীয় সমালোচনাটীই সব চেয়ে মারাত্মক। তিনি বলিতেছেন, "শিক্ষাদাতা চৈতন্যদেব স্বমুখে বলিয়াছেন,—'অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥' *** চৈতন্যদেবের দুইবার দারপরিগ্রহ তাঁহারই পরবর্ত্তী উপদেশের বিরুদ্ধ।" এই অভিযোগের দ্বারা বোধ হয় ইহাই বলা হইতেছে, চৈতন্যদেব দুইবার দারপরিগ্রহ করিয়া স্ত্রীসঙ্গী হইয়াছেন অথচ তিনিই পরবর্ত্তীকালে লোককে শিক্ষা দিতেছেন, যাহারা স্ত্রীসঙ্গী, তাহারা অসাধু। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে কোনও অবস্থাতেই স্ত্রীসঙ্গী, এই কথা কল্পনা করিতে গিয়াও যে আমাদের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে! বোধ হয়, মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ আর কেহই এই পর্য্যন্ত আনয়ন করেন নাই। পণ্ডিতমহাশয় সনাতনশিক্ষার যে স্থান হইতে মহাপ্রভুর এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে স্থানে স্ত্রীসঙ্গী বলিতে কি বুঝায়, তাহা মহাপ্রভুধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বাঙ্গালার শুকাবতার শ্রীমৎ জীব গোস্বামী বলিয়াছেন—"সঙ্গোঽত্র তদ্বাসনয়া তদ্বার্ত্তাদিময়ঃ।" মহাপ্রভুর উক্তি যদি তাঁহার নিজের বিরুদ্ধেই যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়, তিনি স্ত্রীলোকের প্রতি বাসনাযুক্ত হইয়া স্ত্রীলোকের আলোচনাদিময় হইয়া থাকিতেন! কি ভীষণ, কি জঘন্য কথা! নিমাই ও লক্ষ্মীদেবীর কাহিনী বিস্তৃত করিয়া বলিবার অবকাশ মহাজনেরা পান নাই, কিন্তু গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার লীলা তাঁহারা বড় মধুর করিয়াই বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে আশ্রয় করিয়া বাংলায় একটী ভজন-সম্প্রদায় পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সমস্ত মহাজনেরাই বলিবেন, লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাইয়ের সম্পর্ক ভাগবতোক্ত স্ত্রীসঙ্গের পর্য্যায়ে পড়ে কিনা। মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের রজনীর যে অতুলন চিত্র মহাজনেরা আঁকিয়াছেন, মাধুর্য্যে এবং কারুণ্যে বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের চিত্রও তাহার কাছে ম্লান হইয়া যায়। আমরা জানিতাম, এই অকৈতব প্রণয়লীলার স্মরণমনন প্রাকৃত হৃদয়ের কামানলকে স্তম্ভিত করিয়া রাখে। যুগাবতার রামকৃষ্ণদেব মহাপ্রভুর কথা উল্লেখ করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেন, "আর দেখ, চৈতন্যদেব কত বড় জিতেন্দ্রিয়!" চৈতন্যদেবকে মানুষ বলিয়া ধরিলেও তাঁহার সম্বন্ধে এমনি একটী মানুষের মত মানুষের উক্তির মূল্যও অপরিমেয়। কিন্তু বিধির বিপাকে আজ সেই মহাপ্রভুই স্ত্রীসঙ্গীর পর্য্যায়ভুক্ত হইলেন! সময়ের অভাব, স্থানেরও অভাব, নতুবা এই সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথাই বলিবার ছিল। যাঁহারা গৌরানুধ্যায়ী, তাঁহারা এই কুৎসিৎ অভিযোগের যথোচিত খণ্ডন করিয়া ভক্তের মনোবেদনা দূর করিবেন, ইহাই আমাদের আশা।

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রমসংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব সম্প্রতি পুরীধামেই অবস্থিতি করিতেছেন।

জন্মমহোৎসব

গত ১৫ ভাদ্র শুক্রবার পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীগুরুধামে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে তৃতীয় বার্ষিক মহোৎসব যথা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এ বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের আগমনে সমাগত ভক্ত-মণ্ডলীর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দের হিল্লোল উঠিয়াছিল। সকালে শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের পূজা, হোম, আরাত্রিক, বেদপাঠ, ব্রহ্মনাম যজ্ঞ ও নগর-কীর্ত্তনাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। পূজান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও যজ্ঞীয় তিলক ধারণ করেন। তৎপর ফলমূল লুচি-মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রসাদ বিতরণ হয়। বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান ও আসাম হইতে ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় ভক্তবৃন্দও অনেক আসিয়াছিলেন। অপরাহ্নে একটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমৎ রামানন্দ ব্রহ্মচারী ঐ সভায় সভাপতি মনোনীত হন। সভায় সেক্রেটারী শ্রীশ্রীগুরুধামের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের রিপোর্ট এবং এ বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। পরে শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিত্র, শ্রীযুক্ত ক্ষেপাদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদানন্দ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পাল, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্রীপতিভূষণ সরকার ও শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহোদয়গণ শ্রীশ্রীগুরুধামের ও আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অনন্তর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করতঃ সভা ভঙ্গ হয়।

উক্ত তিথিতে শাখাশ্রমসমূহে, জগৎসী ও কঙ্গনে (নাগা হিল্‌স্) জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ পাইয়াছি। উত্তরবঙ্গ সারস্বত আশ্রমের (বগুড়া) বার্ষিক উৎসবও ঐ তিথিতে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ভক্তসম্মিলনী

চতুর্দ্দশ-বার্ষিক ভক্তসম্মিলনীর অধিবেশন এবার মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে হওয়ার প্রস্তাব গত ভক্তসম্মিলনীতে স্থিরীকৃত হইয়াছিল; এবং ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, যাঁহারা ভক্তসম্মিলনীতে যোগদান করিবেন, তাঁহারা সম্মিলনীর একমাস পূর্ব্বে জনপ্রতি ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিয়া নাম তালিকাভুক্ত করিবেন। তদনুযায়ী সম্মিলনীতে যোগদানেচ্ছু ভক্তগণকে জানান যাইতেছে, তাঁহারা যেন কার্ত্তিকমাস মধ্যে জনপ্রতি ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিয়া নাম তালিকাভুক্ত করেন। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে যাঁহাদের টাকা আমাদের হস্তগত হইবে না, পরে তাঁহাদের ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন হইবে। সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিলে সে কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়া নাম লিখাইতে হইবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দরুণ অতিরিক্ত টাকা লাগিবে না, কিন্তু তাহাদের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। তবে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের নাম লিখাইবার প্রয়োজন নাই। মণিঅর্ডার কুপনে নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। বিশেষ প্রয়োজন বোধ না করিলে প্রত্যেকের টাকার প্রাপ্তিসংবাদ দেওয়া হইবে না। অন্যান্য বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

স্বামী প্রেমানন্দ

মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম পোঃ জয়দেবপুর—ঢাকা

গ্রাহকগণের প্রতি

প্রেসের গোলযোগে এই মাসের পত্রিকা কিছু বিলম্বে প্রকাশিত হইল। আশ্বিনের পত্রিকা আশ্বিনের ২৫ শে তারিখে প্রকাশিত হইবে। পূজা উপলক্ষে যাঁহারা স্থানান্তরে যাইবেন, তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নেই আমাদিগকে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের কথা জানাইবেন।

"শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-কথাসংগ্রহ"

—শ্রীযুক্ত শিশির কুমার বসু সম্পাদিত। প্রাপ্তি-স্থান, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং ১৭২ বউবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। প্রথম খণ্ড—মূল্য ১৷৵০। শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানা বর্ত্তমান অবস্থার ফটোও আছে। মহাপুরুষের বাণী আস্বাদ্য, সমালোচ্য নহে। এই গ্রন্থে প্রায় দুই শত প্রসঙ্গে অধ্যাত্ম-জগতের নানা সমস্যা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাঞ্জল মীমাংসা বিশেষ নিপুণতার সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক প্রসঙ্গই নূতন তথ্যে পরিপূর্ণ। বর্ণমালা অনুসারে একটী বিষয়সূচী সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থখানির উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা অধ্যাত্ম-জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিগণকে ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পড়িতে অনুরোধ করি। পরবর্ত্তী খণ্ডসমূহের জন্য আমরা উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

খড়কুসুমা আশ্রমে দানপ্রাপ্তি স্বীকার

কাঁথি—শ্রীযুক্তশশীভূষণ সিংহ ২৷০, শ্রীযুক্তপ্রভাতচন্দ্র দে, ৫৲, শ্রীযুক্তা প্রমোদিনীবালা দাসী ৪৲, ভুঁইমালী শ্রীযুক্তা দুর্গামণি দেই ৫৲, শ্রীযুক্ত ষড়ানন গিরি ৫৲, শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় শাসমল ৫৲, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র শাসমল ৫৲, শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রনাথ গুচ্ছাইৎ হেড্-মাষ্টার ৫৲, রামেশ্বর মেলায় সংগৃহীত ৭৷০, খুচরা সংগৃহীত ৩৲, কাঁথিঅঞ্চলে খুচরা সংগৃহীত ৯৶/, মারিশদা বাজারে সংগৃহীত ১৷০ নাচিন্দা বাজারে সংগৃহীত ১৲১০, দেওলা সভায় সংগৃহীত ৮৵০, জনৈক হিতৈষী ১৷০। (ক্রমশঃ)

আর্য্য-দর্পণ

সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র।



২১শ বর্ষ — ১ম খণ্ড

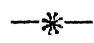
আশ্বিন—১৩৩৫

সমষ্টি সং ২২২ — ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আনন্দলহরী



শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য



বিভক্ত-ত্রৈবর্ণ্যব্যতিকরিত-নীলাম্বুজতয়া,
বিভাতি ত্বন্নেত্রত্রিতয়মিদমীশানদয়িতে।
পুনঃ স্রষ্টুং দেবান্ দ্রুহিণহরিরুদ্রানুপরতান্,
রজঃ সত্ত্বং বিভ্রত্তম ইতি গুণানাং ত্রয়মিদম্॥

নীলাম্বুজে পরাজিয়া—ওগো মেয়ে, ঈশানের জায়া !
ত্রিনয়নে নাচে তোর শ্বেত-কৃষ্ণ-লোহিতের ছায়া !
হরি-হর-ব্রহ্মা লীন, কটাক্ষেতে জীয়াইবে, তাই
সত্ত্ব রজ-তমো গুণ হেথা বুঝি লইয়াছে ঠাঁই !

পবিত্রীকর্তুং নঃ পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে,
দয়ামিত্রৈর্নেত্রৈররুণধবলশ্যামরুচিভিঃ।
নদঃ শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি ধ্রুবমমুং,
ত্রয়াণাং তীর্থানামপনয়সি সম্ভেদমনঘম্॥

জানি জানি, ওরে মেয়ে, পশুপতি তোর মনচোর।
অরুণ ধবল শ্যাম সকরুণ [illegible] নয়ন [illegible]
শোণ গঙ্গা-কালিন্দীর [illegible] যাচে [illegible]—
[illegible] থাকে [illegible], নির্মল [illegible] ভুরি

তবাপর্ণে কর্ণে জপনয়নপৈশুন্যচকিতা,
নিলীয়ন্তে তোয়ে নিয়তমনিমেষাঃ শফরিকাঃ।
ইয়ং চ শ্রীর্বদ্ধচ্ছদপুটকবাটং কুবলয়ং
জহাতি প্রত্যূষে নিশি চ বিঘটয্য প্রবিশতি॥

কণছে [illegible] বাবা [illegible], ও অপর্ণা, [illegible],
লুকায়েছে সচকিত [illegible] [illegible]।
কুবলয়-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] নি[illegible] চুপে,— [illegible] তুলে [illegible]।

অরালং ভ্রূপালীযুগলমগরাজন্যতনয়ে,
ন কেষামাধত্তে কুসুমশরকোদণ্ডকুতুকম্
তিরশ্চীনো যত্র শ্রবণপথমুল্লঙ্ঘ্য বিলসন্,
অপাঙ্গব্যাসঙ্গো দিশতি শরসন্ধানধিষণাম্॥

বাঁকা দুটি ভুরু পাতি, ও গো নগ-রাজার ঝিয়ারি,
ফুলধনু মায়া বলো, কার চিতে দেয় না বিথারি?
কুটিল কটাক্ষ তায় ঝলমলি ছুঁয়ে যায় কাণ—
মনে হয় ধনুকের আকর্ণ এ শরের সন্ধান।

স্ফুরদ্গণ্ডাভোগপ্রতিফলিততাড়ঙ্কযুগলং,
চতুশ্চক্রং শঙ্কে তব মুখমিদং মান্মথরথম্।
যমারুহ্য দ্রুহ্যত্যবনিরথমর্কেন্দুচরণং
মহাবীরো মারঃ প্রমথপতয়ে সংজিতবতে॥

ঝিলিমিলি দুটি গাল, তাড়ঙ্কের ছায়া তায় আঁকা—
মুখখানি রতি-পতি-রথ, তার ওই চারি চাকা,
চড়ি তায় ভূতনাথে [illegible] যত্নে মহা[illegible] মা'র—
রবি-ইন্দু [illegible] এই ক্ষুদ্র [illegible] প্রদানে তাঁর।

সরস্বত্যাঃ সূক্তীরমৃতলহরীকৌশলহরীঃ,
পিবন্ত্যাঃ শর্বাণি শ্রবণ-চুলুকাভ্যামবিরতম্।
চমৎকারশ্লাঘাচলিতশিরসঃ কুণ্ডলগণো,
ঝণৎকারৈস্তারৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব তে॥

ভাবতী[illegible] যে ভাষা অমিয়া [illegible] সুমান,
কাণের [illegible] করি [illegible] নিত্য করপান,
চমৎকার!"—বলি শির দোলে [illegible] পুলকচঞ্চল—
ঝন-ঝন-ঝনৎকারে দেয় সায় [illegible] কুণ্ডল।

অসৌ নাসাবংশস্তুহিনগিরিবংশধ্বজপটে,
ত্বদীয়ো নেদীয়ঃ ফলতু ফলমস্মাকমুচিতম্।
বহন্নন্তর্মুক্তাঃ শিশিরতরনিশ্বাসঘটিতাঃ,
সমৃদ্ধ্যা যস্তাসাং বহিরপিচ মুক্তামণিধরঃ॥

ওই নাসা-বংশ তব—হিমাচল-কুলের পতাকা।
ফলাক্ মুকুতারাশি—ভাগ্যে যদি থাকে তাই লেখা,
আছে মুক্তা, অনুমানি সুশীতল নিশ্বাসের বায়,
বাহিরেও মণি মুক্তা ফলিবে যে বিস্ময় কি তায়।

প্রকৃত্যা রক্তায়াস্তব সুদতি দন্তচ্ছদরুচেঃ
বরাকী সাদৃশ্যং জনয়তু কথং বিদ্রুমলতা।
ন বিম্বং তদ্বিম্বপ্রতিফলনলাভাদরুণিতং,
তুলামধ্যারোঢুং কথমপি বিলজ্জেত কলয়া॥

টুকটুকে দুটী ঠোঁট্—মরি, মরি! অমনি যে লাল—
কোথা লাগে তার কাছে ওই ছার লতানো প্রবাল?
পেয়ে ওই আভা শ্যাম বিম্ব হল অরুণ-বরণ;
একঁকণা তুলা পেতে যাবে কাছে?—হয় না মরণ!

স্মিতজ্যোৎস্না জালং তব বদনচন্দ্রস্য পিবতাং,
চকোরাণামাসীদতিরসতয়া চঞ্চুজড়িমা।
অতস্তে শীতাংশোরমৃতলহরীমম্লরুচয়ঃ,
পিবন্তি স্বচ্ছন্দং নিশিনিশি ভৃশং কাঞ্জিকধিয়া॥

হাসির জোছনা গলে ওই তোর চাঁদমুখ বেয়ে—
পিয়ে জড় চকোরের হল চোঁচ এত মিঠা পেয়ে;
অম্লে রুচি হল তার; রসনারে সরসে কি দিয়া?—
কাঁজি ভেবে তাই পিয়ে নিশি নিশি চাঁদের অমিয়া!

অবিশ্রান্তং পত্যুর্গুণগণকথাম্রেড়নজড়া,
জবাপুষ্পচ্ছায়া তব জননি জিহ্বা বিজয়তে।
যদগ্রাসীনায়াঃ স্ফটিকদৃষদচ্ছচ্ছবিময়ী,
সরস্বত্যা মূর্ত্তিঃ পরিণমতি মাণিক্যবপুষা॥

অবিরাম শিবগুণ গেয়ে গেয়ে, ওগো মা শিবানি
রসনা যে রাঙা জবা হল তোর—ধন্য তারে মানি!
তারি আগে বসে বাণী—ফুট্‌ফুটে ফটিকের ছায়া—
মাণিকের মত তার নিমিষেতে রাঙা হয় কায়া!

মা !

—*—

আমার ভিতর জ্বালা আছে, বেদনা আছে, এই আমার একান্ত পরিচয়। নিষ্পেষণের মাহেন্দ্র-ক্ষণে আমার কাছে আমি যখন তীব্র সত্য হয়ে ফুটে উঠি, তখনি ঠিক বুঝ্‌তে পারি, যা কিছু আমার মিথ্যা সবি এবার ধরা পড়েছে। তখন সত্য-মিথ্যায় মণ্ডিত অপূর্ব্ব রহস্যময় এই জীবন-টার কোন মতেই আর কূলকিনারা করতে পারি না—এক মাত্র তোমার মুখের পানে চেয়ে তার অভিমানের হালটী ছেড়ে দেওয়া ছাড়া! আমার বুকের কথাটী যে কি, তা তো আমি জানি না; সে কথা তোমারই মুখে শুনব বলে এবার সব দিক থেকে তোমার কাছে আমাকে গুটিয়ে আনতে চেয়েছি। আমার পিপাসা আর তোমার ভরসায় মণিকাঞ্চন-যোগ হোক্—তবেই আমি ঠিক তোমার বেদনার ভাগ নিতে পারব! নানা বিচার-বিতর্কের পরেও দেখি, তোমার কাছে একটা কিছু না চেয়ে অমার প্রাণ যে মানে না। আমার এই চাওয়াই আমার অস্তিত্ব, আবার তা হতেই যত জ্বালা আর বেদনা—পক্ষান্তরে তোমারই লীলার সুযোগ। অসংশয়িত দৃষ্টি নিয়ে তোমার লীলা রূপেই আমার প্রাণের জ্বালাকে যদি প্রত্যক্ষ করতে পারতাম, তবে আমার ভিতর দিয়েই তুমি ফুটে উঠ্‌তে—তখন আমার জীবন দিয়ে তোমারই পূজা হত।

সুতরাং আমি চাই—আমার চাওয়ার কখনো বিরাম না হয়। কি চাই তা জানি না—এই-খানটীতেই তোমার কাছে আমি বাঁধা। কেননা প্রত্যহই দেখ্‌ছি—আমার জানার রাজ্যে এমন চাইবার আমার কিছু নাই, যা আমাকে তৃপ্ত করতে পারে। বিষয় হতে বিষয়ে ঘুরে মরে নিজকে শেষ কর্‌তে না পেরে হয়রাণ হয়ে এবার বুঝেছি—তুমি ছাড়া চাইবার নাই, তুমি ছাড়া পাবার নাই।

আমার দিক থেকে যা খুসী তা হয়ে যাচ্ছে, শত চেষ্টাতেও তো কাউকে ধরে বেঁধে রাখা যায় না। নানা দ্বন্দ্বে ভরা বিরাট্ একটা সমস্যাপিণ্ড হয়ে প্রতিনিয়ত তোমাকে আমি কত আঘাত কর্‌ছি; তবু তোমার প্রাণে ক্ষমার অভাব নাই, তোমার সেবার এতটুকু ক্রটী রেখে তুমি থাক্‌তে পার নি। এ জীবন নিয়ে তোমার যা খুসী হয় করে যাও তুমি—আমি যেন শুধু জ্বল্‌তে পারি, জান্‌তে পারি, সবি বাজ্‌ছে তোমারই বুকে!

অবিশ্বাসে, সংশয়মূঢ়তায়, কামনার বিকারে জীবন জটিল হয়ে উঠেছে, তুমিও নিত্যনূতন রহ-স্যের যোগান বাড়িয়ে চলেছ; ক্রমশঃ আমার কাছে আমি কি যে অদ্ভুত হয়ে উঠ্‌ছি—উদ্বেগ আমার একবিন্দু কম্‌ছে না, অটল আবেগে প্রাণে বাজ্‌ছে, তুমি ছাড়া জীবনে আমার আর গতি নাই।

আমার অবিশ্বাসের ফল কি এই?—তোমা-পানে আমাকে উন্মুখ করে তোমার অন্তরের বেদ-নায় আমারো অন্তর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌বে—তাই কি আমার প্রাণে এত সংশয়? আমার কামনা বুঝি আমারই দ্বিতীয় সত্তা; তাই তাকে আঘাত কর্‌তে গিয়েই আমা হতে আমি পৃথক্ হয়ে সবশুদ্ধ তোমারই দিকে আমি অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি। এমনি করে দুঃখ থেকে সুখ চিনে নিয়ে, সুখ থেকে দুঃখ বেছে নিয়ে বিশৃঙ্খল জীবনটাকে সুশৃঙ্খলায় সামঞ্জস্যে এক রহস্যে সংহৃত

করে কি অপরূপ কাব্যই যে তুমি ফুটিয়ে তুল্‌ছ তা তুমিই জান!

* * *

তোমাকে আমি জানি না—এইটাই আমার সব চেয়ে বড় সত্যি কথা। আমি অস্ফুট, সংশয়িত—তোমাকে ধর্‌বার বা আঁক্‌বার কোন কারিগরীই আমার নাই; তবু তুমি হারিয়ে যেতে দাওনি আমায়। আমার কোন দাবী-দাওয়া নাই বলেই তুমি আমায় বুকে করে আছ। আমার অসামর্থ্যই তোমার সামর্থ্য; কেননা আমার সামর্থ্য নাই বুঝ্‌তে পারলেই তোমার সামর্থ্যে তখন তুমি আমায় পূর্ণ করে তুলছ! অভাব তুমি পূর্ণ করে আছ ভাব দিয়ে—শুধু অভাবটা বুঝতে পারলে হয়। তোমাকে জান্‌তে হলে আমাকে এতটুকু দূরেও যেতে হয় না—এই বুকের মাঝে বসেই তোমাকে পাই;—তোমাকে পেতে আমার কোন আয়োজনের প্রয়োজন হয় না, তুমি অতি সহজে ধরা দিয়ে আছ বলেই বলি, তোমাকে জানা যায় না—তোমাকে জানি না।

বাস্তবিক জান্‌ব কি করে?—জান্‌লে কি আর এ আমি "আমি" থাক্‌তাম? কখনো কখনো কোন্ অকূল রহস্যসাগরে যে তুমি ভাসিয়ে নিয়ে যাও, তোমার দিক থেকে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের সুবাস এসে আমার মনের সকল আবরণ বিস্রস্ত করে দিয়ে আমায় নিয়ে কোথায় যে চলে যায়, তখনকার খবর রাখ্‌তে তো আমি পারি না! বুঝি তুমিও সে খবর দিয়েও দিতে চাও না! তখন যে আমার সবি থাকে, তবু কিছুই থাকে না—কি পাই কি দিই সে তুমি জানিয়ে না দিলে জানি না। আমার মনে শুধু একটুখানি স্মৃতি আর এক ফোঁটা বিশ্বাস, তাইতেই আমার গোটা জীবনটাকে মধুময় করে তোলে! অবিশ্বাসী জগৎও আমায় বলতে থাকে, কিছু নাই কেন—সবি আছে, তোমার মাঝে সবি আছে, কারো বেঁচে থাকা কখনো বিফল হয়নি! হায় মূঢ়, তোমার জীবনের মূলে যে কি উদ্দেশ্য, তা কি তুমি জান? আমার জীবনের মূলে তোমার উদ্দেশ্যটুকুই আমি জানতে পারি, তোমাকে তো জানতে পারি না!

আমার জীবন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অজ্ঞান উপাদান মাত্র; তোমারই নিগূঢ় অভিপ্রায় রসরূপে তাকে সংহত করে ঐক্য দিয়েছে। সুতরাং তুমি দিয়েছ বলে আমি গৌরব করতে পারি, আমি পেয়েছি বলে আমার ভিতর সে গৌরবের অনুবৃত্তি চলতে পারে—একান্ত করে আমার এক্‌লার অভিমানকে তো কোথায়ও আমি উদগ্র হয়ে উঠ্‌তে দিতে চাই না। তুমি যার কাছে প্রকাশ পেয়েছ, তোমার কাছে যে প্রকাশ পেয়েছে, তার তো প্রচারের জন্য ব্যস্ততা থাক্‌তে পারে না। অভিমানে আমি কি করি?—নিছক আমার জন্য জগতের বুকে একটা দাগা রেখে যেতে চাই। কিন্তু এই কি আপনজনের কাজ?—সে তো জোর করে তোমার কাছে কিছু পেতে চায় না। তুমি তো আপনা হতেই তাকে দেখা দিতে চেয়েছ। তবে আর কেন?—তোমার আশায় আনত হয়ে থাকা ছাড়া তো জীবনের আর কোন কর্ত্তব্য আমি রাখ্‌তে চাই না। কিম্বা আমার সবি তুমি জান—আমি যা জানি তা ক্ষুদ্র নগণ্য, তার বড়াই আমি ছেড়ে দিলাম—আমার জীবন এখন্ তোমার সেবায় লাগুক্।

* * *

তোমাকে জান্‌বার ছলে আমাকেই আমি জেনেছি তোমায় সুখ দিতে গিয়ে তোমার অহেতুক সুখের বন্যায় আমিই ভেসে গেছি। আমাকে ছেড়ে আমি যাব কোথায়? সে ক্ষমতা যে আমার নাই। আমার জীবন নিয়ে তবু তোমারি লীলা—

আমার কিছু নয়। আমি অকিঞ্চন বলেই আমার কিছু করে তুলবার জন্য এত ব্যস্ততা, দীনাতিদীন বলেই আমার মাঝে রাজাধিরাজের অভিমান। আমার জীবনকে ঘিরে ঘুরে আমি তোমারি নাম করছি—তোমাকে যে পেতে পারি, এই আশ্বাসে নিখিলের পাওয়া আমার কাছে আজ তুচ্ছ হয়ে গেছে!

দ্বৈতকে কোনমতে এড়াতে পারি না বলেই আমার প্রাণে সমর্পণের আকূতি। সমর্পণ যেন অভিমানের ক্ষতিপূরণ। নইলে যথার্থ সমর্পণের আমার অধিকার কই? তুমি যদি স্বেচ্ছাসুখে আমায় এসে কোলে তুলে না নিতে, তাহলে আরো কত জন্ম-জন্ম যে অমনি কেটে যেতো—আমি তো ভ্রমেও জানতাম না যে আমার জীবনের এত বড় একটা সার্থকতা কোথাও আছে! তোমারি আলোকে তোমাকে দেখ্‌ছি—তুমিই সাধ্য, তুমিই সাধন—আবার আমার অভিমানকে আবরিত করে তুমিই আমার অসাধনের ধন।

তোমার দৃষ্টিমাত্রেই যে মন প্রশান্ত আত্মহারা হয়ে যায়, আমি শত চেষ্টাতেও তাকে কূলে ভিড়াতে পারি না। আমার নিজ জীবনের জন্য যে ব্যস্ততা ব্যগ্রতা, এর একটা রূপান্তর তাহলে নিশ্চয়ই আছে। বুঝি আমার স্বার্থটা একটা ভ্রান্তি। আমাকে পূর্ণ করবার সমস্ত চাবিই তো তোমার হাতে; তবু আমার জন্য আমাকে যে ব্যস্ত হতে হয়, এ শুধু আমারই ভ্রান্তিনিরাসের জন্য।—আসলে আমার সমস্ত আকুলতার রশ্মি তোমারই চরণে সংমীলিত; যে কোন একটা ধরে তোমাতে পৌঁছে না গিয়ে একটা হতে আরটায় ঘুরে মর্‌ছি বলেই তোমার আকর্ষণ অনুভব কর্‌তে পার্‌ছি না। আজ আমি কল্পনায় পেয়েছি, তুমি আমার সার্থক করবে—একটা ভাবের সুন্দর সুসমঞ্জস ধাঁধায় তুমি আমার জানাশোনা বাঁধাধরা জীবনটাকে ছেড়ে দিয়েছ—অজানার ভরসায় সে এবার অকূলে ভেসে যেতে চেয়েছে; এখনো তার কিছুই সুনির্দ্দিষ্ট হয়নি, কোন ভাবই তার সুসংহত হয় নি, আজ সে পাগলপারা হয়ে আবোল-তাবোল বকৃছে, যা খুসী তা কর্‌ছে। কিন্তু এ সবি যেন কোন্ সুখসঙ্গীতের পূর্ব্বাভাস—এই সমস্ত বৈচিত্র্যেরই মূলে কোথায় যেন কি এক ঐক্য রয়েছে; সে ঐক্য যেন সমস্ত মায়িক সমস্যার সমাধান—তোমারই কৃপারসস্নিগ্ধ অমায়িক রহস্য যেন তারি মাঝে লুকিয়ে আছে।

আমার এই অনুভূতির সুখসান্দ্র অন্তরকেন্দ্রে তুমি নেমে এসো মা!—তুমি তো জান, আমি আমাকেই চাই—কেন না আমাকে দিয়ে তোমাকে আমি চাইব কি করে? তবু আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছার কোন ক্ষণিক জন্ম আমি চাই না—আমাকে হারিয়ে তোমাকে যদি আমার পাওয়া হয়, তাই আমার কাম্য। আমার এ কামনা কি রহস্যময়!—আমাকে ছেড়ে আমি পেতে জানি না, অথচ আমার ভিতর দিয়ে এমন একটা কিছু পেতে হবে, যেখানে আমি না থাকি; অথবা সকল আমির কেন্দ্র হয়ে তুমি হয়ে থাকি! ঘুরেফিরে আমার বিশ্বাসকেই এমনি করে আমি তোমার নামে আঁকড়ে ধরে আছি!

*　　*　　*

তোমার সঙ্গে আমার যে কথা হয়, সে আমার প্রাণের কথা, আনন্দের কথা! বিচার সেখানে থৈ পায় না বলেই তার আব্‌দার-অত্যাচার সেখানে কিছু বেশী বেশী। তুমি যে আড়ালে থেকে থেকে সর্ব্বদা আমার প্রাণের যোগান দিয়ে আস্‌ছ, এ তো সে জানে, তবু তোমায় সে বাজিয়ে নিতে চায় আর স্বেচ্ছার জালে জড়িয়ে স্বখাতসলিলে ডুবে মরে। এটা হতেই হবে—কেননা এ নইলে একটা কিছু কর্‌বার অভিমান তার কিছুতেই পর্য্যুদস্ত হবে না—নিজের উচ্ছ্বাস না মর্‌লে তোমার প্রশান্ত অনুভূতি প্রাণে জাগ্‌বে না। কিন্তু আসলে

জাগানোর গরজ যে তোমারই, এটুকু না জানা পর্য্যন্ত অহং তো মরে না। অহংকে তলিয়ে বুঝবার জন্যই বিচার—নতুবা তোমার জন্য আমার কাণাকড়িও নাই যে খরচ করি। স্নিগ্ধ রস-ব্যাকুলতায় অন্তর যদি না কেঁদে উঠল—তবে বিচারের সার্থকতা কি ?

আমার জন্যই আমার যত বিচার এই যদি হয়, তবে তুমি আমায় কেড়ে নাও না মা—তবেই তো সব গোল মিটে যায়!—তোমাকে ঘিরে ঘিরে এত সংশয়ের জঞ্জাল কেন?—আমি যে সহজে তোমায় পেতে চেয়েছিলাম। মনের ভুলে কখনো যদি নিজকে ভালবেসে ফেলে থাকি, আর তাই নিয়ে আড়াল হয়ে থাকি, সে মরীচিকা তোমার ক্ষমায় গিলিয়ে যেতে কতক্ষণ ?

* * *

আর প্রশ্ন নয়, সমস্যা নয়, দুঃখ নয়—কেবল আনন্দ! আমার অন্তর তোমার পানেই তৃষিত চক্ষে চেয়ে আছে—শুধু এই আমি জানি! আমার ক্রন্দনে তোমার আসন টলেছে, তুমি নেমে এসেছ—ধীরে ধীরে জীবনকে আবিষ্ট করছ—এই বিশ্বাসই আমার ধ্রুবতারা। আর তো আমি টলেও টলব না—সেই অনাদ্যন্ত মিলনের আবেশ যে আমার প্রাণে বেজেছে। আর আমার পথের ভাবনা নাই—তোমার প্রাণের টান এবার আমায় অপথ ভুলিয়ে দিয়েছে !

আমার জীবনের হাসি-কান্না, সুখদুঃখ তবু মরেনি; কিন্তু জানি, এ সব তোমারই লুকোচুরী। নানা ছলে আমার জীবনে তারা তোমারই প্রকাশ। এ জগতে কেউ তো তোমা হতে আমাকে বিচ্যুত করবার জন্য আমার সঙ্গে যুক্ত হতে আসেনি। বিপদে-সম্পদে সর্ব্বত্র এক সর্ব্বাতীত রহস্যময়ী প্রকৃতি-কেই প্রত্যক্ষ করে এসেছি, আমার অন্তর থেকে যিনি আমাকে বিশ্বের রূপের সঙ্গে এক বলে অনুভব করিয়েছেন। আমার ভাবের কুহেলিকায় আমি তাকে আবৃত করে রেখেছি, ভাষার জটিলতায় তাকে ব্যথিত করেছি, আমার বিষম ব্যবহার দিয়ে বিদ্ধ করেছি এতদিন, তবু তিনি ক্ষণেকের তরেও বিচলিত হননি, সর্ব্বংসহা স্নেহ-কমনীয়তা ভরে অবিরাম আমাকে কান্ত করে তুলতেই চেয়েছেন! আমার মাঝে গোপনে গোপনে তোমার যে এত লীলা তুমি ধীরে ধীরে কোথা দিয়ে কখন এসে জমিয়ে তুলেছ মা, আগে তো আমায় তার কিছুই জানাও নি! আজ শুধু অবাক্ হয়ে চেয়ে আছি—কি সম্পদ্ কি বিপদ সবি যে আজ সমরস সমুজ্জ্বল হয়ে গেছে তোমার পরশে! তোমায় বিশ্বাস করি, নির্ভর করি, এ সব যেন কথার কথা; আসলে যে কি হয়ে গেল, সে কেবল তুমিই জান, আর কেউ জানে না। বাইর থেকে শুধু বুদ্বুদটুক্ পাই আর আভাসে মাতোয়ারা হয়ে উঠি—রভসে জানা হতে অজানার মাঝেই ছুটে যেতে থাকি।

তুমি অজানা বলেই এত মধুর। তোমার কোল, তোমার কৃপা, তোমার আকর্ষণ, নিঃশেষে এর অর্থ কোথাও পাওয়া যায় না; স্বচ্ছ হৃৎপাত্রে একটী একটী করে অনুভূতির রেখাপাত যখন হতে থাকে; ঐ রেখাতেই সব ইতি হয়ে যায় না—আরো এত কিছু থেকে যায়, যার আর হিসাব হয় না!

* * *

তোমায় বেঁধে রাখতে চাই না—এবার আমি নিজেই বাঁধা পড়ে গেছি। ধরা দিতে হবে বলে তোমার কাছে আব্দার জুড়েছিলাম, অলক্ষ্যে নিজেই ধরা পড়েছি। তোমার কর্ম্ম তুমি তো করেই চল্‌ছিলে, মাঝখান থেকে আমার যে কি মাথার বিকার উঠ্‌ল—ভাবলাম, তুমি বুঝি আমার জীবনের নিত্যসিদ্ধ বস্তু নও; তাইতেই নানা চেষ্টার জঞ্জাল জড় করে জীবনকে ঋদ্ধিসম্পন্ন

করতে চেয়েছিলাম। হঠাৎ মহাকালের এক নিশ্বাসে জগৎটার প্রলয় হয়ে যাবার মতন মুহূর্তে আমার সমস্ত ধূলার খেলাঘর ধূলায় মিশিয়ে গেল—তখন বিনা চেষ্টায় সুরম্য পথে তোমার সহজ আনাগোনা সুরু হল—আমি দেখ্‌লাম সে কি বিপুল, সে কি বিস্ময়, সে কি মধুর! রিক্ত হয়ে আমি অপূর্ণতা হারালাম, স্তব্ধ হয়েই আমার মাঝে আমি আরো সচেতন হলাম! নিজের জন্য নিজে কতটুকু ভাবনাই বা আমি ভাবতে পারি?—তাও তো তোমারি বুকে তুমি আদরে এঁকে রেখেছ! শুধু আমারি বিশ্বাস হয় না মা, নিজের ক্ষুদ্র বিবেচনাকে পিছনে হটাতে পারি না—তোমাকেও ব্যথা দিই, নিজেও ব্যথা পাই!

দেশকালের অতীত হয়ে তুমি আমার মাঝে নেমে এসো মা!—ক্ষণিকের খণ্ড প্রাপ্তিতে আর ভুলব না। আমার সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাওয়ায় সুখস্মৃতি একত্র করে তোমার জন্য এবার মালা গেঁথে রেখেছি—হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নাও, আমার চেষ্টার চরম ইতি হয়ে যাক্। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নেড়েচেড়ে কত দিক থেকেই তো তুমি আমাকে দেখ্‌ছ—একবার আমি তোমাকে দেখ্‌ব না? স্বার্থ আমার বৈরী হয়ে চিরকাল জ্বালাবে না—একদিন সে-ও হার মান্‌বে! তখন কি আমার চোখ খুল্‌বে না? তোমার বুকেই তো আছি চিরকাল—কখনো বুকের কাঁটা হয়ে, কখনো সোহাগের দুলাল হয়ে। দ্বন্দ্ব আমাকে নিয়েই। এ দ্বন্দ্বের মূলে যে কি হেতু, কি রহস্য, সে কথা তুমিই জান। আমি শুধু জানি—আমি তোমার!

তোমাকে সুখ দেব বলে যে স্পর্দ্ধা আমার, তুমি না জয়ী করলে তার মাহাত্ম্য থাকে না। তুমি না দিলে এ অধিকার আমি পেতাম কোথায়? আমার সমগ্র জীবন তোমার অফুরন্ত লীলাবিলাসের অবলম্বন—এইটাই আমার অনুভূতির মূল ধারা। সুতরাং তুমি যে তোমার দুঃখের জন্য আমাকে সৃষ্টি করেছ, এ কথা তো আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

তাৎপর্য্য না বুঝ্‌লে শুভেও অশুভ ভ্রান্তি হয়। আমার জীবনেরও তাৎপর্য্য তোমার অভিপ্রায়ে নিহিত, কাজেই তোমার ওই উদার মধুর শাশ্বতী দৃষ্টি আমার হৃদয়ে নেমে না এলে তো আমার জীবনসমস্যার মীমাংসা আমি পাব না। আমার সুখ-দুঃখে আমি বিচলিত যতক্ষণ, ততক্ষণ তো আমি বিপর্য্যস্ত; কিন্তু যেই তার মাঝে ওপারের মধু একবিন্দু এসে পড়ল, অমনি আমার সব হিসাব-কেতাব কোথায় লুটিয়ে পড়ল—বুঝি তোমার স্মরণে আমি ভেসে উঠ্‌লাম! তখন দেখ্‌লাম, বাইরের পরাজয়েই তোমার কাছে আমি জয়ী হয়েছি, কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সকল ক্ষতি সকল গ্লানি সয়েও আমার হৃদয়ের অম্লান উপচার তোমার চরণে পৌছেছে বলেই তুমি আমাকে গ্রহণ করেছ! তোমার সঙ্গে আমার যে সুনিয়ত সম্বন্ধ, তার কাছে বিশ্বজগৎ স্তিমিত!

*   *   *

বাক্য তোমার খুঁজে পায় না, মন তোমায় বেড়ে পায় না—তবু আমরা তাই দিয়েই তোমার চরণ বেড়ে থাকতে চাই! আমার যে আবেগ তার ক্ষুদ্রতার দিকে তো তোমার দৃষ্টি নয়, তুমি শুধু দেখ্‌ছ, আমার কতটুকু আছে আর আমি কতটুকু দিয়েছি। আমার সবটুকু হলেই তোমার মন উঠ্‌বে—এতটুকু আর ততটুকু বলে সীমা-নির্দ্দেশ তো সমর্পণে চলে না। আমি যদি আমার সবটুকু দিলাম, তবে আমি ক্ষুদ্র হয়েও তোমার প্রেমের সব চেয়ে বড় অধিকারী!

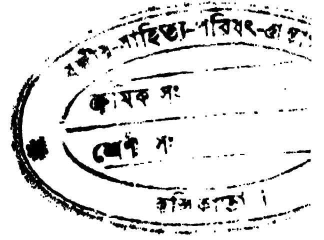
আর এই সবটুকু দেওয়ায় মাঝেই যে কি এক রহস্য সে শুধু তুমিই জান—আমি সেখানে হার মেনেছি! বারবার কতবার করে এই সবটুকুই দিয়ে এসেও তো সবটুকু ফুরাচ্ছে না—অন্তরের সর্ব্বস্বধন যা, তা বুঝি চিরকালই অফুরন্ত! চিরকালই তো তোমার পূজা চলে আসছে, কত ভক্ত তোমায় সর্ব্বস্ব সঁপে দিচ্ছে, তুমিও তাকে পূর্ণ করছ—একটি রহস্যপূর্ণ আবর্ত্তনের মত শুধু দেওয়া আর পাওয়া, দেওয়া আর পাওয়া চলে আসছে—যেন এ লীলার আর অন্ত হল না। অন্ত হয়েও হয় না, কেননা তোমাতেই যার আদি আর তোমাতেই যার অন্ত, সে অফুরন্ত না হয়ে থাকে কি করে? ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিজের কাছেই নিজে বন্দী হয়ে পড়তে হয়—সবাই শুধু পান করেই আত্মহারা। আত্মহারা করাই তোমার লীলামাধুর্য্য, শুধু এই বিশ্বাসটুকুই যথেষ্ট। কেননা তুমি যে যুগপৎ একত্র হয়েও সর্ব্বত্র আছ!

তোমার যে শক্তি দিয়ে ব্যষ্টি-সমষ্টিকে তুমি যুগপৎ সার্থক করে যেতে পার, সেই শক্তিতে এবারকার আমার এই ব্যষ্টি আয়োজনকে হিল্লোলিত করে তোল। তোমার কাছে আর কিছুই তো চায় না সে—শুধু অভয় হস্তের একটুখানি স্পর্শ, ক্ষণেকের জন্য সৌম্য শুচিস্মিত স্নিগ্ধ দৃষ্টিসম্পাত, এতেই সে ধন্য, নিঃসংশয়, এতেই তার পুলকাঞ্চিত আবেগের চরম পরিতৃপ্তি। তোমাকে দিয়ে আমার তৃপ্তি যদি হল, আমাকে নিয়ে তোমার তৃপ্তি অনধারিত।

* * *

আর বাক্যের আড়ম্বর নয়, চেষ্টার মাতামাতি নয়। তুমি আমার মুখের কথা কেড়ে নাও, মনের ভাবনা কেড়ে নাও, বুকের আবেগও কেড়ে নাও—আমার কোন কাম-সঙ্কল্পের কাছে আমি ধরা দিতে চাই না আর! এবার আমায় নিয়ে তোমার কাজ সুরু হয়ে যাক, আমি যেন তোমার খুসীতে আত্মবলি দিতে পারি! আমার আবেগোচ্ছ্বাসের অনাবশ্যক আড়ম্বরের অংশ মুছে ফেলে যে একবিন্দু সত্য আছে, তাকেই চরণে বরণ করে নিয়ে আমার সব লৌকিকতাকে নীরব করে দাও মা! তোমার পূজাচ্ছলে আমার যা কিছু আধ্যাত্মিকতার অভিনয় টুটে গিয়ে তোমার ভাবের অক্ষয় আবেশে স্বরূপে সে প্রতিষ্ঠালাভ করুক। আমি প্রশান্ত হয়ে তোমাতে ডুবে যাই। আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান-অজ্ঞানকে স্তম্ভিত করে দিয়ে শুধু যেটুকুর জন্য আমি অন্ধ হয়ে আছি সেটুকুকে স্তিমিত করে তোমার বোধন আমার জীবনে অনুরণিত হতে থাক্। তখন আমি থাকি আর তুমি থাক, যা তোমার খুসী। তোমার খুসীতে আমার খুসী মিলিয়ে দিয়ে যা আমি লাভ করলাম, তাই আমার চরম পরম প্রাপ্য সত্য; এই সত্যকে ভিত্তি করে তোমার প্রেমের নিত্য-নূতন আবেশে যে বিচিত্র রসসৃষ্টি জীবনে হতে থাকবে, তা দিয়ে তো তোমারি অর্চ্চনা হবে বিশ্বময়ী! তোমার সে অর্চ্চনায়তনে তখন শুধু আমি কেন, আমার মত আরো কত অকিঞ্চনের আকিঞ্চন স্থান পাবে—তোমার মহিমা তাতে বাড়বে বই কমবে না ত!

বাইরের সমারোহের জন্য অধীর না হয়ে, আবাহন-বিসর্জনের সম্মিলিত অনুভূতিতে প্রশান্ত অন্তরের মণিমন্দিরে আজ তোমার আগমনীর আভাস ধরা পড়েছে। তোমার আভাসেই সারা জগতে আজ এমন নবভাবের হিল্লোল উঠেছে, তুমি এলে যে কি হবে না হবে, সে বুঝি আর মনোবচনের এপারে নয়। সত্যি মা তোমার শেষ কোন দিন পাব না বুঝেছি! তাই এখন আমার শেষ কথা এই—তোমার যেমন খুসী তেমনি হয়ে এসো মা—আমি শুধু আত্মহারা প্রতীক্ষায় তোমার আশাপথ চেয়ে বসে রইলাম!



শক্তি-রহস্য

—•—

আমরা বলি শক্তি, বিজ্ঞান বলে Motion বা গতি, কিম্বা Energy বা বল। এই গতি ও বল সম্বন্ধে বিজ্ঞান আজকাল যে সমস্ত কথা বলিতে সুরু করিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। বিজ্ঞান বলে, জড় শক্তিরই রূপান্তর; হয়ত জড় বলিয়া কিছু নাই-ই, জগৎটা কেবল শক্তিরই খেলা। ইথার বলিয়া একটা সর্ব্বব্যাপী ও অজড়-ধর্ম্মী ভূতসূক্ষ্মের কথা বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন। ইথার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বটে, কিন্তু তা বলিয়া তাহা কল্পনাও নয়; বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে তাহার সত্তা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা যে সমস্ত জড়বস্তু দেখি, কিম্বা জড়ের যে সমস্ত গুণ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহা এই ইথারের স্পন্দন ছাড়া আর কিছুই নয়। অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয়, সর্ব্বব্যাপী ইথারই নানা ভঙ্গীতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া সৃষ্টি করিতেছে—আলো, তাপ, শব্দ, বিদ্যুৎ, চৌম্বক-শক্তি, এক্‌স্‌-রে বা অদৃশ্য আলো ইত্যাদি। মুস্কিল হয় বস্তুর কাঠিন্য লইয়া। বস্তু যদি স্পন্দিত পরমাণুপুঞ্জই হয়, তাহা হইলে তাহা কঠিন হয় কি করিয়া? উত্তর সোজা। প্রচণ্ড গতির সঞ্চার করিয়া দাও, অতি শিথিল বা নমনীয় বস্তুও বজ্রের মত কঠিন হইয়া যাইবে। একটা ঘড়ির চেনকে যদি বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা একটা কঠিন তরোয়ালের কাজ করা যায়, এ তো আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। আরও একটা অদ্ভুত পরীক্ষা আছে। একখানা কাঠের তক্তার ভিতর দিয়া একটা মোমবাতি ঠুকিয়া আস্ত বাহির করিয়া দিতে পারিবে কি? প্রথমতঃ ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু মোমবাতিটাকে বন্দুকে পুরিয়া তক্তাটাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলে উহা সোজাসোজি তক্তাটাকে ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে, অথচ বাতিটা যেমন তেমনিই থাকিবে। প্রচণ্ড বেগই ইহার হেতু। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, বস্তুর কাঠিন্য আর কিছুই নহে, গতির পরিণাম মাত্র। এই যে কলমটা দিয়া আমি লিখিতেছি, ইহা কঠিন বলিয়া নিশ্চল তো নয়। বরং ইহার উপাদান পরমাণুপুঞ্জ প্রচণ্ডবেগে স্পন্দিত হইতেছে বলিয়াই ইহা এমন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই যে গাছ-পালা পশু-পাখী সমন্বিত এই জগৎটা আমার চোখের সামনে ছবির মত মেলিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে দেখিতেছি—এ একেবারেই মায়া, একেবারেই ফাঁকি—এ স্থির হইয়া নাই, প্রচণ্ড শক্তির বেগে অনবরত কাঁপিতেছে। এই হইল বৈজ্ঞানিকের মায়াবাদ।

শক্তি পরমাণুগুলিকে কাঁপাইতেছে, এই কথাটাই পাইলাম। কিন্তু তাহা হইলেও তো মূলে পরমাণু বলিয়া একটা জড়বিন্দু থাকিয়া যায়। বৈজ্ঞানিক বলেন, না, আরো গভীরভাবে তলাইয়া দেখ, তাহাও থাকে না। লর্ড কেল্‌ভিনের মত এত বড় বৈজ্ঞানিক বোধ হয় এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহার Vortex Ring Theory বা আবর্ত্ত-কুণ্ডলিনীবাদ জড়কে শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া ছাড়িয়াছে। তামাক খাইয়া একজন কতকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া দিল। আমরা দেখি ধোঁয়াটা কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বলিবেন, কুণ্ডলীটা ধোঁয়ার নয়, আসলে ওটা যে বাতাসের কুণ্ডলী তাহা হাতে-নাতে প্রমাণ

করিয়া দেওয়া যায়; ধোঁয়ার দরুণ বাতাসের কুণ্ডলীটা আমাদের নজরে আসিয়াছে মাত্র। কুণ্ডলীটা ভাসিয়া যায়, তাহা আমরা অমনিই দেখিতে পাই; কিন্তু আরও একটু লক্ষ্য করিলে দেখি, এই চলন্ত কুণ্ডলীটা নিজের মাঝেই অনবরত ঘুরপাক খাইতেছে। একটা লাঠির মাঝে একটা রবারের আঙটা হড়কাইয়া চালাইয়া দিলে সে যেমন ঘুরপাক খাইতে খাইতে ক্রমে আগাইয়া যায়, এ-ও তেমনি। কিন্তু এই কুণ্ডলিনী-গতির কতকগুলি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম আছে। প্রথমতঃ—অন্যান্য গতির চেয়ে এই কুণ্ডলিনী গতির স্থিতিকাল বেশী। দ্বিতীয়তঃ—চারিপাশে বাতাসের চাপ রহিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই বায়ুকুণ্ডলিনী আপন খুসীতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, আশে-পাশের বাতাস তাহার কিছুই করিতে পারিতেছে না। তৃতীয়তঃ—এই বায়ুকুণ্ডলিনী আমরা অন্য কোনও বাহ্যশক্তির প্রয়োগে নষ্ট করিতে পারি না—ছুরি দিয়া কাটিতে পারি না, লাঠী দিয়া খোঁচাইয়া ছিদ্র করিতে পারি না, ঝাঁকাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারি না—বাহ্য শক্তির ঠেলা পাইলেও সে একটুখানি সরিয়া গিয়া আবার আপন খুসীমতই ঘুরপাক খাইতে থাকিবে—এমনি মায়াবিনী এই কুণ্ডলিনী। চতুর্থতঃ—যেখানে এমনি-ধারা একটা কুণ্ডলিনীর সৃষ্টি হইয়াছে, ঠিক সেই-খানে আবার একরাশ ধোঁয়া ফুঁকিয়া যদি আমরা আর একটা কুণ্ডলিনীর সৃষ্টি করি, তাহা হইলে একটা কুণ্ডলিনীর ভিতর দিয়া আর একটা অনায়াসে পার হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু একটা অপরটাকে কিছুতেই বিধ্বস্ত করিতে পারিবে না। কুণ্ডলিনীগতির এই সমস্ত আশ্চর্য্য ধর্ম্ম। লর্ড কেল্‌ভিন বলেন, পরমাণু বা জড়বিন্দুগুলিও এমনি-ধারা ইথারের আবর্ত্তকুণ্ডলীমাত্র॥ ইথার জড়ধর্ম্মী নয়, সর্ব্বব্যাপী অব্যক্তের সহিত তাহার সাধর্ম্ম্য আছে; আমাদের দর্শনে হয়ত বা ভূতসূক্ষ্ম নাম হইতে পারিত। এই ইথারে কুণ্ডলিনীশক্তির স্ফুরণই জড়পরমাণুর সৃষ্টি করিয়াছে; আবার এই জড়পরমাণুগুলি প্রচণ্ডবেগে স্পন্দিত হইয়া কঠিন বস্তুর আকার ধারণ করিয়াছে। এমনি করিয়া দেখি, জগতে অচঞ্চল বলিয়া কিছুই নাই, সামান্য একটি ধূলিকণা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত কেবল প্রচণ্ডবেগে কাঁপিতেছে এবং কম্পনশক্তিই রূপরসে বিচিত্র এই অপরূপ মায়ার সৃষ্টি করিয়াছে—আমাদেরই চোখের সম্মুখে! বৈজ্ঞানিকের এই থিয়োরী শুনিয়া মায়াবাদী শঙ্কর আশ্বস্ত হইবেন, কেননা এতদিন পরে শুধু বৌদ্ধেরা নয়, চার্ব্বাকেরাও যে তাঁহার দলে ভিড়িয়া গেল।

কেলভিনের থিয়োরী বুঝাইতে গিয়া ইচ্ছা করিয়াই বারবার কুণ্ডলিনীশব্দটার ব্যবহার করিয়াছি। সকলেই জানেন, আমাদের শাস্ত্রেও কুণ্ডলিনীর কথা আছে। যোগে, তন্ত্রে জীবশক্তিকেই বলা হইয়াছে কুণ্ডলিনী। এই কুণ্ডলিনী এক প্রচণ্ড শক্তি—ইহারই বিকিরণ বা মায়া জীবের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার বিচিত্র বিলাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব-শাস্ত্র বলে, জীব চিৎ-কণ বা চৈতন্যের কণা অথবা পরমাণু। চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাবগাহী, এক, অখণ্ড—যেন বৈজ্ঞানিকের ইথারের মত; এই চিদা-কাশে একটী চিন্ময়ী আবর্ত্তকুণ্ডলিনী অথবা একটী জীবপরমাণু—যেন বৈজ্ঞানিকের জড়পরমাণুর মত। আর আশ্চর্য্য এই কুণ্ডলিনীরূপী জীবপর-মাণুর ধর্ম্ম!—চারিদিকের বাহ্যশক্তির প্রচণ্ড পীড়-নের মাঝেও সে তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে; সে অবিনাশী; আপনার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না করিয়াও সে বহু আবর্ত্তকুণ্ডলিনীকে নিজের মাঝে গ্রহণ করিতে পারে। ঠিক জড়কুণ্ডলিনীর মতই এই জীবকুণ্ডলিনীর স্বভাব নয় কি? যোগ-

শাস্ত্র বলে, এই কুণ্ডলিনী যেদিন ঋজু আকার ধারণ করিবে, সেদিন শিবে শক্তি লয় হইয়া যাইবে, জীবের জীবত্ব ছুটিয়া যাইবে। বিজ্ঞান-শাস্ত্রও বলে, ইথারের এই কুণ্ডলিনীগতি যখনই নিবৃত্ত হইবে, তখনই বস্তুর ধ্বংস বা প্রলয়। জড়বিজ্ঞান আর জীববিজ্ঞান বা যোগবিজ্ঞানে কি নিবিড় আত্মীয়তা!

বৈজ্ঞানিকেরা আর একটা কথা বলিয়াছেন! কথাটা আধা বৈজ্ঞানিক আর আধা দার্শনিক। কথাটা এই, গতি স্বীকার করিলেই স্থিতিও স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা গতি ধরা পড়িবে কাহার কাছে? হুস করিয়া একটা ট্রেন চলিয়া গেল আমার সম্মুখ দিয়া; আমি যদি স্থির হইয়া না দাঁড়াইয়া থাকি বা ট্রেণের পেছনের গাছপালার চিত্রপট যদি ভূমিকা রচনা না করে তাহা হইলে সেই চলাকে আটক করিবার জন্য নিশ্চল কিছুরও সত্তা স্বীকার করিতে হইবে; সে নিশ্চল শুধু আমার মনে থাকিলেই হইবে না, তাহাকে চঞ্চলের মাঝেও বাসা বাঁধিতে হইবে —নতুবা গতিই যে সম্ভবপর হইবে না। তাই আবর্ত্তকুণ্ডলিনীর মাঝেও বৈজ্ঞানিককে স্বীকার করিতে হয় শিব-কেন্দ্র বা ধ্রুব বিন্দু। সে বিন্দু জড় তো নহেই; কেননা তখন পর্য্যন্ত জড়ের উদ্ভবই হয় নাই; সে যেন শক্তির সত্তারই প্রয়োজক, চঞ্চলকে সত্তাবান্ করিবার দরুণ নেতিমূলে অচঞ্চলের অধিষ্ঠান, সর্ব্বব্যাপী ইথারেরই কূটস্থ স্বরূপ, শক্তির আবর্ত্ত ধরিয়াই তাহাকে বুঝিতে হয়, নতুবা তাহাকে বুঝিবার আর কোনও উপায়ই নাই, অথচ তাহাকে অঙ্গীকার না করিয়া শক্তির স্ফুরণই হইতে পারে না। যোগবিজ্ঞানও বলে, স্বয়ম্ভুলিঙ্গের কথা। চমৎকার নামকরণ! লিঙ্গ কিনা চিহ্ন—অনন্ত আকাশে একটা মায়ার রেখা মাত্র। অথচ তাও স্বয়ম্ভু, কিনা আপনা হইতে হইয়াছে বা আছে; সেই সর্ব্বব্যাপী শিবই বটে, কিন্তু শক্তির আলিঙ্গনে বাঁধা পড়িয়াছে বলিয়া বলি কূটস্থ; বৈদান্তিকের ভাষায় বলি প্রত্যক্ চেতনা। পক্ষপাতহীন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি লইয়া যখন আলোচনা করি, তখন জড়বিজ্ঞানে আর যোগবিজ্ঞানে তফাৎ দেখিতে পাই না; কি অন্তরে, কি বাহিরে মানুষ তল্লীন হইয়া গিয়া যাহা দেখিয়াছে, তাহাকে প্রকাশ করিবার দরুণ যে আকুলি-বিকুলি, তাহাই দর্শনবিজ্ঞানের অপরূপ পরিভাষার সৃষ্টি করিয়াছে; মানুষ এমন জায়গায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে, যেখানে দার্শনিকের বুলি বৈজ্ঞানিকের মুখে বেমানান ঠেকে না, বৈজ্ঞানিকের ভাষাও দার্শনিকের মুখে শ্রুতিকটু লাগে না। আর দর্শনবিজ্ঞানকে সম্পুটিত করিয়া জাগিয়া থাকে সত্যজাগ্রৎ মানবচেতনার অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়! "সে কি হিল্লোল, সে কি কল্লোল!"—দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিক দুয়েরই মুখে রহস্যসমুদ্রের এই চরম বর্ণনা।

Motion-এর কথাই বলিয়াছি, এইবার বলি বৈজ্ঞানিকের Energy-র কথা। Motion বা গতি হইতেই Energy-র বা বলের প্রসঙ্গ আসে। বৈজ্ঞানিক বলেন, যেখানেই দেখিব গতি, সেখানেই বুঝিব, ইহার পূর্ব্বেও কোন না কোন আকারে গতি নিশ্চয়ই বর্ত্তমান ছিল, এই গতি পূর্ব্বতন গতিরই অনুবৃত্তি মাত্র। অথবা কোথাও না কোথাও কতকটা বল ব্যয়িত হইয়া এই নূতন গতির সৃষ্টি করিয়াছে। একটা কন্দুক ছুঁড়িয়া দিলাম; কন্দুকের এই গতি কোথা হইতে আসিল? আমাদের মাংসপেশীতে এই গতি বল-রূপে স্তব্ধ হইয়া ছিল। মাংসপেশীর বল কোথা হইতে আসিল? খাদ্যের মাঝে যে শর্করাজাতীয় উপাদান ছিল, তাহাই ব্যয়িত হইয়া মাংসপেশীর

আকুঞ্চনরূপ ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে; সেই ক্রিয়াও আবার কন্দুকে গতিরূপে দেখা দিয়াছে। এইরূপে পেছন ঠেলিয়া যতই অগ্রসর হইব, ততই দেখিব কোন-না-কোন আকারে বল সঞ্চিত ছিল, তাহা রূপান্তরিত হইয়া নূতন বলে—গতিতে—বস্তুতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহা হইলেই প্রমাণ হইল শক্তির ভাণ্ডার অক্ষয়। ইহাকেই বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, Theory of Conservation of Energy. এই থিয়োরী হইতে বিশ্বরহস্যের এই মীমাংসা পাই—বস্তুর পরিণাম বা রূপান্তরও শক্তিরই খেলা এবং মূলে সে শক্তি নিত্য ও অব্যয়।

এই শক্তি-নিত্যতাবাদ নিউটনের প্রথম গতিবাদের বা Law of Inertiaতে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শক্তি-নিত্যতাবাদ বলিতেছে—শক্তির ধ্বংস নাই, শক্তি নিত্য। আপাততঃ দৃষ্টিতে আমরা যাহা মনে করি ধ্বংস, তাহা রূপান্তর মাত্র। বারবার একটা চাকা ঘুরাইয়া বাহু ক্লান্ত হইয়া পড়িল; বাহুর শক্তি নষ্ট হয় নাই, চক্রের ঘূর্ণনে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। চাকাটাও ঘুরিতে ঘুরিতে থামিয়া গেল; এই শক্তিটাই বা কোথায় গেল? নষ্ট হইয়া গেল কি? শক্তি-নিত্যতাবাদ হইতে এই সিদ্ধান্ত হয়, একটা বস্তুতে যদি গতির সঞ্চার করা যায়, তাহা হইলে সেই গতি তাহার দিক ও বেগকে অব্যাহত রাখিয়া অনন্তকাল স্ফুরিত হইতে থাকিবে, যে পর্য্যন্ত কোনও বলবত্তর বিরোধী-শক্তি তাহাকে বাধা না দিবে। চাকাটা ঘুরাইয়া দেওয়ার উপলক্ষ্যে যে শক্তিটুকু আমার বাহু হইতে চাকায় সংক্রামিত করিয়াছিলাম, তাহা অক্ষয়। সুতরাং প্রথম বলপ্রয়োগেই চাকাটা যেদিকে যতখানি বেগে ঘুরিয়া গিয়াছিল, বাধা না পাইলে অনন্তকাল ধরিয়াই সেই দিকে সেই রকম বেগেই ঘুরিতে থাকিত, কেননা চাকার ঘূর্ণনটা আমার বাহুর শক্তিরই রূপান্তর মাত্র; এবং শক্তি যখন অক্ষয়, তখন ঘূর্ণনটাও অনন্ত। কিন্তু চাকাটা ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে থামিয়া যায়, কেননা বাতাসের ঘর্ষণ, অক্ষদণ্ডের ঘর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বিরোধী শক্তিগুলি তাহাকে বাধা দেয়। বাধা না পাইলে গতির হ্রাস হইত না। তেমনি, যাহা গতিহীন, তাহাকে না নড়াইয়া দিলেও অনন্তকাল ধরিয়া সে নড়িত না—ইহাও সত্য। এই দুইটী তথ্য মিলাইয়া Law of Inertia বা জড়ধর্ম্ম। দার্শনিকের ভাষায় ইহাকে এইভাবে বলা যাইতে পারে, জড়ের কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই, তাহাকে চলিতে দিলে সে অনন্তকাল ধরিয়াই চলিবে, আবার থামাইয়া রাখিলেও অনন্তকাল ধরিয়াই থামিয়া থাকিবে। এই ধর্ম্মই সাংখ্যের তমঃ, পাতঞ্জলের অভিনিবেশ। সাংখ্য বলেন, তমঃ প্রকৃতি বা শক্তিরই একটা স্বরূপ; বিজ্ঞানও বলে, সমস্তটা জগৎই যখন স্পন্দিত, তখন বস্তুর বিশ্রাম বা গতিনিবৃত্তি বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না—গতিনিবৃত্তি Balance of Force বা পরস্পরবিরোধী শক্তির সামঞ্জস্য ছাড়া আর কিছুই নহে। যদি এই balance বা সামঞ্জস্য বিন্দুমাত্র টলিয়া যায়, তাহা হইলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হইবে, অনন্তকাল ধরিয়া তাহার স্পন্দন চলিতে থাকিবে। একজন ভাবুক এই কথাটাই বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "এই যে আমার পায়ের নীচে ঘাসের শিষটী কাঁপিয়া উঠিল, দূরতম নক্ষত্রকে সে দোলা দিবে না কি?" ভাবুকের কথা হইলেও কথাটা বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে নির্ভেজাল সত্য।

Conservation of Energy, Law of Inertia, Balance of Power—এইগুলি মিলাইয়া বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি লইয়া জগতের পানে চাহিলে দেখি—শক্তির কি বিচিত্র ইন্দ্রজাল! আমার দীর্ঘনিঃশ্বাসে এই যে বায়ুতে আন্দোলনের সৃষ্টি

হইল, অনন্ত কাল ধরিয়া ইহার বিরাম নাই; অথচ বিরোধীশক্তির প্রতিঘাতে—উহা নষ্ট হইয়া যায় কি?—না, সুপ্ত হইয়া থাকে মাত্র—যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা অব্যক্তে লীন হইয়া যায় মাত্র। প্রথম "প্রৈতি" বা First momentum কোথা হইতে আসিল? যে আঘাতে স্পন্দনের প্রথম অভিব্যক্তি, সেই আঘাতেরও তো ইহাই আদি নয়। এই আঘাতও যে অব্যক্তেরই ক্ষণিক অভিব্যক্তি মাত্র। যে দিকেই চাই, কেবলই রহস্যের মায়াজাল। যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, তাহাই আদ্যন্তযুক্ত হইয়া দেখা দিতেছে, যাহা অব্যক্ত, তাহাই ক্ষণিকের তরে ব্যক্ত হইয়া আবার অব্যক্তেই লীন হইয়া যাইতেছে। জগতে যাহা স্থায়ী, যাহা জড়, তাহাও শক্তির তরঙ্গের প্রতিঘাতে উদ্ভূত মায়ামাত্র!—জগৎ একটা ইন্দ্রজাল নয় তো কি?

এই তো জড়-জগতের শক্তিরূপ। কিন্তু আরও কথা আছে। বৈজ্ঞানিকের শক্তিনিত্যত্ববাদ ঘাঁটিয়াই কথাগুলি পাই। কন্দুকে যে গতির বিকাশ, তাহার নিদান আমার মাংশপেশীতে; মাংসপেশীর শক্তি আসিয়াছে আহার্য্যের শর্করা-উপাদান হইতে। শর্করা এ শক্তি পাইল কোথা হইতে?—শর্করা-উৎপাদক জীবন্ত উদ্ভিদ্ হইতে। উদ্ভিদ্ তাহার শক্তি পাইল কোথা হইতে?—সৌর কিরণ হইতে। সূর্য্যের শক্তি আসিল কোথা হইতে?—বৈজ্ঞানিক বলেন, সম্ভবতঃ সৌরপরমাণুতে যে স্থাবরশক্তি (Potential Energy) সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাই জঙ্গম হইয়া (Kinetic) এই রূপান্তরপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে। এই পর্য্যন্ত পাইলাম কিন্তু জড়েরই বিবর্ত্তন। কিন্তু কথাটা আরও এক দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিবার আছে।

কন্দুকটাকে ছুঁড়িয়া দিবার দরুণ আমার পেশীতে অনুজ্ঞা আসিল কোথা হইতে? একদিক দিয়া ধরিতে গেলে, আমার ইচ্ছাই তো গতির মূল। এই ইচ্ছার স্বরূপ কি? মানবদেহের সূক্ষ্ম নাড়ী-মণ্ডলীকে চিরিয়া, মস্তিষ্কের ধূসর উপাদান ঘাঁটিয়া বৈজ্ঞানিক অনেক তথ্যই আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রত্যেকটী মানসীক্রিয়ার পেছনে কতটুকু শারীর-ক্রিয়ার খরচ বরাদ্দ করা আছে তাহার চুলচেরা হিসাব বাহির করিয়াছেন, কিন্তু তবুও ইচ্ছার স্বরূপ কি, তাহা ধরিতে পারেন নাই। কেনই বা মস্তিষ্কে আলোড়ন উপস্থিত হইল, কেনই বা আজ্ঞাবহা নাড়ী বাহিয়া সে আলোড়ন পেশীকে উত্তেজিত করিল এবং পেশীর উত্তেজনা কেনই বা শারীর বলরূপে বিকশিত হইল, ইহার কোনও মীমাংসাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দেখি, জড়-শক্তির মূলেও প্রাণশক্তির খেলা; আবার সেই প্রাণও যেন কাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত! আবার সেই বৈদিক ঋষির মতই আকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করি—

কেনেষিতং প্রেষিতং পততি মনঃ,
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি-যুক্তঃ?

—কাহার ইচ্ছায়, কাহার প্রেরণায় মন ছুটিয়া যায়? কাহার কাছে প্রাণ তাহার প্রথম প্রৈতি (First momentum) পাইল?

সেই চিরন্তন রহস্যময় প্রশ্ন—জড়ের ধারা আর চৈতন্যের ধারা পাশাপাশি চলিয়াছে; কি করিয়া একের সহিত অপরের সংযোগ ঘটে?

বৈজ্ঞানিক বলিলেন, সমস্তটা জগৎই অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে; গতিই জগতের স্বরূপ; স্থাণুত্ব শুধু বিরোধী শক্তির সমন্বয় মাত্র; শক্তি অনন্ত ইত্যাদি। সমস্তই বুঝিলাম। কিন্তু কেনই বা এই অগণিত গতি-শক্তির বিকাশ? কেনই বা তাহাদের দিগ্বিভেদ? এইখানে শক্তির সমন্বয় হইবে আর ওইখানে হইবে না, এখন হইবে তো তখন হইবে না—কেন? বিরোধী

শক্তির সমন্বয়ে কন্দুকটা স্থির হইয়াছিল; কে এই সমন্বয় ঘটাইতে বলিয়াছিল? তুমি আসিয়া তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া সচল করিয়া দিলে—না হয় বুঝিলাম, তুমি যে প্রচুর শর্করা খাইয়াছ তাহাই এমনি করিয়া গতিতে রূপান্তরিত হইল; কিন্তু তুমি ঠেলা দিতেই বা গেলে কেন?

এইবার হয়ত বলিবে, ঠেলা দিলাম আমার ইচ্ছা! ব্যস্—ইহার পর আর কথা নাই, বৈজ্ঞানিকের শর্করা-তত্ত্বের এইখানেই সমাধি। দেখি, যাহা ঘটে নাই, ইচ্ছা তাহাই ঘটাইতেছে; যাহা ঘটিয়া চলিয়াছে, ইচ্ছা তাহার গতিরোধ করিতেছে। যতই নিদান খোঁজ না কেন—ইচ্ছার চরমে একটা সুনিশ্চিত কিছু তুমি দাঁড় করাইতেই পার না। তোমার জড়শক্তি যদি অনন্ত হয়, তো ইচ্ছাশক্তি অনির্ব্বচনীয়। এনার্জ্জী যদি শক্তির জড়রূপ, ইচ্ছা তাহা হইলে তাহার চিন্ময়রূপ।

আরও কথা আছে। শুধু জড় নিয়াই তো জগৎটা নয়; চেতনাও যে আছে সেখানে। জড় ঘাঁটিয়া পাইয়াছিলাম এনার্জ্জি, দেখিয়াছিলাম একই এনার্জ্জিই বহুধা রূপান্তরিত হইয়া জড়ের অগণিত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে। আবার চেতনা ঘাঁটিয়াও দেখি, ইচ্ছারই বা কি অফুরন্ত বিলাস! এক ইচ্ছাই তো কত বিচিত্র মনোবৃত্তির আকারে ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে! Conservation of Energy যদি Physics-এর সত্য হয় তো Conservation of Will-ও যে Metaphysics-এর সত্য। আবার দেখি Energyর উপর এই Will-এর ছাপ পড়িতেছে বলিয়াই না প্রকৃতির এমন বিচিত্র রূপান্তর!—ভয়ে ভয়ে বৈজ্ঞানিককে বলিতে হয়, আমার ইচ্ছাই বোধ হয় তোমার গতির প্রথমা প্রেতিঃ—First momentum. অচল কন্দুককে সচল করিয়াছিল আমার ইচ্ছা—যে ইচ্ছা অরূপা, অনির্ব্বচনীয়া। তেমনি অচল জড়কে সচল করিয়াছে—সেও তো কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে?

ইচ্ছার স্বরূপ আরও একটু তলাইয়া দেখ, আর একটা বস্তুর সাক্ষাৎ পাইবে—সে হইতেছে আনন্দ। আমার যাহাই ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি না, তাই বড় দুঃখ। দুঃখ চলিয়া যায়, যদি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পাই। আনন্দের পুঁজি বেশী হইলে মানুষ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া বসে! জড়জগতে নিয়মের বাঁধন অটল হইয়া চাপিয়া বসিয়া আছে—সেখানে চিত্রগুপ্ত খাতা মেলিয়া কড়াক্রান্তির হিসাব রাখিতেছেন, কোথায়ও একচুল অপচয় করিবার জো নাই। নিয়মের এই শৃঙ্খলার উপরই ঝাঁপাইয়া পড়িল আনন্দের উচ্ছল তরঙ্গ—নিয়মকে সে লঙ্ঘন করিল না বটে, কিন্তু তাহাকে হাজারো রকমে বাঁকাইয়া-চুরাইয়া অপরূপ করিয়া তুলিল। নিয়মের জবাবদিহী আছে, কিন্তু আনন্দের জবাবদিহী নাই। যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন এমন করিলে? বলিবে, আমার খুসী, তাই করিয়াছি।—দেখ দেখি, সুন্দর হইয়াছে কিনা?

এখন এই দুইটাকেই মিলাইয়া লও। একদিকে আছে বৈজ্ঞানিকের বহির্জ্জগৎ; তাহার পাকে পাকে কেবল আইন-কানুন আর হিসাব-নিকাশ; সেও অনন্ত, অক্ষয় বটে, কিন্তু প্রাণের অভাবে অচল। আর একদিকে আছে, দার্শনিকের অন্তর্জ্জগৎ—সেখানে এনার্জ্জীর গম্ভীর নির্ঘোষ শুনিতে পাই না—দেখি শুধু কুহকিনী বাসনার চটুল নৃত্য, 'উচ্ছলিত আনন্দে হেলিয়া-দুলিয়া অপরূপ ভঙ্গিমায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে আর তাহার নূপুর-নিক্কণের তালে তালে বাহিরের এনার্জ্জীর জগতে একটা প্রচণ্ড প্রাণের দোলা দুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছে।

এই দুইয়ের বিলাস অফুরন্ত। দুর্নিবার গতি—এও

যেমন জগতের সত্য, তেমনি সেই গতির মূলে বাসনার বিলাস, এ-ও তো সত্য। বাহিরে-ভিতরে দুইটী মিলিয়া শক্তির অপরূপ প্রকাশ। বৈজ্ঞানিকের কথায় সায় দিয়া যেমন বলিব, প্রকৃতি শক্তিময়ী, তেমনি আবার দার্শনিকের সুরে সুর মিলাইয়া বলিব, সে ইচ্ছাময়ী, অনির্ব্বচনীয়াও বটে। ভাবুক বলিবেন, ওরে ক্ষ্যাপা, ওই তো রে তোর সাথে অভেদে জড়িতা নিত্য চিদ্বিলসিতা আনন্দময়ী!

আগমনী

আনন্দময়ীর আগমনে আজ দিকে দিকে আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছে। ভক্তের আকিঞ্চনে, তার আবেগভরা প্রার্থনায়, চিন্ময়ী জননী মৃন্ময়ী বেশে অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। শোক-দুঃখ, জরা-মৃত্যুর আতঙ্ক, নিমিষে কার অমিয়-পরশে দূর হয়ে গিয়েছে। সবই যেন আবার নূতন প্রাণ পেয়ে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। কার অভাবে যেন এতদিন প্রাণ পেয়েও প্রাণহীনের মত বুকভরা সন্তাপ নিয়ে দিন কাটিয়েছি; প্রাণ যাকে চেয়েছিল, যে অভাবে প্রতিনিয়ত সব পেয়েও যেন কিছু পাইনি এমনি মনে হত, আজ তাকে অতি সন্নিকটে স্থূলচোখেই দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাই আমাদের আনন্দ আর ধরে না। এতদিনে বুঝেছি, সারা বর্ষব্যাপী আকুল ক্রন্দনে যাকে চেয়েছি —সে তুমিই, আনন্দময়ী মা আমার! এমন করে না কাঁদিয়ে, তোমার জন্য ব্যাকুল না করে দেখা দিতে সুখ হয় না বুঝি তোমার! কাঁদাও তাতে ক্ষতি নাই, পরিশেষে যেন তোমার দেখা পেয়ে সকল জ্বালা ভুলে যেতে পারি। তুমি আছ, অথচ তোমায় দেখ্‌তে পাব না এ কেমন কথা! তুমি নাকি অমূর্ত্তভাবময়ী চিৎশক্তি? তবে আমার মাঝে রূপের সংস্কার এল কোথা থেকে মা? তুমি আছ বলেই না তোমায় দেখ্‌তে চেয়েছি। তুমি নাই এ কথা তো জোর করেও ধারণায় আন্‌তে পারি না। আমি যখন আছি, তখন তুমিও আছ, তা না হলে আমার আমিই বা এল কোথা থেকে? আমিহারা অনুভূতি এখনও পাইনি, তাই তুমি নাই—এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। সকলের হৃদয়াবেগ একত্র হয়েছে বলেই এত সহজে আমরা তোমার দেখা পেয়েছি। তুমি একা আমার জননী নও, বিশ্বজননী তুমি, তাই তোমায় পেয়ে আমি যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছি, তেমনি বিশ্ববাসীও আনন্দে আত্মহারা। সবার লক্ষ্য এক, তাই পরস্পরের মাঝে আজ বৈষম্যের রেখাপাত তো হয়নি কোথাও। বহুদিনের সঞ্চিত, চিরপোষিত হিংসা-দ্বেষ ভুলে গিয়ে আজ মায়ের রূপ নিরীক্ষণ করবে বলে পরস্পরের গৃহে পরস্পরের যাতায়াতও চলেছে।

মায়ের কি অপরিসীম শক্তি! বিভিন্ন আধারে একসুর বেজে ওঠা কি সহজ কথা? আর-সকলকে নিয়েই দলাদলি হয়, বিপদ বাধে—কিন্তু মা আমার এ সবের পরপারে—মা, সকলেরই

মা—যেমন শিশুর তেমনি বৃদ্ধের, যেমন ধনীর তেমনি কাঙ্গালের। মা বিশেষ করে কারও নয়—অথচ সকলেরই। মাতৃসত্তা দিয়ে নিখিল জগৎকে অনুপ্রাণিত ভাবতে গেলে শুধু আমার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মায়ের রূপ কল্পনা করলেই চল্‌বে না। মাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝ্‌তে হলে, রূপের মায়া অতিক্রম করে অরূপের আস্বাদনও নিতে হবে। আজ যে ঘরে ঘরে মায়ের রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, একে অতিক্রম করে ভাবলোকে মায়ের ভাবময়ী মূর্ত্তিও আছে। সেই অমূর্ত্তরূপ হতেই মায়ের মূর্ত্ত-রূপের বিকাশ। আর ওই আভাস পেয়েই না আমরা মূর্ত্তি গড়ে নিয়েছি। মায়ের অংশ মাত্র ব্যক্ত, আর সবই অব্যক্ত। তাই রূপ দেখে পাওয়া শেষ হয়ে গেল বলে তুষ্ট থেকো না। যতখানি দেখছ, তার চেয়ে ঢের অদেখা রয়ে গিয়েছে। তাই পাওয়ার তৃপ্তির চেয়ে, না পাওয়ার ব্যাকুলতা বেশী দেখে সংশয় করো না। কত আর জেনেছ, আরও জানতে হবে। মায়ের রূপ আছে বটে কিন্তু সে রূপ সমস্ত ব্যষ্টিরূপের সমষ্টি। তাই ব্যষ্টির মায়াকে অতিক্রম করতে না পারলে, রূপের সঙ্কীর্ণ সংস্কার নিঃশেষে মুছে না গেলে, সমষ্টিরূপ ফুটে উঠবে কি করে? মায়ের ভাণ্ডারে যে কত ধন সঞ্চিত রয়েছে—কেবল একদিকের খবর পেয়েই তুষ্টি লাভ করবে কেন? অন্তহীন ব্যাকুলতায় মায়ের সব রূপের দর্শন হবে তোমার। চিন্ময়ী জননীর চিন্ময় সন্তান যে তোমরা।

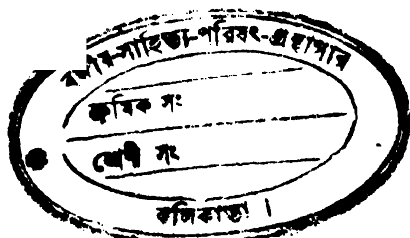
মা আমার চৈতন্যরূপিণী, অথচ তাঁরই কটাক্ষপাতে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি প্রলয় ঘট্‌ছে। দেবাসুর-সংগ্রামে তুমিই মহাশক্তিরূপে উদ্ভূতা হয়ে দুষ্টশক্তিকে প্রনষ্ট করে দেবশক্তিকে বিজয়ী করেছিলে। তাহলে দেখছি, ব্রহ্মস্বরূপে লীন নির্গুণভাব যেমন সত্য, তেমনি তোমার সগুণ ভাবও সত্য। তুমিই মহাশক্তিরূপে অমূর্ত্তভাবে চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমানা, আবার তোমার বিলাসেই গুণময়ী মূর্ত্তির উদ্ভব। তাই বলি, তুমি সগুণও নও, নির্গুণও নও—তুমি রহস্যে অনির্ব্বচনীয়া। আর ডাকলে যখন সাড়া পাই, প্রত্যক্ষ দেখি, তবে আর নির্গুণাই বা বলি কিসে? চণ্ডী বল্‌ছেন, দেবগণের তেজ হতেই তুমি উদ্ভূতা হয়েছিলে; তা হলে তো আমাদের মাঝেও তুমি রয়েছ—আত্মশক্তির উদ্বোধনেই তোমার স্ফুরণ। আসুরিক শক্তিকে বিপর্য্যস্ত করে দেবশক্তির প্রতিষ্ঠাতেই তোমার প্রতিষ্ঠা। বহির্জগতে মা মা বলে, বনজঙ্গলে তোমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছি কেন মা! তুমি যে অন্তরের সম্পদ—বাইরের সাধনায় কি হবে?—আমাকে যে অন্তর্মুখী হতে হবে।

অহং-বুদ্ধিই বিকল্পের আশ্রয়, পতনের মূল কারণ। এ গর্ব্ব নিয়েই অসুরেরা একদিন ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল; যাঁর শক্তিতে শক্তিমান, তাঁকে ভুলে গিয়ে শক্তির গর্ব্বে তাদের বুক ফুলে উঠেছিল। অহংএর অভিমানে যদি এমন শোচনীয় দশা ঘটে, অতলে তলিয়ে যেতে হয়, তবে জীবে জীবে এ অভিমানের বীজ কেন রোপণ করেছিলে মা! অহংএর অভিমান যে কিছুতেই ছাড়তে পারছি না, সাধন-সহায়ে তাকে স্বচ্ছ করলেও একেবারে সে ফাঁকা হয়ে যেতে তো চায় না, সরিয়ে দিলেও যে আবার আমায় ঘিরে বসে। তবে কি এর বিনাশ নাই—চিরকালই আমায় অহংএর তীব্র অভিমান নিয়ে দূরে দূরে সরে থাকতে হবে? দাপাদাপি, লাফালাফি করেও তো শান্তি পাচ্ছি না—আবার আপনিই যে সময়ে মাথা নত হয়ে আসে। এতেও তো বুঝি, আমার ওপরেও একজনার কল্যাণময়ী শক্তি অনবরত ক্রিয়া করছে। তা না হলে পাপ করে পাপের অনুশোচনা জাগে কেন?

প্রবৃত্তির পঙ্কময় ভোগের পথে বিচরণ করেও তো স্বস্তি পাই না। তুমি ছাড়া যখন কিছুতেই স্বস্তি নেই আমার, তখন তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার উপকরণ আমায় জুটিয়ে দাও কেন মা!

বুঝেছি, তোমার হয়ে থাকাই আনন্দ; আমার শেষ পরিণতিও তাই। মান-অভিমান, অহঙ্কারের তীব্র সংস্কার যখন কিছুতেই অপসারিত হবে না, তখন তোমার দেওয়া যা কিছু তুমিই গ্রহণ কর—আমি কেবল চাই তোমাকে। সাধন-জগতের শিশু আমরা, এত অগ্নি-পরীক্ষার মাঝে তুমি সহায় না হলে, কি করে বিপদ হতে উদ্ধার হব মা! আমরা যে শরণাগত, প্রপন্ন। মুক্তির কথা ভেবে আকুল হয়েছি, কিন্তু কি করে মুক্তি পাব, তুমি যদি সকল জঞ্জাল মিটিয়ে না দাও মা! আমার আমিকেও ছাড়তে পারছি না, তোমাতেও নিঃশেষে আত্মসমর্পণ হয়ে উঠছে না—না এদিক না ওদিক—দোটানায় পড়েই তো যত উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্দীপনার উজ্জ্বল মুহূর্ত্তে তুমি যে আছ, এ অনুভূতি আমি পেয়েছি—তাই মিথ্যা অহংএ তৃপ্ত হয়ে থাকাও তো আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। কোন পথ অনুসরণ করে চল্‌লে তোমার অভয়পদে গিয়ে উপনীত হব—এ কথা না বলে দিয়েই তো আমায় ফাঁপরে ফেলেছ তুমি। তবে কি আমায় দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন দেখেই তোমার শান্তি? মা-ছেলেতে কি এই সম্বন্ধ? তুমিই না বর দিয়েছিলে "শোকে-দুঃখে পড়ে আকুল প্রাণে যখনই আমায় ডাকবে তখনই এসে হাজির হব আমি।" না জানালেও তো মা ছেলের কি অভাব তা জান্‌তে পারেন। ছেলের সঙ্গে যে মায়ের নাড়ীর যোগ রয়েছে—সন্তানের দুঃখে যে মাও আকুল হয়ে পড়েন। মাকে পাষাণী বলি কিসে? সন্তানের দুঃখ মোচন করতেই তো দশভুজা দুর্গতি-নাশিনীর আগমন। বর্ষে বর্ষে একবার করে দেখা দিয়ে সঞ্চিত মলিনতা দূরীভূত করে নূতন করে যে আনন্দের সঞ্চার করে যান, তার স্মৃতি ধরে রাখতে পারি না বলেই তো মায়ের ওপর দোষারোপ করি আমরা।

"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।"—মা আমার প্রসন্ন হয়েই আছেন, সন্তানের কল্যাণে তাঁর বরাভয় কর উদ্যত হয়েই আছে। ধৈর্য্য-হারা হয়ে যাই, তাই এ কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। মাকে জান্‌তে হল সাধক হতে হবে। মায়ের শক্তি লাভ করব এ আশায় সাধনা করতে বসিনি—মাকে পাব এই জানি। যার হৃদয় নির্ম্মল হয়ে এসেছে, তার মাঝেই মা বুকজোড়া আসন নিয়েছেন। বাহ্যিক আড়ম্বরে মত্ত না হয়ে, আজ শুধু সত্যিকার আবেগ নিয়ে পূজায় বস—তবেই পূজা সার্থক হবে। বাইরের উপকরণ নাই বা জুটল তোমার; তোমাকে তো তুমি উৎসর্গ করে দিতে পার। এর চেয়ে বড় অঞ্জলি আর কি আছে? মাও যে চান, মায়ের ছেলে বলেই তুমি গর্ব্ব অনুভব কর।



হৈমবতী উমা

—(:০:)—

মায়ের আবির্ভাবের অতি পুরাতন একটি কাহিনী।—

"অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্রহ্মই দেবতাদের হইয়া জয়লাভ করিলেন; কিন্তু সেই ব্রহ্মেরই বিজয়ে দেবতারা উঠিলেন ফাঁপিয়া। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, আমাদেরই তো এই বিজয়—আমাদেরই তো এই মহিমা!

"ব্রহ্ম তাঁহাদের এই অভিমান বুঝিতে পারিয়া সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবতারা বুঝিতে পারিলেন না, এই যক্ষ কে?

তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন, জাতবেদা, তুমি তো সব জান, এই যক্ষ কে, তাহা জানিয়া আইস। অগ্নি বলিলেন, আচ্ছা।

"অগ্নি তাঁহার কাছে ছুটিয়া গেলেন; তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বট? অগ্নি বলিলেন, আমি?—আমি অগ্নি, অথবা আমি জাতবেদা!

—খুব বড়-লোক তো! আচ্ছা, কি তোমার সামর্থ্য?

—সব পোড়াইয়া ফেলিতে পারি—এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব!

"তাঁহার কাছে একটা খড় ফেলিয়া দিয়া যক্ষ বলিলেন, এটাকে পোড়াও। অগ্নি খড়টার দিকে ছুটিয়া গেলেন, কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতেও তাহাকে পোড়াইতে পারিলেন না। তখন সেই যক্ষের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, নাঃ, বুঝিতে পারিলাম না, এই যক্ষ যে কে!

"তারপর দেবতারা বায়ুকে বলিলেন, বায়ু, এই যক্ষ কে, তাহা জানিয়া আইস। বায়ু বলিলেন, আচ্ছা।

"বায়ু তাঁহার কাছে ছুটিয়া গেলেন; তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যক্ষ বলিলেন, কে বট? বায়ু বলিলেন, আমি?—আমি বায়ু অথবা মাতরিশ্বা।

—খুব বড়লোক তো! আচ্ছা, তোমার সামর্থ্য কতটুকু?

—সব নড়াইতে পারি, যা কিছু আছে এই পৃথিবীতে সব!

"তাঁহার কাছে একটা খড় ফেলিয়া দিয়া যক্ষ বলিলেন, এটাকে নড়াও! বায়ু খড়টার দিকে ছুটিয়া গেলেন, কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতেও তাহাকে নড়াইতে পারিলেন না। তখন তিনিও সেই যক্ষের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, নাঃ, বুঝিতে পারিলাম না এই যক্ষ যে কে!

"তখন দেবতারা ইন্দ্রকে বলিলেন, মঘবন, এই যক্ষ কে, তাহা জানিয়া আইস। আচ্ছা বলিয়া ইন্দ্র তাঁহার পানে ছুটিয়া গেলেন। ইন্দ্রের নিকট হইতে যক্ষ অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

"সেই আকাশেই তিনি একটী স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার কাছে গেলেন—পরমাশ্চর্য্য সুন্দরী হৈমবতী উমার কাছে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই যক্ষ কে?

"উমা বলিলেন, ব্রহ্ম। ব্রহ্মেরই বিজয়ে তোমাদের এই দাপাদাপি। তখন ইন্দ্র জানিলেন, এই ব্রহ্ম!

"এই জন্যই এই দেবতারা অন্য দেবতাদের যেন ছাড়াইয়া গিয়াছেন—এই যে ইন্দ্র, বায়ু, আর অগ্নি, এঁরাই; তাঁরা এই ব্রহ্মকে খুব কাছাকাছি ছুঁইয়া গিয়াছেন কিনা! তাঁহারাই প্রথমে জানিলেন, এই ব্রহ্ম।

"এই জন্যই ইন্দ্রও যেন অন্য দেবতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তিনি এই ব্রহ্মকে খুব কাছা-

কাছি ছুঁইয়া গিয়াছেন কিনা! তিনিই ইঁহাকে প্রথম ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন।"

সামবেদের কেনোপনিষদে এই কাহিনী আছে। কেনোপনিষদে নানা ভাবে শক্তিতত্ত্বেরই বিশ্লেষণ—একেবারে শান্তিপাঠের গোড়ার কথাটা হইতে শেষ পর্য্যন্ত। স্তরে স্তরে সব কথাই জমিয়া আছে, নিষ্কাশন করিয়া লইতে জানিলেই হয়।

কাহিনীটা যে রূপক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। রায়টা আমাদের মত অর্ব্বাচীনের নয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যেরও মুখে ওই কথা। তবে রূপক বলিতে যা-তা বুঝিয়া বসি, এই দুঃখ। রূপক যেন সাধন-সঙ্কেতের চার্ট; এখানে সত্য নয় তো ওখানে সত্য। কথা আছে, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা"—সাধকের হিতের দরুণই অরূপ ব্রহ্ম রূপের কল্পনায় তাহার হৃদয়ে উঁকিঝুঁকি মারেন। সংশয়ের তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ চারিদিকে উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, তাই এই সাফাইটুকু গাহিয়া রাখিলাম।

যে ক্ষুদ্র রূপকটী অভিনীত হইল, তাহার পাত্রপাত্রী পাঁচজন; অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, উমা, ব্রহ্ম। গোড়াতেই বলিয়া রাখি, এটা বেদান্ত। সুতরাং যাহা কিছু বুঝিতে হইবে, তাহা স্বাত্মা-নুভূতি দিয়া। বাহিরে বাহিরে হাতড়াইবার প্রয়োজন নাই; আমার ভিতরেই এঁরা আছেন; যিনি যে লোকে, সেই লোকে এই চেতনাকে উঠাইয়া নিতে পারিলেই হইল। যোগীরাও বলেন. ব্রহ্মাণ্ডে যা আছে, এই পিণ্ডেও তা আছে।

নেপথ্যে একটা অভিনয় হইয়া গিয়াছে—সেটা দেবাসুরের লড়াই। প্রথম দৃশ্যেই দেখি, অসুর পরাজিত, দেবতারা উল্লসিত। দেববিরোধী অর্থে অসুর কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক; অসুরের খুব পুরাতন নাম হইতেছে বৃত্র। বৃত্র অর্থে যাহা আবরণ করে (বৃ+ত্র) অর্থাৎ অন্ধকার; আর দেব অর্থে যাহা দীপ্তিশালী অথবা আলো। আলো-আঁধারের লড়াইয়ের কাহিনী সনাতন; আবেস্তাতেও ওই দুটাই তত্ত্ব।

অসুরদের গুষ্ঠীর এত পরিচয় পাই না, যত পাই দেবতাদের। অসুরেরা শুধু বৃত্র—শুধু আঁধার; আঁধারে সব কিছুই এক্‌-সা হইয়া যায়; সেখানে বর্ণ-বিচার নাই বটে; অজ্ঞানের এক রূপ, তাহা শুধু অজ্ঞানই। কিন্তু জ্ঞানের ভূমিকা আছে, চেতনাকে ধাপে ধাপে তুলিয়া নেওয়া যায়; তাই দেবতারা বহুরূপী।

অসুর আর দেবতার লড়াই হইতেছে চেতনার ক্ষেত্রে—মানুষ যতই জানিতেছে, ততই বৃত্র হটিয়া যাইতেছে, দেবশক্তির বিজয় ঘটিতেছে। এই বিজয়েরই কয়েকটী স্তর, চেতনারই কয়েকটী ভূমিকা—ক্রমান্বয়ে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, উমা—পরিশেষে ব্রহ্ম।

ব্রহ্মই অন্ত বটে, কিন্তু তিনিই আবার আদি। মানুষ আদি-অন্ত জ্যোতির্ম্ময়। কিন্তু বৃত্রের কবলিত হইয়া সে সেকথা ভুলিয়া যায়। একটু একটু করিয়া আঁধার সরিয়া যায়, আর সেই আঁধারের অপসরণ দিয়া সে নেয় আলোকের পরিচয়; ইহাই অভিমান, বৃত্রের প্রেত। ইহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিতে হইবে, জানিতে হইবে সমস্তই ব্রহ্ম—আলো নয়, আঁধার নয়—পরন্তু চেতনা; কুরূপ নয়, সুরূপ পরন্তু অনির্ব্বচনীয় যক্ষরূপ। আর এই জানার বিকাশ হয় আলোর ভিতর দিয়াই—বহুশোভমানা উমার স্নিগ্ধস্মিতে। উমা ব্রহ্মময়ী।

এইটুকুই মর্ম্মকথা। এখন ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি।

বেদে তিনটী লোকের কথা আছে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দ্যৌঃ। পুরাণে এই তিন লোককেই

সপ্ত প্রস্তারে বিভক্ত করিয়া বলা হইয়াছে—ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ এবং সত্য। এই সপ্তপ্রস্তার লোকের মাঝে সংসারী ও মুমুক্ষের চেতনা যথাক্রমে আবর্ত্তিত ও প্রসৃত হইতে থাকে। সংসার-দৃষ্টিতে ও মোক্ষ-দৃষ্টিতে বেদের ত্রিস্থান বা লোকত্রয়ের সঙ্কোচ-প্রসার আছে। যাহারা সংসারী অর্থাৎ আবর্ত্তনশীল, পুরাণোক্ত ভূঃ ভুবঃ এবং স্বঃ—ইহারাই তাহাদের পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দ্যৌঃ। কিন্তু যাহারা মুমুক্ষু সাধক বা বেদের ভাষায় অর্চ্চিঃ-পথের পথিক, তাহাদের পক্ষে সংসারীর আবর্ত্তক তিনটী লোকই পৃথিবী। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডদৃষ্টিতে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ বৈদিক পৃথিবী; মহঃ, জন এবং তপঃ বৈদিক অন্তরক্ষি; আর সত্যলোক বৈদিক ভূলোক। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যামন্ত্রে ইহারাই সপ্তব্যাহৃতি; যোগে ইহারা সপ্তচক্র।

বৈদিক দেবতাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বেদের সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থকার যাস্ক বলিতেছেন, "তিস্র এব দেবতাঃ—অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ু বা ইন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ, সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ; তাসাং মহাভাগ্যাদেকৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি, অপি বা কর্ম্মপৃথকৃত্বাৎ"—তিনটী মাত্র দেবতা —পৃথিবীস্থ অগ্নি, অন্তরক্ষিস্থ বায়ু অথবা ইন্দ্র এবং দ্যুস্থ সূর্য্য; তাঁহারা মহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, এক এক-জনের বহু নাম; অথবা পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম করেন বলিয়াই বহু নাম। আরও আছে—"প্রজাপতি বৈ ত্রীন্ মহিম্নঃ অসৃজত—অগ্নিং, বায়ুং, সূর্য্যম্" —প্রজাপতি তিনটী বিভূতির সৃষ্টি করিলেন— অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য। "প্রজাপতি লোকানভ্যতপৎ, তেভ্যো অভিতপ্তেভ্যো রসান্ প্রাবহৎ, অগ্নিং পৃথিব্যা, বায়ুমন্তরিক্ষাৎ, সূর্য্যং দিবঃ;" পৃথিবী অসি, জন্মনা বশাসা অগ্নিং গর্ভমধত্থাঃ; অন্তরিক্ষমসি, জন্মনা বশাসা বায়ুং গর্ভমধত্থাঃ; দ্যৌরসি, জন্মনা বশাসা আদিত্যং গর্ভম্ অধত্থাঃ।"

সুতরাং, দেখিতেছি, বেদোক্ত লোকত্রয় অথবা পুরাণোক্ত সপ্তলোকের অধিষ্ঠাতা দেবতা হইলেন—অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য। শক্তি ও চেতনার সমন্বয়কে বলে দেবতা এবং এই সমস্ত দেবতার অধিকার লোক হইতে লোকান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সমাধিজা প্রজ্ঞাদ্বারা চেতনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারিলে এই সমস্ত দেবতার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। অগ্নিতত্ত্ব যদি আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে ভূলোক দ্বারা পরিব্যাপ্ত সংসার আমার মাঝে ভাসিয়া উঠিবে; তেমনি বায়ুতত্ত্বে ভূলোক হইতে স্বর্লোক পর্য্যন্ত সাধকের চেতনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে; আদিত্যতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে সপ্তলোকই তাহার মাঝে ফুটিয়া উঠিবে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত অমৃতত্ব বা মুক্তি ইহাকেই বলে। ইহারই নামান্তর ক্রমমুক্তি বা কর্ম্মজা মুক্তি; উপনিষদ বলেন, ইহাই অর্চ্চিঃপথ বা আলোর পথ, ইহাই দেবযান। বৃত্র বা আঁধার এই পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কেনোপনিষদের যে রূপকটী উল্লেখ করিয়াছি. তাহাতে আছে অগ্নি, বায়ু এবং ইন্দ্রের কথা। অর্থাৎ অন্যত্র যেখানে পাই, সূর্য্য বা আদিত্য, উপনিষদে সেখানে পাই ইন্দ্র। ইন্দ্রও আদিত্য বটে; ইন্দ্র ও সূর্য্য যে এক, তাহার অন্য প্রমাণ আছে। ইন্দ্রকে অহল্যাজার বলা হয়; অহল্যা উষারই নামান্তর; উষার কান্ত সূর্য্য—এ কাহিনী বেদে প্রসিদ্ধ। এই দিক দিয়াও ইন্দ্র এবং সূর্য্য এক। আরও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে, উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এখানে সূর্য্য না বলিয়া কেন ইন্দ্র বলা হইল তাহার তাৎপর্য্য আছে।

যাহা বিরাট্ হইয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাই আবার স্বরাট্ হইয়া আমার মাঝে গুহাহিত হইয়া আছে—এই ভাবনায় বৈদিকঋষি একান্ত অভ্যস্ত। তাই বেদে অধিদৈবত ও

অধ্যাত্ম এই দুইটী পক্ষের উল্লেখ প্রায়ই দেখিতে পাই। অধিদৈবত পক্ষে যে শক্তির পরিচয় পাই—অগ্নিতত্ত্বে, বায়ুতত্ত্বে এবং ইন্দ্রতত্ত্বে, অধ্যাত্ম-পক্ষে সেই শক্তিই আমার মাঝে কায়, প্রাণ এবং মন রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহারই নামান্তর জড়, প্রাণ এবং চেতনা বা সংজ্ঞা। (পুরাণকার বলেন, সূর্য্যের দুই শক্তি, সংজ্ঞা এবং ছায়া—ইহা গূঢ়ার্থের দ্যোতক।) অধিদৈবত ও অধ্যাত্ম—দুই পক্ষ মিলাইয়া বলিতে পারি, অগ্নি জড়শক্তি, বায়ু প্রাণশক্তি এবং ইন্দ্র সংজ্ঞাশক্তি। এই সংজ্ঞা বা চেতনা কিন্তু নির্ব্বিশেষ চৈতন্য নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ইন্দ্রের শক্তিকেই বলে ইন্দ্রিয়। যোগী বলেন, "ইন্দ্রিয়ানাং মনো নাথঃ"—মনই ইন্দ্রিয়ের রাজা; তাহা হইলে ইন্দ্র হই লেন মনঃশক্তি। বেদেও আছে—"যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্" অর্থাৎ যিনি এই বিশ্বের আদি আবির্ভূত মন। আরও আছে "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপম্ ঈয়তে"—ইন্দ্র বহুরূপী, ইন্দ্র মায়াবী; অর্থাৎ সে সমষ্টি চেতনা ভাঙ্গিয়া এই ব্যষ্টি চেতনার উদ্ভব, তাহাই ইন্দ্র। এইরূপে পাই, অগ্নি বিশ্বভূত, বায়ু বিশ্বপ্রাণ এবং ইন্দ্র বিশ্বচেতনা।

এইখানে একবার বৈজ্ঞানিকের রায় যাচাই করিয়া দেখিলে হয়। বলিয়াছি, অগ্নি জড়শক্তি। বেদে আবার আছে, অগ্নিরই তিন রূপ, পৃথিবীতে তাহা তাপ, অন্তরিক্ষে বিদ্যুত এবং দ্যুলোকে সৌরতেজ। অর্থাৎ তাপ, বিদ্যুত এবং সৌরতেজ এই তিনটীই জড়শক্তির রূপান্তর। আধুনিক বিজ্ঞানও এই কথা বলিতেছে। তাপ-শক্তির সঞ্চারে বা স্ফুরণে জড়ের পরমাণু ভাঙ্গিয়া যায়, জড়ের অবস্থান্তর ঘটে, পরমাণু-সংস্থানের বিপর্য্যাস হয় ইত্যাদি; অর্থাৎ জড়ের পরিণাম ঘটাইতে তাপশক্তির কৃতিত্ব অসাধারণ। বিদ্যুতও ভাঙ্গা-গড়ার ওস্তাদ। বিজ্ঞান সৌরশক্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া এখনও কিছু বলিতে পারে না, কিন্তু অনির্দ্দেশ্য উপায়ে সৌরপিণ্ড হইতে একটা শক্তি-প্রবাহ ছুটিয়া আসিয়া জড়ের জগতে তাণ্ডব সৃষ্টি করে, এ কথা সে জানে, কিন্তু সে শক্তির স্বরূপ সে বোঝে না। বেদের ভাষায় বলিতে গেলে, বিজ্ঞান ভৌম ও আন্তরিক্ষ অগ্নির স্বরূপ কতকটা বুঝিয়াছে; কিন্তু সৌর অগ্নির তত্ত্ব এখনও বুঝিতে পারে নাই। বায়ুতত্ত্ব ও ইন্দ্রতত্ত্ব এখনও বিজ্ঞা-নের এলাকার বাহিরে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যাহা ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তাহাকে পিণ্ডমধ্যে ধারণা করা, ইহাই যোগীর বিশেষত্ব। বেদোক্ত দেবতাতত্ত্ব যোগী বুঝাইয়াছেন, দেহস্থ চক্র-প্রচার দ্বারা। ব্রহ্মাণ্ডে যেমন লোকের বিস্তার, দেহে তেমনি চক্রের প্রচার। নাভিতে আছে মণিপুরচক্র—অগ্নিতত্ত্বের স্থান। তন্ত্র ইহাকে বলিয়াছেন, ব্রহ্মগ্রন্থি। স্বর্লোকই ব্রহ্মাণ্ডের মণি-পুর। তারপর হৃদয়ে অনাহতচক্র, জীবাত্মার আশ্রয়—বায়ুতত্ত্বের স্থান; তন্ত্র বলেন বিষ্ণু-গ্রন্থি। অবশেষে ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র; যোগের পরিভাষায় জ্ঞানদাতা শিবের অধিষ্ঠান সেখানে; তন্ত্র বলেন, উহাই রুদ্রগ্রন্থি। যোগে একটা কথা আছে, তীব্র পুরুষকারের বলে, মানুষ মনকে এই আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত ঠেলিয়া তুলিতে পারে—এই পর্য্যন্তই তাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান খাটে; কিন্তু তারপর আর সে স্ববশে থাকে না, রামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, "মন হু হু করে ওপর পানে উঠে যায়, তখন আর হুঁস থাকে না।"

উপনিষদের রূপকে যে তিনটী দেবতার কথা পাইয়াছিলাম, নানা দিক দিয়াই আমরা তাঁহাদের তত্ত্ব অনুশীলন করিয়া চিনিয়া লইলাম, তাঁহারা কে। বেদে, পুরাণে, যোগে, তন্ত্রে—আধিভৌতিক, অধিদৈবত ও অধ্যাত্মজ্ঞানে তাঁহারা কোন স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহাও বুঝিলাম। এইবার

রূপকের তাৎপর্য্য বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না।

মূল কথা হইতেছে, শক্তির যে বহিঃপ্রকাশ, তাহাতে মুগ্ধ হইলে চলিবে না, অন্তর্ম্মুখী হইয়া ধারণা করিতে হইবে—এই বহির্বিচ্ছুরিত শক্তির মূল প্রস্রবণ কোন্ অদ্বয় তত্ত্বে।

সাধক ধাপে ধাপে চেতনাকে অগ্নিতত্ত্ব—বায়ুতত্ত্ব—ইন্দ্রতত্ত্ব পর্য্যন্ত তুলিলেন, বৃত্রশক্তি পরাভূত হইল বটে, স্বমহিমার আস্বাদন তিনি পাইলেন বটে, কিন্তু অলক্ষ্যে অভিমানরূপী বৃত্রের প্রেত আসিয়া হৃদয় আক্রমণ করিয়া রহিল। তবে কিনা এই অভিমান সাত্ত্বিক অভিমান, দেবতার অভিমান। তাই সহজেই ইহার নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, "ব্রহ্ম সব দেখেন, সর্ব্বভূতের সর্ব্বকরণের প্রযোক্তা তিনি, দেবতাদের এই মিথ্যাজ্ঞানের বিজৃম্ভণ দেখিয়া তিনি আশঙ্কা করিলেন, অসুরদের মত এই মিথ্যা অভিমানে দেবতারা বা পরাভূত হইয়া যায়!—তাই তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অনুকম্পার উদয় হইল।"

অভিমান আশ্রয় করিয়াই জীব সাধনায় অগ্রসর হয়। অহং-এর ক্রিয়া সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার রূপান্তর ঘটে: জড় হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে চেতনা পর্য্যন্ত সাধকের আমিত্ব তীব্র হইয়াই ছড়াইয়া পড়ে। অহং যখন চেতনার রাজ্যে উঠে, অথবা বেদের ভাষায় যখন উহা ইন্দ্র-শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তখন তাহার সাত্ত্বিক প্রকাশ। ইহার পর আর গুণের গতি হইতে পারে না। এর পরেও যদি অগ্রসর হইতে হয়,—আর অগ্রসর হইতেই হইবে—তাহা হইলে অভিমানের তরঙ্গ হইতে, পুরুষকারের পুঁজি হইতে আর সাধকের কোনও সাহায্য পাইবার উপায় নাই। সত্ত্বশুদ্ধি হইল জীবের সাধ্যাবধি। তাহার পরেই হইল পরাশক্তির লীলা, ভাগবতের ভাষায় যোগমায়ার খেলা, শঙ্করের ভাষায় ব্রহ্মের অনুকম্পা। ইহাই বৈষ্ণবের কৃপাবাদ। এই অনুকম্পা, কৃপা, করুণা—জীবের প্রতি এই মমতা—ইহাই শক্তির স্বরূপ, জগজ্জননীর চিন্ময়ী তনু। কৃপা অহৈতুকী, কিন্তু তাহার অনুভব হইবে সত্ত্বশুদ্ধি হইলে। চেতনা ইন্দ্র-তত্ত্বে পৌছিলে বা যোগের ভাষায় মন আজ্ঞাচক্রে উঠিলে, ভক্তের ভাষায় চিত্ত তদ্গত হইলে, তবে কৃপার অনুভব হইবে, মায়ের দেখা মিলিবে।

অভিমানী সাধকের কাছে আবির্ভূত হয় —যক্ষ। যক্ষ কি?—যাহা অনির্ব্বচনীয় তাহাই যক্ষ। রহস্য হইলেও তাহাতে চিত্তে সম্ভ্রমের সৃষ্টি করে; শঙ্কর বলেন, যক্ষ যজনীয়, পূজনীয়। সাধ্যের সীমা পাইয়াছি, উল্লাসে গর্ব্বে চিত্ত ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তবুও মনের গোপনে কার যেন করুণ সুর কাঁদিয়া ফিরিতেছে—"তবু নাহি তিরপিত ভেল!" পুরুষকারের চরম স্ফূর্ত্তিতে সাধকমাত্রেই এই রহস্যের বেদনা অনুভব করিয়া থাকিবেন। ইহা কৃপার আবির্ভাবের পূর্ব্বলক্ষণ। বর্ষণ আসন্ন, আকাশ-বাতাস তাই যেন থমথম করিতেছে।

স্বায়ত্তীকৃত শক্তি দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য সাধকের প্রাণে জন্মে একটা আকুলতা—কিন্তু সমাধান সে খুঁজিয়া পায় না। সে যক্ষের কাছে অগ্নি স্তিমিত, বায়ু স্তম্ভিত, ইন্দ্র চকিত। রহস্যের নিপীড়নে জড়ে, প্রাণে, চেতনায়—এ যেন কিসের বিকলতা! এই বিকলতায় বেদনা আছে, কিন্তু আনন্দও নাই কি? কায়, প্রাণ, চিত্তের কি মধুর পরাভব—এই অনির্ব্বচনীয় রহস্যের কাছে!

অগ্নি এবং বায়ু বাহুড়িয়া আসিলেন, ইন্দ্র কিন্তু সেই যে গেলেন, আর ফিরিলেন না। অগ্নি আর বায়ুর বেলায় বিচার ছিল, বিতর্ক

ছিল, কিন্তু ইন্দ্রের বেলায় সেটুকু ছিল না। সাধনার এইটুকু রহস্য; স্থিরচিত্তে ইহার অনুধাবন করিতে বলি।

ইন্দ্র অবিসংবাদী চেতনা। ব্রহ্মের অভিমুখে তাহার গতি হইলে কি ঘটিল? আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—

"তদ্ যক্ষং যস্মিন্ আকাশপ্রদেশে আত্মানং দর্শয়িত্বা তিরোভূতম্-ইন্দ্রশ্চ ব্রহ্মণস্তিরোধানকালে যস্মিন্নাকাশে আসীৎ, স ইন্দ্রস্তস্মিন্নেব আকাশে তস্থৌ—কিং তদ্ যক্ষমিতি ধ্যায়ন্, ন নিববৃতে অগ্ন্যাদিবৎ, তস্য ইন্দ্রস্য যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধা বিদ্যা উমারূপিণী প্রাদুরভূৎ স্ত্রীরূপা।"—সেই যক্ষ যে আকাশপ্রদেশে স্বয়ং দেখা দিয়া মিলাইয়া গেলেন, ব্রহ্মের অন্তর্দ্ধানের সময় ইন্দ্র যে-আকাশে ছিলেন, তাহার পরেও তিনি সেই আকাশেই থাকিয়া গেলেন, এই যক্ষ কি ইহাই ধ্যান করিতে লাগিলেন, অগ্নি প্রভৃতির মত ফিরিয়া আসিলেন না। যক্ষের প্রতি ইন্দ্রের ভক্তি আছে বুঝিতে পারিয়া উমারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা স্ত্রীরূপে তাঁহার কাছে প্রাদুর্ভূতা হইলেন।

ইহার তথ্যও প্রাঞ্জল। শঙ্কর বলিতেছেন পুনঃ পুনঃ আকাশের কথা—ফাঁকার কথা। চিত্তকে নির্ব্বিষয় করিতে হইবে। সজাতীয় বৃত্তি-পরম্পরা প্রবাহিত করিলেই চিত্ত একাগ্র হইয়া আকাশবৎ হইয়া যাইবে। এই একাগ্রচিত্তের একটা স্বয়ং-সিদ্ধ বেগ আছে, অভীষ্ট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া তাহার স্বভাব নয়। এইজন্য যোগের ভাষায় বলিতে গেলে ইহার মাঝে ব্যুত্থান-সংস্কার (পূর্ব্বের চঞ্চল অবস্থায় ফিরিবার ঝোঁক) স্বল্প। তাই সেখানে ধ্যান জমে ভাল। ভক্তিরও উন্মেষ চিত্তের এই একাগ্র ভূমিকায়। জ্ঞান-পিপাসুর আকাশবৎ নির্ব্বিষয় ধ্যানকুশল একাগ্র-হৃদয়ে বিন্দু বিন্দু করিয়া ভক্তির স্নিগ্ধরসের সঞ্চার হইতে থাকে। সেই ভক্তিই গাঢ় হইয়া মায়ের মূর্ত্তিতে আকাশের কোলে ফুটিয়া উঠে।

সমস্ত দিক হইতে চিত্তকে গুটাইয়া ভ্রূমধ্যে ইন্দ্রলোকে লইয়া আইস এবং অচঞ্চল ভাবে সেখানে ধরিয়া রাখ। একটী একটী করিয়া সমস্ত বৃত্তির বুদ্বুদ মিলাইয়া যাইবে—শেষে আর আকাশ ছাড়া কিছুই থাকিবে না। কিন্তু তখনও রোখ ছাড়িতে নাই; ক্রমে সে আকাশও বিদ্যুতের চমকে আলোকচঞ্চল হইয়া উঠিবে। তারপর অচপল চপলার কোলে ফুটিয়া উঠিবে জ্যোতির্ঘন-রূপিণী মায়ের মূর্ত্তি। ইনিই হৈমবতী উমা।

এই উমা কেমন?—শঙ্কর বলেন, তিনি "সর্ব্বেষাং হি শোভমানানাং শোভনতমা"—যা কিছু সুন্দর আছে জগতে, তার চেয়েও সুন্দরী; মা আমার হৈমবতী কিনা হেমকৃতাভরণবতী, অথবা হিমবা-নের দুহিতা বলিয়াও তিনি হৈমবতী। মায়ের স্বরূপ কি?—শঙ্কর বলেন, "নিত্যমেব সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্ত্ততে"—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর-চৈতন্যের সহিত যিনি নিত্যবর্ত্তমানা। অর্থাৎ এই যে সর্ব্বাতিশায়ী করুণা, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, প্রেম, মায়া, ইহা ব্রহ্মের এক পিঠ; আবার আর এক জ্ঞানরূপী মায়ার রঙ্গপীঠ—ইহা ব্রহ্মের আর এক পিঠ। একটা পাতার এক পিঠ হইতে আর এক পিঠ যেমন পৃথক করা যায় না, তেমনি ব্রহ্ম হইতে উমাকেও পৃথক করা যায় না। উমা ব্রহ্মময়ী। —কে বলে শঙ্কর শক্তি মানিতেন না?

মাকে দেখিয়া ইন্দ্র কৃতার্থ হইয়া গেলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, উনি কে? মা হাসিয়া বলিলেন, যাঁহার শক্তিতে তোমাদের শক্তির স্ফুরণ, ইনি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম। এই বলিয়া মা-ও ব্রহ্মতত্ত্বে লীন হইয়া গেলেন। ইন্দ্রের মনস্কামনা পূর্ণ হইল; তিনি দেবতাদের মাঝে স্বারাজ্য লাভ করিলেন।

শঙ্কর বলেন, কেনোপনিষদোক্ত এই ব্রহ্ম বেদান্তের পরিভাষায় ঈশ্বরতত্ত্ব। উমা ঈশ্বরাশ্রিতা মায়া। উভয়ে অভেদে বর্ত্তমান। এই ঈশ্বর ও মায়ার সম্মিলনেই ব্রহ্মের কারণ দেহ। ইহাই সগুণ ব্রহ্ম বা মহাশক্তি—সাধকের সবিকল্পসমাধিগম্য। নিরাকার ঈশ্বর চৈতন্যই একাগ্র ভক্তির টানে বহুশোভমানা হেমালঙ্কারে ভূষিতা উমার ভুবনমোহন মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠেন—সাধকের সঙ্গে হাসেন, কথা কন। ইহাই উপনিষদোক্ত শক্তি-রহস্য।

মায়ের ছেলে

—(:০:)—

চারিদিকেই শুনি ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদ—মা চাই! বলি, বোকা ছেলে—মা যে পেয়েই আছিস্, চাইবি আবার কি রে? চাইতে যদি হয় কিছু তো নিজকে চা! না চাইতেই যে আছে ছেলের সবখানি হয়ে, তাকেই না বলি মা। মা কি তোর নিজের হাতের ছানা কাদার পুতুল? ছোট ছেলে যে আচম্কা কেঁদে উঠে বলে, মা চাই, সে কি কোনও দিন পায়নি বলে চায় আজ মনে করেছিস্? তা তো নয়; সে জানে মা তার আছেই—এই একটুখানি আগেও তো ছিল তাকেই বুকে ধরে—হয়ত বা এখনও মায়ের বুকেই মুখ ঝাঁপিয়ে সে কেঁদে চায় তার মাকে। এ চাওয়া অভাবের বুকফাটা আর্ত্তনাদ নয়, অপ্রত্যয়ের বেদনা নয়—এ হচ্ছে পাওয়ার বুকে থেকেই অমনি-অমনি চাওয়া। এমনি করে যদি মাকে চাইতে পারিস্, তবেই বলিস্, মা চাই!—মা চাই—ভাবের ঘোরে মাতাল হয়ে; অভাবের তাড়নায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে মা চাই—এমন চাওয়া নাইবা চাইলাম!

পেয়ে আছিস্ যে একেবারে, এইটুকু বুঝতে পারিস্ না, ওরে ও অভাগা! জগতে আর কত জিনিষই সাধ্য-সাধনায় পেতে হয়, নিজে হাতে গড়ে নিতে হয়; কিন্তু মা যে সেধে পেতে হয়, তা তো শুনিনি কোনও দিন! না চাইতেই যা পেয়ে আছিস্, সেই যে তোর মা, বিশ্বাস করতে পারবি এই কথায়? চোখ মেলে যদি কিছু না পাস্ তো একবার চোখ বুজে বুকের ভিতরটা ঢুঁড়ে দেখে আয়—তার আনাচে কানাচে কোথাও এতটুকু সুখের রেশ, আশার রেখা লুকিয়ে আছে কিনা। সেইটুকুই—ওরে অবিশ্বাসী—সেইটুকুই তোর মা! নাই বলে কেঁদে তাকে পাবি না কোনও দিন, আছে বলে জোর করে জড়িয়ে ধরতে হবে যে!

আমি তো মায়ের ভাবনা ভাব্তে পারি না, ভাবি ছেলের ভাবনা। ছেলেই যে অসিদ্ধ সত্তা, অপূর্ণ বিগ্রহ। গড়তে হয় তো নিজকে ছেলের মত গড়ে তোল্। তোর মাঝে যতটুকু ছেলে-মানুষী ফুটবে, মায়ের মুখে হাসি ফুটবে ততটুকু। নিজকে গড়ে তুলে তোর যে আনন্দ, সেইটুকুই যে আনন্দময়ীর রূপ পাওয়া। মা গড়বার যদি কোন সাধনাই থাকে তো সে এই—তোর নিজকে গড়া। যে নিতান্ত অবিশ্বাসী, তাকেই বল্ছি এ কথা।

আর যে বিশ্বাসী, সে তো আনন্দময়; সে

তো জানে সে পেয়েই আছে—গড়া পেটার ভাবনা তার কোথায়? বাস্তবিক, ছেলে তো মা চায় না: সন্তান-কামনা যে মায়ের স্বভাব, ছেলের কি গরজ গো? ছেলে নিশ্চিন্ত, মা আছে জেনেই নিশ্চিন্ত; তাই চুষীকাঠী নিয়ে, পুতুল-খেলা নিয়ে ভুলে থাক্‌তে সে ভালবাসে। যে ছেলে এমনি করে আলাভোলা হতে জানে না, ঘটা করে মায়ের তত্ত্ব-বিচার করতে বসে যায়, সে ইঁচড়ে-পাকা ছেলে মায়ের ছেলেও বটে, আবার তার বুকের কাঁটাও বটে। ছেলে হবি তো ভুল্‌তে শেখ্; তোকে ভোলাবার জন্যই তো মায়ের এই আয়োজন। তুই ভুলে যাবি, গলে যাবি—এতেই তো মায়ের আনন্দ; তা নয় তো কি খেলা ভুলে, ফিতে-গজকাঠি নিয়ে মাকে মাপ্‌তে বসবি?

ছেলে মাকে ভোলে না বলেই এত সহজে খেলায় ভুলতে পারে। নিশ্চিন্তের স্বভাবই ওই—সে ভুলের রাজা—ভোলানাথ। বিশ্বাস আছে, কিন্তু হিসাব নাই বলেই তার সাহসেরও অন্ত নাই; অনায়াসে সে বাঘের গলা জড়িয়ে ধরতে পারে, কেননা সে জানে, তার মা আছে। অনেক দেখেছে-শুনেছে, অনেক হিসাব করে পাকা হয়েছে যে বুড়োর দল, ভুরু কুঁচকে তারা বলে, বাঘের সামনে মানুষ? বলিস্ কি!—কিন্তু মা জানেন, ছেলে ঠিক ধরেছে; মা আছে যখন ভয় কি তার?

ছেলের আমোদ কিসে জানিস্?—মাকে ফাঁকি দিয়ে!—সে তো জানে, সে ফাঁকে পড়বে না কোনও দিন, তার একফোঁটা চোখের জল মুছাবার দরুণ আর একজনের ব্যাকুলতার অন্ত নাই—তাই লুকোচুরী খেলে কাঁদিয়ে তার বড় আমোদ। তোরা বলিস মায়ের লীলার কথা। যে মা দেখে, সে কি লীলা দেখে রে বোকা! মায়ের লীলা দেখে-দেখে বুড়িয়ে যাবার দরুণ তো ছেলের ঘুম নেই! ছেলে স্বরাট্, মায়ের গরবে সে রাজার রাজা। তাই সে-ই দেখায় লীলা—আর মা গর্ব্বে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাই দেখেন—এই হল আসল কথা। তোদের তত্ত্ববিদ্‌দেরই জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বজোড়া এই যে অবোধের খোস্‌খেয়ালী—এতে কার বুকে ঢেউ ওঠে, বিশ্বজননীর তো? এই খেলা দেখে মজে মায়ের মন; আর মায়ের এই মুগ্ধতা—মনে রাখিস্ লীলা নয়—দেখে ভোলে যে সে আর একজন; সে কিন্তু ছেলে নয়। তত্ত্ব ঘেঁটে যারা শক্তি পেয়েছ, তারা বেশ করেছ; এখন বসে বসে চালকলার নৈবেদ্য সাজাও, স্তব আওড়াও, পাঁঠা কাট।—যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। এ কর্ম্মভোগ ছেলের নাই কিন্তু।—সে জানে কেমন করে হানা দিতে হয় মায়ের বুকে।

আচ্ছা, "আমি মা চাই না, মা-ই চায় আমায়"—এ কথাটা ভাবতে বুক দুরুদুরু করে ওঠে, না?—ছেলে হওয়ায় এইটুকুই তো বাধা। কি মায়ের ভাবনা ভাবিস্ তোরা? "এক গা গয়না পরে বসে আছেন সেই কোন্ মাচার ওপরে—অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর দয়া করে নেমে এসে একবার নেক্‌নজরে চাইলেন, আর অমনি কৃতার্থ হয়ে গেলাম"—এমনিতর একটা কিছু কল্পনা তো?—কল্পনাই যদি করতে হয় তো এ মিথ্যা কল্পনা কেন? যাতে একটু সত্যের ভঙ্গি রয়েছে, তেমনি কল্পনা করেই দেখ না, বুকের পাটা বাড়ে কিনা। কি শক্তির চর্চ্চা করছিস্ তোরা! বলছিস্ মায়ের ছেলে, অথচ এতটুকু জোর খাটাতে পারিস না তার ওপর। তোর এত খোঁজাখুঁজির দরকার কিরে বাপু? থাক্ না গ্যাঁট্ হয়ে বসে একজায়গায়, যার দরকার হবে সেই তোকে খুঁজে নেবে। ছেলেরই বুঝি কেবল

মা লাগে, মায়ের আর বুঝি ছেলে লাগে না? মায়ের বুকের ভিতর যে কি, সে খবর যদি রাখতিস্, তাহলে বুঝতে পারতিস্—মাকে কাঁদানোতে কত সুখ। ছেলের যদি কোনও সাধ্যসাধনা থাকে তো ওই—মায়ের চোখে জল ঝরানো। আর ঠিক জানি, ওতেই মা খুসী! যে ছেলের দরুণ মাকে কাঁদ্তে হয় নি, সে ছেলে তার বুক জুড়ে নাই, এ হলপ করে বল্তে পারি।

কেবল ভিক্ষা, কেবল দৈন্য, কেবল আর্ত্তি—এইতে ছেয়ে গেছে দেশটা। মায়ের কাছেও ছেলের মান নাই, বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার হিম্মৎ নাই, কেবল অনুরক্তি-বিরক্তির কল্পনায় মুহ্যমান হয়ে মাথা নীচু করে থাকা, চোরের মত পা টিপে টিপে চলা।—দিনের মাঝে হাজারবার নাকি সুরে কান্না হচ্ছে, "আমি পতিত, আমি পাপী, আমি ঘোর অপরাধী, মাগো আমায় দয়া কর, ছেলে বলে বুকে তুলে নাও!"—বয়ে গেছে মার অমন ছেলেকে বুকে তুলে নিতে। অমন নাকিকান্না শুনলে রক্ত-মাংসের মায়েরও যে মনে হয়, কেন আঁতুরঘরে নুন খাইয়ে মেরে ফেললাম না অমন ছেলেকে! কাপুরুষ, দুর্ব্বল সন্তান যে মায়ের লজ্জা—বীরপুত্র-প্রসবিনী হওয়াই যে মায়ের গর্ব্ব।

ভিক্ষা করে শক্তিলাভ করা যায় না—শক্তি অর্জ্জন করা চাই। লোকে বলে বেদের কর্ম্মকাণ্ড কেবল চাওয়ার ছড়াছড়ি। হাঁ, চাওয়া আছে বটে সেখানে, কিন্তু সে চাওয়াও চাওয়ার মত চাওয়া—নিজকে হীন করে চাওয়া নয়। আমার হক্, অতএব তুমি দেবে এমনিধারা জুলুমবাজের চাওয়া। তেমনি চাওয়া যদি চাইতে পারতিস্ তোরা, তাহলে আর দুঃখ ছিল না।

তাই তো বলছিলাম, শক্তিময়ীর ছেলে আমরা—এই গর্ব্বে যদি বুক না ফুলে ওঠে তো 'মা চাই' বলে কেঁদে ককিয়ে মায়ের প্রাণে আর ব্যথা দিস্ না; বরং বল্—আমাকেই আমি চাই। মা চাই নয়, ছেলের মত ছেলে হতে চাই।—কাঙ্গাল খেদ করে তাই বলেছিল—

"কাঙ্গাল যদি ছেলের মত ছেলে হত,
তবে তুমি জানতে—
ওসে জোর করে কোল কেড়ে নিত—
তুমি পারতে না তায় ঠেল্তে"

"যাহারা ভগবানের আরাধনা করে, তাহাদের প্রতি মায়াশক্তি তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, কারণ ভগবান্ মায়াধীশ—তিনি শক্তিমান্। ভগবদ্ভক্তকে মায়া পথ ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু এটী ঠিক জানিও,—যে বিষ্ণুর আরাধনা করে অথচ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারে নাই, এরূপ ব্যক্তি কিন্তু বিষ্ণুর আরাধনা করিলেও প্রকৃতপক্ষে সে মায়ারই আরাধনা করিতেছে; কারণ সে মায়ার প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। বিষ্ণুর আরাধনা করিলেও মায়া তাহ'কে নাকে দড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে। আবার যদি কেহ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কামিনীকাঞ্চনে আসক্তিশূন্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। তাহাকে আর মায়া প্রলোভিত করিতে পারে না এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও সে প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্ত্র যাহাই হউক না কেন, ভাব ভেদে শাক্ত-বৈষ্ণবে ভেদ।"

—শ্রীশ্রীনিগমানন্দকথা-সংগ্রহ

পূজার্হা গৃহদীপ্তয়

—(:০:)—

মনু বলেন, মেয়েরা "মহাভাগাঃ—পূজার্হা—গৃহদীপ্তয়ঃ"; চণ্ডী বলেন, জগন্মাতাই "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"; তন্ত্র-পুরাণ বলেন, "মেয়েরা শক্তি"; বাংলার উচ্চবর্ণের মেয়েরা স্বামীর বা পিতার উপাধি দ্বারা লাঞ্ছিতা নন, তাঁহারা সবাই "দেবী"; হিন্দীতে মেয়েদের সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে হইলে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বলা হয়, "দেবী"; যে কোনও অনাত্মীয় মেয়েকে "মাতৃ"সম্বোধন করিতে হিন্দু অভ্যস্ত। মোটকথা, নারীজাতির প্রতি হিন্দুর শ্রদ্ধানিবেদনের আদর্শটা কোনও জাতির চেয়েই খাটো নয়।

কিন্তু মেয়েরা আর আজকাল এই সমস্ত বনিয়াদী স্তোকবাক্যে ভুলিতে চাহিতেছে না। পুরুষেরা যে ছলে-বলে তাহাদের অনেকখানি অধিকারই ছিনাইয়া লইয়াছে, তাহা তাহারা টের পাইয়াছে, এই রাহাজানি তাহারা আর কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না, তাহাদের যাহা হক্, তাহা তাহারা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাহারা এতদিন মুখ বুজিয়া সবই সহিয়া আসিয়াছে, আজ যদি তাহারা হঠাৎ বাঁকিয়া বসে, তাহা হইলে অতি তুখোড় লোককেও ফাঁপরে পড়িতে হয়। হাজার বছরের গোলামের জাত আজ চোখ পাকাইয়া অমন তেজীয়ান বৃটিশ-সিংহকে পর্য্যন্ত ভড়কাইয়া দিয়াছে; আর যে মেয়েরা নাকি এ দেশের অর্দ্ধেক সংসার জুড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা যদি আজ ধর্ম্মঘট করিয়া বসে, তাহা হইলে পুরুষকে যে শিবনেত্র হইতেই হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ, এ জাতটা নিতান্তই গৃহসুখের কাঙ্গালী; মেয়েরাই বলে, ইহাদের নাকি ঘর ছাড়িয়া আঙিনা বিদেশ; মায়ের আদর, স্ত্রীর সেবা, কন্যার আবদার এইগুলিকেই ইহারা চিরকাল জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া কল্পনা করিয়া আসিয়াছে; শিশুকাল হইতে জননীরা রাঙা টুক্‌টুকে বউ দিয়া সংসার সাজাইয়া দিবার প্রলোভনটাই ইহাদের কানে গুঞ্জরিয়া আসিয়াছেন। এমন মা-পিসীর আঁচলধরা পুরুষজাতটা হঠাৎ যদি শুনিতে পায়, যাঁহারা ছিলেন গৃহের দীপ্তি, তাঁহারা হইয়াছেন মট্‌কার আগুন, তাহা হইলে তাহাকে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়।

রহস্য থাক্। কথাটা দিন দিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। জীবন বাঁধাধরা খাতে চলিতেছে না, ইহা সত্য। সমুদ্রের পরিখা এবং হিমাচলের প্রাচীর দিয়া আর গৃহস্থালীকে বেড়িয়া রাখিবার উপায় নাই। বহির্জগৎ হইতে নানা চিন্তা, নানা আদর্শ, নানা সমস্যা অনবরত আঘাত করিয়া আমাদের চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে, বাঁচিতে হইলে ইহাদের সহিত নিজদের খাপ খাওয়াইয়া লইতেই হইবে। বিদেশী সভ্যতা আমাদের জারিত করিয়া ফেলুক, এই সর্ব্বনাশের কল্পনা করিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে; আমরাই চাই বিদেশের সভ্যতাকে জীর্ণ করিয়া স্বদেশের প্রাণকে পুষ্ট করিতে। অন্ন কাম্য বটে, কিন্তু অন্নকূটের তলে চাপা পড়িয়া প্রাণ হারাইতে চাই না, পরিমাণমত অন্নগ্রাস উদরস্থ করিয়া জীর্ণ করিতে চাই, সবল হইতে চাই। অজীর্ণ রোগীর সম্মুখে আজ রাজভোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেই তো বিপদ্।

ন্যায্য বিচার করিতে গেলে, মেয়েদের আমরা যে অবস্থায় রাখিয়াছি, তাহা যে একান্তই লোভনীয়, তাহা বলিতে পারি না। পুরুষের নিজের জীবনেই শ্রীছাঁদ নাই; যেখানে মেয়েদের সব রকমে পুরুষেরই আশ্রিতা থাকিতে হয়, সেখানে তাহাদের জীবনে

শ্রীহীনতা যে আরও উৎকট হইয়া ফুটিয়া উঠিবে, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কোন অবস্থাতেই সত্যকে অতিরঞ্জিত করিয়া তো কোনও লাভ নাই; ইহাতে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পায় অথচ তৃপ্তির পথও আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

সাম্যবাদের কথাটাই প্রথম উঠিয়াছে। ঝোঁকের মাথায় অনেকে এমন কথাও বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, যে স্ত্রী-পুরুষ সব বিষয়ে সমান। যুক্তিটা পাদ্রীদের মত—"যেহেতু ঈশ্বর উভয়কে নাক-মুখ-চোখ-কান দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, উভয়কেই প্রাণ দিয়াছেন, মন দিয়াছেন, উভয়ের রক্ত লাল, চুল কালো" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব উপমা-ছড়ানো হাস্যকর যুক্তি এখন বড় একটা শুনিতে পাই না। আজকাল শুনি নারীর বৈশিষ্ট্যের কথা, স্বাতন্ত্র্যের কথা। নারী আর পুরুষ সর্ব্বতোভাবে এক, চিন্তাশীল নরনারীরা আর এ কথা বলেন না; বলেন, পুরুষের নিরপেক্ষ হইয়াও নারীর একটা নিজত্ব আছে, আপ্রাণ চেষ্টায় তাহার সেইটীকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ কথাটা শুনিতে মন্দ লাগে না। একদিন পুরুষও বলিয়াছিল—এবং আজও তাহার সে বদভ্যাস যায় নাই—নারীর নিরপেক্ষ একটা স্বতন্ত্র সত্তা তাহার আছে, সেইটীকে উন্মোচিত করিয়া ধরাতেই তাহার মহিমা। নারীও আজ তাহার পাল্‌টা জবাব পুরুষকে শুনাইতেছে; ইহাতে পুরুষের তো রাগ করিবার কথা নয়।

কিন্তু এ তো গেল ভাবের কথা। বাস্তব জগতে যে এই স্বাতন্ত্র্যবাদ একেবারে সাম্যবাদের কোল ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইখানেই যত সমস্যা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। নারীর স্বাতন্ত্র্যের প্রথম তাৎপর্য্যই হইল, পুরুষের মুখাপেক্ষিতা বর্জ্জন। যে সমস্ত বিষয়ে এতদিন পর্য্যন্ত সে পুরুষের হাত-তোলাতেই সন্তুষ্ট ছিল, এইবার সেইগুলিকে সে নিজের দখলে আনিতে চায়। অন্ততঃ কিছুদুর পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বের দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া নারী-পুরুষের সমাধিকার থাকা প্রয়োজন; ইহার পর যে যাহার স্বাতন্ত্র্যের চর্চ্চা করিয়া আত্মস্বরূপকে প্রকটিত করুক, তাহাতে কাহারও বলিবার কিছু থাকিবে না। কথাগুলি দার্শনিক যুক্তির বর্ম্ম আঁটা, সূচীভেদ করিবার মত ছিদ্রও ইহাদের মাঝে

তাহা হইলে আবার সেই সাম্যবাদের কথাতেই ঘুরিয়া আসিলাম। আগে সাম্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হউক, স্বাতন্ত্র্যের কথা পরে হইবে। নারীর তরফ হইতে যে সমস্ত বৈষম্যের অভিযোগ দাখিল করা হইয়াছে, তাহা মোটামুটি স্বাস্থ্য, স্বচ্ছন্দবিহার, শিক্ষা ও কর্ম্মদায় সম্বন্ধে। প্রধান আপত্তিগুলি এই—বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থায় এমন কতকগুলি প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, যাহা স্পষ্টতঃই নারীর স্বাস্থ্যের প্রতিকূল—যথা, অবরোধ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, পুষ্টিকর আহার্য্যের অভাব, বাল্যমাতৃত্ব, উপর্য্যুপরি সন্তানপ্রসব; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমাজের অঙ্গ, উভয়েই রাষ্ট্রের প্রজা, অথচ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা-ক্ষেত্রগুলিতে নারীর উপস্থিতি অবাধ নয়, এই সমস্ত জায়গায় পুরুষ নারীর প্রক্সী হইয়া যে সমস্ত একতরফা রায় দিয়া আসে, তাহাতে সব জায়গায় নারীর স্বার্থ বজায় থাকে না, সামাজিক আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রেও নারী তুল্যভাগ পায় না; শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকারবৈষম্য আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে, চিরকাল পুরুষ এখানে নারীকে কোণঠেসা করিয়া আসিয়াছে, জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবী চিরকাল পুরুষেরই হাতে, রত্ন আহরণের বাহাদুরীও তাহারই একচেটিয়া; কর্ম্মদায় সম্বন্ধেও পুরুষ নারীর প্রতি সুবিচার করে নাই, গৃহস্থালীর জঞ্জালে নারীকে আটকাইয়া রাখিয়া তাহার আর্থিক স্বাধীনতা অপ-

হরণ করিয়াছে এবং নারীর সাধ্য বহু সম্মানজনক কর্ম্মদায় হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়াছে। মোটামুটী পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর নালিশ এই।

এই নালিশগুলিকে বাক্যের ছটায় বিভীষণ করিয়া তুলিলে পুরুষের হৃদয় আতঙ্কে অবসন্ন হইয়া পড়ে বটে। ইহাদের মাঝে ভাবিবার কথাও আছে যথেষ্ট। তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করিয়াই লইলাম যে নারীর তরফ হইতে এই সমস্ত আপত্তির নিরাকরণ হইয়া নারী-পুরুষের সমাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল; তাহার পরেও নারীর স্বাতন্ত্র্য উদ্বোধনের ক্ষেত্র পাওয়া যাইবে কোথায়, সেটা কিন্তু একটা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়ে। নারীর নারীত্ব বলিয়া একটা অভিমানের কথা উঠিয়াছে মাত্র; কিন্তু এই নারীত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট কথা বড় কোথাও শুনিতে পাই নাই। সকল বিষয়ে পুরুষের তুল্যাধিকার পাইয়া পুরুষ হইয়া যাওয়াই নিশ্চয়ই নারীর বিশিষ্টতা নয়—উহা বৈশিষ্ট্য অর্জ্জনের পরোক্ষ উপায় মাত্র। তাহা হইলে নারীর নারীত্ব সাধনার ক্ষেত্র কোথায়? কি দেখিয়া বুঝিব, সমাজে বা রাষ্ট্রে ইহাই নারীর বিশিষ্ট দান? এই কথার জবাব দিতে গেলে বোধ হয় আবার সেই সেকেলে ব্যাজস্তুতির পালা সুরু করিতে হয়!

আসল কথাটা এই, স্ত্রীপুরুষের অধিকারে সাম্য নিরূপণ করিতে গেলেই বৈষম্যের দিকে নজর না দিয়া পারা যায় না। স্ত্রীস্বাধীনতাই হউক বা স্ত্রী-শিক্ষাই হউক—যে কোনও সমস্যার মীমাংসা করিতে গেলেই স্ত্রী ও পুরুষের মাঝে আকর্ষণ-বিকর্ষণহেতুক যে বৈষম্য রহিয়াছে, তাহাকে স্বীকার না করিয়া কোনও সমাধানই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। স্ত্রী ও পুরুষ সমান, এ কথাটা মনকে চোখ ঠারিয়া বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু নিম্নস্তরেই হউক, আর উচ্চ ভূমিকাতেই হউক, উভয়ের মাঝে যে ব্যতিকর্ষের সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা ধরিয়াই বিধিব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের দেশের সামাজিক পরিস্থিতি আর বিদেশের সামাজিক পরিস্থিতি ঠিক এক নয় সুতরাং বিদেশে যাহা স্বচ্ছন্দে সম্ভব হইয়াছে, এ দেশে তাহা ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভবও হইতে পারে। মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়া অধিকার প্রসার করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে, বাস্তবিকই মনুষ্যত্বের পুঁজি প্রচুর পরিমাণে আমাদের আছে কিনা। যদি সংস্কার করিতে হয় তো স্বভাব হইতে সুরু করিতে হইবে, আচার হইতে নয়; নহিলে বিষ্ণু-শর্ম্মার সেই আক্ষেপটা চিরকাল বজায় থাকিয়াই যাইবে যে—সরমানন্দনকে রাজা করিয়াও তাহার জুতা চিবানো অভ্যাসটা দূর করিতে পারা গেল না।

এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়াই, নারীর তরফ হইতে যে দাবীগুলি উপস্থিত করা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব। একটী কথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা ভাল, যাহারা দাবী করে এবং যাহারা দাবী শোনে, ধৈর্য্য হারাইয়া তাহারা পরস্পরের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে থাকিলেই সমাধানের পক্ষে কিছুমাত্র আনুকূল্য করা হয় না। মানুষের যে কোনও পরিস্থিতি কাহারও একার কীর্ত্তি নহে, চারিদিকের চাপে বাধ্য হইয়া মানুষকে বিকারের মাঝেও বাঁচিয়া থাকিতে হয়। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য গালিগালাজ করা বৃথা। বরং কেন এমন হইল, স্থিরচিত্তে তাহার অনুসন্ধান করা উচিত এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত ইহাও নিরূপণ করা উচিত যে সেই সমস্ত কারণ এখনো বর্ত্তমান আছে কিনা।

প্রথম দফা নালিশ, নারীর স্বাস্থ্যহানিকর বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন—যথা অবরোধ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, পুষ্টিকর আহারের অভাব, বাল্যমাতৃত্ব ও উপর্য্যুপরি সন্তানপ্রসব। অভিযোগগুলি সার্ব্বভৌম না হউক

গড়ে খাটী; কিন্তু সেই গড়কষারও ইতরবিশেষ আছে, তর্কের ঝোঁকে আমরা সেটা ভুলিয়া যাই।

দেশভেদে, সমাজভেদে, বয়োভেদে, অবস্থাভেদে অবরোধের তারতম্য সর্ব্বত্রই আছে। পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে খাঁচায় পুরিয়া রাখিয়াছে এ কথা সত্য নয়; অর্থাৎ নারীকে অবরুদ্ধ রাখা পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, নৈমিত্তিক। নিমিত্তটা খুবই স্পষ্ট—যৌনব্যভিচারের আশঙ্কা। ব্যভিচারের সম্ভাবনা কোন তরফ হইতে প্রথম জাগে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। নারীর চটুলতা সম্বন্ধে অনেক প্রবাদই এ দেশে প্রচারিত ছিল এবং এখনও আছে। এইজন্য ব্যভিচারের দোষটা নারীর কাঁধে চাপাইয়া পুরুষ তাহার অভিভাবকত্বের দাবীতে অবরোধের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা সত্য হইতে পারে। নারী নির্ব্বাক ছিল বলিয়া এই একতরফা রায়টাই এতদিন বাহাল ছিল। কিন্তু আজ নারীর মুখ ফোটার পর হইতে অপরপক্ষের দুর্ব্বুদ্ধিটাও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজ-তত্ত্ববিদ, যৌনতত্ত্ববিদ, সবাই এখন ব্যভিচারের মামলায় পুরুষের বিরুদ্ধেই ডিক্রী দিতেছেন। কিন্তু নারীও যে পুরুষের প্রবল মানসিক চাপকে ঠেলিয়া স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, ইহাও এ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং পুরুষের লোলুপতা এবং নারীর প্ররোচনা-বশ্যতা—এই দুইটী নিমিত্তের উচ্ছেদ তো এখনও হয় নাই; ধাঁ করিয়া যে হইয়াও যাইবে, এমন সম্ভাবনাও দেখিতেছি না, কেননা মানবপ্রকৃতির একটা সনাতন ধারা তো আছে। এই ক্ষেত্রে যাহারা নারীর হিতকামী—এখন সে আত্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষই হউক, আর শক্তিশালিনী নারীই হউক—তাহারা নারীকে একলা ছাড়িয়া দিতে সাহস পাইবে কি করিয়া? অবরোধ এক আকারে না এক আকারে একপক্ষে বজায় থাকিবেই। পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র বাহিরে; সুতরাং তাহাকে ঘরে পুরিবার সম্ভাবনা কম। অতএব নারীকেই ঘরে থাকিতে হইবে। আমাদের দেশে পুরুষের লোলুপতা ও নারীর অতিবিশ্বস্ত সারল্য, দুইটাই স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া চরমে উঠিয়াছে; আমরা মনে করি উভয় পক্ষেরই ইহা মারাত্মক দুর্ব্বলতা। পুরুষের পক্ষে আরও সংযম এবং নারীর পক্ষে আরও শক্তি—এই দুইটীর পুঁজি বাড়িলে সমাজটা আরও এক স্তর উঠিয়া গিয়া স্বাভাবিক ও শক্তিশালী হইত। তখন অবরোধ আর কৌটায় পোরা সমার্থক হইত না।

এই হইল স্বভাবের কথা। তাহা ছাড়া পরিস্থিতির দিকটাও আছে। আমাদের মাঝেই আজকাল দুইটা সমাজ দাঁড়াইয়াছে—একটা নগর-সমাজ আর একটা পল্লীসমাজ। সহরের শিক্ষা ও রুচি উন্নত, সুতরাং অবরোধের প্রয়োজনীয়তাও সেখানে দিন দিন কমিয়া যাইতেছে—সাবেকী ধরণের পুরুষেরাও এখন আর এ নিয়া ততটা উচ্চ-বাচ্য করে না। কিন্তু পল্লীতে অবস্থা ইহার বিপরীত। নৈতিক স্বাস্থ্য সেখানে এত দূষিত হইয়া পড়িতেছে যে এখন ঝি-বৌ নিয়া পাড়াগাঁয়ে বাস করাও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে; নারীধর্ষণের করুণকাহিনীতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সাম্প্রদায়িক হেতুও ইহার মাঝে মাথা কাঁড়া দিয়া উঠিয়াছে। নারীধর্ষণে হিন্দুরা একেবারে নির্দ্দোষ না হইলেও মুসলমানের পাপের পাল্লা হিন্দুর চেয়ে ভারী হইয়া উঠিয়াছে—বিশেষতঃ মুসলমানের পক্ষে এ বিষয়ে সামাজিক শাসন না থাকায়। হিন্দুর মেয়ে কাড়িয়া লইয়া নিকা করিতে মুসলমানের রুচিতে ও ধর্ম্মে বাধে না; কিন্তু হিন্দুর সংস্কার এ বিষয়ে প্রতিকূল বলিয়া তাহার প্রবৃত্তি পরোক্ষভাবে কতকটা সংযত আছে। কিন্তু তা বলিয়া গুপ্তব্যভিচার হিন্দুর সমাজেও অপ্রতুল নয়। এই অবস্থাই যদি আবহমান হয়, তাহা হইলে নিমিত্তবশাৎ অবরোধ উঠিয়া

যাইবে, না আরও দৃঢ় হইবে? অবরোধ-প্রথার নিন্দায় যাঁহারা পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন, তাঁহারা সমাজের পরিস্থিতি যে কি সঙ্কুল ও শোচনীয়, তাহা অনেক সময় ভাবিয়া দেখেন না। হঠকারিতায় কোনও লাভ হইবে না, মূলে প্রতিকার চাই। পুরুষের আত্মা বিকল, নারীর আত্মা মূর্চ্ছিত; শিক্ষার প্রদীপ স্তিমিতপ্রায়, ধর্ম্ম মুহ্যমান; সংস্কারের দম্‌কা হাওয়ার পর্দ্দা ফাঁক করিয়া দিলে কি হইবে? সিংহবাহিনীকে কেহ কোনও দিন অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিয়াছে কি?—মেয়েদের ঘরে রাখিয়াই সেই শিক্ষাই দাও না কেন!

অবরোধের কথাটা ঘরে-বাইরের কথা। তাহার পর তুই দফা নালিশ ঘরোয়া ব্যাপার লইয়া। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের খাটুনী বেশী, খাওয়া কম সর্ব্বত্রই; এ বিষয়ে কোনও পক্ষেরই নালিশ-ফরিয়াদ কিছুই নাই। আর উচ্চশ্রেণীতেও স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই খাটুনী কম, খাওয়া বেশী; সুতরাং সেখানেও কোন মামলা নাই। যত গণ্ডগোল মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে। আর একটা কথা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবার যে স্ত্রী-পুরুষের অধিকার নিয়া যত সমস্যার উদ্ভব, তাহার অধিকাংশই এই মধ্যবিত্ত অথচ ভদ্র লোকদের নিয়া। কিন্তু যখন কথা উঠে, তখন মনে হয়, ইঁহারা যেন ছোট-বড় সকলের পক্ষ হইয়াই ওকালতী করিতেছেন। আসল ব্যাপার তো তা নয়। সব সমাজেই ছোটরা প্রাকৃতিক জীবন যাপন করে বলিয়া কতকটা সংস্কারমুক্ত; বড়রা খোস-খেয়ালী বলিয়াও স্বাধীন, বন্ধনহীন। বিপদে পড়ে, যাহারা ভদ্রলোক অথচ নিরুপায়। ছোটলোকের মত তাহারা বে-আব্রু হইতেও পারে না, আবার বড়লোকের মত ষ্টাইলিশ্‌ হইতে গেলেও পোষায় না। এইজন্যই এই সমাজেই যত সমস্যার উদ্ভব হয়। যে কোনও সমস্যার আলোচনার সময় একবার ভাবিয়া দেখা ভাল যে এটা সার্ব্বভৌম সমস্যা, না ভদ্রলোকের সমস্যা।

যাক্‌, যে কথা বলিতেছিলাম। যাহাদের হাটে-মাঠে খাটিয়া খাইবার উপায় নাই, কিম্বা পায়ের উপর পা তুলিয়া বসিয়া খাইবার সংস্থানও নাই, তাহাদের পরিবারে অনেক সময় স্ত্রীপুরুষের বিপরীত অনুপাতে শ্রমবৈষম্য ও আহারবৈষম্য দেখা গিয়া থাকে। পুরুষের উপর রহিয়াছে অর্থোপার্জ্জনের ভার, স্ত্রীলোকের কাজ হইতেছে সংসার চালানো। অর্থোপার্জ্জনে খাটুনীর ইতরবিশেষ আছে, কিন্তু মোটামুটী ভাবে সংসার চালানোর খাটুনীতে তো ইতরবিশেষ নাই। এইজন্যই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মেয়েদের ভাগে খাটুনী বেশী, স্বাচ্ছন্দ্য কম—কিন্তু পুরুষের সেদিকে ঔদাসীন্য অপরিমেয়। পুরুষের এই ঔদাসীন্যকে নারী স্নিগ্ধ প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, অথচ পুরুষ নির্লজ্জভাবে ইহাকেই তাহার পাওনা বলিয়া দাবী করে, ইহাই দুঃখের কথা। উভয়ের এই আচরণকে যদি পাপপুণ্যের বাট্‌খারা দিয়া ওজন করিয়া দেখি, তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষের উৎফুল্ল হইবার বিশেষ কোনও কারণ থাকিবে না। মনু বলিয়াছিলেন, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে" ইত্যাদি। গরুকে এক হাঁটু কাদায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া যেমন আমরা ভগবতীর পূজা সমাপন করি, মেয়েদের বেলায় শক্তিপূজাটাও তেমন্‌ ভাবেই সারি। এটা ঘরোয়া সংস্কারের কথা, সুতরাং কি নব্য, কি প্রাচীন, কাহারও হয়ত উষ্ণ হইয়া উঠিবার কোনও কারণ নাই।

শেষ আপত্তি হইতেছে, বাল্যমাতৃত্ব ও ঘন ঘন সন্তানপ্রসব। বাল্যবিবাহের সহিত বাল্যমাতৃত্বের সম্বন্ধ আছে। সংস্কারকেরা বাল্যবিবাহের কড়া সমালোচনা করিয়া থাকেন। বিশেষ কিছু না ভাবিয়া-চিন্তিয়া গালাগালি করাই যদি সমালোচনা হয় তো সে সমালোচনা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তবুও সমাজতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, যৌনতত্ত্ব ইত্যাদি

বিজ্ঞান ঘাঁটিয়া যাঁহারা কথা বলেন, তাঁহাদের আলোচনার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে এবং তাঁহাদের উত্থাপিত আপত্তিগুলিও অকিঞ্চিৎকর নয়। তবে বাল্যবিবাহের সপক্ষেও অনেক কথা বলিবার আছে। ক্ষেত্রশুদ্ধির দিকে হিন্দুর কড়া নজর ছিল—কোন জাতিরই বা না থাকে? এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে সমান পাপে পাপী হিন্দু ছাড়া আরও অনেককে পাওয়া যাইবে। সুপ্রজননের দরুণ ক্ষেত্রশুদ্ধি আকাঙ্ক্ষিত, অথচ সমাজ দুর্ব্বল; এই সমস্যার মীমাংসা কি? ইহার একমাত্র মীমাংসা বালিকা বয়সেই কন্যার একটা গতি করা। তা ছাড়া, একান্নবর্ত্তী পরিবারের দাবীও আছে। ভাবের দিক দিয়াও কিছু বলিবার ছিল। কিন্তু আসল কথা হইতেছে কি, প্রাচীন অনেক ভাল ভাল আচারের মত এখানেও বিকার ঢুকিয়াছে। উভয় পক্ষে বয়সের ন্যূনতা থাকিলে তাহাকে ঠিক বাল্যবিবাহ বলা যাইতে পারিত; এখন পুরুষের যৌবনে এবং নারীর বাল্যে বিবাহ হয়, ইহাকে ঠিক বাল্যবিবাহ বলা চলে না। কন্যা পিতৃগৃহে অরক্ষণীয় ছিল; বালিকাবধূ শ্বশুরকুলে আসিয়াও অনেক ক্ষেত্রে অরক্ষণীয়া হইয়াই জীবন কাটায়। ধর্ম্মের শাসন উভয়ত্র শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। বাল্যমাতৃত্বে কতটুকু গুণ, তাহা সেন্সাস ঘাঁটিয়া কেহ কেহ নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সামাজিক বা পারিবারিক যে আবহাওয়াতে বাল্যবিবাহ বা বাল্যমাতৃত্বের সমস্ত দোষ চাপা পড়িয়া যাইত, সে অনুকূল আবহাওয়াটুকু দিন দিন যাইতে বসিয়াছে। অথচ সমাজের প্রতিকূলতায় কন্যার অরক্ষণীয়াত্বও ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে। এই উভয় সঙ্কটে পথ কোথায়? কন্যাকে পিতৃগৃহে প্রাপ্ত-যৌবনা হইতে দিলেও বিপদের আশঙ্কা আছে (তর্ক নয়, এই আসামে পিতৃগৃহে কন্যার যৌবনপ্রাপ্তির ফলাফল চোখের উপর দেখিতেছি—দেখিয়া শুনিয়া এই পদ্ধতি বাংলার বর্ত্তমান দশায় সার্ব্বভৌম হউক, এমন কামনা করি না); আবার অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাবধূর প্রাপ্তযৌবন স্বামীর কাছেও বিপদের আশঙ্কা কম নয়; এখন সংস্কার সুরু করিবে কোন দিক হইতে? মানুষের প্রকৃতি যেখানে নীচু হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আইনের সাঁড়াশী দিয়া তাহাকে উঁচুতে টানিয়া তুলিতে পারা যাইবে কি? অনেকের মুখে সাবিত্রীর উদাহরণ শুনিতে পাই; কিন্তু আজকালকার সমাজ সাবিত্রীর সমাজ নয়। আবার পুরাণ ঘাঁটিয়া প্রাচীন যুগের বাল্যবিবাহের রেওয়াজ প্রমাণ করার কথা শুনি; কিন্তু আজ যে পুরুষের ধর্ম্মবোধ ও সংযম-সাধনা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। অতএব দৃষ্টান্তের সাম্য কোথায়?

নারীকে ঘন ঘন জননী হইতে বাধ্য করা—ইহাই পুরুষের চরম বর্ব্বরতা। তাও যদি সবগুলি ছেলে বাঁচিয়া থাকিত! এদিকে শুনিতে পাই, হিন্দু Dying race; প্রতীকারের দরুণ কত অনাহক কল্পনা-জল্পনাও শুনি। আইন করিয়া এই অত্যাচার রোধের সুবুদ্ধিটা যে কেন কাহারও মাথায় গজাইল না, তাহাই ভাবি; তাহা হইলে একটা নূতন কিছু হইত বটে। বিপাকে পড়িয়া জন্মসংরোধের বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনের কথা উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী একবার ব্রহ্মচর্য্যের কথা তুলিয়া এখনও দেশবিদেশে খোঁটা খাইতেছেন। জাতির আত্মসংযমে সামর্থ্য নাই, প্রবৃত্তিও নাই; আমরা চলিয়াছি কোন পাতালে? জন্মসংরোধের পাণ্ডারা না হয় নারীর যন্ত্রণার লাঘব করিলেন, কিন্তু পুরুষের ক্ষতিপূরণের কি সুরাহা হইল? আর নারী-পুরুষ, উভয়েই কি সমাজের অঙ্গ নয়? পুরুষের সর্ব্বনাশ প্রকারান্তরে নারীরও সর্ব্বনাশ নয় কি?

আমরা যেমন আছি, চিরকাল তেমনই থাকি, ইহা কাম্য নয়। কারণ শাস্ত্রের বচন আওড়াইয়া

বর্ত্তমান অবস্থাকে যতই পালিশ করি না কেন, অসন্তোষের আগুন যেমন দিনের পর দিন ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে, বহু অমীমাংসিত সমস্যা আমাদের সম্মুখে, ইহাদের সমাধান হওয়া প্রয়োজন। আমরা বর্ত্তমানে যদি ভালই থাকিয়া থাকি তো আরও ভাল হইতে হইবে, এইখানে বসিয়া বসিয়া জাবর কাটিলেই চলিবে না। কিন্তু অন্ধভাবে একটা আচারের জায়গায় আর একটা আচার দাখিল করিতে পারিলেই রাতারাতি আমাদের অবস্থা শোধরাইয়া যাইবে না। ইংরাজের অনুকরণে অবরোধ তুলিয়া দিলাম, যৌবনবিবাহ প্রবর্ত্তন করিলাম, জন্মসংরোধ আন্দোলন চালাইলাম—মানি ইহার সবই ভাল। কিন্তু তবুও তো পরিণাম শুভ দেখিতেছি না। প্রবৃত্তি যদি শাসিত না হয় তো সংস্কারে কি হইবে? দুর্ব্বল দেহে রসায়নের প্রয়োগ বিকার ঘটাইবে না কি?

তার পরের নালিশ, সমাজ ব্যবস্থায় বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নারীর কোনও হাত নাই, নারী আইন প্রণয়নের অধিকারিণী নয়। বর্ত্তমান যুগের নারীর পক্ষে ইহা ক্ষোভের কথাই বটে; এজন্য প্রাচীনেরাও তাহাদের কাছে গালি খাইতেছেন। তবে একটা সান্ত্বনার কথা এই, কেবল ভারতবর্ষই নয়, সব দেশই এই অপরাধে তুল্য অপরাধী। বরং বর্ত্তমান যুগে ভারতবাসী যত নির্ব্বিবাদে নারীকে অনেক কিছু অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছে, স্বাধীনতার লীলাভূমি পাশ্চাত্য দেশে এত সহজে তাহা সম্ভব-পর হয় নাই। হিন্দুর নারীচরিত্রের উপর শ্রদ্ধার ইহা অন্যতম প্রমাণ। একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাই, প্রাচীনেরা একচোখা, তাহারা নারীর জন্যই শিকল গড়িয়াছে, পুরুষকে বাঁধিবার কোনও আয়োজনই করে নাই। কথাটা অত্যুক্তি। যে সমস্ত সংহিতার আইনের উপর হিন্দুর সামাজিক ভিত্তি, তাহার মাঝে পুরুষকে শাসন করিবার আইনই তো দেখি বারো আনা। প্রাচীন কালে একটা ধারণা ছিল, পুরুষ যদি সমর্থ হয়, তো নারীকে সেই লালন করিবে, রক্ষা করিবে, নিজের হক বজায় রাখিবার জন্য নারীকে ব্যতিব্যস্ত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই, মায়ের জাতের স্বার্থ পুরুষের স্বার্থ হইতে পৃথক নয়। যতদিন পুরুষে যথার্থ পৌরুষের অভাব ঘটে নাই, ততদিন নারীর জীবনও শ্রীহীন হয় নাই—পুরুষ তাহার অনেক আবদারই হাসিমুখে রক্ষা করিয়াছে—এমন কি বৌদ্ধযুগে নিজের ঘর-সংসার ছারেখারে দিয়া নারীকে দল বাঁধিয়া সন্ন্যাস নিতে দেখিয়া পর্য্যন্ত আপত্তি করে নাই। কিন্তু পুরুষ যখন অধঃপাতে গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নারীকেও সে নামাইয়া আনিয়াছে; যাহারা কাপুরুষ, আশ্রি-তের উপর অত্যাচারটা তাহাদের স্বভাব। উহা সুস্থপ্রকৃতির পরিচয় নয়, উহা স্বভাবের বিপর্য্যয়। আইনকর্ত্তারা স্বভাব দেখিয়াই আইন করিয়াছিলেন, বিকারে তাহার অপব্যবহার ঘটিলে তাঁহাদিগকে দায়ী করা সঙ্গত নয়। প্রমীলার রাজ্য এখনও সুদূর স্বপ্ন; ইউরোপ ও আমেরিকাতেই যদি আজ পুরুষ হীনবীর্য্য হইয়া যায়, তাহা হইলে কালই যে একটা নারীর রিপাব্লিক গড়িয়া উঠিবে, তাহা মনে করা চলে না। মহাযুদ্ধের সময় এবং তাহার পরেও নারী ঘর সামলাইয়াছে, পুরুষের অনেক কাজে ভাগ নিয়াছে, ইহাতে তাহাদের সমাধিকারের কতকটা দাবীও জন্মিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া সমাজ ও রাষ্ট্র সমস্তই নারীর হাতে চলিয়া যায় নাই, সুস্থ হইয়া পুরুষ আবার নিজের চার্জ্জ বুঝিয়া নিয়াছে।

সমাজের কতকগুলি মোটামুটি বিধানে পুরুষ এখনও ব্যবস্থাপক। তাহার মাঝে নারীর স্বার্থ-হানিকর কিম্বা তাহার অপমানজনক বিধি-ব্যবস্থাও যে নাই, এমন নয়। অনিষ্টকর ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়াও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু নারীর হাতে যে কোনও

আইনই নাই, এ কথা ঠিক নয়। সমাজে এবং পরিবারে নারীর এমন একটা বিশিষ্ট গণ্ডী আছে, যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার একদম নিষিদ্ধ। নারী কলরব করিয়া শক্তি পরিচালনা করে না, কিন্তু তাহার অন্তঃশীল শক্তিপ্রয়োগ যে পুরুষের স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। নারীর উদ্ভাবিত অনেক আচার পুরুষকে কবলিত করিয়া রাখিয়াছে; Race Instinct পুরুষের চেয়ে নারীর মাঝে প্রবল, specific nationality গড়িবার সমস্ত জোগানই তাহার হাতে—ইতিহাস হইতে বহু উদাহরণ দিয়া ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। আধুনিক সমাজ-তত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং পরাভবের কথা ভাবিয়া নারীর ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইবার প্রয়োজন নাই। আজও তাহারা জীবধাত্রী—সন্তানের মাতা, জাতির নির্ম্মাণ তাহাদেরই হাতে। আত্মপ্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়া আন্দোলন হউক, ভাল কথা; কিন্তু জিগীষার বশে যেন আত্মমর্য্যাদাকে সে লঙ্ঘন না করে।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীর কতটুকু হাত থাকা উচিত তাহা অবশ্য বিবেচ্য। রাষ্ট্রপরিচালনায় নারীর গুণপণা এদেশের ইতিহাসে পুনঃপুনঃ প্রমাণিত হইয়াছে। শুধু নামে নয়, কাজে রাণী হইবার উপযুক্ত নারী এখনও এদেশে আছে। সুতরাং এদিক দিয়া নারীর যোগ্যতাকে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু আজকাল ঝগড়া হইতেছে গাণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পর্কে। গণতন্ত্র একটা আদর্শ বটে, কিন্তু সে আদর্শে মানুষ কোনও দিন পৌঁছাইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। গণতন্ত্রের নামে আজকাল যাহা চলিতেছে, তাহা বিশিষ্টতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। মুষ্টিমেয় মনস্বীর হাতে রাজ্যভার ছাড়িয়া দিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় মনস্বীরা পুরুষই হউন বা নারীই হউন, তাহাতে সমগ্র পুরুষজাতি বা নারী-জাতির অধিকার-অনধিকারের মামলার কোনও নিষ্পত্তিই হয় না। কথা হইতেছে তার নীচের বর্গ (class) লইয়া। মুষ্টিমেয়েরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইহাই গণতন্ত্রের মূল কথা। এই সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠদের মাঝে শিক্ষার যত প্রসার হইবে, বিচার ও পর্য্যবেক্ষণক্ষমতা যত বেশী থাকিবে, রাষ্ট্রব্যবস্থা ততই গণতন্ত্রের আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইবে, নতুবা ভোট কুড়াইয়া গণতন্ত্র একটা প্রহসন মাত্র। এইদিক দিয়া বিচার করিলে ইউরামেরিকার নারীর রাষ্ট্রাধিকারের দাবী যতখানি মানায়, আমাদের দেশের নারীর ততখানি মানায় কি? আগে শিক্ষার দ্বারা যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে; তারপর রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবী চলিতে পারে। শিক্ষাকে ডিঙ্গাইয়া রাষ্ট্রীয় অধিকারের আন্দোলন শিক্ষিতা নারীর শক্তির অপচয় নহে কি?—অনেকে আদপেই স্বামী ছাড়া নারীর আলাদা একটা অধিকার থাকার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। গৃহ এবং রাষ্ট্রের মাঝে সম্পর্ক কি হইবে এবং নারী কোন্ দিকে তাহার শক্তি প্রয়োগ করিবে, ইহার একটা সুমীমাংসা না হইলে এ বিবাদের নিষ্পত্তি সহজ নয়। যদিও বা তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লই, নারীর রাষ্ট্রাধিকার থাকা প্রয়োজন, তবুও যোগ্যতার কথাটা একেবারে ঠেলিয়া ফেলিতে পারি না এবং সেই দিক দিয়া আমাদের দেশের নারী-আন্দোলনের এই বিভাব সম্বন্ধে ভাবিবার অনেক কথাই আছে।

আর এক দফা নালিশ চিত্তরঞ্জনের (Recreation) ভাগ নিয়া। সংসারের দরুণ খাটিয়া খুটিয়া মানুষের যে সময়টুকু বাঁচে, সেইটুকু সে চিত্তরঞ্জনে ব্যয় করিতে পারে। সূক্ষ্ম ও উন্নততর বিধিতে ইন্দ্রিয়তর্পণ দ্বারা চিত্ত বিনোদিত হইয়া থাকে। এইরূপে কান্তকলার (Fine arts) উৎপত্তি হয়। বাৎস্যায়নে চতুঃষষ্টি কলার উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে আমা-

দের দেশে যাহারা বিদগ্ধ (Cultured), স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে তাহারা নাকি এই কলাবিদ্যায় নৈপুণ্য অর্জ্জন করিত। বাৎস্যায়নের তালিকা অনুযায়ী যাচাই করিলে এখনো অনেক কলাতে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের—বিশেষতঃ কোনও কোনও কলাতে মেয়েদের সমধিক নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কান্তকলা-সমূহের মধ্যে গীত, বাদ্য, নৃত্য ও আলেখ্যই প্রধান। আলেখ্যের কথা বাদ দিয়া আর তিনটীর কথা ধরিলে ইহাদের মাঝে নারীর বিশিষ্ট স্থানটী কোথায়, এই প্রশ্ন আজকাল উঠিয়াছে। তৌর্য্য-ত্রিকের (নৃত্য-গীত-বাদ্যের) যেখানে সামাজিক প্রয়োগ ঘটে, সেখানে নারীর প্রেক্ষার অধিকার সঙ্কুচিত থাকিলেও প্রয়োগের সে প্রধান উপজীব্য; এ বিষয়ে পুরুষের গুণগ্রাহিতার অভাব নাই। কিন্তু এই ব্যাপারটাই নারীর পক্ষে নিদারুণ অপমানের কারণ হইয়াছে এবং সেই জন্য ভদ্র নারী-সমাজে এই কান্তকলার চর্চ্চা ক্রমশঃ আমাদের দেশে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবের দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। পারিবারিক দৃষ্টিতে এবং কোথায়ও সামাজিক দৃষ্টিতেও গীতবাদ্যে নারীর প্রয়োগাধিকার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। অভিনয়, কিনেমা ইত্যাদির প্রচলন বাড়িতেছে এবং ইহাতে নারীর প্রেক্ষার অধিকারও পুরুষের সমতুল্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। নৃত্যে নারীর প্রয়োগাধিকার সম্বন্ধে শিক্ষিতমহলে বেশ গরম গরম আলোচনাও হইতেছে। অবশ্য বিদেশী সমাজই এখানে আমাদের আদর্শ। বিদেশে Folk-dance বলিয়া একটা জিনিষ আছে। জিনিষটা আমাদের দেশে চালাইবার জন্য কলাবিদ্‌রা সমুৎসুক। সাঁওতালী নাচের খুব প্রশংসা শুনি; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের যৌন সংযমের কথাও মনে পড়ে। অনেকে বোধ হয় জানেন না, এই আসামে Folk-dance এখনও প্রচলিত; সঙ্গে সঙ্গে নানা কুৎসিত কেলেঙ্কারীর কথাও শুনি। দুই-এক বৎসর ধরিয়া একটা বিরুদ্ধ আন্দোলনও সুরু হইয়াছে। এই কথাগুলি মিলাইয়া দেখিলে তৌর্য্যত্রিকে নারীর সামাজিক প্রয়োগাধিকারের একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যে কারণে নারীর অটাট্যা অবরুদ্ধ হইয়াছে, সেই কারণে এই অধিকারও অবরুদ্ধ হইয়াছে। অবরোধ বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে, কিন্তু সংস্কার করিতে হইলে প্রতিকূল নিমিত্তের উৎখাত অগ্রে প্রয়োজন।

চিত্তরঞ্জনের আর একটা উপায় সামাজিক ভাবে নরনারীর অবাধ সম্মেলন। বিদেশী ধরণে পার্টি ইত্যাদি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। অনেকে ইহার পক্ষপাতী। গতবছর কলিকাতায় ইহা নিয়া একটু মত্ততাও প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার পর খবরের কাগজে স্ত্রীপুরুষ উভয় পক্ষের রায় পড়িয়াছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, অধিকাংশেই ইহার নিন্দা করিয়াছিলেন, শিক্ষিতা মেয়েরাই যেন বেশী ধিক্কার দিয়াছিলেন। আমাদের দেশে তীর্থে, পর্ব্বস্নানে নরনারীর অবাধ সম্মেলন ঘটে, কিন্তু তাহার প্রয়োজন স্বতন্ত্র। তবুও বিপদ ঘটে। সামাজিক ভাবে মেলামেশার আর এক ক্ষেত্র ছিল—মেলা। সেগুলি লুপ্তপ্রায়, অবশেষ যাহা আছে, তাহাও কদর্য্য, অতএব ভদ্রসমাজে নিন্দিত। মোট কথা, অবরোধের সপক্ষে এবং বিপক্ষে যে যুক্তি ও হেতুনির্দ্দেশ, এখানেও তাই—মূল সমস্যারই ইহা একটা বিভাব মাত্র। আকাঙ্ক্ষা যেখানে জাগিয়াছে, বিশেষতঃ অনুকূল তর্কও বর্ত্তমান, সেখানে উপায় মানুষ খুঁজিয়া লইবেই। নিষেধ করি না, কিন্তু সতর্ক হইতে বলি।

তৃতীয় দফা নালিশ শিক্ষা লইয়া। এইটাই সব চেয়ে গুরুতর সমস্যা। শিক্ষার নিয়ামক কি হইবে, ইহাই প্রশ্ন। কেহ বলিবেন, যাহাতে

নারীর বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে, এমন শিক্ষাই প্রয়োজন। আবার কেহ বলিবেন, তাহা কেন, শিক্ষা সার্ব্বভৌম, উহাতে লিঙ্গভেদ স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? সেই গোড়ার সমস্যাতেই আবার ফিরিয়া যাইতেছি। নারীকে নারী মনে করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিব, না তাহাকে মানুষ মনে করিয়া ব্যবস্থা করিব? বাস্তবিক, দুইটাই অঙ্গাঙ্গী বিভাব, সুতরাং একতরফা সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। তবুও দুইটা পক্ষ দাঁড়াইতেছে। কোনও জবাব দেওয়ার পূর্ব্বে শিক্ষার অধিকার কতদূর বিস্তৃত, তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন। শিক্ষায় নাকি পুরুষের বখরা বেশী, অতএব তাহার শিক্ষাকেই মানরূপে গ্রহণ করা যাউক। পুরুষের শিক্ষার প্রধান প্রয়োজন বৃত্তি-সংগ্রহ। কৃষকের কৃষি-বিদ্যা, কি সূত্রধরের বাসীবিদ্যা, কি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মসীবিদ্যা—সকলেরই গোড়ায় ওই এক কথা। বৃত্তি-অর্জ্জন যাহাতে সুচল হয়, তাহার দরুণ পুরুষের শিক্ষা। কৃষকপত্নী ক্ষেত্রবিশেষে কৃষকের সহায়ক—তন্তুবায়পত্নী, কুম্ভকারপত্নী এরাও তাই; কিন্তু কেরাণীজায়া স্বামীর সহকর্ম্মিণী নয়। তবুও সর্ব্বত্রই নারীর সংসার অনেকটা একই রকম; কেননা পুরুষ বৃত্তি-অর্জ্জনের দায়ে যতই ছুটাছুটি করুক না কেন, উদরপূরণের দরুণ, সন্তান-রক্ষণের দরুণ, তাহার ঘর চাইই এবং নারীই সেই ঘরের কর্ত্রী। পুরুষের বৃত্তিতে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু পুরুষের দেহরক্ষা ও শিশু-রক্ষা কাজটা সর্ব্বত্রই এক বলিয়া নারীর বৃত্তিতে বৈচিত্র্য নাই। এই বৃত্তিভেদ স্বীকার করিয়া লইলে নারী ও পুরুষের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য থাকিবেই। কিন্তু কথা হইতেছে কি, বৃত্তিই যে শিক্ষার একমাত্র প্রয়োজন, মানুষের মন তো এ কথা মানিতে চাহে না। তাই শিক্ষার অবান্তর উদ্দেশ্যও আসিয়া পড়ে এবং সেইখানেই নারী-পুরুষে ঝগড়া বাধিয়া যায়। তবুও একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, শিক্ষার অবান্তর প্রয়োজনকেই মুখ্যস্থান দেওয়া কতিপয় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, কেননা বৃত্তিসমস্যাটা সার্ব্বভৌম, বিলাস কিম্বা ব্যসনের অধিকার পরিমিত। অতএব মূলতঃ নারী ও পুরুষের শিক্ষার বৈশিষ্ট্যটা প্রাকৃতিক প্রয়োজনেই টিকিয়া যাইবে বলিয়া সন্দেহ হয়।

কিন্তু শিক্ষার অবান্তর বিভাব সম্বন্ধে নারীর আকাঙ্ক্ষাও যখন চারিদিক হইতে সূচিত হইতেছে, তখন সে সম্বন্ধেও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি, বর্ত্তমান জগতে বাঁচিয়া থাকার সমস্যাটাই এত সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে যে বৃত্তিব্যবস্থা করিতে গিয়া পুরুষকে শিক্ষার বহর অনেকখানেই বাড়াইতে হইয়াছে, নতুবা প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা অসম্ভব। নারীর গৃহস্থালীও তেমনি দিন দিন জটিলতর হইয়া উঠিতেছে এবং সে সম্পর্কে কোথায় যে তাহার শিক্ষার সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, ইহাও চিন্তার বিষয়। মোট কথা, যতটুকু জানিলে আগে পেট চলিত বা সংসার চলিত, এখন নারী ও পুরুষ উভয়কেই তাহার বেশী জানিতে হইবে, নতুবা প্রাণরক্ষা কঠিন। এইদিক দিয়া নারী-শিক্ষার মাত্রাও যে চড়িয়া যাইবে, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষার ধমকটা সেইদিক হইতে আসে না।

খোঁটাটা এই, কোনও কাজে লাগিবে না জানিয়াও পুরুষ সাহিত্য পড়ে, ইতিহাস পড়ে, বিজ্ঞান পড়ে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেয়—মনের ক্ষুধা মিটাইবার দরুণ; নারীর মনেরই কি অগ্নিমান্দ্য হইল না কি? সে কেন এ বিষয়ে পুরুষ হইতে পিছাইয়া থাকিবে? নারী যদি বাস্তবকিই এই ক্ষুধা লইয়া পুরুষের কাছে ক্ষুন্নিবৃত্তির দাবী করে, তাহা হইলে তাহাকে ফিরাইয়া দিবার কোনও সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু সন্দেহ হইতেছে, এই

ক্ষুধাটা সত্যিকার ক্ষুধা, না দুষ্ট ক্ষুধা? পুরুষের ক্ষুধার যে নজীর উপস্থিত করা হয়, তাহাও কি সত্য, না শুধু অভ্যাসের ফল? পুরুষের শিক্ষা সম্বন্ধেই আজকাল অনেকের মনে এই ভাবনাই জাগিতেছে। তাঁহারা বলেন, পুরুষের শিক্ষাতেই বাহুল্য ঘটিয়াছে, উহাকে ছাঁটিয়া আরও প্রয়োগসিদ্ধ (Practical) করা প্রয়োজন। শিক্ষায় মনের একটা কৃত্রিম বিলাস-ব্যসন জন্মিয়া যাইতেছে মাত্র, ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শনের এত ডিগ্রীতেও দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে না। মনের আবেগে যে পথে ছুটিয়া গিয়া আজ পুরুষ ফিরিয়া আসিবার দরুণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই পথে নারীকে ঠেলিয়া দিবার কোনও প্রয়োজন আছে কি? পুরুষ ঠেকিয়া শিখিয়াছে, নারী দেখিয়া শিখুক; তাহার শিক্ষার বনিয়াদ পুরুষের দুর্ভোগ দেখিয়া আরও পাকা হউক না কেন? বৃত্তিসমস্যার সহিত যুক্ত আছে বলিয়া, পুরুষের এই বিজাতীয় বাহুল্য-শিক্ষা যেন কতকটা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নারীর পক্ষে তো সে সমস্যা নাই, তবে আর তাহাকে এই দুর্ভোগের ভাগী করা কেন? নারী ও পুরুষ উভয়েরই যেখানে এই অবান্তর শিক্ষার সুযোগ ও অবসর থাকে, সেখানে শুদ্ধ ও প্রয়োগসিদ্ধ জ্ঞান-চর্চ্চার অবকাশ নারীই বেশী পাইতে পারে; তথাপি পুরুষ কেন যে ফ্যাশান-দুরন্ত শিক্ষার প্রতি তাহার লোলুপতাকে উত্তেজিত করিয়া তোলে, তাহা বাস্তবিকই একটা বিস্ময়।

আর একটা কথা আছে, শিক্ষার কালাকাল লইয়া। বাল্যবিবাহের বাধা যদি দূর করিয়াও দেওয়া যায়, তথাপি নারীর শিক্ষাকাল পুরুষের শিক্ষাকালের চেয়ে কম। নারীর দেহ ও মন পুরুষ অপেক্ষা শীঘ্র পরিণতি লাভ করে ও সংসারচিন্তার উপযোগী হয়। সুতরাং তাহার শিক্ষার কালসঙ্কোচ প্রকৃতিকৃত; ইহাকে উল্লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যসমাজ অপর দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে; সম্ভবতঃ নারীও ইহা চায় না। অবশ্য ভবভূতির আত্রেয়ীর কথা বলিতেছি না, উহা ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমের প্রাপ্য সম্মান কে না দিবে? কিন্তু তাহাকেই সার্ব্বভৌম করিতে গেলে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। আদর্শের মোহে এই সোজা কথাটা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই।

বারবার বলিয়াছি, সমাজের মাথায় নারী পুরুষ অনেকটা সমান হইয়া যায়, কেননা অনভিজাত নর-নারীর সেবার উপর নির্ভর করিয়া অভিজাতেরা অনেকটা অবকাশ পাইয়া থাকে এবং সেই অবকাশটা উচ্চবৃত্তির অনুশীলনে স্বচ্ছন্দে ব্যয় করিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বত্র এই নিয়ম খাটে না। অনেকে ইউরোপ আমেরিকার নজীর দেখাইয়া বলিবেন, কেন, তাহারা তো মেয়ে-পুরুষে সমান চালে চলে। চলে বটে, কিন্তু ভারতবাসীর, নিগ্রোর ঘাড়ে পা দিয়া চলে। প্রকৃতির হিসাব গড়ে ঠিক আছে। উহারা জাতিহিসাবে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে; আমরা সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি মাত্র স্বচ্ছন্দে থাকিবার অধিকার পাই। সুতরাং উহাদের আর আমাদের পরিস্থিতি এক নয়। অনুকূল পরিস্থিতি নাই, অথচ মুষ্টিমেয়ের ভাবভঙ্গীকে আমরা সার্ব্বভৌম করিতে চাই; ইংরাজী প্রবচনে এইটাকেই বলে, ঘোড়ার আগে গাড়ী জোতা।

পুরুষ জগতের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছে, নারী তাহা করিতে পাইল না, এই নিয়া ক্ষোভ করিবার হেতু দেখি না। বাহিরের অভিজ্ঞতা পুরুষের স্বভাবতঃই বেশী। কোন্ এক যুগে নাকি নারী ঘরে থাকিয়া সন্তান লালন করিত, আর পুরুষ বনে বনে শিকার তাড়াইয়া ফিরিত; তারপর পুরুষ পশুচারণ করিয়াছে, হলচালন করিয়াছে, সপ্তডিঙ্গা সাজাইয়া সাগর পাড়ি দিয়াছে;

নারীর কিন্তু প্রকৃতিদত্ত সেই একই কাজ! বাহিরে পুরুষ যেমন নিত্যনূতনের সন্ধানে ফিরিয়াছে, মনের ভিতরও তেমনি নূতন আলোর সন্ধান করিয়াছে—একই বিবর্ত্তনের ধারা ধরিয়া দুইটী ব্যাপার পাশাপাশি চলিয়াছে। এমনি করিয়া পুরুষ হইয়াছে জগতের গুরু, নারী হইয়াছে জগতের মাতা, সেবিকা। লক্ষ লক্ষ বৎসরের চেষ্টায় পুরুষের হাতে গড়া এই জগৎ চোখের সামনে আজ বিচিত্র হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে; কিন্তু নারী যে ইহার ধাত্রী, প্রেরণার মূল প্রস্রবণ, ইহার সঙ্গোপন শক্তি, পুরুষ সে কথা ভুলিয়া যাইতে পারে কি? বনে বনে, প্রান্তরে প্রান্তরে, সরিৎ-সমুদ্রে ঘুরিয়া পুরুষ যাহা পাইয়াছে, তাহা নারীকে আনিয়া সঁপিয়া দিয়াছে; অন্তর চুঁড়িয়া যাহা পাইয়াছে, তাহাও নারীকে দেয় নাই কি?—পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরাইয়া নারী কলরব করিয়া বলিবে, না, দেয় নাই। আমি ভারতবাসী, আমি বলিব, দিয়াছে বই কি! ভারতবাসীর অন্তর সাধনার ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, নারীর স্থান সে ক্ষেত্রে কোথায়!

তবে চিরকাল এই ব্যবস্থাই বোধ হয় কায়েম থাকিবে—পুরুষ লইবে অর্জ্জনের ভার, এবং নারী হইবে তাহার অনায়াসবিত্তাধিকারিণী। এ ক্ষেত্রে নারীর স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা পুরুষকে বলহীন করিয়া দিবে; কেননা নারী জীবধাত্রী, গৃহদীপ্তি; পুরুষ যুগ যুগ ধরিয়া যে কাজ স্বচ্ছন্দে করিয়া আসিতেছে, আজ নারী জেদ করিয়া তাহাতে ভাগ বসাইতে গেলে বাস্তবিক পুরুষের তাহাতে আসান হইবে কিনা জানি না, কিন্তু নারীর কর্ত্তব্য অসমাপ্ত পড়িয়া থাকিয়া সমাজব্যবস্থাকে যে বিশৃঙ্খল করিবে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে এবং পরে সমাজ-ব্যবস্থার কথা একবার চিন্তা করিতে বলি। পশ্চিম হইতেও ত্রাহি ত্রাহি রব ভাসিয়া আসিতেছে শুনিতে পাই।

শিক্ষার পর আসে কর্ম্মদায়ের কথা। দুইটী সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আর্থিক বিষয়ে পুরুষের মুখাপেক্ষিতা শিক্ষিতা নারীর পক্ষে অমর্য্যাদাকর; পিতৃরিক্থের ভাগ পুত্র পায়, কন্যা কেন পাইবে না, এ প্রশ্নও কেহ করিয়াছেন; বৃত্তি দ্বারা শুধু অর্থ নয়, যশও লাভ হইতে পারে—নারী যদি অন্তঃপুরের মাঝেই আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহার অর্থ ও যশ উভয় উপার্জ্জনের পথই বন্ধ হইয়া গেল; তারপর আছে স্বদেশের সেবা, রাষ্ট্রের সেবা—তাহাতেই বা নারীর মুক্ত অধিকার কোথায়? মোটামুটি আপত্তিগুলি এই।

সমস্যার ধরণটা কিন্তু সেই একই রকম। অর্থাৎ সমাজের মাথায় এবং গোড়ায় বিত্তসাম্য, কর্ম্মসাম্য আছে; গোড়ায় যশ স্ত্রী-পুরুষ কাহারই নাই, মাথায় যশের পথ উভয়ের পক্ষেই নির্ব্বাধ। যত বৈষম্য সেই মাঝারী লোকে।

পরিবারকে যদি সংসারের কেন্দ্র ধরা যায়, তাহা হইলে নর-নারীতে সেখানে যৌথ কারবার চালাইতেছে বলা যাইতে পারে। মনু বলেন, বিত্ত অর্জন করিতে পুরুষ, ব্যয় করিতে নারী। ইহাতে আলাদা তহবিলের দ্বন্দ্বটা অল্পেই মিটিয়া যায়। এই ব্যবস্থা যে ইতিমধ্যে অচল হইয়া উঠিয়াছে, এমনও বলা চলে না। কিন্তু কথাটা সে তরফ হইতে উঠে না। আমাদের দেশে দাম্পত্য-বন্ধন স্বীকার করা পুরুষের পক্ষে খুসীর কথা, নারীর পক্ষে সেটা আইন। পুরুষ ভর্ত্তা, অবশ্য সব পুরুষই নয়; কিন্তু নারীমাত্রেই ভার্য্যা। বিত্তাধিকারের প্রসঙ্গই এখানে আসিতে পারে না। কিন্তু শিক্ষিতা নারী যদি দাম্পত্যজীবনে স্বাতন্ত্র্য চায়, অর্থাৎ সে যদি বলে, আমি বিবাহ করিব না, কিম্বা বিবাহ করিলেও খুসী মত চলিব? বৃত্তির খোঁজ এইখানেই পড়ে। কথাটা আরও মোলায়েম করিয়া বলিলে এই বলা যাইতে পারে,

পুরুষ স্বাধীন চেষ্টার ফলে যেমন দু'পয়সা আয়ের সংস্থান করে, নারীরও যদি সে পথ থাকে তো সংসার কি আরও স্বচ্ছল হয় না? খুব শাদা কথা। নিম্নশ্রেণীতে ইহার চলন আছে—শুধু স্ত্রী-পুরুষ কেন, শিশুরাও উপার্জ্জক, নহিলে পেট চলে না। ভদ্র গৃহস্থ একথা কাণে তুলিবেন না; স্ত্রীর উপার্জ্জনে খাওয়া পৌরুষের লাঘবকর, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। সুতরাং ভদ্রসমাজে দাম্পত্য-বন্ধন স্বীকার করার পর নারীকে অর্থোপার্জ্জনের পথ ঢুঁড়িবার বড় প্রয়োজন হয় না। তবে নারীর উপার্জ্জনের কোনও পথই যে খোলা থাকে না, তা নয়; সে কথা পরে বলিতেছি। মোটের উপর, যাহারা দাম্পত্যবন্ধন স্বীকার করে না, কিম্বা যাহারা বিধবা, অবীরা, তাহাদের একটা বৃত্তিনির্ব্বাহের পথ চাই। অবশ্য ইহা ঠিক আর্থিক স্বাতন্ত্র্য হইল না—এ হইল ঠেকার কথা। কিন্তু এই সমস্যাটাই আপাততঃ কম গুরুতর নয়। বয়স্থা কুমারীর সংখ্যা বেশী না হউক, বিধবার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়; তাহাদের সকলেরও আবার আশ্রয় জোটে না। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা; "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" বলিয়া সমস্যাটা চাপা দেওয়া এ দেশেও চলে নাই। সূতা কাটা, রন্ধন, ফল বিক্রয়, টাকা লাগানো, আরও দুই চারিটী কুটীরশিল্প—এইগুলি আমাদের দেশে অবীরা অথচ ভদ্র নারীর জীবনোপায় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। আজকাল আরও দুই চারিটা পথ খোলা আছে। উচ্চাঙ্গের সূচীশিল্প, শিক্ষকতার কাজ, ধাত্রীবিদ্যা—এইগুলিকে নারী জীবনোপায়রূপে গ্রহণ করিতে পারে। শেষের দুইটী পথ অবরোধ-সমস্যা দ্বারা কণ্টকিত, অতএব বিরলপ্রচার; শিক্ষাবিস্তারের অভাবেও চাহিদা কম। আর একটা পথ আছে সাহিত্যচর্চ্চা। সকলের শেষে ইহার কথা তুলিলাম, কেননা ইহার অধিকারিণী এত কম যে ইহাকে জীবিকার বহুক্ষুণ্ণ পথ বলা যাইতে পারে না। আর একটা কথা এই, সধবারাও এই উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিলে ভর্ত্তার পৌরুষের লাঘব হয় না।

কিন্তু নারীর স্বতন্ত্র-বৃত্তির আন্দোলনটা অবীরা-সমস্যার সমাধানেই আবদ্ধ থাকে নাই। ইহারও মূলে আছে, সেই ঝাঁঝের কথা—পুরুষ যাহা পারে, নারী তাহা পারিবে না কেন! কিছুদিন আগে মেয়েদের একখানা কাগজে পড়িয়াছিলাম, লেখিকা জাপানী মেয়েদের মাঝে উকীল কয়জন, ডাক্তার কয়জন, কেরাণী কয়জন ইত্যাদির এক লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন, ভারতের নারী এখনও কত পেছনে! পুরুষজাতীয় উকিল-ডাক্তার-কেরাণীমহলেই বেকারের হাহাকারে কাণ ঝালাপালা, তার উপর যদি মেয়েরা প্রতিযোগিতা সুরু করিয়া দেয়, তাহা হইলেই চিত্তির! মা লক্ষ্মীর কৃপা আমাদের উপর এতই প্রচুর যে অবীরা নারীর মামুলী উপার্জ্জনের পথগুলিই দিন দিন সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রীয় ধনাগমের নূতন পন্থা আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত না হইলে পুরুষের সঙ্গে গলা মিলাইয়া নারীও 'ধন চাই' বলিয়া চীৎকার সুরু করিলেও কিছু লাভ নাই। জাপানের কথাতেই বলি। জাপানে মেয়েপুরুষে খাটে—রাষ্ট্রের প্রয়োজন আছে বলিয়াই; নিজের ঘর গুছাইয়া সে পরের ঘর ঝাঁটাইয়া আনিবার ফিকির জানে; তাই তাহাদের মেয়েরাও রাষ্ট্রীয় ধনাগমের সহায়িকা। সেটা তো ফ্যাশানের খাতিরে নয়। আমাদের স্বদেশী শিল্প নাই, বিদেশী বাণিজ্যও তথৈবচ; অপর দেশ হইতে আনিব কি, নিজে-রাই দিন দিন ফতুর হইতেছি; ধন নাই, অথচ অথচ ধন চাই বলিয়া হাঁক! Productive labour-এর বেলাতেই এ দুর্দ্দশা, Unproductive labour-এর তো কথাই নাই। অর্থই যেখানে

নাই, সেখানে নারীর আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের ঝাঁকটা রাষ্ট্রের শিরঃপীড়া গোছের নয় কি? সব জায়গাতেই ওই এক কথা—গাড়ীর আগে ঘোড়া জোতা!

এই সঙ্গে আর একটা চিন্তা করিতে হইবে, সেটা ফ্যাসনের নয়, গরজের কথা। ভারতবর্ষে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম্ সুরু হইয়া গিয়াছে। সভ্যজগতের সঙ্গে যখন টক্কর দিয়া চলিতেই হইবে, তখন এ পাপ ঘাড়ে চাপিবেই, গোটা দুনিয়া হইতে ইহার উচ্ছেদ না হইলে আমাদের দেশ হইতেও হইবে না—বিশেষতঃ যে দেশের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নারীশ্রমিক সমস্যাও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমিকেরা মেয়ে-পুরুষে খাটে বটে (স্বাতন্ত্র্যকামিনীর স্বপ্ন এখানে সার্থক হইয়াছে); কিন্তু স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, চরিত্রে সব দিক দিয়া নারী দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ইহার উপায় কি? শ্রমিক নারীর এই অবনতিতে রাষ্ট্রের মূল শিথিল হইতেছে না কি? শিক্ষিতা নারীরা নিজেদের বৃত্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা আপাততঃ চাপা রাখিয়া এই অভাগিনীদের যদি স্বাতন্ত্র্যের (!) নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা করিতেন!

সকলদিকের কথাই একটু একটু করিয়া বলা হইল। এই আলোচনা দিগ্‌দর্শন মাত্র—সমস্যার সমাধান নয়। সামাজিক সমস্যার, বিশেষতঃ জীবন-সমস্যার সমাধান এক কথায় হয় না। তবুও মানুষ জেদ করে, এক কথায় সে সব গ্রন্থি মোচন করিয়া দিবে। ইহা হইতেই লাখো কথার সৃষ্টি হয়, দোলা পাইয়া মানুষের মন সচেতন হইয়া উঠে, চিন্তার ধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হয়। দেশ যদি প্রাণবন্ত হয় তো এই ভাবের সংঘর্ষে শক্তি বাড়েই। আমরা ভাবিতেছি অনেক, কিন্তু কাজে বিশেষ কিছু করিতে পারিতেছি না। প্রাণের দৈন্য বিশেষ করিয়াই অনুভব করি। সেই জন্য সেই দিকেই আগে দৃষ্টি দিতে বলি।

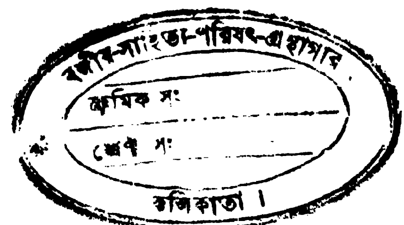
দেখিয়াছি, নারীকে আমরা হারেমে পুরিয়া রাখিয়াছি বলিয়া যে বদনাম রটিয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে সত্য নয়। কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত থাকিলে নারী পিছাইয়া থাকিবার নয়। আমরা সহজেই অনুকরণের নেশায় মাতিয়া উঠি, কিন্তু পরিস্থিতির কথা ভাবি না; হয়ত সমস্যার একটা দিক চিন্তা করি তো আর একটা দিক করি না; কত বিরাট আর কত জটিল যে এই সমাজ, সেটা আমরা দেখিতে পাই না; মানবপ্রকৃতির গূঢ়তর প্রেরণাকে অধ্যয়ন করিতে শিখি না। এইজন্যই আমাদের বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ঘটে, ঘরে-বাহিরে আগুন লাগিয়া যায়।

সমাজ-সমস্যার জবাব আসে কোনও দল হইতে নয়—আত্মপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির অন্তর হইতে। লোকে অপবাদ দেয়, আমরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করি না, সমাজের চাপে ব্যক্তিকে পিষিয়া মারি। এ কথা বিশ্বাস করি না; কেননা আমাদের মত মহত্তের ভক্ত জাত দুনিয়ায় বিরল। স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে আমরা অতি সহজেই পীরের আসন ছাড়িয়া দিই। জনশক্তির মূঢ়ত্ব ইহাতে প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও যে আমাদের চোখে ধাঁধা লাগাইতে পারে, সে কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হয়। সবাই স্বতন্ত্র হয় না—সে আশা মরীচিকামাত্র। মেষ ও মেষপালক দুইই থাকিবে। সান্ত্বনার কথা, শুধু পালক পুরুষই নয়, পালিকা নারীরও অসদ্ভাব নাই আমাদের দেশে। রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, শিক্ষায়, সমাজে, যেখানেই নারীব্যক্তি তাহার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আমরা আপত্তি করি নাই। আরও একটু ভাবিবার কথা এই, এই স্বতন্ত্র নারীব্যক্তিরা যে পুরুষ হইতে বিশিষ্টা, এটা নিয়া চেঁচামেচি করিবারও প্রয়োজন অনুভব করি নাই। নারী রাজ্যশাসন করিয়াছে, ধর্ম্মসঙ্ঘ পরিচালনা করিয়াছে, রণক্ষেত্রে অসি ধারণ করিয়াছে—এক-

বার "মা" বলিয়া ডাকিয়াই আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে সে নারী এবং পুরুষ হইতে তাহার স্বতন্ত্র একটা সত্তা আছে। দ্বিধার কারণটা আজই প্রবল হইয়া উঠিতেছে শুনিতেছি।

আর দুইটী কথা বলিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব। পুরুষ অনবরুদ্ধ, কর্ম্মী, বীর ইত্যাদি; তবুও সে সন্তানের জনক। মানিয়া লইলাম, নারী অবরোধ-মুক্তা, ডিগ্রীধারিণী, রাষ্ট্রপরিচালিকা, বৈজ্ঞানিকা, সাহসিকা ইত্যাদি যত কিছু লোভনীয় বিশেষণে লাঞ্ছিতা; তবুও জননীত্বের দায়কে সে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবে কি? পুরুষ যাই হউক, তবুও সে পিতা; সন্তান উৎপাদন নয়, সন্তান ও সন্তান-জননীর ভরণপোষণের ভারও সে তাহার সবল স্কন্ধে বহন করিতে এখনও রাজী এবং তাহার রাষ্ট্রদায় ও সমাজদায় বোধ হয় ইহাই। কিন্তু নারী যদি বলে সমাজভার ও রাষ্ট্রভার আমিও বহিব, কিন্তু মাতৃত্বের বোঝা বহিতে পারিব না (আর এ কথা না বলিয়া পুরুষের সঙ্গে সমানে সমাজ ও রাষ্ট্রভার বহন করা সম্ভব নয়), তাহা হইলে সেটা জাতীয় আত্মঘাত হইবে না কি? ইউরোপ ও আমেরিকার ঈশান কোণে আজ মেঘ উঠিয়াছে, সে মেঘ আমাদের আকাশেও আসিয়া দেখা দিবে না কি? তবে সান্ত্বনার কথা এই, আমাদের দেশে এখনও শত-করা নব্বই জন বিদেশী রোশনাই পায় নাই, পাইতেও ঈশ্বরেচ্ছায় দেরী আছে, সুতরাং যাহারা নিরীহ গোবেচারী তাহাদের ভয় নাই, মায়ের সেবা এখনও তাহাদের ভাগ্যে মজুদ আছে। উঁচু মাথাতেই ঝড়ের দাপটটা বাজিতেছে, এই যা রক্ষা; সে দাপটটা নীচু পর্য্যন্ত আসিয়া লাগিতে লাগিতে জগদম্বার কৃপায় আবার ভোল ফিরিতেও পারে—বিশেষতঃ নাটের গুরুরা এখনই যখন সুর বদলাইতে সুরু করিয়াছেন।

এটা অবশ্য গড়ের কথা। কিন্তু ব্যক্তির কথাটা তো ভুলিতে পারি না। প্রকৃত সংস্কার সেইখানেই। পরের মেয়ের কি করিতে পারি, সে চিন্তা থাক্, চিন্তা আমার নিজের মেয়েকে নিয়া। তাহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব, আত্ম-শক্তি উদ্বুদ্ধ করিব, তারপর বিশ্বে তাহার স্থান কোথায়, পিতৃত্বের মহনীয় অধিকারে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিব। তাহাতে যদি গতানুগতিকতায় আঘাত পড়ে, বিচলিত হইবার তো কোনও হেতু নাই। অষ্টমবর্ষে গৌরীদানটাও গতানুগতিক, আবার বি-এ পাশ করানোটাও তো গতানুগতিক; স্বাধীন চিন্তা কোথায়? এক পক্ষে আছে গোঁড়ামি, তো আর এক পক্ষে আছে হঠকারিতা। দুইই তো সমান দুর্ব্বলতা। জগতের সমস্ত মেয়ে হইতে পৃথক করিয়াই আমার মেয়েকে আমি গড়িয়া তুলিতে চাই—আত্মার কল্যাণদৃষ্টি, সমাজের কল্যাণ-দৃষ্টি, বিশ্বের কল্যাণদৃষ্টির প্রতি তাহার নয়নকে অন্ধ রাখিতে চাই না। সে মেয়ে যদি স্বতন্ত্রা ব্রহ্মবাদিনী হইয়া লোকমাতার আসনে অধিষ্ঠিতা হয়, নিজকে ধন্য জ্ঞান করিব; আর সে যদি ভর্ত্তৃতন্ত্রা সদ্যোবধূ হইয়া জীবধাত্রীর কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে ফুটিয়া থাকে, তাহাতেও দুঃখ করিব না। কিন্তু সে যে মাতা, এই পরম গৌরব হইতে যেন তাহাকে কোনও প্রলোভনেই বঞ্চিত না করি।



অরূপা

—•—

আমাকে যখন আমি জানিনি, তখন চেয়েছিলাম তোমাকে। তুমিই আমার হৃদয়ের ক্ষুধা, বাসনার আদিরূপ। সে বাসনায় বিবর্তন ছিল, তাই তুমিও ছিলে চঞ্চলা, রূপে রূপে তোমায় আমি পেয়েছি, আবার হারিয়েছি—উল্লাস আর বেদনা আলো-ছায়ার মত লুকোচুরী খেলেছে এই জীবনে কতকাল!—আজ লুকোচুরীর অবসান হবে কি?

রূপের সংস্কার যার ঘুচেনি, সে রূপ ছাড়া আর চাইবে কি? তাই আমার তনুর অণুতে অণুতে চেয়েছিল তোমারই তনুর নিবিড় স্পর্শ। সে চাওয়াতে, সে পাওয়াতে তৃপ্তি ছিল, অতৃপ্তিও ছিল না কি?—ব্যাকুল হয়ে তাই খুঁজেছি, শঙ্কা ও বেদনায় কম্পমান এই মিলনরহস্যের আদি কোথায়? এত পেয়েও আদুরে ছেলের মত সব ঠেলে দিয়ে কোন্ আকাশের চাঁদের দরুণ কেঁদে ফিরেছে এই অবুঝ মন?

স্নিগ্ধ করুণ হাসিটী নিয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছ মনোময়ী, অধীর আবেগে তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, চিরসঞ্চিত বিফলতার বেদনা অশ্রুর আকারে গলে পড়েছে সেখানে, আমার আঁখিজলে মিশেছে তোমার আঁখিজল; তবুও, এত কাছে পেয়েও তো তোমায় পাইনি! যে আবেগে ছুটে গিয়েছি তোমার পানে, তারই নিষ্ঠুর প্রতিঘাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে এসেছি—অশ্রুকলুষিত নয়নের আর্ত্ত চাহনী নিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে তোমায় বলেছি—যাও, যাও তুমি!

ম্লান হেসে তুমি ধীরে ধীরে সরে গিয়েছ—শুধু রেখে গিয়েছ বেদনাভরা দৃষ্টির ব্যাকুল স্মৃতি; তখন বাণাহত বিহঙ্গের মত লুটিয়ে লুটিয়ে কেঁদেছি, আর ডেকেছি—ও মা, মাগো! এই উতলা বুকটাকে দুহাতে নিষ্পেষণ করেও তার হাহাকার থামাতে পারিনি। অবশেষে নিদারুণ অবসাদ আর শ্রান্তির ভারে কখন যে দু'চোখ মুদে এসেছে—

চোখ মেলে চেয়ে দেখেছি, তোমারই সেই স্নিগ্ধ সকরুণ মহিমায় মণ্ডিত আনত মুখখানি—সেই প্রশান্ত নীলিমার মত অপরিমেয় রহস্যে নিথর তোমার অপরূপ মুখ—এ হৃদয়ের অস্ফুট আশা-আকাঙ্ক্ষা যে মুখের পানে চেয়ে গিরিকন্দরমুক্ত মেঘপুঞ্জের মত ফুলে ফুলে ওঠে, ওই উদার ব্যাপ্ত আননশ্রীর মাঝে দিক্‌হারা হয়ে বর্ষণে-বিদ্যুতে-অশনিপাতে আবার আমার বুকেই ফিরে আসে!

এমনি করে গিয়েছে কত কাল! উদ্দীপ্ত অহঙ্কার নিয়ে ভেবেছি, এই মুঠোর মাঝে বন্দী করব তোমায়, কেননা তোমায় তোমায় যে আমি চাই! কামনার বেগ প্রতিহত হয়নি কোথায়ও, সেই দর্পে ভেবেছিলাম, চেয়েছি যখন, পাবই। পেয়েছিলাম,—কিন্তু বলেছি তো, সে পাওয়ায় কত দাহ। আমার হৃদয়ের কলরবেই আমি বধির তখন, তোমার হৃদয়ের অস্ফুট বাণী সে কলরবে মূর্চ্ছিত।—সেই উপেক্ষার বেদনাই যে দ্বিগুণ হয়ে আমার বুকে বেজেছে, সে কথা তখন বুঝিনি, এখন বুঝেছি।

বিদ্যুতের মত একদিন চম্‌কে উঠ্‌ল প্রাণে—তুমিও তো আমায় পেতে চাও! মুখ ফুটে সে কথা কোনও দিন বলনি আমায়—কিন্তু তোমার বিষণ্ণ হাসিতে, তোমার ব্যাকুল চাহনীতে সেই কাতরতাই যে ফুটে উঠেছিল। অস্ফুট অহঙ্কারের অত্যাচারে তোমার বক্ষ ক্ষতবিক্ষত

করেছি, নীরবে তুমি তা সয়েছ, কিন্তু সে তিতিক্ষা ছিল আমারই তরে তোমার আকুল প্রতীক্ষা। তোমার এই নীরব ভাষা বুঝ্‌তে পারিনি বলেই পেয়েও আমার পাওয়া হয়নি, আমার সকল সুখের কল্পনা দুঃখের বিভীষিকায় কণ্টকিত হয়ে ছিল।

শ্রান্ত হয়ে আপনাকে সঁপে দিতে চেয়েছি তোমার মাঝে, কিন্তু পারিনি। তোমার মাঝেও আরাম-শয়ন রচনা করা আমার ভাগ্যে ছিল না; ক্ষুব্ধ হয়ে ভেবেছি, এ কি অভিশপ্ত জীবন! সবাই যেখানে শান্তি পায়, আমার জন্যই শুধু সেখানে অশান্তির ঝড় স্তব্ধ হয়ে থাকে? বুঝ্‌তে পারিনি, আমার তৃপ্তিতেই তোমার শান্তি নয় —তোমারও বুভুক্ষা নিবারণ করতে হবে যে আমাকেই! ছোট হয়ে থাক্‌তে চাইলেই তো তুমি আমার ছোট হয়ে থাক্‌তে দেবে না, তাই বার-বার ঘাটের কাছে এনেই আমার ভরাডুবী করেছ, এমনি করে চিরকাল স্রোতের টানে মহাসমুদ্রের পানে আমায় ভাসিয়ে নিয়েছ, কূলে ভিড়্‌তে দাওনি কোনও দিন!

এমন করে আকর্ষণ কর তুমি আমায়, অথচ এমনি নির্ম্মম আঘাতে ফিরিয়ে দাও—কেন? কোন্ অতৃপ্তি হতে স্ফুরিত এই নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান?—যেদিন বুঝ্‌তে পারলাম, সেদিন হতে আর কোনও দৈন্য, কোনও গ্লানি সঞ্চিত রইল না আমার মাঝে! বিস্মিত হয়ে নিজের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, তোমার চোখে যে আমি এত সুন্দর, এ তো কোনও দিন জানিনি! আমার কামনা দিয়ে তোমার মূর্ত্তি গড়েছি, আমার বুভুক্ষাকেও সেখানে প্রকট কর্‌তে চেয়েছি, কিন্তু তৃপ্তিতে সুমধুর তোমার অপরূপ রূপ তো আমার চোখে পড়েনি!

বাসনার নির্ব্বাণে আজ দেখি তোমার রাজরাজেশ্বরী বিশ্ব-জননীর রূপ। রূপ বলি বটে, কিন্তু জানি সে তো রূপও নয়। ভোক্তৃত্বের বেষ্টনীতে নিপীড়িত নয় সে অপরূপ রূপ! সে তো রূপের পাওয়া নয় রূপকে; অরূপেরও পাওয়া নয় রূপকে; সে যে অরূপের অরূপা। ভেদ আছে অথচ নাই! ধীরে ধীরে এই রূপের জগৎ মিলিয়ে যায় সে বিরাট্ মহিমার মাঝে—রূপ মরে না, বুঝি অরূপের সত্তায় আরোও নিবিড়, আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে —নাই সে, অথচ আছেও! অনুভবের এই অনির্ব্বচনীয় রহস্য—যা বলবার নয়, অথচ যা বলবার জন্যই বুকজোড়া এই আকুলি-বিকুলি! তাই মুখ ফোটবার নয় জেনেও ডাকি—অরূপা, চিন্ময়ী!

আলোচনা

—*—

ভাবুকতায় বাঙ্গালী যত বড়ই হউক না কেন, বাস্তব-জগতে সে রুগ্ন, শ্রীহীন, স্বাধিকারভ্রষ্ট। বাঙ্গালীর জীবন আর বুঝি তেমন করিয়া উৎসবের আনন্দে মুখর হইয়া উঠে না। কবির সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা আর বাস্তবের খানা-ডোবা-কচুরীপানা-মেলেরিয়া-জর্জ্জরিতা বাংলায় আজ প্রভেদ কি মর্ম্মান্তিক! পল্লীর সেই "ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়" নাই, স্বাধীন বাংলার সামাজিক স্বায়ত্তশাসন ও সুশৃঙ্খলা লোপ পাইতে বসিয়াছে, "বুকভরা মধু বাংলার বধূর" নিপীড়িত

হৃদয়ের শ্বাসে বাংলার প্রাণপুরুষ শুকাইয়া কাঠ হইয়া যাইতেছে! এত দৈন্যদশা বাঙ্গালীর, তবুও তো সে তাহার মাকে ভুলিতে পারে নাই। তাহার গর্ব্ব, তাহার আব্দার, তাহার অভিমান, তাহার উৎসব—সবই যে মাকে লইয়া। চাকুরীগতপ্রাণ বাঙ্গালী বিভূঞে কলম পিষিয়া মরে, অন্নাভাবে, অর্থাভাবে, রোগজীর্ণ পাঁজর ক'খানা লইয়া সারা বছর ধুঁকিতে থাকে, তবুও আগমনীর আভাসে বাংলার আকাশে-বাতাসে এতটুকু পুলকের ছোঁয়াচ লাগিতে না লাগিতেই "ঘরমুখো" বাঙ্গালীর প্রাণমন কম্পাসের কাঁটার মত নড়িয়া উঠে—তার অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীজননীর টানে আর পল্লীর প্রাঙ্গণ-আলো-করা মৃন্ময়ী প্রতিমার চিন্ময় আকর্ষণে। দু'দিনের তরে বাঙ্গালীর মনে পড়ে, তার মাকে, তার দেশকে, তার পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটাকে; দু'-দিনের দরুণ সে অনুভব করে, বিদেশে একা হইলেও স্বদেশে তার পঞ্চোত্তরশত ভাই; গ্রাম্য কুৎসা ও দলাদলির কালিমা দু'দিনের দরুণ মুছিয়া ফেলিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে সমবেত কণ্ঠে ডাকে—"মা!"; দুদিনের দরুণ বাংলার শিশুমহলে আনন্দ-উল্লাসের আর সীমা থাকে না, পিতৃগৃহাগতা মুক্তগুণ্ঠনা বাংলার মেয়ের স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে বাঙ্গালীর গৃহ ঝলমল—ধর্ম্মের ভেদ ভুলিয়া গিয়া দুদিনের দরুণ বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই। ধ্যান-তন্ময়তার মাঝে ফুটিয়া উঠে বাংলার এই সান্দ্রীকৃত চেতনার অপরূপ প্রকাশ—দেখি, এই মা-টি তো আর মাটীর মূর্ত্তি নয়—এ যে বাংলার অন্তরে-বাহিরে ব্যাপ্ত নীরন্ধ্র সত্তার প্রীতিঘন বিগ্রহ! তখন বুঝিতে পারি, কেন শক্তি-উপাসনা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের রসায়ন। মাতৃশক্তিতে আবিষ্ট বাঙ্গালী মাতৃতন্ত্রদ্বারা তাহার সমস্ত সাধনা ছাইয়া ফেলিয়াছে—তাহার বৈষ্ণব বাদে তন্ত্রের ছায়া, তাহার বেদান্ত-তত্ত্বেও তন্ত্রের মায়া, প্রবাসী বাঙ্গালীর বিশিষ্ট ধর্ম্ম শক্তিপূজা, তাই যেখানে বাঙ্গালী যায়, সেখানেই সে গড়ে মাতৃমন্দির!

✽

কিন্তু শক্তি-সাধনাই যে বাঙ্গালী জীবনের মর্ম্মকথা, সে কথাও বুঝি আজ বাঙ্গালী ভুলিতে বসিয়াছে। অভ্যাসবশতঃ এখনও সে চিন্ময়ীর মৃণ্ময় ছাঁচ গড়ে, ডাকের গহনা দিয়া তাকে সাজায়, প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র, চক্ষুদানের মন্ত্র অভ্যাস-মতই আওড়াইয়া যায়—কিন্তু কোথায় তাহার হৃদয়ে মহিষমর্দ্দিনীর আবির্ভাব, কোথায় জ্ঞান, কোথায় ঋদ্ধি, কোথায় বিজয়, কোথায় সিদ্ধি? এই দেশের মা-টী, মাটীর মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে পড়িয়া—কি অলঙ্কারে সে তাহাকে সাজাইল, কোন প্রহরণ মায়ের হাতে তুলিয়া দিল? হৃৎপিণ্ড উপাড়িয়া এই মাটীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিল কি? চক্ষু উপাড়িয়া চক্ষুদান করিল কি? বিলাসের নেশায় বাঙ্গালীকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছে, তাই পূজার অবকাশে আর সে দুঃখিনী পল্লীজননীর পূজা করিতে ছুটিয়া যায় না—সে যায় দার্জ্জিলিং-ওয়াল্‌টেয়ার-ভিজিগাপট্টনে হাওয়া খাইতে! বাস্তুভিটার চণ্ডীমণ্ডপে হয়ত প্রদীপ দিবারও কেহ নাই, বাস্তুদেবতা বল্মীকস্তূপের তলে অদৃশ্য, কিন্তু ওদিকে বিলাসের নবতীর্থে বাঙ্গালী ধনিকের অভ্রভেদী সৌধ আকাশকে ভ্রূকুটী করিতেছে! মূর্খ, দরিদ্র, রোগজীর্ণ ছেলেগুলিকে লইয়া পল্লীমাতা তাঁহার কৃতী পুত্রের আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছেন—সে ছেলে হয়তঃ তখন কোন শৈলশিখরে পিক্‌-নিকের ব্যবস্থায় মশ্‌গুল!—দুঃখিনী মায়ের কথা তাহার তখন মনে পড়ে কি?

✽

কলিকাতায় ছাত্রসম্মেলনে যথেষ্ট সমারোহ হইল; আনন্দের কথা বটে। কাজ কতটুকু হইবে, ভবিষ্যৎ

তাহার বিচারক। যাহারা ছাত্র, তাহারা দেশের স্নেহের পাত্র। তাহাদের প্রচেষ্টা কল্যাণোদর্ক হউক, ইহাই প্রার্থনা। বাংলার ছাত্রশক্তি নিতান্ত নগণ্য নয়। স্বদেশী আন্দোলন হই[illegible] অসহযোগ আন্দোলন পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষেত্রেই তাহারা নেতাদের ডাকে প্রাণপূর্ণ আবেগে সাড়া দিয়াছে। দেশের অনেক আন্দোলনেরই মূলে তাহাদের উত্তেজনায় রস জোগাইয়াছে কতটুকু, তাহার হিসাব বাহির করা কঠিন নয়। যুদ্ধ জিতিলে যেমন সেনাপতির নাম হয়, তেমনি স্বদেশী লড়াইয়ে ছাত্রদের শহীদগিরিতেই অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রবাহিনীর নেতারা বেশ সস্তায় নাম কিনিয়াছেন। এইবার ছাত্রদের কার্য্যপদ্ধতি বদ্‌লাইল; নেতৃকর্তৃত্ব ছাড়িয়া এখন তাহারা চায় আত্মকর্তৃত্ব লইতে। মন্দ নয়। উৎসাহ, প্ররোচনা কিছুরই অভাব হয় নাই; এখন সব ভাল যার শেষ ভাল। তবে দুই একটা মনে জাগিতেছে—তাহা বলিয়া ফেলাই সঙ্গত; বিশেষতঃ বুড়োরা বলিবে আর ছেলেরা শুনিবে, এ যখন সনাতন ব্যবস্থা! তবে ছাত্রদলের পাণ্ডামহাশয় বলিয়াছেন, ছাত্রেরা নাকি আর "জীর্ণচিন্তায় বিশ্বাস করিবে না।" তা না করুক; ছেলেরা শুনিবে না বলিয়াই তো বুড়োদের মুখ কোনকালে বন্ধ হইয়া থাকে নাই!

※

নিখিল-ভারত-ছাত্রসম্মেলন নয়, নিখিল"বঙ্গ"-ছাত্রসম্মেলন। সুতরাং আশা ছিল বক্তৃতাদি বাঙ্গালা ভাষাতেই হইবে। শুনিয়া হতাশ হইলাম, বঙ্গের প্রথম ছাত্রসম্মেলনের বক্তৃতা ইত্যাদি হইয়াছে ইংরাজীতে। এ তো বুড়োদের কাণ্ড নয় যে বহুদিনের অভ্যাস ছাড়িতে পারিল না, কিম্বা মতভেদের আশঙ্কা ছিল। বাংলা চলিলে কি দোষ হইত? বোধ হয় উদ্বোধনকর্ত্তা আর সভাপতি মহাশয় অবাঙ্গালী বলিয়াই এই ব্যবস্থা? কিন্তু বাংলায় বক্তৃতা হইয়া ইংরাজীতে তর্জ্জমা হইলে কি তাঁহারা রাগ করিতেন? ছেলেদেরও তাহাতে অন্ততঃ একটা "জীর্ণনীতি" পরিত্যাগের নমুনা দেখিয়া খুসী হইতাম। শুধু এই দুইটী মহোদয়ের উপস্থিতিই যদি মাতৃভাষা-বর্জ্জনের কারণ হইয়া থাকে তো ইঁহাদের না ডাকিয়া বাঙ্গালীর মধ্য হইতেই কি উক্ত পদের যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচন করা যাইত না? 'আর্কুহার্ট সাহেব বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা, সুতরাং তিনিই বঙ্গীয় ছাত্রসম্মেলনের একমাত্র যোগ্য উদ্বোধনকর্ত্তা'—এইরূপ একটা তর্ক মনে ভাসিতে পারে। কিন্তু ছাত্র বলিতে কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রই বুঝিতে হইবে? কেবল ইংরেজীশিক্ষিত ছাত্রদেরই এই সম্মেলন? হিন্দুর টোল, মুসলমানের মক্তবে যাহারা পড়ে, তাহারাও এই সম্মেলনে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল কিনা বুঝিতে পারিলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরপেক্ষ হইয়া আছে, অথচ স্বদেশী ধরণে স্বদেশী বিদেশী উভয়বিধ বিদ্যার কারবার চালাইতেছেন, এমন প্রতিষ্ঠানও দেশে আছে; ছাত্রসম্মেলনে তাহাদের স্থান কোথায় বুঝিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী নামজাদা প্রতিষ্ঠান; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ না আসুন, তাঁহার প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাধ্যক্ষ পণ্ডিত বিধুশেখর দুইটা পদের একটা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারিতেন, ছাত্রসম্মেলনের ধরণধারণের সহিত তাঁহাকে বেখাপ্পাও দেখাইত না। কিন্তু মনে হয়, উদ্যোক্তারা যেন এই দিকটা চিন্তাই করেন নাই। এটা "পুরাতন জীর্ণ চিন্তা"র প্রতি প্রতি অনুরক্তি না বিরক্তি, তাহা বুঝিলাম না।

※

আর্কুহার্ট যাহাই হউন, তাঁহার অভিভাষণটী সুন্দর হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "এই সময় তোমাদের ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবার সময়, প্রস্তুতির সময়—কোনও সমাধান খুঁজিয়া পাইবার

পূর্ব্বেই কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সময় কিন্তু এটা নয়।” স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি আচার্য্য-রূপে ছাত্রদিগকেই এই উপদেশ দিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে দেশী ভাইস্‌চেন্সেলার যতুনাথ কিন্তু এই ধরণের কথা বলিয়া গালি খাইয়াছিলেন। আর্কুহার্টের কথায় কেহ বিশেষ কিছু আপত্তি করেন নাই। কপাল বোধ হয় সঙ্গে ফিরে। পণ্ডিত জবাহার লালও আর্কুহার্টের কথায় সায় দিয়া বলিলেন, “ধীরে, বন্ধু, ধীরে!” কিন্তু তুই-জনের অভিভাষণে মূলতঃ একটা বড় রকমের তফাৎ দেখিতে পাইলাম। এই নিখিলবঙ্গ-“ছাত্র”সম্মেলনেই আর্কুহার্ট সাহেবের বলার ধরণটা যেন ছাত্রের প্রতি আচার্য্যের কায়দায়: আর পণ্ডিত জবাহারলালের বলাটা, তরুণদের প্রতি তরুণ বন্ধুর ঢঙ্গে। এইখানে আমাদের যেন কেমন গোল ঠেকে। ছাত্র আর তরুণ কি সমার্থক? কথাটা ছোট বটে, কিন্তু যে ভাবে ছাত্র-আন্দোলন সুরু হইয়াছে, তাহাতে এই ক্ষুদ্র বৈষম্যটুকু হইতেই সমস্তটা আন্দোলনের মনস্তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। ন্যায়ের ভাষায় তরুণ ব্যাপক সত্তা, আর ছাত্র ব্যাপ্য সত্তা। ব্যাপক অপেক্ষা ব্যাপ্যের গণ্ডী খাটো; অর্থাৎ ব্যাপ্য কতকগুলি বিশেষ কর্ত্তব্য-জালে আবদ্ধ, তাহার স্বমর্য্যাদা ঘটাইলে তাহার ব্যাপ্যসংজ্ঞা নিরর্থক হইয়া যায়। ইহাতে অনধি-কারচর্চ্চার আশঙ্কাও ঘটে। মনে হয়, ইতি-মধ্যেই তাহা সুরু হইয়া গিয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে আরও বলিয়াছি, ছাত্র ছাড়াও দেশে তরুণ আছে, ছাত্রের বয়ঃসীমা পার হইয়া আসি-লেও তারুণ্যের অধিকার থাকে; এই সমস্ত তরু-ণেরা দেশের অনেক ভারই বহন করিতে পারেন এবং করিতেছেন; ছাত্রেরা নিজেদের অধিকার ডিঙ্গাইয়া আসিয়া ইঁহাদের দলে ভিড়িলেই যে দেশ রাতারাতি উদ্ধার হইয়া যাইবে, তাহা নয়—বরং তাহাতে বিশৃঙ্খলাই বেশী ঘটিবে। আর্কুহার্ট সাহেব ছাত্রদের ভাবিতে বলিয়াছেন, কিন্তু কাজে পিছাইয়া থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন (এই নিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে “মাষ্টারমহা[redacted] বলিয়া শ্লেষও করিয়াছেন); ছাত্রসম্মেলনের উদ্বোধন-কর্ত্তার পক্ষে এ উপদেশ বাস্তবিকই সমীচীন হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিতজী প্রথমটায় আর্কুহার্ট সাহেবের কথায় সায় দিয়া শেষে তারুণ্যের উত্তেজনায় বলিয়া ফেলিয়াছেন “আমা-তরুণ ও তরুণীগণ, এমনি করিয়া ভাবিবার ও কাজ করিবার সাহস তোমাদের আছে কি? বিশ্বের তরুণ-তরুণীদের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলা-ইয়া বিদেশী শাসকের হাত হইতে দেশকে—” ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার সমগ্র বক্তৃতার মাঝেই ওই এক সুর। এই সুর তরুণ-সম্মেলনের আসরে শোনাইবে ভাল, কিন্তু বিশুদ্ধ ছাত্র-সম্মেলনে ইহা মানায় কি?

*

ঘোষাল মহাশয়ও বেশ জোর-গলায় বক্তৃতা দিয়াছেন। কিন্তু সেখানেও ওই সংজ্ঞার অতিব্যাপ্তি দোষ। সে যাহা হউক, তিনি ছাত্রদের একটা মোটামুটী কাজের ছকও দিয়াছেন। তাঁহার মতে ছাত্রেরা শুধু পাঠ মুখস্থ করিবে না, তাহারা নাগ-রিকের হিসাবে তাহাদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবে, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, গোঁড়ামি ইত্যাদি উৎপাটন করিবে, পল্লী-স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সংস্কার ও প্রসার করিবে, লাইব্রেরী ইত্যাদির স্থাপনা করিবে। বেশ ভাল কথা। এই কাজ করিতে তাহারা অভিভাব-কের মতামতের অপেক্ষা রাখিবে কি?—সম্ভবতঃ নয়; কেননা অভিভাবকেরা “পুরাতন জীর্ণ নীতি ও চিন্তা” লইয়া আছে।—আচ্ছা, অভিভাবকেরা সব জায়গায় ছাত্রদের সৎকার্য্যে বাধা দিবে কি? যেমন নাগরিক জীবনের যোগ্যতা অর্জ্জন, পল্লী-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার—এইগুলিতে কাহারও আপত্তি হইবে কি?

—এমন আশঙ্কা তো মনে আসে না; তবে ওই যে সমাজ-সংস্কারের কথাটা উঠিয়াছে, ওইখানেই যত ভয়, ওইখানে পিতাপুত্রে লাঠালাঠি হইতেও আটক নাই; কিন্তু ছাত্রেরা তাহাতে পিছু হটিবে না।—এই হইল সম্মেলনের আশা ও আদর্শ। কিন্তু এখানেও দেখি সেই অতিব্যাপ্তির দোষ; সমাজ-সংস্কারকের সঙ্কুল পদবীর প্রতি ছাত্রদের লোভ হওয়া উচিত, কথার ভাবখানা যেন এই। কিন্তু এটা কি সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে? ফ্যাসাদের মাঝে জড়াইয়া গিয়া ছাত্রেরা ইহাতে আত্মকর্ত্তব্যেই ত্রুটী করিবে না কি? তাহা ছাড়া, সামাজিক মতামত নিয়া নিজেদের মাঝেই দল-ভাঙ্গাভাঙ্গি যে হইবে না, তাহারই কিছু নিশ্চয়তা আছে কি? ছাত্র-সম্মেলনে যদি প্রাচ্য-শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রের প্রতিনিধি থাকে, এই নীতি অনুসরণ করিয়া তাহাদের সহিত মিলিয়া কাজ করা সম্ভবপর হইবে কি?

*

সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেও ছাত্রগন্ধ বড় কম। পড়িয়া মনে হয়, এ যেন কোনও রাজনীতিক বৈঠকের কার্য্যবিবরণী পড়িতেছি। প্রায় দেড়কুড়ি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে, কিন্তু ইহার মাঝে যাহা বাস্তবিকই ছাত্রদের চিন্তার বিষয়, তাহার উল্লেখ নৈরাশ্যজনকভাবে কম। বর্ত্তমান শিক্ষানীতির গুণাগুণ, বিজাতীয় ভাষার অতিপ্রয়োগ খর্ব্ব করিয়া স্বজাতীয় ভাষার অধিকতর ব্যবহার —এই দুইটী গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কোনও আলোচনা, অনুরোধ বা উপরোধের নামগন্ধও পাইলাম না। উপরন্তু সর্দ্দা ও গৌরের বিলের সমর্থন, রাজনীতিক প্রগতির ক্ষতিকর বলিয়া সাম্প্রদায়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ কামনা আছে।—বোধ হয় এগুলি "অজীর্ণ" চিন্তার ফল। মোট কথা, সম্মেলনের কার্য্য-বিবরণী পড়িয়া মনে হয়, ছাত্রসম্মেলন যেন দৈনিক খবরের কাগজ পাঠ করিয়া আসিয়া কতকগুলি সস্তা মতের উদ্গার তুলিয়াই ভাবিলেন, তাঁহারা একটা গুরুতর কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন! অবশ্য মতামত প্রকাশের দ্বারা কোনও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব নিরূপিত হয় না। সুতরাং এই সব অকালপক্ক মন্তব্য শুনিয়া আমরা ততটা বিচলিত হই না, ভাবি,—আহা, "অমৃতং বালভাষিতম্!" ছাত্রেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার দরুণ কি উপায় অবলম্বন করে এবং তাহাতে কতটা সার্থকতাই বা লাভ করে, আমরা তাহাই দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম। প্রার্থনা করি, সর্ব্বমঙ্গলা তাহাদের সহায় হউন। ভুলচুক হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা যেন তাহাদিগের প্রচেষ্টাকে কল্যাণময় ও জয়যুক্ত করে।

*

"স্বাধীনতা-সঙ্ঘের" ইস্তাহার পড়িয়া খুসী হইয়াছি। ইস্তাহার সম্ভবতঃ আদেশ নয়, আদর্শ, ইংরেজীতে যাকে বলে pious wish। ইস্তাহার দেখিয়া ইতিমধ্যেই অনেকে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা বলি, মানবসংহিতার এতগুলি সংস্কৃত ious pwishই যদি যুগ যুগ ধরিয়া নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া আসিতে পারিলে, তবে বিংশ-শতাব্দীর মন্নুর দুইটা ইংরেজী pious wish কি হজম হইবে না? "স্বাধীনতা সঙ্ঘের" প্রস্তাবগুলি বেশ মুখরোচক বটে, তবে দুই এক জায়গায় যেন একটু বুঝিতে গোল ঠেকে; কোথায়-কোথায়ও মূল কল্পনাকে একটু টানিয়া লম্বা করিতে গিয়া শেষে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িতে হয় যে বাধ্য হইয়াই জনান্তিকে একবার মাথায় হাত বুলাইয়া লইতে হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মূলনীতিতে দেখিলাম আছে, "সকলের জন্য সমান সুযোগ

সুবিধার ব্যবস্থা এবং সমভাবে ধনসম্পদ বণ্টন।" দুইটা নীতি লইয়াই মনের মাঝে ঠোকাঠুকি চলিতে লাগিল। সমান সুযোগ সুবিধা করিয়া দিলে কি হইবে, মানুষের যে সয়তানী বুদ্ধি—সুযোগ মানেই তো সে বুদ্ধির মাথা কাঁড়া দিয়া উঠা ; তারপরেও সাম্য বজায় থাকিবে তো ? তারপর ফলের উনিশ-বিশ আছে ; যারা অধিকতর বুদ্ধিমান, অতএব বেশী পরিমানে শাঁসালো—তারা কি দুনিয়াদারী সব ফাঁকি বলিয়া হকের ধন বারোভূতকে বিলাইয়া শিবনেত্র হইয়া থাকিবে ? কুড়ের বোঝাও যদি কর্ম্মীর ঘাড়ে চাপে, তাহা হইলে কর্ম্মীর উৎসাহ বজায় থাকিবে তো ?—আরও এমনিতর কত প্রশ্নই মাথায় কিলবিল করিতে থাকে! ভাবি, রুশো-ভল্‌তেয়্যারের ফ্রান্সে যাহা হয় নাই, লেনিনের রাশিয়াতে যাহা হয় নাই, "স্বাধীনতাসঙ্ঘের" ভারত-বর্ষে যদি তাহা হয় তো বলিতে হইবে, ভারত-বর্ষের আধ্যাত্মিক মহিমা কি প্রচণ্ড, কেননা আধি-ভৌতিক কোনও উপায়ে তো এই কমিউনিজম্-স্বর্গ মর্ত্ত্যালোচনগোচর হওয়ার সম্ভাবনা দেখিতেছি না!

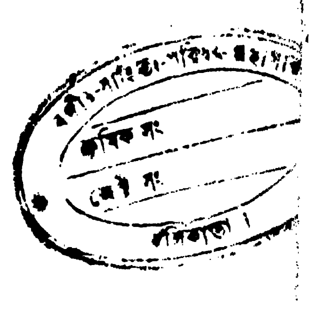
*

কিন্তু "স্বাধীনতাসঙ্ঘ" দয়া করিয়া আমাদের সে আধ্যাত্মিক মোহও ছুটাইয়া দিয়াছেন। সশঙ্ক হইয়া দেখিলাম, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দুই ধন্বন্তরি মুষ্টিযোগ,—কুলগুরু ও কুলপুরোহিতের উচ্ছেদ এবং ব্যবসাদার পুরোহিত ছাড়াই স্বাধীনভাবে পূজাপার্ব্বণাদি সম্পাদনে প্রোৎসাহন। হর্ষবিষাদের কত আন্দোলনই মনের মাঝে খেলিয়া যাইতে লাগিল। পুরোহিত-কুলের উচ্ছেদ হইবে ; অথচ পূজাপার্ব্বণ থাকিবে। পূজা শিখাইবে কে ? পুরোহিতরা তো নয়ই, কেননা তাহাদের তো আগেই সমূলে উচ্ছেদ করা হইয়াছে ; হয়ত ছাপার পুঁথি দেখিয়া—তা শুদ্ধ করিয়া পুঁথিই বা ছাপাইবে, কে ? জার্ম্মানীর আর ফরাসীর Indo-logistরা ? হয়ত এমনও হইতে পারে, সর্ব্বসাধারণকে পূজাপার্ব্বণ শিখাইবার দরুণ কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিদ্যালয় খুলিয়া Ex-পুরোহিতদিগকে বিনা মজুরীতে বিদ্যাটা শিখাইবার দরুণ বাধ্য করা হইবে, যাবৎ সর্ব্ব-সাধারণে বিদ্যাটা না আয়ত্ত করে। কিন্তু তারপর ? Public Training পাওয়ার পর বাপ ছেলেকে ওই বিদ্যা শিখাইতে পারিবে তো ? না তাহাতে আবার সেই কৌলিক দোষ আসিয়া পড়িবে ? তাই যদি হয় তো পৌরোহিত্য শিক্ষার বিদ্যাপীঠ-গুলি যে চিরস্থায়ী করিতে হয়, সেটাই বা কেমন হইবে ? মোটের ওপর ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল ঠেকিতেছে। তবে এক বিষয়ে সঙ্ঘ আমাদের নিশ্চিন্ত করিয়াছেন—কুলগুরুর যে উচ্ছেদ হইবে, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্মের আশঙ্কা নাই, কেননা হরণের ধারায় তিনি ব্যক্ত হইলেও পূরণের ধারায় অব্যক্ত। বোধ হয় গুরুগিরির তালিমটা কাহাকেও নিতে হয় না, সঙ্ঘ সেটা বুঝিয়াই দ্বিতীয় দফায় সে সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। আর কোথায়ও গুরু মানিতে হইবে না ; ভালই হইল। সামাজিক স্বাধীনতার লম্বা ফর্দ্দ আছে—তাহাতে প্রায় সব কুসংস্কারই উড়িয়া গিয়াছে, কেবল এইগুলি বাঁচিয়া আছে—দেব-মন্দির, বিবাহ-প্রথা, বিদ্যালয়। ইহাদের মাঝেও পরাধীনতার উৎকট গন্ধ আমাদের সূক্ষ্ম ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আকুল করিয়া তুলিয়াছে—সুতরাং আমরা সঙ্ঘের নিকট সত্বর ইহাদের উচ্ছেদ কামনা করি। আশা করি, সঙ্ঘের সভ্যেরা সর্ব্বাগ্রে ইস্তাহারলিখিত সমস্ত দফাগুলি পালন করিয়া অপরকে আদর্শপালনের অপক্ষপাত "সুযোগ ও সুবিধা" দিবেন।

সংবাদ ও মন্তব্য

মঠাধিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীমৎ পরমহংসদেব মধ্যপ্রদেশের বস্তারাজের আগ্রহে আগামী ২৯শে আশ্বিন বস্তা যাই-বেন। শারদীয়া পূজার সময় তিনি তথায়ই অবস্থান করিবেন। তৎপর কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে পুরীধামে ফিরিয়া আসিবেন।

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ কথা-সংগ্রহ



[প্রথম খণ্ড]

শ্রীশিশিরকুমার বসু-সঙ্কলিত

—(:০:)—

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পৃষ্ঠপোষক ও বিদ্যোৎসাহী মহারাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নারায়ণ রায় সি-আই-ই (লালগোলা) লিখিতেছেন—

"শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু বি-এ সম্পাদিত "শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-কথা-সংগ্রহ ১ম খণ্ড পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, উহাতে হিন্দুদের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় প্রশ্নোত্তরে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অনেক জটিল তত্ত্ব সংক্ষেপে অথচ বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকারের অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। এই পুস্তকখানি সাধারণ হিন্দুমাত্রেরই প্রয়োজনীর গ্রন্থ। ইহা পাঠ করিলে সকলেই কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিবেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

কলিকাতার বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম নেতা, বৈদ্যশাস্ত্র পীঠের সহকারী অধ্যক্ষ ও দৌলতপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন গুপ্ত, এম্-এ লিখিতেছেন—

"শ্রীমান্ শিশিরকুমার বসু বি-এ প্রণীত শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-কথা-সংগ্রহ পুস্তকখানি প্রায় আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। শিষ্যের প্রশ্ন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের উত্তর বা মীমাংসা—এই ভাবেই পুস্তকখানি প্রস্তুত। প্রশ্নগুলি বহু বিষয় লইয়া করা হইয়াছে এবং প্রায়ই বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে।

"শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভ আমার ভাগ্যে দুইবার ঘটিয়াছিল। বহু জন্মের পুণ্যফলে উপযুক্ত সদ্‌গুরু লাভ হয় এবং সেই সদ্‌গুরুর শ্রীচরণসমীপে মনের সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া মীমাংসা করাইয়া সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে প্রবন্ধরূপে প্রকাশ করা বিশেষ সৌভাগ্যের কথা।

"আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থখানি ভাল করিয়া পড়িলে সকলেই উপকৃত হইবেন। কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর আর একটু বিশদ হইলে ভাল হয়। তাহা দ্বিতীয় সংস্করণে করা যাইতে পারে।"

শ্রীমৎ স্বামী রুদ্রানন্দ গিরি মহারাজ (রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া) লিখিতেছেন—

"শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু সম্পাদিত শ্রীশ্রী-নিগমানন্দ কথা-সংগ্রহ। গ্রন্থকার যে মহাপুরুষের উপদেশাবলী গ্রন্থাকারে গ্রথিত করিয়াছেন তিনি জগদ্‌গুরু ও সদ্‌গুরুর অবতার। তিনি পরমজ্ঞানী ও পরম ভক্ত। তিনি একজন আদর্শ কর্ম্মী পুরুষ। গ্রন্থকার প্রশ্নচ্ছলে অনেক গভীর বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজ-নীতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জ্ঞান-গবেষণার নিরপেক্ষ সমালোচনা আছে। সৎশিষ্য সদ্‌গুরুর নিকট যেসকল ধর্ম্মসিদ্ধান্ত ও জটিল প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা পাইয়াছেন, তাহাই সাধারণের

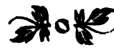
অবগতির জন্য এই সদ্‌গ্রন্থের অবতারণা। দেশে দেশে গৃহে গৃহে এই গ্রন্থ বিরাজ করুক ইহাই জগদম্বার নিকট আন্তরিক প্রার্থনা।"

Forward Fublishing House হইতে প্রকাশিত দৈনিক "বাঙলার কথা" লিখিতেছেন—

"শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-কথা-সংগ্রহ" ১ম খণ্ড শ্রীশিশির কুমার বসু বি-এ সম্পাদিত, মূল্য ১৷৵০। গুরুশিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে শ্রীনিগমানন্দের উপদেশাবলী। সাধুসজ্জনের উপদেশ সকলেরই মনোযোগ দিয়া পাঠ করা উচিত। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবেন।"

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—
মুখার্জ্জী এণ্ড কোং
১৭২ বউবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভক্তসম্মিলনী



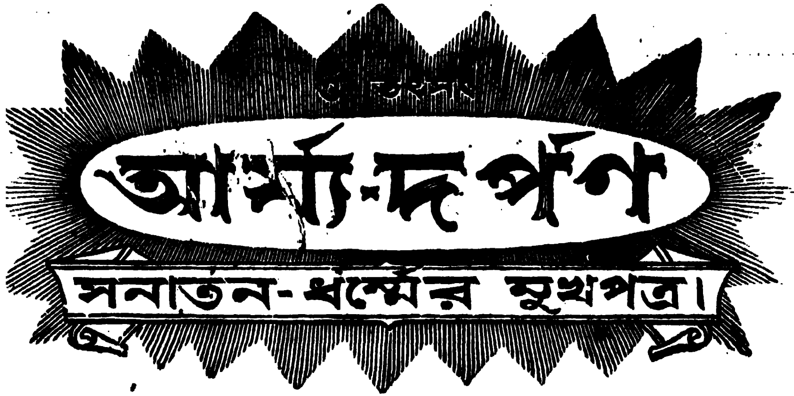
চতুর্দ্দশ-বার্ষিক ভক্তসম্মিলনীর অধিবেশন এবার মধ্য-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে হওয়ার প্রস্তাব গত ভক্তসম্মিলনীতে স্থিরীকৃত হইয়াছিল; এবং ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, যাঁহারা ভক্তসম্মিলনীতে যোগদান করিবেন, তাঁহারা সম্মিলনীর একমাস পূর্ব্বে জনপ্রতি ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিয়া নাম তালিকাভুক্ত করিবেন। তদনুযায়ী সম্মিলনীতে যোগদানেচ্ছু ভক্তগণকে জানান যাইতেছে, তাঁহারা যেন কার্ত্তিকমাস মধ্যে জনপ্রতি ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিয়া নাম তালিকাভুক্ত করেন। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে যাঁহাদের টাকা আমাদের হস্তগত হইবে না, পরে তাঁহাদের ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন হইবে।

সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিলে সে কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়া নাম লিখাইতে হইবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দরুণ অতিরিক্ত টাকা লাগিবে না, কিন্তু তাহাদের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। তবে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের নাম লিখাইবার প্রয়োজন নাই। মণিঅর্ডার কুপনে নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। বিশেষ প্রয়োজন বোধ না করিলে কাহারো টাকার প্রাপ্তি-সংবাদ দেওয়া হইবে না।

ষ্টেশন হইতে আশ্রম তিন মাইল দূরে অবস্থিত; ডুলী পাল্‌কী ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের অন্য যানাদিতে আসিবার সুবিধা নাই। সুতরাং ষ্টেশন হইতে আশ্রম পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিতে হইবে। তবে যাহারা ডুলিতে বা পাল্‌কীতে আসিতে চান, তাহাদিগকে পূর্ব্বে জানাইতে হইবে। ষ্টেশন হইতে আশ্রমে আসিতে ডুলিতে ১৲ টাকা এবং পাল্কীতে ৮৲ টাকা লাগিবে।

অন্যান্য বিশেষ সংবাদ পরে বিজ্ঞাপিত হইবে।

স্বামী প্রেমানন্দ
মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম
পোঃ জয়দেবপুর—ঢাকা



২১শ বর্ষ — ২য় খণ্ড

কার্ত্তিক—১৩৩৫

সমষ্টি সং ২২৩ — ১ম সংখ্যা

মঘবাঁ ঋজীষী

—*—

ঋগ্বেদ সংহিতা—৩।৫।১৭-২০

—*—

[বামদেব ঋষিঃ—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ—অগ্নি দেবতা]

আ সত্যো যাতু মঘবাঁ ঋজীষী
দ্রবন্ত্বস্য হরয় উপ নঃ।
তস্মা ইদন্ধঃ সুষুমা সুদক্ষ-
মিহাভিপিত্বং করতে গৃণানঃ ॥

সত্যসন্ধ মঘবন্, পিয়ে সোম রাখে শুধু আঁশ—
আসুক্ না ঘোড়াগুলি নিয়ে হেথা আমাদের পাশ।
বীর্য্যশালী সোমরস ভাল করে রেখেছি নিঙারি,
পিয়ে নিক্ এসে হেথা, গুণগাথা গাব মোরা তারি!

অব স্য শূরাধ্বনো নান্তে-
ঽস্মিন্নো অদ্য সবনে মন্দধ্যৈ।
শংসাত্যুক্থমুশনেব বেধা-
শ্চিকিতুষে অসুর্য্যায় মন্ম ॥

ছেড়ে দাও আমাদের—পান্থ যথা পথ-অবসানে,
মহানন্দে মেতে যাই আজি এই মধ্যাহ্ন সবনে;
শূর তুমি, অসুরের দর্পহারী, জানই তো সব,
উশনার মত ওই যজমান গাহে তব স্তব।

কবির্ন নিণ্যং বিদথানি সাধন্
বৃষা যৎ সেকং বিপিপানো অর্চ্যাৎ।
দিব ইত্থা জীজনৎ সপ্ত কারূন্
অহ্না চিচ্চক্রুর্বয়ুনা গৃণন্তঃ ॥

সাধিবার যাহা কিছু কবি হেন সেধেছ গোপনে,
ইচ্ছাসুখে পিবে সোম, হে বৃষভ, এই ছিল মনে;
দিবলোক হতে তাই ছড়ায়েছ সাতটী কিরণ—
বলিহারি! দিনে দিনে গড়ে তারা মানবের মন।

স্বর্যদ্বেদি সুদৃশীকমর্কৈ-
র্মহি জ্যোতী রুরুচুর্যদ্ধ বস্তোঃ
অন্ধা তমাংসি দুধিতা বিচক্ষে
নৃভ্যশ্চকার নৃতমো অভিষ্টৌ ॥

আঁখিশোভা সুরলোক ঝলমলি ওই দেখা যায়,
ওই তারি জ্যোতির্ম্ময় পুরবাসী দীপ্ত মহিমায়!
অন্ধ তমঃ যাহা ছিল, সে আলোকে হল খান্ খান্—
নরনেতা নরগৃহে করিলেন দিব্য অভিযান।

ববক্ষ ইন্দ্রো অমিতমৃজীষী
উভে আ পপ্রৌ রোদসী মহিত্বা।
অতশ্চিদস্য মহিমা বিরেচ্য-
ভি যো বিশ্বা ভুবনা বভুব ॥

পিয়ে ইন্দ্র সোম-সার বহে তার মহিমা অপার,
রোদসীরে ছেয়ে আছে সে গরিমা এপার ওপার;
এই তার মহিমায় চরাচর গিয়াছে ছাপিয়া—
এ বিশ্বভুবন সে যে অবহেলে রেখেছে ঝাঁপিয়া!

বিশ্বানি শক্রো নর্য্যাণি বিদ্বান্
অপো রিরেচ সখিভির্নিকামৈঃ।
অশ্মানং চিদ্যে বিভিদুর্বচোভিঃ
ব্রজং গোমন্তং উশিজো বিবব্রুঃ॥

জানেন সকলি শক্র, মানুষের যাহা কিছু চাই,
নিয়ে সাথী মরুতেরে মুক্তধারা রচেছেন তাই;
ফুঁড়েছে পাহাড় এরা কোনো দিন বচনের ঘায়,
আবরি রেখেছে কভু গোষ্ঠ জানি কোন্ কামনায়!

আপো বৃত্রং বব্রিবাংসং পরাহন্
প্রাবত্তে বজ্রং পৃথিবী সচেতাঃ।
প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়াণ্যৈনোঃ
পতির্ভবঞ্ছবসা শূর ধৃষ্ণো ॥

হে রক্ষক, যে অসুর জলরাশি রেখেছে ছাপায়ে,
পড়ুক মাথায় তার বজ্র তব পৃথিবী কাঁপায়ে!
ধৃষ্ট তুমি, শূর তুমি, বাহুবলে জিনেছ ভুবন,
সমুদ্রসলিলে জাগে তোমারই প্রাণের স্পন্দন।

অমানিশা

অন্ধকার ভালবাসি না, এ কথা জোর করিয়াই বলিয়াছিলাম। কিন্তু আমার মাঝেই যে অমানিশার অতলস্পর্শ অন্ধকার স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, এতটুকু আলোকরশ্মির আঘাতে বেদনায় সে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহা তো জানিতাম না। আর জানিতাম না, আলোকের উচ্ছ্বাসে যতই মুখর হইয়া উঠি না কেন, এই অন্ধকারই বুঝি আমার প্রিয়তমের রূপ।

সেদিন অমানিশা। স্থানটা বিকট শ্মশানভূমিও নয়, কালও বিভীষিকাময়ী নিশীথিনী নয়, মনটাও নিতান্ত বৈরাগ্যবিধুর ছিল না। কিন্তু এই স্থান-কাল-পাত্রের প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করিয়াও অন্ধকারের মোহ যেন আমায় পাইয়া বসিল। এইমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে,—কিন্তু আসন্নবর্ষণ মেঘের ভারে আকাশ যেন নুইয়া পড়িয়াছে, দিক্‌চক্রবালে নক্ষত্রের আলো মেঘের উপর দিয়া গড়াইয়া আলোকের শিকরবাষ্পে অন্ধকারকে একটুখানি তরল করিয়া তুলিয়াছে; নির্জ্জন নদীতীর, ভরা-নদীর বুক নিস্তরঙ্গ, অস্ফুট আলোকে শিশার পাতের মত মলিন দেখাইতেছে। নিতান্ত অন্যমনস্ক হইয়াই এইখানটায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। নদীর পারেই একটা পাথরের উপর বসিয়া, দিগন্তের কোলে চাহিয়া কি যে দেখিতে পাইলাম বলিতে পারি না, কিন্তু আমার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া একটা তুষার-শীতল স্পর্শের স্রোত মাথার দিকে উজান বহিয়া যাইতে লাগিল। সে. স্পর্শ আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া আকাশব্যাপী অন্ধকারের সঙ্গে মাখামাখি হইয়া দিগ্‌দিগন্তে লুটাইয়া পড়িল, —মনে হইতে লাগিল, এই যে অন্তর-বাহির ব্যাপ্ত করিয়া সীমাহীন অন্ধকারের পসরা—এ যেন আমারই সত্তার আর এক পিঠ; এই অন্ধকারের বুকে আমার এক বিন্দু চেতনা খদ্যোতের মতই জ্বলিতেছে—নিভিতেছে, নিখিলব্যাপী এই বিরাট্ নিস্তব্ধতার মাঝে তাহার মুখর ভাষণ যেন সে স্তব্ধতাকেই আরও বেশী করিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছে!

কালোর রূপে যে এত আলো সে তো জানিতাম না। আজ আর আমার অতীত নাই, বর্ত্তমান নাই, ভবিষ্যত নাই—সহায়-সম্পদ কিছুই নাই—আমি অনির্ব্বচনীয় ভাবে নিঃসঙ্গ। চোখ বুজিয়া যাহা দেখি, চোখ মেলিয়াও দেখি তাই—অন্ধকারের প্লাবনে বাহির ভিতর দুই একাকার হইয়া গিয়াছে! আমি বাঁচিলাম, আর চাওয়ার বা পাওয়ায় কিছুই রহিল না—যাহা দূর-দূরান্তর ছিল, এই নীরন্ধ্র-নিবিড় অনুভবে তাহাও অতি নিকট হইয়া গেল—মনে হয়, হাত বাড়াইলেই তাহাকে পাই, কিন্তু হাত বাড়াইবার প্রচেষ্টাতেও এই নিস্তরঙ্গ গভীর অন্ধকারকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তি হয় না।

নিস্তব্ধ এই অন্ধকার, কিন্তু প্রাণহীন তো নয়। ঝিল্লীর একটানা ঝঙ্কারে সে নীরবতা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, বিশ্বের আদিম রহস্য যেন তাহারই তালে তালে স্পন্দিত হইতেছে। অনুভব করিলাম, এ অন্ধকার শুধু একটা বিরাট্ প্রতিষেধ নয়, সর্ব্বশূন্য নয়, বিচিত্র ভাবনা-চেতনা-বেদনারবীজ যেন ইহারই মাঝে সমপুষ্টি রহিয়াছে, প্রকাশের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়া আছে। যেমন করিয়া শব্দের অনুরণন শূন্যে মিলাইয়া গিয়াও চিত্তে জাগাইয়া যায় একটুখানি স্মৃতির পরশ, তেমনি প্রাণস্পন্দনে দুনির্ব্বার জগৎ যেন সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম হইয়া আমার এই চেতনাব্যাপ্ত সীমাহীন অন্ধকারের মাঝে মিলাইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রিয়গ্রাম স্তব্ধ এখানে, কিন্তু সে স্তব্ধতা তো নাস্তি-ধর্ম্ম নয়, সে যেন বিপুল অস্তিত্বের সম্ভাব্যতাকেই কুক্ষিগত করিয়া

নিমীলিত চেতনায় জাগিয়া আছে একটা বিরাট্ নাস্তি!—শ্বাস বহে কি না বহে—রূপের জগতে আমি সংজ্ঞা হারাইলাম।

এই নিস্তব্ধ নিবিড় অন্ধকারের সোহাগে যাহাদের চিত্ত গুঞ্জরিয়া উঠে, আদর করিয়া তাহারা তাহাকে ডাকে—"শ্যামা!" রূপদক্ষ কল্পকের চিত্তে ফুটিয়া উঠে এই আঁধারের রূপ আলুলায়িতকুন্তলা বিবসনা বিভীষিকার মূর্ত্তিতে, নীলাঞ্জনস্নিগ্ধবরণা, স্মেরাননা শ্যামার মূর্ত্তিতে!—কে বলে অন্ধকারকে আমরা ভালবাসি না? অন্ধকারের স্নিগ্ধ স্পর্শ সমস্ত শরীরে বুলাইয়া লইয়া ক্ষণিকের তরে আলোর সায়রে ঝাঁপাঝাঁপি করিতে ছুটিয়া যাই—এই না আমাদের জীবন! এ জীবনে কতটুকু ব্যক্ত হইয়াছে? তোমার কাছে আমার কতটুকু ধরা পড়িয়াছে? আমার কাছেই বা আমার কতটুকু সুস্পষ্ট? এই যে দিনের দিন কত মান-অভিমানে, কত অকথিত বাণীতে, সঙ্গতিহীন আচরণে দুর্ব্বোধ্য এই জীবনযাত্রা—এ ও কি সেই অন্ধকারেরই রূপ নয়? তোমার কাছে আমি আঁধার, আমার কাছেও তুমি আঁধার। আমার বাহিরে যতটুকু আলো, তার শতগুণ আঁধারে ছাইয়া আছে অন্তরের অন্তঃপুর! কোথায় প্রকাশ জগতে—কতটুকু প্রকাশ?—অথচ এতখানি অন্ধকার বুকে-চোখে পুরিয়াও অস্বস্তি তো নাই—শিশু যেমন পরম নির্ভয়ে মাতৃস্তন্যকে আঁকড়াইয়া ধরে, তেমনি অন্ধকারের বক্ষে নিলীন হইয়া তাহারই অব্যক্ত সুধা পান করিয়া আমাদের এত উল্লাস! কিছু জানি না বলিয়াই এত নিশ্চিন্ত আছি, আপন খেয়ালে অন্ধকার ছানিয়া কত কল্পমূর্ত্তিই না গড়িতেছি; আলোর প্লাবনে যদি সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িত, তাহা হইলে এ সুখ বুঝি থাকিত না। তাই যদি বলি, শ্যামা আমার জগন্ময়ী, সে কি শুধু রূপক? যেখানেই রহস্যের যবনিকায় অন্তরাল হইয়া রহিয়াছে প্রাণের লীলা—আমি দেখি, সেইখানে আমার শ্যামা! সুপ্তিমগ্ন বিশ্বপ্রাণের উপর অমানিশার নিবিড় স্নেহাঞ্চল, অন্তহীন আকাশের নীলস্নিগ্ধ মহিমা, আমারই অন্তর্জগতের রহস্যানথর নিতল স্তব্ধতা, আমার সুপ্তি, আমার মরণ—এই তো আমার শ্যামা মা!

*

অমানিশার অন্ধকার শুধু রহস্যই নয়—এ নিদারুণ উগ্রকঠিন সংযম। মনে হয়, যেন আলোর রাশ টানিয়া তাহার প্লাবনকে অবরুদ্ধ করা হইয়াছে, ছাড়িয়া দিলে এখনই তাহার নির্ম্মম আঘাতে বিশ্বের পঞ্জর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী"—সর্ব্বভূতের কাছে যাহা নিশা, সংযমী তাহাতে জাগিয়া আছেন—সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত কূটস্থ-ধ্রুব প্রাণপুরুষ রূপে। ইনিই অন্ধকারের রাজা, বিশ্বতশ্চক্ষুর দীপ্তি, আলোকের সংহর্ত্তা। তোমার-আমার আলো আর কতটুকু?—কণিকাপ্রমাণ খদ্যোত বই তো নয়। অন্ধকারের প্লাবনেই হোক্, আর আলোর প্লাবনেই হোক্, সে দীপ্তিকণা ভাসিয়া যাইতে কতক্ষণ?—আর বিশ্বচেতনা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলে তাহা ভাসিয়া যাইবেই, সবিতার প্রকাশে নক্ষত্রের বিন্দু যেমন করিয়া মিলাইয়া যায়! তাই খদ্যোতকে মারিয়া সবিতা হইয়া জাগিয়া আছে যাঁহার নয়নের দীপ্তি, স্বয়ং তিনি আঁধারের রাজা। এই রাজার প্রসাদ পাইয়াছে যে, সেই সংযমী—ইন্দ্রিয়ের খদ্যোতিকা নিভিয়া গিয়া সেও অন্ধকারে সমাহিত।

মহাকালের শুভ্রবক্ষে লগ্না ওই অন্ধকারের জমাট্ মূর্ত্তি—এই তো বৈরাগ্যের রূপ। চেতনা আছে বটে, কিন্তু সে চেতনা রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শকে ফুটাইয়া তোলে না, সকল বৈচিত্র্যকে শুষিয়া অন্ধকারে একাকার করিয়া দেয়—বিচ্ছিন্ন হইয়া যাহা ছড়াইয়া

পড়িত, সংহত করিয়া তাহাকে একটী বিন্দুতে জমাট করিয়া রাখে—কজ্জলবিন্দুর মত। অনন্ত-ব্যাপ্ত নির্ব্বিশেষ চেতনাতে এই অণুপ্রমাণ সত্তার অনুভব, রূপগ্রস্তের কাছে ইহাই তো অন্ধকার; অথচ সূক্ষ্মাগ্র কণ্টকের মত বৈরাগীকে ইহাই চিরকাল সচেতন করিয়া রাখিয়াছে—বৈচিত্র্য দিয়া নয়, একাগ্রতা দিয়া,—বিলাসে নয়, নিষ্ঠায়।

প্রলয়কে যে ডরায়, সে মূঢ়। জানে না, তাহার অন্তঃপ্রকৃতি অহরহঃ এই মহাবিনাশকেই কামনা করিতেছে। ক্ষুব্ধ ইন্দ্রিয়মণ্ডলী লইয়া আলোর জগতে ছুটাছুটি কর—তখন কি বুঝিতে পার, তোমার প্রাণ কাঁদিতেছে সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকারের দরুণ—তুমি বিশ্রান্তির কাঙ্গাল, নিদ্রার কাঙ্গাল, মরণের কাঙ্গাল! অন্ধকারের দৃশ্যপটকে ভূমিকা করিয়াই এই আলোকের স্ফুলিঙ্গনৃত্য, এ কথা যে জানে সে পর্য্যাপ্তিতেও উচ্ছ্বসিত নয়, দৈন্যেও বিকল নয়! মনে মনে তুমি তাহাকেই গুরু বলিয়া মানিয়া লও নাই কি?

মৃত্যুকে জয় করিতে হইলে মৃত্যুর মাঝে প্রবেশ করিতে হয়। মরণকে এড়াইবার চেষ্টাও মিথ্যা। জীবনের প্রতি যে অনুরক্তি মরণকে দূরে সরাইয়া রাখে তাহা যে মরণপ্রীতিরই রূপান্তর, তাহা কয়জন জানে? মরণের রহস্য আয়ত্ত করিব বলিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে চাই, অন্ধকারের আরতি করিব বলিয়াই কম্প্রশিখ প্রদীপের প্রয়োজন। সব যাক্, তবুও আমির বিনাশ চাই না। সব গ্রস্ত হইলে যে আমি জাগিয়া থাকে, সে কি জীবনের রূপ, না মরণের প্রতিক? এই নিঃসঙ্গ আমি কে না চায়? যে না চায়, সে আলোর খদ্যোত হইয়া ছুটাছুটি করিয়া শান্তি পায় কি?—একবার তোমার অন্তরাত্মাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

অমানিশার অন্ধকারই আমার কাছে সত্যের রূপ, কল্যাণের রূপ, আনন্দের রূপ। ধারকরা আলোক দিয়া আমি বস্তু-জগৎকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে চাই না, আমার অক্ষিতারার স্বয়ং-জ্যোতিই সে অন্ধকারকে প্রোদ্ভোদিত করিয়া তুলিবে। দৃশ্য আঁধার, দ্রষ্টা জ্যোতিঃস্বরূপ আমি। দৃশ্যে বিকল্প নাই বলিয়া দ্রষ্টাতেও বিবর্ত্ত নাই, তাই আঁধারের দ্রষ্টা হইয়াই আমি আমার কেবলস্বরূপের পরিচয় পাই। **কেবল** জ্ঞান আর কিছু নয়, জ্ঞেয়ের ছলনা নয়, জ্ঞানজ্ঞেয়ের সম্মিশ্রণে মোহের সৃষ্টি নয়,—স্বতঃপ্রদীপ এই কেবল জ্ঞান—ইহাই আমার স্বরূপ। "চন্দ্রসূর্য্য, অগ্নি-বিদ্যুৎ যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না"—বিশ্বের প্রকাশকও যাহার প্রকাশক নয়, সে আমার এই আত্মচৈতন্য—যার রূপ নীরূপ, যার লেখা অলেখ,—যাকে বলি নিরন্তর, নিরঞ্জন, নির্দ্বয়, নির্ভয়। এ আঁধারেরই সেসার।

জগতে কল্যাণ-অকল্যাণে জড়াইয়া রহিয়াছে, বাছিয়া লইবার শক্তি নাই। কল্যাণকে বুকে টানিয়া লইতে গিয়া অকল্যাণকে আশ্রয় দিই, অকল্যাণ দূর করিতে গিয়া কল্যাণকেই হটাইয়া দিই—এই দ্বন্দ্ব নিত্য আমার জীবনে। ভাবিয়া দেখি, শিবে-অশিবে বেষ্টনীরচনাই তো মায়া! নিখিলের অনু-ভবে কোথায় বা শিব, কোথায় বা অশিব? কেহ বা পূর্ণ, কেহ বা অপূর্ণ? কেহ বা ব্যক্ত, কেহ বা অব্যক্ত? ধীরে ধীরে আমার বিবেকবুদ্ধির উপর আঁধারের আস্তরণ নামিয়া আসে, সকল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলি, "হে হৃষীকেশ, তুমি আছ বুকে, এইটুকু সত্য মাত্র আঁকড়িয়া আছি; ধর্ম্ম জানি বলি, কিন্তু তবুও তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই; অধর্ম্মকেও বিবিক্ত করিয়া জানিয়াছি, তবুও তাহা হইতে আমার নিবৃত্তি নাই। চলি, যেমন তুমি চালাও! প্রদীপ নিভিয়া

গিয়াছে ; কল্যাণ-অকল্যাণের পথে এখন অন্ধকারই আমার দিশারী। সে অন্ধকার, হে শ্যামঘন হৃষীকেশ, সে অন্ধকার আমার তুমি !"

আমি রূপী, এই জ্ঞানে আমার রূপের পিপাসা ছিল। চাহিয়াছিলাম, তোমাকে নয়—তোমার রূপে আমাকেই। হে ইষ্টদেবতা, তুমি আমারই শুদ্ধতর, শিবতর, সুন্দরতর প্রকাশ। তোমাকে যখন কামনা করি, তখন সে তো আমারই চেতনার উজ্জ্বলতর স্ফুরণের কামনা। তাই বলিতেছিলাম, আমার রূপানুভূতিতে তোমার রূপের কামনা, আমার বিগ্রহের বেদনে তোমার বিগ্রহের স্ফূর্ত্তি। রূপজগতে এই তো আমার সাধনার আদি রহস্য। কিন্তু আমা হইতে তোমাতে এই তরঙ্গের দোলা তো চিরকাল চলে না। চেতনার দীপ্তিতে আমি যে আমাকেই হারাইয়া ফেলি—আমার তখন না থাকে রূপ, না থাকে বিগ্রহ, না থাকে ইন্দ্রিয়, না থাকে মনন। সেই গভীর শূন্যরূপী অমানিশার অন্ধকারে আমার যে রূপহীন প্রকাশ, তাহাতে তোমারও রূপবাসনা যে মুছিয়া যায়। থাকে কেবল আদি-অন্তহীন অন্ধকার অথবা দ্রষ্টা-দৃশ্যের অভেদে সম্পুটিত নিস্তরঙ্গ আলোকের ব্যাপ্তি ! —সে যে না আলো, না আঁধার ; কি করিয়া বুঝাইব সে কি, এই অরূপের রূপ কত সুন্দর ! উপনিষদ্ ইহারই ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "য এষ অক্ষিণি দৃশ্যতে"—এই যে চোখের মাঝে যাহাকে দেখা যায় ; চোখের বাইরে নয়, সে তো দৃশ্যে দ্রষ্টায় ভেদ—এই যে চোখের মাঝে, দৃক্‌শক্তির সহিত জড়িত হইয়া যাহার প্রকাশ —সে আঁধার, না আলো ? অরূপ হইয়াও যে সে বিশ্বের অজস্র রূপায়ন—তাহাতে ফোটে আলো, তাহাতে ফোটে আঁধার, তাহাতে ফোটে বহু, তাহাতে ফোটে এক ; স্বয়ং সে কি ?—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে"—বাক্য যেখান হইতে ফিরিয়া আসে' "যত্র সূর্য্যো ন চন্দ্রতারকং" যেখানে সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, তারকা নাই ; অথচ যা আছে এষ অক্ষিণি—এই যে, চোখের মাঝে !

দাও চিত্তকে তলাইয়া—গভীর হইতে গভীরে সে ডুবিয়া যাক্—অণু হইতে অণুতর সত্তাতে লীন হইয়া যাক্—অগ্র্যা বুদ্ধি তীক্ষ্ণতম, সূক্ষ্মতম সূচীর মত বস্তুকে বিদ্ধ করিয়া কেবল তীব্রতম অনুভব স্বরূপেই জ্বলিয়া উঠুক ; কিছুই তখন থাকিবে না ; কিন্তু নিদাঘের নির্ম্মল আকাশে যেমন কোথা হইতে মেঘের সঞ্চার হয়, শীতের উষার বাষ্প-লেশহীন নিথর আকাশ যেমন কুয়াসায় ছাইয়া যায়, তেমনি করিয়া আনন্দের লঘু বাষ্পে দিগন্ত ছাইয়া যাইবে—ইহার পর হয়ত বর্ষার প্লাবন, নয়ত নীহারের বিভ্রম।

আঁধারের এই সৃষ্টি—অব্যক্তের এই অভিব্যক্তি —এ সুন্দর নয় কি ? আমি একক, আমি বিরাগী, আমার ভিতর বাহির ছাইয়া আছে কালোর এই ভুবন আলোকরা রূপে, তাই নিশীথ-গভীর আকাশে চিত্রিত নিস্তব্ধ শৈলশৃঙ্গবৎ মহাকালরূপে আমি অমানিশার পূজারী।



চরথ, ভিক্‌খবে !

—(:০:)—

গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

—সহস্র মানুষের মাঝে কোন একজন তত্ত্বজ্ঞানের জন্য যত্নবান হয়, আবার যত্নশীল সহস্রের মাঝেও একজন আমার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হতে পারে।

সাধকের সাধনার অভিমান নষ্ট করবার জন্যই এ উক্তি। পাওয়া সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, সত্য-সাধকের মনে সাধনপিপাসা আরও বাড়িয়ে তোলে। আমার আজ থেকে জানার ইতি হল, আর আমার জানবার কিছু নাই এ কথা জিজ্ঞাসুর মুখ দিয়ে কখনো বের হবার নয়। জ্ঞানী জানেন, আত্মতৃপ্তিকে অতিক্রম করেও ব্রহ্ম রয়েছেন। আমার ব্যষ্টি ইচ্ছার, ক্ষুদ্র আকুলতার সমাপ্তি হতে পারে, হয়ত বা আমার এমন শক্তিও নাই যা নিয়ে অগ্রসর হতে পারি; তা বলে আমি বলতে পারি না এইখানেই সাধনার শেষ। কেউ কাকে বাধা দেয়নি বলে, ভারতবর্ষে আজ এত বিভিন্ন স্তরের অনুভূতি পেয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ্য এক, পন্থা বহু—এ কথা আর্য্যঋষিরা জানতে পেরেছিলেন বলেই নির্ব্বিবাদে বহু মতের উদ্ভব হওয়ায় সুযোগ দিয়েছিলেন। অথচ তাতে বিরোধ ঘটেনি কোথায়ও। এক উপনিষদেই বিচিত্র রকমের সাধন-প্রণালীর খবর পাওয়া যায়—সাধনবৈশিষ্ট্যে সম্প্রদায়ও ছিল অনেক। উপনিষদের এক বল্লীতে জানা আর না-জানা সম্বন্ধে সুন্দর একটী শ্লোক রয়েছে—

যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতমবিজানতাম॥

—যিনি মনে করেন, ব্রহ্মকে জানি না, বস্তুতঃ তিনিই তাঁকে জানেন; আর যিনি মনে করেন, ব্রহ্মকে জানি, বস্তুতঃ তিনি তাঁকে জানেনেই না। কারণ বিজ্ঞ জনেরা তাঁকে অবিজ্ঞাত বলেই জানেন, আর অজ্ঞজনেরা তাঁকে বিজ্ঞাত বলে মনে করে।

এই যে অশব্দমস্পর্শমব্যয়মরূপম্ বলে ব্রহ্মের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হয়েছে, তার মূলে রয়েছে সাধকের আকুলতা বাড়ানো। সে যেন অল্পে তৃপ্ত হয়ে ঢলে না পড়ে। পরিপূর্ণ বিকাশ করে তারপর সে লয়ের পথ অনুসরণ করুক। উপনিষদে অনেক জায়গায় রয়েছে, কোনো ঋষি হয়ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে অল্প কিছু জেনেই স্ফীতবক্ষে গৌরব করে বেড়াচ্ছেন, একদিন অন্য এক ঋষির সঙ্গে দেখা হল, ঋষি হয়ত কয়টা প্রশ্ন করলেন ব্রহ্ম সম্বন্ধে, তিনি উত্তর দিতে না পেরে বোকা বনে গেলেন। অমনি তাঁর চৈতন্য হল, ভাবলেন, তবে তো আমার কিছুই জানা হয়নি, বৃথা গর্ব্ব করছিলাম এতদিন! এই বলে আবার সাধনায় রত হলেন। মানুষ পরিপূর্ণ বিকাশ না দেখে মরতে চায় না, এই জন্যই মরেও আবার জন্ম নেবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। কি যেন একটু বাকী থেকে যায়, সেই অভাবের সূত্র ধরেই মানুষের বারবার জনম-মরণ। বিচার করে দেখলে বুঝি, আমাকে জানবার জন্যই আমার সাধনা। ঠিক মনের মত হয় না বলেই শিশু একবার ভাঙ্গে আবার গড়ে। সাধন-ভজনও শুধু অতৃপ্তির উপকরণ—যদি কোন দিন নকল গড়তে গড়তেই আসল গড়া হয়ে যায়, দ্বন্দ্বের মাঝে থেকেই সামঞ্জস্যের খবর পাই। কোথা থেকে প্রশ্ন আসবে

এ কথা জানা নাই বলেই সমস্ত বই তন্ন তন্ন করে যেমন ঘাঁটতে হয়, তেমনি কোন সাধনায় সিদ্ধি হবে সাধক জানতে পারে না বলেই সমস্ত সাধনের ভিতর দিয়েই তাকে যেতে হয়। কোনটাতে তৃপ্তি হবে জানা নাই বলেই আয়োজনের আড়ম্বর।

অন্তর্নিহিত খাঁটি ইচ্ছাকে আমরা অনেক সময় সাময়িক উত্তেজনার ফলে আচ্ছন্ন করে রাখি। তাই লাভে অলাভ, ধর্ম্মে অধর্ম্ম, স্বস্তিতে অস্বস্তি রূপে ঠিক ঠিক বিপরীত ভাবগুলিই আমাদের মনে জাগতে থাকে; আর চারদিক হতে দুষ্টশক্তি এসে কর্ণধারবিহীন তরীর মতন যে দিকে ইচ্ছে সে দিকে নিয়ে ঘুরিয়ে মারে। তাই উপস্থিত মত না ভেবে চিন্তে-একটা কিছু করে বসা প্রমত্তের লক্ষণ। অর্জ্জুনকে যুবক বয়সে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ঠিক এই ব্যাধিটাই আক্রমণ করে বসেছিল প্রথম। আত্মীয়স্বজনকে দেখে সাময়িক বৈরাগ্যের বশে তিনি বলে ফেলেছিলেন, "আমি রাজ্য চাই না, জয়ী হতে আকাঙ্ক্ষা নাই আমার, ভিক্ষা করে খেতে হয় তাও ভাল; তবুও আত্মীয়স্বজনকে বধ করতে কিছুতেই পারব না।" সর্ব্বদর্শী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বুঝেছিলেন, তাই যাতে সাময়িক মোহ অপনীত হয়ে অর্জ্জুনের মনে প্রকৃত বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় তার চেষ্টা করেছিলেন; যাতে তাড়াতাড়ি কর্ম্মক্ষয় হয় এর দরুণ অর্জ্জুনকে অহরহঃ যুদ্ধ করবার প্রেরণা দিয়েছিলেন। কেন একজনের কর্ম্মক্ষয় করবার জন্য অপরের এত আকুল চেষ্টা জাগে, তা জানি না; তবে সদ্গুরুর মাঝে এ ভাবের অভিব্যক্তিটা দেখতে পাই। তিনি শিষ্যের অন্তরটা স্পষ্ট দেখতে পান, তাই প্রকৃতির অনুকূলে চালিয়ে তাকে নিবৃত্তির অভিমুখে প্রেরণ করেন। গুরুর অভিপ্রায়, স্থায়ী প্রতিকার; তাই তন্ন তন্ন করে সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হলে তারপর যা দেবার দেন; এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তো কেবল পরীক্ষাই করতে থাকেন। শিষ্যের উপর পরীক্ষা করা, মানে তাকে যোগ্য করে তোলা। আমি কি চাই, আমিই যেন বুঝি। চঞ্চলতার মাঝেও অতর্কিতভাবে সময় সময় স্থায়ী ভাবের আভাস পাই—তাতে উৎসাহ জাগে, উদ্যম বাড়ে, আমার যে একটা ঊর্দ্ধগতি রয়েছে তার স্পষ্ট অনুভূতি পাই। তাই তৃপ্তি পেয়েও সংশয়ের একটা না একটা বীজ থেকে যায়ই; মনে হয়, এর উপরেও যদি কোন কিছু থেকে থাকে—তাই আবার ছুটি। সমস্ত সংশয়ের নিরসন হয় কিনা জানি না; তবে জগতের ক্রিয়া-কলাপ দেখে মনে হয়, নিঃশেষে কোন কিছুরই ধ্বংস নাই; তাই প্রলয়ের পরও আবার সৃষ্টি। এতে তো গতির কথাই পাই—স্থিতি কিম্বা জড়ত্বের তো নয়।

জাতি যখন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, তখন তার মূলের আবেগশক্তি নষ্ট হয়ে যায়; তাই উত্থান না হয়ে পতনই হয়। ব্রহ্মকে জানা যায় না বলে, বৈদিক যুগের ঋষিদের অদম্য জ্ঞানপিপাসা কিছুতেই নষ্ট হয় নি; বরং ইচ্ছার বেগ সহস্র সাধনাকারে ফুটে উঠেছিল। বাধা পেয়ে দমে যাওয়া, এ তো দুর্ব্বলের লক্ষণ; বুঝতে হবে তোমার মাঝে শক্তির পুঁজি কম। এভাবেই দুর্লঙ্ঘ্য বলে নিস্তেজ আমরা নিরস্ত হতে পারি, কিন্তু কই, সবল ইংরেজ জাতি তো কিছুতেই হটল না; বারবার পরাজয়ে, লোকক্ষয়ে, তাদের উৎসাহ বাড়ছে বই তো কমছে না। এ শক্তি তারা পেল কোথা থেকে?—গোটা জাতির সম্মিলিত শক্তির উৎস হতে। তাদের শক্তি দেখে বিমোহিত হয়ে পড়েছ, শুধু জাতীয় ইতিহাসের খবর রাখ না বলে। বৈদিক যুগে ঋষিরা না করেছেন এমন কাজ নাই, যাতে হাত দিতেন তাই সফল না করে ছাড়তেন না। কোন বিদ্যাটা তাদের অজানা ছিল বল দেখি! বরঞ্চ সে আদর্শের

ছিঁটে-ফোঁটা নিয়েই এখন একটু-আধটু নূতন কোন-কিছুর আবিষ্কার হচ্ছে। জাতিকে জীবন্ত রাখতে হলে মূলে যথেষ্ট শক্তি-সঞ্চয়ের প্রয়োজন। মূলধন না থাকলে কারবার চলবে কি করে? 'অনন্ত শক্তির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি,' ব্যয়ের মাত্রা অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে, অথচ আয়ের কোঠা শূন্য; প্রগতি হবে কিসে? ও দেশের অনুকরণে সম্মিলনীর ধুম পড়ে গিয়েছে—প্রস্তাবনারও অন্ত নাই—কিন্তু কার্য্যসফলতার শক্তি কোথা? একটা কথা আছে "দেখাদেখি বাঁকায় নাচে"—এ উদ্দণ্ড নৃত্যও কি সেই পর্য্যায়ের নয়? অপরের প্রভাবে প্রভাবিত হই কখন? নিজের যখন কিছুই থাকে না। বাস্তবিকই কি আমরা ফতুর হয়ে গিয়েছি? যে বুঝেছে আমি দুর্ব্বল, তার তো সবল হবার আকাঙ্ক্ষাও জাগবে!

ভান করে শুধু নিজের মরণকে ডেকে আনা। স্বভাব না যায় মলে—লুকোচুরিতে স্বরূপকে আবৃত রাখবে কয় দিন? সহজে বিশ্বাস না আসে, তাতে ভান করবার কি প্রয়োজন? আর সংশয়ে তো তোমার এক জায়গায় আবদ্ধ করে রাখেনি, সেতো তোমায় ওপরের দিকেই অনবরত ঠেলছে। বুদ্ধির মরণ হলে নাকি স্বরূপ প্রকাশ পায়, তা বুদ্ধি তো সংশয়-রূপ অবস্থাতে থেকে সুখ পায় না, বুদ্ধি যে আত্মানুরাগী। একে মেরে ফেলে জড় বনে যাওয়াই কি মঙ্গল? আপ্তবাক্যে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি দিয়েও সব যাচাই করে নাও। সংশয় আসে তো আসুক না, মীমাংসা করবার স্থানও তো রয়েছে। মোট কথা, গতিশীল থাকতে চাও তো বেগ থামতে দিও না, তা হলে সঞ্চিত কাজের চাপে একদিন বুকের পাঁজর ভেঙ্গে যাবে। সংশয় দিয়ে আমাদের ভিতরে কোন গলদ আছে কিনা বের করে নিতে পারি। এও তো আমার পথ এগিয়ে দেবার বন্ধু।

শিকার ধরা নয়, শিকারের পেছনে ছোটাই ইউরোপের লক্ষ্য। কর্ম্মের অবিশ্রান্ত গতিতে তারা নিজকে সঁপে দিয়েছে, তাই আরাম নাই বিরাম নাই, দিন নাই রাত্রি নাই, গ্রীষ্ম নাই বর্ষা নাই, কেবল কাজ—আর কেবল কাজ। এ ভাবটার প্রতি রীতিমত বিদ্বেষ ভাব আমাদের; বলি, তারা কেবল খাটতে জানে, আরামের কৌশল জানে না; কর্ম্মই তাদের লক্ষ্য, কর্ম্ম নিবৃত্তি নয়—আমাদের শাস্ত্রে যে রয়েছে কর্ম্ম-ত্যাগেই মুক্তি! দুর্ব্বল মস্তিষ্কে সহজেই এ ভাবটা পাকা হয়ে বসে যায়, অন্ততঃ কুড়ের সংখ্যা যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এতেই তো তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি। গীতাতে কর্ম্ম ত্যাগের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা রয়েছে। কর্ম্মত্যাগ মানে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। ত্যাগীর যে একটুও অবসর নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই বলে বন্ধনও নাই, তাই তাদের দিয়ে কাজ হয় আরও বেশী। শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ এঁদের কথাই ভেবে দেখ না, আজীবন খেটে-খুটে কোথায় একদিন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। গণ্ডগোল যত অতি বুঝদারদের নিয়ে। তাদের ভয় বেশী, তাই অগে থেকেই নির্লিপ্ত হওয়ার ফন্দিটা খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।

শক্তি থাকলে সব দিকে সামঞ্জস্য করে চলা যায়। পূর্ব্বে ছিলও তাই। আধ্যাত্মিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের বুদ্ধি 'লোপ পেয়ে যায়নি, তাই সংসারে ফিরে এসে ঘর-সংসার চালানোর দরুণ অন্য কাউকেও নিযুক্ত করতে হয়নি। রাজ-কার্য্য পরিচালনা করেও জনক রাজর্ষি আখ্যা পেয়েছিলেন। ঘরবাড়ী সব ছাড়তে হবে, নেতি নেতি বিচার—এসব পরবর্ত্তী যুগের ধারণা। বৈদিকযুগের আদর্শ তো তা নয়। তাঁরা কিছুই ছাড়েননি বলে, সব পেয়েছিলেন, ব্যষ্টির চেয়ে সঙ্ঘভাবে তাঁরা বেশী অনুপ্রাণিত ছিলেন, ভূমাই ছিল তাঁদের জীবনের লক্ষ্য। তাঁদের চাওয়ারও অন্ত ছিল না, পাওয়ারও অন্ত ছিল না।

সাধকের মাঝে থাকবে অন্তহীন ব্যাকুলতা, অনুসন্ধিৎসার সত্যিকার আবেগ। সে পেছনের দিকে তাকাবে না; অবিশ্রান্ত গতিতে কেবল অগ্রসর হতে থাকবে, পাওয়ার চেয়ে না পাওয়ার আকুলতা তাকে নিশিদিন সচেতন করে রাখবে। ভুলেও সে ভাববে না আমার এতখানি সঞ্চয় হল। মুখ দেখলেই বোঝা যাবে কি সত্যিকার আগুন তার ভিতর দাউ দাউ করে জলছে, নিরানন্দে তার মুখ মলিন হবে না, সাময়িক তৃপ্তিতে তার মন টলবে না, লক্ষ্য রয়েছে জানবে—কিন্তু বহুদূরে; তাই সে চল্‌বে, গতির পথ রুদ্ধ হবে না কিছুতেই। অভাব যে রয়েছে ঢের—সিদ্ধ বন্‌লে হবে কি? সাধক হও, সিদ্ধের ভাণ করো না। কর্ম্ম ছাড়, কুকর্ম্মে রত হবে। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসবার মত স্থৈর্য্য এখনও হয় নি; তাই কর্ম্মের মাঝেই নিবিষ্ট হয়ে থাকতে হবে তোমায়।

তৃপ্তিও একটা মোহ। যা কিছুতে ঠেকে থাকতে হয়, তাই বন্ধন। আবেগে স্থিতি নাই, আছে গতি—এই তোমার আদর্শ। সবই সমান বটে, এর মাঝেই যার শক্তি সংহত হয়, সেই মাথা তুলে দাঁড়ায়, তার বিশিষ্ট সত্তার প্রমাণ তখন পাই। তুমি যে আছ, প্রমাণ করে দেখাও। নির্ব্বিশেষ অবস্থার মাঝে বিশেষভাবে ফুটে ওঠ। বিচিত্র বর্ণের ফুলের সমাবেশেই বাগানের সৌন্দর্য্য। যা কিছু ব্যক্ত, তাই খণ্ড, অংশ; অংশীর প্রতি অংশের স্বাভাবিক টান থাকবে; তা হলে তোমার স্থিতি কোথায়? যতই ছুটবে, ততই এগুবে। কর্ম্মের অন্তরালে যে কর্ম্মদেবতা রয়েছে তাঁর আভাস পাই না বলে কাজ করে হাঁপিয়ে উঠি, বিশ্রাম নিতে চাই। এমন একটা অবস্থা কি নেই, যাতে কাজও চলবে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামেরও অনুভব হবে?

অভাবে মানুষকে সচেষ্ট করে তোলে, অফুরন্ত কর্ম্মের প্রেরণা জাগায়; প্রয়োজন মিটাতে তার যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনেই ইন্দ্রিয়-শক্তির বিকাশ। ইচ্ছার বীর্য্যেই উপায়ের সৃষ্টি। মানুষ যে চেতন, তা ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন রয়েছে বলে। তুমি যে চৈতন্যস্বরূপ, তবে আর জড়ত্ব থাকবে কি করে? বিরুদ্ধ ভাবের একত্রে অবস্থিতি হতে পারে না। সৃষ্টির মূলেই যে বেগ নিহিত, রেহাই পাবে কিসে? আজ না হয় কাল, এ জন্মে না হয় পরজন্মে, ঋণ শোধ করতেই হবে। তোমার ব্যষ্টি ইচ্ছার ওপরেও সমষ্টি ইচ্ছার আধিপত্য রয়েছে—তোমার কোমরের দড়ি যে তাঁর হাতে। তুমি ইচ্ছা করতে পার; কিন্তু যা ইচ্ছা তা করতে পার না; কাজেইএ কজনের কাছে বাঁধা আছ।

কর্ম্মত্যাগের আগে কর্ম্মরহস্য জান! রহস্য জান্‌তে হ্‌লেই ভিতরে ঢুকতে হবে। জানা যে যায় না, সেটাই ভাল করে জেনে নাও না! ক্ষুধা আছে, অথচ রুচি নাই, কর্ম্ম আছে, উদ্যম নাই—এটা রোগের পূর্ব্বলক্ষণ নয় কি? কে বলছে নিদ্রাতেই শান্তি? নিদ্রায় মাঝেও যিনি জেগে রয়েছেন তিনিই জানেন নিদ্রা কেমন মজার চিজ্। সবদিকেই চেতনার প্রয়োজন। বৈদান্তিকের ঘুম চোখ বুজে নয়, চোখ চেয়ে।

সাধন-ছাড়া হবে কেমন করে? তোমার লক্ষ্য যে ক্রমোন্নতি। একদিন খেলেই তো জন্মের মত খাওয়ার ইতি হল না। আকুলতা তোমার চিরসঙ্গী। মনে রেখো, বুদ্ধের আদি ও অন্ত উপদেশ—"চরথ, ভিক্‌খবে।"—হে ভিখারী, হে যাচক—চরে বেড়াও!—"বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ"—যাতে বহুজনের হিত হয়, বহুজনের সুখ হয়। থামবার হুকুম নেই তোমাদের—চরথ—চরথ!

সংঘ-দেবতা

—(:০:)—

জগন্নাথের রথের ডুরীতে যতক্ষণ টান না পড়ে, ততক্ষণ যে যাহার আপন ধান্ধা লইয়াই ব্যস্ত; ততক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতা, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা ইত্যাদির ভেদ; ততক্ষণ দেখি, ব্যষ্টি-জগতের ক্রিয়া, বিচ্ছিন্ন শক্তির স্ফুরণ। কিন্তু রথের ডুরীতে যেই টান পড়ে, অমনি এক মুহূর্ত্তে এই বিরাট জনসংঘ যেন কোন্ মায়ামন্ত্রে তন্ময়, একমুখী হইয়া যায়, সংসারের যত দ্বন্দ্ব ভুলিয়া গিয়া সব একাকার হইয়া যায়; ওই রথস্থ বামনের প্রতি চাহিয়া এই সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ পুরুষ যেন এক অখণ্ড প্রাণের আন্দোলনে সিন্ধুতরঙ্গের মত দুলিয়া উঠে!

এইখানে দেখিতে পাই সংঘনায়ক আর সংঘের স্বরূপ। ওই রথস্থ বামন—ওই "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ জ্যোতিরিবাধূমকঃ"—উনিই সঙ্ঘপতি; আর এই যে সহস্রশীর্ষে ব্যূঢ় বিরাট্‌পুরুষ, ইনিই সংঘ।

কাহাকে বড় বলিব, জানি না। শুনি, "সংঘশক্তিঃ কলৌযুগে।" তাহারই ইংরাজী তর্জ্জমা শুনি—Proletariate, Democracy, Communism, আরও কত কি! বিরাটের দেহে অণুতে অণুতে প্রাণের কম্পন উঠিয়াছে—স্তিমিত হইয়া থাকিবার কেহ নয়! একটা বিপুল উন্মাদনা, মুঠা মুঠা করিয়া প্রাণ ছড়াইয়া দিবার একটা অদম্য উত্তেজনা, কেউ পিছে পড়িয়া থাকিতে চায় না—ব্রহ্মকুণ্ডাভিমুখে যাত্রীর দল পরস্পরকে ঠেলিয়া আগাইয়া চলিয়াছে—কিন্তু জোট বাঁধিয়া।—এইগুলি দেখিতে বেশ ভাল লাগে।

দেখি, আমিও তো ওই দলের মাঝে! আমিও তো "গণানাং গণপতিঃ"—গণেশের মূর্ত্তিতে ডেমোক্রেসীর আদর্শকে রূপ দিয়াছি; তাঁহারই মত আমি অর্দ্ধনর, অর্দ্ধপশু; পশুর মাঝেও অতিকায়তম স্থলচর; লেখনীর মুখে সিদ্ধি-ঋদ্ধি ফুটাইয়া তুলি (বিশেষতঃ আমরা বাঙ্গালীরা); বিপুল তুন্দে বোধ হয় গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাকে পূরিয়া ফেলিতে পারি; কর্ম্মোপযোগী বুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু চোখে খাটো, কাণে বড়; আর গণাধিপতি হইয়াও বিবরসঞ্চারী, অকারণ অপচয়ের হেতুভূত, তস্করধর্ম্মী মূষিককে করিয়াছি আমার বাহন—একবার ভাবিও নাই, সে আমার অতিকায় দেহের ভার সহিবে কিনা!—এই তো কল্পনাকৌতুকী হিন্দুর আঁকা গণতন্ত্রের ছবি। এ নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ, না মর্ম্মান্তিক সত্য, কে জানে?

কিন্তু আমি তো শুধু দলচর নই। আমারও একটা বিশ্রামভূমি আছে তো। অজগরের মত সংঘের বিরাট্ দেহ যখন বিপুল আয়াসে একবার নড়িয়া উঠে, প্রাণের অন্তঃপুরে তখন সমাহিত হইয়া দেখি, যে সর্ব্বংসহা স্থিতি এই বর্ব্বর গতিকে বিধৃত করিয়া রহিয়াছে, সে কোথায়?—দেখি, আমারই মাঝে সে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে—"জ্যোতিরিবাধূমকঃ"—ধূমহীন জ্যোতিঃর মত, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত! ওই তো আমার শিবস্বরূপ—যাহা কূটস্থ, অচল, ধ্রুব। সেখানে ব্যথার বিক্ষোভ নাই, তরঙ্গের আন্দোলন নাই, সমুদ্রেরগভীরতম তলদেশের মত এবং অভ্রশিখরে বিথান প্রশান্ত নীলাকাশের মত সমস্ত বিক্ষোভকে বুকে পূরিয়াও আমি অটল।

কোনটা কাম্য?—আদর্শের লোলুপতায় মুগ্ধ সাধক এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিবে। একবার সে বলিবে, গণাধিপতি হওয়া—এই তো পরম পুরু-

স্বার্থ; অতএব আনো শান্ত স্নিগ্ধ পল্লীর বুকে ডেমোক্রেসীর ভীম প্রভঞ্জন! সংঘ কর, দল বাঁধ, সভা সমিতি, মণ্ডলী-পরিষৎ, আবেদন-নিবেদন, চীৎকার-হট্টগোল— কিছুই বাদ থাকে না যেন! ভোলানাথের পল্টনে যত বাছা বাছা তাণ্ডব-প্রমাথী প্রমথ রহিয়াছে—সকলকে আনিয়া ছুঁড়িয়া ফেল এই প্রমত্ততার রঙ্গপীঠে!—এইতো জীবন—ফেনোচ্ছল মদ্যের মত, ফুটন্ত কটাহের মত, চক্র-ঘর্ঘর যন্ত্রশালার মত!

আবার ইহারই দিকে পেছন ফিরিয়া আর একজন ওষ্ঠাধরে তর্জ্জনী সন্নিবেশিত করিয়া লতাগৃহদ্বারে নন্দীর মত বলিতেছে—"মা চাপলয়!" —সমস্ত তপোবন অমনি নিস্তব্ধ, চিত্রার্পিত!

কোন্‌টা কাম্য, তাহা বলা কঠিন, কেননা আমার যে দুটাই প্রয়োজন। প্রমথনাথ প্রমথের সঙ্গেই নাচেন; কি গূঢ় সে আনন্দের উত্তেজনা, তাহা জানে না, কিন্তু প্রমথের দল তাহারই অনুকরণ করিয়া অঙ্গভঙ্গীতে বিরূপ হইতে থাকে। হয়ত বা বিরূপাক্ষের এও একটা খেয়াল!

সংঘ চাই না কি?—খুব চাই! প্রমথের বাহিনী না হইলে আর প্রমথনাথের নামের সার্থকতা কি? বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত শক্তিকে ব্যূঢ় করিয়া প্রলয়াগ্নির সৃষ্টি করিতে চাই—যে আগুন যুগপৎ জীর্ণকে ধ্বংস করে, এবং সেই উত্তাপেই নবীন প্রাণকে ফুটাইয়া তোলে!—এই ঈর্ষ্যাকাতর কলহাতুর, নিষ্ফলক্রোধপরায়ণ, কাম ও লোভে জর্জ্জরিত জাতির মাঝে প্রাণের রসায়নে নবীন যৌবনের উদ্দীপনা আনিয়া দিক্—আসুক নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা, আসুক রিরংসা, আসুক সিসৃক্ষা! তার জন্য যত বড় আত্মত্যাগই প্রয়োজন, কুণ্ঠিত হইব না—ব্যষ্টির ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে মমতার ক্ষুব্ধদৃষ্টি দিয়া লেহন করিতে পিছু ফিরিয়া তাকাইব না।

কিন্তু এই নিদারুণ উত্তেজনাকেও চাই মুঠোর মাঝে বন্দী করিয়া রাখিতে। নটরাজ আমি —আমার প্রবর্ত্তনা সংহত। কিছুই কিছু নয়—জানি সব ফাঁকি, সব মায়া! হাঁ, মায়াবাদী শঙ্করই আমি! তর্জ্জনীর সঙ্কেতে—প্রাণের সংঘাতে সংক্ষুব্ধ বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল, ভোগের মাদকতায় লেলিহান একটা বিরাট্ সৃষ্টির পত্তন করিতে পারি; আবার সেই মুহূর্ত্তেই প্রলয়ের শিঙা ফুঁকিয়া বলিতে পারি—"ব্যস্—সব খতোম্—!"

সংঘ ছোটকে বড় করে—এই তার মহিমা। কিন্তু স্বভাবতঃই যে বড়, তাহার মহিমা সে খর্ব্ব করিতে পারে না তো! বিষ্ণুর নীলবিশাল বক্ষে দ্যুতিমান কৌস্তুভের মত, সংঘনায়কের বুকে এই সংঘ। ভূমার মাঝে আপনাকে সঁপিয়া দিয়াই তাহার সার্থকতা। কে যেন বলিয়াছিল, "আগেকার লোকে দল বাঁধিতে জানিত না, এখন মানুষ দল বাঁধিতে শিখিয়াছে, অতএব—" বোধ হয় মানুষ আগেকার চেয়ে উন্নত! তুলনা করিতে চাই না, কিন্তু বলি, কথাটা দুর্ব্বলের আত্মশ্লাঘা মাত্র! দলবাঁধা মানুষের প্রকৃতি, কিন্তু বিরাট্ একাকিত্ব তাহার আত্মার স্বরূপ। আত্মার সহিত প্রকৃতির দ্বন্দ্ব যে ঘুচাইতে পারে, সেই সিদ্ধ। সুতরাং সেকালে একালে তুলনা চলে না —নটরাজ মহাকালের নৃত্যচঞ্চল পদক্ষেপের সব্যসাচী বিন্যাস—এই সেকাল আর একাল!

সিংহ দল বাঁধে না, কিন্তু হাতী এত বড় ভুঁড়েল মাংসপিণ্ড হইয়াও দল বাঁধে। যাহার যেমন স্বভাব। গণাধিপের মাথাটা হাতীরই মাথা। কিন্তু জগদ্ধাত্রী' মূর্ত্তিতে দেখি, হাতীর মাথায় থাবা পাতিয়াছে কেশরী; আর তাহার পৃষ্ঠে অরুণচরণ রাখিয়া দাঁড়াইয়াছেন আমার ইষ্টদেবতা।

এই কথাটা যেন না ভুলি।—শুধু হাতীর আস্তাবলও নয়, সিংহের পিঁজরাও নয়, চাই হস্তীশীর্ষে সিংহবাহিনীকে।

সংঘের বাড়া সংঘদেবতা।—ওই তো আমার আত্মস্বরূপ!

তীর্থরামের গৃহস্থালী

—*—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তপোবনে

হরিদ্বারের উর্দ্ধে হৃষীকেশ, হৃষীকেশ হইতে প্রায় আট মাইল উজানে তপোবন। তপোবনে এক সুনিবিড় অরণ্য—নামটী তার চমৎকার—ব্রহ্মপুরী। এই ব্রহ্মপুরীতে গঙ্গার তীরে লতাপাতার একটী ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরের পাদমূলে ঝর্‌ঝর্ শব্দে গঙ্গার ধারা আলুথালু হইয়া ছুটিয়াছে। চারিপাশে বনস্পতির নিবিড় সন্নিবেশ দিগন্তের আকাশকে মুছিয়া ফেলিয়াছে। অরণ্য গভীর, অন্ধকার সেখানে সূর্য্যালোকে গলিয়া গিয়া সুস্নিগ্ধ ছায়ালোক পরিণত হয়। চারিপাশে পাঁচ মাইলের মধ্যে জনমানবের সাড়াশব্দও নাই। বিহঙ্গের কাকলি, পতঙ্গের ঝঙ্কারে বনভূমি মুখরিত—বিশ্বের কোলাহল যেন সে স্তব্ধতার সেতুকে উৎপ্লাবিত করিয়া সহস্র প্রণবঝঙ্কারে ঝরিয়া পড়িতেছে। শাখামৃগের চাপল্য ছাড়া আর কোনও চঞ্চলতার আভাসমাত্রও সেখানে নাই। এখানে আসিলেই মনে হয়, বসুন্ধরার নিবিড় স্নেহাঞ্চলের অন্তরালে একেবারে তাহার তপ্ত বুকের মাঝখানটীতে আশ্রয় পাইয়াছি, শান্ত শিশুর মত সে বুকে মাথা রাখিয়া শুনিতেছি তাহার রহস্যময় হৃদয়ের অস্ফুট স্পন্দন—অব্যক্ত ভাষায় উচ্চারিত কত যুগযুগান্তরের বেদনা ও আশা, তিতিক্ষা ও ব্যাকুলতার বাণী!

প্রশান্ত তপোবনের বুকে চিত্রার্পিতবৎ এই ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরখানি তীর্থরামের—ব্রহ্মপুরীর কমলদলের মর্ম্মকোষে নিষণ্ণ নিস্তব্ধ ভ্রমরের মত। তীর্থরাম আজ পলাতক। হাঁ, পলাতকই বটে, কিন্তু ভয়ে নয়—আবেগে, উচ্ছ্বাসে, আনন্দে! সংসার কোনও দিনই তীর্থরামের কাছে বন্ধন ছিল না। কাজেই জোর করিয়া বাঁধন ছিঁড়িবার প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। অদ্বৈতানুভবের হোমানল তাঁহার বুকের মাঝে, সেই আগুন বুকে লইয়াই তাঁহার ছাত্রজীবন কাটিয়াছে, সংসারজীবন কাটিয়াছে; ভাল ছেলের মতন তিনি পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন, কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহস্থের মত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করিয়াছেন, বৃদ্ধ পিতার শুশ্রূষা করিয়াছেন, আত্মীয়-কুটুম্বের সহায়তা করিয়াছেন, দীন-দুঃখীর দুঃখ দূর করিয়াছেন। কিন্তু তবুও যেন তিনি কিছুই করেন নাই। তিনি এম এ পাশ, তিনি সুবিখ্যাত অধ্যাপক, তিনি দুইটী সন্তানের পিতা—এ তাঁর সত্য পরিচয় নয়।—এ তো মায়া; যে চাপা আগুন তাঁহার মাঝে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, তাহারই অস্পষ্ট আভাসে না এই মায়ার খেলা ফুটিয়া উঠিয়াছে! তীর্থরাম যতক্ষণ সংসারে সচেতন, ততক্ষণই তিনি সংসারী। কিন্তু সংসার-চেতনাকে ধরিয়া রাখিবার বিন্দুমাত্র আগ্রহও তাঁর নাই; ক্ষণিকের পাওয়া ব্রহ্ম-চেতনাকে ধরিয়া রাখিবার আগ্রহ যেমন তোমার-আমার মাঝে নাই, তেমনি আর কি! তুমি আমি সহজে সংসার করি, কদাচ ওপারের খবর নিই; তীর্থরাম সহজে ব্রহ্মে বিচরণ করিতেন, কদাচ নেকনজরে এই সংসারের দিকে তাকাইতেন মাত্র। সুতরাং তীর্থরাম যে সংসার হইতে বনে পলাইবেন, এ তো সাধকসুলভ ভীতিতে নয়—এ যে তাঁর সিদ্ধজীবনের সহজ প্রেরণা।

"অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী সভা" প্রচুর অমৃত বর্ষণ করিয়াছে সে অমৃত সংসারের বাঁধ উপচিয়া

বিশ্ব প্লাবিত করিয়া চলিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাসাইয়া নিল তীর্থরামকে। কথা নাই বার্ত্তা নাই, তীর্থরাম একেবারে লাহোর হইতে হরিদ্বার —তারপর হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ! হৃষীকেশ যাইতে যাইতে খেয়াল হইল, আমি তো নিঃসঙ্গ! অমনি আর কথা নাই, সঙ্গে পথের সম্বল যাহা ছিল, তাহা দুধারি বিলাইয়া চলিলেন—টাকা-পয়সা, জামাজোড়া ঘড়িচেন সব সাধুসেবায় ব্যয় হইয়া গেল, রহিল শুধু পরনে একখানা মাত্র কাপড় আর হাতে একখানা বেদান্তের বই! ছাত্রজীবনের কঠোর তপশ্চর্য্যার ফলে তাঁহার শীতা-তপ সহ্য করিবার শক্তি অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই হিমালয়ের আবহাওয়ার দুরন্ত বৈষম্যের মাঝে একবস্ত্রে বিচরণ করা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র :কষ্টকর ছিল না। ব্রহ্মপুরীর কুটীরটী তাঁহারই পূর্ব্বগামী কোনও তপস্বীর রচনা। হৃষী-কেশের আশেপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে তীর্থরাম এইটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্থানটী তাঁহার খুবই পছন্দ হইয়াছিল। মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া বাস করিয়াও গিয়াছেন। এইবার কিন্তু তাঁহার মনে এক ভীষণ সঙ্কল্প জাগিয়াছে।

আত্মোপলব্ধি চাই! সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হইতে চাই! সংসারের মাঝেও উপলব্ধির স্রোত অন্তঃশীল হইয়া বহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের পিপাসা মিটে নাই তো। সমস্ত উপাধি দূরে ছুঁড়িয়া বিবিক্তসেবী হইয়া একবার নিজের সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া নিজকে চিনিয়া নিতে চাই। এই তীব্র আকুলতার কাছে জগৎ তুচ্ছ—মনের বিজৃ-ম্ভণ, দেহের সুখ-দুঃখ, সবই যে মিথ্যা! বোধি-দ্রুমের তলে আসন বন্ধন করিয়া বুদ্ধদেব যেমন বলিয়াছিলেন, "ইহৈব শুষ্যতু মে শরীরং", তেমনি তীব্রবৈরাগ্যের জ্বালাময় প্রবাহ উদ্গার করিয়া তীর্থরামও বলিলেন—

আসন জমায়ে বৈঠে হৈঁ;
দরসে ন জায়েঙ্গে;
হম্ কৈহ্কশাঁ বনেঙ্গে,
তুম্হেঁ মাহ্রু বনায়েঙ্গে।
হম্ কুয়ে-দরে-যার্সে,
ক্যা টল্কে জায়েঙ্গে?
হম্ ন পত্থর হৈঁ,
ফিসলনে কি ফিসল্ জায়েঙ্গে?
ব্সলে-সনমকো ছোড়্কর,
ক্যা কাবে জায়েঙ্গে?
ব্হাঁ ভী ব্হী সনম হৈ,
তো ক্যা মুঁহ দিখায়েঙ্গে?
হম্ অপ্নে কুয়ে-যার্কো,
কাবা বনায়েঙ্গে;
লৈলী বনেঙ্গে হম্,
উসে মজনু বনায়েঙ্গে।
গৈঁরো সে মত মিলো কি,
সিতমগর্ বনায়েঙ্গে।
হম্ সে মিলা করো
তুম্হেঁ দিল পর্ বনায়েঙ্গে।

—এই তো আসন জমিয়ে বস্লাম এইখানে—তোমার দুয়ার হতে আর হটব না তো। আমি হব আকাশগঙ্গা, আর তোমায় করব তার বুকে ভেসে-যাওয়া চাঁদমুখখানি। বঁধুর ঘরের কানাচ্ থেকে কি আমি সরে যাব? গড়িয়ে তলিয়ে যাব, এমন পাথর তো আমি নই। বঁধুর মধুর সঙ্গ ছেড়ে যাব মন্দিরে? সেখানেও তো আছে সেই, তবে আর এখান ছেড়ে সেখানে মুখ দেখাতে যাব কাকে? বঁধুর এই কুটীরই হবে আমার মন্দির—আমি হব তার লয়লা, আর সে হবে আমার মজনু। বঁধু, তুমি আর কারু কাছে

যেয়ো না, তারা তোমায় করবে জুলুমবাজ; তুমি আমার কাছে এসো—আমি তোমায় করবো আমার বুকের রাজা!

এই সঙ্কল্প লইয়া তীর্থরাম তপোবনে গেলেন। এই সংবাদ দেশে গেলে তীর্থরামের পিতা ব্যাকুল হইয়া পুত্রকে ফিরিয়া আসিবার দরুণ একখানা চিঠি লিখিলেন। তীর্থরাম চিঠিখানি গঙ্গার প্রবাহে ভাসাইয়া দিলেন। পিতার উত্তেজনায় ভকত ধন্না-মলও সংসারকর্ত্তব্য সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়া তীর্থরামকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। তীর্থরাম উত্তরে লিখিলেন—

আপনার এক কৃপালিপি পেলাম। আপনি আমায় ঘরে ফিরে যাবার দরুণ অনুরোধ করেছেন। পত্রখানি পাওয়ামাত্রই তাকে পরমধামের যাত্রী করে দিয়েছি; অর্থাৎ তাকে গঙ্গাজীর প্রবাহে ভাসিয়ে দিয়েছি। আত্মীয়স্বজনের শোকের কথা যিনি বলেন, আমার প্রতি তাঁর বড় করুণা; তাঁকে আমি গীতার কথায় বলি—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥

ঠাকুর, আমি তো তোমারই হুকুম পালন করছি! ঘর ছেড়েছি বটে কিন্তু নিজের বাস্তব স্বরূপে আশ্রয় নিয়েছি। আমি 'পাঞ্জাব' থেকে 'হরিদ্বারে' এসেছি অর্থাৎ রক্ত, বীর্য্য, স্বেদ, মূত্র ও লালা এই পাঁচ নদীতে ঘেরা যে এই দেহ, এর অধ্যাস ছেড়ে আমার নিজধামে হরির দুয়ারে এসেছি। ঘরের সকলকে বল্‌বেন, যদি মিলতে হয় তো কেন্দ্রে এসে মিলা উচিত, যাতে আর কখনো বিচ্ছেদের ভয় না থাকে। রাজা রাজ্যপাট ছেড়ে চায় এই আনন্দ—দেবতারা স্বর্গবাস ছেড়ে চায় এই গঙ্গার তীর। প্রারব্ধবশে আমি তা পেয়েছি; আজ কি সে প্রারব্ধ ক্ষয় হয়ে গেল যে আমি হাতের মুঠোয় পাওয়া এই আনন্দ ছেড়ে ছুটবো তুচ্ছ বিষয়ের পেছনে? মানুষই তীর্থে যায়; তীর্থ কি মানুষের পাছে পাছে ছোটে? ঘরে বল্‌বেন, তীর্থে রমণকারী তীর্থরামরূপী পরমাত্মার চরণ দর্শন করতে চাইবে যেখানে, সেখানেই তারা তীর্থরাম গোস্বামীর দর্শন পাবে। যতদিন পর্য্যন্ত আমার ঘরে সৎসঙ্গরূপী গঙ্গার ধারা না বইছে, ততদিন পর্য্যন্ত আমার চিত্ত তো সে দিকে যেতে চাইবে না। আমি এক মুহূর্ত্তও সেখানে থাক্‌তে পারব না। আমি তো মরে গিয়েছি, জ্যান্ত থাক্‌তেই মরেছি। ঘরের ওরা যেন আমায় আর ফিরিয়ে নেবার দরুণ চেষ্টা না করে, আখেরে একদিন সকলকেই তো হাড়ের শুকনো ফুল হয়ে গঙ্গায় পড়তেই হবে, তবে এই দেহরূপী তাজা ফুলটী কেন জ্ঞানগঙ্গায় বিসর্জ্জন দেবো না?…এখানে দিনরাত্রের মাঝে রাত্রে একবার সাধুসঙ্গ করতে বের হই। সপ্তাহের মাঝে কেবল রবিবার দিন সাধুসন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণের সভায় বক্তৃতা দিতে যেতে হয়; আর কোথাও যাই না। আজ পাঁচ ছয় দিন প্রায় শতাধিক সাধুকে ভাণ্ডারা দেওয়া হয়েছে।"

তীর্থরামের মনোভাব ও তাঁহার দিনচর্য্যা দুয়েরই খবর

এই চিঠিখানাতে পাওয়া যায়। মানুষ বিরাগী হইয়া ঘরবাড়ী ছাড়িয়া যায় একথাও যেমন নূতন নয়, তেমনি ঘরের লোকও এই ব্যাপারে আর্ত্তনাদে মুখর হইয়া উঠে ইহাও নূতন নয়। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিতে তীর্থরামের এই মনোভাবের সম্বন্ধে ভালমন্দ কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু আজকাল মানুষ যুক্তি ছাড়া কিছু বুঝিতে চায় না বলিয়া ভাণ করে। তাই প্রাণের আবেগকেও যুক্তি-তর্ক দিয়া আত্মসমর্থন করিতে হয়, নতুবা তাহার কদর থাকে না। সেই হিসাবে তীর্থরামের এই মনোভাবের একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

সংসারে থাকিয়া কি ধর্ম্ম হয় না?—এ কথাটা যে শুধু বৈরাগীর আত্মীয়-স্বজনের মুখেই শুনিতে পাই, তা নয়; যে সাহিত্য ও ভাবুকতায় জাতির মনন আত্মপ্রকাশ করে, তাহার মাঝেও এই ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুর জাগিয়া উঠিয়াছে শুনিতে পাই। কথায় কথায় জনকের আদর্শের উল্লেখ করা হয়। কোনও একটা আশ্রম যে অপর কোনও আশ্রম হইতে হীন, এ কথা বলা মূঢ়তা। সংসারে সকলেরই প্রয়োজন রহিয়াছে, পক্ষপাত করিয়া কাহারও একচ্ছত্র অধিকার কামনা করিলে সংসার সুখের হইবে না। সুতরাং জগতে সংসারধর্ম্মের যেমন প্রয়োজন আছে, বিরাগধর্ম্মেরও তেমনি প্রয়োজন আছে বই কি? এ কথাটা বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু বৈরাগীর কাছে সংসারী যাহা আশা করে, সেই লাভ লোকসানের হিসাব খতাইতে গিয়াই যত গোলের সৃষ্টি হয়।

তীর্থরাম ঘর বাড়ী ছাড়িয়া একবস্ত্রে বাহির হইয়া গেলেন—**আপন মনের আবেগে।** অমনি তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে কয়েক দফা প্রশ্ন উঠিল। প্রথম প্রশ্ন, সংসারে থাকিয়া কি ধর্ম্ম হয় না? দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কি তোমার কোনও কর্ত্তব্য নাই? তৃতীয়তঃ, তোমার এই বৈরাগ্যে জগতের কি উপকার হইবে?

প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে গিয়া রামতীর্থ হয়ত বলিতেন, "আমি রাম বাদ্‌শা—কারু হুকুমের তাঁবেদার নই। আমি সত্যের পূজারী, তার দরুণ কারু কাছে কৈফিয়ৎ দেবার কোনও প্রয়োজন আছে এ কথা মানি না!"

সত্যিকার প্রভুত্বের কণ্ঠে যদি এই জবাব উচ্চারিত হয় তো ইহার সম্মুখে সকলকেই সঙ্কোচে চুপ করিয়া থাকিতেই হয়। আর চুপ করিয়া থাকি আর না থাকি, এই তেজোদৃপ্ত জবাবের একটা মর্য্যাদা আছেই, তাহা আমরা মনেমনেও অন্ততঃ স্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু যাহার তেজস্বিতায় কিছু ভেজাল আছে বলিয়া সন্দেহ হয়, অর্থাৎ যে অপরের বাক্য ও কার্য্যের অনুকরণ মাত্র করে, তাহার পক্ষে এই উত্তরই যথেষ্ট কিনা বলা যায় না; এবং বোধ হয় এই অনুচিকীর্ষার সন্দেহবশতঃই সংসারী বিরাগীর প্রতি পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া থাকে।

প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ বলি, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম হইবে না কেন? সংসারে কি সবাই অধর্ম্মই করিতেছে? না সেখানে অধর্ম্ম করিবার বিশেষ সনন্দ পাওয়া যায়? কিন্তু ধর্ম্মের তো একটা বাঁধা-ধরা রূপ নাই; এমন তো নয় যে তোমারও যা ধর্ম্ম, আমারও তাই ধর্ম্ম। আজকাল অনেক ছেলেপিলে নানাপ্রকার অত্যাচার অনাচারে জর্জ্জরিত হইয়া পরিত্রাণের আশায় একটু নিয়ম-সংযমের পথে চলিতে চায়, হয়ত একটু ধ্যান-ধারণা নিয়া থাকিতে চায়, মাছ-মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দেয় কিম্বা বিবাহিত জীবন যাপন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। অমনি সংসারে মা-পিসীর অন্দর হইতে খুড়া-জ্যেঠার সদর পর্য্যন্ত কোলাহল, প্রতিবাদ, বিদ্রূপের বন্যা বহিয়া যায় যেন! কেন এমন হয়? ধর্ম্মের কি একটা গড়কষা মূর্ত্তি

আছে? না হয় মানিলাম, নিরামিষ খাওয়া বা ব্রহ্মচর্য্য পালন করাটাই আর ধর্ম্ম নয়! কিন্তু মাছ-মাংস খাওয়া বা অসংযত জীবন যাপন করা-টাই বা ধর্ম্ম হইল কিসে? বৈরাগ্য যদি ধর্ম্ম না হয়, তো ভোগও ধর্ম্ম নয়; এটাই হইবে নিরপেক্ষ যুক্তিবাদীর কথা। আর এমন কথা স্বীকার করিলে তো নির্ব্বিকল্প ভূমিতেই পৌছিয়া গেলে—তাহা হইলে তো সকল ল্যাঠাই চুকিয়া যায়। কিন্তু সেদিক দিয়া তো কেহ বিচার করিতে চায় না!

যদি স্বাতন্ত্র্যের বুলি আওড়াও (আর কালধর্ম্মে ইহাই হইয়াছে রেওয়াজ) তো আমার বেলায় স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিবে না কেন? বরং তোমা-দের বাঁধাধরা রাস্তায় আমি না চলিয়া যে একটা নূতন বিপ্লবের পথ ধরিলাম, ইহার দরুণ আমাকে তিরস্কৃত না করিয়া পুরস্কৃত করাই তো উচিত ছিল। গতানুগতিক ভাবে সংসার তো মান্ধাতার আমল হইতে সবাই করিয়া আসিতেছে—ইহার মাঝে আজ যদি নূতন ভাবের তরঙ্গ ওঠে তো সেটা কি এতই নিন্দনীয়? যাঁহারা বাক্যে স্বাধীনতার বহ্বাড়ম্বর করেন, নিজের জীবনে কার্য্যতঃ তাহার এক কণিকা ফুটাইয়া তুলিতে তাঁহারা পিছুপা হন কেন?

(ক্রমশঃ



প্রেমক অঙ্কুর

—*—

প্রেম তোমার স্বভাব, তুমি প্রেমস্বরূপ। কিন্তু মায়ার এমনই খেলা যে তুমিই সে কথা জান না। তাই জানিবার দরুণ সাধ্যসাধনার অভিনয় তোমাকে করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে সিদ্ধ বস্তুর তো ব্যত্যয় হয় না। সাধনা মায়ার জগতের কারবার—অমায়িক জগতে প্রবেশ লাভ করিলে বোধ হয় দেখিব, এ কি, এতদিন কিসের দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলাম—সাধ্য, সাধন, ও আবার কি? আমি যে—

যাক্, ও কথার বিস্তার করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। দুটী কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে না বলিতেই কালের গণ্ডী আসিয়া জুটিয়াছে, বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ, নহিলে "যখন", "এতদিন", এ সব বুলি আওড়াইতে হইত না। যাহা স্বানুভবসংবেদ্য মাত্র, তাহাকে ভাষায় ফুটাইবার চেষ্টা করিতে গেলে এমনিধারা বিড়ম্বিত হইতেই হয়। তাই সে চেষ্টা করিব না। তবে যদি এমন কথা শুনিয়া তোমার মনে বড় আহ্লাদ হয় যে তুমি চিন্ময়বিগ্রহবিলসিত অখিলেন্দ্রিয়তর্পণ অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ, তাহা হইলে সেই নিমেষের আনন্দ-দীপ্তির দ্বারপথে রসলোকের প্রতি একটুখানি সঙ্কেত করিয়া সরিয়া পড়ি। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমকে ছিন্ন-মেঘের ফাঁক দিয়া অনন্ত নীলাকাশের সন্ধান দিয়া বলি—পাখী, ওই যে স্বধাম; আর এ খাঁচায় ফিরিয়া আসিবি কিসের দুঃখে!

শেষের কথার আভাস মাত্র দিতে পারি,

মুখ ফুটিয়া বলি কি করিয়া? কিন্তু গোড়ার কথা বলা যায়; সে কথা বলিবার মত ভাষা, বুঝিবার মত বুদ্ধি, সাধিবার মত উপকরণ, সবই আছে। অতএব নিরুপাধি প্রেমের স্বরূপ ইঙ্গিতে বুঝাইতে গিয়া উপাধির কথাই আগে বলি।

প্রেম স্বরূপ; কিন্তু গুণমায়ায় আবৃত। আবরণ সরাইতে হইবে। কোথা হইতে এই অপসারণ-সাধনার আরম্ভ? শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখ দিয়া আচার্য্য কবিরাজ গোস্বামী বলাইতেছেন—

কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়!

কি সাবধানীর কথা! অথচ কথাটা রহস্যময়। শ্রদ্ধা আদি; কিন্তু তার নিদান জানি না; অধিকারীই বা কে বলিতে পারি না। "কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের যদি বা হয়"—এ ভয়ের কথা না ভরসার কথা বলিতে পারি না। ভাবিতে বুক কাঁপে।—আমার কি সৌভাগ্য হইবে? মহাপ্রভুর কৃপা কি আমাতে বর্ত্তাইবে? তাঁহার স্বগণ, তাঁহার চিহ্নিত দাস হইবার কপাল কি আমার আছে? শ্রদ্ধার বীজ হইতে প্রেমের কল্পতরু উদ্গম আমার এই ঊষর ক্ষেত্রে হইবে কি? —প্রেমের আদি কথা এমনি আশা, আশঙ্কা, হর্ষ, বেদনায় কণ্টকিত। সারা পথটাও তাই।

তারপর এই পথের সঙ্কেত—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবঃ ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।

—প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর শ্রবণ-কীর্ত্তন আদি সাধনভক্তি, তারপর অনর্থ-নিবৃত্তি, তারপর নিষ্ঠা, তারপর রুচি, তারপর আসক্তি, অবশেষে রতি; রতি হইতে প্রেমের অভ্যুদয়।

কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।

রতির অঙ্কুরের চিহ্নগুলি কি?—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।

—রতির অঙ্কুর এই চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারি।—ভাবুকের চিত্ত কাম-ক্রোধ, ঈর্ষা-দ্বেষাদি প্রাকৃত কোন বিকারে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হয় না; ইষ্টদেবতার সম্পর্ক ছাড়া এক মুহূর্ত্ত তাহার বৃথা যায় না; ইন্দ্রিয়-ভোগে তাহার পরম বিরাগ; তাহার চিত্তে বিন্দুমাত্র অভিমান নাই; ভগবান তাহাকে কৃপা করিবেন, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস; চিত্তে সর্ব্বদা প্রিয়সঙ্গমের দরুণ লালসা জাগিয়া থাকে; সর্ব্বদা ইষ্টনাম লইতে তাহার রুচি হয়; আপনজনের কাছে ইষ্টের গুণবর্ণনায় আনন্দ হয়; ইষ্টদেবতার লীলাস্থলীতে, তাহার কাছে কাছে থাকিতে ইচ্ছা হয়। এইগুলি দেখিয়া বোঝা যায়, ইহার ভিতর রতি অঙ্কুরিত হইতেছে।

রতি গাঢ় হইলে প্রেম হয়। তখন আর তাহাকে চিনিবার উপায় নাই। কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়॥
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥

হাঁ, বিজ্ঞেরা তাহা বুঝিতে পারে না বটে। হয়ত তাহা এমনই সহজ, হয়ত বা আবার এমনই কঠিন। কোনও আচারে হয়ত বা প্রাকৃতজনের সঙ্গে প্রেমিকের কোনও বৈলক্ষণ্যই নাই; আবার কোনও আচার এমনই অদ্ভুত যে, যে তাহা

না দেখিয়াছে, তাহাকে প্রত্যয় করানো কঠিন। প্রেমিকের এই আচার-কৌল্য মহাপ্রভু পর্ব্বে পর্ব্বে প্রকটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। রসশাস্ত্রের ছাঁদনে তাহাকে ছাঁদিবার চেষ্টা মহাজনেরা করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সফলকাম হইয়াছেন কি?—তবুও বোবার ইঙ্গিত বুঝিবার মত উহা হইতেই ঠারে-ঠোরে একটু বুঝিয়া লইয়া আস্বাদন করিতে হয়।

শ্রদ্ধা হইতে ভাবাঙ্কুর পর্য্যন্ত ক্রমস্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়া এক প্রেমেরই ক্রমোজ্জ্বল প্রকাশ। সাধকের এইগুলি চিনিয়া রাখা ভাল। এইগুলি দিয়া অন্ততঃ পথের সঙ্কেত কতকটা পাওয়া যায়, নিজে কতটুকু যোগ্য হইতেছি, তাহা বুঝিতে পারা যায়; চিত্তে বল হয়, সাহস জন্মে। ইহাদের একটু পরিচয় দিই।

শ্রদ্ধা অর্থে বিশ্বাস, আস্তিক্যবুদ্ধি—তিনি আছেন, তাঁহার সঙ্গে আমার একটা নিত্যসম্বন্ধ আছে সামান্যতঃ এই জ্ঞান। ইহার পরেই মনে হইবে, তিনি যদি আমার আপন জন, তবে তাঁহার সংবাদ পাইব কাহার কাছে? যাঁহারা তাঁহার আপন জন, তাঁহাদের কাছেই। এই হইতে সাধুসঙ্গের বাসনা। সাধুসঙ্গে শ্রবণ, কীর্ত্তন ইত্যাদি সাধনাশ্রয় স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। তাহাতে ক্রমশঃ চিত্তের ময়লা কাটিয়া যায়; ইহাই অনর্থনিবৃত্তি। চিত্তের মলিনতা দূর হইলে উহাতে বীর্য্যের আবির্ভাব হয়, ইষ্টকে আঁকড়িয়া ধরিবার শক্তি জন্মে, লোহার কাদা ধুইয়া গেলে তাহা যেমন চুম্বকে লাগিয়া যায়, এসিড্ দিয়া মশলা ধুইয়া ফেলিলে যেমন ঝালার মশলা ধাতুগাত্রকে কামড়াইয়া ধরে। নিষ্ঠাতে উন্মাদনার তেমন কিছু নাই বটে, কিন্তু তবুও উহা দৃঢ়তা, অভিনিবেশ, বীর্য্য, চিত্তের ধৃতি। নিষ্ঠা হইতেই রুচি;—তখন সাধ্যকে ভাল লাগে, অল্প অল্প করিয়া আনন্দের উদয় হয়। রুচি গাঢ়তর হইলেই আসক্তি—ছাড়িতে গেলেও ছাড়িতে পারি না, ইহাই আসক্তির লক্ষণ; চটচটে কাদার মত, হাজার ধুইলেও একটু না একটু দাগ থাকিয়াই যায়। আসক্তির পর ভাবাঙ্কুরের উদয়—তাহার চিহ্নের কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এই হইল প্রেমাভিলাষী চিত্তবিবর্ত্তনের পরিচয়। ইহার কতকগুলি অবস্থা আপনা হইতেই আসিবে; আর কতকগুলি সাধ্যসাধনা করিয়া আনিতে হয়। মূলতঃ চাই শ্রদ্ধা। বিশ্বাস কর যে তিনি আছেন, তিনি তোমার অতি আপন জন এবং তাহাকে পাওয়া যায়। তারপর এই বিশ্বাস লইয়া সাধুর শরণাগত হও, কায়িক, বাচিক বা মানসিক উপায়ে তাঁহার সেবাপরিচর্য্যা কর। সাধূপদিষ্ট কিছু ভজনক্রিয়াও অবলম্বন কর। তোমার কর্ত্তব্য এই পর্য্যন্ত। তার পর চিত্তের ময়লা কাটিয়া গিয়া অন্যান্য বিভাবগুলি আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিবে।

কর্ত্তব্যের কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলি—শ্রদ্ধাসহকারে সাধুর শরণাগতি ও তাঁহার উপদেশ মত সাধনা, এইমাত্র কর্ত্তব্য; আর ইহা অবশ্যকর্ত্তব্যও বটে। "নান্যঃ পন্থাঃ।"

আসক্তি হইতেই রতি অঙ্কুরিত হয় এবং আপনার বেগে আপনিই উহা পল্লবিত হইয়া সাধকের সাধ্যাবধির সূচনা করে। এই রতিকেই মহাজনেরা ভাব বলিয়াছেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে দেখিয়াছি, শ্রীমৎ রূপগোস্বামী যাহাকে ভাব বলিয়াছেন, কবিরাজ গোস্বামী তাহাকেই রতি বলিতেছেন। সুতরাং রতি ও ভাব সমার্থক। মূলত একবস্তু হইলেও দৃষ্টির বিভিন্নতা বশতঃ ভাব ও রতিতে অতি সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গ প্রভেদ রহিয়াছে বটে। তথাপি বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা আসক্তির পরের অবস্থাকে রতি বলিয়াই উল্লেখ করিতেছি।

রতি গাঢ় হইলেই প্রেমের উদয়। প্রেম একটি সামান্য শব্দ, তাহার অন্তর্গত অবস্থার বিলাস আছে ছয়টি অবস্থাবিশেষকে আশ্রয় করিয়া প্রেমবিলাস

প্রকটিত হইয়া থাকে। প্রেমবিলাস ছয়টি এই—

স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্‌,
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি।

—এই সমর্থা রতিই প্রেমসহকৃত স্নেহে ফুটিয়া উঠে; ক্রমে উহা মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, অনুভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ড, সার।
শর্করা, সিতা, মিছরি, শুদ্ধা মিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥

উজ্জ্বলনীলমণি বলিতেছেন—

অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্যুর্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু ষট্।
প্রায়ো ব্যবহ্রিয়ন্তেঽমী প্রেমশব্দেন সূরিভিঃ॥

—স্নেহ প্রভৃতি ছয়টী ভাবকে প্রেমবিলাস বলা যায়। মহাজনেরা প্রায়ই ইহাদিগকে প্রেমশব্দে আখ্যাত করিয়া থাকেন।

তাহা হইলে পাইলাম, ভাব বা প্রেমবিলাস-কেই সামান্যতঃ প্রেমও বলা হইয়া থাকে। কবি-রাজ গোস্বামী ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু রতি প্রৌঢ়া হইয়া যখন মহাভাবসীমা পর্য্যন্ত উঠে, তখন উহা প্রেম বলিয়া কথিত হয়, ইহাও মহাজনদের মত। সুতরাং এই সমস্ত বর্ণনায় সামান্য ও বিশেষ বিবরণের অনুরোধে পরিভাষার সম্মিশ্রণ ঘটিতেছে দেখিতে পাইতেছি।

যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রতি বা ভাবের আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত বিধির বাঁধন; সাধনার সীমাও ইহাই। ভাবই জীবনের লক্ষ্য। ভাবই ভগবান্; ভাবে যে মমতা, উহাই রতি। আমার মাঝেই ভাবের আবির্ভাব হয়; ভগবান্ আমার হৃদয়েই ফুটিয়া উঠেন। তাঁহাকে আস্বাদন করিবার গুণাতীত সাধন বা আমার প্রাণস্বরূপই রতি। প্রাণ দিয়া প্রাণের ঠাকুরকে চিনি; উহাই ভাব ও রতির অযুতসিদ্ধ নিত্য-সম্বন্ধ। ভাব আমার অন্তরের রূপ না তাঁহারই স্বরূপ? বুঝি বা দুইই। তাঁহাকে জড়াইয়াই আমার রতি; ভাবে জড়িত রতি; অথবা আমাকেই বুঝি আমি বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আছি!

এই অবস্থাই কাম্য। ইহার পরিচয় এই—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

—ভাব শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষ স্ফুরণ; প্রেম যদি দীপ্ত সূর্য্য, ভাব তাহা হইলে যেন তাহার কিরণ; ভাবে ইষ্টে রুচি হয়, তাহাকে আপন করিয়া একান্ত করিয়া পাইবার অভিলাষ হয়; চিত্ত তখন মসৃণ হইয়া যায়।

অথবা—

প্রেম্ণস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।

প্রেমের প্রথম দশাই ভাব।

আমার আকুলতা-মমতা যেমন বাড়িতে থাকে, বালারুণবৎ প্রথমোদিত এই ভাবও ক্রমশঃ দীপ্ত হইতে দীপ্ততর হইতে থাকে। আমার রতি ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবে পরিণত হয়; সঙ্গে সঙ্গে ভাবের দীপ্তিও ক্রমে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। ইহাই প্রেমবিলাস। ইহা গুণরাজ্যের পরপারের কথা।

একদিন মহাপ্রভুর প্রেরণায় বিভোর হইয়া রামানন্দ মহাপ্রভুরই কাছে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের সূচক এই গীতটি গাহিয়াছিলেন—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গা ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহু মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সো সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠামে কহব বিসরল জানি॥
না খোজল দূতী না খোঁজল আন।
দুহুকো মিলনে মধত পাঁচবাণ।

এ তো গীত নয়, যেন সুধার নির্ঝর। আবেশে অধীর হইয়া মহাপ্রভু শ্রীকরে রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। কত মহাজন কত ভঙ্গীতে ইহার রসাস্বাদন করিয়াছেন। সে সব বিবৃত করিবার স্থান ইহা নয়। শুধু প্রেমবিলাসের উদাহরণরূপে আমরা ইহার একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব। এই কমঠকঠোর আলোচনায় শ্লোকের অমর্য্যাদা হইবে জানি, সেজন্য মহাজনের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

নয়ন ভঙ্গীতে প্রেমের উদয়—ইহা পূর্ব্বরাগের পরিচয়। দেখিলাম, পাইলাম না—কিন্তু ভুলিতে পারিলাম না কেন? বারবার দেখিবার লালসা জাগে কেন? যদিই বা বারবার দেখিলাম, তথাপি লালসা মিটিল না কেন? "অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল"—ইহাই সেই অপূর্ণ লালসার অভিব্যক্তি। ইহারই নাম **স্নেহ**। মহাজনেরা বলেন—

প্রেমের পরমকাষ্ঠা জ্ঞানোদ্দীপন।
হৃদয় দ্রবায় স্নেহ কহে কবিগণ॥
এই স্নেহ উদয় করয়ে যার মনে॥
তার আশা নাহি পূরে কৃষ্ণদরশনে॥'

স্নেহে চিত্ত গলিয়া যায়, তাহার উৎকর্ষে মানের আবির্ভাব। তাহার লক্ষণ কি?—

স্নেহের উৎকর্ষে হয় মাধুর্য্য নূতন।
তাহে অদাক্ষিণ্যে মান কহে বুধগণ॥

অদাক্ষিণ্য অর্থে কুটিলতা। অন্তরে রসের সায়র পূরিয়া রাখিয়া এই বাঁকাভাবটুকু, ইহাই প্রেমের বিশেষত্ব। ইহার উদাহরণ—শ্রীরাধার চোখে ধূলি পড়িয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ফুঁ দিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন শ্রীরাধা বলিলেন—

তোমার সুরভি বায়
পথে ধূলি উড়ে তায়,
সেই ধূলি নয়নে লাগিল,
তাহে মোর আঁখি ঝুরে,
মুখানিলে কিবা করে?
ইহা বলি ভুরু বাঁকাইল।

ইহার পর **প্রণয়**। প্রণয়ের লক্ষণ এই—

মানের বিশ্বাস হলে হয়ত প্রণয়।

প্রণয় অর্থে বিশ্বাস। তোমাকে সম্ভ্রম করিবার কিছুই তো নাই—কেন না তোমার-আমার দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি যে এক। পার্থক্য থাকিলে তবে সম্ভ্রমের সম্ভাবনা।—"দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি"—জানি, আমাদের দুইজনার মনকেই মনোভব পিষিয়া এক করিয়া দিয়াছে; যে সুখ, যে জ্বালা আমার বুকে, সে সুখ সে জ্বালা যে তোমারও বুকে!

ইহার পর **রাগ**। তাহার লক্ষণ এই—

প্রণয় উৎকর্ষে দুঃখ সুখসম হয়।

প্রণয়ের উৎকর্ষে প্রেমাস্পদের দেওয়া দুঃখও যখন সুখ বলিয়া মনে হয়, তখনই উহা রাগ।

"এ সখি, সো সব প্রেমকাহিনী। কানু ঠামে কহবি, বিসরল জানি॥"—সখি আমি কুলকামিনী লজ্জার মাথা খাইয়া আমার সে কলঙ্কের কথা, তোমার কাছে কহিতেছি। আজ এই কলঙ্কই যে আমার বক্ষের হার, চক্ষের মণি। লোকে ধিকার দিয়া বলে, রাই শ্যামকলঙ্কিনী; তাহাতে আমার যে কত সুখ! সে আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা জানি, তবু লোকে জানে আমি

তাহারই ;—আমার এ গর্ব্বের এ সুখের কি তুলনা আছে সখি ?—ভুলিয়া গিয়াছে জানি, তবুও একবার সে প্রেমের কাহিনী তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিও।

রাগের পরে **অনুরাগ**। তাহার লক্ষণ—

সদাদৃষ্ট কৃষ্ণে দেখে নূতন নূতন।
রাগ নব নব হয়ে অনুরাগ পুনঃ॥

যাহাকে সর্ব্বদাই দেখিতেছি, তাহাকেই প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন করিয়া যেন দেখিতে পাইতেছি, ইহাই অনুরাগ।

"না খোঁজল দূতী না খোঁজল আন। দুহুক মিলনে মধত পাঁচবাণ।"—প্রথম মিলনে দূতীর প্রয়োজন হয় নাই, মিলন ঘটাইবার জন্য আর কাহাকেও ডাকিয়া আনি নাই। পঞ্চবাণই ছিল আমাদের মধ্যস্থ—সেই আমাদের নিত্য নূতন করিয়া পরিচয় ঘটাইয়া দিত।—আর আজ ?

অনুরাগের পরিপাকে **ভাব**। মহজনেরা বলেন—

অনুরাগ আপনি যদি হয় প্রকাশিত।
যাবদাশ্রয়বৃত্তি ভাব হয়ত বিদিত॥

আশ্রয়ের সহিত তাদাত্ম্য-স্বরূপে স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুরাগই ভাব—

ইহার কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত রতির প্রভাব। ইহার পরেও সমর্থারতির প্রৌঢ়-দশায় মহাভাবের স্ফুরণ।

যা মৃগ্যাস্যাদ্বিমুক্তানাং চ বরীয়সাম্।

—বিমুক্তেরা এবং ভক্তশ্রেষ্ঠেরা যাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন।

শিক্ষাপ্রসঙ্গে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শারীর-চর্চ্চা সম্বন্ধে আর একতরফ থেকে কিছু বলবার আছে। শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের দেশের অজ্ঞতা অত্যন্ত শোচনীয়; এই শোচনীয় ব্যাপার শোকাবহ হয়ে ওঠে যখন দেখি, আমাদের শিক্ষাতন্ত্রে এই সম্বন্ধে ছেলেদের অজ্ঞতা দূর করবার দরুণ উপযুক্ত কোনও ব্যবস্থা নাই। ইস্কুল-কলেজে জিমনেশিয়াম্, স্পোর্টিং এসোসিয়েশন ইত্যাদি আছে; কোথায় কোথায়ও ড্রিল, একসারসাইজ ইত্যাদি অবশ্যকর্ত্তব্য। তবুও শোনা যায় দৈহিক চর্চ্চার দিকে বাঙ্গালী ছেলেদের বিশেষ আগ্রহ নাই, জিমনেশিয়ামের হাজিরাতে ফাঁকি দেওয়ার ফন্দী তারা বেশ জানে। এ বিষয়ে উপযুক্ত পরিমাণে আলোচনার অভাবই এই ঔদাসীন্যের কারণ। একটা বিষয়ে চর্চ্চা হলে, একটু জ্ঞান থাকলে তবে মানুষের ঔৎসুক্য উত্তেজিত হতে পারে। এই প্রবল যুক্তিবাদের দিনে কিসে কি হয়, তা জান্‌ছি না, অথচ মাঠে সারবন্দি হয়ে হাত পা খিঁচ তে যাব কেন, এ প্রশ্ন আপনি ওঠে। স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম এবং মোটামুটী একটা জ্ঞান দেশে বহুল পরিমাণে

প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে সমস্ত বিদ্যালয়েই বাধ্যতামূলক শিক্ষা-প্রবর্ত্তন প্রয়োজন।

আমাদের দেশে স্নান, আহার, শোয়া, বসা, ঘুমানো ইত্যাদি সম্পর্কে এমন সুন্দর কতকগুলি আচার আছে, যাতে ধর্ম্ম-চর্চ্চার পক্ষে কোনও আনুকূল্য হয় কিনা, সে বিষয়ে বর্ত্তমান যুক্তিবাদীরা সন্দেহ প্রকাশ করলেও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে এ সব আচার যে অত্যন্ত অনুকূল, এ কথা স্বীকার করতেই হয়। আজকাল এই সমস্ত আচার-নিষ্ঠাকে আমরা কুসংস্কার বলে উপহাস করতে শিখেছি। ফলে ধর্ম্ম হিসাবে এ সব নিয়ম তো আমরা মানিই না, স্বাস্থ্যহিসাবেও মানি না। তাতে আমাদের পরমায়ু বাড়ছে কিনা, তা আদমশুমারী বিভাগের কর্ত্তারা বলতে পারেন।

মানি, কোন কোন আচারের হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের ওপর ঝাল ঝাড়তে গিয়ে যেগুলির বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি পাওয়া যায়, সেগুলিকেও দূরে ঠেলা কি সঙ্গত? দুঃখ এই, পাশ্চাত্য সভ্যতার হঠকারিতাটুকু আমরা অনুসরণ করেছি মাত্র, কিন্তু তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আদর করতে শিখিনি। তাই আমাদের দেশের ভালমন্দ বিষয়গুলিকে ওদের দেশের বিজ্ঞানের আলোকে যাচাই না করে সরাসরি নির্ব্বাসন করেই ভাবি, দেশে সভ্যতার বিস্তার করছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরও যদি যথাযথ প্রচার হত, তাও একটা কথা ছিল। আমাদের হয়েছে ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ।

শারীর-বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি খুব ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে মায়েদের দায়িত্বই বেশী। প্রাচীন গৃহিণীরা মুখে মুখে ছড়ার আকারে অনেক পারিবারিক স্বাস্থ্যনীতির ফতোয়া জারী করতেন। আধুনিক জননীদের সে সব জানা তো প্রয়োজনই, বর্ত্তমান বিজ্ঞানে এ সম্বন্ধে কি বলে, তারও খবর রাখা দরকার। এ শিক্ষাটুকু পাওয়ার পক্ষে বাধাও বিশেষ নেই। শারীরবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যচর্চ্চা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ধরণের আলোচনা ও পুথিপুস্তক বাংলা-ভাষায় দুর্ল্লভ নয়। মায়েদের এগুলির চর্চ্চা করা প্রয়োজন।

একটা বিষয়ে চর্চ্চা কিম্বা খুঁটিনাটি জ্ঞান থাকলে সে বিষয়ে সংযম আপনা থেকেই এসে পড়ে। যেমন খাওয়া সম্বন্ধে! ছেলেপিলেমাত্রই একটু খাওয়ার লোভী হয়, তার দরুণ ভোগেও বেশী। নিজেদের অজ্ঞতায় যদি তাদের এই লোভে ইন্ধন নাও দিই, তবুও সারাদিন "ওরে এটা খাস্‌নে ওটা ফেলে দে" বলে হাঁ—হাঁ করে ছেলের পেছনে পেছনে ঘোরা সব সময় সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এ বিষয়ে ছেলেকে আত্মকর্ত্তৃত্বও দিতে হবে সে তার নিজের ভাল মন্দ বুঝে যাতে নিজেই নিজকে বিধি-নিষেধে বাঁধতে পারে, সেই শিক্ষাই দিতে হবে। কোন্ কোন্ যন্ত্র সহায়ে, কি করে আমাদের খাদ্য পরিপাক হয়, এগুলি যদি ছবি দিয়ে গল্প করে আমরা ছেলেদের বুঝিয়ে দিই এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কোথায় বিপদের আশঙ্কা আছে, তাও দেখিয়ে দিই, তাহলে সে সমস্ত কাহিনী ঠাকুরমার গল্পের চেয়েও কম মনোরঞ্জক হয় না; তাতে উপকার যে হয় সে তো বলাই বাহুল্য! অসুখ করলেই অষুধ খেতে হবে, এই একটা বর্ব্বর ধারণা আমাদের মাঝে বদ্ধমূল হয়ে আছে। আমরা অসুখটাও চিনি না, অষুধটাও চিনি না—আন্দাজে ঢেল ছুঁড়ি মাত্র। ছেলেরাও ছোট বেলা হতে তাই শিখে। শারীর বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাদের মোটামুটী জ্ঞান থাকলে, কি কারণে অসুখ হয়, তারও কতকটা হদিশ পেয়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী নিজেরাই তার প্রতীকার করতে

পারে। ছেলেদের এ বিষয়ে এমনি শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে প্রত্যেক শারীরিক বিকার সম্বন্ধে তাদের অনুসন্ধিৎসা জাগে এবং অবান্তর কোন কিছুর সাহায্য না নিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে তার প্রতীকার করতে সচেষ্ট হয়। এতে শুধু রোগ আরোগ্য নয়, ভবিষ্যৎ জীবনেও অনেক লাভ আছে, সে কথা পরে বলছি। আপাততঃ ছেলেদের এই স্বয়ংতন্ত্র ব্যবস্থায় ডাক্তারের বিল ক'মে পারিবারিক ব্যয়সঙ্কোচ হবার আশা তো করা যেতে পারে।

শেখাবার আর একটা বিষয় হচ্ছে রোগী-শুশ্রূষা। আমাদের দুস্থ দেশ, রোগ-বালাইর অভাব নেই, ঘটা করে সেবা করারও ত্রুটী নেই। এদেশে নার্সিংএর সুযোগ যথেষ্ট। এ বিষয়ে ট্রেনিং দিলে দেশের একটা প্রয়োজনীয় ও বিরাট্ আন্দোলনের সঙ্গে ছেলেদের যোগস্থাপন হয়ে দেশাত্মবোধকে উদ্দীপিত হতে পারত। এতে পারিবারিক লাভ যে আছে, তার তো কথাই নাই। এর সঙ্গে আর একটা বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা উচিত, সেটী হচ্ছে First aib বা দুর্ঘটনার প্রাথমিক প্রতিকার। কাটা, ছেঁড়া, হাত-পা মচ্‌কান বা ভাঙ্গা—এগুলো সচরাচর ঘটনা, বিশেষতঃ ছেলে-পিলেদের বেলায়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রতিকারের উপায় জানা থাক্‌লে বিপদের আশঙ্কা যে কম্‌বে তা বল্‌ছি না, বরং প্রতিকারের উপায় জানা থাকার দরুণ বিপদ খুঁজে নেবার দুঃসাহসটাও বাড়তে পারে; আর এই পরাণ কাতুরে দেশে অমনধারা দুঃসাহসিকতা বাড়া সুলক্ষণ বলেই মনে করি। রোগী-শুশ্রূষা বা First aid সম্বন্ধে খুব পাকাপোক্ত জ্ঞানের কথা বলছি না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারে কাছে না গিয়েও তো ভূগোলের মারফ'ত কোন্ দেশ গোল আলুর জন্য আর কোন্ দেশ তুলার জন্য বিখ্যাত, ছেলেরা তা মুখস্থ করে মরে; তার চাইতে এই সব বিদ্যা পাঠ্যপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত হলে বেশী উপকার হত না? ইতিহাস-ভূগোল পাঠের চেয়ে এগুলো কম কার্য্যকরী নয়, বরং অফলা বিদ্যার চেয়ে এই সব সফলা বিদ্যায় মানুষকে 'মনুষ্যত্বের উন্মেষণে বেশী সহায়তা করে থাকে। অনেক সময় ভেবে অবাক্ হই, সভ্যতার নূতন আলোকে আমরা যে ধরণের শিক্ষা পাচ্ছি, তাতে আমাদের মনের আঁধার অতিরিক্ত পরিমাণে দূর হয়ে গিয়ে আমরা দিন দিন যে অকেজো হয়ে পড়ছি, এইটাই কি নজরে পড়ে না?

শারীর-চর্চ্চা সম্বন্ধে আর একটা বিষয় আলোচ্য হচ্ছে খাদ্যরসায়ন (Chemistry of diet)। অবশ্য এটা হাইজিনের আমলে এসে পড়ে। কিন্তু বিশেষ করে এর উল্লেখ করা এই জন্য যে খাওয়া সম্বন্ধে আমাদের দেশে বাছবিচার অত্যন্ত বেশী এবং এ সম্বন্ধে আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রেও যেমন খাদ্যের গুণাগুণ আলোচিত হয়েছে, তেমনি অধ্যাত্মশাস্ত্রেও খাদ্যের সূক্ষ্ম ক্রিয়ার আলোচনা করে বিধিনিষেধও কিছু কম করা হয়নি। এর সঙ্গে আধুনিক খাদ্য-রসায়ন যোগ করে এ সম্বন্ধে একটা মোটামুটী ধারণা ছেলেদের দেওয়া খুবই প্রয়োজন। ভালই বল, আর মন্দই বল, আমাদের ধর্ম্মটা হেঁসেলে; সেখান থেকে সে যে সহজে নড়্‌বে, এমন সম্ভাবনাও দেখ্‌ছি না। এমন অবস্থায় তার ওপর কেবল আক্রোশ প্রকাশ করে কিছু লাভ হবে না; ওকে একটা নাছোড়বান্দা বালাই (necessary evil) মনে করে হলেও ওর সম্বন্ধে চর্চ্চা-আলোচনা করা প্রয়োজন। বেশ জানি, abstract জাতীয়ত্ববোধ আমাদের দেশে concrete হয়ে দাঁড়ায় ওই খাওয়াদাওয়ায়; খাওয়া সম্বন্ধে পাত্রবিচার, পাচকবিচার, তিথিবিচার, প্রয়োজন-বিচার, উপাদান-বিচার ইত্যাদি এক্‌শো রকমের বিচার আমাদের আছে; এই বিচারের পঙ্কোদ্ধার করা শিক্ষার অঙ্গ হওয়া উচিত;—শুধু স্বাস্থ্যের দিক

থেকেই নয়, নীতির দিক থেকেও এবং জাতীয়ত্ব-বোধের দিক থেকেও। যে শিক্ষায় খাদ্যাখাদ্য-বিচার নাই, তা হিন্দুর "জাতীয়" শিক্ষা কিনা বল্‌তে পারি না—বরং এ যুগে সে কথা অচলই; তার পর কোনো দিন সব একাকার হলে কি হবে বল্‌তে পারি না। আর এই সমস্ত বিচারের শিথিলতা থাকাতে আমাদের শুধু যে শারীরিক অবনতিই হচ্ছে তা নয়—মানসিক দুর্গতিও নিতান্ত কম হচ্ছে না। বিধিলঙ্ঘনের সংসাহসটা যে অনেক সময় ফাঁকিবাজী মাত্র, তা আমরা মনে মনে বেশ জানি; অথচ তা নিয়ে প্রকাশ্যভাবে বৈজ্ঞানিক আলোচনা কর্‌তেও আমাদের মন্থরতা!

শারীর-চর্চ্চা সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথাটাই এখনো বল্‌তে বাকী। শরীরের পক্ষে আহার, পরিশ্রম, অস্বাস্থ্যের প্রতীকার, প্রসাধন—এগুলি খুবই প্রয়োজনীয় এবং এর বিজ্ঞানও শিশুর পক্ষে সহজবোধ্য করে শেখানোর ব্যবস্থা করা উন্নত শিক্ষাপ্রণালীর দায় হওয়া উচিত। অথচ আজকাল পরিশ্রমের কোঠায় সামান্য একটু ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা ছাড়া আমাদের দেশের কোনও সুসভ্য শিক্ষাপ্রণালীই বোধ হয় ও সব বিষয়ে আর কোনও উচ্চবাচ্য করে না। এটা শিক্ষার গলদ কিনা, তার বিচার পণ্ডিতেরা কর্‌বেন। কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক রকম উপেক্ষিত হয় যৌন-বিজ্ঞান। অথচ প্রজনন হচ্ছে দেহের সব চেয়ে জটিল, সুকুমার ও গুরুতরবৃত্তি। দেশের হিতকামী ব্যক্তিরা বাল্যে যৌননিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা বুঝে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম খোল্‌বার দিকে ঝোঁক দিয়েছেন, এটা খুবই সুখের কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে সরকারী শিক্ষাবিভাগ থেকে কোনরকম সাহায্য বা সহানুভূতি পাওয়ারই সম্ভাবনা নেই। সরকারী শিক্ষাবিভাগ সুরুচি ও শ্লীলতার দোহাই দিয়ে এ বিষয়ের আলোচনার পর্য্যন্ত কণ্ঠরোধ করেছেন। আমরা জানি, ছেলেদের সতর্ক কর্‌বার দরুণ ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে দু একখানা পুস্তক পাঠ্য বা পুরস্কার পুস্তিকার তালিকাভুক্ত কর্‌তে চেষ্টা করেও কেউ কেউ অকৃতকার্য্য হয়েছেন, টেক্‌স্‌ট্ বুক্ কমিটি গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিয়েছেন, বই থেকে যৌনব্যাপার সম্পর্কিত কথাগুলো ছেঁটে দিলে বইখানা ইস্কুলে চল্‌তে পারে! ইংরেজীতে একটা প্রবচন আছে—হ্যাম্‌লেটের ভূমিকা বাদ দিয়ে হ্যাম্‌লেট্ নাটক অভিনয় করা—এ উপদেশটা হচ্ছে সেইরকম। অথচ আমাদের দেশের "জাতীয়" শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি কোন্ অনাদি যুগ হতেই যৌন-নিয়ন্ত্রণকে লক্ষ্য করেই শিক্ষার ব্যবস্থা করে এসেছে। আর আজ সুসভ্য বৈদেশিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তার আলোচনা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ! এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অনুসরণ করে দেশের লোকের টাকাতেই যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পত্তন হয় বা হবার কল্পনা-জল্পনা চলে, সেগুলিও যে "জাতীয়" হয় কোন্ গুণে তা বুঝ্‌তে পারি না। প্রাচীন ইতিহাসের সমস্ত প্রভাব হতে মুক্ত করে কোনও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা কর্‌লে "বিশ্বপ্রেম" প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু জাতিপ্রেম প্রকাশ হয় কিনা জানি না। আর এমনি ভুঁইফোঁড় উন্নতির আভিজাত্য কতটুকু, সেই হিসাবে তার স্থায়িত্বও বা কতখানি, তাও জানি না। নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর বুকার্ ওয়াশিংটনের একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, "ইংরেজ-সন্তানের একটা অতীত আছে, একটা বংশের গৌরব আছে, পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তির একটা মহতী প্রেরণা আছে, সেইগুলোই তাকে উৎসাহিত করে, প্রাণে আশা জাগায়, তাকে সম্মুখ পানে ঠেলে; কিন্তু নিগ্রো-সন্তানের অতীত বলে কিছুই নাই, তাই তার ভবিষ্যৎও আঁধার।" কথাটা ভাব্‌বার মত। জাতীয় ধারা ও গৌরব হতে বিচ্ছিন্ন কোনও তন্ত্রই জাতিকে উন্নত কর্‌তে পারে না কিছুতেই। আবর্জ্জনা দূর কর্‌তে হবে স্বীকার করি,

কিন্তু সে কি মূল উচ্ছেদ করে ? যদি বলি যৌন নিয়ন্ত্রণের প্রতি শ্যেনদৃষ্টি, এই হচ্ছে আমাদের শিক্ষার সনাতন ধারা, তাহলে সে কি বাড়িয়ে বলা হবে ?—না আদপেই ওটা আমাদের সেকেলে কুসংস্কার বলব ? এটা শিক্ষার একটা সার্ব্বভৌম সমস্যা নয় কি ? এই সমস্যা সমাধানের দরুণ এক-দিন আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলাম. এইটাই আমাদের জাতীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য নয় কি ? এই বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে বিদেশীয় বা বিশ্বমানবীয় যত কিছু আড়ম্বরের আমদানীই হোক্ না কেন. তাকে অসঙ্কোচে জাতীয় শিক্ষা বলা উচিত হবে কি ? (ক্রমশঃ)

—*—

সংসার

—*—

সংসার মায়া, সংসার বন্ধন, মহাজনেরা এ কথা বলেন বটে। যতই চটি না কেন, তাঁহারা যে মিথ্যাকথা বলেন, তাহা বলিতে পারি না। সংসারের মায়া মানুষকে উচ্চতর লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করে বই কি! যে স্ত্রী-পুত্রের সেবা করিয়া দিন গুজরাণ করে, সে জগতের সেবা, দেশের সেবা করিবার অবসর পাইবে কখন? আমিত্বের প্রসারের সহিত মানুষের পারিবারিক গণ্ডীও বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, বিশ্বের দায়ে বিশিষ্টকে কুণ্ঠিত করা তখন প্রয়োজন হইবে; ইহাকে মানব-ধর্ম্মের প্রতিকূল বলাও চলে না। কিন্তু যদি কেহ ব্যক্তিগত উন্নতির দরুণ সংসার বর্জ্জন করিতে চায়, তাহাকে কি বলা যাইবে? সংসার তাহাকে রেহাই দিতে চাহিবে না, স্নেহের বন্ধন, কর্ত্তব্যের বন্ধনের শতবাহু দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিবে। সে যদি সংসারের এ আব্দার উপেক্ষা করে, সংসারের মায়া-মমতা দুই পায় দলিয়া যায়, তাহাতে অপরাধ হইবে কি? বর্ত্তমান ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ তো তাহা বলে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কাছে আত্মতৃপ্তি সর্ব্বাগ্রে, আত্মতুষ্টির মর্য্যাদা বিশ্বাত্মার পরিতৃপ্তির চেয়ে বেশী। আত্মা যে শুধু ভোগেই তৃপ্ত হন, তা তো নয়; কাহারও আত্মা হয়ত বৈরাগ্যেই তৃপ্ত, ত্যাগেই তাঁহার উল্লাস। সে ত্যাগ বিশ্বের হিতের দরুণও নয়, আত্মহিতের দরুণ; জগতের সেবা করিয়া হয়ত সাধককে বৈরাগ্যের খাজানা শোধ করিতে হয় না, সে চায় শুধু বৈরাগ্যের আনন্দে বৈরাগ্য! আর্টের দরুণ আর্ট, আমোদের দরুণ আমোদ—এই সব বুলি পণ্ডিতদের মতে মর্ষণীয়। আর বৈরাগ্যের দরুণ বৈরাগ্য, আত্মতৃপ্তির এই সনাতন ধরণটাই বা নিন্দনীয় হইবে কেন?

বৌদ্ধযুগে বুদ্ধত্বের শ্রেণীবিভাগ দেখিয়াছি। যিনি সম্যকসম্বুদ্ধ, তিনি ভূতহিতে উৎসৃষ্টপ্রাণ; তাঁহার বৈরাগ্যের দীপ্তি সংসারের অঙ্ককে উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। যিনি প্রত্যেকবুদ্ধ, তিনি আত্মানন্দে বিভোর, জগতের কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে, তাহার দরুণ তাঁহার বড় বেশী মাথাব্যথা নাই, কেবল কখনও একটু তেঁতুল বা দুটী লঙ্কার

প্রয়োজনে হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে লোকালয়ে নামিয়া আসেন। ইঁহার বৈরাগ্য যেন আকাশপ্রদীপের মত, সংসারের প্রাঙ্গণেই একাকিত্বের উচ্চমঞ্চে জ্বলিয়া কাহাকে যে আলো বিতরণ করে, তাহা বোঝা যায় না! আমরা আজকাল ইকনমিক্যাল, শক্তির অপচয় কোথায়ও সহ্য করিতে পারি না, বেকার সাধুদের ধরিয়া চর্‌কা কাটাইবার ফন্দি করি। এই প্রত্যেকবুদ্ধেরা যে আমাদের কাছে আমল পাইবেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমি ভাবিতেছি আর একটা কথা। দেশের হৃৎপিণ্ডে যখন প্রাণের স্রোত বহিতে থাকে, তখন এমনিধারা বেহিসাবী অপচয় ঘটেই—সেইটাই তার শোভা, তার বীর্য্য, তার গৌরব। দু'চার হাজার একান্ত বিরাগীকে ছাড়িয়া দিয়াও তখন দেশের কাজ চলে, তাই দেশ ওই খোস্‌খেয়ালীদের তেঁতুললঙ্কার বরাদ্দটুকু ছাঁটিয়া ফেলিবার প্রয়োজন অনুভব করে না! মিছামিছি উত্তরমেরু আবিষ্কারের ঝোঁকে ও-দেশের লোক প্রাণ দেয়, লাভ-লোকসান খতাইয়া নয়, শুধু প্রচুর প্রাণ আছে বলিয়াই, হৃৎপিণ্ডে রক্তস্রোত মন্থর হইয়া যায় নাই বলিয়াই! তাহাদের যদি ক্ষমা করিতে পারি, তো যাহারা প্রাণের প্রচণ্ড আবেগে সংসার হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া ধূমকেতুর মত নিঃসঙ্গ একাকিত্বে অনন্তের পথে জ্বলিতে জ্বলিতে ছুটিয়া যায়, তাহাদের জন্যও বা গর্ব্ব অনুভব করিব না কেন? আমি তো মনে করি, এই বিবিক্তসেবীরা মেরু-যাত্রীরই প্রাচ্য সংস্করণ!

মানুষের যাহা ইচ্ছা খুসী করিতে পারে কখন? যখন তাহার সঞ্চয় অফুরন্ত। সে খুসীতে কাহাকেও পীড়িত করিতে পারে না, কাহারও অধিকার খর্ব্ব করে না। দাবী আর কর্ত্তব্য নিয়া প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে একটা সূক্ষ্ম ভেদের কথা শুনি; প্রায়ই শুনি, তাহাদের ধর্ম্ম হইতেছে দাবী করা, এই-জন্য তাহারা ভোগী; আর আমাদের ধর্ম্ম হইতেছে কর্ত্তব্য পালন করা, এইজন্য আমরা ত্যাগী। কথাটা সত্য; ত্যাগ ও কর্ত্তব্যকে হীন করিতে চাহি না। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া অবাক্ হই, উহাদেরই বা এত দাবী সমাজ অম্লানবদনে সহিয়া চলে কেন? আমাদের চারিদিকে যে কেবল বেড়া জালে ঘেরা, কেবল কর্ত্তব্যের রক্তচক্ষু, একটু আবদার, একটু দাবী শোনাইবার উপায় নাই, অমনি হাজারো জনের প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়া মস্তকে অঙ্কুশপাতের আয়োজন করা হইবে। অথচ সে সব কর্ত্তব্যও কত ছোট! যে যুবক দেশের কাজে প্রাণ উৎসর্গ করিতে চায়, অতএব যে সঙ্কল্প করিয়াছে বিবাহ করিবে না, তাহার প্রতি পিতামাতার ও পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডাকাঙ্ক্ষার দাবী আছে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারও একটা দাবী আছে, এমন কি বৃদ্ধা পিতামহীও মোমের পুতুলের মত একটী নাত-বৌয়ের মুখ দেখিবার দাবী করিয়া বসিয়া আছেন! তাঁহাদের এই হাজারো গণ্ডা দাবী আমার কাছে হইবে কিনা পরম উপাদেয় কর্ত্তব্য! বাস্তবিক, দাবী আর কর্ত্তব্য একটা জিনিষেরই এপিঠ আর ওপিঠ নয় কি? আর আমরা কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া যতই জাঁক করি না কেন, অধিকাংশ স্থলে উহা কেবল মাত্র সঙ্কীর্ণতার দাবী মেটানোরই রূপান্তর নয় কি?

আসরে যদি জায়গা থাকে তো অনায়াসে হাত পা খেলাইয়া নাচা চলে। এক জায়গায় ঘিঞ্জি হইয়া বসিয়া থাকিলে তাহা সম্ভব নয়। সঙ্কীর্ণতা আর ঔদার্য্যের তফাতই এই। প্রাণের প্রকাশের পরিসর ক্ষেত্র চাই; একটু তলাইয়া দেখ, ওখানেই ত্যাগের জন্ম। ত্যাগের জন্ম উন্মুক্ত আকাশে, উদার সূর্য্যালোকের মাঝে; সৌরকরোজ্জ্বল চিত্ত যার, শক্তিতে যে স্ফুরন্ত, আবেগে দুর্ম্মদ, তিতিক্ষায় নিষ্কম্প—সেই ত্যাগী হইতে পারে। দাবী যার

প্রকাণ্ড, ত্যাগও তার সুমহান্। আমরা ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, সংসার-পাকে কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকিতেই ভালবাসি, গুটীর মায়ায় উদার আকাশ আর রঙ্গীন পাখাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ভাবি, সংসারের কার-বারে খুবই জিতিয়া গিয়াছি! আমরা আবার ত্যাগী?

সংসার-কর্ত্তব্যের কথা আর কি স্মরণ করাইয়া দিবে? সংসার আমাদের ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। বদ্ধ বায়ু, রুদ্ধ আলোক—বিবরবাসী ছুছুন্দরের মত আলোকের অকস্মাৎ আঘাতে চঞ্চল হইয়া কেবল অন্ধকারেই সঞ্চরণ—এই তো আমাদের জীবন! এই আড়ষ্ট পূতিগন্ধময় জীবন হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য একটী প্রাণও যদি আকুল হইয়া উঠে তো তাহাকে অভিনন্দিত করিব। সে যদি আর কিছু না চায়, না বোঝে—চায় শুধু একটু-খানি আলো আর হাওয়া, জাগে শুধু শুদ্ধ-শান্ত মহিমার প্রতি আত্মপ্রাণের তীব্র পিপাসা, তবেই তাহাকে ধন্য মনে করিব। সে সম্যক-সম্বুদ্ধ না হউক, বিশ্বহিতের দরদী না হউক, সে যে এই গলিত পারিপার্শ্বিক হইতে ছুটিয়া পলাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে, ইহাই তো সম্যক-সম্বুদ্ধের প্রথম আবাহন-গীতি। যিনি পঙ্কোদ্ধার করিতে এই কুণ্ডে নামিবেন, ইহাদেরই একজন হইয়া ইহাদের দরুণ প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন, তিনি নমস্য; তাঁহার আশাতেই ঊর্দ্ধমুখ হইয়া চাহিয়া আছি। কিন্তু যিনি আর কিছু না করুন অন্ততঃ এই গতানুগতিকতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া একটা নূতন আদর্শের আলোকেও আমাদের চক্ষুকে ধাঁধিয়া দিবেন, তাঁহাকেও অভি-নন্দিত না করিয়া পারি না।

চাই প্রাণের উত্তাপ, সেই উত্তাপে টগবগ করিয়া ফুটিতে চাই। প্রাণের এই উত্তালতাকে ধারণ করিবার পক্ষে আমাদের সংসার নিতান্তই সঙ্কীর্ণ ইহা দিনের পর দিন চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াও কি চৈতন্য হইতেছে না? তাই ইহার উপর আজ যে আকারেই আঘাত আসিয়া পড়ুক না কেন, বুক পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, মহাকালের উদ্যত ত্রিশূলফলকের অগ্রে এই নির্ম্মমপ্রশ্ন আমাদের প্রতি—আমরা বাঁচিয়া আছি কি?

ভাগবতের সূচনা

সরস্বতীর তীর। এইমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। নবোদিত সৌরকিরণে সরস্বতীর প্রসন্ন জলরাশি গলিত স্বর্ণস্রোতের মত প্রবাহিত হইতেছে।

নদীর তীরেই ভগবান্ বাদরায়ণের আশ্রম, মৃৎ-কুটীরে সজ্জিত ঋষির অনাড়ম্বর আশ্রম—এই ভারতের সুবর্ণযুগের বিশ্ববিদ্যালয়। মানবের অধ্যবসায়ের সহিত অতিমানবের যোগবল সম্মিলিত হইয়া বাদরায়ণের প্রতিভা এইখানে এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত করিয়াছে। আর্য্যজাতির জ্ঞানভাণ্ডারের রত্নসমূহ যুগবিপ্লবে দিগ্‌বিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, অসীম ধৈর্য্যের সহিত ব্যাস তাহা এইখানে বসিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন, সাজাইয়াছেন, শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন; শুধু আর্য্যঋষির হৃদয়ে প্রোদ্ভাসিত বেদবাণীরই সংগ্রহ নয়—লোকমুখে শ্রুত, নানা লোকাচার দেশাচারের সহিত জড়িত কত কিম্বদন্তী, গাথা, প্রাচীন কাহিনী—এ সমস্ত সংগৃহীত,

শ্রেণীকৃত ও সম্পাদিত হইয়াছে। এই বিপুল সাধনার ধন যাহাতে হেলায় না নষ্ট হইয়া যায়, তাই যোগৈশ্বর্য্যবান্, মহাপ্রতিভাশালী ব্যাসশিষ্যেরা গুরুর নিকট হইতে যত্ন সহকারে এই সমস্ত, বিদ্যা অধিগত করিয়াছেন, আবার শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে তাহাদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থাও করিয়াছেন ও করিতেছেন। এমনি করিয়া চতুর্ব্বেদে পৈল, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন ও সুমন্তু এবং ইতিহাসপুরাণ-রূপ পঞ্চম বেদে শৌনক-পিতা রোমহর্ষণ মহামহোপাধ্যায়ের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। বেদপাঠে, ইতিহাসপুরাণের আলোচনায়, শাস্ত্রব্যাখ্যায়, দর্শনের বাগ্‌যুদ্ধে সরস্বতীর তীর মুখরিত। সরস্বতীতীরে বদরিকাশ্রমে (আচার্য্য শ্রীধরের ইহাই মত) বাদরায়ণের জ্ঞানসত্র; যুগযুগান্তর হইতে একটা বিরাট্ জাতি যাহা ভাবিয়াছে, যাহা পাইয়াছে, সমস্তই এক জায়গায় সঞ্চিত, অনুশীলিত ও অধিগত হইতেছে—মহা-ভারতের অনাগত রূপ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়া ব্যাস এইখানে বসিয়া তাহার আদর্শ রচনা করিতেছেন; আজ এইখানে বসিয়া অমোঘ শক্তিবলে যে বিধি-বিধান তিনি রচিয়া দিবেন, যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বিনীত শিষ্যের মত ভারত সেই পথ অনুসরণ করিবে—ইহা তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন।

মধ্যাহ্নতপনের মত মহাপ্রতিভাশালী এই বাদরায়ণ, কিন্তু নারীরই মত সুকোমল তাঁহার হৃদয়। সমগ্র মানবজাতির দরুণ বেদনার ভারে সে হৃদয় নুইয়া পড়িয়াছে। একটা যুগ কালের যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল, ভবিষ্যতের রঙ্গপীঠে ওই নবযুগের সূচনা দেখা যাইতেছে। জিগীষাপরায়ণ আর্য্যজাতির যৌবনের প্রমত্ততা যেন অনিন্ধন অগ্নিকুণ্ডের মত ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া পড়িতেছে! আর্য্যসভ্যতার মহাপ্লাবনে যুগের পর যুগ ধরিয়া ভারতমাতার বুকে কত ধ্বংসের লীলা, কত নবসৃষ্টির সূচনাই না অভিনীত হইয়াছে। আর্য্য-প্রতিষ্ঠার প্রবল বন্যায় রাক্ষস-সভ্যতা, অসুরসভ্যতা দানবসভ্যতা, গন্ধর্ব্বসভ্যতা, বানরসভ্যতা, ঋক্ষসভ্যতা, —সব কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। সকলকে চূর্ণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া আর্য্যগরিমা এইবার বুঝি জাতিদর্পের তুঙ্গশৃঙ্গে আরূঢ় হইল, আর তাহার পতনের ভয় নাই! কিন্তু দীর্ঘদর্শী বাদরায়ণ দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের রজতোচ্ছ্বাসে অমানিশার করাল সূচনা। যুগধর্ম্মের ব্যতিকর আসন্ন, বিষম কাল সমুপস্থিত। যে ভৌতিক (Physical) শক্তির সমুচ্ছ্বাসবশতঃ দিগ্বিজয়ের মত্ততায় আর্য্যজাতি দেশে দেশে হানা দিয়া ফিরিত, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে তাহার চরম পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; এইবার জাতির ভাগ্যে "ভৌতিকানাঞ্চ ভাবানাং শক্তিহ্রাসঃ" অবশ্যম্ভাবী। ইহার ফলে কি হইবে? বাদরায়ণ শিহরিয়া উঠিলেন—দেখিলেন, ভারতের আর্য্য-অনার্য্য সমস্ত জাতি ঘুঁটিয়া মহাকাল সিদ্ধিপাত্রে এক অপরূপ পানীয় মন্থন করিয়াছেন, তাহাই পান করিয়া আবেশে তাঁহার দুটী চক্ষু ঢুলুঢুলু, প্রমথনাথের তৃতীয় নয়ন হইতে আর মদনদহন তীব্র জ্বালা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে না, স্তিমিত-দীপ্তি নয়নের সম্মুখে নেশার ঘোরে তিনি যে বিকল স্বপ্ন রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাই ভারতের ভবিষ্য রূপ। মহাকালের স্বপ্নালস দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা পঙ্গু জাতি—

> অশ্রদ্ধাধানা নিঃসত্ত্বা দুর্ম্মেধা হ্রসিতায়ুষঃ।
> দুর্ভগা জনাঃ—

—শ্রীধরের ভাষায় "শ্রদ্ধাহীন, ধৈর্য্যহীন, মেধাহীন, তেজোহীন, ভাগ্যহীন" একটা ক্লীব-জাতি। বাদরায়ণ আরও দেখিলেন, জাতীয় যৌবন-সুলভ জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া আর্য্য-জাতির লেলিহান

রসনা কেবল বাহিরকেই গ্রাস করিতে ছুটিয়াছে, ভিতরে যে দিন-দিন কত আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে, সেদিকে তাহার খেয়াল নাই। বেদ-পন্থী সমাজ বেদকে—তাহার আত্মাকে কেবলই বর্জ্জনের ভিতর দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে; বেদাচারে যাহাদিগকে অনধিকারী বিবেচনা করিয়াছে, তাহাদিগকেই সে গণ্ডীর বাহিরে রাখিয়াছে, তাহাদের চিত্তোন্নয়নের দরুণ নূতন কোনও ব্যবস্থা করে নাই। এমনি করিয়া অন্তর্ব্বাটীতে স্ত্রীজাতি এবং বহির্ব্বাটীতে শূদ্রজাতিই যে উপেক্ষিত হইয়া সমাজের ভার বাড়াইয়াছে, তাহা নয়, ত্রৈবর্ণিকের মাঝে ভ্রষ্ট দ্বিজবন্ধুর সংখ্যাও আজ নিতান্ত অল্প নয়। ইহারা বেদানুকূল শিক্ষাদীক্ষার ধার ধারে না, অথচ আর্য্যামির বড়াই করিয়া স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রের কাছে আপনার পসার বাড়াইয়া সমাজকে রসাতলের দিকে টানিয়া নেয়। আশু ইহার প্রতিরোধ না করিতে পারিলে একদিন হয়ত এই স্ত্রীতন্ত্র (Feminism) আর শূদ্রতন্ত্রই (Proletariate) দ্বিজবন্ধুদের মূঢ় নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া আর্য্যসভ্যতাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দিবে। বাদরায়ণ শিহরিয়া চক্ষু মুদিলেন।

করুণায় বিগলিত হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "অব্যক্ত এই কালের গতি; যুগে যুগে যুগধর্ম্মের ব্যতিকর ঘটিয়া আসিতেছে, কে তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইবে? কিন্তু তবুও তো চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। তীব্র প্রতিকূল স্রোতকে বিপুল বিক্রমে অতিক্রম করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইব, সে সাধ্য হয়ত নাই; কিন্তু পরপারকে লক্ষ্য করিয়াই প্রতিকূল স্রোতকে অঙ্গীকার করিয়াও তো তরী ভাসাইতে পারি। প্রকীর্ণ বেদসম্পৎকে শৃঙ্খলিত ও পুঞ্জীকৃত করিয়াছি; ইহাই জাতির আত্মার প্রসাদ। কিন্তু এই আত্মজ্যোতিঃ ব্রহ্মবর্চ্চসের দীপ্তিতে তাহার দেহেও ফুটিয়া উঠুক, ইহাও তো চাই। স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুকে আমরা বেদ শুনিতে দিই নাই। জাতির আত্মশুদ্ধির দরুণ ইহা প্রয়োজন; তাহা স্বীকার করি। ইহারা মূঢ়, দিব্যজ্ঞানের অধিকারী নয়, কর্ম্মই ইহাদের শ্রেয়ঃ। কিন্তু তা বলিয়া ইহাদিগকে উপেক্ষা করাও তো চলে না। ত্রয়ী ইহাদের শ্রুতিগোচর না হউক, আম্নায়ের যাহা অর্থ, বেদের যাহা মর্ম্মচর রহস্য, যাহাতে মানবাত্মার বলাধান হয়, কর্ম্মজগতেও জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়, তাহা হইতে ইহাদিগকে বঞ্চিত করা কেন? স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধুরও শুদ্ধি প্রয়োজন; ইহাই সমাজের কায়শুদ্ধি। আত্মরক্ষার জন্য আত্মশুদ্ধি যদি প্রয়োজন হয়, কায়শুদ্ধিও তাহার চেয়ে কম প্রয়োজন নয়। অতএব স্ত্রী-শূদ্রেও যাহাতে বেদার্থ অবগত হইতে পারে, ধর্ম্মের রহস্য জানিতে পারে, তাহার দরুণ লৌকিক ভাষায় বেদপ্রচার অতি আবশ্যক। চতুর্ব্বেদের পরেও চাই পঞ্চম বেদ। চতুর্ব্বেদকে যদি বলি ভারত, তাহা হইলে স্ত্রীশূদ্রের কল্যাণে প্রচারিত এই মনোরম পঞ্চম বেদকে বলিব মহা-ভারত। বাস্তবিক মহত্তর ভারত, বিশালতর ভারত গড়িতে হইবে তো এই স্ত্রী-শূদ্রের অস্থিমজ্জা দিয়া—তাহাদেরই অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন দিয়া!"

সহস্র সহস্র বৎসর পর, বিংশ শতাব্দীর কাকলি-মুখর অগ্রসন্ধ্যায় প্রোলিটেরিয়ানিজম্ ও ফেমিনিজমের কোলাহলের মাঝে ব্যাসগোত্রের এক আর্য্যসন্তান আমি স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছি, মহামানবের মিলন-ক্ষেত্র সেই সরস্বতীতীরবর্ত্তী তপোবনের কথা, সেই "কৃপণ-বৎসল" "বিশাল-বুদ্ধি" কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কথা—আর্য্য প্রতিভা ও সম্পদের উত্তুঙ্গ শিখরে বসিয়াও যিনি অবজ্ঞাত স্ত্রী-শূদ্রের বেদনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, আর্য্য-অনার্য্য সকলকে মিলাইয়া-মিশাইয়া এক মহত্তর ভারতের আলেখ্য গণদেবতার লেখনীমুখে যিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন,

যাঁহার গীতা, যাঁহার ভাগবত, যাঁহার ব্রহ্মসূত্র বেদসমুদ্র মন্থন করিয়া আচণ্ডালকে অমৃত বিতরণ করিয়াছে ও করিতেছে!

সরস্বতীতীরে সূর্য্যোদয় হইতেছে। নদীতীরে সিক্তবসনে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে দ্বৈপায়ন সে গরিমা-ময় দৃশ্য দেখিতেছিলেন। দিকৃচক্রবাল হইতে বিচ্ছুরিত একটী স্বর্ণরশ্মি পঞ্চসায়কের শরের মত উষার কোমল বক্ষ ছুঁইয়া থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে; ঋষির ভাবৈকরস হৃদয় আলোড়িত করিয়া বেদবাণী মন্দ্রিত হইয়া উঠিল—

উদীধ্বং জীব অসুর্ন আগাৎ
অপ প্রাগাৎ তম—আ জ্যোতিরেতি!

—ওঠ, উর্দ্ধপানে ঠেলিয়া তোল আপনাকে, ওই যে আমাদের স্পন্দমান জীবন আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত, কোথায় চলিয়া গেল আঁধারের মায়া—চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া ওই আসিতেছে জ্যোতির প্লাবন!

তন্ময় হইয়া ঋষি এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। কিন্তু এ দৃশ্যে আজ কেবল আনন্দই তো ছিল না, কোথা হইতে বেদনার গুরুভার আসিয়া যেন বক্ষকে পীড়িত করিতে লাগিল। সরস্বতীর তীরে আজ বাদরায়ণ একা। পশ্চাতে বদরিকাশ্রমের আলেখ্য উষার কিরণস্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, প্রভাত-সমীরণে ব্রহ্মচারীদের উদাত্তকণ্ঠে ব্রহ্মঘোষ ভাসিয়া আসিতেছে—তবুও সরস্বতীতীরে বাদরায়ণ আজ নিজকে বড় নিঃসঙ্গ বলিয়া অনুভব করিলেন। প্রভাতকিরণের স্পর্শে সরোবরের স্বচ্ছ বক্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া যেমন বাষ্প-রাশি কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতে থাকে, তেমনি কোথা হইতে এক অনির্ব্বচনীয় বেদনা তাঁহার হৃদয়কে মথিত করিয়া ফিরিতে লাগিল। দ্বৈপায়ন বুঝিতে পারিলেন না, এ কিসের আকুলতা! ধীরে ধীরে তাঁহার বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিল, অতীতযুগের কথা—সেই বেদ ও বেদার্থ সংগ্রহ এবং প্রচারের অলৌকিক ইতিকথা, বদরিকাশ্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কথা! যৌবনের প্রারম্ভে যে মহান্‌ সঙ্কল্প হৃদয়ে জাগিয়াছিল, এতদিনে তো তাহার উদ্‌যাপন হইয়াছে। তন্ন তন্ন করিয়া নিজের জীবন অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কোথায়ও এতটুকু আবিলতা, কর্ত্তব্যের প্রতি এতটুকু অবহেলা জমিয়া রহিয়াছে, এমন তো নয়! যে ব্রত ধারণ করিয়া ছন্দঃসমুদ্র মন্থন করিয়াছেন, গুরুর সেবা করিয়াছেন, অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছেন, কোথায়ও বিন্দুমাত্র ছলনা করেন নাই, উচ্ছৃঙ্খলতায় কোনও অনুশাসনকে লঙ্ঘন করেন নাই, সেই মহাব্রতের উদ্‌যাপন তাঁহার চিত্তকে শান্তি দিতেছে না কেন? জগতে কাহার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রহিয়াছে? মহাভারত রচনার ব্যপদেশে আম্নায়ার্থ যে তিনি স্ত্রীশূদ্রাদির পক্ষেও সুলভ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতেও কি তাঁহার কাজ শেষ হয় নাই? দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুটকণ্ঠে তিনি বলিলেন—

অথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ।
অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চ্চস্যসত্তমঃ।

—স্বরূপে যিনি বিরাট্‌, অথচ এই দেহের পিঞ্জরে যিনি বন্দী, বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনজনিত তেজে সমুজ্জ্বল আমার সেই নিষ্কলুষ অন্তরাত্মা তবুও যেন অসম্পন্ন রহিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে—যেন আমার যাহা করিবার করা হয় নাই, এখনও যেন কিছু বাকী রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য!

ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যুতের মত একটা কথা তাঁহার হৃদয়ে খেলিয়া গেল। হাঁ, একটা কথা তো

এখনও বলা হয় নাই! বিধির কথাই বলিয়াছি, কিন্তু আনন্দের কথা তো বলি নাই। সাধনার কথা বলিয়াছি; সিদ্ধির কথা তো বলি নাই। একদিন আমিও বেদের অনুশাসন মাথায় পাতিয়া লইয়াছি, কিন্তু তাহার পরিশেষে পাইয়াছি কি? বন্ধন না মুক্তি? যে বিধি-বিধান আমি সমাজ-স্থিতির জন্য রচনা করিয়াছি, আমার জীবনের আনন্দের কষ্টিপাথরে তাহার মূল্য যাচাই করিয়া কি পাই? আমার বিধানই আমাকে কতটুকু বাঁধিতে পারিয়াছে? ব্রতচারীর বন্ধন-সাধনাই তো চরম নয়, পরমহংসের হৃদয়ের উদ্বেলিত সুধা-সিন্ধুর সন্ধানও তো আমি পাইয়াছি; অচ্যুতের প্রিয় যে **ভাগবত ধর্ম্ম**, সাধ্যসাধনার পরপারে সেই সহজানন্দের কথা তো এখনো আমি তেমন করিয়া বলি নাই! কেন?—সে কি আশঙ্কায়, সঙ্কোচে? এইখানেই কি আমার দর্শনের অপূর্ণতা? বুঝিতে পারিতেছি না!

আবার সেই অস্বস্তির বেদনায় যেন সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

দেবর্ষি নারদ এই সময়ে বীণায় ঝঙ্কার তুলিতে তুলিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৃদু-হাস্য করিয়া বাদরায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাভাগ পরাশর-নন্দন, আপনার দেহাভিমানী ও মনোভিমানী আত্মা দেহ-মনের প্রতি পরিতুষ্ট তো? আপনার যাহা কিছু জানিবার ছিল, তাহা জানিয়াছেন তো? আপনি মহাকর্ম্মী; বিশ্বের সমস্ত বিষয় আহরণ করিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছেন; সত্যসনাতন ব্রহ্মবস্তুর অন্বেষণ করিয়া তাহাকে অধিগতকরিয়াছেন। তবুও যেন মনে হইতেছে, আপনার যেন কিছুই করা হয় নাই—এমনি বিষাদ আপনাকে ছাইয়া রহিয়াছে!"

দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাদরায়ণ বলিলেন "আপনি যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক; আমি সব পাইয়াছি, সব করিয়াছি, কিন্তু তবুও কেন আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি না? আপনিও ব্রহ্ম-স্বরূপ, আপনার বুদ্ধি অগাধ, তাই আপনাকেই ইহার হেতু জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বচারী; আপনিই বলুন, আমার এই মহাব্রতে ত্রুটী কোথায়?

নারদ একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি ধর্ম্মের কথা অনেক বলিয়াছেন বটে; তাহাতে কি ভগবানের তৃপ্তি হয়? আপনি ভগবানের সুবিপুল লীলাকাহিনীর তো প্রায় কিছুই বর্ণনা করেন নাই। ধর্ম্মের কথা আপনি যেমন করিয়া বলিয়াছেন, তেমন করিয়া বাসুদেবের মহিমার কাহিনী তো বর্ণনা করেন নাই—আমার মনে হয়, এইখানেই আপনার দর্শনের ন্যূনতা।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

অচ্যুতের ভাববর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্ম্য, কিম্বা নিরঞ্জন জ্ঞান কোনটাই যথেষ্ট শোভা পায় না। আপনি শ্রুতিস্মৃতির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। ধর্ম্মকে আপনি মানুষের জীবনের সঙ্গে এমন করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন যে, কোথায়ও স্বাতন্ত্র্যে উচ্ছিত থাকিয়া তাহা বৈষম্য ঘটায় নাই; গীতায় প্রদর্শিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সাধনায় নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি ধর্ম্মজীবনের চরম পরিণতি। শ্রুতিবাক্যকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রে আপনি নিরঞ্জন জ্ঞানকে করামলকবৎ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহার জ্ঞান, যাঁহার কর্ম্ম—তিনি কোথায়? বিশ্লেষণপথের সমস্ত সন্ধানই পাইলাম, কিন্তু সংশ্লেষণের খবর কে দিবে? কর্ম্ম ও জ্ঞানের রহস্য জানিলাম, কিন্তু ভাবজগৎকে আবিষ্কার করিবে কে? এইখানেই আপনার দর্শনের ন্যূনতা। আপনার দৃষ্টি অকুণ্ঠিত, আপনার চরিত্র নির্ম্মল, আপনি সত্যসন্ধ ও সঙ্কল্পে অটল, আপনার প্রতি আমার এই অনুরোধ—

সমাধিনানুসর তদ্বিচেষ্টিতম্

আপনি সমাধিযোগ দ্বারা ভগবানের লীলার অনুসরণ করুন। যে বেদনার ভারে আপনার চিত্ত পীড়িত, তাহা অপসারিত হইবে, আপনার দর্শন পূর্ণাঙ্গ হইবে।"

নিয়তির নিয়ন্তা

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তা ছাড়া ন্যায়ের আর একটা বিধান অনুসারে এই কর্ম্মবিধানকে তোমাদের মানতে হবে দার্শনিকেরা সে বিধানকে বলেন যাথাতথ্যের বিধান সচরাচর যা ঘটছে এমন স্বাভাবিক যুক্তি দিয়ে যদি একটা কিছু বোঝান যায় তো অস্বাভাবিক, কষ্টকল্পিত আন্দাজী ব্যাখ্যার দরকার কি? কর্ম্মবিধানে তুমি পাও জগতের একটা স্বভাবসঙ্গত ব্যাখ্যা— যেমনি সরল, তেমনি বৈজ্ঞানিক। এটাকে ছেড়ে আর অন্য কোন যুক্তিতর্কের আশ্রয় নেবার কোন প্রয়োজন নেই।

একটা কথা উঠবে। বৈজ্ঞানিকেরা বলবেন, না, না, তা কি হয়! সদ্যোজাত শিশুর মাঝে যে বিভিন্ন প্রবৃত্তির লীলা দেখতে পাচ্ছি, তা কি কর্ম্মবিধান অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে হবে? তা কেন! বংশানুক্রম-বাদ দিয়ে আমরা তার ব্যাখ্যা করব।

হাঁ, বংশানুক্রমবাদ দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যায় বটে, কিন্তু বেদান্ত বলছেন, কর্ম্মবিধান তো বংশানুক্রমবিধানের বিরোধী নয়। বংশানুক্রমবিধান কর্ম্মবিধানেরই অন্তর্গত, তার সমস্ত সিদ্ধান্তই এ থেকেই পাওয়া যেতে পারে; মরবার সময় যে শক্তির অপচয় হয়, তার পুনঃপ্রকাশ কর্ম্মবিধান থেকে বুঝতে পারি, বংশানুক্রমবিধানে তো তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। কাজেই বংশানুক্রমবিধানের চেয়ে কর্ম্মবিধানের ওপরেই দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদের বেশী টান হওয়া উচিত।

কর্ম্মবিধান কি করে বংশানুক্রমবিধানের সমর্থন করে? মানুষ যখন মরে, তখন মনে হয়, তার সব বাসনা বুঝি নিভে গেল। বেদান্ত বলেন, তা হতে পারে না। বাতিটা যখন পুড়ছে, তখন মনে হয় বটে যে পল্‌তে আর মোম বুঝি নষ্ট হয়ে গেল। রাসায়নিক সন্নিকর্ষের নিয়ম অনুসারে তখন কার্ব্বন মিলে অক্‌সিজনের সঙ্গে, হাইড্রোজেন যায় অক্‌সিজেনে। তেমনি মানুষ মরবার পরও তার বাসনাগুলো অর্থাৎ তার মননশক্তি বা লিঙ্গদেহ আধ্যাত্মিক সন্নিকর্ষের ফলে (ভৌতিক সন্নিকর্ষ যদি বল তো তাতে আপত্তি নেই) পিণ্ডীভূত হয়। তোমার সমস্ত মননশক্তি এমন একটা ভূমি আশ্রয় করে, যেখানে পারিপার্শ্বিক সর্ব্বতোভাবে তার বৃদ্ধির অনুকূল হয়, তাকে পুষ্ট করে, সফল করে। অর্থাৎ বিভিন্ন বাসনার সমবায় তোমাকে এমন একটা জায়গায় টেনে নিয়ে যায়, যেখানে অনুকূল ভূমি পেয়ে তোমার অনুপচিত শক্তি আর অপূর্ণ বাসনা সফল হয়, বাস্তব হয়।

এমনি করে জন্মের সময় সবাই আপন বাপ-মা বেছে নেয়। মানুষটা বেঁচে থাকতে কত কামনা-বাসনাই না করে। তার অধিকাংশ বাসনাই হয়ত জীবদ্দশায় সফল হয়, কিন্তু কতকগুলি আবার হয়ও না। এগুলির কি হবে? এগুলি কি অজ্ঞাত অখ্যাত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে? না, তা কেন? কুঁড়ি দেখলেই মনে হয় এ ফুল হয়ে ফুটবে। ফোটার সম্ভাবনা একদিন সার্থক হয় বটে। মানুষের বাসনাই বা কেন পর্য্যুদস্ত হবে? প্রকৃতি মানুষকে ব্যঙ্গই কর্ব্বে কেন? তাকে তো ব্যঙ্গ করবার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তার সমস্ত বাসনাই সার্থক হবে। আমাদের অনেক বাসনা এই জীবনেই সার্থক হয়। তখন দেখি, বাসনাই কর্ম্মে পরিণত হয়, বাসনাই কর্ম্মের উদ্যোক্তা। কিন্তু অনেক মনোবাসনা আবার সফল হয়ও

না—তাদের কি হবে? বেদান্ত বলেন, মানব, ভগবান তোমায় তাচ্ছিল্য করবেন না। তোমার অপূর্ণ বাসনা ও অতৃপ্ত শক্তি যদি এ জগতে না পূর্ণ হয় তো পর জগতে হবে।

এইখানে আর একটা কথা। পূর্ব্বজন্ম যদি ছিল, মরবার পর আবার যদি আমাদের জন্মাতে হয় তো অতীত জন্মের কথা আমাদের স্মরণ থাকে না কেন? বেদান্ত জিজ্ঞাসা করছেন, আচ্ছা, স্মৃতিটা কি? এই তো রাম তোমাদের সাম্‌নে বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। ভারতবর্ষে থাকতে রাম কোনও দিন ইংরাজীতে বক্তৃতা দেননি, তোমাদের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বলবার সময় মাতৃভাষায় এক বর্ণও তাঁর মনে আসছে না। কিন্তু সে ভাষা কি তাঁর মন থেকে লোপ পেয়ে গেছে? না, সে ঠিক আছে। আরবী, ফারসী, কি যে-কোনও ভারতীয় ভাষা ইচ্ছা করলেই রাম এক মুহূর্ত্তে আবার স্মরণে আন্‌তে পারেন। তাহলে স্মৃতিটা কি? তোমার মনটা যেন একটা জলাশয়। ফারসী, আরবী, সংস্কৃত বা ভারতীয় ভাষাগুলো এই জলাশয়ের তলে তলিয়ে আছে। তুমি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্ত্তে জলাশয়কে আলোড়িত করে তাদের ওপরে টেনে আনতে পার; এইটাই হচ্ছে স্মৃতি। তুমি তো জান কত কিছুই, কিন্তু সবই তো মনে ভাস্‌ছে না। মনকে আলোড়িত করলে পর এগুলো তোমার মনে ভাসে, তাদের ওপরে টেনে তুললে তবে তারা মনে পড়ে।

বেদান্ত বলছেন, তোমার অতীত জন্ম-মৃত্যু সমস্তই তেমনি জ্ঞানসমুদ্রের তলায় তলিয়ে আছে। তারা আছে নিশ্চয়ই। সম্প্রতি তারা তলে আছে, ওপরে ওঠেনি। যদি গত জন্ম স্মরণ করতে চাও তো সে খুব কঠিন কিছু নয়। চিৎসমুদ্রকে আলোড়িত করে যা খুসী তাই তুমি জাগিয়ে নিতে পার। ইচ্ছা করলে অতীত জন্মের স্মৃতি সব জাগানো যেতে পারে, কিন্তু তা করে কোনও লাভ নেই, কেননা আর একটা আইন আছে—ক্রমবিকাশ বিধান—সে তোমায় ঠেলছে কেবল সমুখ পানে; তাই তোমায় কেবলি এগিয়ে যেতে হবে। গতস্য শোচনা নাস্তি; যে গেছে, সে গেছে; তাকে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার তো দরকার নেই—তোমায় এগিয়ে যেতে হবে যে!

জগতে কত কিছু দেখ্‌ছ, কত কিছু মনে হচ্ছে, কত বস্তুর ওপর তোমার মমতার আকর্ষণ; কেন, তা জান? বেদান্ত বলেন, কর্ম্মবিধান অনুযায়ী তারা তোমার কাছে এত ভাল লাগে। তারা তোমার কাছে এত আপনার বলে মনে হয় কেন? একদিন তুমি যে তাই ছিলে। পাষাণের মাঝে একদিন তুমি সুপ্ত ছিলে, নদীস্রোতে বয়ে চলেছ, তরুলতার সঙ্গে বেড়েছ, বন্য পশুর সঙ্গে বিহার করেছ, তাই আজ তাদের আপন বলে চিন্‌তে পারছ। আর একটা যুক্তি দিয়ে এ কথা প্রমাণ করতে পারি।

যুক্তিটা কিন্তু প্লেটোর একটা সিদ্ধান্তেরই একটু রকমফের। পূর্ব্বস্মৃতি কাকে বলে? পূর্ব্বে যা অনুভব করেছিলাম, এখন তাকে স্মৃতিপথে জাগিয়ে তোলা, তাকেই বলে পূর্ব্বস্মৃতি। ধর, দুজন লোক এখানে বক্তৃতা শুনতে আসে—একেবারে মাণিক-জোড়। এই হলে সাতটা লেক্‌চার পর পর তারা শুনতে এসেছে, কিন্তু অষ্টম লেক্‌চারটা শুনতে এলো মোটে একজন। লোকে দেখলেই কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমার বন্ধুটী কোথায়? এমন প্রশ্ন জাগে কেন? এইটাই হচ্ছে পূর্ব্বস্মৃতির কাজ—একে সহচার-বিধানও বল্‌তে পার। দুটীকে যদি সর্ব্বদা এক সঙ্গে যুক্ত দেখি, আমাদের মনে দুয়ে মিশে যদি এক হয়ে যায়, তাহলে এর পরে একজনকে দেখলেই আমাদের আর একজনকে

মনে পড়বে। এমনি করে মস্তিষ্কের সংস্কার উৎপন্ন হয়, আর তাই থেকে পূর্ব্বস্মৃতি জেগে ওঠে। পূর্ব্বস্মৃতি হতেই বুঝি, যা এখন মনে পড়েছে, তা একদিন দেখেছি।

এখন তর্কের অবয়বগুলি এই। সব মানুষই মর্ত্ত্য; জন্ একজন মানুষ; অতএব জন্ মর্ত্ত্য। যত তোমার যুক্তি, তর্ক, ন্যায়, সব এই অবয়ব দুটীর উপর নির্ভর করছে—সব মানুষ মর্ত্ত্য, জন্ একজন মানুষ। শুধু এই দুটী অবয়ব উচ্চারণ কর, সিদ্ধান্তটা চেপে রাখ, কিন্তু দেখো পারবে না; পূর্ব্বস্মৃতির মত তোমার মনে চমকে জেগে উঠবে —জনও মর্ত্ত্য। সিদ্ধান্তটা পেলে কি করে? প্লাটোর পূর্ব্বস্মৃতিবাদের অনুসরণ করে নয় কি? হাঁ, তাই বটে। তিনটী অবয়ব রয়েছে—"মানুষ মর্ত্ত্য" "জন্ মানুষ", "জন্ মর্ত্ত্য", তিনটীর মাঝে দুটীকে সামনে ধরেছ—"মানুষ মর্ত্ত্য" আর "জন্ মানুষ।" এই দুটি সামনে ধরতে না ধরতেই—দার্শনিকেরা বলেন, আমাদের মন এমনি আইন-কানুনে বাঁধা —যে তৃতীয় অবয়বটি আপনা থেকেই মনে জাগে। সবার মনেই এমনি জাগে। কেন এমন হয়? মাণিকজোড়ের একটীকে দেখেই যেমন তার সঙ্গীটীর কথা আপনা হতেই মনে পড়ে যায়, এ-ও তেমনি নয় কি? আচ্ছা, এই পূর্ব্বস্মৃতি জাগে কি করে? মনের এই আইন আমাদের মস্তিষ্কে বাসা বাঁধল কি করে? এ-ও একটা পূর্ব্বস্মৃতি। পূর্ব্বস্মৃতি অর্থে পূর্ব্বজ্ঞান তো? শিশুর সঙ্গেও আমাদের তর্ক চলে, কেননা যে শিশুরই মস্তিষ্ক আছে সে শিশুরই তর্ক করারও ক্ষমতা আছে। একটু যদি সে ভাবতে জানে, আর তর্কের এই অবয়বগুলো তার সামনে ধরা যায়—সে-ও তা মেনে নেবে।

ধর আমরা ইউক্লিডের জ্যামিতির একটা প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করছি। ধাঁ করে আমরা সিদ্ধান্তে এসে পৌছলাম। পূর্ব্বস্মৃতির সহায়েই সিদ্ধান্তে পৌছেছি। আর এই পূর্ব্বস্মৃতি সবারই মস্তিষ্কে অনুস্যূত আছে। এই সব থেকে এই কথাটাই অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয় যে পূর্ব্বস্মৃতি তোমার মস্তিষ্কে যে বস্তুগুলি জাগিয়ে তোলে, তাদের সবার সঙ্গেই তোমার পরিচয় ছিল। পূর্ব্বস্মৃতির বশে মস্তিষ্কে যা জাগে, তার সঙ্গে পরিচয় থাকতে হলে স্বীকার করতেই হবে যে এক সময় না এক সময় তুমি এই সমস্ত বস্তুর সাক্ষাৎজ্ঞান লাভ করেছিলে। কিন্তু এ-ও জান যে বর্ত্তমান জন্মে কস্মিন কালেও তুমি এ সমস্ত জ্ঞান অর্জ্জন করনি। তাহলে এ জ্ঞান পেলে কোথায়? বেদান্ত বলছেন, এ তুমি পেয়েছ পূর্ব্ব কোনও এক জন্মে।

আর একটা সমস্যা। আচ্ছা, আমরা যদি আমাদের নিয়তির নিয়ন্তাই হলাম তো আমরা কেউ গরীব হতে চাই না, তবুও গরীব হই কেন? সবারই তো ইচ্ছা হয় যে বড়লোকের ঘরে জন্ম হোক্; তবুও তো গরীবের ঘরে আমাদের জন্ম হয়। এ কেমন করে হয়? বেদান্ত বলেন, একটা বিষয়ের তাৎপর্য্য ঠিক ঠিক বুঝতে হলে তাকে যথাযথ ভাবে বিচার করে দেখতে হয়। আধা-সত্যের ওপর ভরসা করো না। চারদিক থেকে সব যাচাই করে দেখ। আজ যে সবাই লণ্ডনের নগরপাল হতে চাইছে, এ কথা তো সত্য নয়। সবাই যে লক্ষপতি হতে চাইছে, তা তো নয়। একজন আজকাল সপ্তাহে পাঁচ টাকা উপার্জ্জন করছে; তার বড় জোর হপ্তায় সাত টাকা রোজগারেরই ইচ্ছা হবে! তার মনে তো কখনো জাগে না যে আমি লণ্ডনের নগরপাল হব।

তারপর আর এক দিক থেকে ব্যাপারটা বুঝে দেখ। মানুষ নানা অসঙ্গত আর অযৌক্তিক কামনাও করে। অবস্থার সঙ্গে ইচ্ছাকে তারা খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, তারা কামনার দাস হয়ে পড়ে। কামনাকে তারা বশে রাখতে পারে না, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা হাঙ্গামায় পড়ে নাস্তানাবুদ হয়।

আজকের আলোচনার সব চেয়ে রসাল জায়গাতে আমরা এলাম এখন। ধর, একটা লোকের পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করবার তীব্র ইচ্ছা। সে আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্ম, নীতি, নাম-যশ কিছুরই ধার ধারে না। এ সবের কোনও প্রয়োজন নাই—সে চায় শুধু পাশব-বৃত্তির চরিতার্থতা—অবাধ-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। এই লোকটা যেন মরল। (বিষয়টা বোঝাবার দরুণ এটা একটা কল্পিত দৃষ্টান্ত মাত্র।) বল দেখি, কেমন বাপ-মার ঘরে, সে জন্ম নিতে চাইবে ? তার যে কামনা, তাতে পণ্ডিত বাপের ঘরে জন্মানো প্রয়োজন নয়; যে মননশক্তি তাতে সঞ্চিত আছে, তা ধনীর গৃহের স্বচ্ছলতার মাঝেও তাকে টেনে নিয়ে যাবে না। তার শিক্ষিত সুসভ্য বাপ-মারও দরকার নেই। বেদান্ত বলেন, মানুষ যদি কেবল পাশববৃত্তির দ্বারাই আদ্যন্ত গঠিত হয় তো শূয়ার বা কুকুরের দেহই হবে তার পক্ষে সব চেয়ে উপযুক্ত আধার; কেননা সে দেহে তার আহারে বা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে কখনো নির্ব্বেদ আসবে না—অন্ধতমে তলিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ওই দেহ। অমনি দেহই সে পাবে। তার বাসনা পূর্ণ করবার দরুণ তাকে কুকুর বা শূকর হয়ে জন্মাতে হবে। এমনি করেই সে তার নিয়তির নিয়ন্তা—কুকুর-শূকর জন্মেও।

এ জগতে থেকে মানুষ যখন কিছু চায়, তখন সে বুঝতে পারে না তার ফল কি হবে, তার কামনা তাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে সে জানে না। তার পর বাসনার ফল যখন ফলতে সুরু করে, তখন কপালে করাঘাত আর ক্রন্দন! তখন যত ভাগ্যের দোষ, গ্রহের ফের—অশ্রুবর্ষণ আর দন্তঘর্ষণ! কাজেই বাসনা ব্যক্ত করবার সময়ও ভেবে দেখা উচিত তুমি কি করছ, এ বাসনার ফল কি দাঁড়াবে। তুমিই তো এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ডেকে এনেছ, আর কেউ তো নয়!

পূর্ব্বভারতের এক কবিকাহিনী রাম তোমাদের বলবেন। কবিটী একজন মুসলমান, যেমন চতুর তেমনি ভাল মানুষটী। এক রাজা তাঁকে বেজায় খাতির করতেন, তারই সভাসদ ছিলেন তিনি। একদিন রাজবাড়ীতে রাজার কাছে কবিতা আওড়িয়ে নানারকম মজাদার খোসগল্প করে তাঁর অনেক রাত হয়ে গেল। গল্প শুনতে শুনতে রাজা এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর আর ঘুমোবার কথা মনেই ছিল না, অনেক রাত হতে তবে তিনি শুতে গেলেন। রাণী জিজ্ঞেস করলেন, এত রাত করে এলে যে? রাজা বললেন, ভারী মজার মানুষ পেয়েছিলাম একজন—লোকটা এমন হাসাতে পারে! শুনে রাণীর ভারী কৌতূহল হল, তিনি খুঁটে খুঁটে কবির সম্বন্ধে সব কথাই শুনলেন, রাজাও শতমুখে তাঁর গুণ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। এমনি করে আরও ঘণ্টাখানেক তাঁরা জেগে রইলেন। ক্রমে তাঁদের শুতে রাত ভোর হয়ে গেল। রাণীর কিন্তু কৌতূহল এতই বেড়েছে যে পরদিন কবিকে তিনি অন্দরমহলে নিয়ে আসতে রাজাকে অনুরোধ করলেন। পরদিন কবি এসে রাণীর সামনে হাজির। বোধ হয় শুনেছ, ওদেশে সামাজিক রীতি-নীতি এখানকার মত নয়। ওদেশে মেয়েরা আলাদা থাকে, পুরুষদের সঙ্গে বিশেষ মেলা-মেশা করে না। হিন্দুরা ততটা না হোক্, মুসলমান মেয়েরা কিন্তু এমন ভাবে পর্দ্দানশীন থাকে যে স্বামী অথবা খুব বিশুদ্ধচরিত্রের লোক ছাড়া আর কেউ তাদের দেখতেই পায় না। রাজা তো রাণীকে. অন্দরমহলে নিয়ে এসেছেন। কবি সেখানে কবিতা আবৃত্তি করলেন, গান গাইলেন; মেয়েরা শুনে ভারী খুসী। কবি বললেন, চক্ষুর পীড়ায় বহুদিন কাতর ছিলাম, এখন আমি অন্ধ। বাস্তবিক তিনি কিন্তু অন্ধ ছিলেন না।

লোকটার কিন্তু মতলব ভাল ছিল না। তার ইচ্ছা ছিল, সে অন্দরমহলে থেকে যায়, তাকে

অন্ধ ভেবে মেয়েরাও তাকে সমীহ করবে না, স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করবে, কথাবার্ত্তা কইবে, চল্‌তে ফিরতে তার সাম্‌নে আর ঘোম্‌টা টেনে বেড়াবে না। তাকে অন্ধ ভেবে রাজাও কোন আপত্তি করলেন না, কাজেই লোকটা বাড়ীর ভিতরেই থেকে গেল। জানই তো, সত্য কোনও দিন গোপন থাকে না। সত্যকে ধূলিসাৎ করে দিলেও জেগে ওঠে, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। কিছুই গোপন রাখবার জো নেই—সব কথাই একদিন বেরিয়ে পড়বে।

একদিন কবি এক দাসীকে কি যেন আনতে বলেছে। বোধ হয় জান, ওদেশের বড় লোকেরা ভারী কুঁড়ে। কুঁড়েমিই হচ্ছে ওখানে বড়মানষাতীর চিহ্ন। তোমাকে যদি আপন হাতে কিছু না করতে হল, তা হলেই তুমি হলে সেখানকার বড় লোক; তোমাকে ধরাধরি করে গাড়ীতে কেউ বসিয়ে দিয়ে গেলে তুমি হলে বড় লোক; চাকরে এসে কাছা গুঁজে দিলে তুমি হলে বড়লোক; কেউ এসে তোমায় হাত ধরে হাঁটালেও বোধ হয় তুমি বড় লোক! পরনির্ভরতা হচ্ছে ওদেশে গৌরবের চিহ্ন। আত্মনির্ভরকে—আত্মপ্রতিষ্ঠাকে ওরা বলবে দাসত্ব! কবি যখন রাজবাড়ীতে সম্মানের পদ পেল, তখন বসবার জায়গায় নিজ হাতে একখানা চেয়ার সরিয়ে আনাও তার কাছে অসম্মানের কাজ! কাজেই সে দাসীকে হুকুম করল একখানা চেয়ার এনে দিতে। দাসী কর্কশ স্বরে জবাব দিল, তার এখন সময় নেই। এমন সময় আর একটী দাসী এসে হাজির হল। কবি তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে বল্‌ল, ওই ঘর থেকে একখানা চেয়ার এনে দে তো! দাসী বল্‌লে, চেয়ার নেই। কবি বল্‌লে, আচ্ছা, ওই জলপাত্রটা দিয়ে যা। দাসী বললে, এ ঘরে তো জলপাত্র নেই; আচ্ছা, আমি ও ঘর থেকে এনে দিচ্ছি। কবি বল্‌ল, হাঁ, ওই তো পাত্রটা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস না কি, যা, নিয়ে আয় বল্‌ছি। হুকুম তামিল করাবার ঝোঁকে তার আত্মবিস্মৃতি ঘট্‌ল। বাস্তবিক তাই হয়। এমনি করে মিথ্যাকে সত্যের পরিহাস সইতে হয়। লেডি ম্যাক্‌বেথ্‌ অন্যায় করেছিল, কিন্তু তা ছাপাতে পার্‌ল না। সত্য তাকে উন্মাদিনী করে দিল, অবশেষে ভিষকের কাছে তাকে আপনা থেকে সব বল্‌তে হল। এই হয়। এটাই হচ্ছে আইন। কবি যখন বল্‌ল, ওই যে দেখতে পাচ্ছিস্‌ না? দাসী আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াল না, ছুটে গিয়ে রাণীকে বল্‌ল, রাণী মা, ও লোকটা তো পাকা বদমায়েস, ও তো অন্ধ নয়। তখনি তাকে অন্দর-মহল হতে বের করে দেওয়া হল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তিন দিন পরে লোকটা বাস্তবিকই অন্ধ হয়ে গেল। কেমন করে হল? কর্ম্মবিধান বল্‌ছে, সে অন্ধ হয়েছে, আপন খুসীতে। সে তার নিয়তির নিয়ন্তা। নিজেই সে অন্ধতা ডেকে এনেছে, আর কেউ তো তাকে অন্ধ কর্‌তে যায় নি। তার বাসনা ছিল অন্ধ হবার, তাই সে অন্ধ হয়েছে। তারপর চোখ দুটী হারিয়ে এখন হয় তো সে কেঁদে আকুল হবে, দাঁত কড়মড় করবে, বুক চাপড়াবে!

(সমাপ্য)

মীরাবাঈ

মীরাবাঈ আমাদের নিতান্ত অপরিচিত নন। মীরা বাংলার মেয়ে নন, তবুও বাঙ্গালী তাঁহাকে যতটা আপন করিয়া লইয়াছে, তাহাতে তিনি বিদেশিনী বলিয়া চিত্তে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ হয় না, মনে হয় এ যেন আমাদের ঘরের মেয়ে, মারবাড়-মেবাড় তাঁর শ্বশুরঘর মাত্র। বাস্তবিক মারবাড়-মেবাড় মীরার ভক্তিকে তেমন আশ্রয় দেয় নাই, যেমন দিয়াছে বাঙ্গালীর নবাবিষ্কৃত প্রেমের তীর্থ শ্রীবৃন্দাবন। চিতোরের একলিঙ্গ মহাদেব দূর হইতে মীরার নমস্কার লইয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালার চির-আদরের নবলকিশোর ছিলেন তাঁহার বক্ষ জুড়িয়া! তাই বুঝি মনে হয়, মীরা আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

মীরার জীবনকথা বলিবার পূর্ব্বে দুইজন প্রসিদ্ধ চরিতকার তাঁহার সম্বন্ধে স্বল্পকথায় যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করি। মীরার জীবনের মর্ম্মরহস্যটি এই উদ্ধরণে প্রকট হইয়া পড়িবে।

বাঙ্গালায় ভক্তমাল সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মূল গ্রন্থ হিন্দীতে, রচয়িতা অগরদাসের শিষ্য শ্রীমৎ নাভাজী। এই ভক্তমাল গ্রন্থে মীরার সামান্য জীবনবৃত্তান্ত উল্লিখিত আছে। সেই প্রসঙ্গে শ্রীমৎ নাভাজী বলিতেছেন—

সদরিস গোপিন প্রেম প্রগট কলিজুগহিঁ দেখায়ো॥
নিরঙ্কুস অতি নিডর রসিক-জস রসনা গায়ো॥
দুষ্টন দোষ বিচারি মৃত্যুকো উদ্যম কীয়ো।
বার ন বাঁকো ভয়ো গরল অমৃত জ্যোঁ পীয়ো॥
ভক্তি-নিশান বজায়কে কাহূ তেঁ নাহি লজী।
লোক-লাজ কুল-শৃঙ্খলা তজি মীরা গিরিধর ভজী॥

—গোপীর প্রেম কেমন, কলিযুগে মীরা তাহা প্রকট করিয়া দেখাইয়াছেন। অতি নির্ভীক তাঁহার রসনা অঙ্কুশের তাড়না না মানিয়া রসিকের গুণগাথা গাহিয়াছে। দুষ্টলোক তাঁহার আচরণে দোষ ধরিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার একটী কেশও হেলাইতে পারে নাই—গরলও তিনি অমৃতজ্ঞানে পান করিয়াছেন। মীরা ভক্তির নিশান উড়াইয়াছেন, কাহাকেও তিনি লজ্জা করেন নাই। লোকলজ্জা, কুল শৃঙ্খলা ত্যাগ করিয়া তিনি ভালবাসিয়াছেন তাঁহার গিরিধারীকে।

এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া ভক্তমালের বাঙ্গালা আভাস রচয়িতা শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী বলিতেছেন—

একান্ত শ্রীকৃষ্ণভক্ত অনন্য মানস,
প্রেম-ভক্তি চমৎকৃত—কৃষ্ণ যাতে বশ।
অন্য কথা, অন্য চেষ্টা, অন্য সঙ্গ হীন,
কাম-ক্রোধ-লোভ আদি আপনা অধীন।
পিরীতি করয়ে শুদ্ধ, হৃদয় নিষ্কাম।

মীরা যখন শ্রীমৎ রূপগোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া—

পরম সুন্দরী বাঈ, অলপ বয়েস,
গোপী উদ্দীপনে রূপের হৈল প্রেমাবেশ।

মীরার জীবনরহস্য নাভাজীর একটী কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—"সদরিস গোপিন প্রেম।" রূপও মীরার মাঝে ইহাই দেখিয়াছিলেন। মীরার শব্দাবলীতে এই প্রেম কূল ছাপাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে যেন। কি তার আবেশ, কি তার করুণা, কি তার ঝঙ্কার! বাস্তবিক হিন্দীসাহিত্যে মীরার শব্দাবলী এক অপরূপ বস্তু। গোস্বামী তুলসীদাস, কেশবদাশ, সুরদাস প্রভৃতি রসিক মহাজনের রচনা রসে অতুলনীয় বটে, কিন্তু তাহাতেও যেন একটু দানা বাঁধিয়াছে, প্রেমভক্তির অনুভাবে একটু যেন পুরুষালীর ছোঁয়াচ রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু মীরার শব্দাবলীতে, শ্রীমৎ বিল্বমঙ্গলের ভাষায় বলিতে গেলে

—"মধুরং মধুরং মধুরং"—হৃদয়টী গলাইয়া যেন গানের স্রোতে মীরা ভাসাইয়া দিয়াছেন। দয়াবাঈ, সহজোবাঈ প্রভৃতি আরও নারী-রসিকার শব্দাবলী হিন্দীতে আছে, তাহাদের আবেগও অসামান্য—কিন্তু মীরার বাণীর কাছে তাহারা কিছুই নয়। রাজপুতনার প্রাদেশিকতার সম্মিশ্রণ থাকাতে মীরার ভাষাটীও এমন অপরূপ হইয়াছে যে শুদ্ধ ব্রজবুলিতে হইলেও বুঝি ও কথা এত মিঠা লাগিত না। আমরা ক্রমে ক্রমে মীরার অনির্ব্বচনীয় শব্দ ও ভাবের সহিত পাঠকদের পরিচিত করিব, তাহার পূর্ব্বে তাঁহার জীবন-কথা বলিয়া নিই।

মীরা জোধপুরের মেড়তা রাঠোর রতনসিংহের একমাত্র সন্তান এবং মেড়তার রাব দূদাজীর পৌত্রী। রতন-সিংহ মেড়তারাজ দূদাজীর চতুর্থ পুত্র। মারবারের কুড়কী নামক গ্রামে মীরার জন্ম হয়; এই গ্রামখানি এবং আরও এগারটী গ্রাম দূদাজীর নিকট হইতে রতনসিংহ নিজের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার দরুণ জায়গীর পাইয়াছিলেন। মীরার জন্মকাল সম্ভবতঃ ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে মেবাড় উদয়পুরের শিশোদীয় রাজকুলে মহারাণা সাঁগাজীর পুত্র কুমার ভোজরাজের সহিত মীরার বিবাহ হয়।

মীরার দেহান্ত কবে হয়, তাহার সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না। জোধপুর রাজষ্টেটের মুন্সী দেবীপ্রসাদ মীরার জীবনচরিত্রে, এক ভাটের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া ১৫৪৬ খ্রীঃ মীরার দেহত্যাগের তারিখ বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু এই সময় নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে দুইটী আপত্তি আছে। ভক্তমাল গ্রন্থে আছে, মীরার যশঃকথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে আকবর বাদ শাহ তানসেনকে লইয়া গোপনে বৈষ্ণববেশে মীরাকে দেখিতে যান। এই কিম্বদন্তী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, মীরার দেহত্যাগের সময় আকবর বাদশাহের বয়স মাত্র চারি বৎসর! (আকবরের জন্মকাল ১৫৪২ খৃঃ।) ইহা একবারে অসম্ভব। বিশেষতঃ আকবর চিতোরে গিয়া মীরার গান শুনিয়াছিলেন, ভক্তমালে এইরূপ উল্লেখ আছে; অথচ মৃত্যুর বহুদিন পূর্ব্বেই মীরা গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং এই দিক দিয়াও এই আখ্যায়িকার সামঞ্জস্য থাকে না। তবে এমন হইতে পারে যে আকবর বাদশাহের কাহিনীটী কিম্বদন্তী মাত্র। মীরার ভণিতাযুক্ত অনেক পদ হইতেই মীরার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি জানিতে পারা যায়, কিন্তু বাদশাহসম্পর্কিত কাহিনীর উল্লেখ তাহাতে কোথায়ও নাই। অবশ্য মীরা সে কাহিনী উল্লেখ না করিলেই যে তাহা মিথ্যা, এ কথা প্রমাণ করা শক্ত। কিন্তু মীরার ভক্তেরা মীরার ভণিতা দিয়া তাঁহার মুখে এমন সমস্ত কথা বসাইয়া দিয়াছে, সব দিক দেখিয়া বিচার করিলে যেগুলি মীরার উক্তি বলিয়া সাব্যস্ত করা কঠিন। তাহারাও যে এমন একটা অপরূপ সংবাদ সম্বন্ধে একটু উচ্চবাচ্য করিল না, ইহাতেও এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

আকবর বাদশার কাহিনীকে যদি কিম্বদন্তী বলিয়াও প্রত্যাখ্যান করা যায়, তথাপি গোস্বামী তুলসীদাসের সহিত মীরার পত্রব্যবহারের কথা সম্ভবতঃ সত্য, কেননা উভয়ের উত্তর-প্রত্যুত্তর এখন পর্য্যন্ত আমাদের হাতে মৌজুদ রহিয়াছে। গোস্বামীজীর জন্ম ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে। তাহা হইলে বলিতে হয়, মীরার মৃত্যুর সময় তুলসীদাস ১৪ বৎসরের বালক মাত্র। অথচ মৃত্যুর বহুপূর্ব্বেই গৃহত্যাগের প্রাক্‌কালে মীরা তুলসীদাসকে পত্র লিখিয়াছিলেন। এখানেও দেখি আর এক গণ্ডগোল।

ভারতেন্দু শ্রীহরিশ্চন্দ্র অনুমান করেন ১৫৬৩ হইতে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মীরাবাই দেহত্যাগ করেন। এই সময় ঠিক বলিয়া ধরিলে উপরোক্ত কিম্বদন্তী দুইটীর সঙ্গতি বজায় থাকে।

'কিছুদিন হইল, হিন্দীর সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'সুধা' তে মীরার পিতৃকুলের মেড়তিয়া রাঠোর ঠাকুর-গোপালসিংহজী মেবাড়, মারবাড় ও মেড়তার প্রাচীন ইতিহাসের সাহায্যে মীয়ার যে সংক্ষিপ্ত জীবনকথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কিন্তু মুন্সেফজীর সিদ্ধান্তকেই তিনি সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু আকবর সাহা অথবা তুলসীদাসের কিম্ব-দন্তী সম্বন্ধে তিনি কোনও উল্লেখই করেন নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটা প্রশ্ন উঠে। ইতিহাসের তরফ হইতে প্রমাণ হয়, মীরার গৃহত্যাগের তারিখ ১৫৩৮ খৃঃ হইতে ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তাহা হইলে মীরার বয়স তখন অনুমান ৪০ বৎসর। বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামীর সহিত যখন তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি তরুণী নন, প্রৌঢ়া। অথচ কৃষ্ণ-দাস বাবাজী বলিতেছেন, সে সময় তাঁহার "অলপ বয়েস।" ইহাই বা কি করিয়া সঙ্গত হয়? তবে মীরার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছিল; সৌন্দর্য্যের সহিত ভক্তির বিহ্বলতা সম্মিলিত হইয়া তাঁহার তারুণ্যকে যে বহুদিন পর্য্যন্ত অটুট রাখিবে, ইহাও অসম্ভব মনে করিতে পারি না।

ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া দেখিলে এইরূপ দুই চারিটী অসঙ্গতি ধরা পড়ে। অবশ্য তাহাতে মীরার জীবনের মূল ইতিকথার বিশেষ কোনও ব্যত্যয় হয় না, কিন্তু ভক্তের ভাববিহ্বল মস্তিষ্ক-সম্ভূত দুই চারিটী উপাদেয় কাহিনীকে বাধ্য হইয়া সংশয়ের বিষে জর্জ্জরিত করিতে হয়, এই মাত্র।

বলা বাহুল্য, বালিকা বয়স হইতেই মীরার ভক্তিভাবের স্ফুরণ হয়। গিরধরলাল তাঁহার ইষ্ট, এ কথা তাঁহার শব্দাবলীর ভণিতা হইতেই আমরা জানিতে পারি। গিরধরলালের প্রতি মীরা কিরূপে আকৃষ্ট হন, সে সম্বন্ধে দুইটি জনশ্রুতি আছে। কেহ কেহ বলেন, গিরধরলাল মেড়তা-রাঠোর রতনসিংহের গৃহদেবতা ছিলেন। একবার প্রতি-বেশীর এক কন্যার বিবাহ দেখিয়া মীরা তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন, "মা আমার বর কোথায়?" মাতা হাসিয়া গিরিধরলালের বিগ্রহ দেখাইয়া বলেন, "ওই যে তোর বর।" বালিকা অকপটে তাহাই বিশ্বাস করে, আর সেই হইতে মীরার—

"মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোঈ!"

আবার কেহ কেহ বলেন, গিরিধর বিগ্রহ রতন-সিংহের গৃহে পূর্ব্বাপর ছিল না, মীরাই সেখানে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। কাহিনীটী এই—একবার মীরার পিতৃগৃহে এক সাধুর সমাগম হয়। গিরিধরের বিগ্রহটী সাধুর নিকট ছিল, তিনি নিত্য উহার পূজা করিতেন। মীরা সাধুর নিকট বিগ্রহটি চাহিলেন, কিন্তু তিনি তাহা দিতে স্বীকৃত হইলেন না। মীরা বিগ্রহটির জন্য একেবারে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। মেয়ে তিন চারি দিন ধরিয়া না খাইয়া আছে দেখিয়া রতন সিং ও তাঁহার পত্নী সাধুটিকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বিগ্রহটি রাখিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। সাধু আপন ইষ্টদেবকে ছাড়িতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। বিগ্রহ লইয়া তিনি রতন সিংহের গৃহ ছাড়িয়া গেলেন। রাত্রে সাধু স্বপ্নে দেখিলেন যে গিরিধর আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "ভাল চাস্ তো আমাকে রতন সিংহের মেয়ের কাছে রাখিয়া আয়!" সাধু প্রভাতেই কুড়কী ফিরিয়া আসিয়া গিরিধরকে মীরার হাতে সঁপিয়া দিয়া যান।

অপরের সম্বন্ধেও এই প্রকার কাহিনী শোনা যায়; সম্ভবতঃ ইহা সর্ব্বসাধারণের উচ্ছসিত কল্পনা দ্বারা অর্পিত সাধুচরিত্রের একটি অলঙ্কার মাত্র।

আমাদের দেশে একটি রীতি আছে, কাহারও ভিতর অলৌকিক কিছু প্রকাশ পাইলেই অমনি তাহাকে পৌরাণিক কোন দেবতার অবতার হইতে হইবে। মীরার বেলাতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রবাদ আছে, মীরা পূর্ব্বজন্মে শ্রীকৃষ্ণের সখীদের

মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁহার প্রবল অনুরাগ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বর দেন যে "কলিযুগে আমি তোমার কাছে প্রকট হইয়া তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব।" মীরার শব্দাবলীতেও এই ধরণের দুই চারিটি কথা আছে, সম্ভবতঃ তাহা হইতেই এই প্রবাদের উৎপত্তি। একস্থানে মীরা বলিতেছেন—

মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
পূরব জনম কা হৈ কৌল।

—মীরার প্রভু গিরিধর নাগর, পূর্ব্বজন্মেরই তো এই প্রতিশ্রুতি ছিল।

আর এক জায়গায় আছে—

বহুত দিনা পে প্রীতম পায়ো
বিছুরণ কো মোহি ডররে॥
মীরা কহে অতি নেহ জুড়ায়ো
মৈনে লিয়ো পূরবলো বর রে॥

—অনেক দিন পর পাইয়াছি আমার প্রিয়তমকে, তাই পাছে সে ভুলিয়া যায়, এই আমার ভয়। মীরা বলেন, পরম স্নেহে দুইটী হৃদয় জুড়িয়া গিয়াছে, আমি যে পূর্ব্বেই এই বর লইয়াছিলাম।

আর এক জায়গায়—

পূর্ব্ব জন্মকী প্রীত পুরাণী
সো কুঁ ছোড়ী জায়।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর
ওর ন আরে মহাঁরা দায়।

—পূর্ব্বজন্মের সেই পুরাতন প্রীতি, সে কি কখনো ছাড়া যায়? গিরিধর নাগরই মীরার প্রভু, আর কাহাকেও যে আমার ভাল লাগে না।

"আমি জন্ম জন্মান্তরের উদ্দিষ্টা কৃষ্ণপ্রিয়া", এমনি একটী প্রেমরসপূর্ণ ভাব মীরার মনে থাকা বিচিত্র নয়। রসিকের অনুভবের ইহাই এক বিশেষত্ব, নিত্যসিদ্ধ ভাবের সন্ধান পাইলে পর মনে হয়, আমি যে আজই শুধু তোমার, তা তো নয়, যুগ যুগ ধরিয়া তুমি আর আমি যে এক! রসিকপ্রবর কেশবদাসেরও এইরূপ একটী উক্তি আছে—

অমর সুহাগ, ভাগ উঁজিয়ারো
পূর্ব্বপ্রীতি প্রগটাই হো!

—ওগো, চিরন্তন তোমার সোহাগ, উজ্জ্বল আমার ভাগ্য, তোমাতে আমাতে পূর্ব্বপ্রীতি বুঝি আজ প্রকট হইয়া পড়িল!

এই নিত্যসিদ্ধভাবের অভিব্যক্তি একটী মহাজন পদে বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। রাধিকা বলিতেছেন—

শিশুকাল হতে বঁধুয়ার সাথে
পরাণে পরাণে লেহা—
না জানি কেমনে কো বিহি গড়ল
ভিন্ন করিয়া দেহা!

নিত্যসিদ্ধভাব সাধ্যসাধনায় হৃদয়ে প্রকট হইলে সাধকমাত্রেরই মনে হইবে, "যতদূর চাই, কোথা কিছু নাই, তুমি আমি একাকার!" এই অখণ্ড ভাবটীকে ভাঙ্গিয়াই জন্মজন্মান্তরের কথা আসিয়া পড়ে। ইহাকে আর একটু জমাট্ করিয়া নিলেই পৌরাণিক কাহিনীর সহিত স্বচ্ছন্দে জোড়াতালি দেওয়া চলে। কিন্তু ইহাতে যে বিশেষ কি লাভ হয়, তাহা তো বুঝি না। "এই বুঝি সেই"—এই কথা মনে করিয়া একটা আনন্দ ও বিস্ময় আছে স্বীকার করি, কিন্তু "সেই" যে কে, তাহা না বুঝিয়া "এই"-কে মূঢ় ভাবে "সেই" কল্পনা করায় ইষ্ট না হইয়া বরং অনিষ্টই হইয়া থাকে। সময় সময় এই কল্পনা হাস্যকর হইয়া উঠে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় শুনিতাম, মহাত্মা গান্ধী রামজীর অবতার, আর চিত্তরঞ্জন তাঁর হনুমান! চিত্তরঞ্জনের স্বদেশবাসীরা তাঁহার এই হিন্দুস্থানী খেতাব শুনিয়া নিশ্চয়ই খুসী হন নাই।

বালিকা বয়সেই মীরা মাতৃহীনা হন। মীরা পিতার একমাত্র সন্তান, সুতরাং মাতৃহীনা হওয়ার পর পিতৃগৃহ কুড়কীতে তাঁহার যত্ন করিবার বিশেষ কেহ রহিল না। মেড়তারাজ রাব দুদাজী পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শিশুকাল হইতেই অনন্যসাধারণ ভক্তির বিকাশ দেখিয়া এই

পৌত্রীটীকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মাতৃহীনা মীরাকে পিতৃগৃহে কেহ আদরযত্ন করিবে না ভাবিয়া দুদাজী তাহাকে মেড়তায় আনিয়া নিজের কাছেই রাখিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন।

১৫১৫ খৃষ্টাব্দে দুদাজী স্বর্গারোহণ করিলে পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরমদেবজী মেড়তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিবার এক বছর পরে বীরমদেবজী ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুমান অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে চিতোড়ের মহারাণা সাগাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র ভোজরাজজীর সহিত মীরার বিবাহ দিলেন।

বিবাহের কয়েক বৎসরের মধ্যেই মীরা বিধবা হইলেন। ভোজরাজজীর মৃত্যুর তারিখ ঠিক করিয়া বলা যায় না, তবে সম্ভবতঃ ১৫১৮ হইতে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার দেহান্ত হয়। মোট কথা, মীরার স্বামীসুখ বড় বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। স্বামীর প্রতি তাঁহার কিরূপ মনোভাব ছিল, সে সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কিছুই জানা যায় না। একটা কথা প্রচলিত আছে, মীরা সধবা অবস্থাতেই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, স্বামী তাঁহাকে স্ববশে আনিবার দরুণ তাঁহার উপর নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন ইত্যাদি। এই জনপ্রবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। চিতোরের রাণা মীরার উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন বটে, মীরার একাধিক পদে রাণাকে সম্বোধন করিয়া নানা কথাও আছে, কিন্তু এই রাণা মীরার স্বামী নহেন, ইনি তাঁহার দেবর বিক্রমাদিত্যজী। ভোজরাজজী পিতার জীবিতাবস্থাতেই দেহত্যাগ করেন, সুতরাং মহারাণা পদ পাইবার সৌভাগ্যই তাঁহার হয় নাই। সুতরাং মীরা চিতোরের রাণার স্ত্রী, এই কিম্বদন্তীর কোনও মূল্যই নাই।

মীরার যেমন কোমলকান্ত শব্দাবলী, তেমনি কোমলকান্ত ছিল তাঁহার স্বভাবটী। ইষ্টে তাঁহার অটল প্রেম ছিল বটে, স্বধর্ম্মরক্ষাতেও তিনি "নিরঙ্কুস অতি নিডর" ছিলেন, তথাপি তাঁহার মাঝে কোথায়ও হঠকারিতা ছিল না। নিতান্ত বালিকাবয়সেও তাঁহার বিবাহ হয় নাই, সুতরাং তিনি না বুঝিয়া-সুঝিয়া যে দাম্পত্যবন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাও তো মনে হয় না। মীরার গৃহত্যাগ শুধু একটা ভাবুকতার আবেশ নয়, উপর্য্যুপরি কতকগুলি দুর্ঘটনায় নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহাকে বাধ্য হইয়া গৃহত্যাগ করিতে হয়, ইহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিব। যতদিন তিনি গৃহে ছিলেন, ততদিন যে কি অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত ঘরের-পরের গঞ্জনা সহিয়াছেন, তাহাও তাঁহার শব্দাবলী হইতেই আমরা জানিতে পারি। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া মীরাকে আমরা পতি-দ্রোহিণী বলিয়া মনে করিতে পারি না। অবশ্য মীরাকে পতিদ্রোহিণীরূপে দাঁড় করাইলে তাঁহার জীবনে কিছু নাটকীয় উপাদান পাওয়া যায় বটে। কিন্তু তাহাতে যেমন একদিক দিয়া ইতিহাস বাদী হয়, তেমনি অপর দিক দিয়া মীরার মধুর স্বভাব ও বাণীর সহিতও ইহার সামঞ্জস্য থাকে না। দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে মীরার নীরবতাতে আমাদের মনে হয়, উহা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসুখের হয় নাই।

ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান সকলেরই একটা ক্রমবিকাশের ধারা আছে। যাহা অলৌকিক, তাহাও লৌকিক জীবনে ফুটিবার সময় কিছুদূর পর্য্যন্ত একটা নির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করিয়া চলে। এই অবস্থায় সংসারজীবনের সহিত ভাবুকের জীবনের বড় বেশী বিরোধ হয় না। আমরা প্রায়ই ভাবুকের জীবনকে ব্যতিরেক মুখে (as a contrast) ভাবিতে অভ্যস্ত। তাই অনেক সময় নিতান্ত সহজ ও সম্ভবপর ব্যাপারকেও উত্তেজিত কল্পনার বিকারে এমনই অতিরঞ্জিত করিয়া তুলি যে তাহাই বরং অসরল ও অসম্ভব হইয়া উঠে। বিকাশোন্মুখ কৃষ্ণপ্রেমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও পতিপ্রেম থাকিতে পারে, এবং মীরার জীবনেও তাহাই ছিল, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। সে কথা যথার্থই হউক আর অযথার্থই হউক, অন্ততঃ আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে মীরা তাঁহার স্বামীর অত্যাচারে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, এ কথা একেবারেই মিথ্যা। (ক্রমশঃ)

আলোচনা

মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে গোহত্যা নিয়া বেশ এক পশলা আন্দোলন আলোচনা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ ইত্যাদি হইয়া গেল। গোহত্যায় হিন্দুর সংস্কারকে সব চেয়ে বেশী পীড়িত করে, তাই হিন্দুরাই এই ব্যাপারে জোরগলায় প্রতিবাদ করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী সম্ভবতঃ নিজকে হিন্দু বলিয়াই মানেন; কিন্তু তাঁহার হিন্দুয়ানীর ঝাঁঝ কিছু কম; অনেক আচার ও মতকে তিনি সমর্থন বা আচরণ করেন, যাহা গোঁড়া হিন্দুয়ানীর বিরোধী। তাই হিন্দুয়ানীর দোহাই দিয়া তাঁহাকে সায়ান্টিফিক্ গোহত্যায় প্রত্যবায় কোথায়, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন বটে। গান্ধীও কৃতকর্ম্মের একটা জবাব দিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুয়ানীর তরফ হইতে নয়, মানবত্বের দিক দিয়া; তাঁহার অতি প্রিয় অহিংসাবাদ নিয়াও একটা তর্ক উঠিয়াছে। গান্ধী বলিয়াছেন, আমার কার্য্যের অভিপ্রায় যখন দূষিত ছিল না, তখন এই ব্যাপার হিংসা নয়; আত্মসুখকে কেন্দ্র করিয়া পরকে দুঃখ দিলেই উহা হিংসা। সূক্ষ্ম তার্কিকেরা প্রশ্ন তুলিয়াছেন, মুমূর্ষু গোবৎসকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা তাহার যন্ত্রণা লাঘবের দরুণ, না করুণাবিলাসী মহাত্মাজীর নিজের মানসিক অস্বস্তি ও উদ্বেগের লাঘবের দরুণ? প্রশ্ন কঠিন বটে। আরও একটা প্রশ্ন আছে। কাহারও দেহের যন্ত্রণা দৃশ্যতঃ নষ্ট করিলেই কি বাস্তবিক সে যন্ত্রণা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়? দেহের পরে কি কিছুই থাকে না? সেখানে কি বেদনা অনুভব হয় না? পরলোকবাদী হিন্দু তো এ কথা স্বীকার করে না। আত্মহত্যাকে হিন্দু মহাপাপ বলে, কেননা উহা মূঢ়তা মাত্র। শূলরোগী যদি খানিকটা বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করে, তাহা হইলেই কি রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবে? রোগের সংস্কার তাহাকে পরপারেও উদ্ব্যস্ত রাখিবে না কি? কথাটা দার্শনিকের মত, বৈজ্ঞানিকের মতও বটে। তারপরেও সূক্ষ্ম তর্ক উঠিতে পারে, তবে আর রোগের চিকিৎসার প্রচেষ্টা কেন? যদি বল, চিকিৎসা উচ্ছেদের দরুণ নয়, প্রশমনের দরুণ, তাহা হইলে ঔষধপ্রয়োগে বিষপ্রয়োগে মাত্রার তারতম্য বই তো আর কিছু নয়! বাস্তবিক এ কথার মীমাংসা সহজ নয়। ঔষধই প্রয়োগ করি আর বিষই প্রয়োগ করি, কাহাকেও যন্ত্রণায় কাৎরাইতে দেখিয়াও অটল থাকি অথবা হত্যাই করি, সমস্তের যোগ্যতা নির্ভরতা করিতেছে জ্ঞানের উপর। আমি যদি জ্ঞানী হই, শ্রীকৃষ্ণের মত বলিতে পারি,—তোমার আমার বহুজন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে, তুমি সে সব জান না, আমি জানি, যাহাদের হত করিবে, তাহারা পূর্ব্বেই আমার দ্বারা নিহত,—তাহা হইলে আমার অনুষ্ঠিত হত্যারও একটা সাফাই থাকিতে পারে। মহাত্মার বিচারে করুণা প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু নির্ব্বেদ ও জ্ঞান প্রকাশ পায় নাই। আর একটা কথা মনে জাগে। গোহত্যা হইল বলিয়া যাঁহারা সভা ডাকিয়া আক্ষেপ করিলেন, মহাত্মার আশ্রমে একটা বিড়ালকে যদি অমন ইন্‌জেকশন দিয়া কাবার করা হইত, তো তাঁহারা কি একই সুরে চীৎকার করিতেন?

*

কাশীতে অখিল-ভারত ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনের অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। এবারকার মত কোনবারই বোধ হয় সম্মেলন এত জাঁকাল হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, তখন তাহার বিবরণ

লইয়া সাময়িক পত্রিকায় যেরূপ মাতামাতি দেখিয়াছিলাম, ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনের বিবরণ নিয়া সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ দুই একটী পত্রিকা ছাড়া আর সবাই সম্মেলনের বিবরণকে সংবাদস্তম্ভের একটী কোণে গুঁজিয়া রাখিতেছেন দেখিতেছি। আবার কোন কোন পত্রিকা আর কোনও কথা উত্থাপন না করিয়া সম্মেলনের দুই চারিটা কেলেঙ্কারী প্রকাশ করিয়াছেন। সংবাদপত্রসেবীরা সবাই নব্যতন্ত্রের লোক, তাই কি প্রাচীনতন্ত্রের প্রতি এই বৈরূপ্য ? ইহার মাঝে ঈর্ষ্যার ছোঁয়াচও আছে না কি ? ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলন বলিতে গেলে হিন্দুমহাসভারই পাল্‌টা জবাব। হিন্দুমহাসভা নিয়া সংবাদপত্রে যেমন হৈ চৈ হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলন ন্যায়তঃ তাহার অর্দ্ধেকটুকুও দাবী করিতে পারিতেন না কি ? ছাত্রসম্মেলনের যেটুকু মর্য্যাদা, এই ধর্ম্মাচার্য্য ও প্রবীণ অধ্যাপক সম্মেলনেরও কি ততটুকু মর্য্যাদা নাই ? স্বীকার করি, ব্রাহ্মণসম্মেলন অতিমাত্রায় রক্ষণশীল, সুতরাং তাহার মতবাদ সমস্ত ক্ষেত্রেই নব্যভারতের রুচিকর হইবে না। এতদিন পর্য্যন্ত নব্যতন্ত্র ব্রাহ্মণকে জড়, ঔদরিক, প্রাণহীন ইত্যাদি আখ্যাতেই ভূষিত করিয়া আসিয়াছে—যেন তাহারা কতই সেয়ানা। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ যদি তাহার তথাকথিত আরামশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া থাকে—হউক না সে উত্থান কেবল মাত্র আত্মরক্ষাকল্পেই—তবে এই জাগরণকে অভিনন্দিত করিবার দরুণও কি সেয়ানাদের মুখ ফুটানো উচিত ছিল না ? দেশের যে কোনও ক্ষেত্রে আমরা প্রাণের সাড়া পাইলে আনন্দিত হই, কেননা এখন যে জাগিয়া উঠাটাই আগে প্রয়োজন। লাঠি-সোটা নিয়াই হোক আর ধানদূর্ব্বা নিয়াই হোক্, সবাই তো উঠিয়া দাঁড়াক্! তারপর কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা ধীরে-সুস্থে আপনিই হইতে থাকিবে। ঝাড়ুদার-সম্মেলন নিয়া যতটুকু কোলাহল হয়, ব্রাহ্মণ-সম্মেলন নিয়া ততটুকুও হইলনা—ইহা কি প্রকারান্তরে দাসমনোভাবেরই পরিচয় নয় ? বর্ত্তমান ব্রাহ্মণের অনুদারতা তোমার বরদাস্ত না হইতে পারে, কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া জাতিগঠন, সমাজগঠনের চেষ্টা ওই ব্রাহ্মণই করিয়া আসিয়াছে; তোমার গৌরব করিবার যাহা কিছু, তাহা এখনও ওই ব্রাহ্মণেরই পর্ণকুটীরে প্রচ্ছন্ন। আর কিছু না হউক, তোমার জাতীয় সম্পদের সে প্রহরী, এই বলিয়াও তো তাহার একটা মর্য্যাদা আছে ? আমাদের মনে হয়, নব্যসমাজের ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষটা সভ্যতা আর ঔদার্য্যের পরিচয় নয়, বিদ্বেষ ছাড়া যে আমাদের আর কিছুই পুঁজি নাই, ইহা তাহারই নিদর্শন।

*

ব্রাহ্মণ সম্মেলনের আলোচ্য-বিচার্য্য সমস্তই দেশী, কিন্তু জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, কাটামটা কিন্তু বিলাতী হইয়াছে। সেই অভ্যর্থনাসমিতির সেক্রেটারী ইত্যাদি নিয়োগ, অনুপস্থিতের পত্রপাঠ—তার পাঠ, প্রস্তাব উত্থাপন, সমর্থন, অনুমোদন, সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ, কমিটিগঠন ইত্যাদি কিছুই বাদ যায় নাই। এ যে দোষের, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু কালধর্ম্ম যে কিরূপ অনতিক্রমণীয়, তাহাই ভাবিতেছি। এই প্রসঙ্গে ভাবনাটা আরও বেশী জাগে এই জন্য যে, ব্রাহ্মণ জাঁক করিয়া বলেন, বৈদেশিক সভ্যতাকে আমরা থোড়াই কেয়ার করি। কে একজন এই সভাকে নৈমিষারণ্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। নৈমিষারণ্যের সভার ভাব আর আচার এই রকমই ছিল কিনা জানি না। তবে এই প্রসঙ্গে Sir Valentine Chirolএর একটা উক্তি মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিয়াছিলেন, "ইউরোপীয় সভ্যতা প্রকারান্তরে হিন্দুসভ্যতাকে নূতন করিয়া চেতাইয়া তুলিয়াছে। আমাদের সভ্যতা হইতেই ধার করা

মুদ্রাযন্ত্র, টেলিগ্রাফ, সংবাদপত্র ইত্যাদির সাহায্যে আজকাল হিন্দুসভ্যতাই যে জগতের সেরা আর পাশ্চাত্য সভ্যতা যে কিছুই নয়, ইহা ভারতের পল্লীতে পল্লীতে প্রচার হইতেছে এবং প্রকারান্তরে ইহা ইউরোপীয় সভ্যতারই বিজয় ঘোষণা করিতেছে।” Chriol লোকটা বিশ্বনিন্দুক, উহার কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু তার এই উক্তিটা যেন ক্ষীরের মাঝে হীরের ছুরী। উট নাকি প্রথম নাকটা গুঁজিবার অনুমতি চাহিয়াছিল, তারপর ক্রমে ক্রমে ঘরের মাঝে সমস্তটা দেহ ঢুকাইয়া গৃহস্বামীকে নাকি বলিয়াছিল, দেখ, দুজনার এখানে থাকা বড় অসুবিধা, তার চাইতে তুমি বরং বাইরে যাও! ভয় হয়, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরও শেষকালে সেই দশা না হয়। অবশ্য অনুরূপ প্রহরণ না হইলে শত্রুর সঙ্গে লড়াই চলে না জানি, কিন্তু জয় করিতে গিয়া না জিত হই, সেদিকে খেয়াল রাখা তো দরকার। সভাসমিতি মাত্রেই অভিনয় তা স্বীকার করি, কিন্তু তাহার মাঝেও এমন অনেক স্থল আছে যেখানে স্বদেশী ঢং ও চালানো যায়। ব্রাহ্মণসম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কল্পনা-কৌশলের প্রশংসা করি; কিন্তু সম্মেলনে দেশীয়ধরণ আরও বেশী আমদানী করা যাইতে পারিত, সম্ভবতঃ অজ্ঞাতসারে বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া উদ্যোক্তারা সেদিকে খেয়াল করেন নাই, এ কথাও দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে।

*

সম্মেলনের বিচারসভা একটী বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। এরূপ বিরাট্ বিচারসভা ইদানীন্তন দেখা যায় না। বিচার্য্য বিষয়ও অনেক। যে সমস্ত সমস্যা আধুনিক হিন্দু সমাজকে আন্দোলিত করিতেছে, তাহার সবগুলি না হউক, অনেকগুলিই এই সভাতে বিচারিত হইয়াছে দেখিলাম। উপযুক্ত মধ্যস্থ নিয়োগও হইয়াছিল। কিন্তু সভার বিবরণ পাঠ করিয়া বিচারে কি সিদ্ধান্ত হইল, তাহ কিছুই বোঝা গেল না। বাল্যবিবাহ, যৌবন-বিবাহ, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার ইত্যাদি অনেক সমস্যাই আলোচিত হইয়াছে, আলোচনাটা একটা গণ্ডীর মাঝেই ঘুরপাক খাইয়াছে, বহু মতান্তরও ঘটিয়াছে, কিন্তু শেষটায় কি হইল, তাহা কিছুই জানা গেল না। সুতরাং এই সমস্ত সামাজিক সমস্যার দ্বারা জনসাধারণ পূর্ব্বাপর যেরূপ আন্দোলিত হইয়া আসিয়াছে, বর্ত্তমানেও তাহাই হইতে থাকিবে। অবশ্য বুঝি, সংঘের ভাব অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যের ভাবই আমাদের দেশে অধিকতর ক্রিয়াশীল; সম্মেলনও এই সংক্রামক ব্যাধি হইতে নিস্তার পায় নাই। তবে আশা করি, পুনঃপুনঃ এইরূপ মেলামেশার ফলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার স্ফুরণ হইয়া একমত গঠন করিবার সুযোগ সম্মেলন ভবিষ্যতে পাইবেন। বিচার সর্ব্বত্রই শাস্ত্রানুকূল হইয়াছে; অর্থাৎ শাস্ত্রবচনকে আশ্রয় করিয়া পক্ষ প্রতিপক্ষ নিরূপণ হইয়াছে। বিচারমাত্রেরই বিবেকবুদ্ধিই উপজীব্য; যে শাস্ত্রবচন উদ্ধার করি না কেন, মূলে কিন্তু আমারই একটা স্বয়ম্ভূ মতকে আমি বিরুদ্ধ মত হইতে বিবিক্ত করিয়া লই মাত্র। অতএব প্রজ্ঞা বা বিবেকবুদ্ধিই যে চরম মধ্যস্থ, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই বিবেককে শাস্ত্রবচনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে গিয়া পূর্ব্বপুরুষের প্রতি আত্মীয়তা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, ইহাই লাভ। কিন্তু যেখানে, “নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং”—সেখানে উপায় কি? শাস্ত্রবচনের অপব্যাখ্যা বা স্বার্থপর প্রয়োগ দ্বারা আমরা অনেক সময় অন্যায়কেও প্রশ্রয় দিই না কি? এরূপ ক্ষেত্রে নিয়ামক মহাজনের আবির্ভাবই সমধিক আকাঙ্ক্ষিত নহে কি? হিন্দুমহাসভাতেই হউক আর ব্রাহ্মণসম্মেলনেই হোক্, মনে হয়, উভয়ত্রই শাস্ত্রকে শুধু নিজের সংস্কারের বেগার

খাটানোতে ব্যবহার করা হইতেছে, যে সাধনায় শাস্ত্রবচন—টীকা-ভাষ্যের সাহায্যে নয়—স্ব স্বরূপে আমাদের মাঝে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিত, সে সাধনার সঙ্কেত কেহই দিতেছেন না। "ঋষি নাই, থাকিলে বুঝাইয়া দিতেন, অতএব এস আমরা যতটুকু পারি নিজেরা বুঝিবার দরুণ ধস্তাধস্তি করি"—এই ভাবটাই সর্ব্বত্র প্রবল নয় কি? কিন্তু বুঝিবার ভারটা যদি শেষ পর্য্যন্ত আমার উপরেই পড়ে, ঋষির বচন বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহাকেই বুঝিবার চেষ্টা করা আরও সঙ্গত নয় কি? নিজের ভিতরই ঋষিত্বের আবির্ভাব ঘটাইবার দরুণ চেষ্টিত হওয়া উচিত নয় কি?

*

ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনে আমরা কেবল ব্রাহ্মণের যুযুৎসু মূর্ত্তিই দেখিলাম, ইহাই আমাদিগকে সব চেয়ে বেশী পীড়া দিয়াছে। নিরপেক্ষ হইয়া ভাবিয়া দেখ, ব্রাহ্মণের যে আদর্শ আমাদের চিত্তে লালন করিয়া আসিতেছি, তাহার কতটুকু এই সম্মেলনে ফুটিয়াছে? সম্মেলনের বিবরণ পড়িয়া মনে হয় না কি, এ যেন ভ্রষ্টাধিকার প্রভুতন্ত্রের একটা বৈঠক মাত্র? ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে নব্যতন্ত্র যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই কি এই সম্মেলনে সমর্থিত হয় না? সমাজধর্ম্মই কি ব্রাহ্মণের একমাত্র ধর্ম্ম? ব্রাহ্মণ কেবল সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা-বিধাতা—ইহাই ব্রাহ্মণের পরিচয়? যে যোগ, তন্ত্র, ভক্তি, জ্ঞান সমগ্র বিশ্ববাসীর সনাতন ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ যে তাহার রক্ষক, ব্রাহ্মণ যে নিজের জীবনে তাহাকে প্রতিফলিত করিয়াছেন, কিম্বা করিতে উৎসুক—সে পরিচয় এই সম্মেলনে কোথায় পাই? অষ্টাহ ধরিয়া কেবল তর্ক-বিতর্ক চলিল—কয় হস্ত দীর্ঘ আর কয় হস্ত প্রস্থ জলাশয়ের জল অমুকে ছুঁইয়া দিলে মারা যায়, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান রহস্য সম্বন্ধে কোনও আলোচনা, অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার কোনও নূতন উপনিষদ্ তো এই সম্মেলন হইতে প্রচারিত হইল না! ব্রাহ্মণ কি চিরকাল রিপুকর্ম্মের ভার নিয়াই থাকিবে, সে কি দ্রষ্টা নয়, স্রষ্টা নয়? যে সমস্ত জীবন-মরণ সমস্যা আজ দেশকে আন্দোলিত করিতেছে, সে সম্বন্ধে কেবল মামুলী গৎ আওড়াইয়াই কি ব্রাহ্মণ খালাস পাইবে, নূতন করিয়া পথের সন্ধান সে কি দিবে না? দেশের উচ্ছ্বসিত যৌবনশক্তির নেতা হইবে না কি এই তপঃশীর্ণ, বিরলভূষণ উদারচিত্ত ব্রাহ্মণ? স্ত্রীশূদ্রের উন্নয়নের বিপুল প্রয়াস দ্বারা মহা ভারতের ভিত্তি-পত্তন করিবে না এই ব্রাহ্মণ? অধ্যাত্মসাধনার দিব্যজ্যোতিতে, যোগশক্তির স্ফুরণে, মহাশক্তির আন্দোলনে, ভক্তিপ্রেমের কূল-প্লাবী বন্যায় দেশকে আলোড়িত, সঞ্জীবিত করিবে না এই ব্রাহ্মণ? কিন্তু এই সম্মেলনে তাহার আভাস তো পাইলাম না। যেমন দেশের অখ্যাত-অবজ্ঞাতদের বাদ দিয়া আমাদের কংগ্রেস, তেমনি এই সমস্ত মহাসভা, আর মহাসম্মেলন! একই মনোভাবের স্ফূর্ত্তি দেখি দুই জায়গায়। মানুষটা আসলে এক; এক জায়গায় সে হ্যাট্‌কোট্ পরিয়া ইংরাজী বুলি ঝাড়িতেছে, আর এক জায়গায় হয়ত উত্তরীয় কাঁধে সংস্কৃত আওড়াইতেছে। বুলির রকমারী চাই না—আসল মানুষটাকে দেখিতে চাই! আর "সমাজ সমাজ" বলিয়া চীৎকার করিয়া সবাই অস্থির। স্বারাজ্যবাদীও চীৎকার করিতেছেন, সমাজ গেল—ব্রাহ্মণ্যবাদীও চীৎকার করিতেছেন—সমাজ গেল! সমাজে মানুষ আছে কি নাই, সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই—কিন্তু বিপরীত দিকে দড়ি ধরিয়া টাগ্-অব ওয়ার চলিতেছে বেশ! —আগে মানুষ সৃষ্টি কর, তবে না তোমার সমাজ টিকিবে! আর এ কাজ ব্রাহ্মণের; তাহারই উপর আমাদের বেশী ভরসা। কিন্তু ইংরেজের আমদানী সামাজিক হুজুগে মাতিয়া গিয়া সে-ও যখন ইংরাজনবীশদের দিকে পেছন ফেরিয়া চীৎকার সুরু করিয়া দেয়, তখন ভাবি, বাস্তবিক আমাদের জাতটাই কি ছোট হইয়া গিয়াছে!

ভক্তসম্মিলনী

—(:০:)—

(চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন ১৩৩৫)

আগামী **১১, ১২, ১৩ই পৌষ** ভক্ত-সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। **পরমারাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিবেন।** সকলেই আপন আপন বিছানাপত্র সঙ্গে আনিবেন। এখানে শীত মধ্যম রকম। হ্যারিকেন সঙ্গে আনিতে পারিলে ভাল হয়।

ই, বি, এস্ রেলওয়ের **"জয়দেবপুর"** ষ্টেশনে নামিতে হইবে। ৯ই ও ১০ই পৌষ সব গাড়ীর সময়েই ষ্টেশনে স্বেচ্ছাসেবক রাখা হইবে। **প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগের** ভক্তগণ কলিকাতা (শিয়ালদহ) হইতে ঢাকা মেইল, বা গোয়ালন্দ পেসেঞ্জারে (ভায়া গোয়ালন্দ) অথবা সিরাজগঞ্জ পেসেঞ্জারে ভায়া সিরাজগঞ্জ আসিতে পারেন। গোয়ালন্দ হইয়া ভাড়া ৫।১০ আনা, সিরাজগঞ্জ হইয়া ভাড়া ৬৶০ আনা। কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ পেসেঞ্জার সন্ধ্যা ৬—৩ মিনিটে, ঢাকা মেইল ৯—৫০ মিনিটে, সিরাজগঞ্জ পেসেঞ্জার ৭—৪৪ মিনিটে ছাড়ে। গোয়ালন্দ হইয়া আসিলে সন্ধ্যা ৭টা এবং সিরাজগঞ্জ হইয়া আসিলে সন্ধ্যা ৬টায় জয়দেবপুর পৌঁছান যায়।

রাজসাহী বিভাগের (পাবনা জেলা ব্যতীত) ও **আসামের** ভক্তগণের কাটীহার নারায়ণগঞ্জ পেসেঞ্জার, মিক্স্‌ড্ ও আসাম মেইল ধরিয়া "বোনারপাড়া"—তিস্তামুখ হইয়া আসিতে হইবে। পাবনা জেলার ভক্তগণের সিরাজগঞ্জ পেসেঞ্জারে আসাই সুবিধা।

চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম, নোয়াখালী সন্দ্বীপ ও কুমিল্লার ভক্তগণের সুরমা মেইল ধরিয়া চাঁদপুর দিয়া আসাই সুবিধা। শ্রীহট্ট জেলার ভক্তগণের পক্ষে ভৈরবের পথে আসিলেই ভাল হয়।

ষ্টেশন হইতে আশ্রম তিন মাইল দূরে অবস্থিত; ডুলি পাল্‌কী ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের অন্য যানাদিতে আসিবার সুবিধা নাই। সুতরাং ষ্টেশন হইতে আশ্রম পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিতে হইবে। তবে যাঁহারা ডুলিতে বা পাল্কীতে আসিতে চান, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে জানাইতে হইবে। ষ্টেশন হইতে আশ্রমে আসিতে ডুলিতে ১৲ টাকা এবং পাল্‌কীতে ৮৲ টাকা লাগিবে।

অন্য কোন বিষয় জানিবার প্রয়োজন হইলে সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিবেন।

স্বামী প্রেমানন্দ

মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম

পোঃ জয়দেবপুর (ঢাকা)

সমালোচনা

পূজার অর্ঘ্য।—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত, গোরক্ষপুর বিজয়া সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত, সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১।০ মাত্র। একখানি গল্পের বই। লেখকের ভাষাটী বেশ ঝর্‌ঝরে, ভাব শুচি ও সংযত। গল্পগুলিতে আধুনিক আর্ট ওরফে নগ্ন প্রেমচিত্রের একান্ত অভাব, ঘরোয়া কথা লইয়া প্লট রচনা করা হইয়াছে। আজকালকার অতিমাত্রায় আর্টিষ্টিক গল্পেও একটা purpose প্রচ্ছন্ন থাকে, এই গল্পগুলিতেও কোথায় কোথায়ও সেইরূপ purpose প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বটে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় সে purpose "লিবিডো"-বিষ জর্জ্জরিত নয়, সুতরাং পুস্তকখানি অসঙ্কোচে স্ত্রী-কন্যার হাতে দেওয়া চলে। আমরা পুস্তকটি পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছি।

রামায়ণের কথা ও অন্যপূর্ব্বা বিবাহ।—মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রণীত, গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়, মুল্য ১৲ মাত্র। এখানি দুইটী স্বতন্ত্র গ্রন্থের সমষ্টি। প্রথম গ্রন্থটী রামায়ণের কথা। ইহাতে গ্রন্থকার নানা শাস্ত্র ঘাঁটিয়া রামায়ণ সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। প্রত্যেকটী উদ্ধরণের সূচী দেওয়া আছে, সুতরাং বইখানি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে লেখা। সংস্কৃত শ্লোকের বালাই নাই, অথচ মূলের সুষ্ঠু অনুবাদ রহিয়াছে, অতএব সাধারণ পাঠকের ভীতির কারণও নাই। কৌতুহলী পাঠকের পক্ষে এই গ্রন্থখানি একাধারে শিক্ষা ও আনন্দের কারণ হইবে।

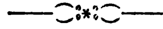
দ্বিতীয় গ্রন্থখানি অন্যপূর্ব্বা বিবাহ বা বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে প্রস্তাব। এটী দুই খণ্ডে বিভক্ত ও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের ন্যায় শাস্ত্রীয় উদ্ধরণে সমাকীর্ণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর এইরূপ উদ্যম বোধ হয় আর কেহ করেন নাই। লেখকের তর্কভঙ্গী সংযত; তাঁহার মত গ্রহণ করা না করা পাঠকের ইচ্ছা, কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে তিনি যে সমস্ত বচন উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে চিন্তা করিবার অনেক উপাদানই পাওয়া যাইবে। স্ত্রীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্বন্ধে অনেক কথারই ইহাতে উল্লেখ আছে। স্বল্লায়াসে প্রাচীন ভারতের নারী-সমাজের ইতিহাস যাঁহারা মূল শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিতে চান, তাঁহারা এই পুস্তক পাইয়া খুসী হইবেন।

মাতৃমন্দির।—মাসিক পত্রিকা, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার নন্দী ও শ্রীযুক্তা সুশীলা নন্দী সম্পাদিত; প্রাপ্তিস্থান ২০০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা; ৬ষ্ঠ বর্ষ চলিতেছে, বার্ষিক মূল্য ৩৲। নারীজাতির উন্নতিকল্পে যে দুই একখানি পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত আছে, মাতৃমন্দির তাহারই অন্যতম। এই পত্রিকাখানির বহুল প্রচারের দরুণ সম্পাদক ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী (সম্পাদিকা) পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ক্রটী করিতেছেন না। তাঁহাদের চেষ্টাযত্ন সফল হইতেছে, স্বীকার করিতে হইবে। নারী-উন্নতি বলিতেই একটা যুধ্যমান ভাবের কথা মনে জাগে; মাতৃমন্দিরে সে ছোঁয়াচ নাই—এই মন্দিরে পাই একনিষ্ঠ সেবকের পূজা-নিবেদন। অথচ বর্ত্তমান সমস্যাসমূহের আলোচনা যে ইহাতে একেবারে নাই, তাহা নহে; কিন্তু সে আলোচনা ধীর ও সংযত। আমরা এই পত্রিকার দিন দিন উন্নতি কামনা করি।

আর্য্যজ্যোতিষ।—মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার জ্যোতির্ভূষণ, মূল্য ৩৷৵০। প্রাপ্তিস্থান—১০৫ গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। আমরা

এই পত্রিকার ১ম সংখ্যা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম সংখ্যা দেখিয়াই পত্রিকার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। কোনও একটা কিছু আলোচনা না করিয়াই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া আমাদের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর্য্যজ্যোতিষ ইহার প্রতিরোধ করিতে পারিবেন বলিয়াই আশা করি। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

সংবাদ ও মন্তব্য

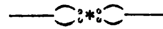


মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব যথা সময়ে মধ্যপ্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি পুরীধামে অবস্থান করিতেছেন।

নানা বিভ্রাটে এই সংখ্যা পত্রিকা বিলম্বে প্রকাশিত হইল। আগামী সংখ্যা প্রকাশিত হইতে নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষাও এক সপ্তাহ বিলম্ব হইতে পারে।

আগামী ২৬শে অগ্রহায়ণ সারস্বত মঠান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব হইবে। আমরা সাধু, ভক্ত ও আর্য্যদর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকবর্গকে উক্ত উৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

দানপ্রাপ্তি



পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে

চট্টগ্রাম

মিঃ এ আজিম ৫৲ শ্রীইন্দ্রলাল লালা ১৲ শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস খুচরা সংগৃহত ১০৲ শ্রীমরা আলি খাঁ জমিদার ৫৲

বালির বাজার

শ্রীরমণী রঞ্জন চৌধুরী ২৲ শ্রীযামিনী রঞ্জন দত্ত ২৲ শ্রীঅপর্ণাচরণ দত্ত ১৲ শ্রীকামিনীকুমার দাস ১৲ শ্রীনবীনচন্দ্র শীল ১৲ খুচরা সংগৃহীত ২৲

সাহেব বাজার

শ্রীবিপিনচন্দ্রপাল ৭৲ শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী ৫৲ শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস ২॥০ শ্রীঅখিল চন্দ্র দাস ১॥০ শ্রীগগন চন্দ্র দাস ১৲ শ্রীসতীশ চন্দ্র চৌধুরী ১৲ শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র পাল ১৲ খুচরা সংগৃহীত ১৲

ফেণী

শ্রীসুরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত ১৲ শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দোপাধ্যায় ১৲ কলেজ হোষ্টেল ১৲

কক্সবাজার

রায় বাহাদুর বিপিন বিহারী রক্ষিত ২৲ শ্রীদীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী ১৲

ফটিকছড়ি

শ্রী নব চন্দ্র চৌধুরী জমিদার ১০৲ শ্রী পূর্ণ চন্দ্র চৌধুরী ২৲ শ্রী মহেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী ৫৲ শ্রী দেবেন্দ্র কুমার পাল ২৲ শ্রী দেবেন্দ্র প্রসাদ দে ১৲ শ্রী নগেন্দ্র চন্দ্র দে ॥০

রোসাংগিরি

শ্রী রাজ কুমার দে ১৲ শ্রী সুরেন্দ্র বিজয় চৌধুরী ১৲ শ্রী কামিনী রঞ্জন চৌধুরী ১৲ শ্রী চন্দ্রকুমার বিশ্বাস

১৲ শ্রী সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী ১৲ শ্রী অতুল বিহারী চৌধুরী ১৲ শ্রী চন্দ্রকুমার দত্ত জমিদার ১০৲ শ্রী: তেজেন্দ্রবিনোদ দেব প্লিডার ১৲ শ্রী রামচন্দ্র দেব ২৲ শ্রী বিনোদ বিহারী চৌধুরী মার্চ্চেন্ট ২০৲ শ্রী নবীন চন্দ্র দাস জমিদার ২০৲

কাটীরহাট

শ্রী রমেশ চন্দ্র ধর ২৲ শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী হোর ॥০

পশুধলই

শ্রীনূতন চন্দ্র চৌধুরী ৪৲ শ্রীচপলা রঞ্জন চৌধুরী ১৲

মধ্যবঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে

সেরপুর (ময়মনসিংহ)

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী ২৲ শ্রীযুক্ত গোপাল দাস চৌধুরী ১৲ রায় বাহাত্র রাধাবল্লভ চৌধুরী ১৲ শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ মৈত্র ১৲ খুচরা সংগৃহীত ২৲

পাটনা (বিহার)

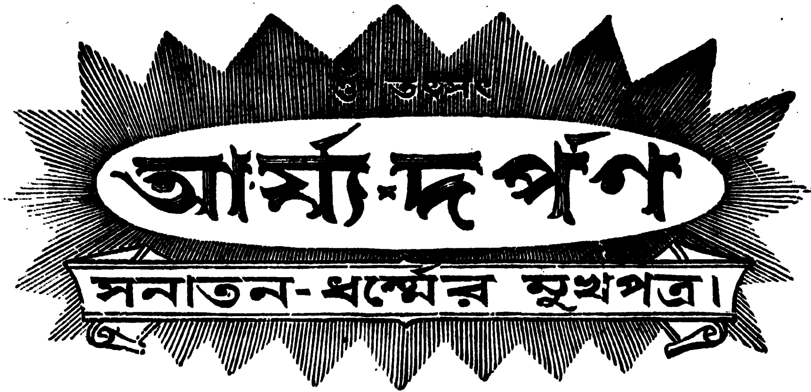
প্রিন্সিপাল, ডি এন্ সেন বি এন্ কলেজ ৪৲ শ্রীশৈবলিনী সাহা ৫৲ ইঞ্জিনিয়ার কলেজ হোষ্টেল ১০৲ সায়ান্স কলেজ হোষ্টেল ৭৲ খুচরা সংগৃহীত ১৬৲

দুই টাকা করিয়া—।

শ্রীযুক্তগণ—হীরালাল দাসগুপ্ত, উকীল বিশ্বেশ্বর দে, উকীল রামচন্দ্র ভাত্নরী, উকীল বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, উকীল ডাক্তার দস্তিদার, ডাক্তার ফণীভূষণ মুখার্জ্জি, ডাক্তার গোপীকৃষ্ণ সিনা, প্রফেসর কামিনী কুমার গুহ, ইঞ্জিঃ কলেজ, প্রফেসর জ্যোতিষচন্দ্র গুহ ইঞ্জিঃ কলেজ, প্রফেসর সুখেন্দু কুমার বসু পাটনা-কলেজ, প্রফেসর রমেশ চন্দ্র রায় সায়ান্স কলেজ, জিতেন্দ্র নাথ চাটার্জ্জি হেড এসিন্টাণ্ট গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, প্রেমানন্দ সাহা, সুপারিণ্ট-অব বিহার উড়িষ্যা কাউন্সিল, নীলমনি চাটার্জ্জি ফণীন্দ্রনাথ, সেন, অক্ষয় কুমার সেন, তারাপদ মৈত্র ইঞ্জিনিয়ার, এম্, মুখার্জ্জি

এক টাকা করিয়া।—

শ্রীযুক্তগণ—নির্ম্মলচন্দ্র দাসগুপ্ত, উকীল, প্রভাতচন্দ্র ঘোষ উকীল, অচলেন্দ্রনাথ দাস উকীল, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ আচার্য্য, ডাঃ উমাপতি মুখার্জ্জি, ডাঃ মোহনচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ পরেশনাথ চাটার্জ্জি, ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, জেইল ডাক্তার যত্নাথ কর, প্রফেসর রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি ইঞ্জিঃ কলেজ, প্রফেসর রামজীদাসগুপ্ত ইঞ্জিঃ কলেজ, প্রফেসর মহেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ইঞ্জিঃ কলেজ, প্রফেসর অমূল্যরতন পাল ইঞ্জিঃ কলেজ, প্রফেসর ফণীভূষণ গাঙ্গুলী সায়ান্স কলেজ, প্রফেসর নারায়ণ-মোহন দে সায়ান্স কলেজ, প্রফেসর আশুতোষ চাটার্জ্জি সায়ান্স কলেজ, প্রফেসর সুবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এম্, কলেজ, প্রফেসর বিমানবিহারী মজুমদার বি এন্ কলেজ, প্রফেসর নলিনীকুমার বসু বি, এন্ কলেজ, প্রফেসর ললিতকুমার ঘোষ বি, এন্ কলেজ, প্রফেসর জি, পি, হাজারী বি, এন্, কলেজ, প্রফেসর দুর্গা-প্রসন্ন আচার্য্য বি, এন্, কলেজ, প্রফেসর নিরঞ্জন নিয়োগী পাটনা কলেজ, প্রফেসর এইচ্ এন্ গাঙ্গুলী পাটনা কলেজ প্রফেসর পান্নালাল পাটনা কলেজ প্রফেসর চন্দ্রভূষণ রায় পাটনা কলেজ প্রফেসর শচীন্দ্র-নারায়ণ চাটার্জ্জি পাটনা কলেজ প্রফেসর নির্ম্মলময় ঘোষ পাটনা কলেজ প্রফেসর শরচ্চন্দ্র মজুমদার পাটনা কলেজ প্রফেসর চারুচন্দ্র সিনা পাটনা কলেজ প্রফেসর গঙ্গানাথ ভট্টাচার্য্য পাটনা কলেজ ভূতপূর্ব্ব প্রফেসর জ্যোতিষচন্দ্র বানর্জ্জি হরি চক্রবর্ত্তী সতীশ চন্দ্র ঘোষ শরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত জেইলার দ্বারকানাথ দেব যামিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এন্ বাগচী রাজেশ্বর সরকার মনোরঞ্জন ঘোষ দুর্গাচরণ দাস সুশীলকুমার বানার্জ্জি অক্ষয়কুমার দাস লালবিহারী চাটার্জ্জি লালবিহারী বসু এস্ সি পালিত নলিনীরঞ্জন সিনা ব্রজেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি সুবোধচন্দ্র ঘোষ প্রমথনাথ বানার্জ্জি বিভূতি ভূষণ ঘোষ বি, এম্ দাস পঙ্কজকুমার পান কালীচরণ কর্ম্মকার মধুসূদন মুখার্জ্জি সুরেন্দ্রকুমার নিয়োগী প্রফুল্লচন্দ্র দে বিনয়ভূষণ রায় চৌধুরী জ্ঞানেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি খগেন্দ্রকুমার ঘোষ পঞ্চানন দাস। (ক্রমশঃ)



২১শ বর্ষ — ২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ—১৩৩৫

সমষ্টি সং ২২৪ — ২য় সংখ্যা

মঘবাঁ ঋজীষী

—✻—

ঋগ্বেদ সংহিতা—৩।৫। ২০-২২

—*—

[বামদেব ঋষিঃ—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ—অগ্নি দেবতা]

আপো যদদ্রিং পুরহূত দর্দ্দর্
আবির্ভুবং সরমা পূর্ব্ব্যং তে।
স নো নেতা বাজমা দর্ষি ভূরিং
গোত্রা রুজন্ অঙ্গিরোভি গৃণানঃ॥

পর্ব্বতে বিদারি' তুমি চাহিলে যে বহাইতে জল,
অপসারি বাধা যত সরমা সে দেখালো সকল।
তোমারেই ডাকে সবে, তুমি নেতা, দাও অন্নভার—
অঙ্গিরারা স্তুতি গায়—খুসী হও—বিদারো পাহাড়!

অচ্ছা কবিং নৃমণো গা অভিষ্টৌ
স্বর্ষাতা মঘবন্নাধমানম্ ।
উতিভিস্তমিষণো দ্যুম্নহূতৌ
নি মায়াবানব্রহ্মা দস্যুরর্ত্ত ॥

তোমারে যে ডাকে কবি, ওগো বন্ধু, তারি কাছে যাও,
যাচকেরে স্বর্গ তুমি, মঘবন, হাতে তুলে দাও !
সম্পদের ডাকে তারে দাও শক্তি, দাও গো আশ্বাস ;
বেদদ্রোহী মায়াবী যে দস্যু তার কর সর্ব্বনাশ ।

কুৎসায় শুষ্ণমশুষং নিবর্হীঃ
প্র পিত্বে অহ্নঃ কুযবং সহস্রা ।
সদ্যো দস্যূন্ প্র মৃণ কুৎস্যেন
প্র সূরশ্চক্রং বৃহতাদভীকে ॥

অশুভ সে শুষ্ণাসুরে কুৎসতরে করেছ বিনাশ,
কুযবেরে মারিয়াছ ফুটিতে না দিনের আভাস ;
সহস্র দস্যুরে সদ্য বজ্রাঘাতে পেড়েছ ভূতলে—
খসে পড়ে সৌরচক্র যেন, দেব, তব বীর্য্যবলে !

আ দস্যুঘ্না মনসা যাহ্যস্তং
ভুবত্তে কুৎসঃ সখ্যে নিকামঃ ।
স্বে যোনৌ নি ষদতং সরূপা
বি বাং চিকিৎসদৃতচিদ্ধ নারী ॥

"দস্যুরে বধিবে ভাবি, হে দেবতা এস মোর ঘরে"—
যাচিয়া প্রণয় তব কুৎস তোমা ডাকিল কাতরে ;
এক ঠাঁই বসে দু'য়ে ; এক্-ই রূপ দেখি দোঁহাকার
সাতপাঁচ ভাবে শচী—সতী-চিত্তে লাগে চমৎকার !

ত্বং পিপ্রুং মৃগয়ং শূশুবাংসম্
ঋজিশ্বনে বৈদথিনায় রন্ধীঃ ।
পঞ্চাশৎ কৃষ্ণা নি বপৎ সহস্রা
অৎকং ন পুরো জরিমা বি দর্দ্দঃ ॥

পিপ্রুরে বধেছ তুমি, বড় তার বাড় দেখেছিলে—
বৈদথিন-ঋজিশ্বনে মৃগয়ুরে বেঁধে এনে দিলে—
কৃষ্ণকায় দস্যু আরো মেরেছিলে পঞ্চাশ হাজার,
জরা যথা নাশে রূপ, দৈত্যপুরী দিলে ছাঁরখার !

যাসি কুৎসেন সরথমবস্যু-
স্তোদো বাতস্য হর্যোরীশানঃ ।
ঋজ্রা বাজং ন গধ্যং যুযূষন্
কবির্যদহন্ পার্য্যায় ভূষাৎ ॥

কুৎসেরে বাঁচাবে বলে এক্-ই সাথে তারি রথে যাও,
খেদাড়িয়া শত্রুগণে বায়ুবেগে তুরগে ছোটাও !—
অন্নের কবল যেন সিধা যায় তার ঘোড়া দুটী—
এক্-ই দিনে জুড়ি রথ দুজনায় চলিয়াছ ছুটি ।

সূর উপাকে তন্বং দধানো
বি যত্তে চেত্যমৃতস্য বর্পঃ ।
মৃগো ন হস্তী তবিষীমুষাণঃ
সিংহো ন ভীম আয়ুধানি বিভ্রৎ ॥

রবিরে আড়াল করি দাঁড়াইলে যবে মৃত্যুঞ্জয়—
তোমার এ ভাস্বর তনু হলো যেন আরো জ্যোতির্ম্ময় ।
হস্তী-মৃগ যেন তুমি—সবাকার বীর্য্যবল দহ,
বিচিত্র আয়ুধ করে ভয়ঙ্কর সিংহ হেন রহ !

পূর্ণিমা

—:*:—

যে নিবিড় আবেশে অমানিশার অন্ধকার আমার শিরায় শিরায় বিসর্পিত হইয়া পড়িয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম, তাহাকে ধরিয়া রাখিব। অথবা সে কথাও বুঝি তখন ভাবিতে পারি নাই। আমার নির্ব্বাণে, জগতের নির্ব্বাণে, যাহা ছিল, তাহা বুঝি ছিল না, অথবা কোন বিশেষণের লাঞ্ছন না মানিয়াই বুঝি ছিল। কি ছিল, কিম্বা কি ছিল না, তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারি না। ইন্ধনকে আশ্রয় করিয়া লেলিহান বহ্নিশিখা যেমন শূন্যে উৎকম্পিত হইয়া শূন্যেই মিলাইয়া যায়, ইন্ধনের মাঝেও বহ্নিসত্তার সমস্তটুকু নিঃশেষে লেহন করিয়া তাহাকেও শূন্যে মিলাইয়া দেয় —অথচ না থাকিয়াও সে যায় না, অদৃশ্য, অননুভাব্য হইয়াও "তদ্ দূরে—তদ্ অন্তিকে"—কখনও বা দূরে, কখনও বা অতি নিকটে রহিয়া নিখিলের সত্তাকে ছুঁইয়া থাকে—তেমনি করিয়া যাহা সর্ব্ব, তাহা এক হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই স্তব্ধতার যদি কোনও স্ফোট থাকে, তবে তাহা নেতিমাত্র! সুগভীর, ভয়াল সে রহস্য—অতলান্ধকার সিন্ধুবক্ষের মতই মরণের সে সুতীব্র আকর্ষণ, যদি তাহার কূলে কোথায়ও জীবনের রেশ এতটুকুমাত্রও ফুটিয়া থাকে তো বিপুল বলে সে তাহাকে নিজের বুকে শুষিয়া নিতে চায় যেন;—এমনি সে করাল, এমনি গভীর, এমনি উন্মাদক!

এই কি আমি, না সে—তাহা বলিতে পারি না। সিন্ধুতরঙ্গ হইতে উৎক্ষিপ্ত একটী বারিবিন্দুর মত আমার এই আমিত্ব—তাহারি বুকে প্রতিফলিত এই সবিতার দ্যুতিতে ঝলমল ধরিত্রী, অনন্ত উদার এই সিন্ধুর প্রসার! আমি বিন্দু, তাই ভাবি সিন্ধুর কথা; সিন্ধু কাহার কথা ভাবে, তাহা ভাবিতে গিয়া অনুভব করি তাহারই তৃষার্ত্ত নাড়ীর আকর্ষণ; তাহারই পানে ছুটিয়া যাই, তাহারই বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভুলিয়া যাই—কিই বা সিন্ধুর বুকের কথা, আর কিই বা বিন্দুরই বুকের কথা!

অমানিশার আঁধার নির্ব্বাণ এমনি করিয়া দোলা দিতেছে যখন, তখনও জানি না, সেই তমিস্রার বুকে নখক্ষতের মত একটুখানি আলোর আভাস কোথা হইতে উঁকি দিয়াছে; যাহা নিষ্কল, তাহা স-কল হইবার জন্য অন্ধকারের বক্ষ আলোড়িত করিয়া কাঁপিতেছে এক রুদ্ধ বাষ্পোচ্ছ্বাস। সেই উচ্ছ্বাসের আদিম মুহূর্ত্তে আমিই আমাকে জন্মিতে দেখিলাম—দেখিলাম, স্বয়ম্ভূর মৃত্যুনীল দ্যুতি অন্ধকারের বুকে ঝিকিমিকি করিয়া হাসিতেছে। এ কি আমার অপরূপ প্রকাশ—এ কি বেদনা, এ কি হর্ষ! অন্ধকারের সুনীলতরল লাবণ্য এমনি তর্-তর্ করিয়া কাঁপিতেছে কিসের প্রকাশব্যঞ্জনায়? এই কি আমার অনির্ব্বচনীয়া মায়া? এই কি আমার আমি? বিস্ময়ে, আনন্দে আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম—দেখিলাম, ধীরে ধীরে আমারই অবিক্ষুব্ধ মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে নিষ্কল অহং কলায় কলায় ফুটিয়া উঠিল, স্বয়ম্ভূ লীলায় নিষ্কল স-কল হইল, অন্ধকারের প্রতি রোমকূপ হইতে বিকীর্ণ আত্মপ্রকাশের জ্যোতিশ্ছটায় পূর্ণিমার জ্যোচ্ছনায় বান ডাকিয়া গেল; অন্ধকারেরই আত্মজা এই আলোকের মায়াকে বুকে ধরিয়া বিরাট্ আঁধার আকাশের স্নিগ্ধ-নীল সৌকুমার্য্যে যেন জমাট বাঁধিয়া গেল!

*

অন্ধকারের স্রোত সাঁতরাইয়া উঠিয়াছি দিবালোকের বন্ধুর উপকূলে নয়, জ্যোচ্ছনার সুকোমল বেলাভূমিতে। অমানিশার উপাসনা করিয়া আমার বুকে ফুটিয়াছে পূর্ণিমা। জ্যোচ্ছনা সত্যের, বৈরাগ্যের

দীপ্তি নয়—স্নেহের, ভালবাসার মায়া। আঁধারের ছোঁয়াচ তাহাতে লাগিয়া আছে বলিয়াই সে এমন স্নিগ্ধ। গভীর সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া নবপ্রস্ফুটিত চেতনায় যেমন করিয়া ভাসিয়া উঠে এই জগৎটা—একটী স্নিগ্ধ, কম্প্র, সলজ্জ তনুর তনিমায়—তেমনি জ্যোচ্ছনার প্লাবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে আমার এই আঁধারপারের জগৎ। কোন্ রসায়নচতুরের সঙ্কেতে কতটুকু আলোর সহিত কতটুকু আঁধার মিশিয়া এই মায়ার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা জানি না, জানিতেও চাহি না। শুধু মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া আছি এই আপাণ্ডুর স্নিগ্ধ-সুষমার পানে। শব্দ এখানে সুর হইয়া ফুটিয়া উঠে, শিশিরের অভিষেকে গন্ধ তাহার উগ্রতা হারাইয়া ফেলে, রূপ তাহার তীক্ষ্ণ সীমারেখাকে মার্জ্জিত করিয়া একে অপরের গায় ঢলিয়া পড়ে। এই আলো-ছায়ার মিথুনলীলায় বিশ্বের রসিক-প্রাণ উদ্দীপিত হইয়া যদি বাঁশীর সুরে আকাশ-বাতাস পূরিয়া দেয় আর সেই সুরে যদি তোমার-আমার প্রাণের সুপ্ত জ্যোচ্ছনাও কাঁপিয়া জাগিয়া উঠে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবে কাহার ভ্রূকুটীতে?

প্রভাতের সৌরকিরণস্পর্শে বিশ্বেশ্বরের যে ভোগের আয়োজন সুরু হইয়াছিল, তাহার পরিপূর্ণতা হইল পূর্ণিমাতে। প্রভাত সৃষ্টি, পূর্ণিমা ভোগ। দিবালোকে পাই সত্য, তাই তাহাতে জোটে বিরাগের উপাদান; আর পূর্ণিমাতে পাই লীলা, তাই তাহার দুকূল ছাপাইয়া বহিয়া যায় অনুরাগের বন্যা। জ্যোচ্ছনায় যে কুহক রহিয়াছে, তাহাকে যদি আয়ত্ত করিতে পার, তবে ভোগের সন্ধান পাইবে। অমানিশার তোরণদ্বারে সংযমীর যে জাগৃতির কথা অনল-অক্ষরে লেখা ছিল, এখানেও দেখি, সেই কথাই বিদ্যুতের দ্যুতিতে ঝিকিমিকি করিতেছে। অমানিশায় সংযমীর আত্মপ্রতিষ্ঠা বা জাগরণ, পূর্ণিমায় তাহার ভোগ।

ছট্‌ফট্ করিও না; এ রূঢ় দিবালোক নয়; এখানে যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহা স্পষ্ট হইয়াও স্পষ্ট নয়। এই জোচ্ছনার প্লাবনে শত্রুর করাল মূর্ত্তিও বন্ধুর মত কমনীয় হইয়া উঠে। যেমন উত্তাপহীন স্নিগ্ধতা এই জ্যোচ্ছনার প্রাণ, তেমনি রসিকের ভোগ—উহা ক্ষুধার উগ্র তাড়না নয়। জ্যোচ্ছনার মাদকতা যেমন ধীরে ধীরে শিরায়-উপশিরায় সঞ্চারিত হইয়া চেতনাকে মাতাল করিয়া তোলে, তেমনি স্নিগ্ধতায় এই নিখিল জগৎ তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলুক। তুমি অটল থাক, স্থির থাক, অবিকম্পিত মমতায় এই লাবণ্যময়ী জ্যোচ্ছনামূর্ত্তিকে বুকে তুলিয়া লও। পূর্ণিমার এই প্লাবনের দিকে চাহিয়া অনুভব কর, ভোগ উদ্দামতা নয়, তাহাতে তাপ নাই, দ্বন্দ্ব নাই।

দিবালোক সত্য, উগ্র, তীক্ষ্ণ, বিচারদিগ্ধ; সেখানে কেবলই গণ্ডী রচনা, একের সহিত অপরের বিরোধ। ইহাকে জানিতে হইবে; কিন্তু ইহাকে ভোগ করিতে হইলে চোখে বুলাইয়া লইতে হইবে জ্যোৎস্নার মায়ামন্ত্র। মায়াকে মিথ্যা বলিয়া গাল দিলেও তো সে মিথ্যা হয় না; তোমার ও গাল হাসিমুখে মাথা পাতিয়া লইয়াও যে সুকোমল বাহু-বেষ্টনে সে তোমায় জড়াইয়া ধরে। এই মায়ার-অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য চোখে মাখিয়া জগতের দিকে তাকাও—দিবালোকের প্রখর তেজ ম্লান হইয়া যাইবে। কোথায় রহিবে জটিলা-কুটিলার ভ্রূকুটী, পাড়া-পড়শীর গঞ্জনা, অঘাসুর-বকাসুরের বিভীষিকা! সকলকে আচ্ছাদিত করিয়া প্রাণে জাগিতেছে শুধু কালোর অধরচুম্বী বাঁশীর সুর, চোখে জ্যোচ্ছনার মদিরোচ্ছাস, ঘ্রাণে নীপবনের মত্ত সৌরভ। বিচার বুঝি না, বিতর্ক বুঝি না—দেখি শুধু আকাশ-ধরণী প্লাবিত করিয়া আনন্দের উপচয়ন।

এ আনন্দে উগ্রতা নাই, আঘাত নাই, ব্যাকুলতা নাই। শিশির-সম্পাতে মৌনসুখে যেমন করিয়া তরুলতা ভিজিয়া ওঠে, তেমন করিয়া আনন্দের স্তব্ধ অভিষেকে প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছি। এই জগতের কোলাহলের মাঝেই আমি চুপটী করিয়া বসিয়া

আছি—দেখিতেছি তোদের দুঃখসুখের খেলা, শুনিতেছি তোদের উচ্ছ্বাস-আবেগের কলতান—কিন্তু সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও যে কিছু বলিতে পারিতেছি না; আমার কণ্ঠ পর্য্যন্ত উপচিয়া উঠিয়াছে আনন্দের ফেনিল উচ্ছ্বাস; নিঃশব্দে সৌরালোক হইতে তরুলতা যেমন করিয়া সঞ্জীবনী শক্তি শুষিয়া লয়, তেমন করিয়া আমার অণুপরমাণু দিয়া যেন এই জগৎটাকে আমার মাঝে শুষিয়া লইতেছি। আমার আনন্দে আকাশের সূর্য্য যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে; সংসারের কোলাহল যেন মাধবীর বুকে ভ্রমগুঞ্জনের মত শোনাইতেছে।—এ জগৎ তো সত্য নয়, এ যে মায়া; এতো দিবালোক নয়, এ যে জ্যোচ্ছনা! এতো সংসারের কর্ম্মকোলাহল নয়, এ যে পূর্ণিমানিশীথে সেই চিরন্তনী অভিসারিকার হিয়ার দুরু-দুরু!

শরতের অবসানে হেমন্তের সূচনায় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-বিতানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি। জাগ্রৎ সুষুপ্তির অন্তরালে এক অপরূপ স্বপ্নলোক আমার সম্মুখে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ; পূর্ণিমার রজতোচ্ছ্বাস তরুপল্লবের সম্পুটে মূর্চ্ছিত হইয়া উপচিয়া পড়িতেছে; জ্যোচ্ছনার অভিষেকে বাতাসও যেন ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে। আমি নিঃসঙ্গ, আমি জাগ্রৎ। অনুভব করিতেছি, আমারই বক্ষ জুড়িয়া লক্ষ কোটী নরনারীর স্বপ্নমাধুরী কামনার বিচিত্র মায়ায় তরঙ্গিত হইয়া চলিয়াছে। বহির্জ্জগৎ সুপ্ত, কিন্তু বিশ্বের অন্তর্জ্জগৎ বন্ধহীন কামনার মৃদু গুঞ্জনে মুখরিত! আমার কার্পণ্য নাই, দৈন্য নাই, জাগ্রতের সমস্ত ক্ষুধা অমৃতের পরিবেষণে মিটাইয়া দিতেছি; যেমন আমি স্বরাট্‌, রাজরাজেশ্বর—তেমনি স্বারাজ্যের অধিকার পাইয়াছে আমারই কল্পনার সূত্রে গাঁথা নিখিলের বিক্ষুব্ধ হৃদয়। আকাশে-বাতাসে, তরুপল্লবে, জীবে জীবে এই তৃপ্তির অনুভূতি আমার অন্তরকে কণ্টকিত করিয়া তুলিল।

এই তো সুখের পূর্ণতর রূপ। তাহাকে কি খুঁজিতে হয়, গহন হইতে গহনে তাড়াইয়া ফিরিতে হয়? যেমন সহজ আনন্দে উদ্ভাসিত এই জ্যোৎস্না-শিথিল রজনী, তেমনি উদ্ভাসিত চিরজাগ্রৎ সংযমীর হৃদয়। সুখ এত সহজ, এত সরল—শুধু চাহিলেই তাহাকে পাওয়া যায়, যদি সে চাওয়ার মাঝে না থাকে উত্তাপ, না থাকে উগ্রতা, না থাকে উৎকট বিচারের রূঢ়তা। এ জগৎকে দেখিয়াও দেখিতেছি না, ছুঁইয়াও ছুঁইতেছি না, প্রকাশ করিতে গিয়াও থমকিয়া গিয়াছি—এই আবেগকম্পমান পরম মুহূর্ত্তেই হৃদয়ের স্তব্ধ নীলাঞ্জনপ্রভ অন্ধকারকে উদ্যোতিত করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে আনন্দের পূর্ণিমা। সেই অনতিস্ফুট আলোকের কুহকে দেখিতে পাই, কোথায় কর্ম্মকুটিল জটিলতা—বিশ্ব জুড়িয়া এ যে মহারাসমঞ্চে রাসরসিককে বেড়িয়া চলিয়াছে মুগ্ধ গোপাঙ্গনার মৃদুশিঞ্জন-মুখর রাসোৎসব।!



না ; এখন আর ফির্‌বার কোনও পথ ছিল না। তাঁর মন ছিল একখানে আর দেহ ছিল একখানে, কায়া-মনের সম্বন্ধ তাঁর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এমন ভাবে তো চল্‌তে পারে না চিরকাল। লোকটীকে শেষে মর্‌তে হল ; মরণ ছাড়া আর কোনও উপায়ে পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন তাঁর দ্বারা সম্ভব ছিল না। মরণে সব মীমাংসা হল। তবেই দেখ, মরণকে যতটা বিভীষিকা মনে করা হয়, ততটা সে নয়।

তুমি পরিস্থিতির প্রভু, নিয়তির নিয়ন্তা। লোকে দুঃখী হয় কেন? বিপদ্ এসে হাজির হয় কোথা থেকে? শুধু ইচ্ছার দ্বন্দ্ব থেকে। একরকম বাসনা তোমায় একটা কাজের দিকে টান্‌ছে তো আর এক বাসনা আর এক কাজের দিকে টান্‌ছে। দুটী বাসনাই আছে। একটী বাসনা হয় তো তোমায় লেখক, বক্তা, অধ্যাপক, প্রচারক বানাতে চায় ; আবার আর এক বাসনা তোমায় চায় ইন্দ্রিয়ের দাস করতে। এই তো বাসনার দ্বন্দ্ব ; দুটীই পূর্ণ হবার উপায় তো নেই। ফলে কি হয়? দুটীই তো পুরো হওয়া চাই। একটী যখন পূর্ণ হয়, তখন আর একটীতে ঘা পড়ে, আর তাইতে তুমি পাও দুঃখ। লোকে দুঃখ ডেকে আনে এই করে। তোমার দুঃখ দেখেও প্রমাণ হয় যে তুমি নিয়তির নিয়ন্তা। একটী গল্প বলে রাম তোমাদের এটী বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল। একজন থাকত নীচের তলায়, আর একজন ওপর তলায়। একদিন বাড়ীতে একটা চোর ঢুক্‌ল। চোর এসেছে অবশ্য চুরী করতেই কিন্তু বাড়ীশুদ্ধ সবাই তখন সজাগ। কাজেই চুরীর বড় সুবিধা হচ্ছে না। ভোরবেলায় চোরকে দেখতে পেয়ে সবাই ধরে ফেল্‌ল, ধরে হাকিমের কাছে নিয়ে হাজির কর্‌ল। অবশ্য চুরী হয় নি কিছু, তবুও চোর যে বাড়ী ঢুকেছিল, এইটাই হল তার অপরাধ। হাকিমের সওয়ালে সে স্বীকার কর্‌ল, চুরীর মতলবেই সে বাড়ীতে ঢুকেছিল বটে। হাকিম তার দোষের দরুণ সাজা দিতে যাবেন, এমন সময় চোরটা বল্‌ল, হুজুর, আপনি যা খুসী সাজা আমায় দিন, জেলে দিন, কুত্তা দিয়ে খাওয়ান, আগুণ দিয়ে পোড়ান, যা খুসী তাই করুন, কিন্তু একটা সাজা আমায় দেবেন না। হাকিম আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন, কি সাজা? চোর বল্‌লে, আমার যেন দুটী স্ত্রী জুটিয়ে দেবেন না—এই শাস্তি যেন আমায় না পেতে হয়। কেন? চোর তখন বল্‌লে, সে রা পড়ল কি করে।—বল্‌লে, কিছুই চুরী করবার সুবিধা পেলাম না হুজুর ; সারারাত বাড়ীর কর্ত্তা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে—এক ঠাকরুণ তাঁকে টেনে ওঠাচ্ছেন আর একজন টেনে নামাচ্ছেন। একজন তাঁর চুলের মুঠি ধরে টানতে টান্‌তে নেড়া করে ফেলেছেন, আর একজন পায়জামা ধরে খিঁচতে খিঁচতে সেটাকে টুকুরো টুকরো করেছেন। ভদ্রলোক সারা রাত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছেন। এই মজা দেখতে গিয়েই তো হুজুর আমি ধরা পড়ে গেলাম, আমার আর চুরী করা হল না। তাই বল্‌ছিলাম, বাসনার সংঘাত থেকেই তো দুঃখ পাও। বাসনার মাঝে সামঞ্জস্য করতে পার না ; গৃহবিবাদে গৃহস্থালী ধ্বংস হয়ে যায়, সে তো জান। তাই নিজের হৃদয় ঢুঁড়ে দেখ সেখানে শান্তি আছে কিনা। যদি এক লক্ষ্য, এক প্রাণ হয় তো দুঃখ পাবে না। কিন্তু যদি কোথায়ও দ্বিধা থাকে, বিরোধ থাকে, সব ছারখার হয়ে যাবে, দুঃখ তখন অবধারিত।

এই হচ্ছে দুঃখের হেতু। দুঃখ ডেকে এনেছ তুমি। তুমিই তোমার নিয়তির নিয়ন্তা। লোকের হীন কামনাও থাকে, উচ্চ কামনাও থাকে ; দুয়ে লড়াই চলে ; কিন্তু ক্রমবিকাশের আইন হচ্ছে, এই লড়াইয়ে যে যোগ্যতম, সেই জিত্‌বে, সেই বাঁচ্‌বে। এই হচ্ছে প্রকৃতির আইন। বিশ্বের এই নিয়মের অনুসরণে বাসনার দ্বন্দ্বে যে বাসনা সব চেয়ে শক্তিশালী, সেই জয়ী হবে। কিন্তু বাসনার শক্তি আসে কোথা থেকে? শক্তি আসে সত্য থেকে, আর

নিয়তির নিয়ন্তা

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একটা লোক একটা ভারী বোঝা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। লোকটা বৃদ্ধ, রুগ্ন, দুর্ব্বল, ভারতবর্ষের মত গরম দেশে তার বাস। একটা গাছের ছায়ায় বোঝাটা নামিয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে সে বল্লে, "যম, ও যম!—এসো, আমায় নাও।" গল্পে আছে, ডাকা মাত্রই যম এসে হাজির। যমকে দেখে লোকটা অবাক্, ভয়ে সে থর্ থর্ কাঁপ্ছে। ওটা কি জানোয়ার গো—এমন বিকট আর বীভৎস? সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "আপনি কে?" যম বল্লেন, "কেন, এই যে আমায় ডাক্‌ছিলে! তাই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ কর্‌তে এসেছি।" বুড়ো কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্‌ল, "আমায় মেরে ফেল্‌বেন বলে তো আপনায় ডাকিনি, ডেকেছি শুধু এই বোঝাটা তুলে আমার কাঁধে চাপিয়ে দিতে!"

লোকে এই করে। যত তোমার ঝঞ্চাট-ফ্যাসাদ, দুঃখ-দৈন্য, সব তুমি নিজে ডেকে এনেছ; তুমিই তোমার নিয়তির নিয়ন্তা, কিন্তু নিয়তি যখন এসে হাজির হয়, তখন সুরু কর কান্না। মরণকে ডাক তুমিই, কিন্তু সে এসে সাম্‌নে দাঁড়ালে আবার কাঁদ্‌তে সুরু কর। কিন্তু সেটী তো হবে না। নীলামে সব চেয়ে চড়া দাম হেঁকেছ যার, সে জিনিষ যে তোমায় নিতেই হবে। গাড়ীর ঘোড়াকে দৌড় করালে গাড়ী তার পেছনে পেছনে ছুটবেই। একটা কিছু কামনা কর্‌লে তার ফল পেতেই হবে।

লোকে সাধারণতঃ বুড়ো হয়ে মরে কেন, জোয়ান বয়সে লোক এত কম মরে কেন? বেদান্ত বলেন, মানুষ বুড়ো হলে তার দেহটা হয়ে পড়ে রোগের বাসা; রোগের দাপটে তারা মৃত্যুকামনা করে; তারা নিষ্কৃতি চায়, নিষ্কৃতি পায়ও। এমনি করে তোমার মরণ তুমিই ডেকে আন। বেদান্তের মতে সবাই আত্মহত্যা কর্‌বেই। যখনই মরণ খুঁজ্‌ছ, তখনই মরণ এসে হাজির হচ্ছে। জোয়ান বয়সে মানুষ মরে কেন? এখন হয় তো রামের কথা তোমাদের বিশ্বাস হবে না, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করে দেখো, একদিন রামের কথায় সায় তোমাদের দিতেই হবে। রাম অনেককে যুবা বয়সে মর্‌তে দেখেছেন। তাদের জীবনের গুপ্তকথা রাম জান্‌তেন, সেখানে সন্ধান করে দেখেছেন, এই সমস্ত যুবক অন্তরে অন্তরে মৃত্যুকে চেয়েছিল, পারিপার্শ্বিকের প্রতি তারা বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিল; তারা চেয়েছিল, পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন। তাই হয়। হাতেনাতে প্রমাণ দেবার সময় এখন নাই, কিন্তু কথাটা ঠিক।

ভারতবর্ষের এক সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ে একজন সুস্থ সবল যুবক অধ্যাপক ছিলেন। একদিন এক সাধারণ সভায় তিনি বল্‌লেন, আমি এই সম্প্রদায়ের দরুণ নিজকে উৎসর্গ করেছি, এর দরুণ আমি প্রাণ দেব। কিছুদিন পর্য্যন্ত তিনি মহা উৎসাহে কাজকর্ম্ম কর্‌লেন। কিন্তু ক্রমে তাঁর মতের পরিবর্ত্তন হল, চিন্তার বিস্তৃতি ঘট্‌ল, চিত্ত উদার হল। আর তাঁর কোন বিশিষ্ট গণ্ডীর মাঝে থেকে কাজ করা সম্ভব হল না। সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্তরে অন্তরে তাঁর প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তবুও তাঁকে তাদের সঙ্গে তাল দিয়ে চল্‌তে হচ্ছে; কি কর্‌বেন, বাঁধা পড়েছেন যে, আগের প্রতিশ্রুতি তো ভাঙ্গা যায়

কোথাও থেকে নয়, সত্য থেকে। যে বাসনায় সত্যের আভাস বেশী, যে বাসনায় নীতি আছে, পবিত্রতা আছে, সাত্ত্বিকতা আছে, সেই বাসনাই চরমে জয়ী হবে। তোমার দিকে সঙ্গীন উঁচানো আছে, সম্মুখ-পানে যেতেই হবে, উন্নতিলাভ অবধারিত। কাম-তৃপ্তি নিয়ে সব সময় ভুলে থাক্‌তে পারো না তো। স্বার্থপরতা ও লোভে নিমজ্জিত হয়ে থাক্‌বার সাধ্য তো তোমার নাই। তোমাকে উঠতেই হবে, ধীরে ধীরে হোক, তবু নিশ্চিতই উঠতে হবে। সুখ এই যে তোমার সম্মুখে! এই তো কর্ম্মের বিধান সবাইকে আনন্দ বেঁটে দিচ্ছে।

বাসনা পূরণ হবে কেন? বেদান্ত বলেন, তোমার আত্মস্বরূপ অমর্ত্ত্য। রাম মৃত্যুঞ্জয় শিব। তোমার যত কিছু বাসনা, তোমার এই দেহ-মন, সব সেই সত্যমনন্তমের অন্তহীন সমুদ্রে তরঙ্গমালা মাত্র। উপাদানের গুণ জিনিষে বর্ত্তায়। ব্রহ্মের বা আত্মার নিঃশ্বাস এই জগৎ। এই জগৎ আমারই নিঃশ্বাস। তোমার চোখের পলকে এই জগৎ সৃষ্টি করেছি—আমি, চোখের পলকে এই জগৎ সৃষ্টি করেছ—তুমি! তুমিই আমি। যত কিছু বাসনা, তাতে ব্রহ্মভাবও আছে, অহংভাবও আছে। বাসনার মাঝে যে অংশ-টুকু মৃত্যুঞ্জয় শিবের সঙ্গে যুক্ত, যেটুকু ব্রহ্মভাবে অনুপ্রাণিত, সেইটুকুই অপর অংশকেও ফলোন্মুখ করে। বাসনার মাঝে যে অংশটুকু মায়া, সিদ্ধির পক্ষে সেটুকুই হয় বিলম্বের কারণ। ব্রহ্মভাব ঘটায় বাসনার সিদ্ধি আর মায়ায় ঘটায় তার বিকৃতি। হয়ত জিজ্ঞাসা করবে, বাসনার মাঝে আবার ব্রহ্মভাব কি রকম? বাসনা মত্রেই তো প্রেম, আর প্রেমই ভগবান্। প্রেম ভগবান নয় কি? যেমন মাধ্যাকর্ষণ, তেমনি হচ্ছে বাসনা। মাধ্যাকর্ষণ কি? পৃথিবী চন্দ্রকে টান্‌ছে, সূর্য্য পৃথিবীকে টান্‌ছে, গ্রহগুলি পরস্পরকে টান্‌ছে—এই তো বিশ্বপ্রেম, পরম সন্নিকর্ষের বিধানে একটি অণুর প্রতি আর একটি অণুর আকর্ষণ। অণুতে অণুতে সংযোগ সিদ্ধি হয় কেন, সংসক্তি (cohesion) আসে কোথা থেকে? একটি আর একটিকে টান্‌ছে। তোমার দিক থেকে এই আকর্ষণই তো বাসনা। কেন এই আকর্ষণ, এই শক্তি, এই সংসক্তি, এই মাধ্যা-কর্ষণ? এ সমস্তই বাসনার রূপ। তোমার সমস্ত বাসনাই ব্রহ্মের বিভাব। তাই বাসনার মাঝে যেটুকু ব্রহ্মীভূত, সেটুকু চায় আত্মসম্পূর্ত্তি। কিন্তু যখন বাসনাকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপার করে তোল, তখনই তার সিদ্ধি অন্তর্হিত হয়ে যায়।

বাসনাকে অনায়াসে এবং সহজে রূপ দিতে হলে তার পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটাতে হলে, তার মায়িক উপাদানকে কমাতে হবে, তার যে অমায়িক শিবকর উপাদান, তাকেই জাজ্জ্বল্যমান করতে হবে, তবেই বাসনা সফল হবে। ওঁ—ওঁ!

একটা কবিতা পড়া যাবে, তারপর এ প্রসঙ্গ শেষ হবে।

একবার ভেবে দেখ, তুমি নিয়তির নিয়ন্তা, কি আনন্দে তোমার বুক উপ্‌চে উঠবে! ওঁকার জপছ যখন, নিজকে জানছ যখন নিজের ভাগ্যবিধাতা বলে, তখন তো আর দুঃখ পাবার বা কাঁদবার কিছু থাকে না। তোমার পরিস্থিতি বদলাচ্ছ তুমিই। তুমি যে প্রভু, এইটাই অনুভব কর না—তুমি অবস্থার দাস, এ কথা ভাববে কেন? তুমি যে নিয়তিরও নিয়ন্তা, এই সত্য অনুভব কর প্রাণে প্রাণে—হোক না তোমার ভাগ্য যতই বিরূপ! তুমি কারাগারেই থাক, আর পদদলিতই হও, স্রোতে ভেসেই যাও, মনে রেখো—সোহহম্—অহং ব্রহ্মাস্মি, আমি দেহ নই—আমি সেই—আমি নিয়তির নিয়ন্তা! তোমার বন্ধুর স্রষ্টা তুমি—যাদের বল্‌ছ বন্ধু, তারা যে তোমার বাসনারই সৃষ্টি। যাদের বল্‌ছ শত্রু, তারাও যে তোমারই বাসনার কীর্ত্তি। হে দুর্ম্মন, তুমি আমার সৃষ্টি, হে দোস্ত, আমারই সৃষ্ট তুমি! এই ভাবে অনুপ্রাণিত হও, এই ভাব ধারণ কর, দেখবে কি আনন্দ।

পাত্র ভরি পিয়ে এই আনন্দ-মদিরা
পূর্ণ মোর মনস্কাম—সিদ্ধ আমি আজ।
প্রভাতের সমীরণ মৃদু মন্দ বায়
চুম্বনে শিহরি তুলে ফুটালো আমায়!
ইন্দ্রধনু রঙ্গে মোর বিচিত্র বসন,
বিদ্যুতে ঝলকে ওই আমার শাসন;
গোলাপের গণ্ডে আমি ফুটায়েছি হাসি,
দলে দলে ঝরি পড়ে মুকুতার রাশি;
স্বর্ণসূত্রে গেঁথে নিই যা কিছু নূতন—
তপন-কিরণে রচি মধুর স্বপন।
নৃত্যপরা শাখি-শাখা, তরঙ্গ-শিঞ্জন,
লতিকার আলিঙ্গন, ভ্রমর-গুঞ্জন—
সবি আমি; পূর্ণিমার রজত উচ্ছ্বাস
স্নিগ্ধ, কম আমারি সে সুরভি নিঃশ্বাস।
নিঃশ্বসি বাঁচাই বিশ্বে, প্রশ্বাসে প্রলয়—
আমি তার আদি-অন্ত দিব্য জ্যোতির্ম্ময়!

পড়ে আছে কোন্ কাজ, কোথা বল যাই—
পূরিয়াছি বিশ্বব্যোম, কোথা আর ঠাঁই!
কোথায় কামনা মম, কোথায় সংশয়
বীর্য্য মম বহ্নিসম দহে বিশ্বময়;—
আছে কাল কুক্ষিগত; আমি দুঃখহত?
বিশ্বের নিদান এই মোরি মুষ্টিগত!
"এইমাত্র" কাল মোর, "হেথা" মোর দেশ—
চুকেছে সমস্যা যত—রহস্য নিঃশেষ!
ভাল যাহা, মন্দ যাহা—তিক্ত আর মধু,
আমার নাড়ীতে তারা স্পন্দমান শুধু।
আমি সখা, আমি সখী, সলাজ প্রণয়,
বাসনার দুরু দুরু—কম্পিত হৃদয়।
স্বার্থক্ষুণ্ণ নহি আমি—বাধা-বন্ধহারা
আমারি প্রাণের মাঝে সবাকার সাড়া—
আমি শিব গুণাতীত, অরি-মিত্র সম—
হে নিখিল, আজি মোর চরণে প্রণম!

আমেরিকা, গোল্ডেন্ গেট্ হল্
২৪ জানুয়ারী, ১৯০৩

——*——

মীরাবাঈ

—*—

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১৫২৭ খৃষ্টাব্দে বাবরের সহিত মীরার শ্বশুর মহারাণা সাগাজীর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মীরার পিতা রত্নসিংহজী এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সেই বৎসরেই মহারাণা সাগাজীও স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র, মীরার দেবর রত্নসিংহ চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রত্নসিংহ মোটে চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই বিক্রমাদিত্য চিতোরের রাণা হইলেন। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল অতিদীর্ঘ হয় নাই। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যাচার ও প্রজাপীড়নের অখ্যাতি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মীরারও দুঃখের জীবনের এই সময় হইতেই সুরু।

বিধবা হওয়ার পর মীরার আর সংসারে কোনও

অবলম্বন রহিল না। গিরিধারীর প্রতি যে প্রেম বুকে পুরিয়া তিনি স্বামিগৃহে আসিয়াছিলেন, কৈশোরের সেই স্নিগ্ধ স্মৃতি এখন যৌবনে পূর্ণরাগে ফুটিয়া উঠিল। চিতোরের কুলদেবতা একলিঙ্গ মহাদেব। তাঁহার প্রতি উদাসীন থাকিয়া চিতোরেরই এক বধূ গোপালের ভজনে মাতিয়া উঠিবে, তখনকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের দিনে এ কথাটা মীরার শ্বশুরকুলের সকলের ভাল না লাগারই কথা। শোনা যায়, মীরার শাশুড়ী বধূকে নানারকম বুঝাইয়া পড়াইয়াও গোবিন্দ-প্রীতির মোহ ছাড়াইতে পারিলেন না, অবশেষে বিরক্ত হইয়া মীরাকে খাসমহল হইতে পৃথক্ একখানা বাড়ী করিয়া দিলেন। মীরার আরও সুবিধাই হইল। সংসারের দায় হইতে তিনি পিছু হটিয়া আসেন নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া নারীসুলভ সংসারমত্ততাও তাঁহাকে কোনদিন পাইয়া বসে নাই। সেই সংসার যদি আজ আপনা হইতেই দূরে সরিয়া যায় তো মীরা খুসী হইবেন না কেন?

মীরার পিতামহ দুদাজী পৌত্রীকে বেশ ভাল করিয়াই লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। ছোটকাল হইতেই মীরার কবিত্বশক্তির স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। নিজে ভজন রচনা করিয়া অপরূপ সুরসংযোগে তাহা গান করা তাঁহার এক পরম আনন্দ ছিল। বিধবা হওয়ার পর মীরা বিশেষ করিয়া এই ভজনরচনায় মনোনিবেশ করিলেন। শাশুড়ী যখন তাঁহাকে সংসার হইতে পৃথক করিয়া দিলেন, তখন এই ভজনাবেগে যেন নূতন প্রেমের জোয়ার আসিল। মীরার ভজনগানের খ্যাতি দূরদুরান্তরে ছড়াইয়া পড়িল, ফলে ভক্ত-মহলের মাঝে সাড়া পড়িয়া গেল। গীত শুনিয়া গীতকারিণীকে দেখিবার দরুণ ভক্তমণ্ডলীর আগ্রহ বাড়িল। মীরা যে রাজার দুহিতা, রাজাবরোধবাসিনী রাজকুলবধূ, লোকে এ কথা ভুলিয়া গেল। মীরাও কাহাকে সঙ্কোচ করিলেন না। সাধু-সন্ত ভক্তমণ্ডলীর কাছে তাঁহার অবারিত দ্বার। তিনি পরম সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন, তাঁহাদের পরিচর্য্যা করেন, ইষ্টগোষ্ঠী করেন, স্বরচিত ভজনগান শুনাইয়া তাঁহাদিগকে বিস্মিত ও পুলকিত করেন। মীরা সরল প্রাণেই এই সমস্ত করিয়া যান, লোকে তাঁহার এই ব্যবহার কি চোখে দেখিবে, সে চিন্তা মুহূর্ত্তের দরুণও তাঁহার চিত্তে উদয় হয় না। তাঁহার সরল যুক্তি— তাঁহার গিরিধারীকে যিনি আপন বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি তো মীরারও আপন জন, তাঁহার কাছে মীরার আর লজ্জা কোথায়, গৌরব কোথায়? এখানকার সংসার তো তাঁহার মিটিয়াই গিয়াছে, এখন গিরিধারীকে লইয়া তাঁহার নূতন সংসার। সে সংসারের গিরিধারী স্বগণেরাই তো তাঁহার পরমাত্মীয়!

সাধু-সন্তেরা যে মীরার গান শুনিতেই আসিতেন, তাহা নয়, আরও একটুখানি উত্তাপ দিয়া এই ভক্তির কমলকলিকাটীকে পূর্ণপ্রস্ফুটিত করিয়া যাইতেন, এমন তপনদ্যুতি তপস্বীর অভাবও ইহাঁদের মাঝে ছিল না। ইহাঁদের কৃপাতেই মীরার ভক্তির তন্ময়তাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শোনা যায়, উত্তরভারতের প্রসিদ্ধ সন্ত রৈদাসজী মীরাকে বিশেষ কৃপা করিয়া যান। রৈদাসের বাণীতে এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, কিন্তু মীরার দুই চারিটী শব্দে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। একস্থানে মীরা বলিতেছেন—

খোজত ফিরোঁ ভেদ ৱা ঘর কো
 কোঈ ন করত বখানী।
রৈদাস সন্ত মিলে মোঁহি সতগুরু—

—আমি সে ঘরের রহস্য খুঁজিয়া ফিরিতেছিলাম, কিন্তু কেহই আমাকে কিছু বলিতে পারিল না। এমন সময় সন্ত রৈদাসকে পাইলাম সদ্‌গুরুরূপে—

আর এক জায়গায় আছে—

মেরো মন লাগো হরিজী শূঁ
 অব ন রহূঁগী অটকী।
গুরু মিলিয়া রৈদাসজী
 দিন্হী জ্ঞানকী গুট্‌কী॥

—ওরে আমার মন, এইবার হরির সঙ্গে মিলিয়া যাও, আর তো আমি কোথায়ও আট্‌কা পড়িয়া থাকিব না। আমি যে রৈদাসকে পাইয়াছি আমার গুরু, তিনি দিয়াছেন আমায় জ্ঞানের একটী গণ্ডূষ!

মীরার গৃহে এমনিধারা সাধুসমাগমের কথা যথা-সময়ে রাণার কর্ণগোচর হইল। শিশোদীয় কুলবধূ আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া লজ্জার মাথা খাইয়া ভিখারী-নাগারী লইয়া ঢলাঢলি সুরু করিয়াছে, এ কথা শুনিয়া কোন্ পুরুষসিংহ স্থির থাকিতে পারে? ভগবানের ভজনা করিতে হইবে কি লজ্জাসরমে জলাঞ্জলি দিয়া? আপনমনে ভগবান্‌কে ডাকিলে হয় না? দশজনকে লইয়া এ কি কেলেঙ্কারী? পবিত্র শিশোদীয় কুলে কলঙ্ক লেপন, এই কি ভক্তির নমুনা? ক্ষোভে, অপমানে রাণা বিক্রমাদিত্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। মীরার এই বেহায়াপনা ছুটাইবার দরুণ নানা সলা-পরামর্শ হইতে লাগিল। মীরার শুভাকাঙ্ক্ষী কেহ কেহ গোপনে আসিয়া মীরাকে এই সংবাদ দিয়া তাঁহাকে সাবধান হইতে উপদেশ দিল। মীরা মৃদু হাসিয়া গাহিলেন—

রাণাজী মেরাড়া মারে কাঁঈ কর্‌লেসী—
মৈ রসিয়ো রাম রিঝারা—এ মাঁ!
রাণাজী রুসেগা তো ঘর জারেগা—
রাম রুস্যাঁ মর্ জাস্যাঁ—এ মাঁ!

—মাগো, মেবাড়ের রাণা রাগ করিয়া আর আমার কি করিবেন? আমি যে রামের প্রেমে ডুবিয়া রহিয়াছি! রাজা যদি রাগ করেন তো বড় জোর ঘরের বাহির হইতে হইবে, কিন্তু আমার রাম যদি বিরূপ হন তো আমার প্রাণ যে বাহির হইয়া যাইবে!

তখনকার রাজশাসন স্বেচ্ছাচারমূলক। রাজার একটা ইঙ্গিতে মীরাবাঈর অস্তিত্ব ধরণীর পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাওয়া কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। তবুও যে মীরা কি করিয়া রাজরোষ হইতে বাঁচিয়া গেলেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। অত্যাচারী মাত্রেই কাপুরুষ হইয়া থাকে। বিক্রমাদিত্যও কাপুরুষ ছিলেন। মীরার জ্যেষ্ঠতাত বীরমদেবজী তখন মেড়তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁহার পরাক্রমের কথা বিক্রমাদিত্য জানিতেন, সুতরাং সেইদিক হইতেও তাঁহার আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল বলিয়া মনে হয়। যাহাই হউক, চিতোরের বুকে বসিয়া মীরার "নিরঙ্কুস অতি নিডর রসিকজস রসনা গায়ো" অথচ মগরাণা বিক্রমাদিত্যের শত চেষ্টাতেও তাঁহার "বার ন বাঁকো ভয়ো" —এ কথা ঠিক।

মহারাণা মীরার দুরাগ্রহ দূর করিবার দরুণ যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে নানা প্রকার কিম্বদন্তীই আছে। ইহার মাঝে কতটুকু সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিচার করিয়া বলা কঠিন। বিষপ্রয়োগে মীরাকে হত্যা করার চেষ্টা সম্ভবতঃ সত্য, নাভাজীও তাঁহার ছপৈয়ে বিশেষ করিয়া ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন। মীরার শব্দাবলীতে অন্যান্য অত্যাচার কাহিনীর সহিত এই ঘটনাটীই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। মীরার নাম করিয়া অন্যান্য অত্যাচার কাহিনীর উল্লেখ মীরার নিজের কৃত কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। এই সমস্ত শব্দের রচনাভঙ্গীতে বিশেষ কিছুই কৃতিত্ব নাই। বরং "এত অত্যাচারেও তোমরা আমার কিছু করিতে পারিলে না"— এইরূপ একটা দম্ভের ভাবই অধিকাংশ স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গিরিধর নাগরকে নিয়া যে বালা দিনরাত্র তন্ময় হইয়া থাকিত, তাহার চিত্তে এই অবলেপ জাগিবার অবসর হইত কিনা, সে বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। তাহা ছাড়া সাজার ধরণটাও সনাতন, অর্থাৎ সেই বিষপান, সর্পদংশন, শূলারোপণ ইত্যাদি। প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারকাহিনী অনেক ভক্তেরই কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। মীরাকেও তেমনি অত্যাচারের ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া দেওয়া ওই ধরণের উত্তেজিত কল্পনারই যে কারসাজি নয়, তাহাই বা কি করিয়া বলি? এই সমস্ত কারণে

মনে হয়, এই অত্যাচারকাহিনীতে পৌরাণিক অতি-রঞ্জনের খাদ যেন একটু বেশী পরিমাণেই মিশানো রহিয়াছে। মীরার জীবনীকে এই সমস্ত অলৌকিক কাহিনী হইতে মুক্ত করিলে তাহার মহিমা খর্ব্ব হয় না। অলৌকিকত্বের ভাঁজ না দিলে সাধুচরিত্র আর আমাদের মুখে রোচে না, এমনি একটা কুঅভ্যাস আমাদের দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইহাতে সাধুর অন্তর্জীবনের মাধুরী ছাপাইয়া তাঁহার বহির্জ্জীবনের অতিরঞ্জন ও আড়ম্বর বিশেষ করিয়া ফাঁপিয়া উঠে। ফলে সাধুচরিত্রের আলোচনায় একটা মূঢ় বিস্ময় ও যুক্তিহীন বিশ্বাসালুতা অর্জ্জন করা ছাড়া আত্মজীবন গঠনের কোনও উপাদানই আমরা খুঁজিয়া পাই না। ইহাতে সাধুর কেরামতি যতটুকু না সূচিত হউক, আমাদের নৈতিক দুর্ব্বলতা যে বিশেষরূপেই সূচিত হইয়া থাকে, সে কথা বলাই বাহুল্য। মীরার প্রতি অত্যাচারের কিম্বদন্তীগুলি এই জন্য আমরা পাঠককে সাবধানে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

মহারাণা বিক্রমাদিত্য শুনিয়াছিলেন, মীরা একাকী ঘরে বসিয়া কাহার সহিত কথা বলেন। সে কথাও আবার একলা কথা নয়, পুরুষের কণ্ঠে মীরার কথার জবাবও নাকি শুনিতে পাওয়া যায়। একদিন রাণার কাছে এই সংবাদটী গিয়া পৌঁছাইল। রাণা আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে মীরার মহলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন, ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দ্বারে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "দ্বার খোল্! হতভাগী, ঘরে কাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিস? আজ তোকে খুন করিব!" মীরা ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া দিয়া প্রশান্ত করুণ দৃষ্টিতে রাণার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি চাও?" রাণা গৃহ জনশূন্য দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার সহিত কথা বলিতেছিলে?" মীরা তেমনি প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আমার ইষ্টদেবতার সহিত!" রাণা বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখাইতে পার—কোথায় সে আছে?" প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে মুহূর্ত্তের মাঝে মীরার মুখ অরুণবর্ণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। শান্তকণ্ঠে মীরা বলিলেন, "এই যে তিনি আমার সম্মুখে, আমার পশ্চাতে, আমার চারিপাশে—এই যে সে আমার বুকের মাঝে! তুমি তাঁহাকে দেখিতে চাও রাণা? তুমি কি তাঁহাকে ভালবাস?" বলিয়া করুণাপূর্ণ নয়নে রাণার মুখের দিকে চাহিলেন। সাধ্বীর সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ধত মহারাণা সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেলেন। আর একটী কথাও না বলিয়া মাথা হেঁট করিয়া তিনি ধীরে ধীরে কক্ষত্যাগ করিলেন।

মীরার মাঝে মহারাণা সেদিন এমন একটা কিছু দেখিতে পাইয়াছিলেন, যাহার সহিত ইতিপূর্ব্বে তাঁহার কোনও পরিচয়ই ছিল না। আর কিছু বুঝিতে না পারিলেও রাণা এইটুকু বুঝিলেন, জোর করিয়া বা ভয় দেখাইয়া এই নারীকে বশ করা যাইবে না। ইহাকে আয়ত্ত করিবার দরুণ কৌশল প্রয়োগ প্রয়োজন। অনেক চিন্তার পর তিনি এক উপায় স্থির করিলেন। রাজাবরোধ হইতে চম্পা আর চামেলী নামে দুইটী যুবতীকে মীরার সঙ্গিনী করিয়া পাঠাইলেন। তাহাদের প্রতি গোপনে রাণার এই আদেশ রহিল, কৌশলে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তাহারা মীরাকে এই পাগলামী হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে এবং নানা অছিলায় মীরার মহল হইতে সাধুর ভিড়ও ভাঙ্গিয়া দিবে। মীরা সমস্তই বুঝিলেন, কিন্তু কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। নব-নিযুক্তা সঙ্গিনীদ্বয় পরম সমাদরে মীরার মহলে গৃহীত হইল। তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য পালনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না; তবে শোনা যায়, মীরার মধুর ব্যবহারে ও ততোধিক মধুর ভজনগানে তাহারা রাণার উপদেশ এমন করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছিল যে দুদিন পরে মীরার মত তাহারাও নাকি কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হইয়া গিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

দ্রষ্টা

চিত্তনদী উভয়তঃপ্রবাহা। বিষয় অভিমুখীও তার টান রয়েছে, আবার তেমনি নিবৃত্তিমুখী। মানুষের জীবনটাও দোটানায় পড়ে কেবলই দুল্ছে; কবে যে দু'সতীনে পীরিত হবে! সে দিন যদি তার বিমল শান্তি উপভোগ করবার সুযোগ ঘটে। মানুষ জানে সুখই তার চরম নয়, দুঃখও তাকে চিরকাল জ্বালিয়ে যাবে না, শান্তির উপলক্ষ্য মানুষের এই নিশ্চিত ভবিষ্যত আশাটুকুই। ইচ্ছার ওপরও রয়েছে মানুষের অসীম আধিপত্য; পশু চলে কামনার নির্দ্দেশে, মানুষ চলে বিবেক বশে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ পশুতে যেমনি আছে, মানুষেও তেমনি—পশু হয়ত প্রবৃত্তির তাড়নায়, কুইচ্ছার বশবর্ত্তী হয়ে এমন একটা কিছু করে বস্‌বে, দিন দিন যাতে তার জীবনীশক্তি ক্ষয় হয়ে আসবে। উটের মুখ দিয়ে দর্‌দর্‌ করে রক্ত পড়ে, তবু নাকি উট কাঁটা ঘাস খাওয়া ছাড়ে না। এই তো পশুর পরিণাম। মানুষের বেলায় কি? সে যখন দেখবে বিষয়ের জ্বালায় কেবল জ্বলেপুড়ে মরা, তখনই এমন এক পথের অনুসন্ধানে বের হবে যেখানে সে দুঃসহ যাতনা ভুগতে না হয়। বাধা পেয়ে যে মানুষ বিচিত্র পথের অনুসন্ধান করে, তার মূলেও রয়েছে ব্যাপ্তিজ্ঞান—সে জানে সুখের পাশে দুঃখ, আলোর পাশে অন্ধকার, বিপদের পাশে সম্পদ্, পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী দুটী পদার্থই সমান্তরালভাবে অনন্তকাল ধরে চল্‌ছে! আর দেখছিও তাই, কেউ চিরকাল দুঃখীও থাক্‌ছে না, আবার কেউ চিরকাল রাজত্বও করছে না। একটীর পর একটীর উত্থান-পতন অবশ্যম্ভাবী। আভাসে বুঝি, উপলব্ধিতে এমন এক স্তরের অনুভূতি পাই—যেখানে মাধ্যাকর্ষণের অলঙ্ঘ্য নিয়মেরও ব্যতিক্রম রয়েছে। "নেতি নেতি" বিচারের মূলেও রয়েছে সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের স্মৃতি; তাই মানুষ স্বর্গলাভের কামনাকেও প্রতিহত করে আরও উর্দ্ধলোকে ওঠে গিয়েছে। মানুষ জানে—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"—পুণ্য শেষ হলেই আবার জনম-মরণরূপ আবর্ত্তের মাঝে পড়তে হবে।

উপনিষদে রয়েছে, আত্মবিদ্ পুত্রাদি এষণাত্রয় ত্যাগ করেন। আবার সাধারণ লোক পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা নিয়েই বিষয়কর্ম্মে নিরত। এর মাঝে আবার এমন নাস্তিকও আছে, যারা পরলোক মোটেই মানে না; তাই লোকৈষণা তাদের মাঝে জাগেই না। সন্ন্যাস—নিবৃত্তির পথ, সংসার—প্রবৃত্তির পথ, আবহমানকাল ধরে অক্ষুণ্ণভাবে এ দুটী ধারা প্রবর্ত্তিত হয়ে আস্‌ছে। তাই দেখছি, মূলে যদি আদিপাপের ভিত্তি থেকে থাকে, তবে আদিধর্ম্মেরও স্থান রয়েছে সেখানে। ডারউইন্ বলেছিলেন, একই পূর্ব্বপুরুষ হতে যেমন একদিকে বানর, অন্যদিকে তেমনি মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। মানুষের মাঝেও দেখতে পাই, সময়ে বিষয়-বাসনা চিত্তের মাঝে এমন বিক্ষোভ তোলে, যখন বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে পশুর চেয়েও অধম হয়ে যাই আমরা; আবার সময়ে আপনি বিষয়-বিতৃষ্ণা বা নির্ব্বেদ এসে পড়ে। জীব সৃষ্টি করে সঙ্গে সঙ্গেই গুরুরূপে ভগবান অবতীর্ণ হলেন, তা না হলে পথভ্রান্ত পথিকদের কে পথ দেখিয়ে সুপথে আনয়ন করবে? প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির দ্বন্দ্বই আমাদের জীবন। যখন যে শক্তি প্রবল হয়ে উঠছে, তার কাছে অপর শক্তি আপনি পদানত। এমন করে দেবাসুরের সংগ্রাম আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও দেখতে পাই। বুদ্ধি আত্মানুরাগী, তাই বিষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়লেও, এ বুদ্ধিই আবার মানুষকে আসল

পথ দেখিয়ে দেয়। নিরোধ-জ্ঞানকে সম্যক জ্ঞান বলা যেতে পারে না, কেননা তাতে একটা দিক্ জোর করে দাবিয়ে রাখা হয়, তখন অন্যদিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু বৈদান্তিকের দৃষ্টি বড় উদার, তিনি হচ্ছেন দ্রষ্টা—মাধ্যাকর্ষণের পরপারে দাঁড়িয়ে অনায়াসে আনন্দে বিভোর তিনি। বৈদান্তিক কারও কুনজরে পড়েন না, তিনি তো কাউকে বাধা দিয়ে উত্তেজনা জাগাতে যান না—তাঁর অমায়িক উদার দৃষ্টিতে সবাই এসে প্রাণ খুলে দেয় তাঁর কাছে। ভয় দেখিয়ে শাসন বৈদান্তিকের শাসন নয়, তাই বৈদান্তিক অপক্ষপাত-দৃষ্টিতে যত তত্ত্বের আবিষ্কার করেন অনেক নিরোধবাদীর কাছেও সে সকল তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। আপনজনের কাছেই আমরা মনের কথা খুলে বলি—জানি দোষ হলেও ক্ষমা পাব। যার কাছে ঘেঁস্‌তে পারব না, তার কাছে আবার আমার দুঃখের কাহিনী কি বলব—তাই আমার মনের আক্ষেপ থেকে যায়ই—কেননা আমি প্রবৃত্তির পথে মগ্ন, আমার করুণকাহিনী আমার প্রতি যার সহানুভূতি রয়েছে সে-ই শুনবে। তাই সাত ঘাটের জল খেয়ে আজ মুক্তকণ্ঠে বলছি, বৈদান্তিকই আমার বন্ধু, দুঃসময়ে তার দৃষ্টি নিরোধবাদীর মত আমায় আহত করে নি। মানুষের চঞ্চলতারও একটা সীমা রয়েছে. এমন এক শুভমুহূর্ত্ত আসে জীবনে, যখন মনে হয়, আর টানাটানি ভাল লাগে না—এমন এক জায়গায় গিয়ে বসব, যেখান থেকে যেন আর টল্‌তে না হয়। একেই বলে নির্ব্বেদ, এই সন্ন্যাসের লক্ষণ। জীবনের একটা সমস্যাই হয়েছে, এই নির্ব্বেদ বা সন্ন্যাস আসে কি করে। স্বভাববাদী বল্‌ছেন, সময় হলে আপনি সব হয়ে যাবে, তার জন্য কোন সাধন-ভজন, যোগ-যাগের প্রয়োজন হয় না। এ কথাতে কর্ম্মপরায়ণ প্রবৃত্তিমুখী জীবের প্রাণে যে শান্তি আনয়ন করবে, তা মনে হয় না; কেননা তারা যে একটা কিছু না করে থাকতে পারে না। এখন কার কথা শুনব? গীতাতে এর সুন্দর মীমাংসা রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"—যাঁরা একাগ্রচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বদা আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করি যাতে তাঁরা আমাকে অনায়াসে লাভ কর্‌তে পারেন। এ জায়গায় তো স্পষ্ট নির্দ্দেশই রয়েছে—আমার আকুল চেষ্টা থাকা চাই, ভক্তের ভাষায় যাকে ভগবানকে পাওয়ার-উন্মাদনা বলে; কিম্বা জ্ঞানীর ভাষায় বল্‌ছে, আমাকে জানবার দরুণই আমার আত্যন্তিক চেষ্টা। সাধনা চাইই; তবে সিদ্ধি তাঁর কৃপাসাপেক্ষ। আমার অভিমানকে খর্ব্ব করার মহৌষধই হচ্ছে এ ভাবনা। আমাকে কোমর জলে নামতেই হবে, তবে না ভগবান্ আমার দরুণ গলা জলে নাম্‌বেন। মোট কথা, আমি আমার বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে তাঁকে পরিমাপ কর্‌তে পারব না; তবে কিনা বুঝ্‌তে হলে এ বুদ্ধিরও প্রয়োজন।

আর একজায়গায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" যারা বাসনাশূন্য হয়ে অনন্যচিত্তে আমার উপাসনা করে, সেই একমাত্র নিষ্ঠাবান্ পুরুষগণকে আমি যোগক্ষেম প্রদান করি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যারা আমার উপাসক, তারা ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত। কোথা থেকে কে যে কবে "কিছু কর্‌তে হবে না", এই বলে স্বভাববাদের সৃষ্টি করল, এই তো আশ্চর্য্য। আর অসীম শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ যাদের সহায়, তাদের নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকাই যে কঠিন। আজীবন সে খাট্‌তে খাট্‌তে মরে যাবে—অফুরন্ত শক্তির উৎস রয়েছে তার মাঝে, এই জেনে। প্রত্যক্ষ দেখতেও পাচ্ছি তাই—শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, নানক, গৌরাঙ্গ এঁরা সারাটা জীবন জীব-

কল্যাণার্থে মঙ্গল কার্য্যে উৎসর্গ করে গিয়েছেন, অথচ অভিমানের লেশমাত্র নেই কোন জায়গায়। একেই তো বলে সব করেও কিছু না করা—কিম্বা দ্রষ্টৃত্ব।

রামকৃষ্ণদেব বল্‌তেন, "গোয়ালিনী পথে হেঁটে যায় বটে; কিন্তু নজর থাকে তার মাথার উপর যে দইয়ের ভাঁড় তার দিকে—তেমনি বিষয়কর্ম্ম কর কিন্তু মনটী নিরত রাখ ভগবানের চিন্তায়।" দ্রষ্টৃত্ব মানে, ক্ষুদ্র অহংএর সৃষ্টি জঞ্জালের বিস্মৃতি—আর আমি যে বৃহৎ এই ভাবনায় মগ্ন থাকা। কর্ম্ম ছেড়ে বসে থাকে তো আল্‌সে মানুষ; তাকে কি আর দ্রষ্টা বলে? মরণ জেনেও মানুষ মরণকে বরণ করে নেবার সাহস রাখে—একেই বলে অমরত্বের নিদর্শন। কর্ম্মত্যাগ করলেই ভগবদ্দর্শন মিল্‌বে, এ রকম রায় কেউ দিতে পারে না। একটা ছেড়ে অন্যটা ধর্‌ছি, কতই না বিচিত্র সাধনপন্থার অন্বেষণে চিত্ত ব্যাকুল, শুধু সামঞ্জস্য আনবার প্রচেষ্টায়;—মানে চঞ্চলতা আর ভাল লাগে না, একটা স্থিতি চাই। সৃষ্টিক্রিয়া বন্ধ করে ভগবান দ্রষ্টা হন নি; তাহলে দ্রষ্টা হতেন তিনি কিসের? তুমিও যে ভাবছ কর্ম্মের জঞ্জাল থেকে নিজকে বাঁচিয়ে এমন এক জায়গায় সুরক্ষিত করবে, যেখানে বাদ-প্রতিবাদ, হিংসা-দ্বেষ, রেষারেষির এতটুকু ঘর্ষণও থাক্‌বে না—সেখানে কি দৃশ্য হবে তোমার? পারিপার্শ্বিক কি তোমায় জাগিয়ে রাখবার, দৃশ্য দেখে চমৎকৃত হবার কম সাহায্য করছে অহরহঃ? আমি তো দেখি, বৈদান্তিকের, দ্রষ্টার মনে নিত্য-নূতন সমস্যা, সে তো কেবল তেলা মাথায়ই তেল দিতে যায়না; তার পরাণ যে লাঞ্ছিতা, সমাজ-বহিষ্কৃতা পতিতাদের জন্যও কাঁদে। বেদান্ত সবার মূল আশ্রয়স্থল; তাই বৈদান্তিকের বুকভরা বেদনা! দ্রষ্টা তো আর অচেতন নয় যে পরের দুঃখ-কষ্টেও তাঁর মন গল্‌বে না? শ্রীকৃষ্ণ দ্রষ্টা হয়েও নিজে সারথি সাজলেন। আসল দ্রষ্টাকে লোকে চিনতেই পারে না, কেননা তিনি তো বহির্জ্জগতের সঙ্গে কোন দিক দিয়ে বিরোধ ঘটান না!



সত্যকাম

—:০:—

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১০

বেলা হয়েছে। বনের পথে সত্যকাম চলেছে গুরু গৌতমের আশ্রমের পানে—একা একা। কালও এই পথ দিয়ে সে গিয়েছে; তখন তার গতিতে ছিল একটা অধীর চঞ্চলতা, চোখে ঔৎসুক্যের দীপ্তি, মুখে কলভাষ। কিন্তু আজ আর তার সে ভাব নাই; কি একটা অজানা ভাবনা যেন

পাথর চেপে বসেছে বুকের ওপর, মনের মাঝে একটা অস্বস্তি কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে শুধু, তারই গুমোটে দুটী চোখ জ্বালা করে বাষ্প ছেয়ে আসে যেন, ঠোঁট দুটী ফুলে উঠে কুঁকড়ে পড়ে!—সত্যকাম কেঁদে ফেল্‌বে নাকি?

অজ্ঞাতসারে দুটী হাত মুষ্টি বদ্ধ করে, রুদ্ধ নিশ্বাসে সত্যকাম ভাবে, নাঃ, কাঁদ্‌ব কেন? আমার কি হয়েছে?—ঠিক কি হয়েছে, তা সে বল্‌তে পারে না, কিন্তু একটা কিছু যে হয়েছে, সে কথাও তো মন থেকে ঠেলেকে পারছে না! কালও তো এমনি আলোকে উজ্জ্বল প্রভাত ছিল, এমনি বনের পথে বাতাসের দোলায় পাতার সর্ সর্, ঝিল্লীর ঝঙ্কার, চম্‌কে-ওঠা হরিণের ত্রস্ত পলায়ন—তার সঙ্গে লঘু মেঘের ছোঁয়াচ লাগা শরতের নীলাকাশের মতই শুভ্র কল্পনায় সমুজ্জ্বল তার অনাবিল চিত্তটী! কিন্তু কই, আজ তো আর সে ঔৎসুক্য, সে আনন্দ সে অনুভব করছে না। এতদিন পর্য্যন্ত স্রোতের মত অনায়াসে বয়ে চল্‌ছিল দিন-গুলি, আজ যেন কোন্ সঙ্কীর্ণ পথে কি একটা আড় হয়ে ঠেকে পড়েছে, আর তাকে কেন্দ্র করেই যেন পেছনের যত জঞ্জাল এসে সাম্‌নে স্তূপ হয়ে জম্‌ছে!

পিতৃপরিচয়ে তার গোত্র-পরিচয়, নইলে ঋষির সমাজে তার প্রবেশ নিষেধ।—কেন? তার পিতা কে, সে তা জানে না বলেই জগতে তার আর যা কিছু জান্‌বার পথ বন্ধ হয়ে গেল? কেন, মানুষ মানুষের প্রতি এমন নিষ্ঠুর হয় কেন? আচ্ছা, তার পিতা কে? মা কি তা জানেন না? জান্‌লে তো তিনি বল্‌ছেন না, কেন? কিন্তু মা যে আবার বল্‌লেন, "হয়ত জানি, হয়ত জানি না, কিন্তু সে কথা তোর কাছে বলি কি করে?" মায়ের তখনকার সেই রোদনাপ্লুত আর্ত্ত মুখ-খানির কথা মনে পড়তেই একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ আর অভিমান যেন তার বুকের মাঝে ধক্‌ধক্ করে উঠ্‌ল। তার পিতা যেই হোক, সে কিন্তু নিষ্ঠুর--অতি নিষ্ঠুর! তার মায়ের মুখে অমন কুণ্ঠা, অমন আর্ত্তি আর কোনও দিন তো সে দেখেনি। কাল সে যেন আভাসে অনুভব করেছে, তার মায়ের বুকে লুকানো গভীর একটা যাতনা। কে এই ব্যথার দরুণ দায়ী?—নিশ্চয়ই তার পিতা। তাঁর কথা বলতে গিয়েই না মা অমন করে অবশ হয়ে তার কাঁধের ওপর এলিয়ে পড়্‌লেন!—"আহা দুঃখিনী মা আমার! তোমাকে যে অমন করে কাঁদাতে পারে, হোক্ না সে আমার পিতা, তবুও তাকে আমি চাই না! কোনও দিন যদি তার সাথে দেখা হয়, আর আমায় সে আদর করে কোলে নিতে চায়, কিছুতেই তো আমি তার কোলে যাব না। বলব, এমন করে আমার মাকে কাঁদিয়েছ তুমি—যাও, আমরা চাই না তোমায়!"

পিতার প্রতি এই কল্পিত অভিমানে সত্যি সত্যি এবার তার দুটি চোখ জলে ভরে এলো। মায়ের স্নেহে সম্পুটিত থেকে এত কাল বাস্তবিকই সে পিতার অভাব কোনও

দিন অনুভব করেনি, কিন্তু এবার বাইরের বিচিত্র জগতের একটুখানি আভাস পেয়েই যেন সে বুঝ্‌তে পার্‌ল, পর্ণকুটীরে মায়ের কোমল বক্ষে মাথাটী রেখে পরমতৃপ্তিতে দুটী চোখ বুজে থাকা চলে, কিন্তু সংসারের পথে চল্‌তে গেলে চাই একটী বলিষ্ঠ বাহুর অবলম্বন; সে বাহু মাতার নয়—পিতার। আজ যদি তার পিতা থাক্‌তেন তো তার মাকেও তো এমন বিব্রত হতে হ'ত না!

আচ্ছা, বাস্তবিকই কি তার কোনও আশ্রয় নাই? গুরু গৌতম—তিনি কি তার পিতা হতে পারেন না?—গত দিনের একটা মুগ্ধ স্মৃতিতে সত্যকামের মনটী আবিষ্ট হয়ে এল।—"আহা, তাঁর চোখ দুটী! কেমন করে তাকান যে! মুখে একটীও কথা বলেন না, কিন্তু চোখের স্নিগ্ধদৃষ্টি বুলিয়ে যেন সর্ব্বাঙ্গ শীতল করে দিয়ে যান।—আচ্ছা, আমার পিতা যদি থাক্‌তেন তো তিনি কি এই গুরু গৌতমের মতই হতেন?—বোধ হয়! বোধ হয়ই বা কেন?—নিশ্চয়ই! নইলে আর কাউকে যে আমার ভালই লাগ্‌ত না!"

অদ্ভুত এই কল্পনা, কিন্তু তাই যেন একটা সুমিষ্ট সৌরভের মত তার বেদনাতুর চিত্তকে ঈষৎ উত্তেজিত করে তুল্‌ল। তার পর এই সূত্র ধরেই তার কল্পনা নানা অসম্ভব ডালপালা বিস্তার করতে লাগ্‌ল। ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন সে গুরু গৌতমকে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী হতে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে—বহু দূর দূরান্তরে—আত্রেয়ীর অপর তীরে এক রম্য নিবিড় তপোবনে, যেখানে একটী কি দুটী মাত্র ছোট্ট পাতার কুটীর, মানুষের সাড়াশব্দ নেই কোথাও—আছে শুধু পাখীর কাকলি, পতঙ্গের গুঞ্জন, প্রজাপতির মাতামাতি; সেই কুটীরের প্রাঙ্গণে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে গৌতম বসে আছেন হিমালয়ের পাটল শৃঙ্গের মত স্তব্ধ, গম্ভীর, সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান হোমকুণ্ডের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ; পদপ্রান্তে একখানি হাত রেখে ঊর্দ্ধমুখে শুকতারার মত স্বচ্ছ দুটী চোখ তুলে মা জবালা চেয়ে আছেন মুখের পানে; আর স্নানপ্রত্যাগত সত্যকাম তরুশাখায় সিক্ত বল্কলখানি মেলে দিতে গিয়ে উমা-মহেশ্বরের এই প্রসন্ন মাধুরী দেখে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে।

আঃ, এইবার সত্যকাম ঠিক পথ পেয়েছে, আর তাকে অত ভাব্‌তে হবে না তো! ঠিক, গৌতমকেই সে পিতা বল্‌বে, আর কাউকে নয়। আজ যখন আশ্রমে গেলে পর তিনি কালকার মতই স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, "বৎস, তোমার পিতা কে, তোমার গোত্র কি", তখন মা জবালা তাকে যা বলে দিয়েছেন, তা বলেই সে বল্‌বে, "মা বল্‌তে পারেননি বটে—আমার গোত্র কি, কিন্তু আমি জানি, আমি মা জবালার ছেলে, আর তুমিই আমার পিতা।" এ কথা শুন্‌লে কি তিনি রাগ কর্‌বেন? আহা, স্নেহে ছলছল ঐ দুটী চোখ, ও চোখে কি রাগ আছে, ওরা কি কাউকে ব্যথা দিতে জানে? আর সত্যকাম যে বড় দুঃখী, জগতে তার মা ছাড়া যে আর কেউ নাই, আর সে-মাকেও যে সে

আজ হারিয়ে এসেছে গুরুর কাছে ; তাঁর এই মাতৃহারা সন্তানকে দূরে ঠেলে ফেলে দেবেন তিনি, মমতায় গলে তাকে বুকে তুলে নেবেন না কি ?

এমনি কত চিন্তাতেই তার মন দুল্‌ছে। অন্যমনস্ক হয়ে সে পথ চল্‌ছে, কালকের মত আনন্দচটুল গতিতে নয়, প্রৌঢ় বিবেকীর মত মন্থরচরণে। অন্যদিন বনের পাতা মৃদু হাওয়ায় দুলে দুলে ঝির্ ঝির্ শব্দে তার কানে কানে কথা কয়, পাখীরা দুষ্টুমী করে একবার তাকে ডেকে উঠেই আবার পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে, বনের হরিণ আহার ভুলে নিঃশঙ্ক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তাদের এই প্রতিদিনকার পরিচিত তরুণ বন্ধুটীর পানে। সত্যকামের হাসিমাখা চোখ-মুখ থেকে আনন্দের বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে—সবার প্রাণে একটুখানি বিদ্যুতের শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে যেন জানিয়ে যায়—"ওগো বন্ধুরা সব, আমি যে তোমাদের—আমি যে তোমাদের !"

কিন্তু আজ আর বনভূমির নিত্যকার আরতির পানে সত্যকামের মন ছিল না। এতদিন পরে আজ তার নিজকে নিয়ে ভাবনা ; আর সে ভাবনা যে এমন প্রচণ্ড হতে পারে, তা তো সে কোনও দিনই জানতে পারেনি ! আচ্ছন্নের মত সে পথ চলেছে—কোথায় চলেছে তারও যেন খেয়াল নাই—কেবল এইটুকু অস্পষ্ট হয়ে মনে জাগছে—জানার কবোষ্ণ বক্ষপুট হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে অজানার অতলে সে ঝাঁপ দিতে চলেছে। তার ভাগ্যে কি আছে কে জানে ?—তার ক্ষুদ্র হৃদয়কে মথিত করে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

হঠাৎ তার খেয়াল হল, সে পথ ভুল করেছে। বনের মাঝে পথ হরিয়ে যাওয়াটা তার পক্ষে বিশেষ কোনও আশঙ্কার কথা নয়, কেননা এ বনের প্রত্যেকটী গাছ প্রত্যেকটী লতা যে তার চেনা। কিন্তু বন্ধু সুতপার যে এই পথে আসার কথা ছিল। কাল ম্লানমুখে যখন গুরুগৃহ হতে বিদায় নেয়, তখন সুতপা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "ছী ভাই, অমন মুখ ভার করতে নাই। তুমি কি ভাবছ, গুরু তোমায় ফিরিয়ে দেবেন ? তা নয়, ত্রিবর্ণের যে কোন বর্ণই তাঁর পায়ে ঠাঁই পাবে। কিন্তু তবু আমাদের যা রীতি আছে, তা তো মান্‌তে হবে। শুধু একটী কথার ভুলে তোমাকে আবার ফিরে যেতে হল ভেবে ভারী কষ্ট হচ্ছে। তুমি গিয়ে যেন আর দেরী করো না—আজকের সেই জায়গাতেই আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব ; তারপর আজকার মতই দুজনায় সমিধসংগ্রহ করে সায়াহ্ন হোমের সময় আশ্রমে পৌঁছাব। কেমন, কালকেই আস্‌ছ তো ?" কণ্ঠোত্থিত বাষ্পোচ্ছ্বাস বহু কষ্টে রুদ্ধ করে নতচক্ষে সত্যকাম মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল শুধু—

আজ তার এই সঙ্কটের দিনে বন্ধুর সাহচর্য্য থেকেও সে বঞ্চিত হল ভেবে মনটা আরও বিকল হয়ে গেল যেন। দুদিনের পরিচয় এই বন্ধুটীর সাথে, কিন্তু

এই দু'দিনেই সে যেন তার জীবনে জানা আর অজানার মাঝে সেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে এমনও ভেবে রেখেছে, যদিও বা তার ভাগ্যহত জীবনে গুরুগৃহে বাস না ঘটে, তবুও সে গোচারণ করতে এসে বন হতে তার বন্ধুটীকে খুঁজে নেবে। দুজনায় মিলে সমিধ সংগ্রহ করবে, নিস্তব্ধ দুপ্রহরে গাছের তলায় বসে গুরুর কথা, গুরুগৃহের কথা, অন্তেবাসীদের কত বিস্ময়ের কথা, গৌরবের কথা নিয়ে তারা আলোচনা করবে, তারপর সত্যকামের নিজের সংগৃহীত সমিধের ভারটী নিয়ে বন্ধুকে আশ্রমের অদূরে বনের প্রান্ত পর্য্যন্ত রেখে এসে আবার সে মায়ের কাছে ফিরে যাবে। এই কল্পনার মাঝে বন্ধুর সঙ্গলাভের প্রত্যাশাটুকুতেই যা কিছু মধু ছিল, নতুবা গুরুগৃহ হতে প্রত্যাখ্যাত এমন বঞ্চিত জীবনই তার হোক্, এ তো সে চায় না। কিন্তু আজ যে পথ ভুলে সুতপার সাহচর্য্যের আশ্বাসটুকুও সে হারাল, এ নিয়তির কোন্ সঙ্কেত বা! সবাই কি তাকে এমনি করে ছেড়ে যাবে—এ কি তারই সূচনা? সত্যকাম আর ভাবতে পারিল না, অবসন্ন হয়ে একটা গাছের তলায় বসে দুহাতে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ডেকে উঠ্‌ল—"ওমা—মাগোঃ।"

[ক্রমশঃ)

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রবাদ আছে—রামচন্দ্র দেবপ্রয়াগে, লক্ষ্মণ লছমনঝোলায়, ভরত হৃষীকেশে ও শত্রুঘ্ন "মৌনী কি রৈতী"তে উৎকট তপস্যা করেছিলেন। তপস্যার সুমনোরম স্থানও বটে! চারদিকে জলবায়ু নির্ম্মল এবং পবিত্র, সাধনের বিশেষ অনুকূল স্থান। এখানে ধ্রুবের একটী মন্দির আছে। এ ছাড়া ছোট ছোট আরও কয়েকটী মন্দিরও আছে। ধ্রুবঘাট ও দ্রোণঘাট নামে দুটী ঘাটও আছে। পুলিশষ্টেশন, ডাকঘর, ধর্ম্মশালা—কিছুরই অভাব নাই। আমরা কালীকম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালা হতে কিছু সদাব্রত নিয়ে নৌকায় চাপ্‌লাম। এই আমাদের প্রথম সদাব্রত নেওয়া। পার হয়ে ভাগীরথী বাঁ হাতে রেখে উত্তর দিকে চল্‌তে লাগ্‌লাম। লছমনঝোলার পরপারে কয়েকটী দোকান, ধর্ম্মশালা, চটী, সেবাসমিতির দাতব্য ঔষধালয়, "মহর্ষি ব্রহ্মচর্য্য স্কুল" প্রভৃতি আছে এবং একটী রাস্তা দক্ষিণ দিকে স্বর্গাশ্রমের ভিতর দিয়ে আবার গঙ্গা পার হয়ে স্বামী রামতীর্থের আশ্রমের সামনে কেদারবদরীর রাস্তার সঙ্গে মিলেছে। লছমনঝোলায় আস্‌তে হলে এ পারেই আসা ভাল—কোন অসুবিধা নাই, প্রয়োজনীয় সব জিনিষই পাওয়া যায়।

এখানে মহর্ষি ব্রহ্মচর্য্যস্কুলে ১৫।১৬টী ব্রহ্মচারী

বিদ্যার্থী ছেলে আছে। একজন বাঙ্গালী সাধুও একটী ঘর তুলে সামান্তরকমে আশ্রম করে আছেন। আমাদের এখানে থাক্‌তে দিল না, স্বেচ্ছা-সেবক দল তাড়াতাড়ি যাবার জন্য পীড়াপীড়ি কর্‌তে লাগ্‌ল। জান্‌তে পার্‌লাম, আজ সকালে দুজন সাধুর কলেরায় দেহান্ত হওয়াতেই স্বেচ্ছাসেবকগণ ও পুলিশ কাউকে লছমনঝোলায় থাক্‌তে দিচ্ছে না। কাজেই মহর্ষি ব্রহ্মচর্য্যস্কুলের কোন খবর জান্‌তে পার্‌লাম না।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গের সকলেই চলে গেছে, আমি কুলীর জন্য অপেক্ষা করছি। এপারে এসে তার সে বিরাট্ বোঝা খুলে যাওয়ায় আবার দুজনে ভাল করে বেঁধে নিলাম। আমরা নূতন যাত্রী, পাছে কুলী বোঝা নিয়ে চম্পট্ দেয়, সেই ভয়ে এক এক দিন এক এক জনে কুলীর সঙ্গে আসা ঠিক হয়েছিল। আজ আমি ছিলাম।

আজ জীবনের একটি নূতন দিন। হিমালয়ের ভিতর আজ নবপ্রাণে নব উৎসাহে প্রবেশ কর্‌লাম। দক্ষিণ পার্শ্বে স্তরে স্তরে সজ্জিত অভ্রভেদী পাহাড়ের প্রাচীর। বাম পার্শ্বে অতি নিম্নে ঠিক যেন পাতাল দিয়ে ভাগীরথীর দুর্দম স্রোত কলকল নাদে সেই নির্জ্জন উপত্যকা প্রতিধ্বনিত করে উন্মাদিনীর মত ছুটে চলেছে। ভাগীরথীর জল কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ, স্রোতও অত্যন্ত প্রবল, বেগে উপলখণ্ডে প্রতিহত হয়ে রাশি রাশি ফেনপুঞ্জ উদ্গীরণ করে বজ্রনির্ঘোষে পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি তুলে বয়ে চলেছে। পশ্চিমাকাশে অস্তোন্মুখ সৌর কিরণমালা খণ্ড খণ্ড মেঘপুঞ্জে বিচ্ছুরিত হয়ে আকাশকে বিচিত্র বর্ণরাগে সজ্জিত করেছে। অস্তগামী সূর্য্যের এই অপূর্ব্ব শোভা দেখতে দেখতে লছমনঝোলা হতে ২ মাইল দূরবর্ত্তী স্বর্গাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী আত্ম-প্রকাশজীর ধর্ম্মশালায় গিয়ে উপস্থিত হলাম।

তখনও কিছু বেলা ছিল। এখানে ভাল ধর্ম্ম-শালা আছে বলে আমার আসার পূর্ব্বেই সুরেশা-নন্দের নির্দ্দেশমত সকলে ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিয়েছেন।

গরুড় চটী
২ মাইল

স্থানটীর নাম গরুড়চটী। লছমন-ঝোলা হতে এখানে আস্‌তে ছোট ছোট ৩।৪টী চড়াই-উৎরাই কর্‌তে হয়েছে। আমাদের কাছে যদিও তাই প্রাণান্তকর, পাহাড়ীরা কিন্তু এসব চড়াই-উৎরাইকে হিসাবের মধ্যেই আনে না। ভাগীরথীর সুমধুর ধ্বনির সহিত গুন্ গুন্ করে গান কর্‌তে কর্‌তে কি ভাবে যে দু মাইল পথ চলে এলাম, তা বুঝ্‌তেই পারিনি। গঙ্গার সে ধ্বনি যেন কত শত জন্মের পরিচিত অনাহত নাদ! আমরা হিমালয়ের প্রত্যেক কন্দরে এই সুমধুর অনাহত নাদ শুন্‌তে শুন্‌তে আনন্দে বিভোর হয়ে গিয়েছি, রাস্তার কোন কষ্টই সে ধ্বনিকে পরাভূত কর্‌তে পারেনি।

শ্রীমৎ স্বামী আত্মপ্রকাশজী এখানে প্রকাণ্ড সুন্দর ধর্ম্মশালা করে যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছেন। আমি যাবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মশালা যাত্রীতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমরা তাদের এক পাশে কষ্টে একটু জায়গা করে নিলাম। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। ধর্ম্মশালার পূর্ব্বপার্শ্বে গরুড়জীর মন্দির। হিমালয়ের যাত্রীরা গরুড়জীর মন্দিরে পূজা দিয়ে যায়। শুন্‌লাম, গরুড়জী এ পথের রক্ষাকর্ত্তা। প্রত্যহ চটী হতে বের হবার সময় "জয় গরুড় মহাবীরকী জয়" ধ্বনি দিয়ে যাত্রা কর্‌লে নাকি রাস্তায় কোন বিপদই হয় না। প্রত্যহ কিছু ছোলাভাজা ও গুড় গরুড়জীর নামে নিবেদন করে সহযাত্রীদের প্রসাদ বিলিয়ে নিজেও প্রসাদস্বরূপ সামান্য গ্রহণ কর্‌তে হয়, তাহলে রাস্তায় কোন কষ্টই পেতে হয় না বলে প্রবাদ আছে। প্রত্যেক যাত্রীই এই প্রবাদের মর্য্যাদা রক্ষা করে থাকে। আমরা কিন্তু "জয় গুরুমহারাজকী জয়" ধ্বনি ছাড়া অন্য ধ্বনি দিইনি। প্রত্যহই প্রাতে বা বিকালে যখনই

বের হয়েছি, তখনই "জয় গুরুমহারাজকী জয়" ধ্বনি দিয়ে বের হয়ে বেশ নিরাপদে যাত্রা সফল করেছি। "গুরু" সর্ব্ববাদিসম্মত, দেব, নর, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি চরাচর বিশ্বের উপাস্য, এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেরই গুরু পরম পূজ্য। এই নশ্বর জগতেও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করবার শক্তি একমাত্র "জয় গুরু" মহামন্ত্রেরই আছে। কি শৈব, কি শাক্ত, কি গাণপত্য, কি বৈষ্ণব, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ব্রাহ্ম, কি জৈন, কি খ্রীষ্টান—প্রত্যেকেরই আপন আপন গুরু আছে, সবাই আপন আপন গুরুর জয়-ধ্বনি দিতে পারেন, তাতে বাধা বা বিরক্তির কিছুই নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই একমাত্র "জয় গুরু" ধ্বনিই যে সর্ব্বজাতির সম্মিলনের একটী প্রশস্ত পথ, তা অম্লানবদনে স্বীকার করবেন। আমাদের আরাধ্যদেব এই মহামন্ত্রটীর বিশ্লেষণ করে এমনভাবে আমাদের হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছেন, জয়ধ্বনি দিতে হলেই যেন আমাদের অজানা ভাবে আপনা হতেই "জয় গুরুমহারাজকী জয়" ধ্বনি বের হয়ে সর্ব্বত্র একতার সৃষ্টি করে দেয়। তাই আমরা আমাদের সংস্কারানুযায়ী প্রত্যহই "জয় গুরুমহারাজকী জয়" ধ্বনি দিয়ে বের হতাম।

এই ধর্ম্মশালার চারপাশে ফল-ফুলে পরিপূর্ণ অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত উদ্যানে পরিশোভিত পর্ব্বতের ভিতর সুন্দর বাগান দেখে খুব আনন্দিত হলাম। এখান হতেই শাক-সব্জী, ফল, ফুল প্রভৃতি প্রত্যহ সাধুসেবার জন্য স্বর্গাশ্রমে গিয়ে থাকে। এখানকার প্রকাণ্ড বাগান দেখে আমাদের আসামের মঠের কথা মনে হল। ছোট ছোট চারা আমগাছে অসংখ্য কচি কচি আম ধরেছে; সারি সারি কলাগাছে রাশি রাশি কলা ধরেছে; রাশীকৃত পেঁপে সহ অসংখ্য পেঁপে গাছ ও অসংখ্য প্রকারের ফুলের গাছের সুদৃশ্য শোভা ও সদ্যপ্রস্ফুট ফুলের সুমধুর গন্ধে স্থানটীকে এমন মাতিয়ে তুলেছে যে আমাদের মনে হল, আমরা স্বর্গে এসেছি। ধর্ম্মশালায়ও বাঙ্গালী, আসামী, উড়িয়া, বিহারী, হিন্দুস্থানী, নাগপুরী, তৈলঙ্গী, মান্দ্রাজী, মরাঠী, গুজরাতী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, কাশ্মিরী, নেপালী, মাড়বারী, রাজপুত প্রভৃতি বিভিন্ন দেশবাসী প্রায় ৪।৫ শত যাত্রী জায়গা নিয়েছে। কারও সঙ্গে কারও পরিচয় নাই, অথচ সবাই যেন পরিচিতের মত আনন্দে পরস্পরকে সম্ভাষণ করছে। সবাই আজ আমরা এক পথের পথিক! এখানে হিংসা, দ্বেষ, কোলাহল—সমস্তই যেন পৃথিবীতে রেখে আমরা স্বর্গে এসেছি বলে মনে হল। সে যে কি আনন্দ, তা ভাষায় বুঝাবার নয়!

ধর্ম্মশালার বাম পাশ দিয়ে কলকল নাদে ঝরণা বয়ে যাচ্ছে। আমরা সেই ঝরণার জলে হাত-মুখ ধুয়ে পাকের বন্দোবস্ত করে ওপরে চলে গেলাম। তখন চারিদিক হতে বিভিন্ন সুরে, বিভিন্ন ভাষায় সকলেই সন্ধ্যা-স্তোত্র পাঠ করছেন। কয়েকজন বৈষ্ণব সাধু আমাদের সামনেই তাঁদের ঝোলা হতে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি ইত্যাদি বের করে ঘণ্টা বাজিয়ে তালে তালে অঙ্গভঙ্গী সহকারে আরতি করতে লাগলেন, তাঁদের সঙ্গীরা কাঁসর, ঘড়ি, শঙ্খ প্রভৃতি বাজাতে লাগল। আরতির শেষে তাঁরা ভজনগান করে আমাদেরও ভজন গাইতে অনুরোধ করলেন। ভজনগানের পর তাঁরা আমাদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করলেন।

ধর্ম্মশালার নীচে দুটি দোকান আছে, তা হতে প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে হয়। এখানে কোন চটী নাই। আমাদের সঙ্গে সদাব্রতের সবই ছিল। শুধু কাঠ কিনতে হল। ধর্ম্মশালার পেছন দিকে দুই সারিতে ৩০।৩৫টি উনান তৈয়ারী আছে, যার যেটি সুবিধা নিলেই হল, কেউ কোন আপত্তি করে না। আলুর তরকারী ও রুটী দিয়ে আমাদের রাত্রির ভোজন সমাপ্ত করলাম। আমি রুটি মোটেই পছন্দ না করলেও আজকের রুটী কিন্তু ভারী মিষ্টি

লাগল। আজ আমরা মাত্র ৫ মাইল হেঁটেছি, হরিদ্বার হতে এ স্থান ১৯ মাইল। একজন হিন্দুস্থানী মাতাজী আমাদের চিদানন্দ দাদাকে তাঁর নিজ হাতের তৈরী একটী কাণ-ঢাকা টুপী দান করলেন এবং নান্নুজীর প্রসাদ এনে আমাদের সকলকে বিতরণ করলেন।

আমাদের সঙ্গে বালিয়া জেলায় একজন তেওয়ারীর আলাপ হয়ে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। তেওয়ারীজীর (ব্রাহ্মণ) বয়স ৬০ বৎসরের ওপর। তিনি তাঁর সমবয়স্কা স্ত্রী ও বাল্যবন্ধু একজন শিষ্য ও শিষ্যাণী সহ বদরিকাশ্রম চলেছেন। তেওয়ারিনের আসবার ইচ্ছা ছিল না; তেওয়ারী অনেক অনুনয় বিনয় করে অর্দ্ধাঙ্গিনী সহ তীর্থ ভ্রমণে অশেষ পুণ্যসঞ্চয় মানসে বেরিয়েছেন। তেওয়ারী ও তাঁর বাল্যবন্ধুটির গাঁজা, আফিম, সুল্‌ফা, চরস ভিন্ন দিন চলা ভার। আজ মাত্র এই ৫ মাইল আসাতেই তেওয়ারিনের পা ব্যথা করাতে, তিনি শুয়ে চীৎকার আরম্ভ করে দিয়েছেন এবং তেওয়ারীকে ডেকে বলছেন, "এ তেওয়ারী, হমারা গোড় দুখাতা!"

তেওয়ারী—"হম গোড় দবা দেগা।"

তেওয়ারিন—"গোড় দবানেসে ক্যা হোগা? হমারা আনেকা মতলব নহী থা, তুম জোরসে লে আয়া। ঘরমে রহনে সে হমারা লড়কা, লেড়কী কড়ুয়া তেল গরম করকে লগা দে রহা থা। তেল নহী লগাকে দবানেসে দরদ নহী ছুট্‌তা।"

তখন তেওয়ারী উৎসাহসহকারে বললেন, "অচ্ছা তো তেল গরম করকে লগা দেগা, গোড় দবা দেগা!" বলেই বৃদ্ধ তেওয়ারীজী সরিষার তেল গরম করে তেওয়ারিনের পদসেবায় লেগে গেলেন। বৃদ্ধ তেওয়ারীটী প্রায় সমস্ত রাত জেগে অর্দ্ধাঙ্গিনীর মনস্তুষ্টির জন্য পদসেবায় কাটিয়ে দিলেন। বেচারীর রাত্রে আর আহার হ'ল না, স্ত্রীর পদসেবাতেই রাত্রি কেটে গেল।

২১ বৈশাখ, বুধবার—রাত্রিবেলা প্রবল বৃষ্টির দরুণ অত্যধিক ঠাণ্ডা পড়াতে ভোর ৪টার সময়ই ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমরা হাতমুখ ধুয়ে যাত্রার জন্য তৈরী হতেই ১॥ ঘণ্টা কেটে গেল। এর মধ্যে অন্যান্য যাত্রীরা রাস্তা ধরেছে। তাদের সঙ্গে জিনিষপত্র কম, যার যার জিনিষ নিজে মাথায় করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। আমাদের সঙ্গে অনেক লোক, প্রত্যেকের জিনিষপত্র গোছাতে এবং মোট বাঁধতেই দেড় ঘণ্টা সময় চলে গেল। কুলীটি নূতন, সে কখনও এমন বোঝা নিয়ে এ পথে চলেনি; নূতন বলে মোটও গুছিয়ে বাঁধতে পারে না, আমাদেরই বেঁধে দিতে হয়। "জয় গুরুমহারাজকী জয়" ধ্বনি দিয়ে সকলের শেষে আমরা রওয়ানা হলাম।

দেখতে দেখতে ২ মাইল গিয়ে **ফুলবাড়ী** চটীতে পৌছলাম। এ দু'মাইল পথ প্রায়ই উৎরাই। ফুলবাড়ী চটিতে প্রকাণ্ড একটী অশ্বত্থগাছের নীচে লম্বা লম্বা কয়েকখানা ঘরওয়ালা ৭টী চটী আছে। রাস্তার পাশেই চটী, গঙ্গাও অতি নিকটে। সকলরকম খাবার, এমন কি জলখাবারের উপযুক্ত পেড়া লাড্ডু প্রভৃতি মিলে। আমাদের দলের যাঁরা আমার আগেই চলে এসেছিলেন, আমি এই দুই মাইলের মধ্যেই তাঁদের পিছনে ফেলে এসেছি। আজ কুলীর ভার আমার ওপর নাই, কাজেই নিশ্চিন্ত মনে পাহাড়ের অতুলনীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে খুব জোরে চল্‌তে লাগ্‌লাম। যেতে যেতে পথের ধারে পাইপ থেকে জল পড়ছে দেখলাম। অনুসন্ধানে জানলাম, গবর্ণমেণ্ট ওপরে ঝরণায় পাইপ লাগিয়ে পথশ্রান্ত যাত্রীর পিপাসার শান্তির জন্য নির্ম্মল জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। রাস্তায় এমন জলের পাইপ অসংখ্য দেখেছি। জল সুমিষ্ট, নির্ম্মল, কীটাণুবর্জ্জিত এবং সর্ব্বদাই প্রবল বেগে ঝরে পড়ছে।

ফুল বাড়ী
২ মাইল

কিছু দূর গিয়ে গঙ্গার ধার ছেড়ে ক্রমে দক্ষিণ দিকে যেতে লাগলাম। গরুড় চটীতে আসবার সময় গঙ্গার অপর পারে অনেক তাঁবু ও লোক দেখেছিলাম। শুনলাম, হরিদ্বার থেকে কর্ণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত (১১৬ মাইল) রেল হবার কথা হচ্ছে। রেল অপর পার দিয়ে হবে, রেল কোম্পানীর লোক রাস্তা জরিপের জন্য ওখানে তাঁবু ফেলেছে। কিছুক্ষণ চলবার পরই অল্প চড়াই করতে হল। হৈমবতী গঙ্গা আমাদের বাঁ পাশে, ডাইনে অভ্রভেদী পাহাড়। নদীর অপর পারে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট কোঠাঘর, তার নীচে স্তরে স্তরে সাজান শস্যক্ষেত্র—ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। নদীগর্ভে সমতল ভূমিতেও আবাদ হয়েছে, ওপর হতে সেগুলি প্রকাণ্ড বিচিত্র শতরঞ্চির মত দেখাচ্ছিল। চড়াইটি আধ মাইলের বেশী হবে না; গতকালের চেয়ে এটী যেন একটু বড়, উঠ্‌তে বেশ কষ্ট হতে লাগল। চড়াই শেষ হলেই আবার উৎরাই।

উৎরাইয়ের পরেই একটী চটী পাওয়া গেল, নাম **গুলর চটী**। এখানে ৩।৪টী মাত্র চটী আছে। গরম দুধ বিক্রী হচ্ছে দেখলাম। ।/০ আনা সের। ঝরণার জল ও পাইপের জল আছে। অল্প নীচেই হৈমবতী গঙ্গা। হৈমবতীর বেগ ভাগীরথীর মত নয়, বেশ শান্ত প্রকৃতি। এর অন্য নাম হিউলী নদী। গুলর চটী হতে রাস্তা বেশ ভাল এবং সমতল। নদীর ধারে, পাহাড়ের উপত্যকায় সমতল ভূমিতে বহু কৃষক ক্ষেতে কাজ করছে। কিছুদূর গিয়েই হৈমবতী বা হিউলী নদীর ওপর একটী লোহার ঝোলান পুল (Suspension Bridge) পার হয়ে গঙ্গা ডানহাতে রেখে ক্রমে অল্প অল্প চড়াই কর্‌তে লাগ্‌লাম। নিকটে একটী মাটীর গুহাতে একজন উলঙ্গ সাধু কৌপীনমাত্রৈকসম্বল হয়ে

গুলর চটী
৩ মাইল

ধুনী জ্বেলে বসে আছেন, সাধুর পদধূলি নিয়ে অল্প চড়াইর পরই আবার সমতল ভূমি দিয়ে কিছুদূর যেতেই হৈমবতী গঙ্গার পারে **বিল্বকেশ্বর** মহাদেবের মন্দির পেলাম। বিল্বকেশ্বর মহাদেবকে দর্শন, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে কিছুদূর গিয়েই **মোহন চটী** পাওয়া গেল।

মোহন চটীতে গিয়ে বিশ্রাম কর্‌লাম। তখন বেলা ৮টা। সঙ্গের সকলকে রাস্তায় পিছনে ফেলে ছুটে এসেছি, এ পথটুকু আস্‌তেই বেশ পরিশ্রম হয়েছে। দুপুরে এখানেই থাকা হবে মনে করে সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লাম। এখানে প্রকাণ্ড টিনের ছাউনীতে সাধারণ ধর্ম্মশালা, সদানন্দ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মশালা, জলের পাইপ, ৩।৪খানা বড় বড় ঘরযুক্ত চটী আছে। দুধ ।/০ আনা সের। ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গীরা সকলেই এসে হাজির হলেন। সারদা ভায়া ও পাগলী মা গুলর চটীতে দুধ খেয়ে এসেছেন, আর সকলেই এখানে দুধ পান কর্‌লেন। পাগলী মা ও সারদা ভায়া খানিক বিশ্রাম করেই রওনা হয়ে গেলেন, তাঁদের বলে দিলাম, সামনে কোন ভাল চটী পাওয়া গেলে তাতেই যেন থাকা হয়। এখান হতে একটী বড় চড়াই কর্‌তে হবে। তাঁরা রওনা হয়ে গেলেন। দলের সকলেই এসে জুটলে পর আমরা আবার রওনা হলাম।

মোহন চটী
২ মাইল

এক মাইল চড়াইর পরই বাবা কালীকম্বলীওয়ালার জলসত্র আছে। বিজলীর চড়াইটী বেশ বড় চড়াই। অনেক ঘোড়াওয়ালা সেখানে ঘোড়া নিয়েছিল, তারা অনেক যাত্রীকে ঘোড়া ভাড়া দিয়ে এই কঠিন চড়াইটি পার করে দিয়ে থাকে। আমরা হেঁটেই চলেছি। এ চড়াইটী খুব খাড়া। এদিকে রৌদ্রও প্রখর হয়েছে, কাজেই খাড়া চড়াই কর্‌তে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবুও যেতে হবে। অতি কষ্টে

ছোট বিজলী
১৷০ মাইল

উঠতে লাগলাম, ক্রমে পা দুটো ধরে গেল। মোহন চটী হতে পৌণে দু মাইল যাবার পরই খুব বড় বড় আমগাছের নীচে কয়েকটি চটী দেখে আশ্বস্ত হলাম। এখানে ৫টী চটী আছে। এক চটিবালা পরমসমাদরে আমাদের নিয়ে গেল। দ্বিপ্রহরে এখানেই থাকা স্থির করে অন্যান্য সকলে আসার পূর্ব্বেই পাক করতে লেগে গেলাম। ডাল-ভাত চাপাবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই এসে হাজির হলেন। হরিদাসভায়ার আস্‌তে আস্‌তে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। তার জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। একে তো তার শরীর অসুস্থ, তার ওপর আবার খাড়া চড়াই, তাতে আবার ভীষণ রোদের তাত, কাজেই তার জন্য খুব ভাবনা হচ্ছিল। শুন্‌লাম, খুব সকালে গুলর চটীতে হরিদাসভায়া ও বিহারীদাদা গরম দুধ খাওয়ার পর হরিদাসভায়ার পেটের অসুখ হয়েছে। রাস্তায় ৩।৪ বার দাস্ত হওয়ায় শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই আসতে দেরী হয়ে গেছে। প্রাতে খালিপেটে মহিষের গরম দুধ খাওয়া উচিত নয়। গরম দুধ খেয়ে হাঁটতে সুরু করলেই বিষম ক্রিয়া হয়। আমরা এর পর আর কখনও সকালে গরম দুধ খাইনি। দ্বিপ্রহরে বা রাত্রে আহারের পর গরম দুধ খেলে বরং ত্রিদোষ নষ্ট করে।

এখানে আলু ।/০ আনা সের, চাউল ।৴০ হতে ৸০ আনা সের পর্য্যন্ত ৪ রকমের পাওয়া যায়। ৸০ সেরের চাউল অতি উৎকৃষ্ট, তেমন চাউল বাঙ্গালা দেশে মিলে না। এদেশে তাকে হংসরাজ, বাঁশমতী বলে। দুধ ।৴০ আনা, অড়হর, খোসা সহ কাঁচামুগ ও খোসা সহ উরুদ ডাল ।৴০ আনা সের, ঘি ২॥০ টাকা। রাস্তায় আসার সময় মায়েরা আমগাছের তলা হতে কচি কচি আম কুড়িয়ে এনেছিলেন। অড়হর ডাল, আলুভাজি এবং কচি আমের টক দিয়ে দ্বিপ্রহরের আহার সমাধা হল।

চটী সম্বন্ধে পাঠকগণের হয়ত ধারণা নাই, আমারও পূর্ব্বে ধারণা ছিল না, এখন চটীতে এসে সে অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। পাঠকগণের কৌতূহলনিবৃত্তির দরুণ তার একটু বর্ণনা দিচ্ছি।

চটীর বিবরণ

চটী আমাদের বাঙ্গালা দেশে নাই। শুনতে পাই, ৪০ বৎসর পূর্ব্বে নাকি ছিল। আজকাল যানবাহনাদির সর্ব্বপ্রকার সুবিধা হওয়াতে চটী উঠে গেছে। হিমালয়ের পথে যানবাহনের সুবিধা না থাকায় পদব্রজেই প্রায় চল্‌তে হয়। সেই সব হাঁটা রাস্তায় ২।৪।৬।৮ মাইল অন্তর অন্তর জলের সুবিধা মত কোথাও ২।৪টী, কোথাও ১৫।২০টী দোকানদার ঘর তুলে দোকান খুলে থাকে। দোকানে চাউল, আটা, ডাল, শাকসব্জী, দুধ, দই, চিনি, ঘৃত, লাকড়ি, মসল্লা প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই সব দোকানকেই চটী এবং তার মালিককে চটীবালা, গৃহস্বামী বা লালাজী বলে থাকে। যিনি যে চটীতে থাকবেন, তাঁকে সেই চটীবালা বা লালাজীর নিকট হতেই সব জিনিষ কিন্‌তে হবে। তার কাছে কোন জিনিষ না থাক্‌লে অন্য চটীবালার নিকট হতে নিতে পারেন। যাঁরা কোন জিনিষ কিন্‌বেন না, তাঁরা চটীতে থাক্‌তে পাবেন না। চটীতে একটু সকাল সকাল আশ্রয় নিলে সবরকমে সুবিধা হয়। চটীবালা আবশ্যকমত সকল যাত্রীকেই রাঁধার জন্য হাতা, কড়াই, ডেক্‌চি, থালা, জলের জন্য কলসী কানেস্তারা প্রভৃতি দিয়ে থাকে। তার দরুণ ভাড়া বা দাম দিতে হয় না; শুধু আহার্য্য সামগ্রী চালডাল প্রভৃতি কিনলেই ঐসব জিনিষ ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা অন্যের ব্যবহৃত জিনিষ ব্যবহার করতে রাজী নন, তাঁদের নিজে নিজে বন্দোবস্ত করতে হয়। অনেক সময় যাত্রী বেশী হলে পাত্রের অভাব পড়ে। সঙ্গে একসেট রাঁধাবাড়ার সরঞ্জাম রাখা বিশেষ সুবিধা। চটীবালারা গভর্ণমেণ্ট হতে লাইসেন্স নিয়ে দোকান খুলে থাকে। এরা প্রায়ই সজ্জন। কোন চটীবালা বিশেষ

অসদ্ব্যবহার করলে তাদের বিরুদ্ধে সেই চটীর চৌধুরী বা পাটোয়ারীর নিকট নালিশ করতে হয়। প্রত্যেক চটীতেই গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত একজন চৌধুরী বা পাটোয়ারী থাকে। রাস্তায় কুলীবিভ্রাট হলেও চৌধুরীকে জানালে তিনিই ব্যবস্থা করে থাকেন। চটীবালারা তৈজসপত্রের ভাড়া না নিলেও জিনিষের দামে তা পুষিয়ে নেয়; চটীর ঘরগুলি লম্বা লম্বা, তিন দিক পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা, সম্মুখ দিকে একেবারে খোলা, কেবল কতকগুলি খুঁটি থাকে। চালে শ্লেটের মত বড় বড় কতকগুলি পাথর চাপান। এক পাশে চটীবালা নিজে একটী কোঠায় থাকে। কেদারবদরীর পথে অধিকাংশ চটীই ভাল। মাঝে মাঝে পাকা দোতালা বাড়ীও আছে। গঙ্গোত্তরীর পথে প্রায়ই ধর্ম্মশালা এবং লতাপাতার চটী। যমুনোত্তরীর পথে ধর্ম্মশালার সংখ্যা কম এবং চটীগুলিও খুব খারাপ; যাত্রী চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেই লতাপাতা দিয়ে ঘর ছেয়ে কোনরকমে পয়সা উপায়ের ফিকির করে থাকে। আমরা রাস্তায় অনেক চটীবালার কাছে খারাপ ব্যবহার পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারও করেছি।

চটীতে ঢোক্‌বার পূর্ব্বে চালডাল, আটা প্রভৃতির দর স্থির করে ঢুক্‌লে সুবিধা হয়। দু'তিন দোকান-দারকে জিজ্ঞাসা করলেই তারা যাত্রীর লোভে ভাল জিনিষ কম দামে দিয়েও যাত্রী নিয়ে থাকে। চটী-বালার নিকট হতে যে তৈজসপত্র পাকের জন্য নেওয়া হয়, তাকে তা মেজে দিতে হয়। অনেক চটীবালা দু'চারটী পয়সার লোভে নিজেও মেজে নেয়। পাকের ডেক্‌চির ভিতর ও কানা মাজলেই যথেষ্ট। তলাটা মাজলে ক্ষয় হয়ে শিগ্‌গিরই ভেঙ্গে যাবে বলে তলা মাজা নিষেধ, কাজেই নীচের যেমন কালী তেমনই থাকে। অনেক হিন্দুস্থানী সেই ডেকচিতেই খেয়ে নেয় এবং ওপরটা ধুয়েই চটী-বালাকে ফেরৎ দেয়, অথচ কত যুগযুগান্তরের কালী নীচুতে জমে পুরু হয়ে আছে, তা ধোয়া দরকার মনে করে না এবং তার দরুণ সেগুলো নাকি উচ্ছিষ্টও হয় না।

শুধু চটীবালা নয়, হিমালয়ের প্রত্যেক গৃহস্থ, এমন কি কেদার-বদরী, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরীর পাণ্ডারাও ডেকচি-কড়াইর তলী মাজে না। বদরী-নারায়ণের ভোগ যে ডেকচিতে পাক হয়, তাতেও ঐ ভাবে কালী লাগান আছে। প্রথম প্রথম আমাদের এতে ঘৃণা হত। পরে সব অভ্যস্ত হয়ে গেল। সমস্ত হিমালয়ের মধ্যে শুধু একজন চটী-বালাকে এর বিপরীত দেখেছি; রামনগর হতে ১২ মাইল ওপরে কুমারচটীতে একজন ব্রাহ্মণ চটী-বালা আমাদের বাঙ্গালা দেশের শুদ্ধাচারী গৃহস্থের মত হাতা, কড়াই, ডেকচি প্রভৃতি ভালরকম মেজে নেয়।

অনেক সময় চটীবালাকে দিয়েই জল আনিয়েছি। চটীতে ঢুকবার সময় সে ব্যবস্থা করে নিতে হয়। অধিকাংশ সময়ই আমাদের কুলী মণিরাম জল এনে দিত এবং পাকের পর পাকের বাসনও মাজত। এর দরুণ কুলী ধরবার সময় ব্যবস্থা করে নিতে হয়। চটীগুলির উভয় পাশে অল্পদূরে এক একটী লাল নিশান দেখা যায়, সেগুলি মেথরদের নিশানা। চটী হতে নিশানের মাঝখানে শৌচ করা নিষেধ। দ্বিপ্রহরে ও রাত্রে খাওয়ার পর মেথরেরা ভাত, ডাল, রুটী ভিক্ষা করতে যাত্রীদের কাছে আসে। যার যেমন ইচ্ছা কিছু কিছু দেয়। শীতাধিক্যবশতঃ তাদের পরিধানে কম্বলের পায়জামা ও কম্বলের চাপকান, অনেক সময় মেথর বলে চেনা যায় না। তাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ পরিপাটী নানা রঙ্গের ঘাঘরা ও কোর্ত্তা পরে থাকে। (ক্রমশঃ)

সেবা

:০:—

অনুগত হয়ে চলা বড় সহজ কথা নয়, তাই সেবক জীবন অগ্নিপরীক্ষার জীবন। সেবাপরাধের দরুণ তাকে নিঃশব্দে কত নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়, পরীক্ষা ব্যপদেশে কত অপ্রত্যাশিত অনাকাঙ্ক্ষিত লাঞ্ছনাই না তার ওপর পতিত হয়, তবু সাঁচ্চা সেবকের মুখে স্নিগ্ধ হাসির বিরাম নাই, সেবাতৎপরতায় বিন্দুমাত্র শৈথিল্য নাই। এ সেবা কার দরুণ? অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে আত্মস্বরূপ উপলব্ধির আকুল আবেগে সেবক পথের আশু প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয় না, অবিশ্রান্ত বাধাবিপত্তিও লক্ষ্যের প্রতি তার সচেষ্ট আবেগকে দাবিয়ে রাখতে পারে না, এদিক ওদিক কোন দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই—সে জানে তার ইষ্টকে, আর পথের কণ্টক কিম্বা পথে এগিয়ে দেবার বন্ধু অভিমানকে। সেবকজীবন অভাবের জীবন, তাই তার আকুলতার অন্ত নাই, তার গতিরও শেষ নাই। পেয়েও যেন পাচ্ছিনা, এই যে ক্ষণেক পাওয়া আর ক্ষণেক না পাওয়া, তাঁর বিরাট্ স্বরূপকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গিয়ে যখন দেখি, আরও কত বোঝার থেকে যায়—তখনই সকল গর্ব্বের নিরসন হয় আমার, আত্মপ্রতিষ্ঠার নিদারুণ জ্বালা প্রশমিত হয়ে যায়, আর আত্মসমর্পণের মধুর আস্বাদ পেতে থাকি জীবনে—সেদিন বুঝি সেবকজীবন কত মধুর।

সেবাতে আত্মসমর্পণ—অহংএর নিরসন। অভিমানের কুহেলিকায় স্বরূপ আবৃত; যাঁর অসীম করুণা জীবে জীবে অনুস্যূত রয়েছে, তাঁকে অস্বীকার করি, অবজ্ঞা দেখাই। অপরের কাছ থেকে ধার করা আলোক নিয়েই যে আমার জীবন আলোকিত হচ্ছে—এ কথা স্বীকার করতে যেন অপমান বোধ হয়। তখন, গীতাকারের ভাষায় বলতে গেলে "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে"—নিজকে মনে করি তাই। অভিমান নিরসনের দরুণই তো সেবা; আমার কিছু নেই,—সবই তোমার এই তো আত্মনিবেদন, আত্মসমর্পণ। যে কোন কারণে নিজকে ভুলে যাও—আমি যে আছি এ ধারণাই যেন না আসে। অপরের সেবায় যখন নিরত থাকি, তখন সহজেই নিজকে ভুলে যাই; কেননা যার সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত, তার সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই আমার মন চিন্তানিরত, ধ্যানের বিষয় হয় তখন "তিনি", তাই আমাকে আমি এত সহজে ভুলে যাই। সাধকের পরম বন্ধুই হচ্ছে সেবা, এতে পতনের আশঙ্কা নাই, অভিমানের বালাই থাকে না বলে সাধককে ক্রমোন্নতির পথেই উন্নীত করে দেয়। নিজের দোষত্রুটী স্বভাবতঃই নিজের চোখে ধরা পড়ে না; যা ভাবি, যা করি, সবই আমার কাছে অতি খাঁটী বলে প্রতীয়মান হয়। এতে তো গলদ থেকেও যেতে পারে; তাই অপরের কাছে নিজকে বিকিয়ে, মিথ্যা অহংকে আহত করে শোধন করে নিতে হয়। সেবা করা, মানে আত্মশুদ্ধি করা। আমার বল্‌তে যত কিছু রয়েছে সবই তাঁর স্নেহধারার উৎস হতে অভিষিক্ত করে আনলেই আকারে সব যেমন তেমনটীই থাক্‌বে অথচ আগের মতন স্বেচ্ছায় যা খুসী তা করতে পারব না। তখন ছিলাম প্রমত্ত—কেউ রক্ষক ছিল না বলে আপন খেয়ালখুসীতে যা তা করে বেড়িয়েছি, এখন তো আর উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত নেই আমার, সেবকের চঞ্চল, অশান্ত মন তাঁরই প্রশান্ত মনে আত্মনিবেদন করেছে—এখন যে মনটীকে ফিরিয়ে পেয়েছি সে তো তাঁর নিজ হাতে গড়া—তাই আমার কাছে আমার মন আর বিদ্রোহী নয়। একেই বলে আত্মসমর্পণে আত্মপ্রতিষ্ঠা। বিপথে চলার চেয়ে একজনের আনুগত্য স্বীকার করতে আপত্তি কি? আর বিরাট্ আমির প্রতিষ্ঠা যদি চাও, মিথ্যা আমির নিরসন তো

করতেই হবে তোমার। . গুরু যিনি, তিনি হলেন শুভপথপ্রদর্শক, তুমি তো স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নও, তাই ভাল-মন্দ সব দিকেই তোমার দায় আছে—গর্ব্ব করে বল্‌তে পার, কারো কাছে অধীনতা স্বীকার কর্‌তে যাব কেন—কিন্তু এ হল যেন জেনেশুনেই আগুনে হাত দিয়ে পুড়ে মরা। আর শিক্ষা বা সেবকজীবনকে যদি বন্ধন মনে কর, সে-ও তো সাময়িক; তোমার লক্ষ্য যে আত্মপ্রতিষ্ঠা। মোটকথা, নিজকে খাঁটী রাখা, তা তুমি যে ভাবেই পার রাখ না—কিন্তু এ কথা তোমায় স্বীকার করতেই হবে, সেবার পথ বেশী নিষ্কণ্টক, সেবকজীবন—সহজজীবন।

তৃপ্তি ভোগেও হয়, আবার সেবাতেও হয়। ছেলেকে খাইয়েই মায়ের তৃপ্তি; নিজের দরুণ কিছু না রেখে উজাড় করে মা সব বিলিয়ে দেন। এ দানের মূলে যদি সুখ না থাকৃত, তৃপ্তি না হত, তবে কয়দিন আর এমন নিঃস্বার্থভাবে দান প্রতিদান চলত? মা যে ছেলেকে ভালবাসেন, ছেলের সঙ্গে মায়ের অবিচ্ছিন্ন নাড়ীর যোগ আছে বলেই; ব্যাপ্তিজ্ঞানে এমন বোধ এসে যায়, তখন মা আর এতটুকু নয়—মা বিশ্বজননী। বুকের রক্ত দিয়ে যে জিনিষ গড়া, তার প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক—ছেলের মাঝেও মা নিজকে দেখতে পান; তাই ছেলে খেলেই মায়ের খাওয়া, আর ছেলের তৃপ্তিতেই মায়ের তৃপ্তি। ভোগের দারুণ লালসা নাই এতে, আছে শুধু তৃপ্তির বিপুল আনন্দ। সেবাতে ব্যাপ্তিজ্ঞান আপনি এসে যায়। সেবায় সুখ আছে, স্বার্থ নাই, ভালবাসা আছে, প্রতিদান নাই—ভাল লাগে তাই সেবা করি, কারণানুসন্ধানে মোটেই প্রবৃত্তি হয় না।

সেবক নিরহঙ্কারী, অনাড়ম্বড়প্রিয়—তার আদর্শ বহু উচ্চে, তাই ভিতরের কিছু পেয়েই গর্ব্বে সে স্ফীত হয়ে ওঠে না; সে কেবল যেন তার অভাব, ত্রুটী-বিচ্যুতিই দেখে; যতই তার দীনতা বাড়ে, ততই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। সেবা নাকি দাসমনোভাবের পরিচয়? প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডে লম্ফ দিল, হনুমান জনপ্রাণীর অসাধ্য সাগর ডিঙ্গিয়ে গেল, শ্রীরাধা নির্ভয়ে কুলমান বিসর্জ্জন দিয়ে ইষ্টের প্রতি অনুরক্ত হলেন,—সামান্য ভীত দাসসেবকের প্রাণে কি আত্মত্যাগের এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখতে পাই? হনুমান চিরকাল রামের খাঁটী সেবক ছিল; অথচ লোকে বলে বীর হনুমান। সেবাতে যেমন আত্মবিসর্জ্জন, তেমনি আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা। ভক্তের দরুণ ভগবান কি না করেছেন! আত্মমর্য্যাদা নষ্ট হয় বলে শক্তিপ্রভাবে কত অসম্ভবকেই না সম্ভব করলেন। ভক্তের আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গেসঙ্গে ভগবানেরও যে মহিমার স্ফূরণ হয়ে যায়। শক্তিতে মানুষ লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ে; সেবকের সে আশঙ্কা নাই। সে জানে শক্তি দিয়েছেন তাঁরই সেবায় নিয়োগ করতে। অভিমানই যদি না জাগল, তবে আবার পতন হবে কিসে? তিলে তিলে আত্মসমর্পণ করে যেদিন আমার অভাব-অভিযোগ মিটে যায়, তাঁরই শক্তি আমার মাঝে পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে,—সেদিনই আমার আত্মপ্রতিষ্ঠা—তখন যে গর্ব্ব করি সে কেবল ফাঁকা নয়, জানি আমার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিলে গিয়েছে। তখন আমিই সত্যসঙ্কল্প—যা ইচ্ছা করব তাই হবে; এই তো আমার গর্ব্ব!

শিক্ষা এবং সেবার পরিণতি কি, তাই দেখতে হবে। ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করি বলেই যে আমি দীন, তা কেন হবে? শাঙ্করভাষ্যে একজায়গায় আছে—"যৎ তে রূপং কল্যাণতমমত্যন্তশোভনং, তৎ তে আত্মনঃ প্রসাদাৎ পশ্যামি। কিঞ্চ অহং ন তু ত্বাং ভৃত্যবদ্ যাচে, যোঽসাবাদিত্যমণ্ডলস্থো ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ (পুরুষকারত্বাৎ 'পূর্ণং বা অনেন প্রাণবুদ্ধ্যাত্মনা জগৎ সমস্তমিতি পুরুষঃ, পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ) সোঽহমস্মি ভবামি।"—চূড়ান্ত কথা হল, আমি তাঁরই স্বরূপ; তাই প্রার্থনা, সেবার মূলে রয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠা। আত্মপ্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য বটে

কিন্তু "তব প্রসাদাৎ" বলে ভাষ্যকার সেবার ইঙ্গিত রেখে দিয়েছেন। গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছেন—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥—এ সেবার, প্রশ্নের, প্রণিপাতের উদ্দেশ্য কি?—আত্মজ্ঞান। কাজেই সেবার মূলেও রয়েছে আমার বিরাট্ স্বরূপের অনুভূতি। সেবার মাঝে যুগপৎ আত্মসমর্পণ আর আত্মপ্রতিষ্ঠা রয়েছে—তাই সেবক-জীবন পূর্ণজীবন।

তীর্থরামের গৃহস্থালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আছে, এ কথার মর্য্যাদা যদি অস্বীকার না করি তো সে সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্ম করুক, আর সংসার ছাড়িয়াই ধর্ম্ম করুক, কোনও তরফ হইতে তাহার বিরুদ্ধে ন্যায়-সঙ্গত কোনও আপত্তি তুলিতে পারি না। অবশ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, স্বার্থপরতা নয় বা সমাজ-বিদ্রোহ নয়, সে কথাও কিন্তু মানিয়া লইতেছি; অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যেরও একটা সীমা আছে। আর দশ-ব্যক্তির ভালমন্দের দিকে চাহিয়া আমার ভালমন্দেরও একটা যাচাই করিতে হয়, সে কথা সত্য; কিন্তু তবুও আমার সমস্তটুকু মূলে যে আমার খুসী আমার তৃপ্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নিছক আত্ম-সমর্পণ বা ব্যক্তিত্ব-বিসর্জ্জনের মূলেও এই কথাটা রহিয়া গিয়াছে। গতানুগতিকতা বশতঃ যেখানে আমরা ব্যক্তিত্ববিসর্জ্জনের বাঁধা খাতে জীবনপ্রবাহকে চালিত করি—যেমন আমাদের দেশের দস্তুর—তাহাতে এই কথাটা উহ্য থাকে বটে, কিন্তু মরিয়া যায় না। ইহাতে ভাল হয় কি মন্দ হয়, তাহা বলা দুষ্কর। নিছক ভাবোন্মাদনা ছাড়া আর সর্ব্বত্রই আমাদের মনে হয় চোখ কাণ দুটাকে খুলিয়াই চলা ভাল। যেখানে নিঃশেষে আপনাকে মুছিয়া দিতেছি—হোক সে সংসারে বা মুক্তিমণ্ডপে—সেখানেও কেন দিতেছি সে সম্বন্ধে সজ্ঞান থাকিলে কাহারও কোন ক্ষতি তো নাই। বরং অনেক সময় এই আত্মা-নুসন্ধিৎসাটুকু না থাকায় আমাদের মানসিক জড়ত্ব বা চিন্তার শৈথিল্যই মাত্র প্রমাণিত হয় এবং তাহাতে গতানুগতিক ভাবে অনুষ্ঠিত মহৎ কর্ম্মেরও কোনও গৌরব থাকে না।

আজকাল ব্যক্তির আত্মবিসর্জ্জনের মাঝেও যে নিজের উহ্য অংশটুকু স্পষ্ট করিয়া লইবার একটা দাবী আসিয়াছে, ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে একটু হঠ-কারিতা বা আত্মগর্ব্ব প্রকাশ পাইলেও মূলে জিনিষ-টাকে ভাল বলি। আমি যদি আমার ভার কাঁধে লই, আমার পথ বুঝিয়া চলিবার জন্য আমারই দৃষ্টিটাকে যথাসাধ্য প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করি তো ভুলচুক হইলেও তাহা আমার কাছেই এক-দিন ধরা পড়িয়া যাইবে, এ ভরসা নিশ্চয়ই করিতে পারি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার একটা ঝোঁক আমা-দের দেশে নূতন আসিয়াছে বলিয়া আমরা ইহাকে সন্দেহের চোখে দেখি বটে, কিন্তু বাস্তবিক এ জিনিষটা একেবারেই নূতন নয়। জগতে যে যখনই দশের ভিড় ছাড়িয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়াছে, অমনি তাহাকে স্বতন্ত্র হইতেই হইয়াছে। যাহারা গতানু-

গতিকধর্ম্মী, তাহারাও ইহাদিগকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারে না; নিজেরা অনুসরণ করিতে না পারুক, দূর হইতে দাঁড়াইয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে ইহাদের সাটোপ ভঙ্গীর প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলে, বাঃ, এই তো চাই! সংসারে থাকিয়াই হউক, আর সংসার ছাড়িয়াই হউক, একটা নূতন কিছু, একটা বড় কিছু যাহারাই করিয়াছে, তাহারাই কি আমাদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে নাই?

কাজেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জিনিষটাকে তো মন্দ বলিতে পারি না। বরং উপনিষদের "আত্মানং বিদ্ধি" "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ", "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ব-মানশুঃ" ইত্যাদি মহাবাণীতে এই ধর্ম্মেরই সমর্থন পাই। আমি যদি আমাকে চিনিয়া বুঝিয়া সংসারের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করি, যদি দেখি, আমার সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফুরণের আর একটা ক্ষেত্র সংসারের গণ্ডীর বাহিরে প্রসারিত রহিয়াছে, তো আমাকে সেই পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার অধিকার কাহারও নাই। কেবল আশঙ্কা দিয়া, ছেঁদো তর্ক দিয়া, পাটোয়ারী বুদ্ধি দিয়া মানুষকে আগলাইয়া রাখিবার প্রয়াসে তাহার যথার্থ কল্যাণ কোনও দিনই হয় না। তাহার বুদ্ধিকে দীপ্ত ও সজাগ করিয়া তোল, তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া অকুণ্ঠ তেজের সহিত তাহাকে প্রয়োগ করিতে শিখাও। এতটুকু করিবার হিম্মৎ যদি তোমার থাকে তো বুঝিব, তুমি গুরু, বাঘের বাচ্চাকে বাঘ করিবার সঙ্কেত তুমি জান।

সংসারে থাকিয়া কি ধর্ম্ম হয় না?—এই প্রশ্নটাই আগাগোড়া পাটোয়ারী বুদ্ধির প্রশ্ন। মনে হয়, প্রশ্নকর্ত্তা যেন সংসার আর ধর্ম্ম দুইটারই রহস্য বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, এবং তাই মুরুব্বিয়ানা করিয়া বিরাগীর চিত্ত-দ্বন্দ্বের একতরফা ডিক্রী দিতে বসিয়াছেন! কিন্তু কথাটা যদি ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া হয় তো সে সংসারে থাকিয়া হয় না বনে থাকিয়া হয়, এ প্রশ্নটাই যে অবান্তর। আমি চাই আত্মোন্নতি, কিম্বা আমার অন্তরের সম্যক স্ফূর্ত্তি। সে যে সংসারে থাকিয়াই হইবে, কিম্বা সংসারের বাহিরে গেলেই হইবে, এমন তো কোনও চুক্তিনামা লিখিয়া দিতে পারি না। লক্ষ্যটা হইল ধর্ম্ম, সংসার নয়। হয়ত বা কাহারো সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম হয়, কাহারো বা হয় না। যার হয় না, তার স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে তুমি খর্ব্ব কর কি করিয়া? এটা আদপেই ধর্ম্মানুরাগ না সংসারানুরাগের উপর ধর্ম্মধ্বজিতার এক পোঁছ প্রলেপ মাত্র?

এই প্রশ্নটা যদি জিজ্ঞাসুর সরল প্রশ্ন হয় তো ইহার উত্তর হইতে পারে যে, হাঁ, সংসারে থাকিয়াও ধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু সবারই যে হয়, তাহাও যেমন বলিতে পারি না, তেমনি ইহাতে সংসার থাকে কি ছারেখারে যায়, তাহাও বলা দুষ্কর। আর এ যদি সংসারের পক্ষ হইতে ওকালতীই হয় তো বিরাগী প্রশ্ন-কর্ত্তার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবেন মাত্র—তিনি জানেন, ইহার উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

তারপর একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টির কথা। আমাদের আজকাল সংসারের যে অবস্থা, তাহাতে বাস্তবিকই সে গণ্ডীতে থাকিয়া ধর্ম্মের সাধনা বা চিত্তোৎকর্ষের চেষ্টা করা অনেক সময় বড় কঠিন হইয়া পড়ে। ইহা অবস্থারও দোষ ততটা নয়, যতটা নাকি আমাদের শিক্ষার দোষ। জন্মাবচ্ছিন্ন আমরা কেবল সংসার করিবার শিক্ষাই পাই, সংসারের বাহিরে থাকিয়া সংসারটাকে চিনিয়া লইবার কোনও সুযোগই আমাদের আসে না। ইহাতে কি কখনও চিত্তের যথার্থ তৃপ্তি হইতে পারে? সংসার যে সকলেরই সব সময় ভাল লাগিবে, এমন কোনও বাঁধাধরা আইন আছে কি? যদিই বা সংসারে থাকিতে থাকিতে কাহারও নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় তো তাহাকে একটু দূরে থাকিয়া বুঝিয়াসুঝিয়া নিজকে প্রকৃতিস্থ করিবার সুযোগ কোথায়ও দেওয়া হয় কি? মানুষ যে আগাগোড়া সংসার প্রবৃত্তিতে পূর্ণ থাকে, এই কি মনুষ্যচরিত্রের সত্যিকার পরিচয়?

ঘোর সংসারীর চিত্তেও এককোণে হয়ত বৈরাগ্যের জন্য একটু স্থান থাকেই। হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর মানুষ একটু বিশ্রাম চায়, জীবন তিক্ত হইয়া উঠিলে মরণ চায়, এইগুলি যদি তাহার স্বাভাবিক ও সুসহ আকাঙ্ক্ষা হয় তো সংসার হইতেও যে তাহার মন কোনও এক সময় ছুটী পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিবে, ইহাও তো অসম্ভব নয়। কিন্তু সংসারের বাহিরটা কি, এবং সংসার হইতে বিবিক্ত থাকিয়া সংসারটাই বা কি, এইটুকু বুঝিয়া লইবার মত শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। ফলে সাংসারিক নানা অশান্তি, অকালপক্ক বৈরাগ্যের ধূয়া, যথার্থ বিরাগীর লাঞ্ছনা—ইত্যাকার নানা আবর্জ্জনায় সংসার আবিল হইয়া উঠিতেছে।

মানুষ যে সংসারী নয়, সে বিরাগীও, অন্তর্নিহিত এই সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়া তাহার চিত্তকে একটা বৈরাগ্যের ট্রেনিংও দেওয়া প্রয়োজন। তাহাকে এমন কতকগুলি শিক্ষায়-দীক্ষায় অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে সংসারের চাপে পড়িয়া যে সমস্ত মনোদ্বন্দ্ব তাহার মাঝে জাগে, সেগুলির সে সুষ্ঠু মীমাংসা করিতে পারে। আমাদের মনে হয়, সংসার করিবার পূর্ব্বে সংসার হইতে পৃথক্ থাকিয়া ছাত্রজীবনে একটা বৈরাগ্যের সাধনা যে আমাদের দেশে ছিল, সেটা সব দিক দিয়া মানবের ব্যক্তিত্ব-স্ফুরণের একান্ত অনুকূল। এই সাধনায় মানুষের মনুষ্যত্বের একটা পরখ হইয়া যায়, যে ভার সে বহিবে তাহার উপযুক্ত শক্তি তাহার আছে কিনা তাহার যাচাই হইয়া যায়। তা ছাড়া ঝালাপালায় তিক্তবিরক্ত মনকে বিশ্রাম দিবার মত একটা মানসিক শক্তির পুঁজিও তাহার থাকিয়া যায়।

ইহারই অনুকল্পস্বরূপ ধর্ম্মসাধনার দরুণ নির্জ্জনতার ব্যবস্থা। পরমহংসদেব বলিতেন, দুধ নির্জ্জনে রাখিয়া দিলে তবে দই জমিবে; সেই দই মন্থন করিয়া মাখন করিতে হইবে; তখন সেই মাখনকে জলে ফেলিয়া দিলেও সে উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইবে। এই যে গোড়ায় নির্জ্জন বাসের ব্যবস্থা, এ'ও কি সংসার-বিরাগ নয়? আরও লঘু অনুকল্প স্বামী তীর্থরামই দিয়াছেন; তিনি বলিতেন, সমুদ্রের ঝড়-ঝাপটায় জখম হইলে পর জাহাজকে ডকে আনা হয়। তখন তাহাকে জল হইতে একেবারে ডাঙ্গায় তুলিয়া ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়; তারপর জখমগুলি সারাইয়া সমুদ্র-যাত্রার উপযোগী করিয়া আবার তাহাকে জলে নামাইয়া দেওয়া হয়। সকালে এবং সন্ধ্যায় দিনের মাঝে এই দুইবার অন্ততঃ তোমাদের নিজকে ডকে তুলিয়া পরীক্ষা করা ভাল—নতুবা ফুটা হইয়া সংসারের সমুদ্রে তলাইয়া যাইবে যে! এক ব্রহ্মবাদিনী রাণীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, তিনি ছিলেন ভিখারিণীর মেয়ে; রাজার চোখে ভাল লাগায় তাঁহাকে তিনি রাণী করিয়াছিলেন। রাণী রাণীর পোষাকেই সারাদিন থাকিতেন বটে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় একবার একটী নির্জ্জন ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া সেই প্রথমদিনকার ভিখারিণী ছেঁড়া সাজে সাজিয়া আওড়াইতেন—এই রাণীর সজ্জা আমার উপাধিমাত্র, আমি যে কি, তাহা আমি কিছুতেই ভুলিব না—ভুলিব না—ভুলিব না। এইগুলি কি? সংসার-বিরাগ নয় কি?

ঠিক ঠিক প্রাণের দরদ দিয়া বিচার করি তো বলিতেই হয়, বাস্তবিক ধর্ম্ম বলিতে যে অলৌকিক অপার্থিব আনন্দের আভাস চিত্তে জাগে, সংসারের সুখে তাহা পাওয়া কঠিনই বটে। আত্মহারা একান্ত প্রেমের মাঝে যদি সে অপার্থিব আনন্দের একটুখানি আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তেমন আত্মহারা প্রেম বোধ হয় শতকরা নিরানব্বই জনের কাছেই একটা যৌবন-স্বপ্ন—একটা আলেয়ার আলো মাত্র। ঠিক আমি যে জিনিষটা চাই, সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়া সুডোল হইয়া সে জিনিষটি আমার কাছে ধরা দেয় না তো! এক-

দিক দিয়া না একদিক দিয়া তাহাতে একটু খুঁৎ থাকিয়াই যায়, সেটুকু আক্ষেপ দিয়া, কল্পনা দিয়া আমাকে পূরণ করিয়া লইতে হয়। আমার কল্পমূর্ত্তিটীকে আমি জগৎ ঢুঁড়িয়াও তো কোথায়ও দেখিতে পাই না! শেষে হতাশ হইয়া আমার মাঝেই প্রবেশ করিতে হয়, বাস্তবে যাহা দুর্লভ মনের ধ্যানে তাহাকে সুলভ করিয়া লইয়া সেই মানসীপ্রতিমারই পূজানিবেদনে দিন কাটিয়া যায়। বাস্তবিক, বুকে হাত দিয়া বল দেখি, যে ভালবাসার আস্বাদনের প্রলোভনে সংসার আঁকড়াইয়া রহিয়াছ, সেই ভালবাসা সেখানে বাস্তবিকই পাইয়াছ কি? না প্রেমের অনবদ্য স্বপ্নের ভাঙ্গা-চোরাটুকু জোড়া-তালি দিয়া কোনও রকমে এই সংসারটাকে জড়াইয়া রহিয়াছ? যদি শিল্পী হও, রসিক হও, কবি হও —আর এরাই ঠিক সংসারের রসবেত্তা—তাহা হইলে বল দেখি, বাস্তবিকই তোমার মানসপ্রতিমাকে যতটুকু ভালবাসিয়াছ, ততটুকু ভালবাসা সংসারে কাহাকেও বাসিয়াছ কি? বাসিতে পারিয়াছ কি? আর যদি তোমার এই সব মানস-প্রতিমা-টতিমার বালাই না থাকে তো তোমার সঙ্গে আমাদের কোনও ঝগড়া নাই; তাহা হইলে বলিব, তুমি যে সংসার কর, সে শুধু একটা বদ-ভ্যাস বশতঃ, বাস্তবিক সংসারে যে কি মধু, তাহা তুমি জানই না। এই কল্পলোকের আহ্বান যাহার কাছে অতিমাত্রায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, "পাচ্ছি-পাব" বলিয়া যাহারা বসিয়া থাকিতে পারে না, তাহারাই পাগল হইয়া সংসার হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। সেটা ভাল করে কি মন্দ করে, সে বিচার তুমি বসিয়া বসিয়া করিতে থাক। আসল কথা, সে দেওয়ানা; তাহার ভিতর একটা কিছু জাগিয়াছে, যাহার সন্ধান তোমারও পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আজও তুমি পাও নাই; তোমার সংসার সে জিনিষ দিতে পারিবে না।

এই ছুটাছুটী ব্যাপারটা সাধকের, তা জানি। রসিকের ব্যবহারটা এর চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। কিন্তু তা বলিয়া মনে করিও না, সংসারের পাঁকে পাঁকাল মাছের মত ডুবিয়া থাকিয়া তুমি-আমি সে রসিক বনিয়া গিয়াছি। কালো পাঁক হইতে আলোর পানে সহস্রদল শোভায় যিনি ফুটিয়া উঠেন, তিনিই রসিক। আর সংসার যদি কেহ ভোগ করে তো তিনিই। তোমার-আমার গায়ে পাঁকের গন্ধ ছাড়া আর কিছুই নাই, পাঁকে বাসা বাঁধিয়াও কেবল তাঁহারই গায়ে কমলের সৌরভ।

কিন্তু চুপি চুপি একটা কথা বলিয়া রাখি। এমনি কোনও রসিক যদি ভাগ্যবশে তোমার-আমার সংসারে জুটিয়া থাকেন তো জানিও, তাঁহার মত দাগাবাজ আর জগতে কেহ নাই। আঁতের খবর জানি বলিয়াই এ কথাটা বলিতেছি। হয় তো তোমার-আমার সঙ্গে তাঁর এত মাখামাখি, এত গলাগলি, মনে হয় যেন তিলেক বিচ্ছেদে প্রলয় ঘটিবে, কিন্তু একবার যদি রসিকের অন্তরে ঢুকিতে পাইতে তো দেখিতে সেখানে একজন চুপটী করিয়া বসিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে শুধু! আমার এই অকুণ্ঠ আত্মনিবেদনের পুরস্কার একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসি মাত্র, এ কথা জানিলে কাহার না কণ্ঠাগত প্রণয়োচ্ছাস শুকাইয়া কাঠ হইয়া যায়?

বাস্তবিক সংসারে থাকিয়াও যদি ধর্ম্ম করিতে হয় তো এই দাগাবাজীটুকু না করিয়া উপায় নাই। এই তো জগতের মায়া। আর এ মায়ার যদি চেতয়িতা কেহ না থাকিবে, মায়াবিনীর এই রঙ্গ দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিবার যদি কেহ না থাকিবে তো কি মনে কর সে মায়াবিনীরও তাহাতে সুখ আছে?

মেঘলোকের ওপারে ছিল একজনের বাসা। দৈবাৎ সে নামিয়া আসিল তোমাদের এই কুহেলিকার রাজত্বে। আসিয়া দেখে এখানে সব ছায়ালোকের লুকোচুরী। কিন্তু তাই নিয়া দুইটা দল হইয়াছে;

এক দল তর্ক করিতেছে, ঝিকিমিকি আলোটাই সত্য—ছায়াটা মায়া মাত্র; আর এক দল তর্ক করিতেছে, না, ছায়াটাই পরিণাম—আলোটা তারই বিকার মাত্র। এখন এই আলোর রসিক ইহাদের কি বুঝাইবে বল দেখি? এ দলও তাহাকে ঠাণ্ডা রাখিতে হইবে, ও দলও ঠাণ্ডা রাখিতে হইবে। সে হয়ত দুই দলের মাঝখানে বসিয়া একের কথায় ডান দিকে মাথা হেলাইয়া সায় দিবে তো অপরের আব্দারে বাঁদিকে মাথা হেলাইয়া সায় দিবে। কিন্তু ইহাদের ছেলেমানুষী দেখিয়া সে মনে মনে না হাসিয়া কি করিবে বল ত? আর, কোনও সেয়ানা যদি তার এই চোরা হাসিটুকু ধরিয়া ফেলিতে পারে তো তাহারই মনের ভাব কেমন হইবে বল দেখি?

সংসারে থাকিয়া যদি ধর্ম্ম হয় তো তাহা এমনি দাগাবাজী করিয়াই হয়। নতুবা উপায় নাই। যে রসিক এমন করিয়া সংসার করে, তাহার অবশ্য ষোল আনাই লাভ। কিন্তু সংসারী যদি একথা টের পায় তো তাহার সর্ব্বনাশ। ছোট্ট মেয়ে ধূলা-বালি দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিয়া বাপের মুখে তুলিয়া দিয়া বলিতেছে, খাও!—না খাইলে কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ করিবে। বাপকে তাই খাওয়ার ভাণ করিয়া কাঁধ গলাইয়া সব ফেলিয়া দিতে হয়। বাপের কিন্তু তাহাতে পেট ভরে না। তাই দুপুরবেলা আদুরে মেয়েকে লুকাইয়া হইলেও মেয়ের মায়ের বাড়া দুটী সত্যিকার অন্নব্যঞ্জন মুখে তুলিয়া দিতেই হয়।

সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম হয় কি না হয়, সে কথা এখন তোমরাই বিচার করিয়া বল দেখি! (ক্রমশঃ)

—*—

সাধুর পরিচয়

—*—

সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। কিন্তু সাধু চিনিব কি করিয়া? একটা সোজা জবাব আছে, সাধু না হইলে সাধু চেনা যায় না। অনেক বড় বড় রহস্যের ফাঁকা মীমাংসার মত এটাও একটা কথার ফাঁকি, তা বুঝি। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার চেয়ে ওই প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব আর কিছু হইতে পারে না। তা ছাড়া কথাটার মাঝে একটু দার্শনিকতাও আছে। যে কোনও চেনাপরিচয়ের মাঝে চিত্তের সাম্য থাকা চাই। যে যে বিষয়ের চর্চ্চা করে, তার সেই বিষয়ে বুদ্ধি খোলে। বৈদান্তিক আরও সোজা ভাষায় বলিবেন, সাধু, চোর এ সব কি আর আমি ছাড়া? আমার মাঝেই তো সব রহিয়াছে! ভিতরে যখন যাহাকে জাগাইব, বাহিরেও তখন তাহাকে দেখিতে পাইব।

তাহা হইলে কথাটা হেঁয়ালীই হউক আর যাই হউক, মূলে কিন্তু ঠিক। আমার মাঝে সাধুত্বের সাধনা যতটুকু ঐকান্তিক হইবে, সাধু চেনা আমার পক্ষে ততই সহজ হইবে। আমাদের দেশ সাধুতে ছাইয়া আছে; সাধুভক্তিও যে আমাদের কিছু কম, তাও নয়। কিন্তু তবুও ভদ্রব্যক্তিরা আপশোষ করিয়া বলেন, সাধুর বুলি কপচাইয়া লোকে তাঁহাদের যত ঠকায়, অমন বুঝি আর কেহ ঠকায় না। এইরূপে সাধুর ওপর একটা আক্রোশও দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে—বিশেষতঃ আমাদের ইয়ং বেঙ্গলে। চিনাকি না দেওয়ার দোষটা সাধারণতঃ সাধুর ঘাড়েই চাপানো হয়। যাঁহারা বাস্তবিক সাধু, তাঁহাদের অবশ্য ইহাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু ভক্তের

প্রাণে ব্যথা লাগে। তাই সান্ত্বনাস্বরূপ তাঁহারা এমন কথাও বলিয়া থাকেন শুনি, যে "ভাল জিনিষেরই তো ভেজাল হয়"; কেউ কেউ ভণ্ডামীর সমস্তটা দোষ আদি সাধুসাজা ভণ্ড রাবণ বেচারীর ঘাড়েও চাপাইয়া দেন। আমি কিন্তু বলি, ভণ্ডেরা যদি নিরীহ লোককে ঠকাইবার এত সুযোগ পায় তো সে ভণ্ডদের তত দোষ নয়, যত দোষ ওই নিরীহ গোবেচারীদের। তাহাদের বেমালুম ঠকিবার ঝোঁক দেখিয়া মনে হয়, বাস্তবিক দেশ হইতে সাধুত্বের সাধনাও উঠিয়া যাইতেছে। সাধুকে ভক্তি করিতে পারি, সেবা করিতে পারি, কিন্তু বাস্তবিক আমরা সাধু হইতে চাই না; এবং সেই জন্য সাধু চিনিও না। তাই আমাদের কাছে মুড়িমিছরীর একদর। এই চেষ্টা-শৈথিল্যের সুযোগ লইয়া যদি সমাজে নানা আবর্জ্জনা আসিয়া জমা হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার দরুণ শুধু এক পক্ষকে দায়ী করা কথনো ন্যায়-সঙ্গত হইবে না।

আমরা কেমন করিয়া সাধু চিনি, তাহার দুই একটা নমুনা দিব। তাহা হইতেই বোঝা যাইবে, আসল গলদ কোথায়। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, তাঁহাকে যে ভাবে চাহিবে, তিনি সেই ভাবেই না দেখা দিবেন!

এ পর্য্যন্ত যত সাধুচরিত্র বাহির হইয়াছে, তাহার মাঝে দুই একটা ছাড়া আর সবই কেবল অলৌকিক কাহিনীতে একেবারে ঠাসা। এই হইতে সাধারণ লোকের মাঝে এমন একটা সংস্কারও ঢুকিয়া গিয়াছে যে অলৌকিক কিছু না দেখাইতে পারিলে আর সাধু কিসের? অতি প্রাচীন কাহিনীর সঙ্গে একটু অলৌকিকত্বের আবছায়া আবরণ থাকিলে সেগুলো একরকম মন্দ লাগে না। কিন্তু একেবারে নিতান্ত একালেও যখন দেখি, দেশপ্রসিদ্ধ সাধু-চরিত্রের মর্ম্মরহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া জীবনী-লেখক কেবল আজগুবি খবরের পর আজগুবিতর খবরের রেস্ সুরু করিয়া দিয়াছেন, তখন চারিদিক চাহিয়া কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ হইতে থাকে। জগতে অলৌকিক কিছু যে নাই বা ঘটে না, আমি সে কথা বলিতেছি না। সেক্সপীয়রের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি—There are more things ইত্যাদি, (আজগুবির সাফাই-সাক্ষীরূপে যাহাকে যত্র-তত্র হাজির হইতে দেখি) আমার বেশ কণ্ঠস্থ আছে; আর সেটাকে শুধু নির্ব্বোধের সান্ত্বনা বলিয়া নয়, বিজ্ঞের বচন বলিয়া মানিয়া নিতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু তবুও ভাবিয়া পাই না, এই জগৎটা কি অমনিই কিছু কম অদ্ভুত, যে আবার নিত্যনূতন অদ্ভুত রস চোঁয়াইবার জন্য স্পেশাল ভাটী খুলিতে হইবে?

আজগুবি কথা সবাই বিশ্বাস করে না। যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহাদের ইহাতে সাধুচরিত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর জন্মা ছাড়া আর কোনও লাভ হয় না। যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদেরই বা কি উপকার হয়, তাহা তো বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দেখিলাম, আমার সামনে বসিয়াই এক সাধু ঢক্ ঢক্ করিয়া দুইমণ রেড়ীর তেল খাইয়া ফেলিলেন, কিম্বা কেউ শূন্যপথে ডিগবাজী খাইতে খাইতে উড়িয়া গেলেন; কিন্তু তাহাতে আমার কি উপকার হইল? এই সিদ্ধাই দেখিয়া না হয় 'বাবার' প্রতি তথা-কথিত ভক্তিই হইল। কিন্তু সেই ভক্তির মূল্য কতটুকু? সে ভক্তি কি আমাকে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, লোভ, ইন্দ্রিয়পরতা হইতে মুক্ত করিবে? আড্ডায় বসিয়া আজগুবি গল্পের চিতেনে আসর জমাইয়া তোলা ছাড়া এই বিশ্বাসালুতায় আর কোনও উপযোগিতা আছে কি?

আজগুবির সম্বন্ধে সাধুদের মুখেই একটা গল্প শুনিয়াছিলাম, এখানে তাহা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বাপ-বেটাতে জঙ্গলে কাঠ কুড়াইতে গিয়া দেখে, একটা বট গাছের নীচে একটা কোলাব্যাঙ একটা হাতীকে গিলিয়া

খাইতেছে। ব্যাপার দেখিয়া ছেলের প্রাণ তো আই-ঢাই করিতে লাগিল, বাপ তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, যা দেখিলি, খবরদার কাউকে যেন তার কথা কিছু বলিস্ না। মিছামিছি লোকের ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুনিতে হইবে বই তো নয়। তোর কথা কেউ বিশ্বাসও করিবে না, তুইও কাউকে এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারিবি না; কাজেই এ নিয়া আর হৈ-চৈ করিস্ না। ছেলে কিন্তু বাপের কথা না শুনিয়া গ্রামে আসিয়া সমস্ত কথা রটাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কেউ বিশ্বাস করিল, কেউ করিল না; যাহারা করিল না, তাহারা তর্ক সুরু করিয়া দিল। তর্কের ঝোঁকে ছেলে বলিয়া বসিল, চল, বাবাকে লইয়া সে গাছের তলায় গিয়া যদি ব্যাপারটা না দেখাইতে পারি তো হাজার টাকা দিব। সবাই আসিয়া বুড়াকে ধরিল; বুড়া সমস্ত কথা শুনিয়া বলিল, কই বাবা, আমি তো এ সমস্ত কথা কিছু জানি না! ব্যাঙে হাতী গিলিবে, এও কি সম্ভব? সবাই বলিল, তোমার ছেলে যে হাজার টাকা বাজী রাখিয়াছে! বুড়া বলিল, তার কি করা! নিয়া যাও, হাজার টাকা গুণিয়া দিতেছি। টাকা লইয়া লোকগুলা চলিয়া গেল। বাবা তখন ছেলেকে ধমকাইয়া বলিল, আগেই তো তোকে মানা করিয়া দিয়াছিলাম, মিছামিছি হাজারটা টাকা দণ্ড করাইলি। মর্ ব্যাটা, ব্যাঙে হাতী গিলিয়াছে তো তোর বাবার কি? কিন্তু রোস, ও টাকার ডবল আমি আদায় না করিয়া ছাড়িতেছি না।

কিছুদিন পরে বুড়ার বাড়ীতে একটী গাই বিয়াইল। বুড়া ছেলেকে বলিল, দেখ্, রোজ দুধ দু'ইবার আগে বাছুরটাকে কোলে করিয়া নিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিবি। গঙ্গায় চুবাইয়া আনিলে তবে যেন ও বাঁটে মুখ দেয়। ছেলে তাহাই করিতে লাগিল। বাঁটে মুখ দিবার আগে রোজ গঙ্গায় চুবুনী খাইতে খাইতে শেষে বাছুরটার এমনি অভ্যাস হইয়া গেল, যে দু'ইবার সময় তাহাকে ছাড়িয়া দিতেই সে আগে গিয়া গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িত, তারপর আসিয়া বাঁটে মুখ দিত। কিছুদিন পরে বুড়া ছেলেকে বলিল, যা, এইবার গ্রামে গিয়া রটাইয়া আয় যে আমাদের কপিলা গাইয়ের এমন সাত্ত্বিক বাছুর হইয়াছে যে সে রোজ গঙ্গাস্নান না করিয়া মায়ের স্তন্যপান করে না। যদি কেউ তর্ক করিতে আসে তো এবার দুহাজার টাকা বাজী রাখিবি। ছেলে গিয়া গ্রামে এই কথা রটাইয়া দিল। লোকে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল, আর একবার ব্যাঙে হাতী গিলিয়াছিল, এবার আবার বাছুরে গঙ্গাস্নান সুরু করিল। তোর যত আজগুবি গল্প! ক্রমে তর্কবিতর্ক হইয়া দুই হাজার টাকা বাজী রাখা হইল। বলা বাহুল্য, এবার আর বুড়াকে বাজী হারিতে হইল না। দুই হাজার টাকা বাজাইয়া লইয়া বুড়া ছেলেকে উপদেশ দিল, দেখ্, যা লোককে দেখাইতে পারিবি না, কখনও যেন তাহা নিয়া কথা তুলিস্ না।

হাজার মাইল ছুটিয়া আসিয়া এক যুবক শিবানন্দ স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, বাবা, তুমি আমায় যোগ শিক্ষা দাও, নহিলে আমি আর বাঁচিব না। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, যোগ শিখিয়া কি করিবে? যুবক বলিল, শুনিয়াছি যোগীরা নাকি অদৃশ্য হইতে পারে, আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে, পাহাড়ের মাঝে ডুব দিতে পারে। স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, সে সব কৌশল শিখিয়া তোমার লাভ? যুবক বলিল, আমি শান্তি পাইবার আশায় আজ ছয় বৎসর ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। স্বামীজী বলিলেন, এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া ভগবান্‌কে একটু ডাকিয়া দেখিয়াছ কি?—মনে শান্তি পাও কিনা, চোখ দুটী কপালে তুলিয়া যুবা বলিল, যোগ ছাড়া কি ভগবানের দেখা পাওয়া যায় কখনো? স্বামীজী মৃদু

হাসিয়া বলিলেন, তুমিই তো সব জান বাবা, তবে আর আমার কাছে আসিয়াছ কেন? যুবক ইতস্তত করিয়া বলিল, আপনার কথা আমি বেদবাক্য বলিয়া মানি, কিন্তু আমাকে কিছু যোগৈশ্বর্য্য দেখাইতে হইতেছে, নতুবা আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না!

এই শ্রেণীর লোকে দেশ ছাইয়া যাইতেছে। সহজ কথার মাঝে কুটিল অর্থ আরোপে ইহারা ওস্তাদ। নিজেদের খাটিবার ইচ্ছা আদপেই নাই, কোনও একটা কিছু পরখ করিয়া দেখিতে বলিলে অমনি চক্ষুস্থির, অথচ এদিকে আঁতের খবর নিয়া দেখ, যোগ, তন্ত্র, সাধু, মহাত্মা ইত্যাদি সম্বন্ধে উদ্ভট থিয়োরীতে পেট বোঝাই! চোখমুখ ঘুরাইয়া হাত নাড়িয়া একজন আমাকে বলিলেন, দেখ, এই যে আজকাল টেলিগ্রাফ্, টেলিফোন্ ইত্যাদি হইয়াছে, এগুলির কি আর সে যুগে কোনও প্রয়োজন ছিল? ধর, ছেলেটা বিদেশে—দু'মাস ধরিয়া তাহার খবর পাইতেছি না বলিয়া মনটা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। একদিন সকালবেলায় শৌচ করিতে বাহির হইয়া দেখি খালের ধারে বটতলায় এক বিরাট্ মূর্ত্তি! গাড়ুটা রাখিয়া গলায় কাপড় দিয়া বাবার পায়ের গোড়ায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলাম, বাবা, ছেলেটার কোনও খবর পাইতেছি না আজ দুই মাস ধরিয়া—। বাবা তিন সেকেণ্ড চোখ বুজিয়া বলিলেন, কোনও ভয় নাই, তার আমাশয় হইয়াছিল, সারিয়া গিয়াছে, বুধবার দিন বাড়ী আসিবে। ব্যস্, তোমার টেলিগ্রাফ-টেলিফোন্ কিছুই করিতে হইল না, গাঁটের পয়সা গাঁটেই থাকিয়া গেল! তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, এখন কি আর সেদিন আছে ভায়া! আমিও হাসি চাপিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, তাই ত, অমন চলন্ত টেলিগ্রাফ অফিসের বদলে অচল তারে তারে দেশটা ছাইয়া গেল, গাঁটের পয়সাগুলোও আর পোষ মানিতে চায় না!

এই অদ্ভুত শ্রদ্ধাবিশ্বাসকে যে কি সংজ্ঞায় অভিহিত করিব, তাহা খুঁজিয়া পাই না। এই সমস্ত বিশ্বাসালুতা যে কেবল অশিক্ষিতদের মাঝেই রহিয়াছে, তাহা নয়—য়ুনিভার্সিটীর ডিগ্রীধারীরাও ইহা হইতে বাদ পড়েন না। যুক্তিতর্ক ও নাস্তিকতার ভান ততক্ষণ, যতক্ষণ নিজে বিপদ্ হইতে তফাতে। কিন্তু বিপদ আসিয়া ঘাড়ে চাপিলেই বিলাতীয়ানার বার্ণিশটুকু উঠিয়া গিয়া ভিতরের দিশী রং আপনি বাহির হইয়া পড়ে। তখন দেখা যায়, যাঁর যত বিদ্যার জাঁক, তিনি তত অন্ধ। হাঁচি-টিকৃটিকি, পোকা-মাকড়-আরশুলা কিছুরই স্মরণ-মনন আর তখন বাদ যায় না—কেবল বাদ পড়েন অদৃশ্য, অচিন্ত্য ঠাকুরটী! চিত্তের এই শিথিলতা, এই তমোভাব একেবারে জাতির মেরুদণ্ডের মাঝে টি বির ব্যাসিলির মত ঢুকিয়া গিয়াছে। উপরে আমরা যতই রকমারী পালিশ দিতেছি না কেন, ধোপে কিছুই টিকিতেছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দর্শনশাস্ত্রের এম্-এ গম্ভীর হইয়া আমাকে বলিলেন, দেখুন, আমার বাসায় মাসাধিক কাল একজন সাধু আসিয়া ছিলেন। তিনি বলিতেন, তিনি যোগাভ্যাসী। রোজ খাওয়া-দাওয়ার পর দেখিতাম, তিনি ঘরে কপাট দিয়া খাটিয়ায় সটান চীৎ হইয়া পড়িয়া আপাদমস্তক শ্বেতবস্ত্রে আবৃত করিয়া প্রায় তিন ঘণ্টা কাল একভাবে নিস্পন্দ হইয়া থাকিতেন। মাঝে মাঝে চাদরের ভিতর হইতে কেবল একটা ঘড়-ঘড় শব্দ শোনা যাইত। আচ্ছা, আপনাদের যোগশাস্ত্রে এইরকম কোনও ক্রিয়া আছে নাকি? আঠারো অধ্যায় গীতা যাঁর কণ্ঠস্থ, বিলাতী দর্শনে যিনি এম্-এ, তাঁর মুখে এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া কী যে জবাব দিব ভাবিয়া পাইলাম না। সাধুসঙ্গ আর ধর্ম্মভীরুতা যে এমন করিয়া মানুষের সহজ কাণ্ডজ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিতে পারে,

তাহার এরূপ বিচিত্র নমুনা বোধ হয় এ দেশেই দুর্ল্লভ নয়।

সমাজেও সাধুগিরির একটা চাহিদা আছে, কিন্তু সেটা আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়াই বেশী না আধিভৌতিকতা ও আধিদৈবিকতার দিক দিয়া বেশী, তাহা বলা শক্ত। সাধু রোগ আরাম করিয়া দিতে পারেন, ভবিষ্যৎ গুণিয়া বলিতে পারেন, মনের কথা বলিয়া দিতে পারেন, আশীর্ব্বাদদ্বারা বা কোন ক্রিয়া-কর্ম্মদ্বারা আমার মোকর্দ্দমা জিতাইয়া দিতে পারেন বা অন্নবস্ত্রের কষ্ট ঘুচাইতে পারেন—বোধ হয় দেশের বারো আনা লোকই সাধুর কাছে এইরূপ প্রত্যাশাই করিয়া থাকে এবং এই মাপকাঠি দিয়াই তাহারা সাধুর সাধুত্ব মাপিয়া থাকে। সাধু যদি তাহাদের আশা পূরণ করিতে পারেন তো সে তাঁহার কেরামতী, সে বিষয়ে সন্দেহো নাস্তি; কিন্তু যে জাতি এই সমস্ত জঞ্জাল মাথায় পুরিয়া সাধু ঢুঁড়িয়া বেড়ায়, তাহার আধ্যাত্মিকতার বড়াই কতটুকু সত্য, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে। "সাধুর নিকট মন্ত্র লইয়াছি তো আমার ছেলের ব্যারাম হইবে কেন?" —এমন অদ্ভুত আব্দারও শুনিতে হয়!

দেখা গেল, সুরেন বিশ্বাসের হঠাৎ একেবারে সাধুভক্তি কানা ছাপাইয়া উপচিয়া পড়িতেছে। দু'চার দিন পর শিবানন্দ স্বামী একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে বাপু, মৎলবখানা কি? কাঁচুমাচু হইয়া সুরেন বলিল, বাবা যদি একটু দৃষ্টি দেন—। স্বামীজী বলিলেন, একটু কেন, চোখ দুটী তো বেশ বিস্ফারিত করিয়াই রাখিয়াছি! তোমার কথাটা কি খুলিয়াই বল না! সুরেন বলিল, এবার বি-এ পরীক্ষা, পাশ করিতে পারি কিনা সন্দেহ। স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, তা আমি কি করিব? দিব্যদৃষ্টি দিয়া প্রশ্নপত্র দেখিয়া বলিয়া দিব? সুরেনের চোখ দুটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, অতদূর না হইলেও হয়, শুধু আপনি বলিয়া দিন যে তুই পাশ করিবি! স্বামীজী বলিলেন, আর তুমি যদি পাশ না কর? সুরেন গগগদ কণ্ঠে বলিল, আপনি যদি বলেন তো নিশ্চয়ই পাশ করিব। দিনের পর দিনা এইভাবে চলিতে লাগিল, সুরেনের বিশ্বাস-ভক্তির গাঙে আর ভাটা পড়ে না। স্বামীজী বলিলেন, বাপুহে, যতক্ষণ তুমি আমার কাছে বসিয়া ঘ্যান্ ঘ্যান কর, ততক্ষণ বইয়ের পাতাগুলি উল্টাইলে কাজ হইত, আমার বাক্য সফল হইবার একটা সম্ভবমত অজুহাতও পাওয়া যাইত। সুরেন বিশ্বাস নাছোড়-বান্দা—সে বাবার নিকট হইতে কবুল জবাব না লইয়া ছাড়িবে না। অবশেষে স্বামীজী একদিন বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, আচ্ছা, যাও—তুমি পাশ করিবে। সুরেন কৃতার্থ হইয়া গেল।—এর পর পড়া-শুনা করিয়াছিল কি না জানি না। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। গেজেটে কোথায়ও সুরেনের নাম খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহার পর শোনা যাইত, সুরেন বিশ্বাস যাহার-তাহার কাছে বলিয়া বেড়াইতেছে—শিবানন্দ স্বামী লোকটা আসল ভণ্ড। এমনি ধরণে আমাদের দেশে সাধুর পরখ হয়।

আর এক তরফের কথা বুঝাইবার দরুণ একটা গল্প বলি। রাজবাড়ীতে এক সাধু আসিয়াছেন, রাজা মহা সমাদরে তাহাকে স্থান দিয়াছেন। একদিন রাজা নির্জ্জনে সাধুকে বলিলেন, বাবা আমার কামপিপাসা অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ভোগের সামর্থ্য নাই। ইহার কোনও উপায় যদি করিতেন। সাধু বলিলেন, কাল আমার কাছে আসিও। পরদিন রাজা সাধুর কাছে গেলেন, সাধু একটী মোদক হইতে এক কণিকা ভাঙ্গিয়া রাজাকে খাইতে দিয়া বলিলেন, কিরূপ ফল পাও কাল জানাইও। বলিয়া মোদকের বাকীটুকু নিজে খাইয়া ফেলিলেন। পরদিন রাজা আসিয়া সাধুকে বলিলেন, বাবা, আপনার ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ, অবিশ্রান্ত ভোগেও আমার

তৃপ্তি নাই, ক্লান্তি নাই। সাধু হাসিয়া আর একটী মোদক লইয়া এক কণিকা রাজাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজে সবটুকু খাইয়া ফেলিলেন। এমনি করিয়া দিন যায়। রাজা সাধুর কাছে একেবারে পোষা কুকুরটীর মত। অমাত্যদের কিন্তু ইহা সহ্য হইল না। তাহারা সাধুকে ভুলাইবার জন্য এক বেশ্যা নিযুক্ত করিল। বেশ্যা একদিন রাস্তা হইতে সাধুকে ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল। সাধু কোনও দ্বিধা করিলেন না। সাধুর মুখের দিকে তাকাইয়া বেশ্যার চৈতন্য হইল। সে তাঁহার পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া সকল কথা খুলিয়া বলিল, বাবা, আমি মহা পাপীয়সী, আমাকে উদ্ধার কর। সাধু তাহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক নানা সদুপদেশ দিয়া আসিলেন। ইহার পর হইতে বেশ্যা-টীর আকিঞ্চনে সাধু প্রায় প্রত্যহই তাহার ঘরে গিয়া বসেন। অমাত্যদের বেশ সুযোগই হইল। তাহারা রাজার কাণে এই কথাটা তুলিল। রাজা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, ব্যাপার সত্য, সাধু রোজই বেশ্যাবাড়ী যান। রাজা ভাবিলেন, হইবে না কেন, এক কণিকা মোদক খাইয়া আমি কামের তাড়নায় ছট্‌ফট্ করি, আর তিনি তো সবটা খাইয়া ফেলেন। সেদিন সাধুর নিকট মোদক খাইতে আসিয়া রাজা বলিলেন, আপনি যে কত বড় সাধু, তাহা জানিতে পারিয়াছি। প্রবৃত্তিই যদি না সংযত করিতে পারিলেন তো এই বেশ ধরিয়াছেন কেন? সাধু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, ব্যাপার কি? রাজা তখন সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। সাধু তাহার কোনও উত্তর না দিয়া বলিলেন, মহারাজ আগামী পূর্ণিমার দিন আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব; সেইদিন তোমার মৃত্যু হইবে। জীবনের এই কয়টা দিন ইচ্ছামত ভোগ করিয়া লও—তাই মোদকের মাত্রা আজ বাড়াইয়া দিলাম। সাধুর কথা শুনিয়া রাজার তো প্রাণ উড়িয়া গেল। বিমূঢ়ের মত তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। পর-দিন রাজা যথাসময়ে মোদক খাইতে আসিলেন, কিন্তু তাঁহার আর সে স্ফূর্ত্তি নাই—এক রাত্রিতেই যেন তাঁহার সব বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। সাধু মোদকের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। এমনি করিয়া ক্রমে চতুর্দ্দশী তিথি আসিয়া পড়িল। সাধু রাজাকে পূর্ণ একটী মোদক খাইতে দিয়া বলিলেন, মহারাজ, আজ তোমার শেষ দিন। আজ রাত্রে যথেচ্ছ ভোগ করিও, কাহারও বাসনা যেন অপূর্ণ না থাকে। পরদিন আবার যথাসময়ে রাজার সহিত সাধুর দেখা হইল। সাধু বলিলেন, কি মহারাজ, মোদকের ক্রিয়া কাল কেমন অনুভব করিলে? রাজা কাতর স্বরে বলিলেন, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? কাল মরিব জানিয়া আজ রাত্রে আমোদ করিতে পারে মানুষে? সাধু জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, মহারাজ, তুমি কাল মরিবে জানিয়া আজই সমস্ত ইন্দ্রিয় গুটাইয়া বসিয়া আছ, আর আমি—নিত্য মরণের কোলেই বসিয়া রহিয়াছি, জগৎ জুড়িয়া মরণেরই তাণ্ডবলীলা দেখিতেছি; ইন্দ্রিয়বিকারের কথা চিন্তা করিব কখন?

এই অন্তর্গূঢ় দিকটাই সাধুর যথার্থ পরিচয়। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছিলেন, "তার ক্রিয়া মুদ্রা যত বিজ্ঞে না বুঝয়।" অন্দরের খবর নিতে হইলে অন্দরে ঢুকিতে হইবে। কিন্তু আমরা সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছি। যুগযুগান্তরের পুঁজি যত কল্পনা, জল্পনা, কিম্বদন্তী—এইগুলি হইতেছে আমাদের সাধু চিনিবার উপায়। এক ভগবান্‌কে যেমন তেত্রিশ কোটি দেবতায় ভাঙ্গিয়া সাংসারিক সুফল লাভের আশায় তাঁহাদের মানসিক আদায় করিয়া আধ্যাত্মিকতার দাবী বজায় রাখিতেছি, তেমনি সাধুর সহজ প্রকাশটী ভুলিয়া গিয়া দেশের যত অলৌকিক আর আজগুবি ব্যাপার তাঁহার কাঁধে চাপাইয়া তাঁহাকে টানিয়া আমাদের কামনা-বাসনার আস্তাকুঁড়ে আনিয়া ফেলিয়াছি।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়, বাস্তবিক সাধুর কলঙ্কের দরুণ দায়ী সাধু নিজে, না তাঁহার দুর্ব্বলহৃদয় ভক্তের দল? আমরা যেমনটী চাই, তেমনটাই পাই। কোনও কিছু করিব না অথচ ফাঁকতালে রাজা হইয়া যাইব—এই আমাদের বাসনা। তা সে বাসনা পূরণ করিবার দরুণ তেমন ওস্তাদ গুণীও আসিয়া জুটিতেছে। কিছুদিন ধরিয়া কোন্ একটা কাগজে দেখিতেছি, পাঁচসিকা না সাত সিকা দিয়া ইষ্টদেবতা দর্শন করাইবার কে যেন কারখানা খুলিয়াছে! মাসের পর মাস যখন বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে, তখন ব্যবসা নিশ্চয়ই চলিতেছে ভাল। কি আর বলিব, শুধু ভাবি, ঠকিবার জন্য উন্মুখ লোক না থাকিলে বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি কখনও কোনও দেশে ঠগের আবির্ভাব ঘটান না। আজকাল বিজ্ঞানের কেরামতীর কথা অনেকই শুনিতে পাইতেছি, অনেকে বলিতেছেন, এইবার অজ্ঞানতিমির দূর হইয়া গেল। কিন্তু ওই দেশে শুনিতেছি, বৈজ্ঞানিক উপায়ে লোকে চুরী ডাকাতী খুনজখম করে; আর আমাদের দেশে আমরা করিব বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইষ্টদর্শন! বিস-মিল্লায় যদি গলদ থাকিয়া যায় তো তার উপরে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার যতই পালিশ দাও না কেন, কিছুতেই কিছু হইবার নয়।

—*—

শিক্ষা-প্রসঙ্গে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শারীরিক শিক্ষা—যৌনবিজ্ঞান

যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে আগে যতটা ঢাকাঢাকি ছিল, আজকাল ততটা নাই। সব আলোচনাতেই পশ্চিমের পণ্ডিতেরা যেমন নাটের গুরু, এ বিষয়েও এদেশে তাই হয়েছে। যৌনতত্ত্বের জ্ঞান ও ব্যবহার দু তরফ থেকেই আজকাল জোর আলোচনা চল্‌ছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে আলোচনার ঢেউ সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে এসে পৌঁছায় না। কোনও কোনও প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ধুরন্ধরের আলোচনা ও সিদ্ধান্তগুলি যেমন একটু ভোগগন্ধী হয়ে প্রকট হয়েছে, তেমনি আমাদের দেশের ধুরন্ধরেরা সেইগুলিকেই আনন্দসহকারে লুফে নিচ্ছেন। কিন্তু যে বিরাট্ অনুসন্ধিৎসা এই বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছে, তার সম্বন্ধে আমাদের গরজটা যেন কিছু কম। পূর্ণবয়স্কের যৌনজীবন আলোচনায় যে পরিমাণ মত্ততা আমাদের দেশে নানা ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছে, তার তুলনায় শিশুর যৌনজীবন সম্বন্ধে ধীর-স্থির আলোচনা খুব কমই দেখ্‌তে পাই। অথচ জাতির বনিয়াদ গড়ে তুলবার পক্ষে এইটেই ছিল সব চেয়ে বেশী দরকারী। আমাদের প্রাচীনেরাও এই তত্ত্ব নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করে গেছেন; আজ কাল সে সব প্রাচীন গ্রন্থেরও কয়েকখানা পুনরাবিষ্কৃত ও সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ও সমস্ত গ্রন্থে নিদানকথা বড় কম; আর সবই বয়স্কদের উপযোগী আলোচনা। যৌনসংরোধের কঠিন ব্যবস্থা ছিল বলেই বোধ হয় শিশুজীবনে এ সমস্যার আবির্ভাব বা তার মীমাংসা নিয়ে প্রাচীনেরা মাথা ঘামান নি।

কিন্তু আজকাল পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন সমস্যাটা যেন সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ও সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান যেমন কঠোর পরিশ্রম সহকারে নানা গবেষণা করছে, তেমনি জাতির অভ্যুদয় আকাঙ্ক্ষায় আমাদেরও যৌন-বৈজ্ঞানিকের নির্দ্দেশানুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করতে হলে স্বতন্ত্রভাবে করা প্রয়োজন—বলবার এত কথাই আছে। আমরা শুধু চল্‌তি পথে দু'চারটা কথা বলে যাব মাত্র।

যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটা কু-সংস্কার আছে, সেইগুলো আগে দূর করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ আমরা একে লজ্জাকর মনে করি। এটা অত্যন্ত মারাত্মক ভুল। কোনও বিষয়েরই তত্ত্ব-জ্ঞান লজ্জাবহ হতে পারে না। যে সমস্ত তথাকথিত আর্টের আলোচনায় সুপ্ত যৌনপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়ে মানুষের সর্ব্বনাশ ঘটায়, কই, তাদের তো আমরা লজ্জাকর বলে মনে করি না, যদিও বাস্তবিক তাদেরই লজ্জা করে দূরে সরিয়ে রাখা আমাদের উচিত ছিল। লজ্জায় শুধু অজ্ঞানকে প্রশ্রয় দেয়, প্রবৃত্তিকে সংযত করবার শিক্ষা তো দেয় না। ফলে কি হয়? মানুষ সেই সমস্ত কাজই করে, কিন্তু তত্ত্ব না জেনে মূঢ়ের মত করে, আর বিঘোরে প্রাণ হারায়। এ সম্বন্ধে অন্ধ ভোগীর আলোচনা—সেটা এখন যত সন্তর্পণ আর সুকুমারই হোক—বাস্ত-বিকই লজ্জাবহ; কিন্তু জিজ্ঞাসু কিম্বা সন্তানের হিতে-চ্ছুর পক্ষে কখনই এ আলোচনা লজ্জাকর নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এ সম্বন্ধে আমাদের উপেক্ষা। যৌন-ব্যাপারটা যেন অবান্তর একটা কিছু, ও সম্বন্ধে আমাদের মনোযোগ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই, আমরা এমনি একটা ভান করে থাকি। অথচ বেশ জানি, আমাদের সারাক্ষণের বারো আনা চিন্তাই হয়ত ওই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। Freudর মত কাম চুঁইয়ে প্রেম নিষ্কাশন কর্‌বার মত বর্ব্বরতাকে আমল দিতে চাই না বটে, কিন্তু Stopesর ভাষায় বাস্তবিকই বল্‌তে পারা যায়, whether we deny it or not, we are essentially sexed organisms. এ কথাটার অন্তর্নিহিত ভাবটা কে কিভাবে প্রয়োগ কর্‌বে, সেটা আমাদের লক্ষ্য নয়, মূলে যে এটা একটা সত্য কথা, এ স্বীকার কর্‌তেই হবে, এবং জীবনের এ তরফটার একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিতেই হবে। Sanger আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমরা মানুষের দরুণ হাঁসপাতাল, পাগলা-গারদ ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করে দয়াবৃত্তির চরিতার্থতা করি, আর ভাবি আমরা বড় সুসভ্য; কিন্তু যে সমস্ত নিদান থেকে এই হাঁসপাতাল আর পাগলা গারদের উদ্ভব হয়, সেগুলোকে দূর কর্‌বার দরুণ চেষ্টা করি না কেন? আদপেই ওগুলো না থাকলে সেইটাই হত আমাদের সভ্যতার পরিচয়। কথাটা খুবই ঠিক। দেহ নিয়ে কারবার করি, এমন কি দেহসর্ব্বস্বই হয়ে আছি, অথচ তার সম্বন্ধে কিছুই খবর রাখি না—অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ কেবল প্রবৃত্তির স্রোতেই ভেসে চলেছি!

তৃতীয়তঃ, আমরা মনে করি, এ সম্বন্ধে আলোচনা না কর্‌লেই বুঝি এর বিকারের করাল গ্রাস হতে আমরা অব্যাহতি পাব। এই ভেবে আমরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এ সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখবার ভান করি; কিম্বা তারা কিছু জেনেছে জেনেও তাদের জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক ধারায় প্রবাহিত কর্‌বার চেষ্টা না করে তাকে কোনওরকম চাপাচুপি দিয়ে রেখে মনে করি, এবার ছেলেকে ভুলিয়ে রাখতে পার্‌লে আর ও বিষয়ে সে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু এ কি ধামাচাপা দিয়ে রাখবার জিনিষ? আঁধার কুঠুরীতে বন্ধ করে রাখলেও, মুখে ভাষা না ফুটলেও যে জন্তুর ওই বৃত্তি জাগবেই। তা ছাড়া, শিশুর সজাগ, অনুসন্ধিৎসু মন।

তার চারদিকে দিনের মাঝে কতবার হয়ত কত পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গের মাঝে এই ব্যাপারের অভিনয় হচ্ছে। সে কি কিছুই দেখছে না? কোনও প্রশ্নই তার মনে জাগছে না? হিতাকাঙ্ক্ষীর কাছে এর বৈজ্ঞানিক জবাব পেলে হয়ত তার জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হত, এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব জাগত; কিন্তু তা না পেয়ে সে হয়ত এমন জায়গা হতে এ সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করে বসে যে, চিরদিনের দরুণ তাতে সে মাটী হয়ে যায়। ছেলে সরলপ্রাণে হয়ত এই সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপার দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করে বস্‌ল, মা ছেলেকে দুটা ধমক দিয়ে বলে গেলেন, ছিঃ, ও সব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই। ছেলের কৌতুহল এতে আরো বাড়েই; আর যে পর্য্যন্ত সে এর একটা মীমাংসা না পেয়েছে, সে পর্য্যন্ত ওই চিন্তাটাই তার মনের মাঝে ঘোরপাক খায় শুধু—এটা এমন কি ব্যাপার যাতে মা অমন করে বকে গেলেন। ফলে মায়ের অতর্কিত ব্যবহারেই তার সরলতার সমাধি হয়ে যায়।

যা অবধারিত, তাকে মেনে নিয়েই তার সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। যৌন বিজ্ঞান লজ্জার বিষয় নয়, উপেক্ষার বিষয় নয়, কিম্বা তাকে লুকিয়ে-ছাপিয়ে রাখাও চলে না, বাপমায়ের বা শিক্ষকের যদি এ জ্ঞানটুকু হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় শেখাবার ব্যবস্থার সঙ্গে এই মহাপ্রয়োজনীয় বিজ্ঞানেরও উপযুক্ত চর্চ্চার ব্যবস্থা করা তাঁদের একান্ত কর্ত্তব্য। এখন সে সম্বন্ধেই দু'চার কথা বল্‌ব।

প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে, এ বিজ্ঞান শেখানো প্রয়োজন হলেও শেখাবে কে? আধুনিক অধিকাংশ Sexologistর মত, আমাদেরও তাই মত, যে মা-ই এ বিষয়ের সব চেয়ে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী। পিতা কিম্বা অন্য কোনও হিতাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকও এ বিষয়ের উপদেষ্টা হতে পারেন। পূর্ব্বেই একটু আভাস দিয়েছি যে যৌনবিজ্ঞানের চর্চ্চার দুটা ফল আছে;—একটার মূলে অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞানপিপাসা, সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি উন্নত স্তরের নিঃস্বার্থ বৃত্তি বর্ত্তমান; আর একটার মূলে হচ্ছে আত্মসম্পূর্ত্তির বাসনা, ভোগের বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে তাকে কাজে খাটানোর ইচ্ছা। যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত বই বেরুচ্ছে, তার মাঝে এই দুটা ধারাই লক্ষ্য করা যায়। শিশুশিক্ষার পক্ষে প্রয়োজন সংযত, উদাসীন ও শুভেচ্ছু উপদেষ্টার। প্রাকৃতিক কারণেই মাকে এ বিষয়ে সব চেয়ে উপযোগী বলে মনে হয়; তারপর পিতা ও তত্তুল্য অন্যান্য অভিভাবক। মাকেও এক বিষয়ে সাবধান হতে হবে—ছেলে সম্বন্ধেও অঙ্গলিপ্সার মোহ তাঁর উৎকট না হয়। যে বৃত্তির প্রথম প্রকাশ একটা অকারণ শরীরজ উচ্ছ্বাস মাত্র, তার শিক্ষাদীক্ষার সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় শারীর সংযম প্রয়োজন। পাথরের দেবতা হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে; এমন কি মা আর ছেলের মাঝে যে অতি পবিত্র শারীরিক মোহ, তার ছোঁয়াচ পর্য্যন্ত শিক্ষাদানকালে যত কম থাকে তত ভাল।

যৌনবিজ্ঞান শিক্ষা কখন থেকে দেওয়া যেতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম করা অসম্ভব। সন্তানের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ও তার পারিপার্শ্বিকের ওপর এটা নির্ভর করে। তার পর অবস্থা বুঝে শিক্ষার ধারারও ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণতঃ কোনও বিজ্ঞানের শিক্ষা নয়, সতর্কতার শিক্ষা। কিন্তু দেশকালের হাওয়া এমনি দূষিত হয়েছে যে এই সতর্কতা কখন থেকে অবলম্বন করা উচিত, তা নিরূপণ করা দুরূহ। এ সম্বন্ধে এক ইংরেজ জননীর অভিজ্ঞতার কথা পড়েছিলাম—তাঁর তিনটী ছেলে, একটীর বয়স ১৪, একটীর ১০, আর একটীর বোধ হয় ৭। তিনি মনে কর্‌লেন, তাঁর বড় ছেলেটীকে তিনি এ সব বিষয়ে সতর্ক করে দেবেন। এই ভেবে তার সঙ্গে আলোচনা করতেই জানতে পার্‌লেন, তার সর্বনাশ হয়ে গেছে—

মায়ের কিছু বল্‌বার বহু পূর্ব্বেই সে কদাচারে পাকা হয়ে গেছে। মায়ের ভারী অনুতাপ এলো; তিনি ভাবলেন, আচ্ছা, বড়টা না হয় তাঁর অবিবেচনায় নষ্ট হল, ছোট দুটী তো রইল, তাদের তিনি এখনও এ পাপ হতে বাঁচাতে পার্‌বেন। এই ভেবে মেজো ছেলেটীর সঙ্গে কথা বল্‌তে গিয়ে দেখেন, সেও মরেছে! মা হতাশ হয়ে ছোটটীকে বুকে চেপে ধর্‌লেন, ভাবলেন, সব যাক্, তবুও এখনো এটী তো অনাঘ্রাত ফুলের মতই পবিত্র রয়েছে। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ!—অনুসন্ধান করে দেখেন, ওই দুধের ছেলেও নরকে ঝাঁপ দিয়েছে! মায়ের মনের তখন যে কি অবস্থা! ঠিক এমনিধারা অবস্থা বোধ হয় শতকরা নব্বইটী ছেলের বেলায়।

এসব ক্ষেত্রে অধিকাংশই Homo-sexuality বা সম মৈথুনের উদাহরণ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাপ-মা অনুসন্ধান করে দেখলে বোধ হয় জান্‌তে পার্‌বেন যে Hetero-sexuality বা বিষম-মৈথুনের উদাহরণও ওই কচি বয়সে নিতান্ত কম নয়। যত ছোট ছেলেই হোক না কেন, কদাচিৎ দুটী একটী ছাড়া এ বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ, এমন আমাদের চোখে বড় বেশী পড়েনি। যে সমস্ত কচি ছেলে দুটো কথা পর্য্যন্ত গুছিয়ে বল্‌তে পারে না, তাদেরও জিজ্ঞাসা কর্‌লে যখন জান্‌তে পারি, এ পাপে তাদের ছুঁয়ে গেছে, তখন বাস্তবিক ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। প্রসিদ্ধ যৌনতত্ত্ববিৎ Havelock Ellis বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা করে বলছেন, সভ্যতার লীলাকেন্দ্রগুলিতে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সবার মাঝে এই সম-মৈথুনের রেওয়াজ এমনি ভয়াবহ রূপে বেড়ে চলেছে যে এ বিষয় সম্বন্ধে কেউ যে অনভিজ্ঞ রয়েছে, এমন লোক বোধ হয় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তিনি বলেন, "এমন একটা ব্যাপার যে সম্ভব, এই কথাটা যে যে সে লোকে জানে, এতেই প্রমাণ হয়, এই পাপ কি ভীষণ সংক্রামক হয়ে পড়েছে। এমন কি এর দরুণ বিশেষ সঙ্কেত, বিশেষ পরিভাষার পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে।" এ কথাগুলো যে কতখানি সত্য, তা যাঁরা ছেলেদের সমাজে ইচ্ছা করে চোখ বুজে নাই, তাঁরাই জানেন। অথচ এ বিষয় নিয়ে বড় বিশেষ উচ্চবাচ্য কর্‌তে কাউকে শোনা যায় না। মনে আছে, কয়েক বছর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী কবি 'উগ্র' মহাশয় এ ব্যাপার নিয়ে চাবুক ধরেছিলেন; তাঁর "চকলেট"-কাহিনী হিন্দীসাহিত্যে অমর হয়ে থাক্‌বে। কিন্তু এর দরুণ তাঁর ঘরে-বাইরে কত গঞ্জনাই না সইতে হয়েছে। তবুও তাঁর কাহিনীগুলি অনেকের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে। যত দূর পর্য্যন্ত জানি, বাংলার কোনও সাহিত্যমহারথী বোধ হয় এ পর্য্যন্ত সত্যিকার দরদ নিয়ে এ বিষয়ে ছেলেমেয়েদের এবং তাদের বাপ-মায়ের চোখ-মুখ ফোটাবার কোনও চেষ্টাই করেননি।

তাই বলি, "আমার কচি ছেলে—দুধের ছেলে কিছুই জানে না" এই ভেবে বাপমায়েরা যেন কখনই নিশ্চিন্ত না থাকেন। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বাস্তবিক ও সমস্ত দুধের ছেলে কিছুই জানে না বটে; তারা খেলা আর অনুকরণচ্ছলে প্রথমতঃ এই সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত হয়। আর কোথা হতে যে তারা অনুকরণ করবার সুযোগ পায়, সে কথা বলতে আমার লজ্জার মাথা নুয়ে পড়ছে। বাপমায়ের চোখেও যে এ সমস্ত ব্যাপার একেবারেই না পড়ে, তা নয়; তাঁরা হয় তো না-দেখি না-দেখি করে সরে গিয়ে কিম্বা নিতান্তপক্ষে একটা ধমক দিয়ে তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ হল মনে করেন। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়, যেটা খেলা ছিল, চাপা পড়ে সেটা প্রাণঘাতী ব্যাপার হয়ে ওঠে। আর শিশু কোনক্রমে যদি একবার এর আস্বাদ পায়, তাহলে হাজার চোখরাঙ্গানিতেও সে এর লোভ ছাড়তে পারে না। ওটা যে সুখের একটা উপায়, এ স্মৃতি তো তার কিছুতেই লোপ পাবে না। তখন প্রয়োজন, তাকে সুখের ফলাফল বুঝতে দেওয়া,

সমস্ত ব্যাপারটার সংযত ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা; "ও কিছুই নয়" বা "ওটা পাপ" শুধু এই বলে তাকে ভাঁড়ালে তো চলবে না।

ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশতে হবে, তারা যাতে প্রাণ খুলে সব কথা বলতে পারে, এমনি উপায় অবলম্বন করতে হবে। প্রত্যেক কাজকর্ম্মে যেমন তদারক করবার দরুণ ইনস্পেক্টার থাকে, তেমনি এ বিষয়েও মা-বাপকে ইনস্পেক্টারী করতে হবে। ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য বা লেখাপড়া সম্বন্ধে তাঁরা যেমন জিজ্ঞাসু হয়ে মাঝে মাঝে তত্ত্ব নেন, তেমনি এ বিষয়েও মাঝে মাঝে খোঁজখবর নিতে হবে। শিশুদের একটা বয়স থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত তারা এ সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত থেকেও এর সম্বন্ধে কোনও লজ্জা অনুভব করে না, একটু সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করলেই সব কথা বলে ফেলে। এই সময়টাই ঠিক শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত কাল। এই সময়ে এ বিষয়ে প্রয়োজন মত ছেলেকে অভিজ্ঞ করে তোলা দরকার; যৌন নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিকতা, আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে তার মনে যেন একটা গভীর ছাপ পড়ে যায়। ব্যাপারটা আসলে কি, সে সম্বন্ধে সকল ছেলেকেই সাধারণভাবে একটু জানিয়ে রাখা দরকার। অনেক ছেলে আছে, প্রথমটায় তারা এ বিষয় শুনতে বিশেষ কোনও আগ্রহ প্রকাশ করে না। আগ্রহ না থাক্, ভাল কথা, তবু না-শুনি না-শুনি করেও ব্যাপারটার সম্বন্ধে একটা মোটামুটী জ্ঞান তাদেরও থাকা প্রয়োজন। যেমন ছেলের বোধশক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার ভিতর সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান ঢুকিয়ে দেবার দরুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তেমনি আমাদের উচিত, জন্মরহস্য বা সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধেও ছোটবেলা হতেই তাদের সচেতন করে তোলা।

জন্মরহস্য সম্বন্ধে ছেলেদের কোনও কৌতূহল নাই, এইটাই অধিকাংশের ধারণা। কিন্তু আমরা জানি, আসলে ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত। একবার বাপ-মায়েরা ছেলেদের জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, তারা কি বলে। যাদের এ সম্বন্ধে আধাকাঁচা জ্ঞান হয়েছে, তারাই চুপ করে থাকবে; কিন্তু যে ছেলের এখনো ছোঁয়াচ লাগেনি, সে সরল ভাবেই এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করবে—এ আমরা বহুবার দেখেছি। শিশুর কৌতূহল অদম্য। যা কিছু ঢাকা থাকবে, যা কিছু লুকানো থাকবে, তার সম্বন্ধেই তার অনুসন্ধিৎসা অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠবে। বাপ-মায়ের উচিত, কেন একটা ব্যাপারের ওপর পর্দা টেনে দেওয়া হচ্ছে, সে সম্বন্ধে ছেলেদের বেশ বুঝিয়ে-শুনিয়ে তার পর পর্দাটা টেনে দেওয়া। সঙ্গত ও স্বাভাবিক উপায়ে একবার তার কৌতূহল নিবৃত্তি করে দিলে বোধ হয় আর সে উপযুক্ত সময় না আসা পর্য্যন্ত ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

কেউ কেউ মনে করেন, এসব বিষয় জানতে দিলেই ছেলেদের পাপে মতি দেওয়া হবে। একথা শুধু ভুল নয়, দস্তুরমত আহাম্মুকি। আগেই তো বলেছি, তোমার সাধ্য নাই যে তুমি এসব বিষয়ে কাউকে অজ্ঞ রাখ। যে ব্যাপার হতে মানুষের জন্ম, যে ভাব তার রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে আছে, সে কি ফুটবার দরুণ তোমার দুটো কথার অপেক্ষা রাখবে মনে কর? উপযুক্ত সময়ে না জানালে এমন জায়গা থেকে ছেলে এ বিষয়ের জ্ঞান সংগ্রহ করবে যাতে তার সর্ব্বনাশের পথ সহজেই উন্মুক্ত হবে। তার পর জানাবার ধরণ আছে। তুমি ছেলেকে বাঁচাতে চাও, তুমি মা হয়ে বাপ হয়ে যেভাবে তাকে এ বিষয়ে বোঝাবে, যে আমিষলোলুপ মার্জ্জারের মত তোমার ছেলেকে গিলে খেতে চায়, তার গুরুগিরিটাও কি তেমনি হবে মনে কর? তুমি বিজ্ঞান শেখালে ছেলে বাঁচত; আর সে পাষণ্ড ছেলেকে শেখাবে প্রয়োগ, যাতে ছেলে মরবে!

তবে কোন্ বয়সে ছেলেকে কতটুকু জানতে দেওয়া উচিত, সে বিষয়ে একটু চিন্তা ও বিবেচনার

দরকার বটে। এটা প্রত্যেক বাপ মা নিজ নিজ ছেলের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা এই সব চলতি প্রসঙ্গে সম্ভবপর নয়। ছেলেদের যৌনজীবন সম্বন্ধে প্রত্যেক বাপমায়ের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কত-কটা নিজ নিজ অবস্থা থেকেও তাঁরা তা বুঝতে পারবেন। তা ছাড়া মনীষীরা এ সমস্ত বিষয়ে যে সকল তথ্য ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তারও সাহায্যে নেওয়া প্রয়োজন। অনেক দিক দেখলে শুনলে তারপর একটা কিছু সুষ্ঠুভাবে করা চলে।

জন্মরহস্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে সকল ছেলেকেই মোটামুটী একটা ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। তারপর যৌনব্যাপার সম্বন্ধে সতর্কতার কথা। এ সতর্কতা প্রথমতঃ একাঙ্গী হওয়া দরকার অর্থাৎ সমমৈথুন, হস্তমৈথুন ইত্যাদি সম্বন্ধে ছেলেদের সতর্ক করা আব-শ্যক। সাধারণ ১৩।১৩ বৎসর বয়স হওয়ার পূর্ব্বপর্য্যন্ত ছেলেরা-মেয়ে সম্বন্ধে মোটেই সচেতন হয় না। এই কথাটীর প্রতি লক্ষ্য রেখে সতর্কীকরণের শিক্ষাটা একাঙ্গী হওয়া প্রয়োজন বল্‌ছি। কিন্তু আবার এ কথাও বলে রাখছি, আজকাল সমাজের যে অবস্থা, তাতে এতটা নিশ্চিন্ত হওয়াও সম্ভবতঃ যুক্তিযুক্ত হবে না। যতদুর অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, আমাদের দেশের উপযুক্তবয়স হবার পূর্ব্বেই শতকরা ত্রিশটী ছেলে ইতরলিঙ্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও সচেতন বলে জান্‌তে পারা গিয়েছে। এখন বুঝুন, ব্যাপার কতদুর গড়িয়েছে।

যৌনসংস্কারকে দেহের একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলে ধরে নিয়ে তার নিরোধ অথবা সুস্থ প্রকাশ সম্বন্ধে উপায় চিন্তা করা বোধ হয় সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত। স্বাভা-বিক অবস্থায় একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত যৌনআকাঙ্ক্ষা সূচিত হয় না—এটা স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে Freud-কথিত গূঢ় যৌনসংস্কারের কথা বল্‌ছি না। কি ছেলে, কি মেয়ের দেহের কতকগুলি বিশেষ পরিবর্ত্তন দ্বারা যৌনসংস্কার জাগ-রণের সূচনা হয়ে থাকে, এটা আমরা জানি। মেয়ে-দের এই পরিবর্ত্তন এত সুস্পষ্ট যে কি আধুনিক, কি প্রাচীন সমস্ত জাতিই এটা বিশেষ লক্ষ্য করে যৌন নিয়ন্ত্রণের দরুণ নানা উপায় অনুষ্ঠানের চিন্তা করেছে। কিন্তু ঠিক ঠিক পাশাপাশি ছেলের দেহ-গত পরিবর্ত্তনকে কেন যে যৌনসংস্কার জাগরণের সূচনারূপে গ্রহণ করা হয় না, এটা একটা বিস্ময়ের কথা বটে। অথচ ১৩।১৪ বছর বয়স থেকে ছেলে-মেয়ে উভয়েই দেহগত পরিবর্ত্তন দেখা দিয়ে থাকে। এই সমস্ত পারবর্ত্তন আসবার প্রাক্‌কালে এ বিষয়ে ছেলেদের সচেতন করে দেওয়া, তার মনে যে সমস্ত নূতন ভাব ও আকাঙ্ক্ষা জাগতে পারে, সেগুলোর বিশ্লেষণ করে তাকে সতর্ক করে দেওয়া, কিম্বা ভাবী পরিবর্ত্তনের সূচনা ও ইঙ্গিত দেওয়া খুবই প্রয়োজন বলে মনে হয়।

মেয়ের ও ছেলের যৌবনোদ্গমের বয়োনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আমরা বেশীমাত্রাতেই হেরফের করে থাকি, যদিও নাকি প্রকৃতি প্রায় একই সময়েই উভয়ের দেহ-গত পরিবর্ত্তন সাধিত করে থাকেন। অন্ততঃ ২০।২২ বৎসর বয়স না হলে ছেলেদের যৌন জীবন সুরু হয় না, এমনি একটা সংস্কার আমাদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। কিন্তু এটা তো ঠিক নয়। যে বয়সটা সুস্থ প্রজনন-সামর্থ্য সূচনা করে, সেই বয়সটাই যৌন-জাগরণেরও বয়স, এ ধারণা ভুল। কেন, তা একটু খুলেই বল্‌ছি।

আজকাল Endocrin Glands বা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিমালা নিয়ে শরীরতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে খুবই জোর আলোচনা চলছে। শরীরের নানাস্থানে অবস্থিত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি কোনও নিগূঢ় কারণবশতঃ উত্তেজিত হয়ে যে hormone বা অন্তঃস্রাব রক্তধারায় মিশিয়ে দেয়, তাতেই মানুষের শরীরের আকার, সামর্থ্য, মনোভাব, বুদ্ধি ইত্যাদি সবই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এটা বিশেষজ্ঞেরা একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়

করিয়েছেন। শুধু তাই নয়, গ্রন্থির ক্রিয়ার আধিক্য ও ন্যূনতাবশতঃ দেহে ও মনে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন দেখা দেয়, তার চিকিৎসার দরুণ organotherapy বলে চিকিৎসার একটা নূতন বিভাগ পর্য্যন্ত স্থাপিত হয়েছে। মানবদেহের গ্রন্থিগুলির মধ্যে পুংত্ব ও স্ত্রীত্বের উদ্বোধক বিশেষ বিশেষ গ্রন্থি রয়েছে, সেগুলির ক্রিয়াদ্বারাই নপুংসকভাবাপন্ন কিশোর দেহে প্রকৃতি পুরুষোচিত ও স্ত্রীজনোচিত শারীরিক ও মানসিক বিকারগুলি সাধন করে থাকেন; অর্থাৎ এইগুলির সহায়েই কিশোর দেহে লিঙ্গভেদের সূচনা হয়ে থাকে। যদি দেহের পরিবর্ত্তনকে মানসিক পরিবর্ত্তনেরও সূচক রূপে গ্রহণ করি, তাহলে ছেলেদের যে বয়সে স্বরভঙ্গ, গুম্ফরেখার বিকাশ, মাংসপেশীর বর্তুলতার হানি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, ঠিক সেই সময়টা তাদের মানসিক পরিবর্ত্তনেরও সূচনা করছে, এই বুঝতে হবে; অর্থাৎ সুষুপ্ত Sex-glandএর ক্রিয়া এই সময় হতে সুরু হয়েছে জেনে হিতাকাঙ্ক্ষীর উচিত উপযুক্ত জ্ঞান ও উপদেশ দিয়ে ছেলেকে এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। এই বয়সটী ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই এক; অথচ মেয়েদের বেলায় আমাদের যতখানি সাত-তাড়া-তাড়ি, ছেলেদের বেলায় ততখানি ঔদাসীন্য! এর ফলে যে মানবজাতি চিরকাল ক্ষতিপীড়িত হয়ে আসছে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কি? (ক্রমশঃ)

—*—

আলোচনা

নিষাদদের গ্রাম গিলিবার সময় নবজাত ক্ষুধাতুর গরুড় এক ব্রাহ্মণ-দম্পতীকেও গিলিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহাদের অলৌকিক তপঃশক্তির পুঁজি বড় বেশী ছিল না, তবুও শুধু ব্রাহ্মণ বলিয়াই বোধ হয় গরুড়ের কণ্ঠ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাই তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণ-দম্পতীকে সে উগলাইয়া বাহির করিয়া দিয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সদ্যোজাত ক্ষুধাপীড়িত বিনতানন্দনের মতই জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত। তাহার কবল হইতে যে কেহ বাঁচিবে, তাহার বড় আশা দেখিতেছি না; একমাত্র আশা এই নিষাদজাতিসমূহের মাঝে আত্মবিস্মৃত হতপ্রভাব ব্রাহ্মণজাতীয় যদি কেহ থাকে। তুরস্কের নবজাগ্রৎ শৌর্য্যবীর্য্য দেখিয়া একদিন প্রাচ্যের মনে আশা জাগিয়াছিল, আর যা হউক না কেন, প্রাচীর দুই প্রান্তে যুগল রবির অভ্যুদয়ে হয়ত বা তার সুদিন ফিরিয়া আসিল। আফগানরাজ যখন পৃথিবীভ্রমণে বাহির হইলেন, তখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যুগপৎ বিস্ময়ে তাঁহার পানে তাকাইয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া তিনি নাজানি কি করেন। তুরস্ক, জাপান ও আফগানিস্থান, মোহাভিভূত প্রাচ্যের মাঝে এই তিনটী রাজ্যই প্রতীচ্যের অভিভবের বিরুদ্ধে মাথা ঝাঁড়া দিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু রাজনৈতিকতার দিক দিয়া না হউক, আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া তাহারা যেরূপ দ্রুত পাশ্চাত্যের পায়ে মাথা নোয়াইয়া দিল, তাহা জগতের এক অভিনব বিস্ময় বটে! জানি না, আত্মপ্রতিষ্ঠা ইহাকেই বলে কি না, কিম্বা সভ্যতার নূতন ধুয়া গণতন্ত্রের মর্য্যাদা এইভাবেই রক্ষিত হয় কি না। জাপানের ইউরোপীয় ধাঁচা গ্রহণ করার মাঝে ততটা উগ্রতা ও ব্যতিব্যস্ততা নাই, যতটা এই দুইটী ইস্‌লামরাজ্যের

মাঝে দেখা দিয়াছে। দুই-এক ধমকেই যদি একটা জাতির আচারব্যবহার আর রীতিনীতি এমনি করিয়া বদ্‌লাইয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহা হইলে তাহার মাঝে আত্মশক্তি কতটুকু যে সঞ্চিত আছে, তাহা বলা কঠিন। রাষ্ট্রহিত বা বিশ্বমানবতা বুঝিবার মত মেধা কোনও জাতিরই জনসাধারণের নাই। তাহারা হয় ধর্ম্ম মানে, নয় তো রাজব্যক্তিকে মানে। তুরস্ক ও আফগানিস্থানের জনসাধারণের উপাস্য হইল ধর্ম্ম নয়, রাজব্যক্তি। ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল এমনি করিয়া এক এক সময় প্রবল হইয়া একটা জাতিবীর্য্যকে সময় সময় খড়ের আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বালাইয়া তোলে বটে। কিন্তু নিরেট ও প্রশস্ত কোনও ভিত্তি না থাকিলে শুধু ব্যক্তিগত উত্তেজনার উপর কোনও একটা জাতিকে জীয়াইয়া রাখিতে পারা যায় কি? ইংলণ্ডে ক্রমোয়েল্, ফ্রান্সে নেপোলিয়ান্, মহারাষ্ট্রে শিবাজী, গ্রীসে আলেক্‌জাণ্ডার—এমনি অনেক ব্যক্তির অভ্যুদয়ের কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। একটা মহতী কল্পনা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তাঁহারা জগতের মাঝে অভাবনীয় কাণ্ডও ঘটাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু উদার ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টির অভাবে তাঁহাদের কীর্ত্তি তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঝরিয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মের ভিত্তি না থাকিলে ব্যক্তির অভ্যুদয়কে মানুষের মনে জীয়াইয়া রাখিবার কোনও উপায়ই নাই। এই জন্য দেখি, বাবা নানকের আশ্রিত নিরীহ শিখ চাষীরাও গুরুগোবিন্দের হাতে পড়িয়া এক রণনিপুণ যোদ্ধজাতিতে পরিণত হইয়াছিল। এই ভারতবর্ষেই মহারাষ্ট্র ও শিখ অভ্যুদয়ের পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলে বোঝা যায়, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টা ক্ষণিক্ উচ্ছ্বাস মাত্র, আর কোন্‌টাই বা দৃঢ়মূল বাস্তবতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

*

তুরস্ক আর আফগানিস্তান যাহাই করুক না কেন, তাহা লইয়া এতটা মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন ছিল না বটে, কিন্তু সময় সময় এমনও দুই চারিটা অদ্ভুত কথা কাণে আসে যে তখন জবাব দিবার ইচ্ছাকে দমন করা কঠিন হইয়া পড়ে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন হউক, ইহা কে না চায়? কিন্তু সে পরিবর্ত্তনের মাঝে কি কার্য্যকারণের সঙ্গতি থাকিবে না, সমবেত ইচ্ছার যোগ থাকিবে না? স্বাধীনতা সঙ্ঘের ইস্তাহার বাহির হওয়ার পর কিছুদিন বেশ নরম গরম আলোচনা চলিয়াছিল। তাহার মধ্যে কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, কি বলিব, এ পরাধীন পোড়া দেশ, হইত এ তুরস্ক বা আফ্‌গানিস্থানের মত স্বাধীন রাজ্য, কলমের এক খোঁচায় দেশের সমস্ত অনাচার কদাচার কোথায় মিলাইয়া যাইত! সম্ভবতঃ তুরস্ক বা আফগানিস্থানের মত এ দেশ স্বাধীন হইলে স্বাধীনতার পাণ্ডারা এমনি করিয়া কলমের এক খোঁচায় দেশের সমস্ত অনাচার কদাচার দূর করিয়া দিবেন। কিন্তু এই জবরদস্তির ও বেয়াকুবীর মাঝে স্বাধীনতার হিস্যা কতটুকু, আমরা তাহাই ভাবি। একদিন রুশিয়ার জারের বিরুদ্ধে সমগ্র সভ্য-জগৎ কলরব করিয়া উঠিয়াছিল জার স্বেচ্ছাচারী, তাহার কলমের এক খোঁচায় দেশের লোকের যা খুসী তাই হইতে পারে। জিজ্ঞাসা করি, আফগানরাজ বা তুর্কীরাজের ব্যবহারও স্বেচ্ছাচার নয় কি? আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়ান গ্রীস কিম্বা ফ্রান্সের গৌরব বলিয়া ইতিহাসে লেখে; কিন্তু ব্যক্তিগত দুরাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের দরুণ তাঁহারা একটা জাতির গলায় গামছা দিয়া যে পৃথিবী জুড়িয়া ঘুরপাক খাওয়াইয়াছিলেন, সেটা কি বাস্তবিকই জাতির আত্মমর্য্যাদার অনুকূল ছিল? এই কি গণতন্ত্রের আদর্শ, না প্রভুতন্ত্রের বদ্‌হজম? ভারতের ভাগ্যে যদি এই ধরণের স্বাধীনতা লেখা থাকে তো সেটা তাহার অপরিমেয় দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে।

জাপান যে ভাবে প্রতীচ্য সভ্যতাকে গিলিতে চেষ্টা করিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জঠরাগ্নিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তাহাকে হজম করিবার আয়োজনও করিতেছে তাহা অনুমোদনযোগ্য বটে। নব্য চীনের দুয়ারে আসিয়াও প্রতীচী হানা দিতেছে; সে ও যে কি ভাবে এই মারাত্মক অতিথিকে গ্রহণ করে, তাহা বলা যায় না; তবে সম্ভবতঃ তুরস্ক ও আফগানিস্থানের মত গদগদ ভাব তাহার হইবে না। ভারতবর্ষের কথা নাই বা বলিলাম; কেননা, তাহার আত্মকর্তৃত্ব নাই, অতিথিরাই তাহার প্রভু, যেরূপভাবে পরিচর্য্যার হুকুম হইতেছে সেইরূপভাবেই সে পরিচর্য্যা করিতে বাধ্য। প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের এই সংঘর্ষের কথা ভাবিলে একটা চিন্তা মনে না উঠিয়াই পারে না যে প্রতীচ্যের এই যৌবন-জলতরঙ্গ রুধিবে কে? প্রাচ্যে কতটুকু খৃষ্টধর্ম্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেটা তত ভয়ের কথা নয়, প্রতীচ্য সভ্যতা কতটুকু প্রাচ্যে কায়েম হইয়াছে, সেইটাই ভাবিবার বিষয়। গরুড়ের মতই এই সভ্যতার বিশাল পক্ষের আবরণে সমগ্র প্রাচ্যের বুকে করাল ছায়া পড়িয়াছে। তর্কের খাতিরে যদি বা স্বীকারই করি, প্রতীচ্যের শক্তি, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি সকলই প্রাচ্যের আদর্শস্থানীয়, তথাপি নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া, আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া একটা সভ্যতার মাঝে আর একটা সভ্যতা তল্লীন হইয়া যাউক, এ কিছুতেই কামনা করিতে পারি না। আমার হিত আমি যেন বুঝিয়া করি; কেহ আমাকে কুকুরতাড়া করিয়া আমার গভীর হিতসাধন করিবেন, এমন দুর্ভাগ্য যেন আমার কখনও না হয়। দেশে নূতন নূতন আন্দোলনের ঢেউ উঠিতেছে; সকলকেই সাদরে অভ্যর্থনা করি, প্রাণশক্তির বিচিত্র স্ফুরণে দেশের হৃৎপিণ্ড সবলে স্পন্দিত হউক। কিন্তু দোহাই, হৃদয়ের উত্তেজনায় যেন আমাদের জ্ঞানটুকু না লোপ করিয়া দেয়।

প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের সংঘর্ষের মাঝে বিভিন্ন ধর্ম্মের শক্তি-পরীক্ষাও চলিতেছে। ধর্ম্মের নামে গোঁড়ামীকে আমরা ঘৃণা করি। "আমার ধর্ম্ম বড় আর তোমার ধর্ম্ম ছোট" এমন বালকোচিত উক্তির কোনও মূল্য আছে বলিয়া আমরা জানি না। কিন্তু তথাপি যাহা সত্য, তাহা বলিতে সঙ্কোচ করিব না। জগতের চারিটী বড় ধর্ম্ম, খৃষ্টীয়, ইস্‌লাম, হিন্দু ও বৌদ্ধ। ইহার মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম একই আর্য্যধর্ম্মের শাখাভেদ মাত্র, সুতরাং দুইটীকে জড়াইয়া আমরা আর্য্যধর্ম্ম এই সাধারণ সংজ্ঞাই ব্যবহার করিব। ইস্‌লাম ধর্ম্ম আর আর্য্যধর্ম্ম প্রাচ্যে, আর খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রতীচ্যে। খৃষ্টধর্ম্মাশ্রিত প্রতীচ্যসভ্যতা ইস্‌লামসভ্যতা ও আর্য্যসভ্যতার উপর আছড়াইয়া পড়িয়াছে—ধর্ম্মের কথা বাদ দিয়াও বোধ হয় এই সংঘর্ষকে এই ভাবে পরিচিত করা চলে। এই সংঘর্ষের ফল কি দেখিতেছি? বহুশতাব্দীব্যাপী পোষিত বিদ্বেষের জ্বালা ভুলিয়াও ইস্‌লামসভ্যতা আজ প্রতীচ্যসভ্যতার পদানত। কিন্তু জাপানে, চীনে, ভারতবর্ষে আর্য্যসভ্যতা এই সংঘর্ষে পড়িয়া যেন এখনও শক্তিহারা হয় নাই—আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা সজাগ প্রচেষ্টা তাহাদের মাঝে এখনও বর্ত্তমান। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার মূলে আমরা বেদান্তশিক্ষারই প্রভাব অনুভব করিতেছি। চীন ও জাপানের চিন্তাধারার সহিত আমরা ততটা পরিচিত নই, কিন্তু ভারতবর্ষকে যতটা জানি ও বুঝি, তাহাতে দেখি, বিরোধীসত্তাকে আত্মসাৎ করিয়া জীর্ণ করিবার ও তাহাকে নিজের ভাবে ভাবিত করিবার ক্ষমতা ভারতবর্ষের এখনও লোপ পায় নাই। চীন, জাপান, তুরস্ক, আফগানিস্থানের কোনও বিশিষ্ট বাণী আছে কিনা জানি না এবং সে বাণী প্রচার করিবার কোনও চেষ্টাও সে করিয়াছে কিনা, তাহাও বলিতে পারি না; কিন্তু এই অন্নহীন, বস্ত্রহীন পরপদানত ভারতবর্ষ তাহার চরম দুর্দ্দিনের

মাঝেও প্রতীচ্যের রাজসভায় বিশ্বমৈত্রীর বাণী বহন করিয়া নিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আজও ভারতের বিবেকানন্দ, রামতীর্থ, বাবা ভারতী, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রতীচীর যন্ত্রসভ্যতার মর্ম্মস্থলে দাঁড়াইয়া উদাত্তকণ্ঠে সেই যুগযুগান্তরপ্রসূত তপোবনের বাণী উচ্চারণ করিতেছেন। রাজনীতিক ও আর্থনীতিক চিন্তা আমাদের আজ এত প্রবল হইয়াছে যে ভারতের বিশিষ্টতার এই দিকটার প্রতি নজর দিবার আমাদের অবসর পর্য্যন্ত নাই। আমরা চাই প্রতীচ্যের শক্তি আর বিত্ত; আর এই দিক দিয়া নিজকে প্রতীচ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া দুঃখে, ক্ষোভে উন্মত্তের মত বকাবকি লাফালাফি করি। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ এখন পর্য্যন্ত নিঃশব্দ আত্মদান দ্বারা সমগ্র জগৎকে এক মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার কৃতী সন্তানদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন. হতমান ভারতের এই পরমগৌরবের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইবার অবসর আমাদের হয় না। শক্তি ও বিত্ত না চাহিব কেন? কিন্তু বুঝিতে হইবে, আমার প্রতিষ্ঠা ওখানেই নয়। শক্তিহীন ও বিত্তহীন হইয়াও আজও আমার এমন কিছু রহিয়াছে, যাহা নিয়া জগতের সভায় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে আমি কুণ্ঠিত হইতেছি না। বুঝিতে হইবে আমার সত্তায় শক্তি ও বিত্ত অপেক্ষা ইহাই অধিকতর তেজস্বী উপাদান। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘর্ষে ভারত যদি আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা সম্ভব হইবে এই বেদান্তের প্রসাদে—ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। আর্যসভ্যতাবলম্বী দেশগুলির মাঝে বেদান্তের ভাব যতখানি প্রকট হইয়া উঠিবে, এই জগদ্ব্যাপী বিপ্লবের মাঝে ততখানিই তাঁহাদের বাঁচোয়া। নিষাদের গ্রামে শমিতবীর্য্য ব্রাহ্মণের মতই জ্বালাময়ী প্রভাব এই বেদান্তের—ইহাকে গিলিবার সাধ্য গরুড়ের নাই।

ভারতবর্ষ জগতের গুরু, এমনি একটা দম্ভের কথা আমরা মাঝে মাঝে উচ্চারণ করি এবং ইহার দরুণ ঘরে বাইরে টিটকারীও শুনিতে হয়। যদি আমাদের বিত্তসামর্থ্যের দিকে চাহিয়া এ কথায় আমাদিগকে উপহাস করা হয় তো সে উপহাসের কোনও মূল্যই নাই; কেননা পাশ্চাত্য জাতি যে উপায়ে সাম্রাজ্যবাদের বিষ বিসর্পিত করিয়া বিত্তসঞ্চয়দ্বারা জগতে গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, সে পন্থাকে আমরা আন্তরিক ঘৃণা করি। "দ্রাক্ষা অলভ্য অতএব অম্ল" শৃগালের এই বিজ্ঞবচনের অনুসরণ করিয়া যে আমরা বিত্তসামর্থ্যকে অবজ্ঞা করিতেছি, তাহা নয়। পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও যে রাজতপস্বী অশোক নিজের জন্য আধখানা আমলকমাত্র সঞ্চয় রাখিয়াছিলেন, তাঁহার আদর্শ আমাদিগকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করিয়া আসিয়াছে ও আসিবে। সুতরাং প্রাণ বাঁচাইবার উপযোগী বিত্তসঞ্চয়কে ধর্ম্ম বলিয়া অনুমোদন করিলেও অপরকে প্রাণে মারিয়া আত্মজঠর পূরণের নীতি এ দেশ কখনও গ্রহণ করিবে না। কাজেই বাহিরে যদি আমরা পাশ্চাত্য জাতির সমকক্ষ না-ও হয়, তথাপি আমাদের গুরুত্বের দাবী কমিবে না। বিচার করিতে হইবে, আমাদের আধ্যাত্মিক সামর্থ্য দেখিয়া। এই সামর্থ্যের প্রথম পরিচয় হইতেছে নিষ্ঠা; দ্বিতীয় পরিচয় ঔদার্য্য। "আমার যাহা তাহা আমি ছাড়িব না" এই মনোভাব নিষ্ঠার পরিচায়ক; "তোমাকেও তোমার যাহা, তাহা ছাড়িতে বলিতেছি না" ইহা ঔদার্য্যের পরিচায়ক। নিজের কোটে রাজার মত বসিয়া এই দুইটি মনোভাবকে যদি অকুণ্ঠ হইয়া প্রচার করিতে পারি, তাহা হইলে বুঝিব আমি অধ্যাত্মশক্তিতে দুর্ব্বল নহি। এতদিন এই ভাবটিই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল; নিজের আসনে স্থির থাকিয়া সে জগৎকে তাহার অঙ্গনে আমন্ত্রন

করিয়া আনিয়াছিল। গুরুগিরি যদি বলতে হয় তো ইহাকেই বলি। যদি কখনো দেখি, মোহ-মুগ্ধ হইয়া আলেয়ার পেছনে ছুটিয়া আমরা এই নিষ্ঠা ও ঔদার্য্যকে হারাইতে বসিয়াছি, কিম্বা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইতে না পারিয়া একঝোঁকা হইয়া পড়িয়াছি, তখনই বুঝিব, আমাদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। দেশের শিরোভাগে সর্ব্ব-নাশের এই টনক নড়িয়াছে কিনা, সুধীব্যক্তিরা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদ সংহিতা

বাসনা থেকে সংযোগ হয়; তাতে যদি উভয় পক্ষেরই তৃপ্তি হয়ে যায়, তবে আর সাধন হবে কোথা থেকে? সাধনা হচ্ছে ঐ পরিতৃপ্তিকুকু আনা। খেয়েও আনন্দ হয়, আবার শুধু দেখেও হয়। একটিতে আকাঙ্ক্ষার জ্বালা আছে, একেই বলে প্রবৃত্তির পথ; অপরটিতে নির্ম্মল তৃপ্তি, তাই নিবৃত্তির পথ।



উদ্দেশ্য ও উপায়ের মাঝে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা চাই। আমি যা হতে চাই, আমার যা লক্ষ্য, তার পথ আমাকেই প্রস্তুত করে নিতে হবে। গতির দিকে লক্ষ্য করতে হবে—সবই করি বটে কিন্তু ঝোঁকে রয়েছে আমার কোনদিকে বেশী। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদের প্রত্যেকের জীবন। ওই বিশেষটুকু যিনি ধরতে পেরেছেন, তিনিই জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছেন।



পাওয়াটা ছুটোছুটির সময় নয়, যখন স্থির হয়ে এক জায়গায় বসি তখনই। অস্থির চিত্তে কখনও আত্ম-স্বরূপ ধরা পড়ে? উদ্বেগশূন্য করতে হবে, কিন্তু আবেগ থাকা চাই। ব্যস্ততার সময় মানুষ আসল কথাটি ভুলে যায়, যা না হলে চলে না, তাকেই বাদ দেয়।



অপরকে ফাঁকি দেওয়া সহজ, কিন্তু আমাকে তো আমি কোন মতেই ফাঁকি দিতে পারি না। অন্যায় করেও, যুক্তি-তর্কের বলে অপরকে পরাস্ত করে নিজে সাফা হতে পারি; কেননা সে তো আর আমার মনের গুপ্ত কথা জানে না! কিন্তু আমার "আমি" যে সব সময় সজাগ প্রহরী, তার কাছে ফাঁকি দেব কেমন করে? যিনি আমার সব জানেন, তার কাছে তো আর ফাঁকী খাটে না। শেষ পর্য্যন্ত আমার আমিটুকুই থাকবে। তার কাছে নির্দ্দোষী হতে হবে আমাদের আগে, তারপর বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো।



কারও জামা নয় বলেই, দোকানের জামার কোন বৈশিষ্ট্য নেই। যখনি আমি গায় দিলাম, তখনই তাতে আমার মার্কা পড়ে গেল। প্রকৃতির পরিণাম অনন্ত, তার সঙ্গে আমি যুক্ত হলেই মরণ।

পূর্ণতা চঞ্চল অবস্থা নয়। তাই উচ্ছ্বাসে ফেঁপে উঠে কূল ভাসিয়ে প্লাবন ঘটানো পূর্ণতার লক্ষণ নয়। শক্তির অপব্যয় বা অযথা প্রয়োগ শক্তিমত্তার নিদর্শন নয়। পূর্ণ যিনি, তিনি স্থির-ধীর, অচল-অটল।



নিজের ওপর যাঁর প্রভুত্ব আছে, ভাবের বিকারে তিনি আত্মহারা হয়ে যান না। লক্ষ্যটাকে উপায়ে নিয়োগ করতে গিয়েই যত উদ্বেগ আর অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়। ভাব লক্ষ্য—ভাবুকতা নয়।



স্বাতন্ত্র্যের উগ্রতাকে ছেড়ে দিয়ে উদারতা অর্জ্জন করতে হবে। স্বাতন্ত্র্যের জোর কেবল নিজকেই জানে, অন্যকে মান্‌তে চায় না। কেবল নিজকে বুঝলেই বোঝার শেষ হল না। অন্যকে বুঝ্‌তে গেলে, অন্যের ভিতর প্রবেশ কর্‌তে হলে, নিজকে অন্যের নিয়মের অনুগত করতেই হবে। তাই পরাধীন না হয়ে স্বাতন্ত্র্যের জয় হতে পারে না। দাসত্ব সাময়িক, প্রভুত্বই যে আমাদের লক্ষ্য।



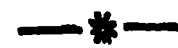
চেয়ে যা পাই, তা অভাব মিটায় না, আরও বাড়িয়ে তোলে। আভাসে বুঝি, আকাঙ্ক্ষার ধনে অপূর্ণতা রয়েছে, তাই পেয়েও যেন পাচ্ছি না। মন্দ না, এতে আকুলতা বাড়ে, কিন্তু তৃপ্তির দিকও একটা আছে। যেটা আমার চাওয়া নয়, তাঁর দেওয়া।



প্রবৃত্তি-নিরোধ পশু-পক্ষীর আয়ত্তাধীন নয়। তারা প্রকৃতির স্রোতে ভেসে চলছে, কবে তাদের অহংবুদ্ধি সুস্পষ্ট হয়ে নিরোধ করবার ক্ষমতা জাগ্‌বে, তবে তাদের মুক্তির সুযোগ আসবে। মানুষের মুক্তি যে স্বেচ্ছাধীন। আদিম প্রবৃত্তি রয়েছে বটে, আবার একে খর্ব্ব করে, উপেক্ষা করে চলাও মানুষের পক্ষে সহজ, যা জীবের পক্ষে অসাধ্য। মানুষে পশুতে ত এ জায়গায়ই পার্থক্য।



আমার খাঁটী ইচ্ছা, আমারও অগোচর। আমি তাকে জানি না, অথচ সে আমার সবটা জানে—সবটা দেখে। সবই গোপনে গোপনে চলছে, জানি আমরা কয়টা? কাজেই শোকে অতি বিহ্বল হওয়ারও প্রয়োজন নাই, আবার অত্যুৎফুল্ল হওয়াতেও লাভ নাই। আমার খাঁটী ইচ্ছা যেটী, সেটি মহদিচ্ছার সঙ্গে একযোগ। তাই তাতে অনিষ্টের বীজ নাই।



দানপ্রাপ্তি স্বীকার



এক টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—নৃপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মথুরানাথ মিত্র, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র দত্ত, রায় সাহেব কেদার নাথ ব্যানার্জি, আর সি দাস, আর কে দত্ত, কে এস্ রাও, পি সেনগুপ্ত, প্রফুল্লচন্দ্র আয়কাত, মিহিরলাল সিনা, নরেন্দ্রনাথ দাস, সুরেন্দ্রনাথ চাটার্জি, উপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, সত্যেন্দ্রলাল বসু, জনৈক ছাত্র (নোলকপুর)

ছাপরা (বিহার)

দুই টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—সুরেশচন্দ্র মুখার্জ্জি হেমচন্দ্র মিত্র (উকিল) রায় বাহাদুর বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ডাক্তার উপেন্দ্রনারায়ণ রায় রায় সাহেব রা জন্দ্র প্রসাদ হেডমাষ্টার উকিল বাকিবিহারী লাল।

এক টাকা করিয়া—

শ্রীযুক্তাঃ—ডিপুটী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ডিপুটি

পঙ্কজকুমার চাটার্জ্জি বিনয়কৃষ্ণ ব্যানার্জ্জি ইঞ্জিনিয়ার ডাঃ যতীন্দ্রনাথ বসু ডাক্তার মনোমোহন বসু ডাক্তার সত্যনারায়ণ সাহায় ডাক্তার ডি, সি, প্রসাদ উকিল ধরমনাথ সহায় উকীল গিরিধর গোপাল উকীল মণীন্দ্রনাথ চাটার্জি উকীল যতীন্দ্রনাথ গুপ্ত সবজজ কিশন সহায় মুন্সেফ রামচন্দ্র মিছির রায় ব্রজনন্দন প্রসাদ সিনা (এস্, ডি, ও) গুরুপ্রসাদ দাস ডি, এস, পি বৈদ্যরাজ বাবুলাল সিং পণ্ডিত রামচন্দ্র উপাধ্যায় এস্, আর সিনা বিশ্বনাথ সহায় অতুলকৃষ্ণ ব্যনার্জি সৌরীন্দ্রনাথ মুখার্জি উমাশঙ্কর মিত্র নারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী হাজারীলাল সাহু।

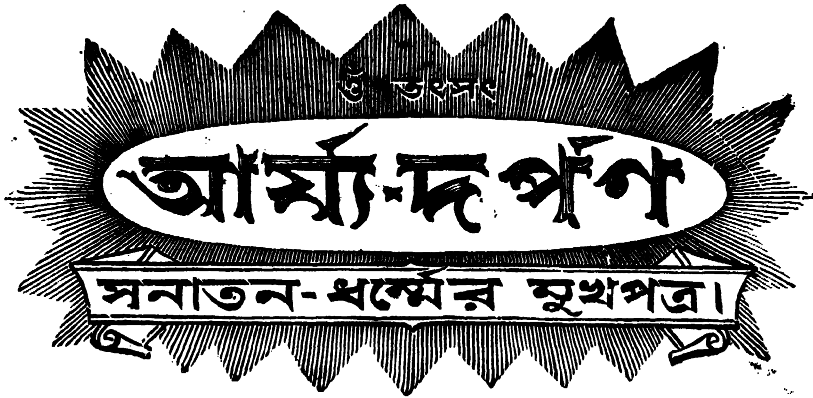
খুচরা সংগৃহীত ৬৲।

সমালোচনা

আসাম সাহিত্যসভা পত্রিকা—শ্রীযুত চন্দ্রধৰ বৰুৱা সম্পাদিত আৰু যোৰহাট আসাম সাহিত্য সভাৰপৰা প্রকাশিত। এই পত্রিকাখনি তুইমাহতে এবাৰকৈ ওলায়। ই আসাম সাহিত্যসভাৰ মুখপত্র। বঙ্গদেশৰ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা যেনেকুৱা বিশেষজ্ঞসকলৰ ৰচনাৰ দ্বাৰাই অলঙ্কৃত, এই পত্রিকাখনিও তেনেকুৱা। ঐতিহাসিক, প্রাত্নতত্ত্বিক, দার্শনিক আদি নানা বিষয়ৰ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধৰ সমাবেশই ইয়াৰ বিশেষত্ব। পত্রিকাখনি উদীয়মান আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ গৌৰৱস্বরূপ।

হরিসাধক কণ্ঠহার—নিত্যধামগত শ্রীযুক্তেশ্বর প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী সিদ্ধান্ত অনুমোদিত ও দেবকীনন্দন ধর্ম্মপ্রকাশ কার্য্যালয় হইতে শ্রীপঞ্চানন ঘোষ দ্বারা সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। মূল্য ॥৹, বাঁধাই ॥৵৹, সিল্ক কাপড়ের বাঁধাই ॥৵৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীদেবকীনন্দন ধর্ম্মপ্রকাশ কার্য্যালয়, ৬৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে সাধক ভক্তগণের স্মরণমননোপযোগী মহাজনগণের বাণীসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। সঙ্কলিত বিষয়গুলির নাম হইতেই প্যাঠকগণ গ্রন্থের উপযোগিতা বুঝিতে পারিবেন—শ্রীমৎ নরোত্তমরচিত শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম, হাটপত্তন, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, প্রার্থনা, পাষণ্ডদলন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক, শ্রীমৎকৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রথিত গুরুতত্ত্ব, উজ্জলরসতত্ত্ব, শ্রীরাধাতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা, উত্থান আরতি, মঙ্গলআরতি, ভোগ আরতি ইত্যাদি। গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই যে উদ্ধৃত মহাজনবাণীসমূহের দুরূহ অংশগুলির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। সাধকভক্তদের পক্ষে বাস্তবিকই বইখানি কণ্ঠহারই হইয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি হইতে ভাগবতধর্ম্মাবলম্বীর সিদ্ধান্ত ও জীবনযাপনপ্রণালীর একটী পূর্ণাবয়ব চিত্র পাইবেন। অল্পের মাঝে এতগুলি গুরুতর বিষয়ের সুশৃঙ্খল সন্নিবেশ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সঙ্কলয়িতার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। ছাপা ও কাগজও ভাল।

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বামৃতসিন্ধু।—শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও মধ্যবাংলা 'সারস্বত-আশ্রম, পোঃ জয়দেবপুর, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ৸৹ মাত্র। অতি অল্পদিনের মধ্যে এই পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে, সুতরাং ইহা ইতিমধ্যেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই গ্রন্থে বেদ, সংহিতা, উপনিষদ, তন্ত্র প্রভৃতি নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ আহরণ করিয়া ও সুনিপুণ যুক্তিসমাবেশ দ্বারা গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে যাবতীয় কথাই বিবৃত হইয়াছে। শুধু হিন্দু নয়, জগতের যে কোনও সাধকই ঐকান্তিক অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে গুরুর প্রয়োজন অনুভব করিয়া থাকেন, সুতরাং গুরু সার্ব্বজনীন। গ্রন্থকারের রচনানৈপুণ্যে এই কথাটীই সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের নবজাগরণের নানা বিপ্লবগন্ধী ধূয়ার মাঝে "গুরুদ্রোহিতাও" একটী; বিপ্লবীরা যুক্তি চান; যদি হঠকারিতার বশবর্ত্তী না হইয়া সত্যানুসন্ধিৎসুর চিন্তা লইয়া গ্রন্থখানি তাঁহারা পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা এ সম্বন্ধে গ্রন্থখানিতে অনুকূল ও প্রামাণিক যুক্তির অভাব দেখিতে পাইবেন না।



২১শ বর্ষ ২য় খণ্ড

পৌষ—১৩৩৫

সমষ্টি সং ২২৫ ৩য় সংখ্যা

মঘবাঁ ঋজীষী

—*—

ঋগ্বেদ সংহিতা—৩।৫। ২০-২২

—*—

[বামদেব ঋষিঃ—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ—অগ্নির্দেবতা]

ইন্দ্রংকামা বসূয়ন্তো অগ্মন্ত্
স্বর্মীড়্হেন সবনে চকানাঃ।
শ্রবস্যবঃ শশমানাস উক্থৈ-
রোকো ন রণ্বা সুদৃশীব পুষ্টিঃ॥

অশ্ব-গজ-রথ চায়, তাই তারা ইন্দ্রপানে ছুটে—
কত না কামনা নিয়ে রণে হেন যজ্ঞে পড়ে টুটে;
চাহে অন্ন, গায় তাই স্তুতি কত বিচিত্র-রচনা—
পুণ্যছবি দেবালয় যেন তারা—লক্ষ্মী সুশোভনা!

তমিদ্ধ ইন্দ্রং সুহবং হুবেম
যস্তা চকার নর্য্যা পুরূণি।
যো মাবতে জরিত্রে গধ্যং চিন্
মুক্ষু বাজং ভরতি স্পার্হরাধাঃ॥

প্রাণভরে ডাকি তাঁরে—"কোথা তুমি ইন্দ্র—মঘবান্!"
মানুষের তরে যিনি করিলেন কত না কল্যাণ!
আমি দীন ভক্ত তাঁর; আমাকেও দিয়াছেন কত
উপচিত অন্নকূট; তাঁরি দান চাহি যে সতত।

এভির্নৃভিরিন্দ্র ত্বায়ুভিষ্ট্বা
মঘবদ্ভির্মঘবন্ বিশ্ব আজৌ।
দ্যাবো ন দ্যুম্নৈরভি সন্তো অর্য্যঃ
ক্ষপো মদেম শরদশ্চ পূর্ব্বীঃ॥

তোমারেই চায় তারা—এই মোর যত পরিজন;
বিশ্বরণে নিঃস্ব নহে তাহারাও—ওগো মঘবন্!
কনকে-রতনে কত উজলিয়া শত্রু বিনাশিব;
কত রাত্রি, কত বর্ষ গাহি জয় হরষে যাপিব।

তিগ্মা যদন্তরশনিঃ পতাতি
কস্মিঞ্চিচ্ছূর মুহুকে জনানাং।
ঘোরা যদর্য্য সমৃতির্ভবাতি
অধ স্মা নস্তন্বো বোধি গোপাঃ॥

বহুজনসাথে যদি কখনো বা বেধে যায় রণ,
তীক্ষ্ণতর অস্ত্র যত চারিদিকে হয় বরিষণ,
সংকট সংগ্রাম এক ঘোর হতে হয় ঘোরতর'—
ওগো স্বামী, ওগো শূর—আমাদের রক্ষা যেন করো।

এবেদিন্দ্রায় বৃষভায় বৃষ্ণে
ব্রহ্মাকর্ম্ম ভৃগবো ন রথম্।
নূ চিদ্ যথা নঃ সখ্যা বিযোষদ্
অসন্ন উগ্রোঽবিতা তনূপাঃ॥

জানি ইন্দ্র কল্পতরু, তাঁর কাছে যাহা চাই পাই;
তক্ষা যথা কুঁদে রথ, আমরাও রচি স্তুতি তাই।
আমাদের প্রিয়কর্ম্মে কুণ্ঠা তাঁর হেরি নাই কভু;
উগ্র তিনি; তবু জানি আমাদের সবাকার প্রভু!

ভুবোঽবিতা বামদেবস্য ধীনাং
ভুবঃ সখাবৃকো বাজসাতৌ।
ত্বামনু প্রমতিমা জগন্মা
উরুশংসো জরিত্রে বিশ্বধ স্যাঃ॥

করিয়াছে বামদেব যাহা কিছু তার পানে চাও;
দরদী সখার মত রণে তার সাহস বাড়াও;
প্রজ্ঞা তব অতুলন; তাই তব মিলিয়াছি পায়—
কীর্ত্তি তব মুখে মুখে বিশ্ব জুড়ি উছলিয়া যায়।

নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান
ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং
ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ॥

এই তো গেয়েছি স্তব—নতিগাথা ঢালিয়াছি পায়!
ঢাল অন্ন, নদী যথা দুই কূল ছাপাইয়া যায়!
হে হরিবিহারী, তব রচিয়াছি স্তুতি নবতর';
দাও ধন; চিরদাস হই তব, এই যেন করো!

প্রাণের পরশ

দুঃখেও মানুষের যেমন কলরবের অন্ত নাই, তেমনি সুখেও তার কলরবের অন্ত নাই। কোলাহলটা জীবনে অসম্ভব, এ কথা বলিতে চাই না; কিন্তু এইটাই যে একান্ত, এ কথা আর মানিতে পারিতেছি না।

এইখানেই তো দ্বিধা। তুমি বলিবে, আমি কোলাহল ভালবাসি, তোমার ওই অবিচল প্রসুপ্তির মাঝে তলাইয়া মরিতে আমি চাই না। কিন্তু আমার এই নিষুপ্তি যে কোলাহলকে বুকে করিয়াই স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, সে কথা তুমি জান?

এগারটা দরজাই তোমার খোলা; মুক্ত দ্বার-পথে রূপ-রস, গন্ধ-স্পর্শের হিল্লোল আসিয়া সুখের মৃদু শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছে; তুমি তাহাতেই বিভোর। এই সুখের সঙ্গে কোলাহলও আসিয়া পুঞ্জীভূত হইতেছে। তুমি বল, উপায় কি. গোলাপ তুলিতে গেলে কাঁটার আঘাত সহিতেই হইবে।

আমি বলি, তা কেন? এমন সুখ কি নাই, যাহার মাঝে কিছুমাত্র তরঙ্গের কম্পন নাই? এমন ভাষা নাই, যাহার মৌনেই তার ভাবাভিব্যক্তি পূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠে? এগারটা দরজাকে ছাপাইয়াও কি দ্বাদশ দ্বার বলিয়া কিছু নাই?

দ্বিধাগ্রস্ত মন বলিবে, হয় তো আছে! কিন্তু তাহার সন্ধানে যাইতে হইলে যে এই রূপ-রসের মেলা ফেলিয়া যাইতে হয়। যাহা নিশ্চিত পাইয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়া অনিশ্চিতের মাঝে ডুবিয়া মরিতে যাইব কেন?

চতুর দার্শনিক এই কথায় সায় দিয়া আবার বলেন, তাই তো, তুমি যে এগারোর উপরেও বারোর কথা বলিতেছ, সেখানে আমার সব ঘুলাইয়া যাইবে না কি? আমার আমিত্বের কোন্ নিদর্শন থাকিবে? কি ধরিয়া আবার এই রূপ-রসের হাটে ফিরিয়া আসিব?

আমাকে চুপ করিয়াই থাকিতে হয়। মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি না—সেই পরম শান্ত, শিব, অভয়ের কথা। আমি নেতির কথা বলিতেছি না; আমি নাস্তিক নই। আমি পরিপূর্ণ আস্তিক; আমার অস্তি তোমার নাস্তির বিভীষিকাকেও যে পরম সন্তর্পণে বুকে জড়াইয়া রহিয়াছে!

বলিতেছিলাম, প্রাণের কথা। জান, প্রাণ কি? দেহ বলে, ও আমারই স্ফূর্তি। ইন্দ্রিয় বলে. ও আমারই স্পন্দন। মন বলে, ও আমারই লাবণ্য। অহঙ্কার বলে, ও আমারই দীপ্তি। বুদ্ধি বলে, ও আমারই শুদ্ধপ্রকাশ। সবাই তাহাকে জানে, সবাই তাহাকে মানে; কিন্তু কেউ বলিতে পারে না, সে কি! আমি সেই প্রাণের কথা বলিতে আসিয়াই তো মূক হইয়া যাইতেছি।

তুমি বন্ধু, তুমি দরদী। কি দিয়া তুমি আমাকে বুঝিয়াছ? ইন্দ্রিয়ের পরখকে ছাপাইয়া কার অকুণ্ঠ প্রত্যয় তোমার মাঝে ওই রসের আবেশ আনিয়া দিল? ওই তো প্রাণের কীর্তি। বন্ধু. তুমি আমাকে দেহ দিয়া পাও নাই, ইন্দ্রিয় দিয়া আমাকে খণ্ডিত করিয়া তোমার তৃপ্তি হয় নাই, মনবুদ্ধি দিয়া তুমি আমাকে বুঝিতে পার নাই। তুমি পরিপূর্ণরূপে আমাকে পাইয়াছ—তোমার প্রাণ দিয়া!

এই জগৎটাকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, তোমার কোনও ইন্দ্রিয়পথে প্রাণ ধরা পড়ে কিনা। বিবেকী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া চতুর্বিংশতিতত্ত্বের মাঝে বিশ্বের তথ্যকে থরে থরে সাজাইলেন—কিন্তু তাহার মাঝে প্রাণের সন্ধান পাইলেন না। তাই তাঁর প্রকৃতি প্রাণের অভাবে জড়

হইয়া রহিল। আত্মপ্রকৃতির যে আনন্দ, প্রাণের অভাবে তাহা উল্লসিত হইয়া উঠিল না ; জগৎ জুড়িয়া আমরা দেখিলাম—একটা নিষ্ঠুর চক্রের আবর্ত্তন মাত্র। স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া, সব সে চক্রতলে নিষ্পেষিত হইয়া গেল, পুরুষের তীব্র মহিমা অনন্তকোটী সূর্য্যের অসহনীয় দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিল, জ্যোছনার স্নিগ্ধ আবরণে তাহাকে কেহ কমনীয় করিতে আসিল না!—বলিহারি বৈরাগীর আত্মপ্রত্যয়!

বম্ ভোলানাথ—এই তো চাই! মাকড়সার জালের মত ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে এই জগতের যত কিছু মায়া-মমতা, সৌকুমার্য্যের বন্ধন! আমি শিব, আমি রিক্ত, আমি সন্ন্যাসী, আমি প্রলয়ঙ্কর; কেবল-জ্ঞানের তীব্রোজ্জ্বল সম্পুট আমি—কৈবল্যের নিষ্ঠুর একাকিত্বে পরম শুভ্র—ইন্দ্রধনুর মায়া-লেশহীন—আকাশের মত নির্লেপ! অনন্ত জগৎ যেন একটা বালুকণা, আর তাহারই বুকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে আমার পরম জ্যোতিঃ; আমার প্রতিবিম্ব বুকে লইয়াই বালুকণা ঝিকমিক্ করিতেছে—কিন্তু তাহার সহিত কি তুলনা হয় আমার এই বিপুল মহিমার!—ওম্—ওম্—জ্ঞানমনন্তং—জ্ঞেয়ং তুচ্ছং; জ্ঞান অনন্ত, তাই তুচ্ছ; যেমন ওই সূর্য্য আর বালুকণা!

সত্য বটে এই কথা; কিন্তু উন্মাদক। ক্ষুদ্র আধারে যখন মহাসিন্ধুর বান গর্জ্জিয়া উঠে, তখন দুই পার কাঁপিয়া উঠিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিরাটের প্রলয়বিষাণে ক্ষুদ্রের আকুলি-বিকুলি কোথায় মিলাইয়া যায় যেন। কিন্তু যাহা ছিল তাহা একেবারে যায় না তো। ওই বাঞ্ছিত বেদনাই আবার যে বৈরাগীর হৃদয়ে ফুটিয়া ওঠে আনন্দের মাদকতায়!

হে প্রলয়ঙ্কর, হে রিক্ত, হে ভয়াল, বিশ্বের এই বেদনার বন্ধন তুমি কি ছাড়াইয়া যাইতে পারিয়াছ সন্ন্যাসী? পার নাই—পার নাই। ওই যে প্রলয়ের মত্ততা, ওই যে একাকিত্বের নির্ম্মম আনন্দ, ও কে—ও কে, ভোলানাথ? ওই কি তোমার আত্মপ্রকৃতি নয়? তোমার পরম বিবেকী, পরম নির্লিপ্ত "তুমি"-কে ওই আনন্দের রসায়নে উত্তেজিত করিয়া তোলে নাই? বেদনা দিয়া যাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলে, আনন্দের মৃদু শিহরণে সে যে তোমারই মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছে। তুমি জগৎকে প্রত্যাখ্যান করিতে পার সন্ন্যাসী, কিন্তু প্রাণকে প্রত্যাখ্যান করিতে পার না। এই প্রাণই জগতের ধাত্রী।

বিবেকীর চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের শুষ্ক হাড়ের মালা দুইটী কোমল বাহুবল্লরী হইয়া লতাইয়া পড়িল ভোলানাথের কণ্ঠে—এই অনতিব্যক্ত, অনতিবচনীয় প্রাণের সরস পরশে! নিরোধের সংস্কার হইল স্বরূপের বিলাস। অতএব সাধ্য-সাধনাও তো আর রহিল না। দ্বৈতকে বুকে করিয়া জাগিয়া রহিল পরিপূর্ণ অদ্বৈতের অখণ্ড আনন্দ!

আমি স্তব্ধ, আমি মূক, আমার শ্রবণ বধির, নয়ন স্তিমিত, হৃদয়ের স্পন্দন রুদ্ধ—কিন্তু মধুকোষ হইতে নিঃসৃত পুষ্পসৌরভের মত আমার প্রাণ ছুঁইয়া রহিয়াছে এই নিখিলের সুখ-দুঃখের মেলাকে! এই আমার দেহ, এই মন, এই ইন্দ্রিয়—এরাও আর আমার নয়; "আমার" দাসত্ব হইতে ইহাদিগকে আজ মুক্তি দিয়াছি, মুক্তি দিয়া আমিও মুক্তি পাইয়াছি। অনাহত-ধ্বনিতে বিশ্বের হৃৎপিণ্ড তালে তালে স্পন্দিত হইয়া উচ্চারণ করিতেছে—ওঁ—স্বস্তি—স্বস্তি!

অতল গহ্বর ভাবিয়া যাহার পার হইতে তোমরা আঁৎকাইয়া ফিরিয়া আসিতেছ, আনন্দের প্রস্রবণ যে তাহারই অন্তস্তল হইতে উৎসারিত। যেখানে কিছুই নাই, সেইখানেই যে সব কিছুর বাস। কে বুঝিবে, এই পরমাশ্চর্য্য রহস্য!

ঋষি বলিয়াছিলেন, সেই পরমানন্দধামে মানুষ

নিয়তই প্রবেশ করিতেছে, সেখানকার অমৃতপানে সঞ্জীবিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তথাপি সে জানে না সে ধাম কেমন। এই তো মায়া, বস্তুকে যাহা আবৃত করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার জ্ঞানকে আবৃত করিয়াছে।

নেতিমূলে যে সত্য রহিয়াছে, তাহা যে শূন্য নয় বা জড় নয়, বুদ্ধির পরাবর্ত্তন না হইলে মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না। অথচ সেই রিক্ততার আকর্ষণ তার সর্ব্বত্র; মরণ ছানিয়াই সে সুখের সন্ধানে ফিরিতেছে। আবার কোন প্রাক্তন সংস্কারবশে এই পরম সুহৃদ মরণকেও সে মনে করিতেছে বিভীষিকা!

বহুর দাবী আজ মানুষের অন্দর-মহল পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। তাই সে একেকে ডরায়। মহা সমুদ্রের তরঙ্গমালায় ভাসিয়া বেড়াইতে তাহার সাধ, কিন্তু যে তলদেশে সব এক হইয়া রহিয়াছে, সেখানে যে কি রত্ন ফলিয়া আছে, তাহার সন্ধান সে নিতে চায় না।

তর্ক করিয়া, যুক্তি দেখাইয়া মানুষের মনকে প্রজ্ঞানঘন, আনন্দঘন স্বরূপের দিতে ফেরানো যায় না। আলোর স্পর্শে ফুল ফুটিয়া যেমন গন্ধকে মুক্তি দেয়, তেমনি ভূমার স্পর্শে একদিন মানুষের মাঝে এই "কোঠার ভিতর চোরকুঠুরীর" দরজা খুলিয়া যায়।

মানুষ তখন বোবা হইয়া যায় কি?—হয়ত হয়। কিন্তু অন্ধ, বধির, মূক হইয়াও সে বঞ্চিত নয়। মধুকোষের সন্ধান পাইয়াছে যে ভ্রমর, তাহার পক্ষবিধূনন আপনা হইতেই স্তব্ধ। কিন্তু আমি একাকারের কথা বলিতেছি না। দার্শনিকের বুলি কপচাইয়া সব এক করিয়া ঘুলাইয়া দেওয়া চলে, কিন্তু তাহাতে রস থাকে না তো!

রস থাকিলে রসনাও থাকা চাই। সে রসনা কেমন জান? অমৃতের সমুদ্রে ডুবিয়া যদি অনুভব কর, তোমার প্রতি রোমকূপে, প্রতি অণুতে অণুতে সচকিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে রসনার রসপিপাসা, আর অনন্ত ধারায়, অজস্র অভিষেকে যদি সে রসনার আপ্যায়ন চলিতে থাকে, তবে বুঝি সে অস্বাদনের একটু আভাস দেওয়া চলে।

অথবা তোমার দুটী চোখের দৃষ্টি তোমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ফুটিয়া উঠিয়া যদি রূপের সায়রে ডুবিয়া মরে, তবে বুঝি বা সে রূপায়নের একটু আভাস দেওয়া যায়!

আমি বলিতেছি, এমনি তদ্গত ইন্দ্রিয়ের কথা। একের মাঝেই বহুর পরিসমাপ্তি। স্পর্শে যেখানে শুনি বীণার ঝঙ্কার, সঙ্গীতে পাই ভাবে এলায়িত পরশের রভস, অথবা গন্ধে ফুটিয়া উঠে কোন সুরবালার নূপুর-নিক্কণ—এমনিতর যত অনাসৃষ্টির সৃষ্টি যেখানে। সমস্ত খণ্ডানুভবের মথন করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় রসায়নের উদ্ভব সেখানে।

তবুও বলি, ইন্দ্রিয়ের কথা, আস্বাদনের কথা। ওরে মূঢ়, ওরে কাঙ্গালী তুই কত চাস, আস্বাদনের কতটুকু ক্ষমতা তোর! মরণভয়ে তুই কূল আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিলি, অকূলের রহস্য উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালার হাতছানি দিয়া বারবার তোকে ডাকিয়া গেল—পারিলি তুই তার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে—আপনাকে গলাইয়া মিশাইয়া দিতে তোর ভয়, যদি কঠিন কিছু না থাকে তো এই তরলতার পরিমাপ করিব কি দিয়া; পাত্র যদি না থাকে তবে পান করিবি কি দিয়া! কিন্তু পাত্র আছে—সে ও যে তরলিত সুধার উচ্ছ্বাস দিয়াই গড়া। সে সকল কাঠিন্য গলাইয়া তরল হইতে পারিল না, সে কি করিয়া এই পথের সন্ধান পাইবে, এই অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের শক্তির পরিচয় পাইবে।

চোখের পানে চোখ তুলিয়া চাহিয়া থাক। ওই সুনীল স্বচ্ছ সাগরের মাঝে কি দেখিতে পাও, বল দেখি? কামনার বেসাতী খুঁজিয়াছিলে ওখানে, পাইয়াছ কি? পাও নাই। নিজের অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব খুঁজিয়াছিলে কি?—পাও নাই। তবে কি পাইয়াছ? পাইয়াছ শুধু লাজে সুখে থরথর

কম্পমান একটী আকুলতার আভাস মাত্র। কিন্তু তাহাই তোমাকে জগৎ ভুলাইয়াছে—ভুলাইছে যে তুমি আছ, তোমার বন্ধু আছে, তা ছাড়া জগৎ বলিয়া একটা বস্তুপিণ্ড আছে। ওই দুটী চোখই তখন ভুবন ছাপাইয়া ভাবে টলিয়া পড়িতেছে। এমনিতর আত্মহারা আকুলতায় বুঝি পাওয়া যায় সেই ভাবঘন ইন্দ্রিয়ের একটুখানি আভাস!

প্রত্যক্ষে স্থূল দেখিতেছ, অনুমানে সূক্ষ্ম বুঝিতেছ, অনুভবে বুঝিবে কারণের সত্তা। এই কারণই চিন্ময় আনন্দবিলসিত ভাবব্যূঢ় ইন্দ্রিয়। যাহা পাইবার এবং যাহা দিয়া পাইবার, দুইয়ে এখানে পরস্পরকে জড়াইয়া রহিয়াছে যে! তাই পাওয়ার মাঝে আর কোনও অন্তরায় নাই। এই অন্তর্গূঢ় আনন্দ হইতেই সহজ জীবনের উৎস। ইহাকেই বলিয়াছি প্রাণ।

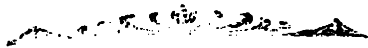
সাধক ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "ওগো, আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না, ধর্‌ব শশী হয়ে বামন!" আবার কেউ বলিয়াছিলেন, "মনে-প্রাণে ঐক্য করে ডাক্ যশোদাকুমারে!"

ঠিক কথা। মনকে যা-তা দিয়া বুঝাইতে পার, কিন্তু প্রাণকে বুঝাইবে কি দিয়া? যে ডাকার মাঝে মন আছে কিন্তু প্রাণ নাই, সে তো নিয়ম মাত্র, সে কি রতি?

এই অতীন্দ্রিয় প্রাণময় কারণসত্তায় অবগাহন করিয়া তার পর জগতের দিকে তাকাইতে হইবে—তবে না বৈচিত্র্যের সমাধান পাইবে, অদ্বৈতের সন্ধান মিলিবে। একই রস পত্রে শ্যামল, পুষ্পে সুনীল, ফলে কোমল, শাখায় কঠোর। কেমন করিয়া হয়? এই তো প্রাণের পরিচয়;—যে মূলে এক, আনন্দময়, অথচ যাহার বিকাশে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই, যাহার আনন্দের সব্যসাচী ধারায় সুখ ও বেদনার সৃষ্টি এবং সমন্বয়!

এই প্রাণরূপিণী ভাবব্যূঢ়া আত্মপ্রকৃতিকে যেদিন চিনিতে পারিবে, সেইদিন হইবে তুমি বৈরাগী। এই জগৎকে তুচ্ছ না করিয়া যে আর তখন উপায় নাই। কিন্তু জান, সে তুচ্ছীকরণে উগ্রতা নাই, পীড়া নাই। প্রাণে, আনন্দে, ভাবে সে পূর্ণ,—তাহার অভাব কিসের, জ্বালা কিসের যে সে অপরকে ব্যথা দিবে? এই জগতের উপর যে তাহার বাৎসল্যের করুণার সীমা নাই। তাই সে স্বচ্ছন্দে বলিতে পারে—নাহং তেষু, তে চ ময়ি—আমি ওদের মাঝে নাই কিন্তু ওরা আমার মাঝে আছে। এই হইল পূর্ণ প্রাণের পরিচয়।

প্রাণ পাইতে হইলে মরিতে হইবে। ঐকেন্দ্রিয়া সম্বিৎ আয়ত্ত করা চাই, একের অনুভূতির রভসে অনুক্ষণ আপনাকে ভাবাবিষ্ট রাখা চাই, যে কোনও ক্ষতি আসন্ন হউক না কেন অবিচলিত থাকা চাই। জানিতে হইবে অমৃতের ভাণ্ডারী আমি, ঐক্যের দিশারী আমি;—আমি চেতনাঘন প্রাণের ভাবুক।



ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিকতা

নরনারীরূপে প্রিয়তম,

আমেরিকায় প্রথমবার যখন আসি, তখন সিটেনে নেমেছিলাম। অধ্যাত্মবাদীরা আমার অভ্যর্থনা করেছিলেন। এই পুণ্যভূমিতে তাঁরাই প্রথমতঃ আমার অভিনন্দন করেন। সিটেনের এই অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ আমার অতি প্রিয় ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ্। পোর্টল্যাণ্ড এবং অরিগেনেও অধ্যাত্মবাদীরা আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। দক্ষিণ-আমেরিকার অধ্যাত্মবাদীদের মাঝেও আমার খুব অন্তরঙ্গ সুহৃদেরা রয়েছেন। আমেরিকার অধ্যাত্মবাদীদের সম্বন্ধে আমার অভিমত এই যে তাঁরা খুব উদারচেতা, সহানুভূতিপ্রবণ—একেবারে খাঁটী ক্রিশ্চিয়ান্। আবার আপনলোকের মাঝে এসে পড়ে আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে। শীগ্‌গিরই আমেরিকা ছেড়ে যাব, তাই যাঁরা এদেশে আমায় আবাহন করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে ছুটো কথা কইবার সুযোগ পেয়ে আমি বাস্তবিকই খুসী!

হিদেন্ (বিধর্ম্মী) হই, তবু আমরা এখানে ভাই-ভাই। হিদেন কাকে বলি? যে হিদ্ বা প্রান্তরে থাকে, তাকে। আমরা একই দেশে আছি, আকাশের উন্মুক্ত চন্দ্রাতপতলে—মেঘের ছায়ায়, গাছের কোলে, কাজেই আমরা হিদেন বই কি—আমরা ভাই ভাই। আমার হিদেন্-ভাইদের সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে! আগে তোমাদের কাছে "ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিকতা" সম্বন্ধে কিছু বলে নিই, তারপর না হয় অন্য প্রসঙ্গ তোলা যাবে।

এদেশে যে সমস্ত আধ্যাত্মিক সমিতি স্থাপন করা হয়েছে, ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিকতা কিন্তু তেমন কিছু নয়। অথচ প্রাচীন শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও শক্তির সম্পর্কে আমরা কত কথাই না শুনতে পাই।

এই যে আমি কাজ করছি, লিখছি, পড়ছি, লেখা আওড়াচ্ছি, এ সমস্তই ভারতবর্ষের ভাষায় "দিব্যদৃষ্টি"র দ্বারা আবিষ্ট হয়ে করছি। দিব্য-দৃষ্টি মানে জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি। তোমরা ভগবদ্‌গীতা সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছ। গীতার বক্তা হচ্ছেন সঞ্জয়। গীতার গোড়াতেই সঞ্জয়ের নাম পাবে। ভগবদ্‌গীতা অর্জ্জুন শুনেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু সঞ্জয় ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে হতে প্রায় ছুশো মাইল তফাতে। তাঁর গুরু তাঁকে দিব্য-দৃষ্টি নামে এই অলৌকিক শক্তি দিয়ে দিলেন। ছুশো মাইল দূরে থেকেও তিনি যুদ্ধে যা কিছু হচ্ছিল, তা বলে যেতে লাগলেন, তার মাঝে গীতার আবৃত্তি যে হল, তাও তিনি বলে গেলেন। তোমরা হয়ত শুনেছ, এদেশেও এক মিডিয়ামের কথাবার্ত্তা নিয়ে একবার একটা কেস্ হয়েছিল। যোগ-বাশিষ্ঠ বলে একখানা বই আছে। এমন আশ্চর্য্য বই জগতে কেউ কোনদিন দেখেনি বলে আমার বিশ্বাস। বইখানা যে পড়বে, তার ব্রহ্মানুভূতি না হয়ে যায় না, সে সবার সঙ্গে এক হয়ে যাবেই যাবে। ওই বইখানাও এমনি করে লেখা হয়েছিল। ভারতবর্ষে আর একখানা বই আছে রামায়ণ নামে—খুব বড় দরের বই—বাল্মীকি তা আসল ঘটনা ঘটবার বহুপূর্ব্বেই লিখেছিলেন। ভারতবর্ষের কতকগুলি বড় বড় বই লেখার নিদান সম্বন্ধে এমনিতর প্রসিদ্ধি আছে।

মহাভারত বোধ হয় জগতের সেরা বই একখানা—চারলক্ষ শ্লোক তাতে। তার মাঝে এক রাজকন্যার কাহিনী আছে, তিনি স্বপ্নে এক রাজকুমারকে দেখে

তার প্রেমে পড়ে যান। তিনি রাজকুমারকে এত ভালবেসে ফেলেছিলেন যে প্রেমের তাড়সে তাঁর অসুখ হয়ে গেল। রাজা মেয়ের দরুণ কত ডাক্তার-বদ্দি আনালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কিছুদিন পরে একজন আবিষ্কার করলেন যে রাজকন্যার রোগটা হচ্ছে প্রেমরোগ। রাজার মন্ত্রী এসে রাজকন্যার নাড়ী ধরে একটু দেখলেন, তারপর দেশের বড় চিত্রকরকে ডেকে এনে ভারতবর্ষের যত সুন্দর রাজা, সবার ছবি আঁকতে বল্লেন। চিত্রকরটী একটী মেয়ে। এ হতে বুঝতে পারবে, সে যুগে ভারতবর্ষের মেয়েদের যোগ্যতা কতখানি ছিল, এবং সমাজের কোন্ স্তরেই বা তাঁরা থাকতেন। মহিলা চিত্রকরটী এসে দেয়ালের গায়ে ছবির পর ছবি এঁকে যেতে লাগলেন—সব তখনকার বড় বড় রাজাদের ছবি। মন্ত্রী এদিকে রাজকন্যার নাড়ী ধরেই আছেন। চিত্রকর শ্রীকৃষ্ণের ছবি আঁকলেন, অমনি রাজকন্যার নাড়ী জোরে জোরে স্পন্দিত হতে থাকল। মন্ত্রী একটু থমকে রইলেন। তাঁর মনে হল, এই লোকটীকেই বোধ হয় রাজকন্যা মানসচক্ষে দেখেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁর মনে হল, নাড়ীর যেন খুব বেশী জোর এখনো হয় নি। চিত্রকর আরো ছবি এঁকে যেতে লাগলেন। তারপর যেই শ্রীকৃষ্ণের ছোট ছেলের ছবি আঁকা হল, অমনি রাজকুমারীর নাড়ী অসম্ভব জোরে চল্তে লাগল, তাঁর সমস্ত বুক জুড়ে তোলপাড় সুরু হয়ে গেল। মন্ত্রী তখন বুঝতে পারলেন, এই লোকটাকে পেলেই রাজকুমারীর দুঃখ দূর হবে। এটা কিন্তু গল্প নয়, আমরা মনে করি ঐতিহাসিক সত্য।

আচ্ছা, এই চিত্রকরটীর কথাই ধর। সে কি রাজা আর রাজপুত্রদের সবাইকে দেখেছিল? না, তা তো নয়। এই হচ্ছে দিব্যদৃষ্টি। এ যেন একটা উচ্চতর স্পন্দন, সবার সাথে স্পন্দিত হয়ে তখন প্রকৃতির আর কোনও আবরণ আমাদের চোখে থাকে না, সব আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়। এমনি কত কাহিনীই তোমাদের কাছে বল্‌তে পারি কিন্তু সে কথা বল্‌বার প্রয়োজন নেই। এইটুকু শুধু জেনে রাখ, একটা দৃষ্টি আছে, বরং বলা চলে, ভিতরের একটা আলো আছে, যা চোখে পড়লে পর জগতের সমস্ত জ্ঞান তোমার করায়ত্ত হবে। বেদান্তদর্শনে ভারী সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। তোমরা বই পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিকট শুনে যে রকম আলো পাও, এই আধ্যাত্মিক দিব্যদৃষ্টি তার থেকে যে কতখানি স্বতন্ত্র, তা বোঝাবার দরুণ একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

একবার এক রাজা তার একটা বিচিত্র প্রাসাদকে অতি বিচিত্র চিত্রসজ্জায় সাজাবেন মনে করেছিলেন। অনেক চিত্রকরই উমেদার হয়ে এল, আশা রাজা তাদের কাজই পছন্দ করবেন। রাজা তাদের সামনে একটা পরীক্ষা ধরলেন। সামনা-সামনি দুটো দেওয়াল ছিল, ওই দেওয়াল দুটোর ওপর রাজা বিদ্যা ফলাবার আদেশ দিলেন। দেওয়াল দুটোর মাঝখানে পর্দা টানানো ছিল। কাজেই একজন চিত্রকর আর একজনের কাজ দেখতে পেত না। এক একজনকে কাজ শেষ করতে দু'সপ্তাহ করে সময় দেওয়া হল। একজন চিত্রকর দেওয়ালে মহাভারতের ছবি আঁক্‌লে—পৃথিবীর যা নাকি সবার সেরা বই—আর তার কাজও হয়েছিল অতি চমৎকার বটে। অপর চিত্রকরটী কি করছিল, তা তোমাদের বল্‌ব না। দু'সপ্তাহ চলে গেলে পর রাজা এলেন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ছবি দেখতে। প্রথম চিত্রকরের নির্ব্বাচিত দেওয়াল থেকে পরদা তুলে নিতেই দেখা গেল, তাতে কত হাজারে হাজারে সুন্দর ছবি। যে-ই দেখে সে একেবারে থ বনে যায়। কি চমৎকার শিল্পকলা! যে দেখছে সেই চেঁচিয়ে উঠ্‌ছে— একেই পুরস্কার দিতে হবে, এরই জয়, একে দিয়েই মহারাজ তার কাজ করিয়ে নেবেন। রাজা তখন আর একজন চিত্রকরকে বল্‌লেন পরদা তুল্‌তে।

যখন পর্দা তোলা হল, তখন লোকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল—শ্বাস পড়ছে কি না পড়ছে, বিস্ময়ে চোখগুলি বিস্ফারিত হয়ে পড়েছে। তাদের আর কথাটী নাই—তারা যেন বিস্ময়ের প্রতিমূর্ত্তি। কেন? এই দ্বিতীয় লোকটী কি করেছে জান? প্রথম লোকটী যা কিছু এঁকেছে, তার সবই আছে এর দেওয়ালে। বরং প্রথম চিত্রকরের চিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত অসমান, কুশ্রী আর দ্বিতীয় ব্যক্তির ছবিগুলি এমন মসৃণ, এমন পরিস্কার, যে মনে হয় দেওয়ালের ওপর মাছি বস্‌তে গেলেও যেন পিছলে পড়ে যাবে। এত সুন্দর তার কাজ! তা ছাড়া দ্বিতীয় চিত্রকরের ছবিতে এ-ও এক বিশেষত্ব যে, দেওয়ালের ভিতর দিকে প্রায় তিন-গজ গভীর করে তার ছবিগুলি আঁকা। এ কি করে হলো? দ্বিতীয় চিত্রকরটী এতদিন ধরে তার দেওয়ালটী ঘসে ঘসে এমন মসৃণ করেছে যে সেটা একেবারে আয়নার মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে। আয়নার মতই প্রথম চিত্রকরের সমস্ত ছবিও ওতে পড়েছে বটে, কিন্তু তাও আবার দেওয়ালের একেবারে ভিতরে। জানই তো আয়নাতে ছবির যে ছায়া পড়ে, তা আয়না হতে জিনিষটা যতদূরে থাকে আয়নার ভিতরেও তাকে ততদূর দেখা যায়।

তাই দেখছ, জ্ঞান অর্জ্জন করবার দুটো পথ রয়েছে। একটা হচ্ছে তোতাপাখীর মত কেবল মুখস্থ করা, দেওয়ালের ওপরে ওপরে ছবি আঁকা—ছবির পর ছবি আঁকছই, ভাবের পর ভাব চলেছে সার বেঁধে, যত চিন্তা-ভাবনার রকমারী দিয়ে মস্তিষ্ককে বোঝাই করা শুধু—এই তোমার যত ভূতত্ত্ব, নভস্তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি যত সব কুছ-কামকা-নহী-তত্ত্ব। এই হচ্ছে জ্ঞানলাভের একটা ধরণ। আমি বল্‌ছি না যে ও রকম করে মানুষ কিছু পায় না। এই লোকটা যেমন করে দেওয়ালে চিত্র এঁকেছিল, তেমনি ওপরে ওপরে সব কিছুর রং বুলিয়ে যেতে পার। কিন্তু ভাই সব, এই জগতের জ্ঞান অর্জ্জন করবার আর একটা পথও কিন্তু আছে। সেটা হচ্ছে আত্মশুদ্ধির পথ। কিছু ঠাসা নয়, বরং বের করে দেওয়া। যা ভাবনা করবার একান্ত প্রয়োজন তাই শুধু ভাবা; তোমার চিত্তকে পূর্ণস্বরূপে পূর্ণ করে তোলা। যেমন নাকি ইমার্শন বলেছিলেন—

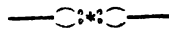
প্রকৃতির সাথে কাঁপে তোমারি হৃদয়—
প্রাচী হতে প্রতীচীরে করি জ্যোতির্ম্ময়।

পূর্ণস্বরূপে আত্মস্বরূপ নিমজ্জিত করবার ওই হচ্ছে উপায়। ওয়াল্ট হুইটম্যান বলছেন, সবকে অনুভব না করলে সবকে জানবে কি করে? এই হচ্ছে সর্ব্বানুভূতি।

যত সব মৌলিক চিন্তাশীল ব্যক্তি, যত সব প্রতিভাবান্ পুরুষ, তাঁরা জ্ঞান পান কোথা থেকে? আমাদের দেশে কত ধর্ম্মবিজ্ঞানের অধ্যাপক, ভক্তি-সাগর, আচার্য্য ইত্যাদি রয়েছেন, সারা জীবন ধরে খেটে খেটে তাঁরা লাইব্রেরী বোঝাই করেছেন। কিন্তু যীশু যেমন মিষ্টি করে উপদেশ দিয়েছিলেন, তেমন করে তাঁদের কয়জন মিষ্টি উপদেশ দিতে পারেন? আমাদের ঝুরি ঝুরি লেখক, ঝুরি ঝুরি বক্তা—কিন্তু ওই সাতটী কথার যে বক্তৃতা হয়েছিল, জান তো ভাই তার মত এত বড় বক্তৃতা কেউ দিতে পারে নি। কথা কয়টী কি?—না "দাও মোরে দাও স্বাধীনতা অথবা মরণ।" কত তো গণিতের পণ্ডিত, দর্শনের অধ্যাপক ইত্যাদি রয়েছেন, কিন্তু নিউটনের ওই অতটুকু Principia র মত একখানা বই আজ পর্য্যন্ত বেরিয়েছে? তিনি কোথা থেকে ওই জ্ঞান পেলেন? বই পড়ে তিনি যে গণিতের জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন, আর যে জ্ঞান তিনি জগতে ঢেলে দিয়ে গিয়েছেন, দুয়ের মাঝে তুলনা চলে কি? তাঁর এ জ্ঞানের উৎস ছিল, আর কোথায়ও। সেক্সপিয়ারের বই আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ক্লাসে পড়ানু হচ্ছে। বেচারী সেক্সপিয়ার কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ তো ছিলেন না, কিন্তু তিনি যা লিখে গিয়েছেন, তা

পড়ে আমাদের এম-এ পাশ করতে হচ্ছে। বর্ত্তমান যুগের সেরা বৈজ্ঞানিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সার কোনও কলেজের গ্রাজুয়েট্ ছিলেন না। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মশায় আপনি কি যা পান, তাই পড়েন? তিনি বলেছিলেন, না, মশায়, আমি যদি আর সবার মত সবজান্তা পড়ুয়া হতাম, তাহলে হয়ত তাদের মতই আকাঠ মূর্খ হতাম। এই সমস্ত মৌলিক পণ্ডিতেরা জগতের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করে গিয়েছেন, কিন্তু সে জ্ঞান তো তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের লেখা হতে নকল করেন নি। যদি অন্য বই থেকে নকলই হল, তাহলে আর তাকে মৌলিক বলা চলে না। এই তাহলে আর এক সমস্যা। মৌলিক চিন্তা আসে কোথা থেকে? মৌলিকতার মূল উৎস কোথায়?

ভাই সব, বন্ধু সব, শোন। জ্ঞাতসারে হোক্ আর অজ্ঞাতসারেই হোক্—আমার এই কথাগুলোর দিকে মন দাও তো! তোমার অন্তরে যে দিব্য-ভূমি রয়েছে, যা নাকি নিখিল জ্যোতির উৎস, তারই সহিত এক হওয়া—এই হচ্ছে মৌলিকতার মূল নিদান। নিখিল প্রাণের, নিখিল জ্যোতির নিদান হচ্ছে তোমার আত্মস্বরূপ, সত্য-স্বরূপ! মুহূর্ত্তের তরে এস ভাই চুপ হয়ে যাই এই চিন্তা নিয়ে—যে নিখিল প্রাণ, নিখিল আলো—আমারই অন্তরে—আমারই অন্তরে! (সমাপ্ত)



দায়ী কে?

রোগ আরোগ্য করার চেয়ে, রোগ যাতে না হয় তার চেষ্টা করা ভাল। মানুষের মাঝে এ সতর্কতা রয়েছে বলেই অনেক সময় প্রকৃতির হাত থেকেও মানুষ রেহাই পায়। হঠাৎ কোন কিছুই হয় না—বহুদিনের ছোট ছোট ঘটনাকে উপলক্ষ করে একদিন হয়ত বিপুল কাণ্ড বেধে যায়; বড় বড় বিপ্লব-বিদ্রোহের মূলেও রয়েছে বহুদিনের বহুমানবের সমবেত চেষ্টা। এত বড় জার্ম্মান-যুদ্ধ হয়ে গেল, তার আয়োজনও নাকি কত বৎসর আগ থেকেই চল্‌ছিল। যা আমাদের অমঙ্গল ঘটাবে, তাকেই আমরা বাধা দিই; মানে তা আমাদের প্রতিকূল। অপর পক্ষে অনুকূলকে সর্ব্বদাই আমরা সাদরে গ্রহণ করি। এমনি করে মরণের ডাক না আসা পর্য্যন্ত জীবন এক রহস্য-ময় দ্বন্দ্বের দোলায় অনবরত দুলছেই। বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে, মানুষ চেষ্টা করলে তাকে দূরীভূত করতে পারে। জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ যদি প্রকাশ পায়, উপবাস দিয়ে মানুষ অব্যাহতি লাভ করে। চারিদিক দেখে শুনে মনে হয়, অনেক সময় আমরা প্রকৃতির ইঙ্গিত বুঝে উঠ্‌তে পারি না—সমস্যার সমাধান হয় কিসে, সে চিন্তা জাগে আমাদের মাঝে খুব কম; অথচ অল্পায়ু নিয়ে সময় নষ্ট করি নিত্য-নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে। বিকারের মাঝেও নির্ব্বিকার থাকা, প্রবৃত্তির আবর্ত্তে পড়েও নিবৃত্তি অভিমুখী আকর্ষণ, খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। প্রলোভনের বস্তুর সমক্ষে নিজকে অটল রাখা সাধকের প্রয়োজন। পতন হবে জেনেই আর্য্য-ঋষিদের নিয়ম-সংযমের প্রতি এত ঝোঁক। নিজকে দ্রষ্টার আসনে রেখে, যা ঘট্‌ছে তা দেখে যাওয়া তোমার-আমার মত লোকের কাজ

নয়—যিনি অন্তর্দর্শী, দূরদর্শী তাঁর পক্ষেই সম্ভব। এতটুকুন ধৈর্য্যশক্তি কয়জনার ভিতর আছে জানি না ; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পরিণাম দেখে প্রতিকারের চেষ্টাই যে মঙ্গল, তাই মনে হয়। বিদ্যালয়ে দেখেছি, কত শিক্ষক ছেলেদের bad conduct বলে অবিরত রিপোর্ট দিচ্ছেন ; কিন্তু এ ব্যবস্থা কি প্রতিকারের না প্রতিশোধের, মঙ্গলের দরুণ না অনর্থসৃষ্টির চেষ্টায় ? শিক্ষকের কর্ত্তব্য যেন রেজেষ্ট্রি খাতাতে নাম লেখাটুকুই, এরূপ নিঃসম্পর্কভাবে কি শিক্ষক ছেলের মঙ্গল সাধন করতে পারেন ? মেনে নিলাম ছেলে দুষ্টু, কিন্তু দুষ্টুমি করে কেন, সহানুভূতির ভাব নিয়ে, কল্যাণেচ্ছায় ছেলেদের মহলে কেউ প্রাণ খুলে মিশেছেন কি এ তত্ত্ব জানবার আকাঙ্ক্ষায় ? উদাসীন হয়ে শিক্ষকতা করা বড় শক্ত। সমাজে কত ব্যভিচার অবাধে ঘট্‌ছে, হয় তো ব্যভিচার যাতে না ঘটে তার চেষ্টা কর ; তা না হয় তো ব্যভিচারীকেও একটা আশ্রয় দিতে হবে সমাজেরই। মোট কথা দরদীর প্রয়োজন।

যতটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা, চিন্তা ব্যয় হয় ঝগড়া-বিবাদ মিটাতে, ততটুকু যদি বিবাদ যাতে না বাধে তার চেষ্টায় নিয়োজিত হত, তবে দেশের কত প্রভূত কল্যাণ হত। শক্তির অপব্যয়ে দেশের দুর্ব্বলতাই তো বাড়ছে দিন দিন ! আদালতে গিয়েও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় বটে ; কিন্তু উভয়পক্ষের মনোমালিন্য দূর হয় না। ভাল উকীল বাদী-বিবাদীকে এর দরুণই আপোষের উপদেশ দিয়ে থাকেন ; কেননা বহুদর্শিতার গুণে তিনি পরিণাম-ফল স্পষ্ট দেখতে পান। সবার ভিতরেই যে শুভ প্রেরণা জাগবে তা বল্‌ছি না, আর তাহলে আদালতকে পোষণই বা করবে কে ? কিন্তু দেশকে অকাল-মরণ হতে উদ্ধার করতে হলে দূরদর্শী, কল্যাণেচ্ছু জন-নায়কেরই প্রয়োজন। সমাজ থেকে একজনকে বহিভূর্ত করে দেবার বেলায় যে সব লোক জোরগলায় কুৎসা গেয়ে থাকে, তাতে তো প্রমাণ হয় না যে তারা উদাসীন ছিল। তারা সবই জান্‌ত, কেবল সুযোগ অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল কবে ধরা-ছোঁয়া না দিয়ে আপন মৎলব হাঁসিল করতে পারবে। এতে কি সমাজের কিম্বা দেশের কল্যাণ সাধিত হতে পারে ? বাইরের আয়োজনে ভিতরের প্রয়োজন মিটে না। সুখ-সুবিধার দরুণ কত হাঁসপাতাল, কত কল-কারখানারই তো সৃষ্টি হচ্ছে, এতে কি রোগীর সংখ্যা, আর লোকজনের দুঃখদৈন্য ঘুচে গিয়েছে ? সুখ-শান্তি এ হল আভ্যন্তরীণ ; বাইরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সংগ্রহে হবে কি ? তাই যদি হত, দিবারাত্র খাটুনে কৃষকের স্বাস্থ্য দেখে ধনী ব্যক্তির হিংসা হত না। এ সমস্ত বহির্মুখীনতার ভাব অবশ্য পাশ্চাত্য দেশ থেকেই আমদানী ; কিন্তু তাদের দুর্গুণটুকুই সহজে সংক্রামিত হয়ে পড়েছে আমাদের মাঝে—ভাল গুণটুকু নয়। ভবিষ্যতের ভাবনা নিয়ে তাদের কত লোক গভীর গবেষণায় মগ্ন তার খবর কেউ রাখেন কি ? প্রাণবন্ত জাতির পরিচয় ভাঙ্গন-গড়নেই ; মানে তাদের উদ্ভাবনী শক্তি আছে।

কাজ কর্ম্মের অসম্পূর্ণতা আর বিশৃঙ্খলা দেখে মনে হয়, সামর্থ্য বুঝে আমরা কাজে হাত দিই না। অবশ্য আদর্শ উঁচু রাখতে কেউ নিষেধ কর্‌ছে না ; কিন্তু যা করব নির্ব্বিবাদে তার প্রতিক্রিয়া সহ্য করার ক্ষমতাও অর্জ্জন করতে হবে। শক্তিবন্ত না হয়ে দুষ্ট-শিষ্ট সবাইকে আশ্রয় দিয়ে নিজের সাময়িক উদারতা প্রকাশ করি বটে ; কিন্তু দুদিন পর তাদের আচরণে যখন আমায় উত্যক্ত করে তোলে, বাধ্য হয়ে তখন ন্যায়ের পন্থা অবলম্বন করতে হয়। এর আগে বুঝে-শুনে উদার হওয়ার প্রয়োজন ছিল না কি ? মানুষ তো—অতিমানুষ নয় ; ভাল-মন্দ থাকবেই। আবর্জ্জনা আর বাজে মাল দিয়ে পূরণ না করে, ভাল কয়টী জিনিষ দিয়েই দোকানটী সজ্জিত রাখ না কেন ? ক্ষতিতে যে এখনও তোমার বিশেষ বাজে।

অজ্ঞানীর বুদ্ধিভেদ জন্মাতে নাই, তা বলে

কুবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়ে চল্‌তে হবে এমন কথাও কেউ বলে নি। ভাল-মন্দকে যখন সমচক্ষে দেখতে পারিনে, মন্দ কার্য্যে বাধা দেওয়া তখন বিশেষ প্রয়োজন। নির্গুণ ভোলানাথকে এনে সমাজরক্ষক কর্‌লে চল্‌বে না; আমার ভিতর যখন ভাল-মন্দ বোধ রয়েছে, তখন মন্দকে বর্জ্জন করার দরুণ যে উপায় অবলম্বন করতে হয়, অনায়াসে তার দরুণ আমায় প্রস্তুত থাকৃতে হবে—এতে যদি আমার উদারতা ছুটে যায় তা যাক্ না। আমার শক্তির শান্তিপূর্ণ স্পন্দন দিয়ে যদি পারিপার্শ্বিককে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারি সে তো ভালই—সহজ পন্থা; আর মহাপুরুষেরা তো এরূপ শুভচিন্তা দিয়েই বিল্বমঙ্গল, জগাই-মাধাই এদের মত লম্পটকেও শুভ পথে আনয়ন করতে পেরেছিলেন। সবার মাঝেই যে সে দৈবী-শক্তির উদ্বোধন হয় তা তো নয়; তাই অধিকারী বুঝে আগ থেকেই সাবধান হয়ে চল্‌তে হয়। ধ্রুব গেল বনে হরিকে ডাকৃতে, কত হিংস্রজন্তু তার সামনে এল গেল; কিন্তু কেউ তাকে হিংসা করে নি। যদি পার ধ্রুব-প্রহ্লাদের মত সরল বিশ্বাস, আর শুভচিন্তা দিয়ে পারিপার্শ্বিকের উদ্ধত-প্রভাবকে নির্জ্জিত করে রাখ, দেখবে প্রতিদ্বন্দ্বীও আসবে তখন মাথা নুইয়ে। কিন্তু বাঘে যদি খাবেই জানা থাকে, নিরস্ত্র হয়ে তাদের মাঝে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়াতে কি লাভ?

ফল চিরকাল কাঁচা থাকে না, তারও একটা পাকবার সময় রয়েছে। ছোট ছোট ছেলেরা বড় হবে এ-ও জানা কথা, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বিকাশ, নূতন নূতন সংস্কার জাগবে স্থির নিশ্চয় কিন্তু অকালে তাদের ভিতর কুসংস্কার ঢুকিয়ে যে কি ফল তা বোধ হয় কাউকে বলে দিতে হবে না। অনেক সময় ছোট ছেলেদের সমক্ষে প্রকাশ্যে বক্রোক্তি দিয়ে বড়দের সংশোধন করতে গিয়ে বরঞ্চ তাদের মাঝে যা জাগে নি তাই জাগিয়ে দেওয়া হয়। একটী ছেলের কথা মনে হল। কোনদিন তাকে বড় একটা বিষণ্ণমনা দেখিনি, হঠাৎ একদিন দেখি সে মুখভার করে বসে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? প্রত্যুত্তরে সে বল্‌লে, বাবা নিষেধ করেছেন, পাশের বাড়ীর আমার সমবয়সী নরেনের সঙ্গে কখনও মিশে খেলা না করতে! আমি বল্‌লাম, তুই কোন কিছু করেছিলি? ছেলেটী বল্‌ল—না, তবে নরেনের পিতার সঙ্গে নাকি ওর পিতার মনোমালিন্য হয়েছে, নরেনদের বাড়ীতে যেতে নিষেধ হয়েছে এর দরুণই। ছেলেবয়সে সরল-প্রাণে এমন হিংসার ছাপ বসিয়ে দেওয়া সঙ্গত? ছেলেকে উদারতার শিক্ষা না দিয়ে ছোটবেলা থেকেই যত সঙ্কীর্ণমনা করে তুল্‌তে পারি তারই চেষ্টা। এরূপভাবে প্রায় প্রত্যেক কাজেকর্ম্মে ছেলেদের সরল ভাবটী যত সহজে বিলীন হয়ে যায় তার চেষ্টা করে অসময়ে তাদের পাকিয়ে তোলা হয়। আশ্চর্য্য বোধ হয় এর প্রতিফল দেখে অভিভাবকও যখন আসেন বিস্ময় প্রকাশ করতে!

আত্মা অমর জেনেও দৈহিক উন্নতি-অবনতির দরুণ আর্য্য-ঋষিরা কম বিধি-ব্যবস্থা করেন নি। তাঁরা ভেবে-চিন্তে দেখেছেন, আত্মোন্নতির পক্ষে শারীরিক বাধা-বিঘ্ন, ক্ষতি বড় কম নয়। বৈদেহ অবস্থা লাভ না করা পর্য্যন্ত উত্থান-পতনের ভয়েও বিশেষ সতর্ক হয়ে চল্‌তে হয়। এতে যদি নিরুদ্ধবাদী নাম নিতে হয় তাতে আপত্তি কি? সবার মাঝেই নারায়ণ আছে বটে, কিন্তু বাঘ-নারায়ণকে ভয় করেই চল্‌তে হয়; দূরে না থাকৃলে প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে। মানুষের শিক্ষা হয় অভিজ্ঞতা থেকেই। সতর্ক হয়ে চল্‌লে কি আর ফাঁকিতে পড়তে হয়? উৎসবে প্রয়োজনের চেয়েও আয়োজন বেশী হয়, তাই কত লোকসান হচ্ছে অনবরত; কিন্তু উৎসবের বিরাট্ আনন্দ কোন দিক দিয়ে ব্যাহত হয় না। নিত্যকার জীবন উৎসবের জীবন নয়—হিসাব করে না চল্‌লে তাতে ক্ষতি হয়—একটু এদিক-সেদিক হলেই জবাবদিহী দিতে হবে। যেখানে হিসাব করে চল্‌তে হবে

সেখানেও যে উদারতা—বলার থাকলেও যে কিছু না বলা, শেষ পর্য্যন্ত এ ভাবটীকে অক্ষুণ্ণভাবে হৃদয়ে পোষণ কর্‌তে পারবে কি ?

নিঃশেষে হিংসা লোভ জয় না হওয়া পর্য্যন্ত অপরের মঙ্গল করতে যাওয়াতেও বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা রয়েছে। ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষের আলোচনায় নিজের মঙ্গল ইচ্ছার প্রশান্ত-দীপ্তি ক্ষীণ হয়ে আসে, সম্পূর্ণ মানুষটী লক্ষ্যে পড়ে না—চোখে ভাসতে থাকে শুধু তার কলঙ্কের রূপ। সম্যক সাধু দৃষ্টি না খোলা পর্য্যন্ত এরূপ আশঙ্কা থেকে কেউ নিস্তার পায় না। শুভ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে যদি ব্যষ্টির কিংবা সংঘের কল্যাণে একজন আত্মনিয়োগ করত, তবে চারিদিক থেকে এমন বিরোধের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠ্‌তে পারত ? তাই একজন যখন জগতের হিতের কল্যাণে উঠে-পড়ে লেগে যায়, তখনই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—কোন দিক দিয়ে তো তোমার আপন স্বার্থের ব্যাঘাত হয় নি ? ফলাফল দেখে মনে হয়, তত্ত্ব জানবার দরুণ বিষয়ে প্রবিষ্ট হই বটে ; কিন্তু আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ থাকে না বলে বিষয়জালেই জড়িত হয়ে পড়ি। এমন করে মঙ্গল করনেওয়ালা লোক অগুণতি হয়ে ওঠেছে ; অথচ দেশের অমঙ্গল অপসারিত হচ্ছে না কিছুতেই।

প্রতিদিনের ক্ষুদ্রতা আমাদের ঔদ্ধত্যে নিয়ে যায়, মিথ্যা অহঙ্কারের পীড়ন প্রতিদিন জীবনকে ভারগ্রস্ত করে তুলবেই তুলবে। প্রলেপ দিয়ে যাই অন্তর্জ্বালা নিবাতে, এ কি কখনও সম্ভব ? পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পার্থক্যই এ জায়গায়। আমরা চাই কামনা-বাসনার উচ্ছেদ, তারা চাইবে এক ঢোক ঔষধ খাইয়ে দেহটাকে সুস্থ করে তুলতে, তাই ওদেশে বড় বড় চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, রাসয়নিক হচ্ছেন বটে ; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গদেবের মত আত্মদর্শী পুরুষের সংখ্যা বিরল। ভারতের বৈশিষ্ট্য, এত যে উন্নত হয়ে উঠেছে পাশ্চাত্য জাতি তারাও অস্বীকার করতে পারছে না। তাদের যখন বলার সব শেষ হয়ে যাবে, ভারত তখনও নূতন কিছু বল্‌তে পারবে। তারা বলে, দেহের প্রয়োজনে আত্মা, —আমরা বলি আত্মার প্রয়োজনে দেহ। ঔষধপত্র প্রয়োজন বটে ; কিন্তু এটাই একমাত্র প্রয়োজন নয়। এক হৃৎপিণ্ডের জায়গায় অন্য হৃৎপিণ্ড বসাচ্ছে—নূতন Experiment বটে ; কিন্তু হৃদয়ের দুঃখজ্বালা তো প্রশমিত হচ্ছে না। ভারতের মুনি-ঋষিগণ বুঝেছিলেন এর প্রতিকার—তপস্যায়, সাধনায়। সবল ইন্দ্রিয়-গুলোকে নির্জ্জিত করে আমাদের পথের কণ্টক করে না তুলে মিত্র করে তোল—তাদের কথায় না চলে যেন আমাদের আদেশেই তারা চলে।



ভাগবতের দেবতা



সত্যং পরং ধীমহি

—সেই পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি। এই পরম সত্যস্বরূপ দেবতাই ভাগবতের প্রতিপাদ্য। মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ইঁহারই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। শ্লোকের এক একটী অংশ উদ্ধার করিয়া তাহার উপবর্ণন করিতেছি।

তিনি **পরং সত্যং**। দুই ভাবেই তাঁহাকে বুঝিতে পারি। বলিতে পারি, তিনি পরম বা চরম বা অবধি, এবং তিনি সত্য। তিনি কিসের অবধি? আমাদের যাহা কিছু কল্যাণগুণের ধারণা হয়, তিনি তাহারই অবধি। অথবা গুণাবরণহীন চেতনার পরম প্রদীপ্তি তিনিই। অথবা নিখিল ঐশ্বর্য্যের পরমাশ্রয় তিনিই। মোট কথা, জীবের বুদ্ধির ঊর্দ্ধবিবর্ত্তন যত দূর পর্য্যন্ত হইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত গিয়াও যে সে তাঁহার নাগাল পাইতেছে না, তাই বলিতেছে, তিনিই পরম্। তিনি রমণীয়তম, কমনীয়তম, জ্যোতির্ম্ময়তম, দিব্যতম—যা কিছু বল বা ভাব, তাহারই চরম স্ফূর্ত্তি।

আবার এই সঙ্গে সঙ্গেই বলি, তিনি সত্যম্। এই যে লীলায়নের চরমের দিক দিয়া তাঁহাকে খুঁজিতেছি, ইহার মূল ভিত্তি কোথায়? কোন্ ভূমিকায় দাঁড়াইয়া বলিতে পারিতেছি, তিনি সকলেরই চরম বা পরম? উহাই সত্য। সত্য কি? আত্মচেতনার অনুধাবন করিয়া দেখ—যে অবিকম্পিত জ্যোতিঃশিখা তোমার মাঝে নিয়ত প্রদীপ্ত রহিয়াছে, যাহার কিরণস্পন্দনে বস্তুর প্রকাশ, তাহাই সত্য। কূটস্থ যাহা, তাহাই সত্য। রঙ্গমঞ্চে দীপশিখার মত এই সত্য। রঙ্গমঞ্চ যখন পূর্ণ তখনও যেমন তাহা নিষ্কম্প, শূন্যমঞ্চেও তেমনি তাহা নিষ্কম্প, ভাস্বর। খণ্ডবুদ্ধি হার মানিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলে, তুমি পরং, আবার সমাহিত অখণ্ড প্রত্যয় বলে, তুমি সত্যম্। এই উভয় কোটীর সামঞ্জস্য করিয়া পূর্ণ জ্ঞানের পূর্ণ পরিচয় ভাগবতের আদিতে—তুমি একাধারে পরম এবং সত্য—তুমি সত্যং পরম্। দার্শনিকের পরিভাষায় বলিতে গেলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের সমন্বয় এই ভাগবতের পরম দেবতা। ইহাই সিদ্ধানুভূতি।

আবার এই দেবতার সাধকানুভূতিও আছে। পরং সত্যং বলিতে ইহাও বুঝি, তুমি পরম সত্য অর্থাৎ সত্যেরও উচ্চাবচ ক্রম আছে এবং তুমিই তাহার পরম বা অবধি। ইহাই পাশ্চাত্য দর্শনের অধুনাপ্রচলিত প্রসিদ্ধ Theory of Relativity of Truth। আজকার দর্শন আজকার সত্য; আবার কালকার বিশুদ্ধতর দর্শন আরও উন্নততর স্তরের সত্য। এইরূপে মিথ্যা হইতে সত্যে নয়, সত্য হইতে সত্যতরের পানে আমাদের চেতনা প্রচোদিত হইয়া চলিয়াছে। জগতে সবই সত্য, সবই আনন্দময়, সবই প্রাণময়—এই নিবিড় অনুভূতিতে প্রাণ পূর্ণ করিয়া সত্যের জয়যাত্রায় পতাকাবাহী হইয়া চলা, ইহাই সাধকের আদর্শ। এই সত্যপথের পথিকেরই চরম লক্ষ্য—পরং সত্যম্—ভাগবতের দেবতা।

সত্যং পরং ধীমহি—ইহার মাঝে আর একটি নিগূঢ় ব্যঞ্জনা রহিয়াছে, ধীমহি—এই কথাটীর মাঝে। ইহা সঙ্ঘের ব্যঞ্জনা বা ভারতের রাষ্ট্রচেতনার অব্যক্ত বীজ। দেবতাকে যখন ধ্যান করিতেছি, তখন আমি একা নই, **আমরা** সবাই আছি; তিনি শুধু আমার দেবতা নন, তিনি **আমাদের** দেবতা। এই বহুবচনের ভিতর দিয়া সংঘচেতনার ব্যঞ্জনা বেদের ছত্রে ছত্রে। ভারতের ভূদেব অনাদি যুগ হইতে যে গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সনাতন ভাবধারাকে সঞ্চালিত ও প্রবাহিত রাখিয়াছেন—তাহাতেও এই

সংঘের ব্যঞ্জনা—**আমরা** তাঁহারই ধ্যান করি, যিনি **আমাদের** বুদ্ধিকে প্রচোদিত করিতেছেন। একা আমি নই, আমরা সবাই—এই ভাবটিও ভাগবতের আদি।

দুই প্রকার লক্ষণ আছে—স্বরূপ ও তটস্থ। সাক্ষাৎ ভাবে যাহা বস্তুকে চিনাইয়া দেয়, তাহা স্বরূপ লক্ষণ; আর যাহা অপর কিছুকে ধরাইয়া দিয়া তাহা হইতে বস্তুর ইঙ্গিত দেয়, তাহা তটস্থ লক্ষণ। তিনি সত্যং পরং—ইহা তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ। এইটুকু অপরোক্ষভাবে ধারণা করিবার উপযোগী মেধা যাহাদের নাই, তাহাদিগকে ব্যক্ত বস্তু হইতে নিষ্কাসন করিয়া অব্যক্তের স্বরূপ চিনাইতে হয়, ইহাই আবার তটস্থ লক্ষণ। এক্ষণে এই পরম দেবতার কয়েকটি তটস্থ লক্ষণের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে।

১। জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চ।

এই একটি তটস্থ লক্ষণ। ইহার অর্থ এই, অন্বয় ও ব্যতিরেক ন্যায় দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় যাঁহা হইতে সিদ্ধ হয়, তিনিই পরম সত্য। অতঃপর ইহার বিবৃতি প্রয়োজন।

অন্য অর্থে ইহার—পুরোবর্ত্তী বস্তুর অর্থাৎ এই যে তুমি-আমি যাহা কিছু দেখিতেছি, এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান বস্তুর। আমি পরমপুরুষ চিনি না, বুঝি না, তাঁহাকে ধারণা করিবার মত শক্তিই আমার নাই। যদিই বা তোমরা বল, তেমন একজন কেহ রহিয়াছেন, আমি ভাবি, চোখে দেখিলাম না, ও তো শোনা কথা;—কি করিয়া বুঝিব যে সে আছে কি নাই? মনের সংশয় বাড়িয়াই চলে। এই অবস্থাতেই মানুষের প্রয়োজন হয়, ন্যায়ের বা যুক্তির। অভিজ্ঞ পাঠক Descartes প্রসিদ্ধ উক্তি Philosophy begins in doubt এবং তাঁহার Methodএর কথা স্মরণ করুন।

যুক্তিবাদী আসিয়া বলিলেন, তুমি আর কিছু না মানিতে পার, কিন্তু ইদং—এই যে চোখের সামনে জগৎটা পড়িয়া আছে, ইহাকে তো মান? যদি জগৎকে স্বীকার কর, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কথাও স্বীকার করিতে হয় যে এই জগতের স্বরূপ সম্বন্ধেও তুমি কিছু কিছু জান। সে স্বরূপ এই—জগৎ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন রূপে দেখা দিতেছে, ক্ষণকাল সেরূপ থাকিতেছে, আবার নিমেষেই মিলাইয়া যাইতেছে; আবার নূতন রূপে সে দেখা দিতেছে, আবার ক্ষণকাল থাকিয়া মিলাইয়া যাইতেছে।

এই যে ব্যাপারটা চোখের সামনে ঘটিতেছে, আমরা দ্বৈতবুদ্ধিদ্বারা ইহাকে গ্রহণ করিতেছি। রহস্য এই, বুদ্ধির এই দ্বৈতের কথা আমরা জানি না; আমরা মনে করি আমরা যাহা বুঝি, তাহা বুঝি এক রকম করিয়াই বুঝি; কিন্তু তা নয়, প্রত্যেকটী বৌদ্ধ প্রত্যয়ের পেছনে রহিয়াছে দুইরকম করিয়া বুঝা। তাহার মাঝে একটী বুঝা সুস্পষ্ট, আর একটী অস্পষ্ট; তাই আমাদের ধোকা লাগিয়া যায়, আমরা বুঝি এক রকমই সব বুঝিতেছি।

কথাটা এই—আমাদের বুদ্ধি যে শুধু চঞ্চলতাকে, বিবর্ত্তনকে বা পরিণামকেই গ্রহণ করে, তাহা নয়; সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্থৈর্য্যকে, সত্তাকে, অখণ্ডকেও বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণ করি। আর এই দুইটী বুদ্ধির ধারা ঘুলাইয়া গিয়া আমাদের মনে হয়—যাহা **নশ্বর**, তাহাই বুঝি **স্থায়ী**; অথবা যাহা **স্থায়ী**, তাহাই বুঝি **নশ্বর**। প্রত্যেক ক্ষণেরই বেদনাকে আমরা চিরন্তন ভাবিয়া মরিতেছি, আবার চিরন্তনের স্ফূর্ত্তিকে ক্ষণিক উচ্ছ্বাস ভাবিয়া মুখ বাঁকাইতেছি। এই বিপর্য্যয়-বুদ্ধিই আমাদের জৈববুদ্ধির পরিচয়।

এই দ্বৈতগর্ভ বিপর্য্যস্ত বুদ্ধিই ন্যায়-যুক্তি প্রয়োগের যথার্থ ক্ষেত্র। একদিকে দেখিতেছি আমার বুদ্ধির চঞ্চল বৃত্তি; আর একদিকে তাহার স্থির-নিলয়। চঞ্চলতাকে বলিতেছি জগৎ—যাহা "ইদং"-পদবাচ্য, ইন্দ্রিয়গোচর; স্থৈর্য্যকে বলিতেছি সেই চঞ্চলতারই বিধৃতি বা রঙ্গপীঠ, উহাই পরম সত্য। এইরূপে আমার বৌদ্ধপ্রত্যয়কে বিশ্লেষণ করিয়াই আমি অজ্ঞাত ব্রহ্মের সন্ধান পাইতে পারি।

এই সামান্যতঃ উপলব্ধ সত্যকে যুক্তিদ্বারা আরও সুপরিস্ফুট করিবার জন্য কার্য্য-কারণের সম্পর্ক-নির্ণায়ক অন্বয়-ব্যতিরেকের ন্যায় প্রয়োগ করা হইতেছে। কারণ ও কার্য্যের মাঝে নিয়ত সম্পর্ক। এই সম্পর্ককে নিশ্চিত করিয়া বুঝিবার জন্য অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তি। "তৎসত্ত্বে তৎসত্তা" ইহা অন্বয়ের ধারা; "তদসত্ত্বে তদসত্তা" ইহা ব্যতিরেকের ধারা। ধ্রুব-প্রত্যয় রঙ্গপীঠরূপে থাকিলেই চঞ্চল বৃত্তির সত্তা দেখা যায়; আবার ধ্রুব কোনও কিছুর ভিত্তি না থাকিলে অপর কোনও কিছুর সত্তাই অসম্ভব। এই দুইটী ন্যায়কে মিলাইয়া ধ্রুবসত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রত্যক্‌দৃষ্টিতে এই কথাটী সহজভাবে এইরূপে ফুটাইয়া তোলা যায়—আমার চেতনাই ধ্রুব; এমন কি "আমি নাই," এ কথারও সাক্ষী আমিই। আমার জ্ঞানে এই জগৎ, এই তরফের কথাটাই সত্য। আমার জ্ঞান যদি না থাকে, জগৎও থাকে না, এই কথাটাও তর্ক হিসাবে সত্য, কিন্তু বাস্তবে সত্য নয়; কেননা আমার জ্ঞান থাকিবে না, এরূপ কখনও হওয়া সম্ভব নয়। তবে আর এক দিক হইতে বলিতে পারি, জগৎ যখন থাকে না, তখনও আমার জ্ঞান থাকে; আমি নাই, এ কথাও বলি "আমি।" সুতরাং আমার জ্ঞান সদাজাগ্রৎ, উহা হইতেই আমার জ্ঞেয়ের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। ব্যষ্টির এই ভাবকে সমষ্টিতে ছড়াইয়া দিলেই পাই প্রত্যক্‌-চেতনা নয়, ব্রহ্মচেতনা। তিনিই সত্যং পরং।

২। অভিজ্ঞঃ

কিন্তু ইহার পরেও একটা কথা উঠে। যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, স্থিত ও লীন হয়, তাহা চেতনা নাও হইতে পারে। ধ্রুবসত্তা যে শুধু চেতনা বা আলোক, তাই বা কেন, অন্ধকারও তো ধ্রুব সত্তা হইতে পারে। কথাটা কিরূপ, তাহা আমাদের এই নিত্যদৃষ্ট জগৎ ব্যাপার হইতেই বুঝাইতেছি।

সৃষ্টি হইতে স্রষ্টার অনুমান, পরমসত্যের ইহাও তটস্থ লক্ষণ, পূর্ব্ববর্ত্তী নিবন্ধিকাতে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের বুদ্ধির বিভিন্ন ধারণা থাকা অসম্ভব নয়। স্তরে স্তরে এক্ষণে তাহাই দেখানো হইতেছে।

সাংখ্য বলিতেছেন, সৃষ্টির মূল নিদান অব্যক্ত। কথাটা সত্য। কিন্তু তাহাই পরম সত্য নয়, ভাগবতের ইহাই তাৎপর্য্য। কার্য্য স্থূল, কারণ তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, ইহাই সাধারণের ধারণা। কিন্তু এই সূক্ষ্মের সীমা কোথায়, ইহা নিয়া নানা স্তরের অনুভূতি থাকিতে পারে। সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে কার্য্যের ক্রমসূক্ষ্মতার একটা বিবৃতি আছে। এই বিবৃতির চরম তত্ত্ব হইল সাংখ্যের অব্যক্ত বা জগৎ কারণ। কারণ তাহাই, যেখানে সমস্ত কার্য্য সমগ্রসভাবে সম্পুটিত হইয়া থাকিতে পারে—ইহাই সাংখ্যের অব্যক্ততত্ত্ব। জগতেও দেখি তাই। একই মাটীতে নানা রঙের ফুল ফোটে, বা একই গাছের মূল উপাদান নানা বিচিত্র অবয়ব-সংস্থান বা গুণবৈচিত্র্যে প্রকট হয়; ইহাই কারণতত্ত্বের দৃষ্টান্তস্থল। অধ্যাত্ম-জগতে বলিতে পারি, সুষুপ্তির কথা। সেখানেও সব গিয়া একাকার হইতেছে; উপনিষদ যেমন বলেন, সে এমন এক ঠাঁই, যেখানে বাঘ, ভালুক, মানুষ, মশা, কীট, পতঙ্গ সব আপনার সত্তা হারাইয়া এক হইয়া যাইতেছে, আবার বাহির হইয়া আসিবার সময় আপনার ব্যক্তিত্ব নিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। ইহাই কারণ তত্ত্ব। এই অব্যক্তই সৃষ্টির প্রাণ, ইহাই সাংখ্যের অভিমত। খুব স্থূল উদাহরণ দিয়া বোঝান যায়, সুষুপ্তিতে মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিরতিতে মস্তিষ্ক নূতন নূতন সৃজনী প্রতিভা অর্জ্জন করে। এই ভাবধারা সে কোথা হইতে পায়? সাংখ্যকার বলি-

বেন, ওই তো অব্যক্তের নিশানা। বৌদ্ধ বলিবেন, ওই তো সর্ব্বশূন্য হইতে সর্ব্বাস্তির সৃষ্টি। বৈদান্তিক বলিবেন, বলিহারি, এই তো মায়া!

সাংখ্য উৎকট বিবেকজ্ঞান লইয়া চলিয়াছেন, তাই বাধ্য হইয়া এই অব্যক্তকে বলিয়াছেন—জড়। এই কথা মানিয়া ব্রহ্মাণ্ডের একটা স্কীম্‌কে মাত্র স্বীকার করা চলে। কিন্তু অগ্র্যা বুদ্ধি যখন একের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়িতে চায়, তখন সাংখ্যের এই মহত্তর জড়বাদও টিকে না। প্রকৃতিবাদ ভাবুকের হাতে পড়িয়া তখন শক্তিবাদে রূপান্তরিত হয়। বৈদান্তিক তাহাকে মায়াবাদে লীলায়িত দেখেন। এই দর্শনের মূল কথা হইতেছে—সমাহিত বুদ্ধি সর্ব্বশূন্য নয়, বা সর্ব্বপূর্ণও নয়, উহা অনির্ব্বচনীয়। এই অনির্ব্বচনীয়ের স্বীকৃতিতে যাহা ছিল জড়, তাহা হইয়া উঠে প্রাণবন্ত; যেখানে সমস্ত ছিল আঁধার, সেখানে সব হইয়া উঠে অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়। ফলে পাই—সর্ব্বকারণ-কারণের পরম চেতনায় উদ্ভাসিত সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে লীলায়িত সৃষ্টির ছক্। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিতেছেন, পরম সত্য অব্যক্তের মতই একরস বটে, কিন্তু তিনি জড় বা চেতনাহীন নন, তিনি প্রজ্ঞানঘন। তিনি **অভিজ্ঞ।**

৩। স্বরাট্

সেই পরম সত্য স্বরাট্—এই তাঁহার আর এক তটস্থ লক্ষণ। একটা কথা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে, এই তটস্থ লক্ষণগুলির মাঝে ব্যাপ্তির একটা পরম্পরা রহিয়াছে, এইজন্য ইহারা পরস্পরের সহিত বিশেষ্য-বিশেষণভাবে যুক্ত। পরম সত্যের অনুভূতি অপরোক্ষভাবে যাহার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না, সেই তো তটস্থ-লক্ষণের খোঁজে যায়। এই তটস্থ-লক্ষণসমূহের মাঝে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক লক্ষণ হইতেছে—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"—পরিদৃশ্যমান চঞ্চলতার যাহা রঙ্গপীঠ। কিন্তু এই জিনিষটা কি, তাহা লইয়া ভারতীয় দর্শনকারদের মধ্যে বহু মতভেদ বা অনুভবের স্তরভেদ রহিয়াছে। এই স্তরগুলির বিবৃতির উপলক্ষ্যে আমরা জগতের এক একটা সার্ব্বভৌম সত্যের সন্ধান পাই এবং সেই সত্যের সহিত অন্বিত করিয়া পরমসত্যের পরোক্ষ জ্ঞান আমাদের বুদ্ধিতে স্ফুরিত হয়। ইহাই তটস্থ-লক্ষণের মহিমা।

প্রথমতঃ জানিয়াছি, "সৃষ্টি হইতে স্রষ্টা বোঝা যায়"—এই এক জাগতিক মহাসত্য। পাশ্চাত্য Evolution of the idea of God-এর খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারাও জানেন, এই কথাটাই তাহার মূল ভিত্তি।

সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার সম্পর্ক হইতেই পাই কারণবাদ। এই কারণের মহা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণই সাংখ্য—উহাতেই পাই অব্যক্তের কথা। অব্যক্তের রহস্য জগতের আর একটা মহাসত্য বা Great Principle।

অব্যক্তকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মাঝে পাই চেতনার স্পন্দন; অবশ্য ইহা সাংখ্যের বিশ্লেষণাত্মক (analytic) মত নয়, বেদান্তের বা ভাগবতের সংশ্লেষাণাত্মক (synthetic) মত। তাহাতে তটস্থ-লক্ষণটী এইরূপে পল্লবিত হইয়া দাঁড়ায়—চেতনাযুক্ত অব্যক্তই জগদ্ব্যাপারের প্রকৃতি বা প্রসূতি; এই প্রকৃতির সত্তা যে মহাসত্যের কুক্ষিগত, তিনিই পরম সত্য।

কিন্তু অব্যক্তকে শুধু চেতনাযুক্ত বলিলেই সব বলা শেষ হইয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চেতনাযুক্ত অব্যক্তই শক্তি; উপনিষদ যাহাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—**প্রাণ** এব ইদং সর্ব্বং, **প্রাণো** হ বৈ জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ। ইহার মাঝে ব্যষ্টি-সমষ্টি দুই ভাব রহিয়াছে। শক্তির বা প্রাণের ব্যষ্টি স্ফুরণ জীব;

তাহার সমষ্টি স্ফুরণ অপরব্রহ্ম বা মায়া। "চেতনাযুক্ত কারণ বা অব্যক্ত" বলিলে উহা ব্যষ্টিকে বুঝাইতেছে, কিম্বা সমষ্টিকে বুঝাইতেছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। আবার এই ব্যষ্টি ও সমষ্টির মাঝে যে সম্পর্ক, তাহা গণিতের সম্পর্কও নয়। বলা যাইতে পারে, এই সম্পর্ক অনির্ব্বচনীয়। যাহা অখণ্ড, তাহার স্বরূপ এক প্রকার; আবার সেই বস্তুই খণ্ডিত হইলে একেবারে বিরোধী গুণের উদ্ভব হয়। যাহা অখণ্ড, তাহাতে আছে শুধু পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ আনন্দ; সেই অখণ্ড সত্তারই খণ্ডিত বিলাসে আবার জাগিয়া উঠে, আলো-আঁধার, সুখ-দুঃখ, হিংসা প্রেম, জীবণ-মরণ ইত্যাদি কত কিছু! তাই বলিতেছিলাম, ব্যষ্টি আর সমষ্টির দার্শনিক সম্বন্ধ গণিতের সংখ্যাযোজনা মাত্র নয়, উহা অনির্ব্বচনীয়।

এই অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধতত্ত্বের একটী বিশেষ প্রকাশ "অভিজ্ঞ অব্যক্তে"র স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তিমত্তায়। ব্যষ্টি "অভিজ্ঞ অব্যক্ত" জীবমাত্র—তাহারও বৌদ্ধ চেতনাতে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে, সেও এক অপরূপ সত্য; কিন্তু ইহা হইল প্রত্যক্ দৃষ্টির কথা। সমষ্টি "অভিজ্ঞ অব্যক্ত" হইতেছেন **স্বরাট্** —তিনি পরমেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বতোভাস্বর; তাঁহা হইতেই জগতেরও সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে; ইহা পরাক্ দৃষ্টি।

এইরূপে পরমসত্যের তটস্থ লক্ষণে আমরা আর একটা পরিচায়ক বিশেষণ পাইলাম—**স্বরাট্**—শ্রীধর যাহাকে বলিতেছেন, স্বেনৈব রাজতে, স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ। আবার জগতের দিক দিয়াও আমরা আর একটী মহাসত্যের সন্ধান পাইলাম, এই জগতের মূলে রহিয়াছে স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাশক্তির প্রস্রবণ; তাহাকে ইংরাজী করিয়া Natureই বল আর Cosmic Energyই বল, যাই বল না কেন।

৪। তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।

পরম সত্যের এই আর একটি লক্ষণ—মনীষীরা যাহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন না, সেই ব্রহ্ম-তত্ত্ব হৃদয়-স্পন্দন দ্বারা আদি-কবিতে যিনি সঞ্চারিত করিলেন।

এই লক্ষণটীতে আরও একটী গভীর কথা প্রকট হইয়া পড়িল—উহা গুরুতত্ত্ব। তাহা বুঝাইয়া বলিবার পূর্ব্বে লক্ষণস্থিত কয়েকটী কথার একটু বিবৃতি প্রয়োজন।

"অভিজ্ঞ এবং স্বরাট্ অব্যক্ত" অথবা নিখিলজ্ঞান এবং স্বতঃসিদ্ধ শক্তিসম্পন্ন যে বিশ্বের কারণতত্ত্ব, তিনি কি পুরুষবিধ?—ইহাই আমাদের প্রশ্ন। একবার সংশয় হইয়াছিল, তিনি কি জীবের মত? ব্যষ্টি-সমষ্টির রহস্য মীমাংসার ছলে আমরা এই সংশয় নিরসন করিয়াছি। জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি, পরাধীন, সে কখনও স্বরাট্ হইতে পারে না। কিন্তু জীবে যে পুরুষের বিভাব প্রকটিত, তাহার একটা নিদান তো খুঁজিয়া দেখিতে হইবে? বিশ্লেষণদৃষ্টিতে (analytic view) জীবকে আমরা বলিয়াছিলাম, সে অব্যক্ত প্রত্যক্‌চেতনা (fundamental individual consciousness); কিন্তু সংশ্লেষণদৃষ্টিতে (synthetic view) তাহার মাঝে পাই এই দার্শনিক চুলচেরা ভাবেরও অতিরিক্ত একটা রসায়ন, যাহাকে আমরা বলি "পুরুষবিধত্ব" (Personality)। মোটকথা জীব শুধু তত্ত্ব নয়, সে একটা সংঘাত। যেমন বৈজ্ঞানিকের লেবরটরীতে দেখা যায়, পৃথক পৃথক অণুসমূহের মাঝে তাড়িৎশক্তির পরিচালনা দ্বারা তাহাদিগকে একেবারে গলাইয়া-মিশাইয়া একটী যুগ্মবস্তু বা Compound সৃষ্টি হয়, তেমনি জগতেও একটা রাসায়নিক শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে; তাহাকে

উপনিষদ বলেন প্রাণ; সাধারণে "ভাব" বলিতেও তাহার কতকটা আভাস পায়। এই ভাব বা প্রাণের রসায়নে পুরুষবিধত্ব বা personalityর উদ্ভব। ব্যষ্টিজীবে ইহাই ব্যক্তিত্ব। ইহার যে সমষ্টিগত অমূর্ত্ত বিগ্রহ, তাহাই হিরণ্যগর্ভ, ভাগবত যাঁহাকে বলিতেছেন আদিকবি। বেদ বলিতেছেন—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ"—তিনি আদিতে আবির্ভূত পুরুষ। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের যে ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি, তাহার সহায়ে নিরূপণ করিতে গেলে ইহাঁকে বলিতে হয়, ইনি ব্রহ্মের সূক্ষ্মবিভাব। ঈশ্বরত্ব বা মহাশক্তিমত্তা তাঁহার কারণ বিভাব; আর এই জগতের বীজীভূত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবঘন স্ফুরণোন্মুখ-বিগ্রহ হিরণ্যগর্ভ তাঁহার সূক্ষ্মপ্রকাশ। ইহাঁকে cosmic mind বা universal ideation ইত্যাদি বলিলে কতকটা তাঁহার ধারণা হইতে পারে। দার্শনিকেরা যে anthropomorphic view of Godএর কথা বলেন, তাহার মূলে এই বৈদিক হিরণ্যগর্ভের প্রেরণা বা Projection।

এই হিরণ্যগর্ভের যে জ্ঞান, তাহাই হিন্দুর বেদ। এই বেদ সূক্ষ্ম ভাবস্পন্দন মাত্র। বেদপ্রবক্তা যিনি, তিনিই গুরু। বেদানুশাসিত জীবন শুধু একটা বিধি-নিষেধের জটপাকানো নয়; তাহার অর্থ, এই হিরণ্যগর্ভে প্রথমানুভূত যে বিশ্বস্পন্দন, তাহারই ছন্দে ব্যষ্টির জীবনকে স্পন্দিত করা। এই স্পন্দন-রহস্য যিনি জানেন এবং নিজকে স্পন্দিত করিয়া অপরের মাঝে সেই স্পন্দন সঞ্চারিত করিতে পারেন, তিনিই গুরু। গুরুও স্রষ্টা, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি সূক্ষ্মতর। স্পন্দনরহস্য, ছন্দোরহস্য জানেন বলিয়া হিরণ্যগর্ভ কবি, গুরুও কবি। কিন্তু গুরু হিরণ্যগর্ভ অপেক্ষাও গুরুতর। সেই কথাটাই এই তটস্থলক্ষণে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞান আর জগৎজ্ঞান একই কথার এ পিঠ আর ও পিঠ। জৈববুদ্ধির কাছে এই পরিভাষার একটা সার্থকতা আছে, কিন্তু পূর্ণব্রহ্মের কাছে ইহা নিরর্থক। নিজের মাঝে জগৎকে যে যতটুকু উপলব্ধি করিতে পারে, সে জগৎ হইতে ততটুকু উর্দ্ধে আসীন (বা উদাসীন) হইতে পারে; জ্ঞেয় জগতের চেয়ে তার গুরুত্ব সেই পরিমানে বেশী। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভাব বা scheme or ideation যাঁহাতে আদি-প্রকট হইয়াছে, তিনি হিরণ্যগর্ভ, তিনি প্রকট-জগতের মাঝে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। অনেক উপাসকের কাছে, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই অবধি, তিনিই জগদ্‌গুরু। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, হিরণ্যগর্ভ পরম সত্যের মনন মাত্র —তাঁহার সূক্ষ্মবিভাব; সাংখ্যের ভাষার আশ্রয় লইয়া বলিতে পারি, তাঁহার বিশ্বাত্মিকা বুদ্ধি। তত্ত্বসমূহকে প্রাণের রসায়নে মিশাইয়া এই আদিপুরুষের প্রকাশ। কিন্তু তাহার উর্দ্ধেও রহিয়াছে কারণতত্ত্ব বা ব্রহ্মের আনন্দঘনবিগ্রহ—"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" তাহাও বিধৃত রহিয়াছে ব্রহ্মের স্বরূপে। অতএব পূর্ণব্রহ্মের দৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভের যে জ্ঞান, তাহা স্বতঃসিদ্ধ নয়, পরব্রহ্ম হইতে সঞ্চারিত। পরব্রহ্মই একমাত্র গুরু, তিনি জগদ্‌গুরু, হিরণ্যগর্ভেরও গুরু। তাঁহার হৃদয়ের অব্যক্ত স্পন্দনই হিরণ্যগর্ভে রূপ ধারণ করিয়াছে। যেমন পিতৃবীজে পুত্রের অবয়ব প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমনি হিরণ্যগর্ভে জগতের অবয়ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; কিন্তু তথাপি বীজ হইতে পিতা স্বতন্ত্র, এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে।

এই যে বেদসঞ্চারতত্ত্ব বা গুরু-শিষ্যপরম্পরা অব্যাহত রাখিবার ধারা, ইহা জগতের এক মহারহস্য, যাহার কথায় ভাগবত বলিতেছেন "যৎ মুহ্যন্তি সূরয়ঃ" —যে তত্ত্বে পণ্ডিতদেরও মাথা ঘুলাইয়া যায়। এই ধরণের কথা উপনিষদে যত্র তত্র—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য" ইত্যাদি। শঙ্করাচার্য্য এই বেদসঞ্চরণপ্রণালী সম্বন্ধে একটী বড় সুন্দর কথা বলিয়াছেন, "কি

আশ্চর্য্য! বটতরুর মূলে গুরু বসিয়া আছেন, তিনি চিরতরুণ; আর শিষ্যেরা তাঁহাকে বেড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা বৃদ্ধ, পরম প্রবীণ। গুরু চুপ করিয়া থাকিয়া উপদেশ দিতেছেন, আর তাহাতেই শিষ্যের সংশয় ছিন্ন হইয়া যাইতেছে!" কথা কয়টী গভীর ভাবুকের কথা বটে।

মোট কথা, পরম সত্যের এই তটস্থ লক্ষণ হইতে আমরা জগতের আর একটী মহাসত্যের সন্ধান পাইলাম—এই গুরুরূপী পরম সত্য হইতেই জগতের পরম্পরাক্রমে হিরণ্যগর্ভ বা আদিকবিকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানের জাহ্নবীধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত জীবের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতেছে—যে সঞ্চরণের রহস্য পাণ্ডিত্যবুদ্ধির অগম্য।

৫। তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা।

এই আর একটী তটস্থ লক্ষণ। অর্থ এই—আলোক, জল এবং মৃত্তিকার যেরূপ পরস্পর বিনিময় ঘটিয়া থাকে, (অথচ অধিষ্ঠানের দৃষ্টিতে এই সমস্ত প্রতিভাস বাস্তবিক মিথ্যা), সেইরূপে যাঁহাতে তিনের সৃষ্টি মিথ্যা, তিনিই পরম সত্য।

তিনের সৃষ্টি কি? শ্রীধর বলেন তিনটী মায়াগুণের কথা, সাংখ্য যাহাদিগকে বলেন. সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ; অথবা যাহাদিগকে বলা যাইতে পারে, ভূত, ইন্দ্রিয় এবং দেবতা। এইগুলি জগদ্রূপের দার্শনিক ব্যাখ্যা। ত্রিগুণের কথা সকলেই জানেন। তবে এই ত্রিগুণ সম্বন্ধে দুইটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। একটী কথা এই যে ত্রিগুণ পরস্পরসাপেক্ষ, উহারা বিশ্লিষ্ট সত্তা নয় (organic whole). দ্বিতীয় কথা এই, সাংখ্যের প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ ত্রিগুণের organic totalityই প্রকৃতি। এই দুইটী কথা স্মরণে থাকিলে সাংখ্যের বিশ্লেষণমূলক বিচার হইতে বেদান্তের সংশ্লেষণমূলক বিচারে পৌছান যাইতে পারে, এবং মায়াবাদের বীজও ইহা হইতে নিষ্কাসিত হইতে পারে।

ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা—ইহারা ত্রিগুণেরই দৃষ্টরূপ। কথাটা বিষয়-বিষয়ীর দিক হইতে বা প্রত্যকচেতনার তরফ হইতে। একটা ফুল দেখিলাম; ইহার মূলে তিনটী কথা আছে। প্রথম, বিষয় ফুল; ইহাই ভূত। দ্বিতীয়তঃ এই ফুলের রূপদ্বারাই উত্তেজিত আমার রূপদর্শনানুকূল ইন্দ্রিয়শক্তির স্ফূর্ত্তি; ইহাই ইন্দ্রিয় বা রজোগুণের ক্রিয়া। তৃতীয়তঃ রূপানুভব বা চিত্তের সাত্ত্বিক পরিণাম; ইহাই দেবতা। যখন বিষয়বিষয়ী ভাব বর্ত্তমান, তখন মূল একই এইরূপে তিন ভাগে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু অখণ্ড জ্ঞানে এই তিন থাকে না। কি থাকে? সাংখ্য বলেন, **কেবল জ্ঞান** থাকে, জ্ঞেয় থাকে না। তাই প্রত্যক্ দৃষ্টিতেও তিনের সৃষ্টি অধিষ্ঠানের অপেক্ষায় মিথ্যা।

মূল কথাটা হইতেছে এই—একটা পরিণামের ক্রিয়া চলিতেছে, উহাই সমষ্টিভাবে সত্ত্বরজস্তমের খেলা বা ব্যষ্টিভাবে ভূত-ইন্দ্রিয়-দেবতার প্রকাশ। পরিণামের চক্রে বাঁধা থাক তো ইহাকেই সত্য বলিয়া মনে হইবে, হয়ও আমাদের তাই। কিন্তু কথা এই, কেন এই পরিণামের ক্রিয়া হয়? ভাগবত বলিবেন, তাঁহার ইচ্ছায় বা লীলায়। বৈরাগী সাংখ্য বলিবেন, প্রকৃতির পারার্থ্য বশতঃ। মোট কথা, এই পরিণামের মূলেও একজনকে স্বীকার করিতে হইতেছে - যিনি জড় নন, কিন্তু প্রবর্ত্তক। তিনিই পরম সত্য।

তিনি যদি পরম সত্য, তাহা হইলে এই আপেক্ষিক সত্যগুলি অর্থাৎ পরিণাম জগতের সত্যগুলি মিথ্যা।

ভাগবত বলিতেছেন, মিথ্যা বটে, কিন্তু নাস্তি নয়, পুরাপুরি অস্তিও নয়, সে এক মজার মিথ্যা। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি, আলো, জল, ও মৃত্তিকার বিকারের কথা। আলো স্বচ্ছ, জল অনতি-স্বচ্ছ, মৃত্তিকা কোথায়ও স্বচ্ছ যেমন কাচ, কোথায়ও বা অস্বচ্ছ যেমন অন্যত্র। অর্থাৎ এই তিনের মাঝে স্বচ্ছতার একটা তারতম্য আছে। ত্রিগুণের মতই নয় কি? আবার ইহাদের মাঝে ওলট-পালটও হয়। যেমন শ্রীধর বলিতেছেন, মরীচিকাতে দেখ, আলোটাই জল বলিয়া মনে হইতেছে; আবার কাচটা জল বলিয়া মনে হয়, জলটা কখনও কাচ বলিয়া মনে হয় ইত্যাদি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা ভুল হয়; কিন্তু অধিষ্ঠান তত্ত্ব জানিলে ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। পরম সত্যকে অধিষ্ঠান করিয়াও জগৎ জুড়িয়া এইরূপ আপেক্ষিক সত্যের তারতম্যের বাহারে কত বিচিত্র মায়ার ফুল ফুটিতেছে। এর সবই মিথ্যা, কিন্তু যিনি ইহার মূলে, তিনিই পরম সত্য।

আবার এমনও বলা হয়, এই যে তিনের খেলা, ইহা মৃষা বা মিথ্যা নয়, ইহা অমৃষা বা সত্য। তবে কিনা সে সত্য পরম সত্যেরই প্রতিফলন। আসলে কথাটা একই; কিন্তু জগতের সত্যতা সম্বন্ধে ইহাতে দুইটা পক্ষ উপস্থিত হয় মাত্র।

৬। ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকম্।

এইটী শেষ তটস্থ লক্ষণ। যিনি নিজের তেজদ্বারা সমস্ত কুহককে নিরস্ত করিতেছেন। এটী আশার কথা, সাধনার কথা। কুহক সর্ব্বত্র। জীব জিজ্ঞাসু না হইলে এই কুহকের জ্বালা বুঝিতে পারে না। জিজ্ঞাসু সাধকের চক্ষে তোমাদের প্রমোদরজনীর এত রোশনাইও যে একেবারে কালো! তাই সে হাঁপাইয়া উঠে। কোথায় আলো পাইবে, সে বুঝিতে পারে না। লোকে বলে, বেশ নিশ্চিন্ত আয়েসের সহিতই বলে, নারায়ণ তোমার মাঝে। বাস্তবিক নারায়ণ যাহার মাঝে জাগিয়া উঠিতেছেন, সে জানে, শুধু কথায় কিছু হয় না। কোথায় আমার মাঝে নারায়ণ? কে দেখাইয়া দিবে? সংশয়জাল কে ছিন্ন করিবে? এই আকুলিবিকুলির মাঝেই কোথা হইতে আলো আসিয়া সাধকের হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া তোলে! কাহার আলো এ?—বিগলিতচিত্তে, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে সাধক বলে—তাঁর! এই তো গুরুরূপে তিনি, অজ্ঞানতিমিরের অপহারক- -পরং সত্যম্!

এই পরং সত্যমই ভাগবতের দেবতা। তিনিই ব্রহ্মরূপে সচ্চিদানন্দময়, আত্মারূপে সচ্চিদানন্দঘন, ভগবান্‌রূপে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ।

সত্যং পরং ধীমহি—তাঁহাকেই আমরা ধ্যান করি।



শিক্ষা-প্রসঙ্গে

শারীরিক শিক্ষা—যৌনবিজ্ঞান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—○:*:○—

ইতিপূর্ব্বে এই বিষয় নিয়ে আমরা যে আলোচনা করেছি, পাঠক যদি মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করে থাকেন, তাহলে অল্প বয়স হতেই যৌন-বিজ্ঞানও যে ছেলেমেয়েদের একটা অতি সন্তর্পণ অথচ অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এখন কথা হচ্ছে, কি উপায়ে ছেলেমেয়েদের এই শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, এ বিষয়ে জননীই প্রধান শিক্ষয়িত্রী। কৈশোর কাল পর্য্যন্ত মায়ের সঙ্গে ছেলের একটা স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতা থাকেই। ভবিষ্যৎ জীবনে ছেলের যে সমস্ত শিক্ষা কার্য্যকরী হবে, তারও হাতেখড়ি এই সময়টার মাঝে মায়ের কাছে হওয়াই দরকার। এই প্রসঙ্গে ছেলেকে যৌন বিজ্ঞান সম্পর্কিত শিক্ষা দেওয়াও মায়েরই দায়িত্ব।

এই শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে একটা সঙ্কোচের ভাব আমাদের মজ্জাগত। কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনায় এই সঙ্কোচ কেটে যায়। যে ব্যাপার একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মাঝে আবদ্ধ, তাই সঙ্কোচের নিদান হতে পারে, কিন্তু তাকে যখন আমরা বৃহত্তর পরিসরের মাঝে নির্ম্মুক্ত দেখি, তখন আর তার সম্বন্ধে কোনও সঙ্কোচ অনুভব করি না। এই শিক্ষা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা যেতে পারে।

যৌন বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে তিনটী ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—প্রথমত শরীর-সংস্থান সম্পর্কিত (anatomical and physiological) দ্বিতীয়তঃ জীববিজ্ঞান ঘটিত (biological); তৃতীয়তঃ প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা (prohibitive measures)।

প্রথমতঃ, শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা খুবই অজ্ঞ। শরীরের সমস্ত যন্ত্রপাতির বিবরণগুলি পারিভাষিক সংজ্ঞাবর্জ্জিত করে বেশ সহজ বাংলায় স্ত্রীলোকদের এবং ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে এ পর্য্যন্ত বোধ হয় প্রকাশ হয় নি। অথচ বাংলার শিশুসাহিত্যে যে ঝুরি ঝুরি ডাইনী-পরীর গল্প বেরুচ্ছে, সে সবের কষ্টকল্পনার চেয়ে এই বিবরণ বোধ হয় চিত্তাকর্ষকই হত। ইংরেজীতে এ সম্বন্ধে পুথি-পত্রের অভাব নাই। যেমন করেই হোক, শারীরবিধান সম্বন্ধে একটা মোটামুটি অথচ কার্য্যকরী জ্ঞান প্রত্যেক মায়েরই থাকা উচিত। আহার-বিহার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির উপলক্ষ্যে মা ছেলেকে দেহের বিজ্ঞানগুলিও শেখাবেন। উদাহরণস্বরূপ বল্‌তে পারা যায়, ছেলে হয়ত দাঁত মাজতে চাইছে না; মা তাঁকে দাঁত মাজ্‌তে বাধ্য তো করবেনই, উপরন্তু দাঁতের প্রকৃতি, তার গঠন, তার উপাদান, ভুক্ত দ্রব্যের সম্পর্কে এসে তার যে সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়া হয় ইত্যাদি কথাও গল্পচ্ছলে তাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। এমনি করে ছেলে-পিলের মনে একটা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জাগিয়ে দেওয়া মায়ের প্রথম কর্ত্তব্য। যে সমস্ত যন্ত্রপাতিগুলি আমরা বাইরে দেখতে পাই এবং নিত্য ব্যবহারে লাগাই, সেগুলির জ্ঞান আগে দিতে হবে; তারপর যে সমস্ত আভ্যন্তরীণ শারীর ক্রিয়া নিত্য চল্‌ছে, তার দিকে

ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে হবে ; অসুখ-বিসুখ দৈব-দুর্ঘটনা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে যে সমস্ত শারীরিক বিকার তাদের ঘটে, সেই সম্পর্কেও তাদের অনেক কিছু জানানো যেতে পারে। এমনি করে একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার আব হাওয়া সৃষ্টি করতে পারলে শারীরিক নিগূঢ়তর যন্ত্রাদির ক্রিয়া কিম্বা ভাবী পরিণাম সম্বন্ধে কোনও আলোচনা তাদের হঠাৎ চমক্ লাগিয়ে দেবে না।

অনেক বিলাতী শারীর-বিজ্ঞানের পুস্তকেও এ সম্বন্ধে বেজায় অতিরিক্ত সাবধানতা দেখতে পাওয়া যায়। হয়ত শরীরসংস্থানের সমস্ত কথাই তাতে বিস্তৃত করে বলা হয়েছে ; কিন্তু প্রজনন যন্ত্র সম্বন্ধে কোনও আভাস-মাত্র তাতে নাই। গ্রন্থকর্ত্তার হয়ত ধারণা যে ব্যাপারটা তা হলে অশ্লীল হবে। কিন্তু এই যে বিশেষভাবে একটা কথাকেই চেপে গিয়ে তাকে আরও পাকাপাকি রকমে প্রকাশ করে দেওয়া হল, এইটাকেই তো আমি মনে করি আরও বেশী অশ্লীল এবং মারাত্মক। Stopes দুঃখ করে বলেছিলেন, What a pity ! Even the great Huxley did not dare to disclose these things. Stopes তাঁর স্ব-রচিত The Human body and its Functionsএ এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এবিষয়ে Hæckelএর Evolution of man একখানা অতি চমৎকার বই। তবে কিনা বইখানা বৈজ্ঞানিকের লেখা বলে পরিভাষার কটমট একটু বেশী ; কিন্তু তাঁর বল্‌বার কায়দা এবং বিষয়সজ্জার ভঙ্গীটী অতুলনীয়। যাঁরা এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু, তাঁরা ওপরের বই দুখানি থেকে একটা মোটামুটী শিক্ষণোপযোগী জ্ঞান সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

অনেকে মনে করতে পারেন, শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধুরন্ধর পণ্ডিত না হলে বোধ হয় শিশুর মনে ওই রকম একটা পূর্ণাবয়ব বৈজ্ঞানিক আব-হাওয়া সৃষ্টি করা খুবই শক্ত। আমার কিন্তু মোটেই তা মনে হয় না। প্রথম কথাই হচ্ছে, আমরা জানাতে চাই সুস্থ দেহের বিজ্ঞান, রোগের নিদান নয়। সে বিজ্ঞান এমন কিছু অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত নয়। আমার বিশ্বাস দু'শ পৃষ্ঠায় একখানা বইয়ের মাঝে সমস্ত কথা মায়েদের বুঝবার উপযোগী করে সাজিয়ে লেখা যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই তরফ থেকে কোনও প্রচেষ্টা বোধ হয় এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে হয় নি।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, জীববিজ্ঞানঘটিত শিক্ষা। প্রজনন-রহস্য এরই অন্তর্গত আর যৌন-বিজ্ঞানের এইটাই হল সব চেয়ে গুরুতর অংশ। প্রজনন-রহস্য কি করে ছেলেদের শেখানো যেতে পারে, সে এক অতি সুকুমার সমস্যা। বিশেষজ্ঞেরা তুলনামূলক আলোচনার (Comparative Study) কথা বলেন। আমরাও দেখেছি, এই পদ্ধতিই সবচেয়ে নিরাপদ এবং কার্য্যকরী। এককোষ প্রাণী হতে আরম্ভ করে মানুষ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর প্রজননের ইতিহাস পরম্পর তুলনা করে আলোচনা করলে স্রষ্টার সৃষ্টি-কৌশলের মহিমা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। এই যে মহিমজ্ঞান এবং বিস্ময়—এইটুকুই হচ্ছে কাম-বিষের ধন্বন্তরী। প্রজনন-ব্যাপার যে মহিমময়, বিস্ময়কর এবং পবিত্র—এই ভাবটি ছেলে-মেয়েদের মনে সঞ্চারিত করতে হবে এবং তাদের এই উন্নত ভূমিকায় রেখে এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে।

Sexologistদের মতে ছেলেদের পাঠ্যপঞ্জীর মাঝে উদ্ভিদবিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করলে যৌন-বিজ্ঞান শেখানোর পক্ষে একটা সুরাহা হয়। কি করে ফুলে ফল ধরে, তার ইতিহাস মানুষের জন্মরহস্যের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। উদ্ভিদকে দৃষ্টান্তস্থল করে মানুষের

প্রজনন-রহস্য সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে ও নির্ব্বিবাদে আলোচনা করা যেতে পারে। তা ছাড়া মাছের জন্মরহস্যও এ বিষয়ে একটা দিগ্‌দর্শনীর কাজ করে থাকে। জীববিজ্ঞানের একেবারে আদি স্তরে, আমিবা, প্রোটোজোয়া প্রভৃতির বংশবিস্তার প্রণালী যেমন আশ্চর্য্যজনক, তেমনি শিক্ষাপ্রদও বটে; এমন কি একটু তলিয়ে দেখলে তার মাঝে হিন্দুর অনেক বড় বড় দার্শনিক তত্ত্বের সমর্থন ও উদাহরণও পাওয়া যাবে। এইগুলোর আলোচনায় জন্মরহস্য সম্বন্ধে মনে একটা নির্ব্বিকার, উদার ও বৈজ্ঞানিক আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি হবে এবং যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়াও সহজ-সাধ্য হবে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যৌন-বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে বিদেশী অনেক বইই আছে। তার মাঝে Dr. Stopesর Mother, how was I born? নামের বইখানাই বোধ হয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট।"What a young boy ought to know" বলে একখানা বই আছে। বহুদিন পূর্ব্বে "গুপ্ততত্ত্ব" নাম দিয়ে ক্রিশ্চিয়ান লিটারেচার সোসাইটী বাংলায় তার একটী প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। বইখানা আজকালও পাওয়া যায় কিনা বল্‌তে পারি না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সোসাইটীর কলকাতার আফিসে খোঁজ করে দেখতে পারেন। এই বইখানাও অতি চমৎকার। কতকগুলি পত্রের আকারে বালককে শিক্ষক যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন। বইখানার বাংলা সংস্করণ যদি আজও সুলভ থাকে তো প্রত্যেক জননীরই এখানি পড়ে দেখা এবং ছেলেমেয়েদের পড়ানো উচিত।

যৌন-সংযমের উপদেশ অনেকক্ষেত্রেই বিফল হবে, যদি নাকি তার বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা ছেলে-মেয়েদের অন্ধ রাখি। তবে এ কথা আগেও বলেছি, অনেক ছেলে এমন আছে, যারা এ বিষয়ে বড় বিশেষ মনঃসংযোগ করতে চায় না, যুবক বয়সে যাদের undersexeb হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু এর বিপরীত মনোবৃত্তিবিশিষ্ট ছেলেরই সংখ্যা বেশী, এই কথা মনে করে এ বিষয়ে চুপ থাকা অভিভাবকের কর্ত্তব্য নয়।

যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত বিলাতী বই আছে, তার সম্পর্কে একটা মোটামুটী সতর্কীকরণ প্রয়োজন, সেটাও এখানে বলে রাখছি। Sex-instinct সম্বন্ধে শুধু personal equation নয়, একটা racial equationএর questionও আছে, সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছিলেন, Indo-aryan stockএর যৌন সংযম সম্বন্ধে এমন একটা স্বাভাবিক মজ্জাগত ধারণা আছে, যা Indo-European stockএর কাছে দুর্লভ। যে যৌন ব্যভিচার আমাদের মাঝে লোমহর্ষণ, তা অনেক সময় তাদের কাছে "বিশেষ কিছুই নয়।" এর ভাল-মন্দ বিচার আলাদা কথা, কিন্তু কথাটা যে মূলতঃ সত্য, সেটা মনে রাখতে হবে। এই জাতীয় মনোবৃত্তির ফলে দেখতে পাই, বিলাতী যৌনতত্ত্ববিদ্‌রা Sex-instinctএর স্থূল দিকটার ওপর অত্যন্ত ঝোঁক দিচ্ছেন; তার ফলেই আমাদের দেশেও যান্ত্রিক Contraceptionএর ধূয়া শিক্ষিতসমাজে এত প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে। আমরা যে Sex-instinctকে অস্বীকার করছি, তা নয়, কিন্তু তার সূক্ষ্ম ও উন্নততর বিভাবের দিকেই ঝোঁক দিয়েছি বেশী; তাই দৈহিক সংযমকে নব্যতন্ত্রীরা যতটা প্রাণান্তকর মনে করেন, আমাদের কাছে তা ততটা প্রাণান্তকর নয়। Platonic Love ওদেশে উপহাসের বস্তু; কিন্তু আমাদের কাছে ওইটাই হল আধ্যাত্মিক বিকাশের রঙ্গপীঠ।

দুটী জাতির মনোভাবের এই যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু, এইটুকু যে আমরা বিদেশী শিক্ষার মোহে দিন দিন ভুল্‌তে বসেছি, এইটাই ভয়ের কথা। এই কথাগুলো

এখানে বলে রাখছি এই জন্য যে, যদি কোনও অভিভাবক এ সমস্ত বিষয়ের চর্চ্চা উপলক্ষ্যে বিদেশী কেতাব পড়েন, তাহলে তারা যা কিছু বল্‌ছে, তা থেকে যেন সতর্ক হয়ে নীরটুকু বর্জ্জন করে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করেন। তারা যা বল্‌ছে, তা মিথ্যে নয়, তাদের পক্ষে তাই normal ; কিন্তু আমাদের দেশে তাই হয়ত abnormal। সুতরাং শিক্ষা দেবার বেলাতেও হুঁশিয়ার হতে হবে—আমরা যেন বিলাতী মনোভাবের আওতায় পড়ে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যটুকুকে ঠুঁটো করে না ফেলি।

তৃতীয় কথা হচ্ছে প্রতিষেধমূলক বিধিব্যবস্থা (prohibitive measures)। এ সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের নিষেধ কর্‌বার অনেক বিষয়ই রয়েছে, তা নিয়ে খুঁটিনাটী আলোচনা করা এখানে প্রয়োজন মনে করি না। এতক্ষণ যে কথাগুলো বলে এলাম, যদি কেউ তা মনোযোগসহকারে পাঠ করে থাকেন তো তিনি নিজে থেকেই বুঝতে পার্‌বেন—কোন্ ক্ষেত্রে কতটুকু সতর্কতা বা বিধি-নিষেধ প্রয়োজন। তা ছাড়া যৌন-সংযম সম্পর্কিত বইএরও আমাদের দেশে অভাব নাই। তা থেকেও প্রতিষেধের ধারাগুলো বিবেচনাপূর্ব্বক বেছে নেওয়া যেতে পারে। আমি শুধু একটা বিষয়ের দিকে অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ছি।

আমাদের দেশের মেয়েরা লজ্জাশীলা বলে খ্যাতি আছে। পুরুষ সম্পর্কে তাঁরা অত্যন্ত লজ্জাশীলা, তা শতবার স্বীকার করতেও আপত্তি নাই, কিন্তু নিজেদের মাঝে, বিশেষতঃ সখীসমাজে তাঁদের লজ্জার বড় একটা বালাই নাই। এ সময় তাঁরা এতটা বে-আব্রু হয়ে পড়েন, এমন সমস্ত আলোচনা ও রসিকতা অসঙ্কোচে করে যান, যা শুন্‌লে আমাদেরও লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। এই সমস্ত আলোচনা আরো মারাত্মক হয়ে ওঠে, যখন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সাম্‌নেও তাঁরা কোনওরকম আব্রু রাখেন না। কুললক্ষ্মীরা হয়ত মনে করেন, ও কচি ছেলে, কিছুই বুঝতে পার্‌ছে না ; কিন্তু সেটা একটা মহা ভুল। ছেলে কিছু বুঝতে পারে না বটে, কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি বলে তো একটা জিনিষ আছে। ওই অত্যন্ত ইতর আলোচনা, অশ্লীল হাস্যপরিহাস তার স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা থাকে ; তারপর উপযুক্ত সময়ে তা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ছেলেমেয়েদের নিভৃত চিন্তার উপাদান যুগিয়ে তাদের সর্ব্বনাশ করে। বিশেষতঃ ছোটদের মস্তিষ্কে অতি সহজেই একটা ছাপ ধরে যায়। সুতরাং যা তারা আজ ধারণা কর্‌তে পার্‌ছে না, রোমন্থক প্রাণীর মত দু-চার বছর পরে তার জাবর কাটা তাদের পক্ষে একটু বিচিত্র নয়। এই তরফ থেকে মায়েদের অত্যন্ত সাবধান হওয়া প্রয়োজন। (ক্রমশঃ)

দীক্ষার মন্ত্র

—*—

সবই যেমন তেমনটাই থাকবে, শুধু তোমার দেখবার পন্থাটা বদ্‌লে ফেল্‌তে হবে। ইদং সর্ব্বং—এ তো আছেই, কিন্তু তোমায় দেখতে হবে ঈশা বাস্যং—ঈশ্বরই সকলকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন। এখানেই আত্ম-সাধনার গোপন সঙ্কেতটী নিহিত রয়েছে। আমরা যাকে অলৌকিক শক্তি বলে আখ্যা দেই, মহাপুরুষদের সেটাই স্বভাব ; তাঁরা মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সবই দেখেন, অতিরিক্ত আরও কিছু

দেখেন ; অতিরিক্ত বল্‌লে আবার অলৌকিকত্ব এসে পড়ে, তাই বল্‌ছি, তাঁরা দেখতে পান আসল জিনিষটী। সাধনার প্রভাবে যত কিছু আবরণ উন্মোচিত হয়ে, তাঁদের নজরে পরে খাঁটী জিনিষটী। তাঁদের দৃষ্টি তখন এত সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ হয়ে যায়, কাল-খনির এত বড় অন্ধকার আবরণকেও অতিক্রম করে সোনার ঔজ্জ্বল্যই প্রতিভাত হয়। এক কথায় বল্‌তে গেলে, তাঁরা বিচার করেন—বিশ্লেষণ করেন অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে। ভগবান যে সর্ব্বত্র বিরাজমান, এটুকুন উপলব্ধি করার দরুণই সাধনা। দীক্ষা না হলে ঐকান্তিকতা আসে না, মনও উতলা হয় না ; তাই উপনিষদের প্রথম মন্ত্রেই আমাদের দীক্ষা হয়ে গিয়েছে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

এর চেয়ে বড় দীক্ষা আর জীবনে কি হতে পারে? আমাদের জীবন ধন্য যে আমরা মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছি, আর এ দীক্ষার অধিকারী হতে পেরেছি। ভারতের সাধনার বিশেষত্বই এখানে—তাঁরা "আরও"র অতিরিক্তের খবর জান্‌তে পেরেছিলেন। ঐক্যের খবর ভারতের মুনি-ঋষিদেরই উপলব্ধির বিষয়—তাঁরাই জান্‌তে পেরেছিলেন আত্মা এক। আত্ম-চেতনা উদ্বুদ্ধ থাকেনা বলে প্রথম প্রথম আমাদের খুব সজাগ-সতর্ক থাকতে হয়। বিবেক-জ্ঞানের প্রয়োজনও এইখানে। আত্মসত্য ধারণা না হওয়া পর্য্যন্ত এ জগৎকে আমরা সত্য বলে আঁকড়ে ধরে থাকি। যখন বিষম ফাঁকিতে পড়ি, তখনই বুঝি যাকে সত্য বলে ধারণা করেছিলাম সে তো মিথ্যা—আপেক্ষিক। বারবার প্রতারিত হয়ে, মানুষ এমন এক স্তরের অনুভূতি পেয়েছে, যা ধ্রুব-সত্য। তখন সে বলেছে, "ভগবান আছেন বলেই সব সত্য, নইলে সবই মিথ্যা।"

ঈশাবাস্যং ইদং সর্ব্বং—এই তোমার অজপা-জপ। গুরুর সান্নিধ্যে রয়েছ এ মন্ত্রের সার্থকতা উপলব্ধি করার দরুণই। এ মন্ত্রের অবিরাম স্মৃতিতে তুমি পাপকর্ম্মে লিপ্ত হতে পারবে না। পুরুষ নারীতে আকৃষ্ট হয়, নারীকে প্রলোভনীয় মূর্ত্তিতে ভাবে বলে। এ দুরন্ত রিপুর হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলেও তোমাকে ঐ মন্ত্রেরই স্মরণ কর্‌তে হবে। সত্যের মাঝে প্রলোভন নেই, আছে রূপের মাঝে ; তাই বল্‌ছি রূপের অন্তরালে গিয়ে আত্মসমাহিত হয়ে বসতে হবে তোমার। এক ফকির নাকি এক শিষ্যকে পরীক্ষা করার অভিপ্রায়ে একটা কপোত বধ করতে দিয়ে-ছিলেন। শিষ্য এসে বলেছিল, "প্রভু আমি এমন নির্জ্জন জায়গা পেলেম না যেখানে ঈশ্বর নেই ; তাই কপোত-বধ আমাদ্বারা হল না।" তুমিও যখন সয়-তানের কবলে পড়, তখন যেন শরীর শিউরে ওঠে, সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়ে যায়—ভগবান সর্ব্বত্র আছেন, এই জেনে।

মন্ত্রের সার্থকতার জন্যই তৃষিত হয়ে আমাদের অন্তরাত্মা বসে রয়েছেন। মানবের ধর্ম্মই যে তাঁকে চিন্তা করা। যে ভুলে আছে তার ভুল একদিন না একদিন ভাঙ্গবেই। এত দ্বেষ-বিদ্বেষ, চারিদিকে এত উন্মত্ততা, তবু মানুষের ধর্ম্মবোধ একেবারে লোপ পায় না। কয়দিন থেকে, আবার দ্বিগুণ উদ্দীপনা জাগে—বিল্বমঙ্গল, জগাই-মাধাই এদের চরিত্র বিশ্লে-ষণ করেই তো এর প্রমাণ পাই। ভোগই যদি চরম হত, বৈরাগ্যের অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত হয়ে মানুষের বিষয়-তৃষ্ণা কখনই বিলোপ হত না। এখনও তো কত সংসার বীতস্পৃহ সন্ন্যাসীকে দেখতে পাই—এতে কি প্রমাণ হয় না পথ আরও একটী রয়েছে?

মূলে থাকা চাই শ্রদ্ধা, শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় বল্‌তে গেলে আস্তিক্যবুদ্ধি। আমরা চোখে দেখা, কানে শোনাকেই সব চেয়ে বেশী বিশ্বাস করি। ইন্দ্রিয়ের

বাইরে শ্রদ্ধাকে জাগিয়ে রাখতে পারি না, তাই প্রত্যেকটী বস্তুকে আমরা কেবল ভোগের লোলুপতা নিয়ে দেখি—শরীরকে মনে করি স্থূল মাংসপিণ্ড। দিন-রাত কত যে দ্বন্দ্ব আর বিদ্রোহের কলরব শুন্‌তে পাচ্ছি; তবু এ কোলাহলই ভাল, এ জগৎই সত্য—জেনে শুনেও যে মানুষ কি করে এ মায়াকেই সত্য বলে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে, তাই এক রহস্য। কিন্তু আমাদের মুনি-ঋষিগণ এ অনিত্য-সংসারেই নিত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন—তাঁরা বুঝেছিলেন মূলে রয়েছে বলেই স্থূলে সব বিকশিত হয়ে ওঠেছে। রূপের চেয়ে রূপীকে তাঁরা শ্রদ্ধা করতেন বেশী—রূপকে বাদ দেওয়া যায়, কিন্তু রূপী না হলে যে আমাদের জীবনই চলে না। বিংশ শতাব্দীর কাম-কাঞ্চনের যুগে এসে যুগাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কি বাণী প্রচার করে গেলেন? তিনি বল্‌লেন, "দেখ, তোমরা যাকে সুন্দর বলে মনে করে মজে আছ, এর চেয়েও সুন্দর আরও কিছু আছে। বিশ্বাস যদি না কর আমি তাঁকে দেখিয়ে দিতে পারি।" বিবেকানন্দের মত এত বড় তার্কিকও পরাস্ত হয়ে গেলেন তাঁর কাছে এসে! এ উদ্দীপনা, সত্য-শক্তির উন্মেষ হয় কিসে?—যিনি "আরও"র ভূমার অনুসন্ধান পেয়েছেন।

চেতন-অচেতন যে অবস্থায়ই থাক না কেন, এ মন্ত্রের ক্রিয়া যেন অনবরত চল্‌তে থাকে তোমার মাঝে। ইন্দ্রিয়গুলোকে এমন ভাবে শিক্ষিত করে তোল, বিষয়ের সংস্পর্শে এলেই যেন তারা শ্লথ হয়ে যায়, তোমার লক্ষ্য না থাক্‌লেও যেন অভ্যাসবশে তারা প্রতিনিবৃত্ত হয়ে যায়। সাধারণ লোকের মাঝে যে বৃত্তির উদয় হয়ে অনর্থ ঘটায়, মহাপুরুষদের মন সে দিকে ধাবিতই হয় না—সংযম, ত্যাগের ক্রিয়া তাদের মাঝে সহজেই চল্‌তে থাকে। জীবনের মূল্যবান সময় যাতে বাজে চিন্তার প্রণালীতে প্রবাহিত না হয় তার দরুণ অভ্যাসেরও প্রয়োজন—মন যাতে সত্ত্বভূমিতে অনবরত বিচরণ করতে পারে তারই চেষ্টা করা। বুঝে হোক না বুঝে হোক, এখন শুধু জপ করে যাও—তারপর এমন একদিন আস্‌বে যখন সত্যের মহিমা আপন জীবনেই উপলব্ধি করতে পারবে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভাল-মন্দ সংস্কার জেগে ওঠে। এ সময়টাতে দেহের জ্ঞান যত কম থাকে ততই মঙ্গল। মোট কথা নিজকে সঙ্কীর্ণভাবে আবদ্ধ করে রাখলেই মরণ। অনন্তের সঙ্গে যোগ রয়েছে বলেই আমরা বেঁচে আছি, অসময়ে ডেকে আনি বলেই মরণ আমাদের কাছে বিভীষিকা, নতুবা মৃত্যু তো আমাদের প্রমোশন। আমরা সবই পেয়েছি বটে কিন্তু ব্যবহার জানি না। ওটুকু শিখবার দরুণই শরণাপন্ন হওয়া। আমরা যাঁর কাছ থেকে সব পেয়েছি তাঁকে না জানিয়েই স্বেচ্ছায় যা খুসী তা করছি। ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়, আমরা তাঁকে ছেড়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছি কিন্তু তিনি আমাদের পরিত্যাগ করেন নি কখনও—এই তো তাঁর করুণা। জটিল সমস্যার মাঝে পড়ে সহজ-সত্যটী একেবারে ভুলে যাই, নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করি বটে কিন্তু সমাধানে পৌছতে পারি না; অথচ সে সত্যের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

——:*:——

সকলেই তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমরা এ চটীতে এসে আমাদের সঙ্গী সারদা-ভায়া ও পাগলী মাকে না দেখতে পেয়ে আরও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লাম। তখন প্রবল রৌদ্র, কিন্তু সেদিকে গ্রাহ্য না করে আবার রওনা হওয়া গেল।

বড় বিজলী ১। মাইল

ক্রমে চড়াই করতে হচ্ছে। সোয়া মাইল যেয়েই বড়বিজলী চটী পেলাম। কিন্তু এই সামান্য পথ আসতে যত কষ্ট হল, সকালে অত রাস্তা চলতেও তত কষ্ট হয় নি। বড় বিজলী চটীতে পৌঁছবার পূর্ব্বেই পাহাড়ের ওপর বাঁ হাতে একটী রাস্তা গিয়েছে, সে রাস্তায় অল্পদূর গেলেই সরকারী ডাকবাঙ্গালা। আমরা বড় বিজলীতে পৌঁছেই পাগলী মা ও সারদা ভায়াকে দেখতে পেলাম। সারদা ভায়া বিষণ্ণ মনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি একে নিজে পাক করতে পারেন না, তার ওপর আবার পাক করবার সময় তাঁর নূতন গরম কোটটী একজন সাধুবেশধারী চোর নিয়ে চম্পট দিয়েছে। পিছন ফিরে কোট না দেখতে পেয়ে দোকানদারকে বলেছিলেন। দোকানদার তখনই চোর ধরবার জন্য ঘোড়া নিয়ে বন্দর-চটী পর্য্যন্ত যেতে রাজী হয়েছিল, সারদা-ভায়ার অনিচ্ছাতেই সে বেচারী যায় নি। শুনলাম, সে কোটের ভিতর কয়েকটী টাকাও ছিল। হিমালয়স্থ পাহাড়ীরা প্রায়ই চোর নয়। কিন্তু অনেক চোর যাত্রীর, সাধুর, কুলীর বেশ ধরে এমনি সর্ব্বনাশ করে থাকে। গভর্ণমেণ্ট হতে এ সব চোর ধরবার জন্য বন্দোবস্ত থাকলেও ফলে কিছু হয় না। যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক কিনা কে জানে?

বড়-বিজলী-চটী বেশ ভাল চটী, বড় বড় দোতালা ১২ খানা দোকান আছে। সর্ব্বদা পাইপের নির্ম্মল জল পাওয়া যায়। একটী ডাকবাক্স আছে। সাধারণ জলখাবারও মিলে। আমরা এ রৌদ্রের মধ্যে আর বেরুব না, রৌদ্র কমলে রওনা হব বলে সেখানে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। এই ১। মাইল রাস্তা আসতেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এর মধ্যে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত তেওয়ারী মহারাজ সদলবলে হাজির হলেন। তিনি হাসতে হাসতে আমরা যে চটীতে বসে বিশ্রাম করছিলাম, সেই চটীতেই আমাদের কাছে এসে বসলেন। তেওয়ারী আমার অতি নিকটে এসে বসেই তাঁর বাল্য-বন্ধু শিষ্যের সঙ্গে খুব রসালাপ করতে লাগলেন। তাঁরা দু'জনেই বেশ অবস্থাপন্ন। অবস্থাপন্ন হলেও কিন্তু আমাদের বাঙ্গালীর মত কুলীর ঘাড়ে বোঝা দিয়ে চলেন নি। নিজেরাই আপন আপন বোঝা ঘাড়ে করে রওনা হয়েছেন। অল্প বিশ্রাম করেই তেওয়ারী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপকে পাশ চিলম্ হৈ?

আমি বললাম, জী, নহী।

তেওয়ারী। আপ চিলম্ নহী পীতে হৈঁ?

আমি। মৈঁনে কভী চিলম্ নহী পী।

তেওয়ারী। আপকে গুরুজীনে জব্ আপকো চিলম পীনা নহী শিখায়া তো ক্যা শিখায়া? চেলা বনানে কে পহলে চিলম্ ধরনা শিখলানা চাহিয়ে। জো চিলম্ ধরনা নহী জান্‌তা, বহ তো কুছ্ ভী নহী জান্‌তা।

এই বৃদ্ধ বয়সেও যাঁর অমন অগাধ জ্ঞান, তাঁকে কিছু বুঝানো দুষ্কর মনে করে তাঁর দিকে পেছন ফিরে পর্ব্বতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলাম। এখান হতে দূরে—দূরে—অতিদূরে হৈমবতী-গঙ্গার

পারে স্তরে স্তরে পাহাড় সাজানো রয়েছে। পর্ব্বতের শিখরে শিখরে পশ্চিমাকাশের তীক্ষ্ণ রৌদ্র পড়ে কি সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করেছে। তার গায় দূরে দূরে ২৪টী পাহাড়ীয়া লোকের বসতিগ্রাম। গ্রামগুলি পর্ব্বতের গায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলনার পুতুলের ঘর বলে মনে হচ্ছে। পর্ব্বতের কোন দিকেই খালি নেই, সব দিকেই চাষ-আবাদ হচ্ছে, জমিগুলো যেন পাহাড়ে ওঠবার সিঁড়ির মত। পাহাড়ের এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য জীবনে দেখিনি, আজ অবাক হয়ে তা দেখতে লাগলাম।

৫॥ টা বেজে গেল। তখনই আবার রওনা হবার জন্য উঠে দেখি, তেওয়ারী সঙ্গীদের এখানে রেখে তিন মাইল নীচুতে মোহন-চটীতে চলে গেছে। খোঁজ করে জানলাম, মোহন-চটীতে তেওরারিন একখানা কাপড় ফেলে এসেছে। এখানে এসে তার হুঁস হয়েছে। তেওরারিন নিজে কাপড় ফেলে এসে তেওরারীর উপর চটে লাল—সে কেন আসার সময় তার কাপড়ের খোঁজ করে নি! তেওরারিনের ভুলের জন্য তেওয়ারীর অপরাধ হওয়াতে, বেচারী তেওরারিনের হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে গাঁজায় দম লাগিয়ে তখনি তিন মাইল উৎরাই করে আবার মোহন-চটীর দিকে ছুটেছে। এ দিকে প্রচণ্ড রৌদ্র, অন্যদিকে ভীষণ উৎরাই, তবুও স্ত্রীর মন রক্ষার্থে বেচারার এমন অধ্যবসায় দেখে আমরা অবাক্!

আমরা আবার চড়াই করে উঠ্‌তে লাগলাম। কুমীরের লেজ হতে ক্রমে একটীর পর একটী কাঁটা যেমন বড়, একটী কাঁটার মাথায় উঠে আবার আর একটী কাঁটার মাথায় যেতে হলে যেমন কাঁটা বেয়ে নেমে আবার উঠতে হয়, পাহাড়গুলোও তেমনি ভাবেই একটীর পর একটী ডিঙ্গাতে হয়। হৈমবতী গঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্বের পর্ব্বতগুলি কুমীরের কাঁটার মতন স্তরে স্তরে ক্রমোচ্চ ভাবে সাজান দেখতে দেখতে চল্‌তে লাগলাম। এখনও আমরা চড়াই করছি, ২ মাইল চড়াই করে পর্ব্বতের চূড়ায় এসে হাজির হলাম। যদিও এ স্থানটী পর্ব্বতের শিখর, তবুও দুটী পর্ব্বতের উপত্যকা; আমরা এখন হৈমবতী গঙ্গার তীর ছেড়ে ভাগীরথী বাঁয়ে রেখে তার তীর ধরে চল্‌ব। নদীর তীর বল্‌ছি বটে, তবুও ভাগীরথী বোধ হয় ৪০০০ ফিট নীচে। এ স্থানে বাবা কালী-কম্বলী-ওয়ালার জলছত্র আছে। উপত্যকার এক দিকে হৈমবতী-গঙ্গা অপর দিকে ভাগীরথী-গঙ্গা। পর্ব্বতের ভিতর পাহাড়ীরা প্রত্যেক নদীকেই গঙ্গা বলে থাকে। ভাগীরথীর এ দিকটা অত্যন্ত চড়াই এবং রাস্তাও অনেক বেশী। ভাগীরথীর উত্তাল-কল্লোল এখানে দাঁড়িয়ে মোটেই শুনতে পাচ্ছি না, নদী এত নীচুতে। এতক্ষণ পাহাড় বাঁ হাতে করে চড়াই উঠেছি, এবার ডান হাতে করে শুধু উৎরাই করতে হবে। দক্ষিণ দিকের পাহাড়ও খুব উঁচু। জলছত্রে খানিকক্ষণ বসে জলপান করা গেল।

এখানে দাঁড়িয়ে আমরা এক অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখলাম, সেরূপ দৃশ্য সমস্ত হিমালয় ঘুরেও দেখতে পাই নি, আমাদের সঙ্গী পাণ্ডার কর্ম্মচারী সুরেশা-নন্দও বল্‌ল, তার জন্ম হিমালয়ে, সে হিমালয়ে লালিত-পালিত, এখনও সে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই হিমালয়েই বাস করে থাকে, কিন্তু জীবনে এমন চিত্ত-বিনোদক মনোহর দৃশ্য আজ পর্য্যন্ত সে দেখে নি। আমরা ঠাকুরের অহৈতুক কৃপাতেই এমন মনোরম দৃশ্য দেখতে পেলাম মনে করে আনন্দে অধীর হয়ে গেলাম। আমরা পর্ব্বতের শিখরদেশে ভাগীরথী-গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেই ক্রমে উত্তর দিকে, একটির পর একটি ক্রমোচ্চ পর্ব্বতের স্তর দেখতে পেলাম। তখন উত্তর আকাশ কাল মেঘে ছেয়ে গেছে। আকাশও পর্ব্বতের শেষস্তরের সঙ্গে মিশে গেছে এবং মাঝে মাঝে বিজলী চমকে মেঘের ঘন-কৃষ্ণকে আরও নিবিড়তর করে তুলছে। পূর্ব্ব-

দিকের আকাশে ও পর্ব্বতের গায় অনেকগুলো রামধনু উঠে তার শোভা আরও বাড়িয়েছে। অস্তোম্মুখ সূর্য্যের আভায় সমস্ত পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত। উত্তর-পশ্চিম কোণের মেঘগুলির ওপর সে আভা প্রতিফলিত হয়ে তাদের আরো বিচিত্র করে তুলেছে। এদিকে সমুদয় পর্ব্বত গাঢ় ধুম্রবর্ণে প্রতিভাসিত। আবার সর্ব্বোত্তরের পর্ব্বতে গাঢ় মেঘের কোলে বিজলীর সঙ্গে গুড়্গুড় শব্দে চারদিক কাঁপিয়ে প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছিল।

অন্যদিকে পাহাড়ের উপত্যকার দৃশ্য আরো মনোরম। যে পর্ব্বতটী আমাদের অতি নিকটে ভাগীরথী-গঙ্গা হতে খাড়া উঠেছে, তার স্তরে স্তরে হলুদবর্ণের গমের জমিগুলো যেন গঙ্গা হতে পর্ব্বতের শিখরে ওঠার সিঁড়ি করে দিয়েছে। গমগুলো পেকে গাঢ় হলুদবর্ণ হয়ে আছে। তার ওপর পশ্চিমাকাশের সূর্য্যকিরণ পড়ে মনে হচ্ছে সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে সোনলী গালিচা পেতে রাখা হয়েছে। সে যে কি সুন্দর দৃশ্য, তা ভাষায় বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার নাই।

এ দিকে সন্ধ্যা আসন্ন দেখে আমরাও চটীর আশায় জোরে জোরে চল্‌তে লাগলাম। এখনও চড়াই, তবে বিজলীর চড়াইর মত কঠিন নয়। যে স্থানে দাঁড়িয়ে আমরা এই মন-প্রাণমাতানো প্রকৃতির খেলা দেখছিলাম, সেস্থানে ভীষণ জলকষ্ট দেখে বাবা কালী-কম্বলী-ওয়ালা একটী জলছত্র খুলেছেন। প্রায় ৪০০০ ফুট নীচু হতে জল তোলা হচ্ছে। এখানে জলছত্র খোলা যে কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার, তা না দেখলে বুঝা যায় না। আজ আমাদের আসান-মঠে শ্রীশ্রী শঙ্করাচার্য্যদেবের জন্মোৎসবে সকলে মাতোয়ারা। শ্রীশ্রী ঠাকুর বোধ হয় আমরা এ হেন বন্ধু-বান্ধবহীন পার্ব্বত্য প্রদেশে আছি বলে আমাদের সে আনন্দ হতে বঞ্চিত না করে, এমন একটী দৃশ্য দেখালেন, যাতে আমরাও আজ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। ধন্য তোমার করুণা! ধন্য তোমার পতিত পাবন নাম! (ক্রমশঃ)

আলোচনা

—*—

ভারতের ভাগ্য-বিধাতা কে, ইহা সময়ে সময়ে মনে জাগে বটে। রাষ্ট্রীয় বিচারে রাজাই দেশের ভাগ্যের নিয়ন্তা, এ কথা সুস্পষ্ট। আইন-কানুন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই কম বেশী রাজ-বিধানের উপর নির্ভর করে। এই রাজা ভারতের ভাগ্যে বিদেশী—আজ বলিয়া নয়; আজ হাজার বছর ধরিয়া। হাজার বছর ধরিয়া অনাত্মীয়ের শাসনে একটা জাতিকে বোধ হয় নিষ্পেষিত করিয়া দেয়, তাহার স্বাতন্ত্র্যের কিছুই অবশিষ্ট রাখে না। কিন্তু ভারতের ভাগ্যে ঠিক এই ব্যাপারটী ঘটে নাই, ইহাও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। মোহই বল আর যাহাই বল, তোমাদের হিসাবেও যাহার বয়স সাত-আট হাজার বছরেরও কম হইবে না, সেই বেদের দোহাই পাড়িতে ভারতবাসী এখনও অভ্যস্ত। জগতের কোনও জাতির আভিজাত্যের গর্ব্ব বোধ হয় এতদুর পর্য্যন্ত পিছু হটিতে জানে না। এই যে দেশের

বুকে কত রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজবিপ্লব পদ্মপাতার উপর জলের মত গড়াইয়া গেল, তবুও ভারতবর্ষের সনাতন আত্মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল না কেন, ইহা ভাবিবার বিষয় বটে। বিপ্লবের মাঝে দেশকে আগুলিয়া রহিয়াছে কাহারা? ক্ষাত্র-শক্তি বারবার নির্জ্জিত হইয়াছে, তাহার কথা তুলিব না। কিন্তু বাহু-সামর্থ্যে হীন হইয়াও অন্তরের কোন বলে বলীয়ান হইয়া এখানো ভারতবর্ষ তাহার বৈশিষ্ট্যের কথা জগতের সম্মুখে প্রচার করিবার ভরসা করে? ভারতের রাষ্ট্রনেতা যাহারা, তাহারাই তাহার ভাগ্যনিয়ামক, না যাহারা তাহার অধ্যাত্মসাধনার কাণ্ডারী, তাহারাই তাহার যথার্থ শাস্তা? অনাত্মীয় সংস্পর্শের কোন্ বিষ সব চেয়ে আমাদের নিকটে মারাত্মক হইয়াছে—যাহা বাহিরে প্রস্থত তাহাই, না যাহা অন্তরে প্রবেশ করিয়া মজ্জাকে আক্রমণ করিয়াছে তাহাই? আরও সহজ করিয়া বলি, ভারতবর্ষ কাহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে চলিবে, ব্রাহ্মণের না ইংরেজশিক্ষিতদের? কথাটা লইয়া ঈর্ষ্যা-বুদ্ধিপ্রণোদিত কলরবের আসর জমাইয়া তুলিতে বলি না, কিন্তু বাস্তবিকই ধীরভাবে ইহা বিচার করিতে হইবে, ভারতবর্ষের নিয়তিসূত্র কাহার হাতে? ব্রাহ্মণ বলিতেই কুসংস্কারের পুঁটুলী বুঝি না, কিম্বা ইংরেজীওয়ালা বলিতেই পাষণ্ডের বাথান বুঝি না। উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে যাহা বাস্তবিকই হিত ও পথ্য, এই সংজ্ঞা দ্বারা তাহাকেই সূচিত করা হইতেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, আমরা যাহারা মধ্যপন্থী, তাহারা কাহার ইঙ্গিত মানিব, কাহার কথায় বল পাইব? একজন বলিতেছেন, ভারতের যখন ঋদ্ধি নাই, তখন তাহার কিছুই নাই; আর একজন বলিতেছেন, যখন সিদ্ধি আছে, তখন তাহার সকলই আছে। ব্রাহ্মণ optimist, ইংরেজীওয়ালা pessimist; ব্রাহ্মণ এখনও democrat, ইংরেজীওয়ালা বাস্তবিকই oligarch; ব্রাহ্মণের অতীতের গৌরব ও ভবিষ্যতের আশা দুইই আছে, ইংরেজীওয়ালার আছে শুধু ভবিষ্যতের কল্পনা; ব্রাহ্মণ idealist, ইংরেজীওয়ালা realist। ভারতবর্ষ কাহাকে মাথার মণি করিয়া তুলিয়া লইবে? খুসীর কথা বলিতেছি না, দেশের নাড়ী ধরিতে যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, জাতির গতি কোন্ দিকে? কাহার পানে সে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে?

*

বিদেশী সভ্যতার বিপরীত প্রসার দেখিয়া আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি—ভাবি, এইবার বুঝি সব গেল! কিন্তু সব দিক দেখিয়া বিচার করিতে গেলে এই কথা আঁকড়িয়া থাকিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। আসুর সভ্যতার সম্মোহনকে অতিক্রম করিয়াও ভারতের সনাতন আত্মা বিজয়ী হইতেছে দেখিতে পাইতেছি। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংঘর্ষে একটা ধর্ম্ম-সঙ্করেরও সূত্রপাত হইয়াছে বহুদিন ধরিয়াই। এক দিক দিয়া খাঁটী হিন্দুর ভাবধারাকে বজায় রাখিয়া এই বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও যেমন সাধু-সন্তপরম্পরার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তেমনি আবার প্রতীচ্য মনোভাবে আপ্লুত শিক্ষাভিমানীদিগের মনের ধাঁধা ঘুচাইবার দরুণ তদুপযোগী গুরুর আবির্ভাবও ঘটিয়াছে। বলিতে পারা যায়, রাজা রামমোহন রায় এই গুরুপংক্তির আদি। নব্যতন্ত্র তাঁহাকে বলেন—Father of modern India। মডার্ণ ইণ্ডিয়া বা বর্ত্তমান ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান কতটুকু, ভারতে যে আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিপ্লবের হিড়িক্ আসিয়াছে, তাহা তাহার আত্মিক বিপ্লবেরও নিশানা কিনা, এ বিষয়গুলির সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হইতে পারিতেছি না। মনে হয়, নব্যতন্ত্রের অনেক হুজুগের মত মডার্ণ ইণ্ডিয়ার হুজুগটাও একটা একদেশী বিকার মাত্র; অথচ হুজুগপ্রিয়েরা গালভরা "বিশ্ব" বিশেষণটা ইহারই ভাগে জুটাইতে চাহেন। সে যাহা হউক, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাবসাঙ্কর্য্যে যে

একটা কিম্ভূতকিমাকার মডার্ণ ইণ্ডিয়ার উদ্ভব হইয়াছে (তাহার বাসস্থান দেশের মাটীতে না খেয়ালীর মগজে, সে বিচার না হয় নাই করিলাম), তাহারও মাঝে একটা গুরুপরম্পরা চলিয়াছে এবং এই পরম্পরা বিশেষ করিয়া ভারতেরই সনাতন আধ্যাত্মিকতাকে ঘেঁষিয়া চলিয়াছে, ইহাই আমাদিগের বক্তব্য। ভারতের সনাতনত্বের জয় এইখানেই। দেশে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদের দরুণ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গের মত অবতারের প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন রামমোহন, অরবিন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, ভাবানীর মত অবতারের। (অবতার বলিলাম বলিয়া কেহ রাগ করিবেন না, ওটা কেবল ভাষার মারপ্যাচ মাত্র।) নির্জলা বিলাতিয়ানার চর্চ্চার ভিতর দিয়াও যে ভারতবর্ষ এই শ্রেণীর একদল ভাবুকের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে, ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে ভারতের আত্মা অমর। এই মহামৃত্যুঞ্জয়-কবচই তাহাকে আসুর-সভ্যতার মরণপাশ হইতে আত্মরক্ষা করিতে শিখাইবে। স্বাধীনতাসঙ্ঘ যত লম্বা ইস্তাহারই জারী করুন না কেন, ঘুরিয়া-ফিরিয়া আবার দেখিতেছি, গুরুগিরিরই জয় সর্ব্বত্র।

*

তারুণ্যের চাঞ্চল্য সনাতন। "নিখিল ভারত" যুবক কংগ্রেস পণ্ডিচেরী আর সবরমতীর ভাবধারার গাম্ভীর্য্যে নিতান্ত চঞ্চল হইয়া দুই-চারিটা বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। তারপর তাহা নিয়া মল্লযুদ্ধও কম হয় নাই। পণ্ডিচেরীর যোগসমাধি কিম্বা সবরমতীর ফকিরী চাল, কোনটাই "নিখিল ভারতে"র তরুণদের বরদাস্ত হয় নাই, কেননা নিখিল ভারতের নিখিল তরুণই কর্ম্মদুর্ম্মদ এবং এক একটী ক্ষুদ্র ওমরাহ কিনা! নিখিল তরুণেরা উচ্ছ্বাসের মাথায় ভুলিয়া গিয়াছেন যে সমাধি আর ফকিরী দুটোই যে ভারতের সনাতন এবং সার্ব্বভৌম নেশা; তবে আর বিশেষ করিয়া পণ্ডিচেরী আর সবরমতীর নাম করা কেন? ইহারও একটা হেতু আছে। সম্ভবতঃ নিখিল তরুণের মনোভাবটা এই ধরণের;—মডার্ণ ইণ্ডিয়া হইতে সমাধি আর ফকিরীর বুজরুকী উঠিয়া গিয়া দিব্যজ্ঞানের বিকাশ তো হইয়াছে; যাহা কিছু কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে সেই old fool নেটিভ্ ইণ্ডিয়ার মাঝে। তাও যদি একবার স্বরাজ কি স্বাধীনতা একটা কিছু মিলিয়া যায় তো নাহয় কামালপাশার দৃষ্টান্তে আইনের এক খোঁচায় ওল্ড্ ফুল্‌এর ফকিরীর নেশাটা ঘুচাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু মডার্ণিজমের যাহারা পাণ্ডা বলিয়া এতদিন নিখিল তরুণের বিশ্বাস ছিল, তাহারাও যদি কুসংস্কারে স্বেচ্ছায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া থাকে তো কাহার সহ্য হয় বল দেখি? নিখিল তরুণ গীতা আওড়াইতে জানে, কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা করিতেও জানে, কিন্তু চক্ষু দুইটী উল্‌টাইয়া বুজরুকী করিবার ফিকিরটা যে গীতাকারেরও রপ্ত ছিল, সেই খবরটাই কেবল জানে না?

*

তারুণ্য বয়োধর্ম্ম না মনোধর্ম্ম না মনুষ্যত্বের নির্ব্বিশেষ প্রকাশ, তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সম্ভবতঃ বয়োধর্ম্মের সঙ্গে তারুণ্যের একটা অবিনাভাব সম্পর্ক আছে, ইহা আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই ধরিয়া নিই। দেহের সঙ্গে মনের যে গভীর সম্পর্ক, এ কথাটা "চারুপাঠ" পড়িবার সময় হইতেই জানিতাম। সুতরাং তারুণ্যের সঙ্গে বয়োধর্ম্মের একটা যে যোগ থাকিবে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র বলে, একটা সিদ্ধান্ত সত্য হইলে তাহার পাল্টা সিদ্ধান্তও যে সত্য হইবে, এটা দুরাশা। বয়োধর্ম্মের সঙ্গে তারুণ্যের জুড়ি মিলাইবার সময় এই কথাটী স্মরণ রাখিলে সম্ভবতঃ নবীনে-প্রবীণে এত মন কসাকসি হয় না। খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম এক আকালী শিখের কথা। তাঁহাকে কোনও

রকমে কাবু করিতে না পারিয়া শাসকসম্প্রদায় তাঁহার মস্তকে মলমূত্র নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিলেন। আকালী বলিতেছেন, "তাহারা মনে করিয়াছিল, এই উপায়ে আমি জব্দ হইব। তাহাদের আহৃত মলমূত্র আমি স্বেচ্ছায় মুখে পুরিয়া দিলাম। ইহার পর আর আমাকে কেহ বিরক্ত করিত না। উহারা জানে না যে আমি আকালী—deathless; আমরা শির দিতে জানি—কিন্তু সার দিতে জানি না।" এই আকালীর বয়স তিনকুড়ির ওপারে। ইহাঁকে বৃদ্ধ বলিব, না তরুণ বলিব? সমস্ত দিনের মাঝে একদণ্ড ফুরসুৎ লইতে জানেন না, এমন পক্ক কেশের অভাব এ দেশে হয় নাই। ইহাঁদিগকে কি তরুণ বলিব না? যদি কর্ম্মশক্তি, উদ্ভাবনী প্রতিভা, নেতৃত্ব ইত্যাদি গুণাবলীর দিকে নজর দিই, এবং তাহাই দেখিয়া তারুণ্যের পরিমাপ করি তো চল্লিশের এপারে কয়টী তরুণ পাওয়া যাইবে? একটা Statistics নিলে বোধ হয় প্রমাণ করা যায় যে তারুণ্যের উপর বয়োধর্ম্মের চেয়ে মনোধর্ম্মের দাবীটা গুরুতর। অথচ ঠিক এইখানটাতে আমাদের একটা সংজ্ঞাবিপর্য্যয় ঘটিতেছে। বুদ্ধি-বিবেচনার চেয়ে ছট্‌ফটানীর উপর আমাদের আস্থা বেশী এবং তাহাকেই কর্ম্মশক্তির অরুণ স্ফুরণ বলিয়া আমরা ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেছি!

সে দিন খবরের কাগজে হিন্দুয়ানীর এক নূতন রোসনাইএর বিবরণ পড়িলাম। কলিকাতার "রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি" বড়দিনে খৃষ্টের জন্মোৎসব করিয়াছেন। মেরী ও খৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে কেক-বিস্কুটাদির নৈবেদ্য সাজাইয়া যথারীতি (!) পূজারতি করিয়া ভক্ত-মণ্ডলীর মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে এবং ভক্তিসহকারে খৃষ্ট-সঙ্কীর্ত্তনাদিও করা হইয়াছে। গোঁড়া হিন্দু এ কাহিনী শুনিয়া হয়ত ক্ষেপিয়া উঠিবেন। কিন্তু প্রথম আশ্বাসের কথা, উক্ত সমিতির সহিত বেলুড় মঠের কোনও সংস্রব নাই। দ্বিতীয় কথা, সমিতির নামের সহিত যখন রামকৃষ্ণদেবের ও বেদান্তধর্ম্মের পবিত্র নাম সংযোজিত রহিয়াছে, তখন সমিতির উদ্যোক্তারা স্বচ্ছন্দে মনে করিতে পারেন এইরূপ অভিনব উপায়ে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রয়াস করিয়া তাঁহারা রামকৃষ্ণ ও বেদান্ত উভয়েরই মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। আমরাও বলি তথাস্তু! কেবল মনে মনে ভাবি, হিন্দুর toleration বা পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতার চরমে কি এই আত্মহত্যার ব্যবস্থা? একদিকে এই আচোট গোঁড়ামী আর একদিকে এই গদগদ ভাব, এই দুয়ের মাঝে ভদ্রস্থতা বজায় রাখিয়া একটু আত্মগৌরব নিয়া দাঁড়াইবার ঠাঁইও কি হিন্দু কোথায়ও রাখিল না? খৃষ্ট বা খৃষ্টমাতাকে শ্রদ্ধা কর, কুস্থান হইতেও কাঞ্চন আহরণের ন্যায়ে যত পার বাইবেল ঘাঁটিয়া সদুপদেশ গ্রহণ কর, আর তেমনি যদি মন গলে তো বাপ্তাইজ হইয়া খৃষ্টান হও না কেন! কিন্তু হিন্দুয়ানীও বজায় রাখিবে আর এদিকে ঢলাঢলি করিবে এ কেমন বেহায়াপনা বাপু? নজীর উঠিবে, রামকৃষ্ণ সব ধর্ম্ম যজিয়া-ভজিয়া দেখিয়াছিলেন, আমরাই বা তাঁহার চেয়ে কম যাই কেন? কিন্তু রামকৃষ্ণদেব যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বনে, মনে, কোণে—Scientist-এর spirit লইয়া; অমন সমিতি গড়িয়া ঢাক-ঢোল পিটাইয়া তো নয়। হিন্দু ভাবের দিক দিয়া সকলকেই স্বাধীনতা দিয়াছে, Free-thinking তাহার জন্মস্বত্ব; কিন্তু সে সংহতি গড়িয়াছে বাহ্য আচার দিয়া, কেননা সে জানে সংহতি বাস্তবিক বহিরঙ্গ প্রয়োজন মাত্র, সুতরাং তাহার বাহন বাহ্য আচার ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। এই আচারকে চূর্ণ করিয়া সেই সিমেণ্ট দিয়া যাঁহারা বৈদান্তিক হিন্দুর অভিনব জাতীয়তার সৌধ খাড়া করিবেন, তাঁহাদের কৃতিত্ব দেখিবার দরুণ মহাকালের নিকট হইতে পরমায়ুর মেয়াদ বাড়াইবার আর্জ্জি করিতে পারি।

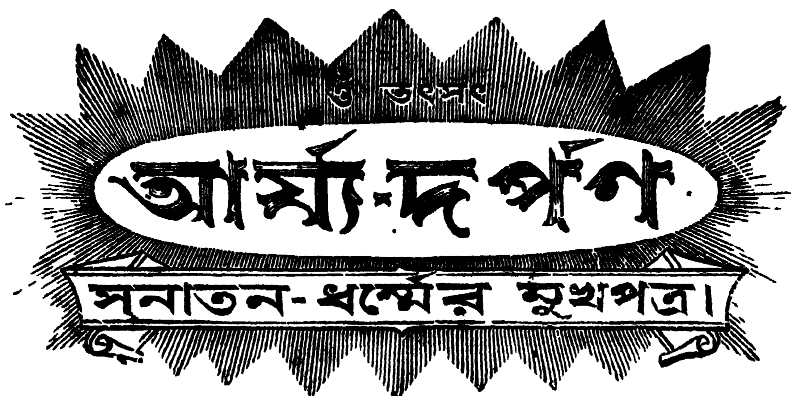
মদনমোহন হিন্দু-মহাসভার তরফ হইতে সর্ব্ব জাতিকে মন্ত্র দিয়া উদ্ধার করিবেন বলিয়া সফরে বাহির হইয়াছেন। ভানুমতীর পেটারী হইতে আরও যে কত রঙ্গ বাহির হইবে তাহাই ভাবি। শ্রীচৈতন্য আচণ্ডালে হরিনাম বিলাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দুর সংগঠননীতির কায়দা-কানুনটা তিনি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার প্রচার একেবারেই আধুনিকতা বর্জ্জিত অর্থাৎ non-political; তিনি কেবল জীবোদ্ধারের বায়নাই ধরিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার misson টাকে "নিখিল" হিন্দুজাতির একতাসংগঠনরূপ মহত্তর উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করা যাইতে পারিত, এ কথাটা মোটেই তাঁহার খেয়াল হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের এই ন্যূনতা পরিপূরণের দরুণই অত্যাধুনিক কলিপাবনদের আবির্ভাব এই সবেমাত্র সুরু হইল। দেখা যাক্, শ্রাদ্ধ কতদূর 'গড়ায়! যাঁহারা নব্য হিন্দুয়ানীর এই পাণ্ডাগিরির বিরুদ্ধে গুণ্ডাগিরি করিয়াছেন, তাঁহারা আরও রংদার। মালব্যজীর মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া তাঁহার গায়ে কর্দ্দম ও আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহার বাপান্ত করিয়া এই সমস্ত বীরপুঙ্গবেরা সনাতন হিন্দু-রণনীতির লোমহর্ষক নমুনা প্রকট করিয়াছেন। ধর্ম্ম-যুদ্ধটা পৌরাণিক কথামাত্র ছিল—তাহার এই অত্যাধুনিক রূপ দেখিয়া এই বিপ্লব ও ব্যভিচারের যুগে ব্রহ্মণ্যদেব নিশ্চয় হিন্দুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছেন। আমাদের কিন্তু কেন জানি সমস্তটা ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া লজ্জায় ঘৃণায় মাথায় হেঁট হইয়া যাইতেছে। বোধ হয় এটা প্রাক্তন সংসার!

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নানা অপ্রত্যাশিত বিপত্তিতে পৌষ-সংখ্যা পত্রিকা বাহির হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইল; বহু চেষ্টা করিয়াও এই সংখ্যার পূর্ণাবয়ব পত্রিকা বাহির করা গেলনা। মাঘ-সংখ্যা প্রকাশ হইতেও অগত্যা বিলম্ব হইবে। এই সংখ্যার ন্যূনতা পরবর্ত্তী সংখ্যায় পূরণ করা হইবে। ভক্ত-সম্মিলনীর বিবরণ মাঘ-সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বিনীত

কার্য্যাধ্যক্ষ, আর্য্যদর্পণ।



২১শ বর্ষ | ২য় খণ্ড
মাঘ—১৩৩৫
সমষ্টি সং ২২৬ | ৪র্থ সংখ্যা

পুরুহূত ইন্দ্রঃ

—※—

ঋগ্বেদ সংহিতা—৪।১৭।২০-২১

—*—

বামদেব ঋষিঃ—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ—অগ্নি দেবতা।

ত্বং মহাঁ ইন্দ্র তুভ্যং হ ক্ষা অনু
ক্ষত্রং মংহনা মন্যত দ্যৌঃ।
ত্বং বৃত্রং শবসা জঘন্বান্ সৃজঃ
সিন্ধূঁ রহিনা জাগ্রসানান্॥

তুমি ইন্দ্র, মহীয়ান্;—মহীয়সী এই বসুন্ধরা
বাখানে তোমার বল; তব গানে দ্যুলোকও যে ভরা।
বৃত্রেরে বধিলে তুমি, বলিতাবি। কি দুর্দ্দম তেজে—
শুষেছিল সিন্ধুজল ওই অহি,—আবে বহালে যে!

যঃ এক ইচ্চ্যাবয়তি প্র ভূমা
রাজা কৃষ্টীনাং পুরুহূত ইন্দ্রঃ।
সত্যমেনমনু বিশ্বে মদন্তি
রাতিং দেবস্য গৃণতো মঘোনঃ॥

সবাকার রাজা ইন্দ্র, ছোট-বড় সবে তারে চায়;
একাকী সে; শক্রভীতি হতে তবু সবারে বাঁচায়;
ঋদ্ধিমন্ত সে দেবতা, তার দান বাখানে সকলে;—
তার পানে চাই এই বিশ্ব-হিয়া প্রেমে যায় গলে।

তব ত্বিষো জনিমন্রেজত দ্যৌঃ
রেজদ্ ভূমির্ভিয়সা স্বস্য মন্যোঃ।
ঋধায়ন্ত সুভ্বঃ পর্ব্বতাস আর্দ্দন্
ধন্বানি সরয়ন্ত আপঃ॥

কাঁপিল দ্যুলোক তেজে, যবে ইন্দ্র জনমিলে তুমি,
ক্রোধে তব থরথরি কম্পমান ভয়ে এই ভূমি!
বিশাল পর্ব্বতরাশি বিদারিলে, ওগো মহাশূর—
মরুতে বহাও নদী পিয়াসীর তৃষা করি দূর!

সত্রা সোমা অভবন্নস্য বিশ্বে
সত্রা মদাসো বৃহতো মদিষ্ঠাঃ।
সত্রাভবো বসুপতির্বসূনাং
দত্রে বিশ্বা অধিথা ইন্দ্র কৃষ্টীঃ॥

সত্যি বটে, এ জগতে যত সোম, সকলি তো তাঁর;
সত্যি বটে, সে বিভুর সুধাধারে বিশ্ব মাতোয়ার!
সম্পদের অধিষ্ঠাতা সত্যি তুমি, হয়েছ হেথায়,
বিশ্ববাসী প্রজা যত, করিয়াছ হাতের মুঠায়।

ভিনদ্গিরিং শবসা বজ্রমিষ্ণন্
আবিষ্কৃণ্বানঃ সহসানঃ ওজঃ।
বধীদ্ বৃত্রং বজ্রেণ মন্দসানঃ
সরন্নাপঃ জবসা হতবৃষ্ণীঃ॥

দুঃসাহসী সে দেবতা; সুদুঃসহ হের বীর্য্য তার—
মহাবলে হানি বজ্র চূর্ণ সে যে করিল পাহাড়!
বজ্র হানি বধি বৃত্রে আস্ফালিয়া মত্ত হেন ফিরে,
ভাঙ্গি বাঁধ মহাবেগে ছাপি কূল বহাইল নীরে!

ত্বম্ অধ প্রথমং জায়মানো-
ঽমে বিশ্বা অধিথা ইন্দ্র কৃষ্টীঃ।
ত্বং প্রতি প্রবত আশয়ানম্
অহিং বজ্রেণ মঘবন্বি বৃশ্চঃ॥

জানি মোরা হে দেবতা প্রথমেই তুমি জনমিলে;
বিশ্ববাসী প্রজাগণে ভয় হতে তুমিই রাখিলে;
বহমান জলধারা রুধিয়া যে ছিল মহাসুর,
বজ্রাঘাতে ছেদি তারে বাধা যত করে দিলে দূর।

সুবীরস্তে জনিতা মন্যত দ্যৌঃ
রিন্দ্রস্য কর্ত্তা স্বপস্তমো ভূৎ।
য ঈং জজান স্বর্য্যং সুবজ্রম্
অনপচ্যুতং সদসো ন ভূম॥

দ্যুতিমন্ত পিতা তব, বহু ভাগ্য মানে আপনার;
ইন্দ্রেরে গড়েছে যে সে, হেন কর্ম্ম কে করেছে আর?
দ্যুলোকে ভূলোকে যার নাহি ক্ষয়, বজ্রে সুশোভিত,
হেন পুত্রে জন্ম দিয়া পিতা তার জগতে পূজিত।

কুহেলিকা

কত বিচিত্র ভাবের কুহেলিকা না আমাদের জীবনে দ্যুতিমন্ত হইয়া উঠে। প্রভাতকিরণের স্পর্শে জীবনের এক একটী দল মেলিয়া পড়ে, আর বিস্ময়ের এক একটী কপাট খুলিয়া যায় যেন! কাহাকে আমার একান্ত ভাবিব, আর কাহাকেই বা ভাবিব আমার পর—নিখিল রসের রসিক চিত্ত যে সবার ছোঁয়াচ পাইয়াই শিহরিয়া উঠে। সে দেখে, তাহার অন্তরে যা রসানুবিদ্ধ হইয়া ছিল, তাহাই যে অজস্র লীলাচপলতায় বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতেছে!—আমি দেখিতেছি, বাহিরের প্রকৃতি আর আমার অন্তর-প্রকৃতি একই সুরে বাঁধা। আমিই সবার একান্ত, অথচ আমার একান্ত কেউ তো নাই! আমাকে পাইয়া সবাই পর্য্যাপ্ত, সবাই সুখী; কিন্তু এমন কেউ তো নাই, যাহাকে পাইয়া আমি পর্য্যাপ্তির অনুভবে পুলকিত হইতে পারি। আমার সুখ আছে, আবার তাহার সঙ্গে আছে অপূর্ণ দর্শনের বেদনাও। এই সুখ আর দুঃখকে আমার মাঝে যুগপৎ ধারণ করিতে পারি বলিয়াই আমার আনন্দ সম্পূর্ণ; তাই আমি সবার হইয়াও কাহাকেও আমার সর্ব্বস্ব করিতে পারিলাম না।

অনন্ত উদার অথচ একান্ত বিবিক্ত আমার মহিমার মাঝে অচঞ্চল হইয়া চাহিয়া আছি আমারই নিগূঢ় ছন্দে স্পন্দিত এই লাস্যমুখর, নূপুরক্বণৎকারে চমৎকারবাহিনী প্রকৃতির পানে; দেখিতেছি, রসের পরিবেশনের তো আর অন্ত নাই। নির্লিপ্ত বলিয়াই আমি যে কত বিচিত্র! অমানিশার স্তব্ধ নিবিড় আঁধারে তলাইয়া গিয়া দেখিয়াছি, প্রাণের ইঙ্গিতে স্ফুরন্ত আদি-বাসনার সুকুমার ভ্রূণ; পূর্ণিমার গলন্ত জোছনায় অঙ্গ এলাইয়া দিয়া অনুভব করিয়াছি দার্শনিকের সত্যানৃতের মিথুনে ভাবরসঘন অনির্ব্বচনীয়ের ব্যঞ্জনা; প্রখর দিবালোকে দেখিয়াছি সত্যের অকুণ্ঠ নগ্ন প্রকাশ আর তাহারই সম্পাতে ঊষর ভূমিতে মরীচিকার লেলিহান তৃষ্ণা। দেখিতে দেখিতে আমার অন্তর বাহির জড়াইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে—অনির্ব্বচনীয় পুলকে শিহরিয়া ভাবি, আমি বাহিরে না ভিতরে!

কিন্তু এই পুলকের মাঝেও কাহার বেদনাময় একটী স্পর্শ মৃদু আকর্ষণে বার বার আমাকে বাহিরের দিকেই টানিতে চায়। পূর্ণের বুকে অপূর্ণের বেদনার এই সকরুণ প্রতিচ্ছবি—রাধিকার আকুলতাভরা দীর্ঘনিঃশ্বাসে শ্যামায়িত শ্যাম-অঙ্গের সুকোমল ছায়ার মত। আমার দৃষ্টি দিয়া যখন দেখি, তখনও কোথায়ও নাই বেদনা, নাই সন্তাপ, নাই দৈন্য; কিন্তু সেই সরল মর্ম্মভেদী দৃষ্টিরও যেন তির্য্যক্ প্রতিফলন রহিয়াছে। সে দৃষ্টি জগতের দৃষ্টি; সে দৃষ্টিতে পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটিয়া উঠে দাহ আর ব্যথা, শ্রান্তি আর মূঢ়তা। দূর হইতে তাহাও দেখি, তাহাও ভাল লাগে। কিন্তু ওই যে অনির্দ্দেশ্য বেদনা, উহার আকর্ষণে আবার ওই সকরুণতার মাঝেই নামিয়া আসিতে হয়, আমার সত্যসন্ধানী প্রজ্ঞাদৃষ্টিকে স্তিমিত করিয়া এই আবছায়ার বক্ষজোড়া বেদনার স্পর্শটুকু নয়নে-মনে বুলাইয়া লইতে হয়।

এমনি করিয়া আমার চেতনায় দ্বৈতের আভাস ফুটিয়া উঠে। বৈরাগী মন রুখিয়া বলে, কাজ কি তোমার ওই কুহেলিকায় দৃষ্টি ধাঁধিয়া? মিনতিভরা দুটী বাহুর আলিঙ্গনে যে তোমাকে জড়াইয়া ধরিতে

চায়, রূঢ় প্রত্যাখ্যানে তাহার মোহ ভাঙ্গিয়া দাও, তোমার নিষ্ঠুরতা তাহার পক্ষে শিবকরী হউক।

জানি, কথাটা কঠিন সত্য, কিন্তু তবুও তাহা শুনিয়া চলিতে পারি না। বেদনাহত হৃদয় যে আমারই আর এক দিক। আমার দ্বারা না হউক, আমাকে লইয়াই না এই বেদনার উদ্ভব! আমাকে ধরিয়াই যে ঝুরিয়া মরিতেছে, তাহার ব্যথার ভাগ আমাকে লইতেই হইবে যে!

এমনি করিয়া আবার এই জগতের সুখ-দুঃখের কোলাহলের মাঝেই ফিরিয়া আসি। মনে হয়, এখানে যাহা কিছু শুনিতেছি, তাহা শিশুর অস্ফুট কাকলি; তাহার গভীরতা আছে, কিন্তু ব্যাপকতা নাই। নাই বা থাকিল; ওই আধফোটা বুলি শুনিয়াই যে আমার স্নেহের সপ্তসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠে—আমারই অজ্ঞাতসারে আমি বলিয়া ফেলি—আহা, এ জগতের সকলকেই আমি ভালবাসি—বড় ভালবাসি!

হাঁ, অমানিশার দিশারী আমি, জ্যোৎস্নার রসিক আমি, প্রাণের অব্যক্ত শিহরণ আমি, সবিতার অনবগুণ্ঠিত ভাস্বর দীপ্তি আমি—সেই আমিই আবার সৃষ্টি করিয়াছি এই কুহেলিকা। আমিই আমাকে আচ্ছাদন করিতে রচিয়াছি রহস্যের এই মায়াবরণ!

শিশুর মুগ্ধ দৃষ্টিতে যেমন ফুটিয়া উঠে এই বিস্ময়-ভরা জগৎ, তেমনি ঊষার সুকোমল বর্ণিকাভঙ্গে অনতিস্ফুট রাগরেখায় ভাসিয়া উঠে বিশ্ব-শিল্পীর অপরূপ কল্পনা। শিশুর মতই নির্ব্বাক্ হইয়া স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি এই জগতের পানে—ইহার সব কিছুই যেন বুঝিতে পারি, অথচ বুঝিতে পারি না, বিগত রাত্রির অন্ধকার আর অনাগত দিবসের অপর্য্যাপ্ত আলো, দুয়ের স্মৃতি ভুলিয়া গিয়া দাঁড়াই এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুগ্র মহিমার পরিমণ্ডলের মাঝে! এই নবারুণদ্যুতিকে জানি গায়ত্রীর কুমারীরূপে, জীবনের সূচনায়, প্রজ্ঞার উন্মেষে, ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্যোতনায়। সংযমের অবধি এইখানে, অকুণ্ঠিত প্রত্যয়ের জ্যোতির্ম্ময় আবির্ভাবের আদি মুহূর্ত্ত এই! এ চেতনা শুধু আমার নয়—তোমার, বিশ্বের চেতনা এই বৃন্ত আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে।

হয়ত ইহার পর জাগিত দিবসের খর দীপ্তি; তাহা না জাগিয়া আসিল কুহেলিকার বিরামহীন আবর্ত্তন। সে আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইয়া মানুষ দিশাহারা হইয়া গেল, সত্যে-মিথ্যায় তাহার কাছে জড়াইয়া একটা অপরূপ পিণ্ড হইয়া রহিল! কুহেলিকায় আচ্ছন্ন দৃষ্টির কাছে যাহা ছিল দূর, তাহা হইল নিকট, যাহা ছিল নিকট, তাহা গেল দূরে;—সত্যের ঋজু প্রকাশ বাঁকিয়া-চুরিয়া কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া গেল।

নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে দৃষ্টি ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছে, তবুও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই এই কুহেলিকা কি! অন্ধকারকে সহজে বুঝি, কেননা তাহার এক রূপ; আলোককেও সহজে বুঝি, কেননা তাহার অনেক রূপ; রূপের মাঝে অরূপের ছটায় এলাইয়া পড়া জ্যোচ্ছনা-বিতান-কেও অন্তরের দরদ দিয়া বুঝিতে পারি; কিন্তু যতই প্রয়াস করি না কেন, এই কুহেলিকাকে বুঝিয়া উঠিতে পারি না!

এ তো আঁধার নয়, কেননা তাহা হইলে এ সত্যদৃষ্টিকে বাধা দিত; এ বাধা দেয় না, কিন্তু বেড়িয়া যায়, আর বেড়িতে গিয়া জড়াইয়া ধরে। এ আলোক নয়; বস্তুকে প্রকাশ করার চেয়ে বেড়িয়া বিরূপ করিবার কৌশলটুকু চমৎকার জানে। এ জ্যোৎস্না নয়; ভাবুকের অন্তরে এ স্বপ্নের আবেশ ফুটাইয়া তুলিতে পারে না—এ যেন একটা ভয়াল বাস্তবের কুণ্ডলী পাকাইয়া তোলে!

অন্তরে ঢুঁড়িয়া দেখি, জীবের বুদ্ধিতে এই কুহেলিকার ঘোর। চিন্ময় আলোকে চরাচর উদ্ভাসিত করিয়া তোলে; সে আমার সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বেদনা, স্পর্শ-আস্বাদনের বাইরে, অথচ তাহাকে জড়াইয়াই আমার সব। আর এই কুহেলিকায় সে আলোক যেন জড়মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—তাহার গতি দেখি, স্পর্শ অনুভব করি, সে অবস্ত হইয়াও একটা বস্তুর বিভীষিকা।

জীবের বুদ্ধি কি করিয়াছে? যাহা সহজ, সরল, উদার ছিল, তাহাকে কুটিল জটিল ও সঙ্কীর্ণ করিয়াছে; সত্যকে বাঁকাইয়া মিথ্যার মায়া রচিয়াছে। কিন্তু কিছুরই কিনারা সে পাইয়াছে কি? কিছুই পায় নাই। বুদ্ধির ঘূর্ণীতে পড়িয়া নিদ্রার শান্তি বুকচাপার বিভীষিকায় ফুকারিয়া উঠিয়াছে শুধু!

সহজ-জ্ঞান বলিতেছে—আত্মা অন্তরতম; বুদ্ধি বলিতেছে কই তাহাকে তো খুঁজিয়া পাইতেছি না! এই এক কুহেলিকা। হৃদয়ের সহজ আকুলতায় পাই অন্তরতর কাহার স্পর্শ, বলি, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, চোখে না দেখিয়াও তোমার রূপে আমি পাগল। বুদ্ধি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলে, কি সব বাজে বকুনি সুরু করিয়া দিলে? যাহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারি না, তাহার সত্যতার প্রমাণ কোথায়?—তাহার কাছে ভগবান এক কুহেলিকা। অতৃপ্ত আশার পরিতৃপ্তি পাই কল্পলোকে, শ্রদ্ধায় তাহাকে পরলোক বলিয়া আঁকড়িয়া ধরি; বুদ্ধি শূন্যপথে দৃষ্টি তুলিয়া আলস্য-জড়িত ঔদাসীন্যে বলে, কোন্ আঁধার হইতে আসিয়াছি তাহাও জানি না, চোখ বুজিলে কোন আঁধারে তলাইয়া যাইব, তাহাও বলিতে পারি না—এই নিত্য-দৃষ্ট বর্ত্তমানের বাইরে আর কাহাকেও মানিয়া আমার লাভ?—আত্মার ব্যাপ্তি, পরকাল, সব তার কাছে কুহেলিকা।

এমনি করিয়া জীবনের প্রতি পাকে পাকে সমস্যা জটিল হইয়াই চলিয়াছে। কোথায়ও মীমাংসা নাই, কোথায়ও সোয়াস্তি নাই; অথচ সত্যের ভাণটুকু আছে। জীবন-ভরা জীব-বুদ্ধির এই অত্যাচার, কুহেলিকার এই ছলনা।

বলিয়াছি বটে, সত্যের ভাণ; কিন্তু সুস্পষ্ট মিথ্যা হইতেও যে তাহার জ্বালা কি নিদারুণ, তাহা তোমার অন্তর্য্যামীই জানেন। এই যে সংশয়, এই যে ছলনা, অপ্রবুদ্ধ চিত্ত দম্ভসহকারে মনে করে, ইহাই তাহার পৌরুষ। কিন্তু নিদাঘের খরতাপে ধরণী রসহীনা হইলেও আকাশের কোলে অলক্ষ্যে যেমন করিয়া বারিবিন্দু জমিয়া ওঠে, তেমনি নিখিল অপ্রবুদ্ধ চিত্তের অহমিকার উগ্র উষ্মার উপরও বেদনায় ফুটিয়া ওঠে সন্ধ্যাতারার মত কাহার দুটী করুণ নয়ন!

বুদ্ধির কুহেলিকায় সত্যের জ্যোতিঃ ম্লান হইয়া গিয়াছে, এ যে ভগবানের বুকে কত কড় বেদনা, কত নিষ্ঠুর আঘাত, আর সেই আঘাতে কি করুণাই যে বিশ্বের পরে তাঁহা হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহা অপরে বুঝিবে কি করিয়া?

ব্যষ্টির কথা বলিতেছি না, সমষ্টির বিচারে দেখিতেছি, কুহেলিকা অপরাজেয়। সবিতার দীপ্তি যত কাল, এই কুহেলিকার মায়াজালও ততকাল। তবে আর আনন্দ কোথায়?—আনন্দ অদ্বৈতের গর্ভে দ্বৈতের যুগ-বিলাসে।

আমি জানি, আমারই দীপ্তির, আমারই তেজের তির্য্যক্ পরিণামে রচিত আমার এই প্রতিভাস; আমারই বক্ষ উদ্বেলিত করিয়া এই আত্মমায়ার বিজৃম্ভণ। দৃষ্টি যার অনুদার, সে ইহাকে সোহাগে জড়াইয়া ধরিতে পারে, রূঢ় প্রত্যাখ্যানে ফিরাইয়াও দিতে পারে। কিন্তু আমি তো তা পারি না। আমার কাছে সমষ্টির প্রশান্তি আর ব্যষ্টির বিক্ষোভ দুইই যে তুল্যমূল্য। এই কুহেলিকার ঘোরে পড়িয়া দিশাহারা যাহারা তাহাদের দুঃখেও আমার প্রাণ কাঁদে; কিন্তু এও তো জানি, এই কান্নাই

কুহেলিকা। কুহেলিকার মায়াবরণ ছিন্ন করিয়া ভাস্বর স্বমহিমায় যাহারা জ্যোতির্ম্ময় আমিকে চিনিয়া লইল, তাহাদের দৃপ্তিতে আমারও মাঝে পুলক জাগে; কিন্তু তবুও জানি, এ পুলকও কুহেলিকা। আমাকেই আমি বেদনা দিয়া অশ্রু ঝরাই, আবার সোহাগ করিয়া হাসি ফুটাই। আমাকে লইয়াই আমার ঘরকন্না, আমার দীপ্তি হইতে উদ্ভূত আমারই কুহেলিকার আমি আনন্দ-মুখর—বেদনা-বিধুর।

তমো আর জ্যোতিঃ, এই দুইটা কথা থাকেই এবং চিরকাল ধরিয়া ইহারা থাকিবেও। তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ মহান্ত পুরুষকে যিনি দেখিয়া আসিয়াছেন তিনিও বিস্ময়মুখর ভাষণে জগৎকে এই খবরই দিতে পারেন মাত্র; তাহার বেশী কিছু করিবার উপায় আছে কি? প্রয়োজনই বা কি? কুহেলিকার এপারে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের কলরবের আর অন্ত নাই; হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া তাহারা অস্থির হইবেই। কি বলিয়া তাহাদের শান্ত করিবে? নিঃশব্দে আলোর মত আপনাকে ছড়াইয়া দাও—কাণের কাছে মর্ম্মচর রহস্যটী একবার গুঞ্জরিয়া যাও—শুধু বল, আছে, এর পরেও কিছু আছে। কোথায় তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু আত্মার প্রশান্তির মাঝে সন্ধান কর, বীতরাগ চিত্তের অনুধ্যান কর;—প্রদীপ হইতে প্রদীপ যেমন করিয়া সঞ্চারিত হয়, তেমনি করিয়া যদি কিছু পাও।

ঘোর একদিনে কাটে না; কিন্তু নিঃশেষে যে কাটে, সে কথা বিশ্বাস কর। আবার তোমার কাটিলে দেখিবে, একের কাটিলেও যে সবার কাটে তাও তো নয়। এই তো মায়া—সত্য হইতে বিজৃম্ভিত চিরন্তনী কুহেলিকা!

লক্ষ্য

—:*:—

লক্ষ্যে উপনীত হবার আকুল চেষ্টা সবার মাঝেই রয়েছে। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী হতে আরম্ভ করে জ্ঞানী মানুষ পর্য্যন্ত কত যে বিভিন্ন কর্ম্ম-চক্রের মাঝে নিজকে নিয়োজিত করে লক্ষ্যের প্রতি বাধাহীন গতিতে এগিয়ে চলছে তার ইয়ত্তা নেই। এত আর্ত্তনাদ, এত দ্বন্দ্ব—যাতে মানুষের উন্মুক্ত প্রাণের গতি সঙ্কুচিত করে দেয়, তার মূলেও কি সেই জীব-মুক্তির প্রেরণা নাই? মানুষ যেন উন্মত্তের ন্যায় কেবল কর্ম্মচক্রের মাঝেই ঘুরে বেড়াচ্ছে—বুদ্ধি রয়েছে, বুঝবার ক্ষমতা রয়েছে মানুষের, তাই ইতর প্রাণীর চেয়ে কোন্‌টা তাদের ইষ্ট-সিদ্ধির অনুকূল হবে মানুষ ধরে ফেলে সহজে—পশু-পক্ষীর হয়ত কত দিনের পর দিন, বৎসরে পর বৎসর অতীত হয়ে যাচ্ছে তবু সঙ্গেই আছে—জানে না কোন পথে তাদের সহজ-সিদ্ধি। আজ যে আমাদের মন-প্রাণ, সমস্ত শিরা-উপশিরায় চঞ্চলতার নৃত্য চলেছে কোন কিছুতে তৃপ্তি পাচ্ছি না বলে। ভোগী—সেও বল্‌ছে, না, এ ছাড়াও যেন একটা শান্তিময় স্থান রয়েছে। ভোগ চায় মানুষ—উপকরণ তো স্বচ্ছন্দেই জুটে গিয়েছে. তবু যে একদিন ভোগীর উচ্ছৃঙ্খল মন সত্যপথের অনুসন্ধানে উতলা হয়ে ওঠে—যার প্রলোভনে পড়ে সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় পশু সেজে

বসেছিল—আজ সে কেমন করে অসংযত বাসনার দুর্নিবার চেষ্টাকেও নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি পাচ্ছে! তাহলে কোলাহল ছাড়াও একটা শান্তিপ্রদ স্থান রয়েছে? মুক্তি চায় সবাই—আর 'পলে পলে সে সাধনাই চল্‌ছে; পথ ভুলে কি যেন একটা মোহে পড়ে ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে জড়িয়ে পড়েছি। মানুষ বলে শুভ-বুদ্ধির চেয়ে দুষ্ট-শক্তির প্রভাবই নাকি বেশী। এত জড়িয়ে গেলেও যে চেতনার দিব্য-প্রেরণায় মানুষকে নরক হতে টেনে স্বর্গে নিয়ে যায়, চোরের মাঝে সাধুভাব জাগায়, ভোগীর মনে নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে—এ সর্ব্বনিয়ন্ত্রী শক্তির অনুভূতি সকল সময় নাই পা'ক; কিন্তু কোন একদিন, কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে কি কেউ একে উপলব্ধি করে নি? একবার যে এ শক্তির পরিচয় পেয়েছে, সেই জানে কোন্ শক্তির আকর্ষণ বেশী!

আমরা সাধক—পথিক, নিশ্চিত লক্ষ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। লক্ষ্য ঠিক; কিন্তু পথ জানি না। ভগবান্ আছেন, এই বিশ্বাসেই তো আমাদের চঞ্চল করে তুলেছে। সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাক্‌লেই পথের সন্ধান পেয়ে যাব, এ ভরসাও তো পাচ্ছি না; আর কর্ম্ম ত্যাগ করে যে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি না, আরও যে বেশী উদ্বিগ্ন করে তুলে। কর্ম্ম না কর্‌তেই তো কর্ম্মত্যাগ হয় না; কর্ম্মের বোঝা যে তাতে আরও বেড়েই ওঠে। পড়ায় যারা অমনোযোগী পরীক্ষার পূর্ব্বে যে তারা নাকে মুখে পথ পায় না, পড়া যে তখন তাদের কাছে এক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়—কূল না পেয়ে রাত্রি-জাগরণ, দৈবী-শক্তির সহায় কতই না কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে হয় তাদের। নায়মাত্মা প্রবচনেন, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—আত্মা প্রবচন অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা, মেধা—শাস্ত্রাদিধারণা শক্তি দিয়ে কিম্বা বহুশাস্ত্র শ্রবণেও লভ্য নন। তবে কি উপায়ে লভ্য?—আত্মা নিজে যাকে বরণ করে নেন। অবশ্য এতে আত্মসমর্পণের কথা রয়েছে, কিন্তু উদ্যোগ নিবারণের কথা তো কেউ বলে নি। এ ভাবতেই অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি, আবার রূপ গড়ে পূজার প্রচলনও এ ভাবতেই। শাস্ত্র দিয়ে ভগবান লাভ হয় না, কিন্তু শাস্ত্র-সংখ্যা কি শুধু এ কথাকে উপলক্ষ্য করেই দিন দিন হ্রাস পেতে বসেছে? উপনিষদে একদিকে যেমন অদ্বৈত-ব্রহ্মতত্ত্বের কথা রয়েছে, তেমনি তো আছে প্রাণতত্ত্ব—শক্তিতত্ত্বের কথা। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এ-ও তো উপনিষদেরই বাণী। পাওয়া না পাওয়ার দিক দিয়ে বল্‌ছি না, কিন্তু বিভিন্ন প্রচেষ্টায় তো মানুষের কত শক্তি রয়েছে তার পরিচয়টুকু অন্ততঃ পাই। জন্ম নিলেই মরতে হবে এ তো সবাই জানে; কিন্তু মরেও যারা অমর হয়ে রয়েছেন—তাঁরা দিয়েছিলেন প্রাণের পরিচয়। আজ যে ভারত এমন ভীষণ বহির্ম্মুখীনতার স্রোতে পড়েও অন্তর্নিবিষ্ট হবার শক্তি পাচ্ছে—এ মুনি-ঋষিদের সত্যিকার সাধনার, শক্তি-সংক্রমণের ফল। জানি, সাধনা দিয়ে তাঁকে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারব না, কিন্তু যতটুকু করব, তার ফল কি বৃথা যাবে? গতির মাঝেও যে স্থিতি—হয়, সেটা জড়ত্ব নয় তো, পরিণাম। আর আমি যদি দেশ-কালের অতীত হয়ে থাকি, বিশিষ্ট একটা অবস্থাতেই তো আমার তুষ্টি আসবে না। ব্যাকুলতা এসেছে তোমার?—এ তো শুভ লক্ষণ—তুমি তোমার পরিপূর্ণ বিকাশ চাও!

কোন এক দার্শনিক নাকি বলেছিলেন—"আমি যদি দাঁড়াবার একটা নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র পেতাম, জগৎকে তাহলে উল্টিয়ে দিতে পারতাম।" কথার ভাব দিয়ে বেশ বোঝা যায়, উনি কেন্দ্রকে খুঁজেছিলেন বাইরে, বহুর মাঝে পড়ে তিনি ঐক্যের আস্বাদনের কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—উপনিষদের এ

বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ভারতের আর্য্যঋষি, এ অনুভূতির আবেগ নিয়েই নিজের জীবনে তো শান্তি ভোগ করতেনই, আরো কত লোকের উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকেও প্রশান্ত করে দিতে পারতেন। "অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়"—আমি বহু হব। বহুর মাঝে যে আত্ম-প্রত্যয়, এই তো কেন্দ্র। আমিই তো অনেকের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছি। রূপের অদল-বদল হয় বটে কিন্তু বহুরূপী আসতে একজনই। জীবন দুঃখময়, কর্ম্মের পথ অতি দুরূহ—এ কথা বলে জীবনকে অনেকেই জটিল সমস্যায় ফেলেছেন, কিন্তু উপনিষদ্ গোড়া থেকেই উল্টো কথা বল্‌লেন—জীবন আনন্দময়, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—প্রত্যেকের মাঝে ব্রহ্ম পরিপূর্ণভাবে রয়েছেন ; অতএব তোমরা অংশ কিম্বা খণ্ড নও। অন্ধ, আতুর, দুঃখী, দরিদ্র, তাদের নিরাশার জীবনেও এ বাণীর শক্তি প্রদ্যোতিত হয়ে ওঠে। কল্পনাই মনে কর না কেন একে ; কিন্তু এমন আশার বাণী কয়জনে শোনাতে পারে? এমন শক্তি অর্জ্জন করতে হবে, কলঙ্ক কালিমায় জড়িত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় যেন সত্যশক্তির প্লাবনে নির্জ্জিত হয়ে ভেসে যায়। মোট কথা, শক্তির উদ্বোধন চাই।

আমার সংশয় ভঞ্জন না হলে, হৃদয়ের জ্বালা না মিটলে—আমি লক্ষ্যে পৌঁছেছি এ মনে করা ভুল! অনেকে নিজের বাসনা অনুযায়ী রূপ-বিগ্রহ দেখে মনে করে, এই বুঝি আমার শেষ, পূজা-পার্ব্বণ দান-দক্ষিণা দিয়ে স্বর্গ লাভ করাটাই বুঝি চরম ; এমন করে ভুল বুঝে কয়দিন হয়তো বেশ নিশ্চিন্ত মনে ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকেন। কিন্তু দেখি, তৌষ্টিকের মোহও একদিন ভেঙ্গে যায়। তারা বলে, স্বর্গসুখও তো দেখছি নশ্বর, এর থেকেও বিচ্যুতি হয়। এখান থেকেই আত্মানুসন্ধিৎসা জাগে, মনে হয় পরিবর্ত্তনশীল তো সবই, এর মাঝে কি অপরিবর্ত্তনীয় বলে কিছু নেই? সর্ব্বনিঃশেষে আপন অস্তিত্ব লোপ পায়, কিন্তু "আমি" তো কোথায়ও লোপ পায় না। এ "আমি"র জ্ঞান হলেই লক্ষ্যে পৌঁছাব। তাই কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে আমায়, তোমার জীবনে লক্ষ্য কি? বলব, সত্য সহায় আছে বলে অনেকের প্রলোভন কাটিয়ে আমি বলে আমাকে জানাই আমার লক্ষ্য!

সংস্কার তো আর সবারই সমান নয়, তাই এই "আমির" আস্বাদনেই এক একজন এক এক ভাবে করতে চায়। বাধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু সকল সংস্কারকে জ্ঞানাগ্নি দিয়ে দগ্ধ করে আমি "আছি" শুধু এই উপলব্ধি নিয়েই দিবা রাত্র বিভোর হয়ে থাকতে হবে ; মানুষ যদি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ হতে চায়, তবে সে দিনই, এর আগে নয়। জীবনের লক্ষ্যের এমন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা বোধ হয় আর কেউ দিতে পারেনি। ভারতের শিক্ষার মন্ত্রই হচ্ছে, "আত্মানং বিদ্ধি।" গুরুসেবা, বেদাধ্যয়ন তোমার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করার দরুণই।

"নিত্য গঙ্গা পানী" বলে একটা চলতি কথা আছে। তাই এক মহাপুরুষের মুখে শুনেছিলাম, "যারা আমার নিকটে রয়েছে, তারা আমাকে পায়নি, বরঞ্চ দূরে যারা রয়েছে আমাকে পাওয়ার দরুণ আকুলতা তাদের বেশী—তারাই আমাকে পেয়েছে।" শ্রীকৃষ্ণকে এত কাছে পেয়েও রাধার বিরহ মোচন হল না কোন দিন—প্রাণের ভিতর এই যে দারুণ অভাব বোধ এতে রাধা শ্রীকৃষ্ণকে তন্ন তন্ন করে বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কোন একটা বিশেষ অবস্থা লাভ হলেই গুরুর মন প্রপন্ন শিষ্যের সম্বন্ধে তৃপ্ত হতে পারে না। গুরু দেখেন—এ যে চলার মাঝেই থেমে গেল—আরও

যে কত জানবার বুঝবার রয়ে গেল! অসময়ে যে গতি রুদ্ধ হয়ে আসে, সাধন ভজনে বিন্দুমাত্র স্পৃহা থাকে না, এ কি সিদ্ধের লক্ষণ, না অল্পে তুষ্ট তৌষ্টিকের?

জানি না বলেই শরণাপন্ন। যতদিন তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণ নির্দ্দেশ না পাব, কি অধিকার রয়েছে আমার থাম্‌বার! জড়তার সঙ্গে নবলব্ধ চেতনার সংঘর্ষ উপস্থিত হবে, তবে না বুঝ্‌ব আমি চলছি ক্রমশঃ উন্নতির পথে। তা না হলে দ্বিধাহীন আরামের মাঝে কি সুখ রয়েছে? গতিতেই তো ব্যাপ্তি। গতিতে বাধা পড়ে বলেই তো বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে, বাধার কষ্টকে সৃষ্টির আনন্দে মানুষ ভুল্‌তে পেরেছে। ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশী, রিক্ততার চেয়ে পূর্ণতাই যখন বেশী করে উপলব্ধি হতে থাকে, ক্ষতিকে তখন মানুষ অগ্রাহ্য করে না, কিন্তু দেখে লাভের তুলনায় এ তুচ্ছ। আমাদের প্রাণের আবেগ যেন স্বচ্ছ ঝরণার বেগের মত হয়, কঠিন বস্তুকে গলিয়ে অতিক্রম করে যেন মহাপ্রাণে মিশে যেতে পারে।

দেনা-পাওনার সম্বন্ধ প্রভু-ভৃত্যের মাঝে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—আমার কোন কর্ত্তব্য নাই অথচ আমি কর্ম্ম করি—না করে উপায় নেই বলেই নয়, করাতে আনন্দ রয়েছে। আনন্দের উৎস থেকেই সৃষ্টির ধারা প্রবর্ত্তিত হয়ে আস্‌ছে। সকালবেলা বিচিত্র সুমিষ্টস্বরে পাখীগুলো আনন্দমনে গাইতে থাকে, তারা তো জগৎবাসীকে সে গান শোনাবে বলে গায় না—রাত্রিতে সুষুপ্তির মাঝে যে নবপ্রেরণা লাভ করে, সকালবেলার গানে সে আনন্দের বার্ত্তাই উছলে পড়ে। প্রভাতের আনন্দ জানার আনন্দ, এ শুভ মুহূর্ত্তে সবাই অনুভব করে—আমি কে? আমাকে জানা মানে আমি যে ক্ষুদ্র নই, বৃহতের সঙ্গে যে আমার নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্র বিদ্যমান—এ অনুভূতিতে বিভোর হয়ে থাকা। এর চেয়ে আর সেরা আনন্দ জগতে কি রয়েছে—আমাকে যখন আমি উপলব্ধিতে পাই!

মীরাবাঈ

——:*:——

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শুধু চম্পা আর চামেলিই নয়, ক্রমে ব্যাপার এমন হইয়া দাঁড়াইল যে মীরার মহলে যে যায়, দুদিনেই মীরার ছোঁয়াচ পাইয়া তাহার চিত্ত "সঁবলিয়ার" অনুরাগে রাঙিয়া উঠে। বিক্রমাদিত্যজী দেখিলেন, এ তো ভারী বিপদ! যাকে-তাকে দিয়া তো এ মেয়েকে বাগ মানাইতে পারা যাইবে না। উদাবাঈ ছিলেন রাণার ভগিনী। বিদুষী ও বুদ্ধিমতী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। রাণা ভাবিয়া-চিন্তিয়া উদাবাঈকেই মীরার কাছে পাঠাইলেন মীরার মন ভাঙ্গাইতে।

উদাবাঈর সঙ্গে মীরার যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, মীরার ভণিতা দিয়া কয়েকটী শব্দে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। মীরা বৈরাগিণী সাজিয়াছেন, রাজভোগ ত্যাগ করিয়াছেন, সাধু-সন্তের সঙ্গে মাতিয়াছেন, ইহাই উদার অনুযোগ। মীরা হাসিয়া বলিলেন—

সাধুন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোকলাজ খোঈ—
যহ্‌ তো বাত ফুট গঈ জানত সব কোঈ;
মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসূরা ন কোঈ!
অঁসুঅন জল সীচ্‌ঁ সীচ্‌ঁ প্রেম বেল বোঈ,
যহ্‌ তো বেল ফৈল গঈ, অমৃত ফল হোঈ;
মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসূরা ন কোঈ!

আঁসুঁয়া মেঁ ভগত জান জগত দেখ রোঈ,
লোগ-কুটুম ভাঈ-বন্ধু সঙ্গ নহী কোঈ ;
মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোঈ !

—সাধুসন্তের সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া আমি তো লোক-লজ্জার মাথা খাইয়াছি ; আর এ কথা ছড়াইয়াও পড়িয়াছে সবখানে, সবাই এ কথা জানে ; আমার তো আছে কেবল গিরিধর গোপাল, আর তো কেউ নয় !

—আঁখিজল সেঁচিয়া সেঁচিয়া প্রেমের লতাটী রোপন করিয়াছিলাম ; এখন সে লতা বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে ফলিয়াছে অমৃত-ফল ; আমার তো আছে কেবল গিরিধর গোপাল, আর তো কেউ নয় !

—ভক্তির প্রবাহ এখানে বহিয়া যাইতেছে দেখিয়া জগৎ চোখের জল ফেলিতেছে ; ভাই বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনের মাঝে আমার সঙ্গী কেহই নাই ; আমার তো আছে কেবল গিরিধর গোপাল, আর তো কেউ নয় !

উদাবাঈর যুক্তি-তর্ক, অনুরোধ-উপরোধ, তর্জ্জন-গর্জ্জন সমস্ত বিফল হইয়া গেল ; মীরার মন কিছুতেই টলিল না। তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া মীরা অবশেষে বলিলেন—

উদাবাঈ মন সমজ জাবো অপনে ধাম,
রাজপাট ভোগো তুমহী, হমেঁ ন তাসুঁ কাম !

—উদাবাঈ, মনকে প্রবোধ দিয়া তুমি আপন ঘরে যাও ; রাজপাট তুমিই ভোগ কর, আমার তাহাতে কোনও প্রয়োজন নাই !

উদাবাঈ হার মানিলেন—শুধু বাহিরে নয়, অন্তরেও। ইহার পূর্ব্বে মীরাকে যাহারা বুঝাইতে আসিয়াছিল, তাহাদের যে দশা হইয়াছিল, উদারও সেই দশা হইল। মীরা পরশমণি, তাঁহার স্পর্শে উদার চিত্তও সোনা হইয়া গেল, উদা প্রকাশ্যেই মীরাকে গুরু স্বীকার করিলেন।

উদাবাঈর সম্বন্ধে একটী কাহিনী প্রচলিত আছে। উদাবাঈ একদিন জেদ ধরিয়া বসিলেন, যেমন করিয়াই হউক, আজ মীরা তাঁহাকে গিরিধরের সহিত দেখা করাইয়া দিবেন। উদার জেদ এড়াইতে না পারিয়া মীরা সকলকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিলেন। আয়োজন শেষ হইলে মীরা উদাকে লইয়া সখীদের মাঝে বসিয়া করুণ কণ্ঠে প্রেম ও বিরহের পদ রচনা করিয়া গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার অমৃতনিস্যন্দিনী স্বরলহরীতে উন্মথিত হইয়া সকলের চিত্তই তল্লীন হইয়া গেল। এমনি করিয়া কতক্ষণ যে কাটিয়া গেল, তাহা কেহই খেয়াল করিল না। গভীর নিশীথে এক দিব্য জ্যোতিঃতে গৃহ আলোকিত হইয়া উঠিল ; মুগ্ধ বিস্ময়ে সকলে দেখিল, মীরার "গিরিধর নাগর" ললিত ভঙ্গীতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। মীরাকে বুকে জড়াইয়া তাঁহার চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে গিরিধর বলিলেন, "এমন করিয়াই কাঁদিতে হয় ? ছিঃ ! এই যে আমি !"

দুয়ারে যাহারা প্রহরী ছিল, তাহারা পুরুষের কণ্ঠ শুনিতে পাইয়া মহারাণাকে সংবাদ দিল। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার বিবৃতি আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি।

যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন কুলের গৌরব বজায় রাখিবার দরুণ মীরাকে গোপনে হত্যা করার পরামর্শ হইল। কথা হইল, গোবিন্দের চরণামৃত বলিয়া মীরাকে বিষের পাত্র পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। কাজেও তাহাই হইল। মীরার শুভার্থিনীরা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু মীরা তাঁহাদের কথা

শুনিলেন না। যখন বিষের পেয়ালা তাঁহার সম্মুখে আসিল, তখন হাসিমুখেই তিনি তাহা তুলিয়া লইলেন। এই ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া মীরা নিজেই বলিতেছেন,

বিষ কো প্যালো রাণাজী মেলো।
দ্যো মেড়তনী নে পায়;
কর চরণামৃত পী গঈ রে
গুণ গোবিন্দ রা গায়।

—বিষের পেয়ালা রাণাজী পাঠাইয়া দিলেন, তাহারা মেড়তাণীকে (মীরাকে) তাহা আনিয়া দিল; চরণামৃত জ্ঞানে তাহা পান করিয়া মীরা গোবিন্দের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

সম্ভবতঃ এই ব্যাপারেরই ইঙ্গিত করিয়া মীরা দুই শব্দটীতেই বলিতেছেন—

পিয়া পিয়ালা অমর রসকা
চঢ় গঈ ঘুম ঘুমায়।
যো তো অমল ম্হারো কবহু ন উত্‌রে
কোট করো ন উপায়!

—আমি যে অমৃতরসের পেয়ালায় চুমুক দিয়াছি, তাই জোর-নেশায় আমায় চাপিয়া ধরিয়াছে; এই নেশার আমেজ কি আমার কখনো ছুটিবে মনে কর? তোমরা কোটী কোটী ফন্দীই আঁট না কেন!

মীরার পাঁচ-ছয়টী শব্দে এই বিষপ্রদানের কাহিনী পাওয়া যায়, সে গুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন, বিষপানে মীরার মৃত্যু ঘটে; মীরার মুখে বিষ-প্রয়োগের কাহিনী পরবর্ত্তী শব্দকারদের যোজনা। কিন্তু এই ঘটনা সত্য হইতেও কোনও বাধা নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলাদেশেরই এক মহাপুরুষের এইরূপ দুর্ভোগ ঘটিয়াছিল, ইহা আমরা জানি। ঐকান্তিক বিশ্বাসে সব কিছুই সম্ভব। মীরাও বলিতেছেন—

মীরা প্যালা পী লিয়া রে
বোলো দোউ কর জোর—
তেঁ তো মারণ কী করী রে,
মেরে রাখণ হারো ঔর!

—মীরা বিষের পেয়ালা পান করিয়া ফেলিলেন; তারপর যুক্তকরে বলিলেন, তুমি তো আমাকে মারিবার আয়োজন করিতেছ, কিন্তু আমার রক্ষাকর্ত্তা আর কেউ আছে!

এই বিষপান সম্বন্ধে একটী শব্দ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহাতে যে কর্ম্মচারী মীরার দরুণ বিষ লইয়া আসে, তাহার নাম পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, শব্দটীতে ভাবের যেমন সরল ও তেজস্কর অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না। শব্দটী এই—

সীসোদ্যা রাণো, প্যালো ম্হাঁনে ক্যুঁ রে পঠায়ো:
ভলী-বুরী তো মৈঁ নহিঁ কোন্‌হী,
রাণা ক্যুঁ হৈ রিসায়ো।
থাঁনে ম্হানে দেহ দিয়ী হৈ,
ভ্যাঁ রো হরিগুণ গায়ো॥
কনক কটোরে লে বিষ ঘোলী
দয়ারাম পণ্ডো লায়ো।
উঠী উঠী তো মৈঁ দেখ্যো
কর চরণামৃত পায়ো॥
আজ কাল কী মৈ নহিঁ রাণা,
জদ যহ ব্রহ্মণ্ড ছায়ো
মেড়তিয়াঁ ঘর জন্ম লিয়ো হৈ,
মীরা নাম কহায়ো।

শিশোদীয় রাণা, তুমি বিষের পেয়ালা কেন আমার কাছে পাঠাইয়াছিলে? আমি তো তোমার ভাল-মন্দ কিছুই করি নাই রাণা, তবে তোমার এত রিষ কেন আমার উপর? তোমাকে আমাকে দেহ দিয়াছেন যে হরি, আমি তো তাঁহারই গুণ গাইতেছিলাম; সোনার কটরায় বিষ গুলিয়া দয়ারাম পাণ্ডা লইয়া

আসিল ; একবার আমি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, তারপর চরণামৃত মনে করিয়া তাহা পান করিয়া ফেলিলাম। রাণা আমি তো আজকালকার নই ; একদিন আমিই এই ব্রহ্মাণ্ড ছাইয়াছিলাম ; আজ মেড়তার ঘরে জন্ম লইয়া আমি মীরা নামে পরিচিত। মৃত্যু আমার কি করিবে ?

করুণায়, বেদনায়, বিশ্বাসে, জ্ঞানে এই শব্দটী বাস্তবিকই মীরার হৃদয়ের বিচিত্রভাবের ব্যঞ্জনাটী অতি সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

বিষপ্রয়োগে মীরার প্রাণনাশ হইল না দেখিয়া রাণা আর এক ফন্দী আঁটিল। একটা ঝাঁপিতে বিষধর সাপ পূরিয়া মীরার কাছে পাঠাইয়া দিয়া বলা হইল, ইহাতে হাত পূরিয়া যাহা আছে তুলিয়া লও। কিম্বদন্তী এই, মীরার স্পর্শে বিষধর সর্প শালগ্রাম শিলাতে রূপান্তরিত হইয়া গেল ! মীরার দুই একটী শব্দে এই কাহিনীরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

আর একটী কাহিনীর উল্লেখ মীরার একটী শব্দে এইরূপ পাওয়া যায়—

শূল সেজ রাণা নে ভেজী
দীবো মীরা সুলায়।
সাঁঝ ভৈ, মীরা সোবন লাগী
মানো ফুল বিছায়।

—রাণা কণ্টকশয্যা পাঠাইয়া দিল মীরাকে শোয়াইবার দরুণ ; সন্ধ্যা হইয়া গেল, মীরা শুইতে গেলেন, কিন্তু মনে হইল, বিছানায় যেন ফুল বিছাইয়া রাখা হইয়াছে !

এই সমস্ত কাহিনী সম্ভব কি অসম্ভব, সে কথা লইয়া আমরা তর্ক করিব না। এ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। সাধুচরিত্রের অনুশীলন দ্বারা নিজকে সাধু গড়িবার উপাদান সংগ্রহই আমাদের প্রয়োজন ; সুতরাং আমরা বুঝিতে চাই সাধুর ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিশ্বাস, ব্যাকুলতা ইত্যাদি ; সিদ্ধাই তাঁহাদের (এবং আমাদেরও) মনের ময়লা মাত্র ; ইহাকে ছাপাইয়া আত্মার যে বিমল জ্যোতিঃ চরাচরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, আমরা তাহাতেই স্নাত, পূত হইতে চাহি।

শ্বশুরঘরে মীরার উপর নির্য্যাতন কিছু কম হয় নাই, এ কথা সত্য। রাণা ও আত্মীয়স্বজনকে উল্লেখ করিয়া মীরার কতকগুলি শব্দ আছে, সেগুলি পড়িলে করুণায় হৃদয় গলিয়া যায়, বর্ষণস্নাত ক্ষুদ্র জুঁইটীর মত মীরার হৃদয়টী একটী বেদনাবিহ্বল মিষ্ট সুবাস লইয়া যেন ভাসিয়া উঠে।

রাণার ক্রমিক অত্যাচারে উদ্বেজিত হইয়া করুণকণ্ঠে মীরা বলিতেছেন—

রাণাজী, ম্হাঁরী প্রীত পুরবলী মৈঁ ক্যা করূঁ ?
রাম নাম বিনে ঘড়ী ন সুহাবে,
রাম মিলে ম্হাঁরা হিয়রা ঠরায় !
ভোজ নিয়া নহিঁ ভাবে ম্হাঁনে,
নীঁদড়লী নহিঁ আয় !

—রাণাজী, এ যে আমার জন্মজন্মান্তরের প্রেম, আমি কি করিব, বল ? রাম ছাড়া আমার এক মুহূর্ত্তও যে ভাল লাগে না, তাহাকে পাইলে তবে যে আমার হিয়া শীতল হয় ; তাহাকে না পাইলে আমার মুখে যে অন্ন রোচে না, চোখে ঘুম আসে না !

পেয়াঁ বাসক ভেজিয়া জী
যে হৈ চন্দনহার।
নাগ গলেমেঁ পহিরিয়া,
ম্হাঁরো মহলাঁ ভয়ো উজার।

—তুমি সাপের পেটিরা আমার কাছে পাঠাইয়াছিলে, কিন্তু আমার কাছে তাহা হইল চন্দনহার !

সাপ আমি গলায় তুলিয়া লইলাম—আমার মহল আলোয় আলোময় হইয়া গেল!

রাণাজী, থেঁ ক্যানে রাখো মোসূঁ বৈর?
রাণাজী, থুঁনে অসা লগত হৈ
জ্যুঁ বিরছন মেঁ কের!

—রাণাজী, মিছামিছি তুমি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছ কেন? তুমি তো জান না রাণা, এ জগৎটা আমার কাছে এমন মনে হইতেছে যেন এ একটা কণ্টকবন, এতে না আছে ছায়া, না আছে ফল!

ক্ষোভহীন বৈরাগ্যের কি করুণ চিত্র!

(ক্রমশঃ

ভাগবত-ধর্ম্ম

ভাগবত ধর্ম্ম কি?—স্বয়ং ভাগবতই বলিতেছেন, **স বৈ পুংসঃ পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।**—ভগবানে যে ভক্তি, তাহাই জীবের পরম ধর্ম্ম।

আর এই পরম ধর্ম্মই ভাগবত ধর্ম্ম।

ভাগবতের গোড়াতেই এই ধর্ম্মের কয়েকটী কয়েকটী লক্ষণ সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। আমরা এখানে তাহারই আলোচনা করিব।

ভাগবত বলিতেছেন, এই যে ভক্তিরূপ পরম ধর্ম্ম, ইহা "প্রোজ্‌ঝিতকৈতব" অর্থাৎ যাহা হইতে কৈতব বা কপটতা নিঃশেষে দূর হইয়া গিয়াছে। শ্রীধর বলিতেছেন, ফলাভিসন্ধিই হইতেছে কপটতা। আমি ভগবানকে ভক্তি করি;—কেন করি, তাহা অনেক সময় বলিতে না পারিলেও মনের আনাচে-কানাচে একটু তীব্র দৃষ্টি লইয়া সন্ধান করিলেই অনেক গলদই বাহির হইয়া পড়ে। গীতায় এই হেতুগুলি ধরিয়া একটা অধিকারী ভেদের কল্পনা আছে। ভগবান্ বলিতেছেন, চার রকম লোকে আমার ভজনা করে; যাহারা বিপদে পড়িয়াছে, যাহারা কিছু চায়, যাহারা জিজ্ঞাসু, এবং যাহারা জ্ঞানী।

বিপদে পড়িলে ভগবানে ভক্তি হয়, একথা আমরা জানি। এমন ভক্তিকে কটাক্ষ করিতেছি না; বরং ভক্তির উন্মেষক বলিয়া বিপদকেও তাঁহারই আনুকূল্যের নিদর্শন বলিয়া অভিনন্দন করি। চিত্ত যখন রজোগুণের ভূমিকায় থাকে, তখন একটা কিছু সংঘর্ষ না ঘটিলে তাহার চেতনা হয় না। বিপদই আমাদের চেতাবন। নিরবচ্ছিন্ন সুখ নিয়া আসে মোহ, জড়ত্ব এবং তাহারই সহিত একটুখানি সূক্ষ্ম বিরক্তি। এই জন্য যাহাদের চিত্ত দ্রঢ়িষ্ঠ, তাহারা ইচ্ছা করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনে, কেননা আঘাত না পাইলে যে চিত্ত জ্বলিয়া উঠিতে চায় না। বিপদে ভক্তির এইটা হইল ভাল দিক। মন্দ দিকটা সবাই জানি। সেটাতে কৈতব আছে, সে তো জানা কথাই। এই ভাল দিকটাতেও একটুখানি কৈতব আছে—কিন্তু খুব সূক্ষ্ম। একটা নিমিত্ত ধরিয়া ভক্তির উন্মেষ, এটা ভাল কথা নয়। পরধর্ম্ম তাহা হইলে অহৈতুকী হইল না। আমার

নিমিত্ত চলিয়া গেলে ভক্তিতেও ভাটা ধরিবে ; ভক্তি তাহা হইলে অপ্রতিহতাও হইল না। দুইটাই দোষের। আসল কথা, বিপদ্ এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ্‌ও তুচ্ছ হওয়া চাই ; তবেই পরধর্ম্মের দিব্যরূপ ফুটিয়া উঠিবে। বিপদ্‌টাই যদি একান্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে কি আর ইহা সম্ভবপর ?

অর্থার্থী ভক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর। ইহার কৈতব পুরাপুরি। তোমাকে ভক্তি করি, কোনও মৎলব হাঁসিল করিব বলিয়া। তোমাকে চাই না, কিন্তু তোমার উপাধি চাই। অতি ছোট নজর। নিজেরও উপাধি ছাড়া আর কিছুর দিকে দৃষ্টি নাই। আমি আমার কথাই ভাবি না, আমার কথাই বুঝি না ; তোমার কথা কি ভাবিব, কি বুঝিব ? যদিই বা বলি, তোমাকেই চাই, এই রূপে বা এই গুণে ; তাহা হইলেও সেটাও তো কামনার কামড়ানি হইল। খুব সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-বিলাস বটে, কিন্তু তবুও তাহাকে বলিব জঘন্য। মন্দবুদ্ধি এইখানে আসিয়া ঠেকিয়া যায়। সে বলে, যে রূপেই তোমায় ভাবনা করি না কেন, তাই তো তোমার উপাধি ; একটা কিছু নিদর্শন যদি না ধরি তো তোমার নাগাল পাই কি করিয়া ? কি করিয়া ভজনা করি ? এ কথার জবাব দেওয়া শক্ত। যে যে স্তরের মানুষ নয়, তাহাকে সেই স্তরের খবর দিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। বলিলে বিশ্বাস করিবে কি, তাঁহার এতটুকু নিদর্শনও আঁচিয়া রাখিতে না চাহিয়াও তাঁহাকে ভালবাসা যায় ? এ কথা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অসম্ভাব্যের সম্ভাবনই তো সাধনা। লাঠিতে একটী আঙ্গুলের ভর দিয়া বাজীকর শূন্যে বসিয়া থাকে। তেমনি শূন্যে বসিয়া থাকিতে শিখিতে হইবে। জগতের সঙ্গে, অর্থের সঙ্গে, নিমিত্তের সঙ্গে সম্পর্ক মাত্র এইটুকু—ওই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া যষ্টির একটী প্রান্ত শুধু ছুঁইয়া থাকা। সমজদার জানে, ওরকম ছুঁইয়া থাকা না ছোঁবারই সামিল। অহৈতুকী ভক্তির সহিত অর্থার্থী ভক্তির এইখানি তফাৎ অর্থাৎ দিনের সঙ্গে রাত্রের যতটুকু তফাৎ ততটুকু তফাৎ। আবারও স্মরণ করাইয়া দিই—এই মন্ত্রই জপিতে হইবে, তোমাকে ভালবাসি, কোনও অর্থই চাহি না বলিয়া ; আমার অর্থ যে চাহি না, তা নয়, তোমার অর্থও চাহি না। তোমার মনমতন করিয়া তুমি আমার আস্বাদন কর, আমার মনমত করিয়া তোমায় আমি চাখিতে চাহি না।

তিন নম্বর জিজ্ঞাসু। এ উন্নত অধিকারী। বিপদে পড়িয়া নয়, মতলব হাঁসিল করিবে বলিয়া নয়—স্বভাবের প্রেরণায় এ ভগবানকে ভজনা করে। এ ব্যক্তি বিবেকী তাই তাহার মাঝে আছে একটা দ্বন্দ্ব, একটা অতৃপ্তি। এখানে সে যাহা পাইয়াছে, তাহাতে সে তৃপ্ত থাকিতে পারিতেছে না বলিয়াই সে ওপারের পানে হাত বাড়াইয়াছে। তাই সে জিজ্ঞাসু। তার কাছে প্রতিভাত হয় জীবনের একটা দ্বৈত ব্যঞ্জনা ; একটা তার বাস্তব, আর একটা তার আদর্শ। বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া সে খোঁজে আদর্শকে। সে আদর্শ কি ভগবান্ ? জিজ্ঞাসু ভক্ত এখানকার সবই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছে ; কিন্তু তাহার আশ মিটে নাই। তাই সে চায় প্রপঞ্চাতীতকে। আমরা এক বাক্যে বলিব, এর চেয়ে বড় লক্ষ্য আর কি হইতে পারে ? যে জগৎ ছাড়িয়া ভগবানকে চায়, তার চাওয়ার মাঝে ত্রুটী কোথায় ? কিন্তু, শ্রীধর বলেন, না, ইহাকেও আমরা অকৈতব বলিতে পারি না। বাস্তব আর আদর্শে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছে, তার চাওয়াতে গরিমা থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকেই চরম বলিয়া স্বীকার করিব না। এই জিজ্ঞাসুর ইহলৌকিক বা পারলৌকিক আর কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকুক, মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা তো

রহিয়াছে? ভগবৎ-প্রাপ্তিতে মোক্ষ—জীবনভরা দ্বন্দ্বের অবসান, এই তাহার লক্ষ্য। খুব উঁচু কথা বটে, কিন্তু ইহাই অন্তরতম কথা নয়। ওত দ্বৈত ভাবনার ছোঁয়াচটুকুও যদি না থাকিত, আর তাহার হৃদয় হইতে স্বতঃ-উৎসারিত হইয়া ছুটিত ভক্তির জাহ্নবী-ধারা, তবে তাহাকে পরধর্ম্মের অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিতাম।

মুক্তিও চাহি না—এটা বাহাদুরীর কথা নয়, রাগের কথাও নয়। মুন্সীয়ানা করিয়া যাহারা বলে "চাই ভক্তি, মুক্তি তার দাসী", তাহাদের বলি, বাপুহে মুক্তিটা কেমন চিজ্ তাহা চিনিয়া ফেলিয়া ওই বুলি কপচাইতেছ তো? না ও শুধু ফাঁকা আওয়াজ? জ্ঞান তো মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা আর ভক্তিকে এক জিনিষ বলিয়া প্রমাণ করা যায়? ভক্তির টানে মুক্তিকেও যে তুচ্ছ করিতে পারে, সে বন্ধন মোক্ষের পর পারের সহজ মানুষ; সে তোমার আমার মত ভক্তির ব্যবসাটী নয়।

জিজ্ঞাসুর পরেও জ্ঞানী। ভগবান্ বলেন, জ্ঞানী ভক্ত একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। যিনি ভক্ত, তিনি যেমন মোক্ষকামী নন, তেমনি যিনি জ্ঞানী, তিনিও মোক্ষকামী নন। ভাগবত ধর্ম্ম ভগবানেরই আত্মস্বরূপ। অতএব তিনিই যথার্থ ভক্ত, তিনিই পরধর্ম্মের বিগ্রহ। জ্ঞানী আর ভক্ত যেন একটা পাতার এ ধার আর ও-ধার। ভেদ-জ্ঞান মূঢ়তার পরিচায়ক মাত্র।

জানা অর্থে উপাধি সহায়ে জানা নয়; তেমন করিয়া জানে আর্ত্ত, অর্থার্থী আর জিজ্ঞাসু। জানা মানে হওয়া—মিলাইয়া যাওয়া। আত্ম-স্বরূপে কৈতবের স্থান হইতেই পারে না। যেখানে সব এক, সেখানে কৈতব কোথায়? সব এক বলিলাম বলিয়া শিহরিয়া উঠিও না। অদ্বৈত-তত্ত্ব শুধু জ্ঞানীরই একচেটিয়া নয়; ভক্তেরও তাহাতে বখরা আছে। ভাগবতই বলিতেছেন, যাঁহারা তত্ত্বের খবর রাখেন, তাঁহারা বলেন মূলে সেই অদ্বয়-তত্ত্বই যোগমায়ার লীলায় ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমায় হেলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ওই ত্রিভঙ্গই—ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্। অদ্বয়-তত্ত্ব, ওই তিনটাকে জড়াইয়া। তিনটাকে অনুভবে নিবিড় করিলে পাই এক; আবার যে এক করে, সে-ও তো এক। অতএব একে একে হইল দুই। এই দুইয়ে যে ভেদ থাকিয়াও ভেদ নাই, এইটাই হইল অদ্বয়-তত্ত্ব। দুইয়ে এক না হইলে, অদ্বৈত হয় না। জ্ঞান আর ভক্তির একত্ব এখানেই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে।

মোট কথা, এই পাইলাম, ভক্তের কৈতব যায় তখন, যখন ভক্ত জ্ঞানী; যখন ভক্ত আত্মস্বরূপ; অথবা ভক্তি যখন অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা। এই কৈতবহীন জ্ঞান-সমঞ্জসা ভক্তিই ভাগবতের ধর্ম্ম।

ভাগবত আর একটী গভীর কথা বলিতেছেন, এই ধর্ম্ম "সতাং নির্ম্মৎসরাণাং"—মাৎসর্য্যহীন সাধুদের এই ধর্ম্ম। ছয়টী রিপুর কথা সবাই জানি। রিপুর অত্যাচার থাকিতে যে ভক্তির আবির্ভাব অসম্ভব, ইহাও জানা কথা। কিন্তু এখানে বিশেষ করিয়া মাৎসর্য্যের প্রতি কটাক্ষ কেন, তাহার একটা তাৎপর্য্য আছে। রিপুগুলি যে ভাবে সাজানো হয়, তাহার মাঝে স্থূল-সূক্ষ্মের একটা ক্রমিকত্ব আছে। প্রথমেই ইহাদিগকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; কাম ক্রোধ-লোভ এই তিনটী মূলতঃ শারীর-বৃত্তি, গীতা ইহাদিগকে নরকের দ্বার বলিয়াছেন। আর মোহ-মদ-মাৎসর্য্য এই তিনটী মানস বৃত্তি। কাম-ক্রোধ-লোভেরও স্থূলত্ব ক্রমিক; কাম সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, শারীর-বিকার ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া অনেক সময় ধর্ম্মের প্রথম সোপান ব্রহ্মচর্য্যকে আমরা কাম দমনের উপায়রূপেই বুঝিয়া থাকি। শারীর নিগ্রহ করিলে কাম সকলের আগে যায়, তারপর যায় ক্রোধ, তারপর লোভ; অথবা শারীর-নিগ্রহের পরম্পরা অনুসরণ করিতে হইলে

প্রথমতঃ কামের সহিত লড়িতে হইবে ইত্যাদি। শারীর-নিগ্রহের পর মানস-নিগ্রহ। মোহ মনের প্রাথমিক আবরণ। মায়ার আবরণী-শক্তিতে বস্তুর স্বরূপ আবৃত করিয়া তদনন্তর বিক্ষেপ-শক্তির সহায়ে অবস্তুর সত্তা সম্ভাবিত করে, মোহ বা অজ্ঞানও সেইরূপ চিত্ত-ক্ষেত্রকে অধিকার করিয়া সেই আঁধারের ভূমিকায় অহঙ্কাররূপ বিক্ষেপের স্ফুরণ করিয়া থাকে। অহঙ্কার কোথায়ও প্রতিহত হইলেই মাৎসর্য্যের উদ্ভব। মোহ স্থূলতম; ইহাকে আয়ত্ত করিলে অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যকে আয়ত্ত করিবার কৌশল জানিতে পারা যায়! শারীর কাম ও মানস মোহ বলিতে গেলে এই দুইটীই জীবের বাহিরে-ভিতরে প্রসূতি।

ভক্তির অনুশীলনে সাধক যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই ওই ষড়্রিপুর একটী একটী করিয়া সব খসিয়া পড়িতে থাকে। যিনি সাধু, তিনি কামজিৎ, অক্রোধ, নির্লোভ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার;—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সব বৃত্তি স্তিমিত হইয়া গেলেও মাৎসর্য্য যেন অন্তরের কোন কানাচে আত্মগোপন করিয়া থাকে। শরণাগতি ধর্ম্মের ক্রমঃ-স্ফুরণে এটী সুন্দর ধরা পড়ে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার সব প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়া দিয়াও মাৎসর্য্যের হাত হইতে রেহাই পাই না। প্রভু যদি আজ কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরাগ প্রদর্শন করেন তো আমার চিত্ত জ্বলিয়া উঠে কেন? শুনিয়াছি শঙ্করের চেলারা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন করিতে করিতেও ঈর্ষ্যার হাত হইতে বাঁচিতে পারেন নাই। গুরুগত প্রাণ দুই শিষ্য, কোথায়ও তাহাদের হৃদয়ে এতটুকু কলঙ্কের ছোঁয়াচ নাই, কিন্তু খুঁজিলে দেখিবে, দুজনায় একটু আড়াআড়ি যেন রহিয়াই গিয়াছে। মানব-চিত্তের এই এক অদ্ভুত রহস্য। সব বৃত্তির নাগাল পাই, সবার টুঁটি চাপিয়া ধরিতে পারি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই মাৎসর্য্য যেন কি করিয়া দৃষ্টি এড়াইয়া চলিয়া যায়। মাৎসর্য্যের অভিভব সব চেয়ে দুরূহ বলিয়াই ষড়্রিপুর ছকে ইহার স্থান সর্ব্বশেষে। ভাগবত যে সাধুর বিশেষণরূপে নির্ম্মৎসর শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে নিঃশেষে সমস্ত রিপু জয় না করিলে, এমন কি মাৎসর্য্যের অতীত না হইতে পারিলে ঠিক ঠিক মনের কৈতব যায় না, ভিতরে ভিতরে একটু-না একটু গলদ থাকিয়াই যায়।

ভাগবতের পরম ধর্ম্ম নির্ম্মৎসর। কিন্তু একটী বিস্ময়ের কথা এই, ভগবানের যে মদনমোহন লীলা ভাগবতের প্রাণ, সেখানে কিন্তু লীলার স্ফুরণে মাৎসর্য্যই প্রধান সহায়। রসশাস্ত্রকারেরা বিপ্রলম্ভ ব্যতিরেকে সম্ভোগের পুষ্টি হয় না বলিয়া থাকেন। তাই রসপুষ্টির দরুণ নায়িকা-প্রতিনায়িকার সৃষ্টি; এবং মাৎসর্য্য এইখানেই বিপ্রলম্ভকে আশ্রয় করিয়া প্রেমের একটী নূতন ভঙ্গী দৃষ্টিতে প্রকট করিয়া তোলে। "নির্ম্মৎসর প্রেম" যুক্তিবিচারে আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু ভাগবত গোড়াতেই যে "বাস্তব" বস্তুর বেদনকে ভাগবতের প্রতিপাদ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, মাৎসর্য্যযুক্ত প্রেম ছাড়া যে সেই বাস্তবতার কোনও মর্য্যাদাই থাকে না। ইহা দেখিয়া মনে হয়, ভাগবতে যে ধর্ম্ম প্রথম আভাসিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী রসিক মহাজনেরা তাহার পরিপূর্ত্তি ঘটাইয়া সেই ধর্ম্মের চমৎকারিতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভাগবত মুখ্যতঃ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন, নির্ব্বেদযুক্ত অধিকারী; আর মহাজনেরা সৃষ্টি করিয়াছেন যথার্থ "রসিকাঃ ভুবি ভাবুকাঃ।" এবং এই বিষয়ে বাঙ্গালী মহাজনদিগের কৃতিত্ব, সূক্ষ্মদর্শন ও সাহসিকতা বাস্তবিকই বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া থাকে।

ভাগবত বলেন, এই পরমধর্ম্ম **বাস্তব**—"বেদ্যং বস্তু বাস্তবমত্র শিবদং—তাপত্রয়োন্মূলনম্।" এই কথাটীরও নিগূঢ় ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। ভক্তি জীবের স্বভাব, অতএব উহা বাস্তব। শ্রীধর বলেন, বস্তু বা

পরম সত্যের অংশ যে জীব, তাহার শক্তি যে মায়া এবং তাহার কার্য্য যে জগৎ—এই তিনটী লইয়াই বস্তুর বাস্তবতা। ইহারাই লীলার উপাদান। বিবেকে যে জগৎকে প্রত্যাখ্যান করি, লীলাতে আবার তাহা ফিরিয়া পাই। ইহাই লীলার বাস্তবতা। ভাগবতধর্ম্ম এই বাস্তবতার প্রচারক। কিন্তু বাস্তব বলিতে এই যে দুঃখতপ্ত ও অশিবকর প্রপঞ্চ আমাদের অসম্যক্‌দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, তাহার মানদণ্ড দ্বারা কিন্তু লীলার বাস্তবতার বিচার করিতে হইবে না। এই জন্যই শেষের দুইটী বিশেষণ—শিবদং, তাপত্রয়োন্মূলনম্। ভাগবতের সারীভূত রাসলীলা বাস্তবের নির্ম্মুক্ত আলেখ্য, অথচ মহাজনেরা বলেন, ইহা "শৃঙ্গারকথাব্যপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরা।" ইহা এক রহস্য; আর এই রহস্যই ভাগবতধর্ম্মের প্রাণ।

ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিকতা

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই ভাগবত-দৃষ্টি লাভ করবার দরুণ ভারতের ঋষিরা যে পথ অবলম্বন করেছিলেন, তার সম্বন্ধেই তোমাদের কিছু বল্‌ব। ভারতের লোকে বলে, বেদ ভগবানের লেখা, ঋষির লেখা। এর অর্থ এই, এই বেদ যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁরা দেহ-জ্ঞান, অহং-জ্ঞান বা ব্যক্তিত্ববোধ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে তবে তা লিখতে পেরেছিলেন। এই জন্যই যাঁদের হৃদয় থেকে বেদের উদ্ভব, তাঁরা হলেন গিয়ে ঋষি। কিন্তু তাঁরা বেদের রচয়িতা নন। ঋষি অর্থে দিব্য-সত্যের মন্তা, দিব্য-দ্যুতির দ্রষ্টা। আবার হিন্দু শাস্ত্রের কোন কোন জায়গায় লেখা আছে যে, বেদ (তোমাদের যেমন বাইবেল, হিন্দুর তেমনি বেদ) হচ্ছে যেন একটা গাছ—তার বীজ হচ্ছে—ওঁ(হ্)ম্—ওঁ(হ্)ম্—ওঁ(হ্)ম্! এই হচ্ছে বীজ, যা থেকে বেদের উদ্ভব। আচ্ছা, এই যে আগে বলেছিলাম, যাঁরা বেদ লিখেননি, তাঁদের থেকে বেদের আবির্ভাব, যেমন নাকি গোলাপ ফুট্‌লে তার সুবাস ছড়িয়ে পড়ে, বা প্রদীপ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়, তেমন বেদের স্বত আবির্ভাব ;—এই মতের সঙ্গে এখনকার মতের সামঞ্জস্য হবে কি করে? দুটী মতের এইভাবে সামঞ্জস্য হতে পারে যে যারা উন্নততর প্রেরণা চায়, যারা ভাগবত-দৃষ্টি লাভ করতে চায়, যারা এই অহং-বদ্ধ, তুচ্ছ, ক্ষুদ্র দেশকালাবচ্ছিন্ন আমির জ্ঞানকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে চায়, তারা ওঁ(হ্)ম্—মন্ত্র জপ করে বেদের জ্ঞান, বেদের আলো পেয়েছিল।

কিন্তু এ তো শুধু বাগ্‌যন্ত্র দিয়ে জপ নয়, এ যে আরো কিছু। ঠোঁটে আর মুখে যখন বাহ্যতঃ জপ হয়েছে, মন তখন জপ করেছে অন্তরে আর ভাব তাকে জপেছে আরও উচ্ছ্বসিত আবেগে। এই তিন রকম জপের সামঞ্জস্যে তুমি পেয়েছ সবার সঙ্গে ঐক্যের অনুভূতি—যা নাকি দিব্য জ্ঞান, দিব্যদ্যুতি। এই পথ ধরে তাঁরা পেয়েছিলেন। এই জন্যই ওঁ মন্ত্রের অর্থ এবং তাৎপর্য্যই বা কি, তা তোমাদেরকে বোঝাতে হবে। সে কথা না হয় আর একদিন হবে। কিন্তু ওঁকারের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলবার

পূর্ব্বে এই মন্ত্রের ছোট ছোট দুটী চারটী ধ্বনির মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান কি করে নিহিত, সেটা তোমাদের বুঝিয়ে দিতে হয়।

ভগবান্ কি কথার খেয়ালী? এ কথাটা সবার মাঝেই জাগে। আমি তোমাদের দেখাব যে সর্ব্বময় সত্যস্বরূপের ওঁকারই হচ্ছে স্বাভাবিক অভিধান বা আসল নাম। এ নাম তো কোনও বিশেষ ভাষার এলাকায় পড়েনি। হিন্দুরা যে এই নাম নিচ্ছে, তার অর্থ তো এ নয় যে এ নামটা সংস্কৃত থেকে এসেছে। এ হচ্ছে স্বভাবের নাম, স্বভাবের শব্দ, স্বভাবের ধ্বনি, স্বভাবের মন্ত্র। কেউ কেউ হয়ত এটা হিন্দুর অভিধান ভেবে এ নাম প্রত্যাখ্যান করতে চাইবে। কিন্তু জান তো গোঁড়ামি মানেই আত্মম্ভরিতা, আর আত্মম্ভরিতাই হচ্ছে পরকে তাড়া করা। যারা গোঁড়া, তারা করে কি? যা কিছু তাদের ছাপমারা নয়, তাকেই তারা হাঁকিয়ে দেয়। ওটা হিন্দুর বলে এ নাম প্রত্যাখ্যান করো না। সংস্কৃত শব্দের ব্যাকরণ অনুযায়ী যে সমস্ত বিভক্তির পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর ঘটে, ওঁকারের কিন্তু তা হয় না। কাজেই শব্দটা সংস্কৃত নয়। ওটা একটা খাঁটী শব্দ—স্বভাবের শব্দ। হিন্দুরা এটা মেনে নিয়েছে মাত্র। প্রত্যেক শিশুই এই শব্দ নিয়ে জন্মায়। শিশু জন্মেই কি শব্দ উচ্চারণ করে? সে বলে, আম্, উম্, ওম্ কি মা। এখন দেখ, ওঃ, অঃ, আর উহ্ ম্ এই তিনটী মূল ধ্বনি দিয়ে ওঁ গঠিত। ফরাসী ভাষায় ও আর অ একত্র হলে হয় ও। সংস্কৃতেও এমনি সন্ধি আছে। ও আর অ জুড়ে যে ধ্বনি, সব জাতির সব শিশুই পরলোক হতে পুঁজি করে তা নিয়ে জন্মায়। মানুষের অসুখ হলে কি শব্দ উচ্চারণ করে সে আরাম খোঁজে? সে বলে—উঃ, উঃ, উঃ; এই বলে তার সোয়াস্তি। যে রোগী, মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় যে কাতর, তার সোয়াস্তির শব্দ হচ্ছে—এই ও(হ্)ম্! যে দেশেই জন্মাক না কেন, ছোট ছোট ছেলেপিলেরা যখন ভারী খুসী হয়ে ওঠে, তখন "ও(হ্)ম্" বলে তারা তাদের আনন্দের অভিব্যক্তি করে থাকে।

এই হচ্ছে কথা। এই হচ্ছে একটী শব্দ যা নাকি তোমার তুচ্ছ, ক্লিষ্ট, অভিমানরুদ্ধ, দেশকালাবচ্ছিন্ন চেতনার বাইরে যা কিছু তোমার মাঝে জাগে তারই দ্যোতক। তোমার একটা দৈশিক অনুভব আছে; তখন তোমার মনে হয়, তুমি যেন পাঁচ-ছয় ফিট্ সীমানার মাঝে আট্‌কা রয়েছ; তোমার চৌহদ্দীর উত্তরে হচ্ছে—মাথা, আর ওপর এখন হ্যাটই থাক্, আর পাগড়ীই থাক্; দক্ষিণে হচ্ছে একজোড়া জুতা! কিন্তু এই চৌহদ্দীর সীমানা ছাড়িয়ে যখন তুমি ওঠ, তখন ও(হ্)মের স্বভাব-মন্ত্র তোমার মাঝে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে।

দেখ্‌তে পাচ্ছি, জগতের সমস্ত ভাষাতেই ও(হ্)ম্ মন্ত্রের স্থান খুব উঁচুতে। ইংরেজীতে সর্ব্বজ্ঞকে বলা হয় ওম্-নিসিয়েণ্ট; তেমনি যিনি সর্ব্বভূতস্থিত, তিনি ওম্-নিপ্রেজেণ্ট; যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি ওম্-নিপোটেণ্ট। এই তো হচ্ছে ভগবানের সব চেয়ে মধুর আর সবার সেরা নাম; আর তাদের সুরুতেই দেখ ভগবৎনামের স্বভাব-মন্ত্র—ও(হ্)ম্। তোমাদের প্রার্থনাতে সমস্ত কথার যখন ইতি হয়, তখন তোমরা বল আমেন (amen); আরবীতে বলি (amin) ফার্সীতে বলি আমিন্। তাই দেখছি, সভ্য জগতের প্রধান কয়েকটী ভাষাতে যে প্রার্থনার মন্ত্র রয়েছে, তার ইতি যেখানে, যেখানে সমস্ত বাক্যের সমাধি নিস্তব্ধতার মাঝে, সেখানে সেই স্তব্ধতাকে বাণীর রূপ দেবার জন্য সবাই বলে ওম্। এই কথাটাই হিন্দু বলে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—দেয়ালের গায়ে একটা বল্ ছুঁড়ে মারলে তা যেমন ফিরে আসে, তেমনি যাঁর হতে সমস্ত বাক্য ও চিন্তা ফিরে আসে। এই অবস্থায় যখন আসে, তখন "আমেন" মন্ত্রই তোমাকে

বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। আমেন্ হচ্ছে ওমেরই বিকার। কাজেই দেখ, ওম্ হল গিয়ে ভগবানের স্বভাব-মন্ত্র—পরম সত্য-স্বরূপের একমাত্র বাচক!

আরও একটী কথা। তোমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যে শব্দ হয়, তা কি তোমরা লক্ষ্য করেছ? একটু লক্ষ্য করলেই বুঝ্তে পার্বে, শব্দটা হচ্ছে—সো-হহম্-হহম্-হহম্। নির্জ্জনে বেশ জোরে জোরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলো, দেখবে, ওই শব্দই হচ্ছে—সোঽহম্। সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দটার একটা অর্থ আছে। আর মনে রেখো, সংস্কৃতে যদিই বা এর একটা মানে পাওয়া যায় তো ইংরেজী ভাষাতেও সেটা মেনে নেওয়া হবে না কেন? শব্দবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে ইংরেজী, ফরাসী, স্কাণ্ডীনেভীয়, রুশীয়, গ্রীক, পারস্য সমস্ত ভাষাই সংস্কৃত ভাষার দুহিতা। কাজেই মায়ের সম্পত্তি মেয়েতে গ্রহণ করবে না কেন? দেখতে পাচ্ছি, সংস্কৃত ভাষায় সোঽহম্ শব্দটার একটা মানে আছে। 'সো' মানে তাই; 'হহম্' মানে আমি অর্থাৎ আমি তাই। এর সঙ্গে বিশেষ করে একটা শ্বাসত্যাগের প্রণালী যুক্ত আছে। তোমার শ্বাসের শব্দ যে সোঽহম্—তার মধ্যে দুটো ব্যঞ্জন আছে, আর বাকী সব স্বর। প্রথম ব্যঞ্জনটী আর হকারটী বাদ দাও, থাকবে ওম্। তবেই দেখ্ছি, মানুষের কি জীবজন্তুর শ্বাসপ্রশ্বাসে কিম্বা তাদের জীবনের আভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তির নিদান হচ্ছে দুটী ব্যঞ্জনবর্ণ—ওরা স্বরবর্ণের ওপর ভর দিয়ে আছে। এই পরাশ্রিত ব্যঞ্জন দুটীকে সরিয়ে নিলে তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের অনাহত ধ্বনি পাবে—ওম্। তবেই দেখছ, তোমার শ্বাসের প্রাণই হচ্ছে ওম্। যে শব্দ তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের আত্মস্বরূপ তা হচ্ছে এই প্রণব। তাহলে ভগবান্কে ডাকবার এই হচ্ছে সর্ব্বোত্তম মন্ত্র—তোমার হৃদয়ে যে বৈকুণ্ঠ রয়েছে তার অধিপতি যে সনাতন-পুরুষ নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ, তাঁর বাচক হচ্ছে প্রণব। সবার আত্মা, সবার প্রাণ তাহলে বেঁচে আছে ওঙ্কারে। ওঙ্কারের জপে বা উচ্চারণে যে উচ্চতর অনুভূতি ও কম্পনের সৃষ্টি হয়, তার বৈজ্ঞানিক কারণ তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারি।

জানই তো, শব্দ দুই রকম। ব্যাকরণ বল্ছে শব্দ ধ্বন্যাত্মক আর বর্ণাত্মক। বর্ণাত্মক শব্দগুলিকে স্পষ্ট উচ্চারণ করা যায়, বর্ণমালার সঙ্কেত অনুযায়ী লেখা যায়। আর ধ্বন্যাত্মক শব্দ হচ্ছে কেবলমাত্র একটা মুখের ভঙ্গী। বর্ণাত্মক শব্দের সৃষ্ট যে ভাষা, তা দ্বারা মস্তিষ্কের ধারণাযোগ্য বিষয়সমূহের আলোচনা হতে পাবে; আর ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বারা অন্তঃকরণের বা হৃদয়ের ভাবগুলো অভিব্যক্ত হতে পারে; এই হচ্ছে বর্ত্তমান যুগের মনস্তত্ত্ববিদের রায়। এ তো বোধ হয় জান, বর্ণাত্মক ভাষাদ্বারা কেবল নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি লোকের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান চলে। এই যেমন ধর, তোমাদের সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় কথা কইছি। যারা ইংরেজী জানে না, তারা আমার কথার এক বর্ণও বুঝ্বে না। একটা বিশেষ ভাষা আয়ত্ত কর্বার যে প্রণালী রয়েছে, সেই কৃত্রিম ধারাতে যারা অভ্যস্ত, আমি ইংরেজী বল্লে তারাই বুঝতে পার্বে, অপরে পারবে না। একটা লোক এসে ফার্সী বল্ছে, কি রাশীয়ান বল্ছে, কি সংস্কৃত বল্ছে, তুমি তার কথার একবর্ণও হয়ত বুঝবে না। সে ইংরেজী জানে না, কাজেই তোমাদের কথাও বুঝতে পারে না। কিন্তু এখন যদি সে কেঁদে ফেলে, তাহলে সবাই তাকে বুঝতে পারবে। তোমরা তখন বুঝতে পার লোকটার কি জানি কিসের অভাব, তার বড় দুঃখ, বড় বিপদ। একটা লোক এসে সংস্কৃত, ফার্সী বা জাপানী-ভাষা আওড়াচ্ছে, কিছু বুঝতে পারবে কি? কিন্তু সে এসে হাসতে সুরু কর্ল—সবাই তখন তার ভাব বুঝতে পারলে। এই যে কান্না-হাসি, এ বর্ণাত্মক নয়, ধ্বন্যাত্মক। কিন্তু এই ভাষাতেও কাজ চলে। শিশু তোমার ভাষায়

কথা কইতে পারে না ; কিন্তু লোকে বলে, প্রেমের ভাষা সবাই বুঝে। একটা বিড়াল এলো, তাকে তাড়াতে চাও। তার কাছে ফারসীতে, আরবীতে, সংস্কৃতে বা ইংরাজীতে বক্তৃতা করে দেখ দেখি—ও কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু হাতচাপড়ি দাও—বিড়ালটা পালিয়ে যাবে। এই হল ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বর্ণের সঙ্গে তার কোনও সংস্রব নাই ; অথচ তাতে কাজ চলে।

তাইতে আমরা দেখছি, ধ্বন্যাত্মক ভাষা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী—এই ভাষার নিদান মস্তিষ্কের চেয়েও গুঢ়তর। সপ্তদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিকেরা মানব-জীবনের শাসনকেন্দ্র মস্তিষ্কের মাঝে স্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁদের ভুল ধরা পড়েছে। আজকাল আবার দার্শনিকেরা বলতে সুরু করেছেন, হৃদয়ের নাড়ী-কেন্দ্রই মানুষকে চালাচ্ছে। ওইখানেই মানুষের শাসন-কেন্দ্র। তাই বলছিলাম, ধ্বন্যাত্মক ভাষা আসে, মানুষের মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি-কেন্দ্রের চেয়ে গভীরতর কোনও প্রদেশ থেকে। একটী মেয়ে বলেছিল, "গির্জ্জায় গিয়ে তুমি আমার কাছে বক্তৃতা করতে পাবে না, কিন্তু গান গেয়ে শোনাতে পার। সবাই বলবে, গির্জ্জায় গিয়ে বক্তৃতা শোনার চেয়ে গান শুনতে সবার বেশী ভাল লাগে। কেন এমন হয়? সবারই মন ভারী হয়ে আছে, এমন সময় একজন পিয়ানোতে ঝঙ্কার তুলল, কম্পনের লীলা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল, আর অমনি সবার চিত্তে শান্তি নেমে এলো। পূর্ব্ব অরোরাতে আমার এক বন্ধু আছেন। তাঁর কারখানায় মজুরের দল যখন একটু বেসামাল হয়ে ওঠে, চারদিকে বেসুর বেজে ওঠে, অমনি তিনি কাজ থামিয়ে দিয়ে কাউকে বলেন পিয়ানোতে সুর ধরতে ; আর আধঘণ্টার মাঝে সব একেবারে নিস্তব্ধ! মানুষের ওপর সঙ্গীতের যে কি মোহন-প্রভাব, তা তো জানই। ফ্রাঙ্কোপ্রুশিয়ান যুদ্ধে কতকগুলি ফরাসী-সৈনিক যুদ্ধের বাজনা শুনতে শুনতে ঘর পাগলা হয়ে উঠল। কর্ত্তারা বাড়ী যাওয়ার ছুটীর দরুণ আরজীর পর আরজী পেতে লাগলেন। "সবার মন বাড়ীর জন্য কেমন-কেমন করছে, কেউ আর লড়াই করবে না। যুদ্ধে বাদ্যের যে কতখানি প্রভাব, তা জান বোধ হয়। গ্রীক-পুরাণ কাহিনী শুনেছ তো, এপোল্লোর সঙ্গীত হতে নাকি ট্রয়নগরীর আবির্ভাব হয়েছিল। সাগরবাসিনী সাইরেণদের কথা শুনেছ তো? সমুদ্র দিয়ে যারা যেতো, তারা সাইরেণের সঙ্গীতধ্বনি শুনবামাত্র তাঁদের পানে ছুটে যেতো। তারা জানতো, ওরা তিনদিন মাত্র তাদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করবে, তারপর কেটে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে ; কিন্তু তবুও তাদের বাধা দেবার শক্তি কারু নাই।

এটা হচ্ছে জাগতিক প্রলোভনের নিশানা। লোকে জানে, প্রলোভন যখন তাদের জয় করে, তখন তিনদিনের দরুণ রঙ্গ-রস-আমোদ আহ্লাদ—তার পরেই তারা প্রলোভনের কবলিত হবে। তবুও তারা প্রলোভন ছাড়াতে পারে না। ওর্‌ফিয়ুস্ যখন গান গাইতেন, তখন ঝরণার জল নাকি স্থির হয়ে সে সঙ্গীত শুনতো। তাঁর এক পাশে একটা সিংহ, আর এক পাশে একটা গাই ; এক পাশে একটা ভেড়া, আর এক পাশে একটা নেকড়ে। কিন্তু সুরের মাধুর্য্যে সবাই আত্মহারা। সেণ্ট সিসিলিয়া জগতে দেবতার আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন, তা বোধ হয় জান। Alexenders feastএ বোধ হয় পড়েছ, যে গুণী সঙ্গীতপ্রভাবে আলেকজাণ্ডারকে মুহূর্ত্তের দরুণ ব্রহ্মলগ্ন করেছিলেন, তার সম্বন্ধে কবি বলছেন, মানুষকে এই গুণী স্বর্গে তুলেছে, আর সেই গুণী (অর্থাৎ সেণ্ট সিসিলিয়া) স্বর্গ হতে দেবতাকে নামিয়েছিলেন মানুষের মাঝে। কাজেই এই গুণীকেই তো সেণ্ট সিসিলিয়ার চেয়েও বড় বলতে হয়।

সঙ্গীত কি? এ কি ধ্বন্যাত্মক না বর্ণাত্মক? নিশ্চয়ই ধ্বন্যাত্মক। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তার প্রভাব!

কেন একটা বিশেষ শব্দে বিশেষ একটা ভাব জাগায়, বিজ্ঞান হয়ত তার প্রমাণ হাজির করতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞান যদি তা নাও পারে, তবুও এও একটা কথা যে, ধ্বন্যাত্মক ভাষার অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটাবার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। এ খবরটা তোমরা মনে মনে তো জান।

তাই আমি বল্‌ছিলাম, ওঙ্কারের সঙ্গে এই ধ্বনির একটা অন্তরঙ্গ যোগ রয়েছে; আর এই ওঙ্কারজপ আশ্চর্য্যরূপে তোমাকে সবার সঙ্গে এক করে দেয়। এর অপরিসীম ক্ষমতা। বিজ্ঞান যদি আজ এ কথা প্রমাণ নাও কর্‌তে পারে দুঃখ নাই; বিজ্ঞান আরও বড় হোক্, একদিন এ রহস্য সেও ভেদ কর্‌তে পার্‌বে। কিন্তু ততদিন কথাটা সত্যিই থেকে যাবে। তাই যুগযুগান্তরসঞ্চিত মানব-অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে বেদান্তদর্শনের এই পরম সম্পদ্ আমি তোমাদের সাম্‌নে রাখছি। এই মহামন্ত্রকে আশ্রয় করেই হিন্দু দিব্যদৃষ্টি অর্জ্জন করেছিল, অন্তর্জ্যোতিঃতে, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃতে সে জ্যোতিষ্মান্ হয়েছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণ

—:*:—

ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ভিটাদিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে একখণ্ড হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উহার নাম "স্বরূপচরিত" এবং উহা উক্ত ভিটাদিয়ার লাহিড়ী বংশের ইতিহাস। পুঁথিটার সংবাদ পাইয়া ঢাকার ঈষ্টবেঙ্গল টাইম্‌স্ অফিসের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বলাভের আশায় উহা হস্তগত করিতে চেষ্টা করেন। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় কোন প্রতিলিপি না থাকায় লাহিড়ী মহাশয় উহাকে হাতছাড়া করিতে অস্বীকার করেন, পরন্তু গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখিবার সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দেন। লাহিড়ীবংশ বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ে স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর ভ্রমণ উপলক্ষ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপ হইতে একবার মাতৃভূমি শ্রীহট্টদেশে গমন করিয়াছিলেন। অধিকাংশ বৈষ্ণব গ্রন্থেই শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিলেন, এইরূপ উল্লেখমাত্র দৃষ্ট হয়। প্রেমবিলাস নামক গ্রন্থে এই ভ্রমণের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। স্বরূপ-চরিতের পঞ্চদশ অধ্যায় হইতে এ বিষয়ের আরো বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। নিম্নে উক্ত অধ্যায় হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। ভক্ত-বৈষ্ণবের পক্ষে ইহা যেমন প্রাণের উপভোগ্য, ঐতিহাসিকের নিকটও ইহা তেমনি প্রণিধানযোগ্য। এই গ্রন্থের প্রমাণে রঘুনাথ শিরোমণির জন্মভূমি ও পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে চিরাগত সমস্যার সমাধান হইয়াছে এবং অন্যান্য বহু বিষয়েরও মীমাংসা পাওয়া যাইতেছে। সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার ভৌগোলিক সংস্থান ও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পরিবারের পবিত্র চিত্র মানস-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

স্বরূপচরিত

ভিটাদিয়ার লাহিড়ীপাড়ায় স্বরূপ গেল।
প্রতি বাড়ীতে দেখা করিতে লাগিল॥
রমানাথ তর্কালঙ্কার মধুসূদন ভট্টাচার্য্য।
রামভদ্র সার্ব্বভৌম কমল লাহিড়ী হরি ভট্টাচার্য্য॥
রামগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য রাজারাম চক্রবর্ত্তী।
রামগোপাল লাহিড়ী জগৎ লাহিড়ী সৌম্যমূর্ত্তি॥
রাধাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ পণ্ডিতগণে।
নমস্কার করিলেন অতি হর্ষমনে॥
এই সমস্ত বৃদ্ধগণে করি নমস্কার।
টোলে টোলে ছাত্রসহ করিলেন বিচার॥
কুলীন রামরাম সান্যাল স্বরূপ চক্রবর্ত্তী।[১]
ভিটাদিয়া কিছুদিন করেন অবস্থিতি॥
ভিটাদিয়ায় মহাপ্রভুর আগমন শুনে।
বঙ্গদেশবিলাসে আসি শ্রীহট্টগমনে॥
মহাপ্রভু বঙ্গদেশবিলাসে আসিয়া।
শ্রীহট্টে গমন কৈলেন ভিটাদিয়া হৈঞা॥
ভিটাদিয়ার কুলীনশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী।
পরমবৈষ্ণব সর্ব্বগুণে সর্ব্বোপরি॥
পরম পণ্ডিত তাইন বুদ্ধে বৃহস্পতি।
অতিথি সেবয়ে সদা করি দৃঢ়-ভক্তি॥
সদাচারী জিতেন্দ্রিয় ধনধান্যশালী।
শাস্ত্রের বিচারে তেঁহো হয় মহাবলী॥
তার ঘরে মহাপ্রভু কিছুদিন রয়।
সে স্থান দেখিতে স্বরূপ ভিটাদিয়া থাকয়॥
ব্রহ্মপুত্র বরাসার মিলন যেখানে হয়।
সেই বরাসার পারে ভিটাদিয়া রয়॥
বরাসা নদীর পারে ভিটাদিয়া গ্রাম।
নানা দেশে সুপ্রসিদ্ধ কুলীনের স্থান॥
ভিটাদিয়া থাকে স্বরূপ অতি হৃষ্ট মনে।
অতিপ্রাচীন বিপ্রেরে গিয়া করিল প্রণামে॥

(১) রামরাম সান্যাল পূর্ব্বনাম। গুরুদত্ত নাম স্বরূপ-চক্রবর্ত্তী।

রামগোপাল লাহিড়ী বৃদ্ধ বিপ্রের নাম হয়।
রাম রাম স্বরূপেরে স্নেহ করে অতিশয়॥
বিপ্র তারে সমাদর করি বসাইল।
স্বরূপ মহাপ্রভুর কথা বিপ্রে জিজ্ঞাসিল॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপ হৈতে।
শ্রীহট্ট যাওয়ার সময় আইলা এ গ্রামেতে॥
প্রাচীন মুখে এই কথা পাইলাম শুনিতে।
আপনার কাছে আইলাম বিশেষ জানিতে॥
শুনিয়া প্রাচীন বিপ্র স্বরূপেরে কয়।
পিতার মুখে যা শুনেছি কহি সমুদয়॥
লাঠী ভর দিয়া বিপ্র ধীরে ধীরে চলে।
রামরাম স্বরূপেরে দেখায় কুতূহলে॥
এই স্থানে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর বাড়ী ছিল।
যাঁর যশগুণ সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হৈল॥
শ্রীগৌরাঙ্গ এ স্থানেতে ছিল কিছুদিন।
লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর হৈঞা প্রেমাধীন॥
ঐ দেখ তমাল আর বকুল বৃক্ষদ্বয়।
লক্ষ্মীনাথ সহ গৌর তার তলে রয়॥
ইষ্ট-গোষ্ঠী করে আর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
যে দেখে তাঁহার রূপ মোহিত সেজন॥
শুনি স্বরূপ বৃক্ষতলে নমস্কার কৈল।
মহাপ্রভুর বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিল॥
বিপ্র কহে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ যে কারণে হয়।
জনশ্রুতি অনুসারে তোমার কাছে কই॥
ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বপার যত দেশ হয়।
পাণ্ডববর্জ্জিত বলি সবে তারে কয়॥
ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব পারে পাণ্ডব নাহি যায়।
তে কারণে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ বলি তায়॥
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণু-অবতার।
পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ করিতে উদ্ধার॥
নবদ্বীপ হৈতে আইলেন পদ্মাবতী তীরে।
স্নান-তর্পণ করি পূত করিলেন পদ্মারে॥

পদ্মার সৌন্দর্য্য দেখি পদ্মাতীরে স্নন।
বিস্তার বিলাস করেন নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
তাত্তরপুরের ঘাট প্রভু পদ্মা পার হৈল।
নরোত্তমে আকর্ষিয়া গোপালপুরে গেল॥
পদ্মার উত্তর তীর পাছপাড়া গ্রামে।
কিছুদিন থাকি করে নাম সঙ্কীর্ত্তনে॥
আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণ করি।
যমুনার তীরে আইলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
যমুনা পদ্মার সঙ্গম যেবা স্থান হয়।
কৃপা করি তথায় আইলা দয়াময়॥[২]
যমুনায় স্নান তর্পণ করি পবিত্র করিল।
প্রভুর চরণ পাঞা যমুনা কৃতার্থা হইল॥
প্রভুর চরণপরশে যমুনা গঙ্গাতুল্য হৈল।
পারাইঞা প্রভু পদ্মার দক্ষিণ পারে গেল॥
ফরিদপুর গ্রাম হয় অতি মনোহর।
সে গ্রামেরে প্রভু কৃপা কৈলেন বহুতর॥[৩]
হরিনাম দিলা কৈলা নামসঙ্কীর্ত্তন।
তথা হৈতে পূর্ব্বদিকে করিলা গমন॥
পদ্মাবতীর শোভা দেখি বড় সুখ পায়।
ক্রমে ক্রমে প্রভু বিক্রমপুরে চলি যায়।
দক্ষিণ পার হৈতে প্রভু পদ্মাপার হৈঞা।
উত্তর পারে নূরপুরে আসলেন চলিয়া॥[৪]

পদ্মার তীরেতে গ্রাম অতি মনোহর।
নূরপুর ত গ্রাম নয় দ্বিতীয় সহর॥
দলান কোঠা মঠমন্দিরে পূর্ণ সেই গ্রাম।
ধনবান্ তিলি আতের তথায় আশ্রম॥
সাধু গুরু ব্রাহ্মণে তেলীর ভক্তি অতিশয়।
তিলিজাতিরে কৃপা কৈলা দয়াময়॥
হরিনাম দিলা কীর্ত্তন করিলা প্রচার।
তেলিজাতিরে প্রভু করিলা উদ্ধার॥
তেলিজাতিরে কৃপা করি প্রভু দয়াময়।
সুবর্ণগ্রামেতে আসি হইলেন উদয়॥[৫]
ব্রহ্মপুত্রে লাঙ্গলবন্ধে করেন স্নান-তর্পণ।
লৌহিত্যকে নানারূপে করেন স্তবন॥
যে কারণে ঘাটের নাম হৈল লাঙ্গলবন্ধ।
তাহা কহিতেছি আমি করি অনুবন্ধ॥
বলরাম লৌহিত্যে স্নান করিবারে।
লাঙ্গলবন্ধে উপস্থিত হইলেন ধীরে॥
কিছু দূরে ছিল সেই ব্রহ্মপুত্র নদ।
বলরাম ডাকিলেন করি উচ্চ শব্দ॥
বলরামের ডাক লৌহিত্য শুনি না শুনিল।
ক্রোধ করি বলরাম লাঙ্গল ধরিল॥
লাঙ্গল আকর্ষণ করি নিকটে আনিল।
লাঙ্গলে বান্ধিয়া স্নানপূজা কৈল॥
একারণ এই স্থানের নাম লাঙ্গলবন্ধ কয়।
শীতলা লক্ষ্মীর সঙ্গম এই স্থানে হয়॥
সঙ্গমেতে স্নান কৈলে শতগুণ ফল ধরে।
নানা দেশ হৈতে লোক আসি স্নান করে॥
তথা হৈতে মহাপ্রভু পঞ্চমীঘাট গেলা।
নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিতে লাগিলা॥
পঞ্চপাণ্ডব সেই ঘাটে করিলেন স্নান।
এই সে কারণে হয় পঞ্চমীঘাট নাম॥
নামসঙ্কীর্ত্তন কৈলেন হরিনাম প্রচার।
উচ্চ নীচ প্রভু কিছু না কৈলেন বিচার॥

(২) পদ্মা ও যমুনার সঙ্গমস্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে অধিবাসীগণমধ্যে অদ্যাপি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র এক সুপুরুষ পরম পণ্ডিতের আগমন ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে।

(৩) তিনচারিশত বৎসর পূর্ব্বে পদ্মার প্রধান স্রোতধারা বর্ত্তমান ফরিদপুর সহরের পশ্চিম দিকে কিঞ্চিৎ দূর দিয়া প্রবাহিত হইত। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ছিল।

(৪) নূরপুর বহুদিন হইল পদ্মাগর্ভে গিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ-গোয়ালন্দ ষ্টিমার লাইনের মৈনট ষ্টেশন বর্ত্তমান সময়ে নূরপুর বলিয়া পরিচিত। ভাগ্যকুলের প্রসিদ্ধ ধনবান্‌গণ পূর্ব্বে নূরপুর গ্রামে বাস করিতেন। নূরপুর পদ্মায় ভাঙ্গিয়া গেলে তাঁহারা বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ভাগ্যকুলে আসেন।

(৫) সুবর্ণগ্রাম—বর্ত্তমান সোনার গাঁ।

তথা হৈতে মহাপ্রভু ঘিঘাটে আইল।
যেই স্থানে পরশুরাম যজ্ঞ করেছিল॥
সেই ঘাটে প্রভু কৈলা স্নানাদি তর্পণ।
এগারসিন্দুর দেশে পরে উপনীত হন॥[৬]
ব্রহ্মপুত্র তীরে হয় সুন্দর সহর।
এগারসিন্দুর নাম বড় মনোহর॥
ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বপারে এই স্থান হয়।
পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ সর্ব্বলোকে কয়॥
বহু বহু গন্ধবণিক তথি বাস করে।
সঙ্কীর্ত্তন প্রচার প্রভু কৈলেন ঘরে ঘরে॥
বণিক জাতিরে কৃপা করি দয়াময়।
জামালপুরের ঘাটে আসি হইলেন উদয়॥
লৌহিত্যে করিলা প্রভু স্নানাদি তর্পণ।
লৌহিত্যকে প্রণাম করি করিলেন স্তবন॥
তথা হৈতে মহাপ্রভু আইলা **বেতাল**।[৭]
সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম লোকে ঘোষে চিরকাল॥
ব্রাহ্মণভদ্র ধনী-মানীর বাস শত শত।
সহরতুল্য গ্রাম ব্রহ্মপুত্র-তীরে স্থিত॥
বন উপবন পুকুর সরোবর কত।
দলান কোঠা মঠ মন্দির আছে শতশত।
সে স্থানের রাজা ছিল সদানন্দ রায়।
তার সুশাসনে প্রজা সুখে কাল কাটায়॥
নানা দিগ্‌দেশ হৈতে আসে বহুলোক।
লৌহিত্যে স্নান করে গ্রাম দেখি পায় সুখ॥
গ্রামের শোভা দেখি লোকের মনেতে উল্লাস।
ব্রহ্মপুত্র সেই গ্রাম করিলেন গ্রাস॥
শুহে স্বরূপ সেই গ্রামের শোভা না দেখিলা।
ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মপুত্র সব গ্রাস কৈলা॥
গ্রাম ভাঙ্গিল কীর্ত্তিনাশ কৈল ব্রহ্মপুত্র।
অখন অবশিষ্ট আছে বেতালের জঙ্গলমাত্র॥

গ্রাম দেখিবারে কত লোক আইত নিত্য।
গ্রাম ভাঙ্গিয়া উজার কৈল এ দুষ্ট লৌহিত্য॥
পুণ্য সলিল বলি তারে সবে কয়।
কীর্ত্তিনাশ কৈল বলি মনে কষ্ট হয়॥
সেই বেতাল গ্রামে আইলা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
লৌহিত্যে স্নান তর্পণ করি বৈসে গাছতলায়॥
ব্রহ্মপুত্রের শোভা প্রভু করয়ে দর্শন।
গ্রামের শোভা দেখি আনন্দিত মন॥
হেনকালে লক্ষ্মীনাথ বিপ্র বৈষ্ণবপ্রধান।
প্রভুর তেজোময় মূর্ত্তি দেখি করিলা প্রণাম॥
লক্ষ্মীনাথ বোলে প্রভু যে দেখি লক্ষণ।
তাহাতেই বোধ হয় তুমি নারায়ণ॥
কৃপা করিয়া প্রভু বল মোর ঘরে।
ভিটাদিয়া বাড়ী মোর অতি অল্প দূরে॥
বৈষ্ণব জানি নিমন্ত্রণ প্রভু কৈলেন অঙ্গীকার।
ভিটাদিয়া গ্রামে যাইতে করিলেন স্বীকার॥
কুলীন ধনবান লক্ষ্মীনাথ বিপ্র মহাশয়।
সুপণ্ডিত সদাচারী জিতেন্দ্রিয় হয়॥
প্রভুকে সঙ্গে করি লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী।
লইয়া গেলেন তিনি আপনার বাড়ী॥
কিছুদিন তথা রহে তার ভক্তিগুণে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রভু করে রাত্রি দিনে॥
লক্ষ্মীনাথ সহ কৃষ্ণ আলাপন নিত্য।
বহুলোক সঙ্কীর্ত্তনে হইলেক মত্ত॥
লৌহিত্য কৌমুদী ব্রহ্মপুত্রের মাহাত্ম্য।
একদিন শুনিয়া প্রভু হৈলা আনন্দিত॥
একদিন কহে প্রভু লক্ষ্মীনাথ স্থানে।
শ্রীহট্টে যাব পিতামহ দরশনে॥
লক্ষ্মীনাথ বোলে শ্রীহট্টিয়া ব্রাহ্মণ ভাল।
আমার গৃহে আতিথ্য করে চিরকাল॥
ব্রহ্মপুত্র স্নানে আসে আর গঙ্গা স্নানে।
যাওয়া আসার সময় মোর গৃহে অবস্থানে॥
বহুদিন হৈল এক শ্রীহট্টিয়া ব্রাহ্মণ।
বৈদিক সদাচারী জিতেন্দ্রিয় হন॥

(৬) ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঈশা খাঁ এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি তাহার ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে।

(৭) বর্ত্তমান ভোগবেতাল।

পরম পণ্ডিত হয় বিষ্ণু ভক্ত অতি ॥
সস্ত্রীক নবদ্বীপে করয়ে বসতি ॥
মাণিক্য মিশ্রের পুত্র বল্লভ আচার্য্য ॥
মোর পিতার সহপাঠী সেই বিপ্রবর্য্য ॥
বনমালী বিপ্র আর বিপ্র কাশীনাথ।
এই দুই শ্রীহট্টিয়া বিপ্র ছিল তার সাথ ॥
কোন কাজে সেই বিপ্র শ্রীহট্টে গিয়াছিল।
নবদ্বীপে যাওয়ার কালে মোদের গৃহে আইল ॥
মোর পিতা পদ্মগর্ভ আচার্য্যের আগ্রহে।
সস্ত্রীক বল্লভ কিছুদিন মোদের গৃহে রহে ॥
দ্বিবর্ষীয়া এক কন্যা আছিল সঙ্গিনী।
লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম তাঁর লক্ষ্মীস্বরূপিণী ॥
পরমা সুন্দরী কন্যা যার ঘরে যায়।
ধনধান্যে পরিপূর্ণ তার গৃহ হয় ॥
মোদের ঘরে কন্যার যেদিন পদার্পণ হৈল।
সেইদিন হ'তে ধনধান্য বাড়ীতে লাগিল ॥
শত শত শ্রীহট্ট্যা ছাত্র মোর পিতার কাছে পড়ে।
অন্নদান করি পিতা রাখয়ে সবারে ॥
নানা দেশী ছাত্র আসি পড়ে পিতার টোলে।
অন্নদান করি পিতা পড়ান সকলে ॥
পৈঙ্গীরহস্য ব্রাহ্মণভাষ্য গীতাভাষ্যসার।
দ্বাদশ-উপনিষদ্ভাষ্য ক্রমদীপিকার টীকা আর।
শারীরক-সূত্র ভাষ্য করিলা সুন্দর।
বিশিষ্ট অদ্বৈত-বাদ তাহাতে প্রবল ॥
রামানুজ-মতানুযায়ী গ্রন্থ সব হৈল।
এই সব গ্রন্থ রচিয়া পড়ুয়া পড়া হৈল ॥
পিতার পাণ্ডিত্য বল্লভ আচার্য্য মহাশয়।
আলোচনা করিয়া বহু প্রশংসয় ॥
সেই লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা বল্লভ আচার্য্য।
বহুকাল হয় নবদ্বীপে গেলা বিপ্রবর্য্য ॥
সেই বল্লভ আচার্য্য সহ কি প্রভুর আছে পরিচয়।
প্রভু কহে লক্ষ্মীপ্রিয়া পত্নী বল্লভ মিশ্র শ্বশুর হয় ॥
বহু শ্রীহট্টিয়া বিপ্র নবদ্বীপে বৈসে।
সম্বন্ধবাদ চলে তথায় দেশে নাহি আইসে ॥

লক্ষ্মীনাথ বোলে এক শ্রীহট্ট্যা ব্রাহ্মণ।
নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত জানে সর্ব্বজন ॥
সেই শ্রীহট্ট্যা বিপ্র রামনাথ বাচস্পতি।
সস্ত্রীক নদীয়ায় করয়ে বসতি ॥
তার পুত্র রঘুনাথ শিরোমণি।
বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র মধ্যে গণি ॥ (৮)
ন্যায়শাস্ত্রের টীকাকার এই মহাশয়।
কার্য্যগতিকে বিপ্র শ্রীহট্টেতে যায় ॥
মোর গৃহে সেই রঘুনাথ আতিথ্য কণয়।
তাঁর সহিত কি প্রভুর আছে পরিচয় ॥
প্রভু কহে রঘুনাথ মোর সহাধ্যায়ী হন।
এক সঙ্গে ব্যাকরণ করেছি অধ্যয়ন ॥
লক্ষ্মীনাথ বোলে প্রভু পিতা মহাশয়।
নবদ্বীপেতে এক বিবাহ করয় ॥
নবদ্বীপবাসী জয়রাম চক্রবর্ত্তীর কন্যা।
রূপগুণে বিমাতা হয় বড় ধন্যা ॥
তার গর্ভে জনমিল পুরুষোত্তম আচার্য্য।
বৈমাত্রেয় ভাই মোর সর্ব্বগুণে বর্য্য ॥
তার সহিত প্রভুর কি আছে পরিচয়।
ইহা জানিতে মোর বড় বাসনা হয় ॥
প্রভু কহে পুরুষোত্তম সখা প্রিয় ভক্ত।
সর্ব্বদা আমাতে আছে অনুরক্ত ॥
মোর সখা তোমার ভাই তুমি প্রিয়পাত্র।
শুনি লক্ষ্মীনাথ তুষ্ট হৈল অতিমাত্র ॥
সেই পুরুষোত্তম আচার্য্য মহাশয়।
মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হৈলে সন্ন্যাসী হয় ॥
সন্ন্যাস আশ্রমে নাম স্বরূপ দামোদর।
মহাপ্রভুর মর্ম্মী ভক্ত পণ্ডিতপ্রবর ॥

---

(৮) বাঙ্গালায় ন্যায়শাস্ত্রে নবযুগের প্রবর্ত্তক সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি। এই গ্রন্থের প্রমাণে স্থিরীকৃত হইল যে রঘুনাথের পিতা রামনাথ বাচস্পতি শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুমান ইহাতে দৃঢ়ীকৃত হইল।

পুরুষোত্তমের সংবাদ জানিল লক্ষ্মীনাথ।
দিনরাত্রি কৃষ্ণকথা মহাপ্রভুর সাথ॥
কৃষ্ণকথায় কিছুদিন তথি গত হৈল।
একদিন লক্ষ্মীনাথ প্রভুরে কহিল॥
জ্যোতির্ম্ময়রূপ তোমার তুমি মহত্তম।
তোমাকে দেখি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ॥
প্রভু কহে লক্ষ্মীনাথ তুমি বিষ্ণুভক্ত।
যেখানে নেহার তাহে বিষ্ণু হও প্রাপ্ত॥
লক্ষ্মীনাথ বলে রূপ গোপন কর বৃথা।
তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ চিনেছি সর্ব্বথা॥
পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ উদ্ধার করিতে।
ইহ আগমন তোমার লয় মোর চিতে॥
পুত্র নাহি হয় মোর করি যে চিন্তন।
কে ভোগিবে আমার এই বহু রত্ন-ধন॥
পুত্র নাহি হয় মোর পুত্রবর দেহ।
ধনধান্তে পরিপূর্ণ আছে মোর গেহ॥
কে খাবে এ সম্পত্তি ভাবি অনিবার।
পুত্র পাইলে বাঞ্ছা পূর্ণ হয় আমার॥
অন্তিমেতে যেন তোমার শ্রীচরণ পাই।
এই মনের অভিলাষ তোমারে জানাই॥
প্রভু কহে এক বৎসর করিয়া নিয়ম।
ভক্তিভাবে ত্রিসন্ধ্যায় পূজ নারায়ণ॥
সুপণ্ডিত এক পুত্র হইবে তোমার।
কৃষ্ণভক্ত হবে জগৎ করিবে উদ্ধার॥
লক্ষ্মীনাথে বর দিয়া প্রভু গৌরহরি।
বাজিতপুরের রাস্তায় তাহাই গেলা বলি॥
গৌরাঙ্গের চরিত স্বরূপ এই মাত্র জানি।
শ্রীহট্টে কি করিলেন তাহা নাহি শুনি॥
ইহা শুনি রামরাম স্বরূপ করিলা গমন।
বেতাল গ্রামে গিয়া উপস্থিত হন॥
সেই স্থান দেখিতে বড়ই সুন্দর।
ব্রহ্মপুত্রের শোভা দেখি আনন্দ অন্তর॥
বেল বকুল করঞ্জ অশোক শিমুল কত।
শাল তাল তমাল গ'য়া ডুমুর আছে কত॥
পাকইর কাঠালি অশ্বত্থ বই আর।
আমলকী হরিতকী বয়ড়ায় ভরা নদীর পার॥
গাম্ভারী পারুলী কানাইর ভীঙ্গী গুণিয়ারী।
গাব বাড়ই আম কাঠাল বান্দরলড়ী॥
ঔষধের গাছ শত শত আম্‌লি গাছ সুন্দর।
দেখি নদীর পারের শোভা আনন্দ অন্তর॥
পাখীর সুমধুর রবে মনেতে উল্লাস।
ইচ্ছা হয় এই স্থানে করিবে নিত্যবাস॥
ব্রহ্মপুত্রের পার দিয়া মসুয়া গমন।
মৈত্রভট্টাচার্য্য পাড়ায় উপস্থিত হন॥
রামকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত মুকুন্দ ন্যায়বাগীশ।
জগদানন্দ বিশারদ গুণানন্দ তর্কবাগীশ॥
ভবনাথ ভট্টাচার্য্য জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য॥
কমলাকান্ত মৈত্র মাণিক্যানন্দ ভট্টাচার্য্য।
রামনাথ ন্যায়ালঙ্কার রামজীবন ভট্টাচার্য্য॥
বাণীনাথ ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের বর্য্য॥
এই সব বৃদ্ধ পণ্ডিতগণকে করেন নমস্কার।
টোলে টোলে ছাত্র সহ করিলেন বিচার॥
তাহা হইতে স্বরূপ জামালপুর গেলা।
যে ঘাটেতে মহাপ্রভু স্নান করিয়াছিলা॥
সেই ঘাটে কৈলেন স্বরূপ স্নানাদি তর্পণ।
গোসাঞির ঘাট বলিয়া ঘোষয়ে সর্ব্বজন॥
রূপনারায়ণ গোসাঞি প্রভু পরম উদার।*
সেই ঘাটে স্নান তর্পণ করিতেন অনিবার॥
সেই জামালপুরের ঘাটে অশোকাষ্টমী দিনে।
রূপনারায়ণের যত্নে স্নানঘাট মিলে এখন ক্রমে
জামালপুরের ঘাট স্বরূপ করিয়া দর্শন।
এগারসিন্দুরে গিয়া উপনীত হন॥
রূপনারায়ণ গোসাঞির বাড়ী যেখানে আছিল।
তাহা দেখিয়া বিবুধ রায়ের বাড়ী গেল॥
বিবুধ রায় রূপনারায়ণ গোসাঞির শিষ্য হয়।
অতি সুমনোহর তার বাড়ী আছয়॥

*রূপনারায়ণ গোস্বামী আম্বষ্ঠীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। ইঁনিই বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী দ্বারা পরাজিত হন।

তা দেখিয়া রূপনারায়ণের ঠাকুরবাড়ী গেলা।
অতি সুন্দর মন্দির দেখিতে পাইলা॥
মানসিংহ ঈশা খাঁয় বড় যুদ্ধ হয়।
তাহাতে মন্দিরের কিছু না হয় অপচয়॥
শ্রীল মোহন রায় জিউ সে মন্দিরে ছিল।
ভীষণ যুদ্ধের সময় ঠাকুর নিয়া পলাইল॥
ঠাকুর নিয়া বারৈচিড়া গ্রামেতে উদয়।
রূপনারায়ণের পুত্রগণ গিয়া সেই গ্রামে রয়॥
স্বরূপ গোসাঞি মন্দির দেখি সেইখানে বসিল।
একজন প্রাচীন বণিক তথায় আইল॥
স্বরূপেরে প্রণমিয়া কহিল তাঁহারে।
গোসাঞিজী আসিয়াছেন মন্দির দেখিবারে॥
রূপনারায়ণ গোসাঞি প্রভু এগারসিন্দুরে আসি।
এই মন্দিরে শ্রীমোহন রায় জিউ স্থাপিলা গুণরাশি॥
প্রাচীনের মুখে আমি যা কৈলাম শ্রবণ।
আপনার নিকটে তাহা করি যে বর্ণন॥
রূপনারায়ণ গোসাঞি প্রভু পরম পণ্ডিত।
গড়ের হাট খেতুরে কিছুদিন ছিল অধিষ্ঠিত॥
সেইস্থানে টোল করি কিছুদিন ছাত্র পড়াইল।
নানা স্থান হৈতে পড়ুয়া পড়িতে আসিল॥
সেই সময় রাজমহল হৈতে এক বিপ্র।
গড়ের হাটে উপস্থিত হৈলেন ক্ষিপ্র॥
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হয় কুলীনপ্রবর।
রূপনারায়ণ গোসাঞির চরণে প্রণাম বিস্তর॥
রূপনারায়ণ নিকটে বিপ্র দীক্ষিত হইল।
ভক্তিশাস্ত্র তাঁর নিকটে অধ্যয়ন কৈল॥
পরম কৃষ্ণভক্ত হৈল সংসারে উদাস।
দিনে দিনে বৈরাগ্য তার হইল প্রকাশ॥
রূপনারায়ণ সঙ্গে বিপ্র ভ্রমে অনুক্ষণ।
পরম পণ্ডিত মাধব অধিকারী হন॥
রূপনারায়ণ গোসাঞি এগারসিন্দুরে।
চৌপাঠী করি পড়ুয়া পড়ায় অনিবারে॥
রূপনারায়ণ গোসাঞি প্রভু এগারসিন্দুরে।
শ্রীমোহনরায় জিউর যে সেবা প্রকাশ করে॥

সেই সেবায় নিযুক্ত হৈল মাধব পণ্ডিত।
ভক্তিভাবে সেবে পূজে হৈঞা হরষিত॥
এক মনে বাউলের অন্ন করয়ে রন্ধন।
নানাবিধ ভাজাবড়া শাক সব্জি ব্যঞ্জন॥
বহুলোকে প্রসাদ পায় আনন্দিত মনে।
মাধবের পাকের বাখানয়ে সর্ব্বজনে॥
রূপনারায়ণ গোসাঞি প্রভুর পড়ুয়া যত জন।
মাধবের পাকের ব্যাখ্যা করে অনুক্ষণ॥
রূপনারায়ণের শিষ্য ললিত ঘোষাল হয়।
পূজার কার্য্যে পাকের কার্য্যে সাহায্য করয়॥
রূপনারায়ণের শিষ্য সুন্দর ভট্টরাজ।
ঠাকুর-সেবা করে পরিবেশন করে ভক্ত-মাঝ॥
এই তিন শিষ্য সেবা-পূজাদির কাজ করে।
মাধব মধ্যে মধ্যে রূপ সঙ্গে ফিরে॥
রূপনারায়ণ সঙ্গে মাধব বিক্রমপুরে গেল।
তিলি জাতি হৈতে বহু-কড়ি আনিল॥
নূরপুরের পানকুণ্ডু এগারসিন্দুর দপ্দগায়।
বাণিজ্য করে তারা আনন্দ হিয়ায়॥
ধনবান সদাগর ঘোষে তা সবারে।
বড় কৃষ্ণভক্ত তারা নামসঙ্কীর্ত্তন করে॥
পানকুণ্ডু হৈতে মাধব ধন-কড়ি লয়।
মাধব অধিকারী তারে সকলে ডাকয়॥
সেই ধনে মাধব শ্রীমন্দির করিয়া।
প্রতিষ্ঠা করিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনিয়া॥
শ্রীমোহন রায় জিউরে শ্রীমন্দিরে নিল।
মহাভিষেক করি মহামহোৎসব কৈল॥
মহোৎসবের খরচ নুরপুরিয়া কুণ্ডুগণ দিল।
বহুলোক আসিয়া প্রসাদ পাইল॥
সবার নিকট রূপনারায়ণ কহিতে লাগিল।
মাধব অধিকারী এই মঠ গড়াইল॥
মাধব অধিকারীর মঠ করিলাম ঘোষণা।
মাধব অধিকারীর মঠ বলিবে সর্ব্বজনা॥
সেই মাধব অধিকারীর ভক্তি গাঢ়তর।
অধিকারীর মঠ লোকে ঘোষে নিরন্তর।

গোসাঞি শ্রীমন্দির বলিও লোকে কয়।
নিত্য মহোৎসব নিত্য সংকীর্ত্তন হয়॥
মানসিংহ ঈশা খাঁর বড় সুহৃদ হয়।
সে সময় রূপনারায়ণ বৃন্দাবনে রয়॥
যুদ্ধকালে রূপনারায়ণ গোসাঞির পুত্রগণ।
বারৈচিড়ায় বিগ্রহ নিয়া করিলা স্থাপন॥
গুরুপুত্র সঙ্গে মাধব বারৈচিড়ায় আইল।
বহুকাল থাকি বৃন্দাবন বলি গেল॥
ওহে গোসাঞিজি যাহা করিলাম শ্রবণ।
আপনার নিকটে তাহা করিলাম অর্পন॥
তথা হৈতে স্বরূপ গোসাঞি গড়ে প্রবেশিল।
দুর্গা দেখিয়া পরে বাণীয়াগ্রামে আইল॥

আলোচনা

আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের মাঝে একটা অভিনব ধর্ম্ম দিন দিন প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে, এক কথায় যাহাকে বলিতে পারি সৌখীন আধ্যাত্মিকতা। দেশের কাজের যেমন একটা সৌখীন দিক আছে, যাহাতে হাতে পায়ে খাটিবার কোনও বালাই ই নাই, আছে শুধু বিমানসঞ্চারী ভাবকে কথার ফাঁদে বন্দী করা; তেমনি এই সৌখীন আধ্যাত্মিকতার মাঝেও অনুষ্ঠানের কোনও দায় নাই, কিন্তু ভাবের বিলাসের মাত্রা ষোল আনা ছাড়াইয়া আঠারো আনায় উঠিলেও হানি নাই। ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে কোনও চিন্তা করিব না, যুগে যুগে মানুষের ব্যাকুল হৃদয় তাঁহাকে পাইবার দরুণ যে অগণিত পন্থার আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার কোনও সন্ধান রাখিব না, অথচ উপনিষদের বুলি "কোট" করিয়া বলিব, "এই যে তিনি জলে-স্থলে, ওষধিতে বনস্পতিতে!" কথাগুলি সত্য বটে, কিন্তু তোতা পাখীর মত এগুলি আওড়াইয়া গেলেই ধর্ম্মানুভবের চূড়ান্ত হইল, ইহা মনে করা নাস্তিকতারই নামান্তর। এই প্রকার সৌখীন আধ্যাত্মিকতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া যুগাবতার রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "বাবু বাগানে বেড়াতে বেরিয়েছেন, বেড়াতে বেড়াতে একটা ফুল ছিঁড়ে একটু শুঁকে বল্লেন, "আহা, গড্ কি বিউটিফুল ফুল করেছেন! যেন এইতেই ঈশ্বরজ্ঞানের চরম হল!" "আছ অনল অনিলে" ইত্যাদি খবর উপনিষদে যেমন আনন্দভরা উদাত্ত সুরে ঘোষিত হইয়াছে, এমন আর কোথায়ও নয়; কিন্তু সেই উপনিষদই আবার বলিয়াছেন, আত্মাকে জানার কথা—মুঞ্জতৃণ হইতে ইষিকা বাহির করিয়া নিবার মত আত্মাকে উদ্ধার করিবার কথা। আত্মজ্ঞানের, আত্মোদ্ধারের এই প্রবল প্রচেষ্টা হইতেই ভারতের কত শত সাধনপন্থার উদ্ভব। সমস্ত সাধন-পন্থাতেই ত্যাগ-বৈরাগ্য আছে, সংযম আছে, তপস্যা আছে, নিষ্ঠা আছে; শুধু আধ্যাত্মিক সাধনার বেলাতেই বা কেন, এই যে আধিভৌতিক সাধনার দ্বারা এ যুগের মানুষ এত আরামের উপকরণ সঞ্চয় করিতেছে, ইহার মূলে কি তপস্যা নাই? তুমি হয়ত অনায়াসে আহরিত বিলাস-সম্ভারে আকণ্ঠ মজ্জিত রহিয়াছ, কিন্তু তোমার এই বিলাসোপকরণ সংগ্রহ করিতে তোমারই শত শত জাত-ভাইকে ধমনীর শেষ রক্তবিন্দুটুকু উৎসর্গ করিতে হইয়াছে। আধিভৌতিক বিলাসের বেলায় এমন বখরা করা চলে বটে যে একজন খাটিবে, আর একজন তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিবে; কিন্তু আধ্যাত্মিক আনন্দলাভের বেলায় সে কথা বলা তো চলে না! আত্মাকে জানিবার, ব্রহ্মকে

অনুভব করিবার তপস্যাটুকু করিয়াও তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিব আমি. আর তুমি আমার সমস্ত তপস্যার ধন বাজার দরে কিনিয়া লইয়া বিনা আয়াসে আনন্দ লুটিবে, এ তো হয় না। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে এমনি একটা তামসিক শৈথিল্য সাত্ত্বিকতার ভাণ ধরিয়া দেখা দিয়াছে যে, আমরা বাস্তবিকই পরের মুখ হইতে ভাবের বুলি চুরী করিয়া দুই-চারি বার তাহাই আওড়াইয়া মনে করি, তপস্বী যাহা এত সাধ্যসাধনায় অনুভব করিয়াছে, আমরাও বুঝি অনায়াসে সে বিত্তের অধিকারী হইয়াছি। কোনও প্রকার ক্লেশকে জীবনে বরণ করিয়া লইব না, দেহকে এতটুকু কষ্ট দিয়া পরহিতৈষণার পরিচয় দিব না, অথচ জগতের যাহা কিছু ইন্দ্রিয়মোহন, লোলুপ হইয়া তাহাই আঁকড়িয়া থাকিব, আর এই ইন্দ্রিয়-প্রীতিকেই ভগবদ্ভক্তি বলিয়া আত্ম প্রবঞ্চনা করিব, এমন একটা শৈথিল্যের ভাব আমাদের দেশে দার্শনিকতার আকার ধারণ করিবার উপক্রম করিয়াছে। এই "সহজিয়া-বাদ" কি আমাদের পক্ষে শুভোদর্ক হইবে?"

*

বাংলাদেশটা চিরকাল ভাবুকের দেশ। মুসলমান যখন আসিয়া আমাদের দুয়ারে বিজয়-ডঙ্কা বাজাইয়াছে, তখনও আমরা অন্দরের আঙ্গিনায় ভাববিহ্বল দশায় থাকিয়া কোমল মলয়-সমীরে ললিত লবঙ্গলতা দুলাইয়াছি, ধীর সমীরে তটিনী-তীরে কিশোর-কিশোরীর গোপন অভিসার ঘটাইয়াছি। এই যুগে ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে নানা বিপ্লবের মাঝে চলিয়াও আমরা আমরা রবীন্দ্রনাথের অফুরন্ত কাব্যরস-পরিবেষন হইতে বঞ্চিত নই। অতিরিক্ত কাব্যরস পানে যে মত্ততা আসে, তাহাতে মানুষকে কর্ম্মের বাহির করিয়া দেয় কিনা, তাহার তত্ত্ব পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিবেন; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মিষ্ট হইয়াই এক দিক দিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যর্থ অনুকরণকে আশ্রয় করিয়া দেশে যে "সবুজ" ভাবধারা মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে, এই সেদিনও তাহা তারুণ্যের স্পর্দ্ধায় তাঁহার পক্ককেশের মর্য্যাদা-হানি ঘটাইতে লজ্জা অনুভব করে নাই। যে সৌখীন আধ্যাত্মিকতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার সহিত এই সবুজ ভাবের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ; এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য এই ভাবের কতখানি জোগান দিয়াছে, তাহাও নির্দ্দেশ করা দুরূহ নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যদি শুধু প্রেমের কবিতাই হইত, তাহা হইলেও আপশোষের কোন কারণ ছিল না, কেননা যৌবনের নেশা কাটিয়া গেলে প্রেমের স্বপ্ন আপনা হইতেই উবিয়া যাইত এবং সংসারচক্রে দুই চারিটা ধাক্কা খাইয়াই মানুষ ইহকালের ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া পরকালের গাইডবুক হিসাবে গীতা ভাগবতের বঙ্গবাসীকৃত অনুবাদ বাহির করিয়া বসিত। প্রেমের কবিতায় আর ধর্ম্মের কবিতায় যে একটা তফাৎ আছে, তাহা বৈষ্ণব কবিরা আমাদের ভুলাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের বেলাতে ধর্ম্মের সঙ্গে সাধন কৃচ্ছ তার একটা অবিনাভাব সম্বন্ধ থাকায়, সে ভুলে আমাদের তত ক্ষতি করে নাই—এই সেইদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী মুখে প্রেমের কবিতা আওড়াইতে আওড়াইতেই তথাকথিত দস্যু-সঙ্কুলতা ও অরাজকতার মাঝেও আপনার জরু-গরু সাম্‌লাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে ধর্ম্মের বিলাসের কথা—কুসুমাস্তৃত পল্লবের শ্যামল সরসতার কথা। যে রস আজ পুঞ্জে-পুঞ্জে ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে রসের সন্ধানে গাছের মূলকে যে কি বিপুল তৃষ্ণা লইয়া অহরহ গভীর অন্ধকারে হাৎড়াইয়া বেড়াইতে হইতেছে, পাষাণের বুক নিঙড়াইয়া অমৃতবিন্দু সঞ্চয় করিতে হইতেছে, সে খবর কি পুষ্পরসপায়ী মধুকরেরা জানে? রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমাদের তরুণদের মনে যে একটা উড়ু উড়ু ভাব জাগাইয়া দেয়, প্রকৃতিকে সোহাগ করাকেই

ধর্ম্মানুভূতির চরম ভাবিতে শিখায়. তাহার প্রতিষেধক রবীন্দ্রনাথেরই গদ্য রচনায় রহিয়াছে ;—তাঁহার "শান্তি-নিকেতন" "ধর্ম্ম" "স্বদেশ" ইত্যাদিতে পাই একটা বলিষ্ঠ-মন ও শাণিত-বুদ্ধির পরিচয়, আপনাকে সব দিক দিয়া বুঝিবার একটা প্রবল প্রয়াস, সাধন-কৃচ্ছ তার একটা Rationale বা যৌক্তিকতা। কিন্তু জানি না, রবীন্দ্র-মনের এই দিকটার পরিচয় নিবার জন্য আমাদের আগ্রহ কতটুকু। আমরা কাব্যের সৌন্দর্য্য আর মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াই মত্ত—বিচার, বিতর্ক-সাধনার ধার ধারি না। ইহা জাতীয় বুদ্ধির উন্মেষের অনুকূল কিনা বলিতে পারি না। শতাব্দীর পর শতাব্দীর দার্শনিক সাধনায়, কমঠ-কঠোর নব্য-ন্যায়ের ভরা জোয়ারে একদিন বাঙ্গালী প্রেমের কীর্ত্তনের, কোমল-কান্ত পদাবলীর আসর জমাইয়াছিল। হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর এক গ্লাস সরবতের মত বোধ হয় এই প্রেমের অভিষেকে বাঙ্গালীর হৃদয়কে স্নিগ্ধ ও সতেজই করিয়াছিল। কিন্তু আজ সরবতের মাত্রা চড়িয়া গিয়াছে ; যাহা শ্রম বিনোদনের উপায় ছিল. তাহা দাঁড়াইয়াছে ব্যসনে। আজ বাঙ্গালী কবিতায়, গানে, চারুশিল্পে, মাতিয়া উঠিয়াছে—"সুন্দর দিয়া সুন্দরের পূজার" ধূয়ায় তরুণ বাঙ্গালী ক্ষেপিয়া যাইবার মত হইয়াছে। আজ দর্শন-বিজ্ঞান ভাল লাগে না, ত্যাগ-সংযম ভাল লাগে না, এমন কি আত্মোদর পূরণ করিবার দরুণ গতর খাটাইতেও ভাল লাগে না ; তাই আজ অতি একান্ত আপন আধ্যাত্মিক সাধনার অমৃত-রসকেও পরের ভাটী হইতে চোলাই করিয়া না আনিলে আমাদের আর পিপাসা মিটে না ! ভগবান্ আজ সখের খেলানা হইয়াছেন ; আত্মাকে তপস্যাদ্বারা মথিত করিয়া অমৃত আহরণ করিবার সাধনাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে তথাকথিত অতিসুলভ লীলাবাদ আর প্রকৃতি-পূজার অসহ্য ন্যাকামী।

*

হিন্দু বলে, পরিণামে সুখলাভ হইবে, এই জন্যই ধর্ম্মের সাধনা। চিরটা জীবন দুঃখে কাটিবে বলিয়াই কেহ ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে না। ধর্ম্মসাধনায় যদি আপাততঃ দুঃখও থাকে, সংযম ও তপস্যা যদিও সম্প্রতি ক্লেশকর হইয়া উঠে, তথাপি অভ্যাসে একদিন সমস্ত সহিয়া যাইবে, তখন এই দুঃখের বিনিময়ে অপরিমেয় সুখ আমার অধিগত হইবে—এই ভরসাতেই এখন ধর্ম্মের নামে দুঃখ স্বীকার করিতেছি। এ একটা কথা বটে, কিন্তু আমরা বলি, ইহার মাঝেও কতকটা অস্বাভাবিকতা আছে। সংযম দুঃখ বলিয়া মনে হয় তাহাদেরই কাছে, যাহারা বাল্যকাল হইতে অস্বাভাবিক পথে জীবনকে পরিচালিত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সংযম তো একটা বিভীষিকা নয়, সংযম অর্থে শক্তির উদ্বর্ত্তন, সুষ্ঠু ভোগের জন্য শক্তি সঞ্চয়। ধর্ম্মের পথ ঊর্দ্ধতন স্বভাবের পথ। মানুষ হাত-পা ছাড়িয়া দিলে নীচে গড়াইয়া পড়িবে মাধ্যাকর্ষণের টানে, ইহাও যেমন প্রকৃতির বিধান, তেমনি মানুষ যে হাত-পা খেলাইয়া মাধ্যাকর্ষণকে কাটাইয়া উপরের পানে উঠিয়া যাইবার প্রয়াস করে, ইহাও তো প্রকৃতিরই প্রেরণা। এই ঊর্দ্ধমুখী প্রেরণার মূলে যে স্বভাবের নিয়ম রহিয়াছে, তাহাকে আবিষ্কার করিয়া জীবনে প্রয়োগ-সিদ্ধ করিয়া তোলাই ধর্ম্ম-সাধনা। ইহার মাঝে যাহাকে আমরা কৃচ্ছ্রতা বলি, তাহা আমাদের অস্বাভাবিক পথে জীবনকে পরিচালনা করিবার ফল মাত্র ! বাল্যকাল হইতে বালককে যথেচ্ছ ও উচ্ছৃঙ্খল ভোগ হইতে হইতে বিরত রাখ, তাহার কাছে সংযম বিন্দুমাত্র কঠোর বোধ হইবে না ; অথচ এই প্রাকৃতিক ভোগের ফলে তাহার ভোগকালের মেয়াদ অসংযত ব্যক্তিদের অপেক্ষা বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে। সংসারে ভোগের অনেক কিছুই রহিয়াছে বলিয়াই আমাকেই যে তাহা ভোগ করিতে হইবে, ইহার কি কোনও মানে আছে ? তাহা হইলে ভগবান্ আর আমার মাঝে বিবেকবুদ্ধি দিলেন কেন ? কেহ কেহ আপশোষ করিয়া বলেন, সংসারে এত ভোগের উপকরণ

থাকিতে উপবাসী থাকিব ? তাহা হইলে ভোগের সৃষ্টি হইল কেন ? বিবেকী বলিবেন, ভোগের সৃষ্টি হইয়াছে কতকটা ভোগের জন্য, আর কতকটা দুর্ভোগের জন্যও বটে। আজ আমি যদি এই ভোগকে প্রত্যাখ্যান করি, তাহাতেও ক্ষতি নাই, কেননা সংসারে অবিবেকীর সংখ্যাই বেশী ; আমার নিকট হইতে প্রত্যখ্যাত এই ভোগকে লুকিয়া লইবার দরুণ অনেক লোকই আছে, তাহাদের কাছে প্রকৃতির এই ডালি সার্থক হইবে। বৈদান্তিক বলিবেন, যতটুকু আমার নিতান্ত প্রয়োজন, আমি তাহাই মাত্র স্বীকার করিয়া প্রকৃতিস্থ থাকিব ; আর আমার প্রসাদ লইয়াই অবিবেকীর দল কাড়াকাড়ি করিবে ; মত্ততার অনুভব আমি তাহাদের ভিতর দিয়াই করিব, কেননা, তাহারা যে আমারই আত্মস্বরূপ ; আমার আধারকে আমি সংযত ও বিশুদ্ধ রাখিতে চাই, নতুবা এই দৃষ্টিভোগের সামর্থ্য আমার থাকে না। হিন্দুর সংযম-সাধনার যে কৃচ্ছ্র তা রহিয়াছে বলিয়া লোকে তাহাকে এত ভয় করে, তাহার মূলে এই গভীর দার্শনিক তথ্য নিহিত। সুষ্ঠু চিন্তা দ্বারা, বিচার দ্বারা জীবনকে পরিশীলিত করিতে হইবে ; ভোগের লোলুপতা জাগে বলিয়াই তাহাকে তৃপ্ত করিতে হইবে এ কোন বিচারের কথা ?

*

এই সংযম-সাধনার উপরই হিন্দুর আশ্রম-জীবনের প্রতিষ্ঠা। আজকাল আশ্রম বলিতে একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম-সাধনার স্থান বোঝায়। কিন্তু হিন্দুর আশ্রম তো জীবনের সবটুকুই নিয়ন্ত্রিত করিত—আশ্রমজীবন যাপন তো সকলকেই করিতে হইত। এক অনুপনীত শিশু, আর এক ব্রহ্মবিত্তম পরমহংস—এই দুইজনই অনাশ্রমী, ইহাঁরাই বিধিনিষেধের গণ্ডীর বাহিরে। ইহা ছাড়া বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে, বার্দ্ধক্যে—কোথায় আশ্রমজীবনের বিধিনিষেধ ছিল না ? যে সংসারী, সে কি ভোগের লাইসেন্স পাইত, না তাহারও জীবন আশ্রম-জীবন, সংযমের জীবন, বিধিনিষেধ দ্বারা শাসিত জীবন ছিল ? আশ্রম-জীবনের অধীন থাকিয়া ব্রহ্মচারী বিবেক ও বিচারের ট্রেনিং পাইত, গৃহস্থ তাহার প্র্যাক্‌টিস্ করিত, বানপ্রস্থী তাহার ফলভোগ করিত। এমনি করিয়া সমস্তটা জীবনই একটা ঊর্দ্ধতন স্বভাবের ইঙ্গিতকেই অনুসরণ করিয়া চলিত। এ জীবন যে সুখের নয়, একথা তাহারাই বলিবে, যাহারা কোনও দিন আপনাকে শৃঙ্খলার মাঝে সঁপিয়া দিবার সাহস অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

*

সংযমের সাধনা আমাদের সামাজিক জীবনে চিরকাল অন্তঃশীলা হইয়া বহিয়া আসিয়াছে। মাঝে আমরা আত্মবিস্মৃত, হতচেতন হইয়া পড়িয়া ছিলাম। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষে আমাদের শক্তিকে নূতন করিয়া উদ্বোধিত করিয়া তুলিয়াছে। অনেক বিষয়ে আমরা নিজকে যেন নূতন করিয়া ফিরিয়া পাইয়াছি। আজকাল যেখানে-সেখানে আশ্রম-প্রতিষ্ঠার একটা হিড়িক্ আসিয়াছে যেন। ইংরেজী শিক্ষা আমাদের দেশে যখন প্রথম প্রচলিত হয়, তখন কিন্তু এই সৃজনীপ্রতিভার বিকাশ হয় নাই। আশ্রম প্রতিষ্ঠা দ্বারা ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কল্পনাই তখন কেহ করিতে পারিত না। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার ভরা জোয়ারেই আমাদের দেশে এই আশ্রমপ্রতিষ্ঠার বাতিকটা চাগিয়া উঠিয়াছে বেশী। একদল লোক আছেন, যাঁহারা এই সমস্ত আশ্রমকে সেকেলে কুসংস্কারের আড্ডা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন ; কেহ কেহ এতদূর না গেলেও, ইহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কটাক্ষও করিয়া থাকেন। কিন্তু কথাটাকে সমষ্টি-ভাবে বিচার করিবার মত ঔদার্য্য কাহারও দেখি না। আশ্রমপ্রতিষ্ঠার বাতিক আমাদের একটা জাতীয় মনোবৃত্তির পরিচায়ক, ইহা কোনও আকস্মিক ঘটনা

নয়। জাতির জীবনমূলে কোথায়ও এই প্রেরণা অবরুদ্ধ ও নিৰ্জ্জীব হইয়া ছিল, আজ যখন সংঘাতে শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল হইলেও এই প্রেরণাই সবলে জাতীয় জীবনে আত্ম-প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। এই জন্যই দেখি, আশ্রম প্রতিষ্ঠার আইডিয়াকে নূতন নূতন ব্যঞ্জনা দ্বারা সার্থক করিবার মত প্রতিভা, যাঁহারা বেশী মাত্রায় ইংরেজী-নবীশ, তাঁহাদের মাঝেই বিশেষ করিয়া ফুটিয়া আসিতেছে। ইংরেজী শিক্ষার ভরা মুরসুমে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রেরণা আমাদের অন্তরতম স্বভাবেরই পরিচয়, নতুবা এই বিসদৃশ ব্যাপারটা এমন করিয়া প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মাঝে মাথা কাঁড়া দিয়া উঠিত না। তাহা ছাড়া, দেশকে বড় করিয়া জানিবার সুযোগ যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিয়াছেন, এই দেশের অভাব কত বেশী, আর তাহার তুলনায় আমাদের শক্তি কত কম! দেশের দুঃখে যাঁহাদের প্রাণ কাঁদে, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা বিন্দুমাত্র শক্তির অপচয় সহ্য করিতে পারেন কি? বরং নানা দিকে বাঁধ দিয়া এই শক্তিটুকু অপচয় হইতে রক্ষা করিবার আকুলতাই তাঁহাদের মাঝে জাগে না কি? এই সমস্ত ভাবুকেরা কি করিবেন?—গতানুগতিকের জীবন ছাড়িয়া উৎসর্গের জীবন গ্রহণ করিবেন, সংযমের জীবন গ্রহণ করিবেন;—এক কথায় বলিতে গেলে ভোগে বীতস্পৃহ দারিদ্র্যের ব্রতকে মাথায় তুলিয়া লওয়াই হইবে তাঁহাদের স্বভাব। শুধু নিজেরাই যে তাঁহারা এই পথ ধরিবেন, তাহা নয়; দেশের হাজার হাজার তরুণ প্রাণকে ডাক দিয়া তাঁহারা বলিবেন—"এ একার সাধ্য কাজ নয়; সহস্র সহস্র উৎসৃষ্ট প্রাণের শক্তি একত্র পুঞ্জীভূত না হইলে কিছুতেই কিছু করিতে পারিব না; অতএব পরোচ্ছিষ্ট ভোগের লুব্ধতা ছাড়িয়া তোমরা ছুটিয়া এস—এই দৈন্যের মাঝে, পুণ্যের মাঝে, দারিদ্র্যের মাঝে, তপস্যার মাঝে!" এই মনোভাব হইতেই, এই আকুলতা হইতেই আজ দেশ জুড়িয়া এত আশ্রমপ্রতিষ্ঠার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। বাংলার একজন শক্তিশালী লেখক ইহাকে "স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ" বলিয়া সবিদ্রূপ কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আশ্রম গড়িয়া এমনি ঘটা করিয়া দারিদ্র্যের অনুশীলন করিলে দেশের কি উপকার হইবে? আশ্রমজীবনের মূল প্রেরণাটীকে যদি তিনি হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেন তো এই প্রশ্ন উঠিতই না। তাঁহার মনঃকল্পিত একটা আশ্রম অসম্পূর্ণভাবে চিত্রিত করিয়া সেই উপলক্ষ্যে সমগ্র আশ্রমজীবনটাকেই বিদ্রূপের বাণে জর্জ্জরিত করা সুবুদ্ধিও নয়, সৌজন্যও নয়। দেশে ধনিকের মেকী বিলাসও তো কিছু কম নয়; তাহাতেই কি দেশের সত্যিকার উপকার হইতেছে? মুষ্টিমেয় ধনিক পাশ্চত্য সভ্যতার অনুকরণ করিয়া দেশে বিলাতী ভোগের উপকরণ আমদানী করিয়া কি একটা খুব উন্নত জীবনাদর্শ খাড়া করিতেছেন? ওই প্রাংশুলভ্য ফলের দিকে দেশের লোককে প্রলুব্ধ করিয়া চেতাইয়া তোলাই কি দেশের কাজ হইবে? অভাব বাড়ানোতে নয়, অভাবকে সীমাবদ্ধ করাতেই সোয়াস্তি, এই ভাব আমাদের মজ্জাগত। এই ভাবকে ধরিয়া যাঁহারা কাজ করিবেন, তাঁহারাই দেশের লোককে স্পর্শ করিতে পারিবেন। অভাবের সঙ্কোচে আবার তামসিকতা না আসিয়া পড়ে, এই জন্যই কর্মকঠোর আশ্রমজীবনের প্রয়োজনীয়তা। ইহা জাতীয় জীবনের একটা অনুশীলনক্ষেত্র। ধনিকেরা ইহা [illegible] আদর্শ [illegible] হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের ছাড়িয়া দিলেও দেশের সাড়ে পনের আনা লোকের জীবনে এই আশ্রমজীবনের প্রভাব রসায়নের মতই কাজ করিবে, ইহা দেশের নাড়ীর খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন।

*

বেলুড় মঠ Statutory Commissionকে

বাড়ী ডাকিয়া আনিয়া ভোজ খাওয়াইয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন, এই কথা লইয়া নানাপ্রকার সমালোচনাই হইতেছে। "বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্" এই সাফাই গাহিলে এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু লোকে কথাটাকে ব্যাখ্যা করিতেছে অন্য রকমে। তাহারা বলে, রামকৃষ্ণ-মিশন সেবার কাজ চালাইবার দরুণ আজকাল অতিরিক্তমাত্রায় সরকার-ঘেষা হইয়া উঠিতেছেন; কমিশনকে ভোজ খাওয়ানের মাঝেও সরকারকে প্রীত করিবার গোপন উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কেহ কেহ একটু মাত্রা বাড়াইয়া মিশনকে দেশ-দ্রোহী বলিতেও কসুর করিতেছেন না। আমরা ভিতরের কথা জানি না, সুতরাং এই ব্যাপারকে যে কি ভাবে গ্রহণ করিব, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সেবা যদি একটা বাতিক বা hobby হইয়া দাঁড়ায়, এবং তাহার উদ্‌যাপনের দরুণ যেখানে-সেখানে হাত কচ্‌লাইতে হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাসীর মিশনের আত্ম-মর্য্যাদা রহিল কোথায়? নাই বা হইল দেশের সেবা, তা' বলিয়া নিজকে হীন করিব? শিবত্বের অচল আসন হইতে ভ্রষ্ট হইব? সেবা তো শুধু রোগীর হাসপাতাল গড়িয়া বা কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া নয়। আজ যদি পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতা বশতঃ এই স্থূলের সেবা আমাদেরদ্বারা সম্ভব নাও হয়, আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কি এমন শক্তি নাই যে মঙ্গল-ভাবনা দ্বারা দেশের প্রাণে জাগরণের স্পন্দন আনি? পওহারীবাবা বিবেকানন্দকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা কি এতই সহজে ভুলিয়া যাইবার? শুধু কমিশনকে ভোজ খাওয়ানোতেই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল, সে কথা আমরা বলি না, কারণ দেশের এক শ্রেণীর লোক রাজনীতিক কারণে এই ব্যাপারটাকে বাড়াইয়া তুলিলেও রাজনীতি নিরপেক্ষ মিশনের তাহাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু "সঙ্কল্পিত কর্ম্মকে" বজায় রাখিবার দরুণ সন্ন্যাসের মহিমা হইতে ভ্রষ্ট হওয়াকেই আমরা সব চেয়ে মারাত্মক মনে করি। মিশন আতুরের সেবা ছাড়িয়া দিয়াও যদি স্বাধীন থাকিয়া শুধু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে প্রচার করেন, তবে তাহাই ভুবন-মঙ্গল হইবে।

আরণ্যক

—):*:(—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তার বাহিরের দরজা বন্ধ কর—তোমার দেওয়া সংযমের বাঁধ সে প্রাণপণে আঁকড়িয়ে ধরবে। নতুবা শত আব্রু দিলেও সমস্তই কুহেলিকার মত ক্ষণপরে উড়ে যাবে। তার মর্ম্মস্থলে বসে চাবি দাও, কারও সাধ্য নাই যে তা খুলবে। আর ভিতর ফাঁকা রেখে সেখানটা দখল না করে বাইরে থেকে যতই কর না কেন, কর্পূরের মত উবে যাবে।

*

আমাকে আমি যতটা ভালবাসি, বিশ্বাস করি,

ততটা কাউকে নয়; কিন্তু এই আমিটা যদি না থাকে তবে সবই শূন্য হয়ে যায় না কি? অথচ আমি বাদে সমস্ত জগৎটা একশা হয়ে আছে। এইটী অনুভব করাই দ্রষ্টৃত্ব; নতুবা আমার ভিতরে ভিতরে তো সবই হচ্ছে, আবার তার সঙ্গে মিশে গিয়ে হাসছি-কাঁদছি। আর একটা মন কিন্তু এ সমস্ত তুচ্ছ হাসির ব্যাপার বলে ধরিয়ে দিচ্ছে। জীবনের উপর এ ভাবটীও দ্রষ্টৃত্বের পরিচায়ক। কিন্তু যে দিক দিয়েই দেখ না কেন, প্রচণ্ড মনের জোর ভিন্ন বিপর্য্যস্ত আবেগ থাকতে কেউ দ্রষ্টা হতে পারে না।

*

আচারানুষ্ঠানের যা লক্ষ্য, সেই ভাব যখন মানুষের জীবনে অনুস্যূত হয়ে যায়, তদনুকূলে চিত্তের স্বাভাবিক গতি হয়, তখন বাহিরের দু একটা ক্রিয়াকাণ্ড বাদ পড়লেও তাতে আসলে ক্ষতি হয় না। তাই হিন্দুর অধিকারীভেদের ব্যবস্থায় আমরা দেখি নূতন উপবীতধারীর পক্ষে যে আচার বিহিত হয়, বৃদ্ধ বা প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে তা হিতকর হলেও একান্ত-করণীয় নয়। যেমন সন্ধ্যাবন্দনা, এ প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু হিন্দু সে সন্ধ্যা বলতে উপনয়নের সময়কার নির্দ্দিষ্ট সংস্কৃত কয়েকটী মন্ত্রই সকলের পক্ষে আজীবন ব্যবস্থা করেন নি। যতদিন পর্য্যন্ত বিধি আয়ত্ত হয়ে দেবভাবটী লাভ না করবে, সংস্কার শুদ্ধি হয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশাধিকার না জন্মাবে, ততদিনই ওই মন্ত্র কয়েকটি আওড়াতে হবে। কিন্তু যখন অর্থ হৃদয়ঙ্গম হবে, তখন স্বেচ্ছায় আরও তার ভিতরে প্রবেশ করে নূতন নূতন সত্য আহরণ করবে। হয়ত ক্রমশঃ সেই নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র কয়েকটী বাদও পড়ে যেতে পারে; তার লক্ষীভূত যে অর্থ তদনুকূলে হয়ত আরও কত কিছু সে নিজে নিজে সাধন করতে থাকবে। একেই বলে শ্রদ্ধা। নিষ্ঠাসহকারে একটা বিধি দিনের পর দিন সমস্ত বাধা-বিপত্তির মাঝ দিয়া পালন করে চল্‌তে চল্‌তে ক্রমশঃ তার উদ্দেশ্য তার মর্ম্ম সাধকের অধিগত হয়ে থাকে। নিত্য নূতন করে তা তার জীবনে রসের যোগান দেয়। শ্রদ্ধার অর্থ হল আস্তিক্য বুদ্ধি—অর্থাৎ আছেই এবং পাবই এই বিশ্বাস; এতেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়ে থাকে।

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ

শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ মঠ হইতে যাত্রা করিয়া বঙ্গদেশ পরিভ্রমণান্তে চৈত্রের প্রথমভাগে পুরীধামে পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী প্রচারোদ্দেশ্যে উত্তরপশ্চিম ভারতে যাত্রা করিয়াছেন।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ—শ্রীনরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত। পাণিহাটী শ্রীশ্রীমধুর গৌরাঙ্গভবন হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

নাটকখানি বর্ত্তমান সময়োপযোগী। মহাপুরুষদের জীবনী অবলম্বনে এইরূপ যতই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, ততই সমাজের মঙ্গল। বাজে নাটক নভেল অপেক্ষা এই শ্রেণীর পুস্তক রচনায় গ্রন্থকারের উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান বিজাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে দেশের রত্নসমূহের প্রতি সাধারণের মন ফিরাইয়া আনিতে হইলে এই পন্থা আশুফলপ্রদ।

গ্রাহকগণের প্রতি

প্রেসসংক্রান্ত নানা দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ প্রতিমাসের পত্রিকা আমরা নিয়মিতকালে গ্রাহকগণের হস্তে দিতে পারিতেছি না; এজন্য তাঁহাদিগের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। ফাল্গুনের পত্রিকা চৈত্রের শেষে এবং চৈত্রের পত্রিকা বৈশাখের প্রথমভাগে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করি।

ভক্তসম্মিলনী

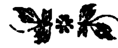
চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন

(১৩৩৫)

স্থান—মধ্যবাংলা সারস্বত আশ্রম, জয়দেবপুর, ঢাকা

—)*:(—

সংক্ষিপ্ত বিবরণ



গত ১১ই পৌষ বুধবার হইতে ১৩ই পৌষ শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় মধ্যবাংলা সারস্বত আশ্রমে (ঢাকা—জয়দেবপুর) ভক্ত-সম্মিলনীর ১৪শ বার্ষিক অধিবেশন যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজা, জমীদার, ইঞ্জিনিয়ার, উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরাণী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তগণই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত জেলা হইতে ভক্ত-সমাগম হইয়াছিল। আসাম, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতেও দুই এক জন করিয়া ভক্তের আগমন হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত প্রায় দুই শত ভক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-মহারাজের একনিষ্ঠ প্রিয় শিষ্য মধ্যপ্রদেশান্তর্গত বস্তার-রাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সিংহ ভঞ্জদেব সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া ভক্তমণ্ডলীর সবিশেষ আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। রাজাসাহেবের অমায়িকতা, নিষ্কিঞ্চনতা, অমানিতা ও নিষ্কপট গুরুভক্তি ভক্তমণ্ডলীকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছিল।

প্রথম দিবস শ্রীভগবান জগদ্‌গুরুকে সভাপতিরূপে আবাহন করিয়া বন্দনাগীত ও স্তোত্রাদি পাঠান্তে বেলা ৮॥টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিয়া একটী লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস নন্দী বি-ই ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় দক্ষিণ-বাংলা সারস্বত-আশ্রমের সেবক পরলোকগত বিজয় ব্রহ্মচারীর গুণ কীর্ত্তন করিয়া একটী শোকসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করিলে ভক্তগণ "জয়গুরু" উচ্চারণ করিয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সভাপতির প্রতিনিধিস্বরূপে শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহারাজ গুরুর পক্ষ হইতে লিখিত একটী অভিভাষণ পাঠ করিয়া ভক্তসম্মিলনীর উদ্দেশ্য সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। অনন্তর গতবর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ এবং মঠ ও আশ্রমগুলির আয়ব্যয় প্রদর্শন করিয়া সেবক ও সদস্যগণের মধ্যে কাহার দ্বারা কিরূপ কার্য্য হইতেছে ও অর্থসামর্থ্যে কে কিরূপ সাহায্য করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। অতঃপর অন্যান্য বর্ষের ন্যায় আগামী বর্ষের দরুণ প্রয়োজনমত নূতন সদস্যাদি নির্ব্বাচনান্তে বেলা ১টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। পুনরায় সন্ধ্যা ৭॥টার সময় সমবেত ভক্ত-

মণ্ডলীকে লইয়া একটী বিশেষ সভার আহ্বান করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

দ্বিতীয় দিবস যথানিয়মে প্রার্থনাসঙ্গীত ও স্তোত্র পাঠান্তে বেলা ৯টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ অনুপস্থিত সদস্য ও ভক্তগণের পত্র ও টেলিগ্রামসমূহ পঠিত হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি. এল্ ও রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মঠের উদ্দেশ্য ও প্রচার সম্বন্ধে, ডাঃ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় ঋষিবিদ্যালয় সম্বন্ধে, শ্রীমৎ স্বামী চিদানন্দ মহারাজ ও শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ মিত্র বি, এল্ সংঘশক্তি ও ভাববিনিময় সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। বস্তাররাজ সম্মিলনীতে যোগ দান করিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করায় সম্মিলিত ভক্তপক্ষ হইতে একটী ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উপস্থাপিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। অনন্তর সভাপতি মহারাজ রাত্রে সকলকে সমবেত হইয়া আত্মগঠন, আদর্শ গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠা, সংঘশক্তি প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা ভাববিনিময় করিতে আদেশ দিলেন। অনন্তর ভক্তগণের মধ্যে পরস্পর পরিচয় ও অভিবাদনান্তে বেলা ১টার সময় সভাভঙ্গ হইল।

তৃতীয় দিবস বেলা ২॥টার সময় আশ্রমের প্রাঙ্গণে একটী সাধারণসভার অধিবেশন হয়। সভায় ঢাকা সহর ও এতদঞ্চলের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আনুমানিক প্রায় ১৫০০ লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ভাওয়াল রাজষ্টেটের সেক্রেটারী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল্ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভাওয়ালের স্বর্গীয় কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ভাগিনেয় সর্ব্বজনসম্মানিত শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ কর্ম্মকার কর্ত্তৃক একটী উদ্বোধনসঙ্গীত ও ঋষিবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক স্তোত্রপাঠান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অনন্তর অভ্যর্থনাসমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বসাধারণকে অভ্যর্থনা করিয়া একটী লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল্, শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ মিত্র বি, এল্, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস বি, এল্ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ প্রভৃতি মহোদয়গণ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের সমস্যাই যে আমাদের জাতীয় সমস্যা, ইহা সকলকে বুঝাইয়া দেন। শ্রোতৃমণ্ডলীস্থ এক ভদ্রলোক অন্নসমস্যাকেই দেশের মূল সমস্যা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন এবং কেহ কেহ তাঁহাকে সমর্থনও করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়া সকলকে তাঁহার বক্তব্য জানান এবং শিক্ষাসমস্যাই যে গুরুতর সমস্যা ইহা সকলকে বুঝাইয়া দেন। সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ দেশের প্রধান প্রধান সমস্যাসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া তাহার সমাধানের উপায় যে আত্মশক্তির উদ্বোধনেই নিহিত, ইহা বুঝাইয়া দিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে সংশয়শূন্য করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি ও সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদজ্ঞাপনান্তে রাত্রি ৭টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। তদনন্তর উপস্থিত জনমণ্ডলী শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজকে প্রণাম ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সভাস্থান পরিত্যাগ করেন।

এবার সম্মিলনীতে একটী অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চারে সকলকেই বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই কয়দিন উপস্থিত সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শেষের দিন প্রায় সহস্রাধিক লোক প্রসাদ পাইয়াছিলেন। সম্মিলনীর সমুদয় ব্যয়ভার সমাগত ভক্তমণ্ডলীই বহন করিয়াছেন। আগামী বর্ষে উত্তরবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে সম্মিলনীর ১৬শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

স্বাগতম্

[সারস্বত মঠের পক্ষ হইতে পঠিত]

অসতো মা সদ্‌গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়,
আবিরাবির্ম এধি।
গুরো যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যং ॥

—হে গুরো, অসত্য হইতে তুমি আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও, এসো—এসো—আমার মাঝে প্রকাশিত হও, তোমার যে প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ, তাহা দ্বারা আমাকে নিত্য রক্ষা কর।

আজ অর্দ্ধযুগ পরে ভিক্ষুকের দীন আয়োজন এবং উপচিত প্রাণের আনন্দ ও আবেগ লইয়া আপনাদিগকে গুরুগৃহের এই পুণ্য প্রাঙ্গনে সাদরে আহ্বান করিতেছি। আমাদের সম্মুখে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীশঙ্কর-গৌরাঙ্গের সম্মিলিত মূর্ত্তি—গৌরাঙ্গকে অন্তরে রাখিয়া শঙ্করকে বাহিরে প্রকটিত করেন বলিয়া যাঁহাকে দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরু বলিয়া জানি, সেই বুদ্ধকল্প শ্রীগুরুবিগ্রহ আমাদের সম্মুখে; আসুন, এই ত্রিমূর্ত্তির সম্মুখে নতজানু হইয়া আমরা সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যকণ্ঠে উচ্চারিত গুরুপূজার বিদ্যুদ্‌গর্ভ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলি:—

"নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স—বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি।"

—আমি সেই ভগবান্ জীবন্মুক্ত সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে নমস্কার করি, আমি বুদ্ধরূপী গুরুর শরণ লইলাম, তাঁহার বাণীরূপী ধর্ম্মের শরণ লইলাম, তাঁহার কর্ম্মরূপী সংঘের শরণ লইলাম।

এই আত্মনিবেদনই আমাদিগকে শ্রেয়ের পথে প্রচোদিত করুক

শুধু একটা মত প্রচার নয়, মানুষকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহাকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া, দিনের পর দিন তাহার কার্য্যকলাপ প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে অনুসরণ করিয়া নির্ব্বাণের পথে তাহাকে প্রচোদিত করা—এবং এইরূপে একটী দুইটী নয়, একটা বিরাট্ সংঘকে পরিচালিত করা—লোকগুরুর এই লোকোত্তর কর্ম্ম সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের পূর্ব্বোত্তর কোণে একবার বুদ্ধজীবনীতে পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেখানে যে হোমানল সমিদ্ধিত হইয়াছিল, তাহার দ্যুতি আজও অর্দ্ধজগৎকে আলোকিত করিতেছে। বুদ্ধ-প্রচোদিত সংঘের প্রেরণা আমাদের মাঝে কত প্রবল, তাহা আমাদের জাতীয় কর্ম্মপদ্ধতি যাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখেন, তাঁহারাই জানেন। বুদ্ধের জীবনী ও বাণী যতই আলোচনা করি, ততই তাঁহার পুণ্যময় জীবনের সহিত আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরেরও জীবন ও কর্ম্মধারার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হই। সে সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার সময় এখন নয়। কিন্তু সংঘের এই পূর্ণাবিবেশনের দিবসে সেই লোকোত্তর সংঘনায়ককে এই শ্রীবিগ্রহে প্রকটিত অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—তাই আবারও নতজানু হইয়া বলি—নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স!

প্রতি বৎসরই আমাদের এই সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া থাকে। বৎসরান্তে এই কয়টী আনন্দের দিনের দরুণ আমরা কত আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। এই কয়টী দিনে গুরূপদিষ্ট বেদান্তের ভাব যেন আমাদের মাঝে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রাণে হিল্লোলিত হইতে থাকে, আমরা বুঝিতে পারি —আমরা একা নই, আমরা বহু, বিচিত্র—আমাদের মৃত্যু নাই, শঙ্কা নাই—রাগ নাই, দ্বেষ নাই—জাতি-ভেদ নাই, কুলদর্প নাই—আমাদের বন্ধন নাই, মোক্ষ নাই—আমরা শ্রীগুরুর পার্ষদ—চিন্ময়, আনন্দময়! তিন দিনের এই বিরাট্‌ত্বের অনুভূতি ও সাধনা আমাদের সম্বৎসরব্যাপী কর্ম্মে কতই না বল সঞ্চারিত করে!

আমাদের সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনাদের কাছে দুই-চারিটী কথা বলিতে চাই। প্রতি বৎসরই আমরা এই আলোচনা করিয়া থাকি; প্রতি প্রভাতের নূতন সূর্য্যোদয়ের মত তাহা আমাদিগের প্রতি বর্ষের কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত, ছন্দোবদ্ধ ও প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে। মহত্ত্বের সাধনায় অভ্যাসযোগের যে স্থান, এই বার্ষিক আলোচনাও সেই স্থানীয়, সুতরাং ইহা অবান্তর নয়, বরং ইহাই আমাদের উদ্দেশ্যের সহায়ক।

সম্মিলনীর তিনটী উদ্দেশ্য—সংঘপ্রতিষ্ঠা, ভাব-বিনিময়, আদর্শ গৃহস্থজীবন প্রতিষ্ঠা। ইহাদের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

সংঘের স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের সংঘের যে একটা বিশিষ্টতা রহিয়াছে, তাহারই প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মানুষ যেখানে কোনও বিশিষ্ট মতবাদ বা অবস্থাবৈচিত্র্যদ্বারা বিপর্য্যস্ত নয়, সেই পূর্ণজাগ্রৎ মানবত্বকেই আমরা সংঘের উপাদান রূপে গ্রহণ করিয়াছি। কর্ম্মবিভাগের দরুণ সেবক ও ভক্ত, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ, এইরূপ আপাতভেদসূচক নাম আমরা ব্যবহার করি বটে, কিন্তু সকলেই তো জানি, গুরুগৃহের প্রাঙ্গণে এই ভেদ কত সহজে বিলুপ্ত হইয়া যায়, গুরুর কর্ম্মে আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় আমরা কত সহজে আমাদের অবস্থাবৈষম্যের কথা ভুলিয়া যাই। পুরাণের হরিহর-মিলনের চিত্র অনু-ধাবন করিলে যে ভাব হৃদয়ে জাগে, আমাদের সংঘের তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিলেও সেই কথাই মনে পড়ে। কর্ম্মী সন্ন্যাসী আর নির্লিপ্ত গৃহী—এরা যেন গুরুর ডান হাত আর বাঁ হাত। এই আশ্রমগুলি কি? আপনাদের ছেলেপিলে কুড়াইয়া আনিয়াই তো গুরু এই গৃহস্থালী পাতিয়াছেন। আপনাদের গৃহস্থালীই বা কি? আমরা জানি, গৃহস্থদের মাঝে এমন উন্নতহৃদয় কত জন আছেন, যাঁহারা সমস্ত সংসারটাই গুরুর সংসার জানিয়া একান্ত বিবিক্ত হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর মনে করেন, তিনি যেন তাঁহারই স্বরচিত কোনও আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই ভাবে যদি সকলে না হউক, আমরা অধিকাংশেই অনুপ্রাণিত হইতে পারি, তাহা হইলেই কি সংঘশক্তির উন্মেষ সম্পূর্ণ হইবে না?

সন্ন্যাসী আর গৃহস্থের মাঝে একটা দ্বন্দ্বের ভাব আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে; তাই আশ্রম যেন সমাজবহির্ভূত একটা ডেরা এই কল্পনা আমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। এই ভাব মনে রাখিয়াই অনেকে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনাদের আশ্রমের নিয়মাবলী কি? বাস্তবিকই তখন আমরা ফাঁপরে পড়িয়া যাই। সন্ন্যাসের মর্য্যাদাবোধক কতকগুলি কঠিন কসরতের নাম যদি করিতে পারি-তাম, তাহা হইলে হয়ত মান বজায় থাকিত। কিন্তু ভাবিয়া-চিন্তিয়া যখন জবাব দিই—"এমন উদ্ভট নিয়ম তো কিছুই নাই, গুরুর গৃহস্থালী চালাইতে যা দর-কার, তাই করি মাত্র", তখন মানুষ অবাক্ হইয়া মুখের পানে চাহিয়া থাকে। অনেক নূতন সেবকও

এই রহস্য বুঝিতে না পারিয়া তিক্তকণ্ঠে প্রশ্ন করে, এ তো ঘরে যাহা করিতেছিলাম, এখানে আসিয়াও তাহাই করিতেছি ; তবে আর ঘর ছাড়ার প্রয়োজন কি ছিল ?

কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, ঠিক এই জায়গাতেই আমাদের সংঘের প্রাণশক্তি নিহিত নয় কি ? এক দিন গুরুর ঘর আর আপনাদের ঘর এক হইয়া যাইবে, আজ যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর স্বচ্ছন্দে কাহারও কাহারও বাড়ীতে উঠিয়া সন্ন্যাসী সেবকদের পানে চাহিয়া বলেন, "যাও, তোমাদের আর কোনও প্রয়োজন হইবে না, এদের এখানে আমার কোনও অভাব নাই"—তেমান করিয়া যেদিন আপনাদের ঘরে ঘরে তিনি গিয়া হানা দিতে পারিবেন, সেইদিন তাঁহার সংকল্প পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে না কি ? গুরুর ঘরে থাকিয়া আমরা ঠাকুরকে আমাদের বলিয়াই একটু জোর দাবী করি সেকথা আপনাদিগকে বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না ; কিন্তু আমরা আকুল হইয়া সেইদিনের প্রতীক্ষায় আছি, যেদিন আমাদের ঠাকুর ("আমাদের" বলিলাম বলিয়া রাগ করিবেন না) আপনাদের অঙ্গনে পদার্পণ করিয়া মুখ ফিরাইয়া আমাদের বলিবেন, "যাও, তোমাদের আর প্রয়োজন নাই—আমি আপন ঠাঁই আসিয়াছি !"

আবার আমার সেই বুদ্ধদেবের কথা মনে পড়িতেছে। বুদ্ধদেব বক্তৃতা দিয়া ফিরিতেন না, দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেন না, উতরোল কিছুই তাঁহার ছিল না ; তিনি নিঃশব্দে এর ঘর হইতে তার ঘরে গিয়া উঠিতেন ; কি জানি আজ শাস্তা কার ঘরে গিয়া উঠিবেন, সেই ভাবনায় শ্রাবস্তী, গিরিগৃহ প্রভৃতি নগরের গৃহস্থেরা উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন ; বুদ্ধদেব যে ঘরে গিয়াছেন, সেই ঘরেই দেখিয়াছেন, তিনি সংবাদ না দিয়া আসিলেও তাঁর অভ্যর্থনার জন্য সেখানে সবাই প্রস্তুত ! আমাদের ঠাকুরও এমনি ঘর ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এমন দিন কবে হইবে, যেদিন তিনি দেখিবেন, বিনা আহ্বানে, বিনা সংবাদেও তিনি যে ঘরে গিয়া হাজির হইয়াছেন, সেই ঘরে সবাই উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় তাঁহার পথপানে চাহিয়া ছিল—সবাই সেখানে প্রস্তুত ?

এই যে ঠাকুরের জন্য সবারই প্রস্তুতি, যখন যে ভাবেই আসুন না কেন, তিনি আসিয়া যে দেখিবেন, তাঁহারই জন্য আমরা তৈয়ার হইয়া রহিয়াছি—এই ভাবটাই সংঘশক্তির মূল নয় কি ? বুদ্ধদেবের সংঘশক্তি জগৎ ছাইয়া ফেলিল কিসের জোরে ? কতকগুলি সন্ন্যাসী এক জায়গায় দল বাঁধিয়া ছিল বলিয়াই কি ? আমার তো তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, বুদ্ধকে, গুরুকে বরণ করিয়া লইবার জন্য গৃহস্থের যে সদাজাগ্রৎ ভাব, সেইখানেই বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত সংঘের মূল দৃঢ়প্রোথিত হইয়া রহিয়াছিল।

এই যে বুদ্ধাবির্ভাবের প্রতীক্ষায় সচকিত গৃহস্থালী, ইহা আজ সুলভ নয় তাহা জানি। কিন্তু পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি, ঠাকুর কেবল কতকগুলি মতই প্রচার করেন নাই—সেই মতকে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তুলিবার দরুণ আদর্শও তিনি সম্মুখে ধরিয়াছেন। তাই গৃহস্থালীর ছাঁচে ঢালা তাঁহার আশ্রমগুলি। মূল ভাবটুকু ধরিতে পারে না বলিয়াই প্রাণোৎসর্গে উৎসুক সেবকও অনেক সময় ইহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকে। ঘরের কাজ আর আশ্রমের কাজ ঠাকুর এক করিয়া দিয়াছেন।—সংশয়ী জিজ্ঞাসা করিবে, কেন ? ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছি, কাজটা বাহিরে একই বটে, কিন্তু ভাবে তো এক নয়। সংসারে তুমি খাটিয়াছ স্বার্থে, মায়ায় ; এখানে খাটিতেছ নিঃস্বার্থ সেবায় ;—তবে আর এক হইল কি করিয়া ?

এই যে বিবিক্ত সেবার আদর্শে গঠিত আশ্রম, এ কি শুধু গুটিকতক গৃহত্যাগী সেবককে উদ্ধার করিবার উপায় মাত্র ? এই আশ্রম কি

বিস্তৃতি লাভ করিতে চাহে না?—নিশ্চয়ই চাহে। আপনাদের ঘরেও এই বিবিক্ত সেবার ভাব ছড়াইয়া পড়ুক। বাহিরের কাজ উভয়ত্র এক, ভিতরও তেমনি এক হইয়া যাউক। এই আশ্রমের আদর্শে আপনাদের গৃহস্থজীবন সুপ্রতিষ্ঠ হউক, তবেই যথার্থ সংঘশক্তির আবির্ভাব হইবে। আপনাদের জীবনে আমরা সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাই, আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যেন আর কোথায়ও প্রয়োজন না হয়;—আপনারা আমাদিগকে ছুটী দিন্!

অনেক সময় শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের কাছে বলেন, "আমার এমন কত অভিজ্ঞতার কথা আমি আমার গৃহস্থ শিষ্যদের কাছে বলি, কিন্তু তোমাদের কাছে বলিতে পারি না।" সত্যকথা বলিতে কি, সেই ভাগ্যবান্ গৃহস্থদের আমরা প্রাণ ভরিয়া হিংসা করি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় আনন্দে পূরিয়া উঠে যখন ভাবি, এই সংঘে এমন মহাসৌভাগ্যশালীও কেহ আছেন, যিনি ঠাকুরকে তাঁহার ঠাকুরালীর কুহেলিকা হইতে মুক্ত করিয়া সহজ মানুষ রূপে দেখিয়াছেন, পাইয়াছেন! ঠাকুরের এই ছদ্মবেশ ঘুচাইবার দায় আপনাদের; ঠাকুরের মুখোস্ খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে চিনিয়া লউন—প্রাণের মানুষ, মনের মানুষ ভাবিয়া নিবিড় পুলকে তাঁহাকে বুকে চাপিয়া ধরুন্—এই আপনাদের দায়! কিছু না করিয়া নিষ্কৃতি পাইবেন মনে করিয়াছেন! সংসারের বোঝার উপর এই ঠাকুরের বোঝাটীও যে আপনাদিগকে বহিতে হইবে। আপনাদের দায়িত্ব কি এতই সহজ?—আমরা শুধু দূতিয়ালী করিব, ঠাকুরকে বহিয়া আনিয়া আপনাদের দুয়ারে রাখিয়া যাইব, তারপর দূর হইতে দাঁড়াইয়া দেখিব, সহজ মানুষের সহজ প্রীতি।

ঠাকুরের হরিহর মূর্ত্তি দেখিবেন তো তাঁহার সম্মিলিত মঠ ও গুরুধামের পানে চাহিয়া দেখুন—সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য যে ঠাকুরের দক্ষিণ ও বাম বাহু, একই হৃৎপিণ্ডের রক্তধারায় যে উভয় বাহু সমভাবে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত, তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই সুমহতী কল্পনাই আমাদের জীবনের আদর্শ। মঠ ও গুরুধাম যেমন আদিতে অন্তে এক, তেমনি গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীও আদিতে অন্তে এক। এই সম্মিলিত মঠ ও গুরুধামের মাঝেই ঠাকুর পূর্ণ বগ্রহে প্রকটিত হইয়াছেন। বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বে মহাথের আনন্দকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, আনন্দ, তোমাদের এমন কথা মনে হইতে পারে, শাস্তা যখন নাই, তখন তাঁহার বাণীও বন্ধ্যা, আমাদের আর কিছুই করিবার নাই; কিন্তু তাহা মনে করিও না —**যো বো আনন্দ ময়া ধম্মো চ বিনয়ো চ দেসিত সো বো মমচ্চয়েন সত্থা**—যে ধর্ম্ম, যে বিনয় আমি তোমাদিগকে উপদেশ করিয়াছি, আমার অবর্ত্তমানে তাহাই তোমাদের শাস্তা।" শ্রীশ্রীঠাকুরও তেমনি তাঁহার বাণীতে ও কর্ম্মে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহাকে এড়াইবার উপায় নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠানই তাঁহার বিগ্রহ। এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ হইতে ভাব সংগ্রহ করুন, প্রাণ সংগ্রহ করুন!

এই সম্মিলনীতে মায়েরাও উপস্থিত রহিয়াছেন। তোমাদিগকেও মা আমার কিছু বলিবার রহিয়াছে। এই সংঘের মাঝে তোমাদের স্থানও নিতান্ত নগণ্য নহে। বরং আমরা জানি, আমাদের এই সংঘ মূলে মাতৃশক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত, বিধৃত ও সঞ্জীবিত। নারীর আত্মোৎসর্গ মূলে না থাকিলে এই সংঘ এমনি পূর্ণাবয়ব পাইত কি না তাহা সন্দেহস্থল। এই সঙ্ঘের ইষ্টসিদ্ধির পক্ষে তোমাদের সহায়তা অপরিহার্য্য। তোমরা কল্যাণী শ্রীরূপে প্রতিষ্ঠিতা না থাকিলে গার্হস্থ্যজীবনের আদর্শ ফুটিবে কোথা হইতে? মদালসার মত সন্তানকে স্তন্যপান করাইবার সময়েই ব্রহ্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া না তুলিলে

দেশ সুসন্তান পাইবে কোথায়? চারিদিকে আজ নারীজাগৃতির ঢেউ উঠিয়াছে—ভ্রান্ত পথে ছুটাছুটি, চ্যাঁচামিচি, গালিগালাজের আর অন্ত নাই। এই জাগৃতির কোলাহলের মাঝে তোমাদিগকেই যে সাম্য ও কল্যাণের বার্ত্তা বহিয়া আনিতে হইবে। আবার আমায় সেই বুদ্ধদেবের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতের নারীসমাজে যে বিপুল প্রেরণা ও মহীয়সী শক্তির বিকাশ হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। যসোধরা, মহাপ্রজাবতী গোতমী, থেরী খেমা, থেরী উপ্পলবণ্ণ, থেরী ধম্মদিন্না—ইঁহাদের শক্তি ও সাধনার কথা জগৎ কোনও দিন ভুলিতে পারিবে না। "আমরা বুদ্ধসুতা, আমাদের জয় করিতে পারে এমন শক্তি কাহারও নাই"—এই দীপ্ত বাণী অন্তরে বহন করিয়া তাঁহারা সংঘকে জয়যুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। "আমি বুদ্ধসুতা" এই গর্ব্ব করিবার অধিকার তো তোমাদেরও রহিয়াছে। এই সংঘের ভিত্তি গৃহস্থজীবনে; তোমরা তাহার নিয়ন্ত্রী। সুতরাং তোমাদেরও কর্ত্তব্য কায়মনোবাক্যে এই সংঘের উন্নতিসাধনকল্পে চেষ্টিত হওয়া। সন্তানের সুশিক্ষার দায় তোমাদেরই; আমরা তোমাদের দায়ের একাংশমাত্র অসম্পূর্ণরূপে বহন করিতেছি। তোমরা কন্যাকে ব্রহ্মবাদিনী ও পুত্রকে ব্রহ্মবিত্তমরূপে গড়িয়া উঠিবার প্রেরণা দিয়া আমাদের কার্য্যে অনুকূলতা কর। মাতৃশক্তি বিমুখ বলিয়া সময় সময় শিক্ষাদানকার্য্যে আমাদের কত যে বেগ পাইতে হয়, তাহা বলিবার নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্য বুঝিয়া, সন্তানের হিত বুঝিয়া, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া যথার্থ সন্তানের স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীরূপে তোমরা উদ্বুদ্ধ হও, ইহাই প্রার্থনা।

আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব। গুরুশক্তির বিকাশ ও প্রচার, ইহাই আমাদের সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীঠাকুর আর্য্যশক্তি ও প্রতিভার গুরুরূপে নিজকে প্রকট করিয়াছেন, ইহা আপনারা জানেন। দেশে নূতন ভাবের একটা হিল্লোল আসিয়াছে। মানুষ শক্তি চায়। পাশ্চাত্যের অনুকরণেই বলুন, অথবা তাহাদের অভিঘাতে উদ্বুদ্ধ নবচেতনার উন্মেষের ফলেই বলুন, আজ আমরা—এই দুর্ব্বল জাতিও শক্তিমান্ হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছি। দেশে এই শক্তিলাভের নানা উপায় প্রচার হইতেছে। কেহ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, কেহ আর্থনীতিক স্বাধীনতা, কেহ বা সামাজিক স্বাধীনতাকে শক্তিলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে কেহই দেশের পুনরুন্নতির সোপানরূপে গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন না। তাহার কারণও সুস্পষ্ট। আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনা এতকাল ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র ছিল; তাহা ছাড়া অজ্ঞানান্ধকারের প্রবলতাবশতঃ কালে বহু আবর্জ্জনা আসিয়াও তাহাতে স্তূপীকৃত হইয়া ছিল। যে সাধনা মানুষকে কেবল নিজের সুখটুকু খুঁজিতে শিখায়, যাহা সরল প্রাণের যুক্তিবিচারের ঘাতপ্রতিঘাত সহিতে পারে না, তাহার প্রতি মানুষের একটা বীতস্পৃহা আসিয়াছে। সুতরাং আধ্যাত্মিক সাধনাকেও জাতীয় জীবনে ফলপ্রসূ করিতে হইলে যুগসঞ্চিত আবর্জ্জনা হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া তাহার নির্ম্মল রূপটী সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে ধরিতে হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাই করিতেছেন। আর্য্যসভ্যতার যে সাধনা যোগ, জ্ঞান, তন্ত্র ও ভক্তির মর্ম্মরহস্য আয়ত্ত করিয়া এই সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত মানবদেহেই ভূমার অনুভব ও বিলাস সম্ভব করিয়াছিল, সেই সাধনা জগতে প্রচার করাই ঠাকুরের উদ্দেশ্য। জাতীয় পুনরুজ্জীবনের ইহাই সনাতন পন্থা। গুরুর নিকট হইতে এই যোগশক্তি, জ্ঞানশক্তি, তন্ত্রশক্তি, প্রেমশক্তি আধারানুযায়ী গ্রহণ করিয়া আবার বিশ্বহিতকল্পে তাহা ছড়াইয়া দিয়া জাতিকে নিগূঢ় অধ্যাত্ম

সম্পদে শক্তিশালী ও শ্রীমন্ত করিয়া তোলা—ইহাই আমাদের সংঘের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

আপনারা সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া এখানে যে কষ্ট পাইতে আসিয়াছেন, তাহার দরুণ আপনাদিগকে প্রশংসা করিব না। ভাই বলিয়া যদি আমাদিগকে জানিয়া থাকেন তো বৎসর বৎসর এইরূপ কষ্ট সহিতে যে আসিবেনই—সে তো জানা কথাই। তবুও অভ্যর্থনায় ও সৎকারে যে সমস্ত ত্রুটীবিচ্যুতি হইবে, ভাই বলিয়া তাহা যেন মর্ষণ করেন, ইহাই প্রার্থনা।—

পারশেষে আসুন, আমরা সমকণ্ঠে প্রণতশিরে শ্রীগুরুর সম্মুখে উচ্চারণ করি—ওয়া গুরুজীকা ফতে—ওয়া গুরুজীকা ফতে—ওয়া গুরুজীকা ফতে!

"জয়গুরু" "জয়গুরু" "জয়গুরু"

সভাপতির অভিভাষণ

—*—

[ভক্তসম্মিলনীর ১৪শ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সাধারণ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ দ্বারা পঠিত]

যং ব্রহ্ম-বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতাঃ স্তুবন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

পরমহংসদেব, সমাগত মাতাগণ ও ভ্রাতাগণ,

আপনারা আমাকে এই বিশাল সম্মিলনীর সভাপতি-পদে বৃত করিয়া যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে যে "Where angel fears to tread there the fool rushes in অর্থাৎ যেখানে দেবদূত যাইতে ভয় পান, মূর্খ সেখানে আগ বাড়াইয়া প্রবেশ করে।" আমারও হইয়াছে তাহাই। আমা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তির অভাব নাই, তথাপি আমার স্কন্ধেই এই গুরুভার বাহিত হইবে—ইহাই বোধ হয় প্রাক্তন। আপনাদিগকে অযোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচনের কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছুক নহি—আবার নিজেকেও এ কার্য্যের যোগ্য মনে করার ধৃষ্টতায় দৃপ্ত হইয়া হাস্যাস্পদ হইতে চাহি না। এ সংসারে অনেক বড় বড় কাজ খুব ছোট ছোট লোক-দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যিনি মূককে বাচাল ও পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘনের সামর্থ্য-প্রদান করেন এবং যিনি প্রাণীমাত্রেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় ভ্রমণ করাইতেছেন তাঁহারই ইঙ্গিতে এরূপ হইয়াছে মনে করিয়া এবং যে মহাপুরুষ ইহার কাণ্ডারী তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া ভেলাদ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। সহৃদয় শ্রোতৃবর্গ মনে রাখিবেন ইহাতে আমার কোন কৃতিত্ব নাই—বরং অকৃতকার্য্যতার গুরুদোষ সানন্দে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

যাহা হউক ভাওয়ালের জঙ্গলে পরমহংসদেবের কৃপার নিদর্শন এই আশ্রম-স্থাপন যদিও এক অভিনব ব্যাপার, তথাপি ইহার একটা নিশ্চয়ই কোন রহস্য

আছে যাহা হয়ত আমাদের পরবর্ত্তিগণ বুঝিতে পারিবে। বারদী গ্রামে শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আবির্ভাব বোধ হয় ইহা হইতেও অধিকতর আশ্চর্য্যের ঘটনা বলিয়া এতদ্দেশীয় লোকের নিকট রহস্যাবৃত ছিল। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যেরূপ ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, কে জানে কাহার জন্য এই তমসাচ্ছন্ন ভাওয়ালে সেইরূপ ধর্ম্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে?

এ স্থানে ভাওয়ালের সামান্য একটু ইতিবৃত্ত বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এ স্থান অতি প্রাচীন। ইহার ভৌগলিক অবস্থানও এ কথার পোষকতা করে। আমার কতিপয় প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধু এ দেশটাকে মহাভারতের "অনন্তবোল" প্রদেশের সহিত সমতুল্য করিতে চান এবং রেণলডের মানচিত্রে Anti-Bowl বা "আটীভাওয়াল" নামকরণের সাদৃশ্যে নাকি তাঁহারা "অনন্তবোলের" সন্ধান পাইয়াছেন। Encyclopædia of Indiaতে এই ভাওয়াল পরগণা মহাভারতের চেদী-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা কি ঠিক? সাভারের পালরাজগণের এক অংশ তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া ভাওয়ালে রাজধানী স্থাপন করেন; তাঁহাদের একজনের নাম শিশুপাল। নামের সাদৃশ্যই এই গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। যাহা হউক, হিন্দু রাজত্বের শেষ ভাগে এবং মুসলমান রাজত্বের প্রথম ভাগে ভাওয়াল অন্ত্যজজাতীয় চণ্ডাল-রাজগণ দ্বারা শাসিত হয়। তন্মধ্যে প্রতাপ ও প্রসন্ন নামক দুই ভ্রাতা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে খুব অল্পদিনের জন্য রাজত্ব করেন এবং ইহা হইতেই ভাওয়ালে একটা প্রবাদ-বচন আছে যে "চাঁড়াল রাজার রাজত্ব আড়াই দিন।" সেই সময় "চাষা নাগরী" নামে একটা ভাষার প্রচলন হয়। এখনও ভাওয়ালে "রাজাবাড়ী" প্রভৃতি স্থানে চাঁড়াল-রাজার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, তাহাদের ভগ্নী "মঘীর মঠ" প্রভৃতি ইহার সাক্ষ্য দেয়।

অতঃপর বহুদিন পর্য্যন্ত ভাওয়ালের ইতিহাস ঘন তমসায় আবৃত থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে পুনরায় ভাওয়ালের নাম লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয়। মোগল সম্রাট মহানুভব আকবর সাহ সুপ্রসিদ্ধ ঈশাখাঁর বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া ২২টী পরগণা প্রদান করেন। ঈশাখাঁ তাঁহার বিশ্বস্ত গাজীবংশীয় অনুচরগণকে পুরস্কারস্বরূপ ৫টী পরগণা প্রদান করেন। এইরূপে ভাওয়ালগাজী ইহার জায়গীরদার হইয়া কালীগঞ্জের নিকট চৈরা গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। গাজীগণের অমানুষিক অত্যাচার ও খাম খেয়ালীর দরুণ ভাওয়াল প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়ে এবং রাজস্ব নিয়মিতরূপে আদায় না করার দরুণ নবাব সরকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার হুকুম দেন। তদানীন্তন জায়গীরদার দৌলতগাজী মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারে দরবার করিয়া বহুকষ্টে সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন। সেই সময় তিনি মুর্শিদাবাদের গোকর্ণগ্রাম নিবাসী কুশধ্বজ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক উকীলকে তাঁহার পক্ষসমর্থন জন্য নিযুক্ত করেন। ইনিই ভাওয়াল রাজবংশের স্থাপয়িতা। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গাজীগণ এ দেশে তাঁহাদিগকে আনাইয়া বস-বাস করান। কুশধ্বজ চক্রবর্ত্তী দরবার হইতে রায় উপাধি প্রাপ্ত হন এবং কালে তাঁহার পুত্র বলরাম রায় গাজীদের দেওয়ান নিযুক্ত হন। দৌলতগাজীর অকথ্য অত্যাচারে প্রজাগণ বিদ্রোহী হয় এবং খাজানা অনাদায়ে রাজস্ব বাকী পড়ে। স্থানীয় নবাব-সরকারের চেষ্টায় বলরাম রায় ও গাছার জমীদারবংশের আদি পুরুষ কৃষ্ণরাম ঘোষ ১০৮৮ হিজরীর ৬ই জেলকহ তারিখে ভাওয়ালের জিম্মাদারী সনন্দ এবং তৎসহ চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। এইরূপে গাজীদের ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। অতঃপর

বলরাম রায়, কৃষ্ণরাম ঘোষ এবং পলাসনার রায়-বংশীয়দের পূর্ব্বপুরুষ নবাব সরকার হইতে নিজ নিজ নামে যথাক্রমে ।৴+।৴+৴+৵ আনী অংশের মালীকানা স্বত্ব গ্রহণ করিয়া জিম্মাদার হইতে মালীক পদ প্রাপ্ত হন। এইরূপে গাজী বংশের উচ্ছেদ হয়। সর্ব্বশেষে গাজীবংশীয় সুলতান গাজী ১৭০৪ খৃঃ অঃ জয়দেবপুর রাজবংশীয় কীর্ত্তিনারায়ণ রায় ও গাছার চৌধুরী বংশীয় রামচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়দের নামে সম্পত্তির দাবি করিয়া এক দেওয়ানী মোকর্দ্দমা রুজু করেন। ১৭০৪ খৃঃ অঃ ১৭ই মে তারিখের সদর নিজামত আদালতের রায় অনুযায়ী গাজীদের সকল আশা নির্ম্মূল হয় এবং চৌধুরী মহাশয়গণ ভাওয়ালে প্রকৃত মালীক সাব্যস্ত হন। বলরাম রায়ের কনিষ্ঠ-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায়ের পুত্র জয়দেবনারায়ণ রায় চন্দনা হইতে বাসগৃহ স্থানান্তরিত করিয়া বর্ত্তমান স্থানে আনয়ন করেন এবং নিজ নামে গ্রামের নামকরণ করেন। পূর্ব্বে এই জয়দেবপুরের নাম "পীরাবাড়ী" বলিয়া প্রচলিত ছিল। তিনি পলাসনার রায়দিগ হইতে ৵০ অংশ খরিদ করিয়া ৷৷৴০ হিস্যার মালীক এবং গাছার চৌধুরীগণ ।৴০ হিস্যার মালীক হন। এই জয়দেবনারায়ণ দরবার হইতে প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত হন, এমন কি ১১২৬ হিজরীর ৪ জেলকোয়া (১৭০৮ খৃঃ) এক সনন্দ দ্বারায় তাঁহাকে মাসিক ১০০ সিক্কা পুরস্কার প্রদত্ত হয়। তিনি ৪৫ বৎসর জমিদারী করেন। তাঁহার পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ রায়ের সময় গাজীগণ পুনরায় উৎপাত করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন দেশব্যাপী অরাজকতা উপস্থিত হয়, সেই সময় রাজনগরের রাজা তাঁহার দরবারে ভাওয়ালের মালীকগণের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া একদল সৈন্য প্রেরণ করেন এবং সাত আনী জমিদারীর মালীককে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক ইস্তাফানামা লন। কিন্তু নয় আনির তাৎকালীন মালীক বিজয়নারায়ণ হইতে ইস্তাফানামা গ্রহণ করা ত দূরের কথা বরং সাত আনির ইস্তাফানামাখানি পর্য্যন্ত রাজাকে হারাইতে হইল। কারণ বিজয়নারায়ণ ঐ ইস্তাফানামা দেখিবার ছলে রাজার সম্মুখেই উহা গিলিয়া ফেলেন। কোনরূপ নির্য্যাতন তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই। এইরূপে ভাওয়াল রাজনগরের রাজার গ্রাস হইতে রক্ষা পায়।

অতঃপর কালক্রমে জে, পী, ওয়াইজ নামক নীল-কুঠীর সাহেব ভাওয়াল জমিদারীর কতক অংশ খরিদ করেন। সেই সূত্রে গোলকনারায়ণ রায়ের আমলে তৎপুত্র সপ্তদশবর্ষীয় বালক কালীনারায়ণ রায়ের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মামলা-মোকদ্দমার পর ১৮৫১ খৃঃ অঃ ১২৫৮ সনের ২৬শে পৌষ তারিখে সাধু গোলক-নারায়ণ রায় ৪৪৬০০০৲ টাকায় ওয়াইজ সাহেবের অংশ খরিদ করিয়া সকল গোলযোগের মীমাংসা করেন। তিনি অতি ন্যায়-পরায়ণ, ধর্ম্মভীরু, শান্ত, সংসারে অনাসক্ত, সন্ন্যাসী প্রকৃতির লোক ছিলেন। এজন্য তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার পুত্র কালীনারায়ণ রায় জমীদারী পরিচালনা করেন। তিনি বিচক্ষণ, বহুদর্শী, কূটনীতিপরায়ণ প্রতাপশালী জমীদার ছিলেন। অবশেষে তিনি রাজাবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় (আমার স্বর্গীয় মাতামহ) ভাওয়াল রাজ্য উপভোগ করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী, সুকুমারকলাবিদ, উত্তম শিকারী ও প্রসিদ্ধ তবলাবাদক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তিনি রণেন্দ্রনারায়ণ, রমেন্দ্রনারায়ণ ও রবীন্দ্রনারায়ণ নামে তিন পুত্র রাখিয়া ৪২ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। বর্ত্তমান সময় ভাওয়ালের বিষয় লইয়া দেশ-ব্যাপী এরূপ আন্দোলন, আলোচনা চলিতেছে, যাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং এইখানেই ইহা সমাপন করিতে চাহি। যাহা হউক, রাজা কালীনারায়ণের সুযোগ্য সদর নায়েব স্বর্গীয় মুন্সী

হরনাথ রায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী স্বর্গীয়া জ্ঞানদাসুন্দরী বসু মহাশয়া তাঁহার পৈত্রিক বসতবাটী ও কতক সম্পত্তি তাঁহার গুরুদেবকে প্রদান করেন এবং সেই মহাপুরুষ এই কাল্নীগ্রামে বর্ত্তমান আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন।

যাক, এসকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রত্নতাত্ত্বিকদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি।

এই মধ্যবঙ্গীয় সারস্বত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের নাম আজ শিক্ষিত বঙ্গবাসী—শুধু বঙ্গবাসী নয়, শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রেই অবগত আছেন। আজ আর তিনি কেবল মাত্র "যোগীগুরু" "তান্ত্রিকগুরু" বা "প্রেমিকগুরু" প্রভৃতির গ্রন্থকর্ত্তারূপে পরিচিত নহেন; আজ তিনি একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ, দেশময় একটা ভাবস্রোতস্পন্দনের কেন্দ্রশক্তি।

আজকাল দেশে আশ্রমের অভাব নাই, অনুষ্ঠানের ক্রটী নাই, কিন্তু প্রকৃত কার্য্য কয়টী প্রতিষ্ঠান হইতে হয় সে সংবাদ অল্প লোকেই রাখেন। দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে যে "আগুন কখন কাপড় দিয়া চাপা রাখা যায়না" আর "কালীর দাগ কখন উঠান যায় না।" যে জিনিষ খাঁটী, যাহা সত্য, তাহা আপনার তেজে আপনিই প্রকাশ হইবে, আর যাহা অসত্য বা মলিন, তাহা তাসের ঘরের মত ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে। আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্যবাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠিত আশ্রমগুলি এবং তদন্তর্গত, শিক্ষা, সেবা, প্রচার প্রভৃতি বিভাগগুলি দ্বারা যে কিরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহা এখন আর কাহারও অবিদিত নাই।

এই যে একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করা, ইহা আমাদের দেশে নূতন নহে। বৈদিক যুগ হইতে ইহা প্রচলিত। তথায় দেখিতে পাই যে, প্রত্যেকেরই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকৃত আছে। ঋত্বিক হইতে আরম্ভ করিয়া যূপকাষ্ঠ প্রস্তুত করারও যজ্ঞের একটা ভাগ বা অংশ আছে এবং সেজন্য কেহই কাহারও ঘৃণ্য নহে। তৎপর বৌদ্ধযুগে পুনরায় ইহার উদ্বোধন হয়। বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করিতে হইলে তাহাকে তিনটী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইত—যথা (১) **বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি (২) ধম্মং সরণং গচ্ছামি (৩) সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।** আবার শাস্ত্রেও আছে যে "সঙ্ঘশক্তি কলৌ যুগে।" আমরা ইহা ভুলিয়া গিয়াই এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি।

আমরা "দেশমাতৃকা দেশমাতৃকা" বলিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত কিন্তু গর্ভধারিণীর বাক্য অবহেলা করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিনা। ভ্রাতৃপ্রেমে পরকে কোল দিতে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকেও পশ্চাৎপদ করিতে কুণ্ঠিত নহি, কিন্তু সহোদর ভ্রাতার মস্তকে লগুড়াঘাত করিতে কাতর নহি। এই যে বৈষম্য, এই যে কাপট্য, এই যে শিক্ষার ব্যভিচার, ইহা দূর করিতে হইলে আমাদিগকে অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি ত্যাগ ও বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যে শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই, তাহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। যে দেশের শিক্ষা ছিল "মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ" সে দেশে এখন কেহ আর মাতা হইতে চাহেন না, চাহেন "দিদিমণি" হইতে—যেন মাতা হওয়া লজ্জার বিষয়। এদেশ ধর্ম্মের নামে এমনই মত্ত যে—"খণ্ড খণ্ড যদি হয় যায় দেহ-প্রাণ। তবু তারা বদনে না ছাড়ে হরিনাম॥" সুতরাং ধর্ম্মের ভিতর দিয়া আমাদের শিক্ষা দিতে হইবে।

আমাদের একটা দুর্ণাম আছে যে আমরা বড় সঙ্কীর্ণ, বড় রক্ষণশীল। বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলো থাকিলেও সন্ধ্যাদীপ সরিষার তৈলে না জ্বালাইলে আমাদের তৃপ্তি হয় না। এই রক্ষণশীলতাই বোধ

হয় আমাদিগকে যুগব্যাপী পরাধীনতার নিষ্পেষণে একেবারে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলে নাই। ইহা এ জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। যেমন এক ব্যক্তির নিকট আর এক ব্যক্তির শিক্ষার বিষয় আছে, সেরূপ এক জাতির নিকট আর এক জাতিরও শিক্ষার বিষয় আছে। এই আদানপ্রদান প্রকৃতির নিয়মে স্থাপিত। আজকাল আমরা যে "বৃহৎ ভারত" "বিশ্বভারতী" প্রভৃতি শব্দ শুনিতে পাই ইহা সেই "ভাব বিনিময়ের"ই প্রতিধ্বনি নহে কি? তাই কবি, ভাবে বিভোর হইয়া গাহিয়াছেন—

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ,
উঠিল বিশ্বে সেকি কলরব সেকি মা তৃপ্তি, সেকি মা হর্ষ।"

যে শিক্ষায় চরিত্র গঠিত হয় না, সে শিক্ষাকে শিক্ষা বলা যায় না। অধুনা "গুরুকুল" "ঋষিকুল" "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" "ঋষিবিদ্যালয়" প্রভৃতি বিদ্যা-আয়তন গুলিতে যেরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা কতক পরিমাণে ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির অনুকূল।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের প্রধান ও প্রথম শিক্ষালয় গৃহ। সেই গৃহের সংস্কার করিতে হইবে— "আদর্শ গৃহস্থজীবন" গঠিত করিতে হইবে। জাতীয়-জীবনের উৎস জননীর নিকট। সেই জননীদের শিক্ষিতা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বৈদিক যুগের নারী-শিক্ষা লুপ্ত, পরাধীন জাতি আমরা তাই নারীদিগকে বিধিনিষেধের কঠোরতায় আরও শৃঙ্খলিত করিয়াছি। সেই শৃঙ্খল দূর করিতে হইবে—তবে না আমরা মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব? আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন কি যে পরমহংসদেবের গ্রন্থে ইহা কিরূপ দৃঢ়তার সহিত প্রচারিত করা হইয়াছে?

আর একটা বিষয় না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। অনেকে বলেন যে এই সকল আধুনিক আশ্রমাদি "ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের" উৎসাদন করিতে সৃষ্ট হইয়াছে। আবার দেখিতে পাই যে নৈষ্ঠিক হিন্দুগণ স্পর্শাদি বিষয়ে এরূপ অবহিত যে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত যে "এটার স্পর্শদোষ হইল—সব গেল"—এই ভাব অর্থাৎ আমিই পবিত্র, আর সব অপবিত্র। কি দুর্দৈব! আগুনের স্পর্শে যে অপবিত্র পবিত্র হয় এ জ্ঞানের অভাবই না আজ এতদুর নীচে নাবাইয়া আনিয়াছে? চিরকালই কি আচারের বেষ্টনীর মধ্যে থাকিতে হইবে? আবেষ্টনীর চারা গাছ কি চিরকাল চারাগাছই থাকিবে? আর একদল বলিবেন যে, ওসব কিছু না—সকলই ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দাও। তাঁহারা দেখেন না যে যে আবেষ্টনীর মধ্যে আমরা গঠিত, তদুপযোগী আমাদের ব্যবহার কি হইতে পারে। এই উভয় ভাবই আমাদের পরিপন্থী। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই পরিবর্ত্তন আবশ্যক। সে জন্যই "যুগধর্ম্ম" বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। জন্মদ্বারা কি কর্ম্মদ্বারা বর্ণাশ্রম গঠিত হইবে, সে সব জটিল বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বা তর্কের জটিলতা বৃদ্ধি করিতে চাহি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে যেমন জলবায়ুর গুণে ভিন্ন ভিন্ন চারা-গাছ ভিন্ন ভিন্নরূপে জীবনধারণ করে বা মরিয়া যায়, সেইরূপ দেশকাল পাত্রানুযায়ী যাহা উপযোগী তাহাই টিকিয়া যাইবে অর্থাৎ যেটা টিকিবে, তাহাই উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

যাহা হউক, সকল উন্নতির মূল "ব্রহ্মচর্য্য।"—এই ব্রহ্মচর্য্য সাধন জন্যই এখন নানাদিক হইতে নানা চেষ্টা হইতেছে। ভুলিবেন না যে, ভারতীয় শিক্ষা এরূপ নহে যে "আমি যাহা বলি তাহা কর, কিন্তু আমাকে অনুসরণ করিও না।" এ দেশীয় শিক্ষা, নিজকে আদর্শ রাখিতে হইবে—কায়—মনে—বাক্যে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমি নূতন কথা কিছুই বলি নাই, আর নূতন কথা বলা খুব শক্ত। তত্ত্বদর্শী ঋষিপ্রচলিত দর্শন, উপনিষদের দেশে নূতন কথা

বলা অসম্ভব। তবে ভাল কথা, পুরাতন কথা যত বেশী উক্ত হয়, ততই মঙ্গল—এই মাত্র ভরসা। যাহা হউক আপনারা ধৈর্য্য সহকারে আমার এই প্রবন্ধ যে শুনিয়াছেন সে জন্য আপনাদিগকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সহিত শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সর্ব্বশেষে ভাওয়ালের জঙ্গলের এক নগণ্য গ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠার কি প্রয়োজন, এই মহা মহোৎসবেরই বা কি আবশ্যক, তাহা যাঁহার অঙ্গুলী সঙ্কেতে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে তিনিই বলিতে পারেন। তবে এখন আসুন, আমরা কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া প্রার্থনা করি—

—হয়ে মধুমান
বহিবে মন্থরবায়ু, অর্ণবসকল
নিয়ত ক্ষরিবে মধু; হবে মধুমান্
বনস্পতি—লতাগুল্ম—ওষধি আবলি;
নিশা হবে মধুময়ী, উষা মধুমতী;
নৃপতির মনোরাজ্য হবে মধুময়
প্রজার মঙ্গল কল্পে; রেণুতে রেণুতে
বসুধার মধুধারা হবে প্রবাহিত।

ওঁ মধু! ওঁ মধু!! ওঁ মধু!!!

আমাদের কথা

[ভক্তসম্মিলনীর ১৪শ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারা পঠিত]

সংসারবৃক্ষে আরোহণ করিয়া জীব মায়ার বন্ধনে কুকর্ম্মের ফলে নরকসাগরে মগ্ন হয়। যাঁহার কৃপায় সেই ভীষণ সংসার হইতে বিশ্ববাসী যাবতীয় জীব উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া উত্তমাগতি লাভ করে, অশেষ করুণানিধান সেই গুরুদেবের শ্রীচরণ সরোজে নমস্কার।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই পবিত্র আশ্রম-প্রাঙ্গণে আমরা আর একবার মিলিত হইয়াছিলাম। বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং আসামের সুদূর প্রান্তদেশ হইতে প্রাণের আকর্ষণে এই স্থানে সম্মিলিত হইয়া আমরা আর একবার স্থানীয় জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া আমাদের বিজ্ঞপ্তি ও নিবেদন জানাইয়াছি। আর একবার আমরা আমাদের গুরুদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ও তাহার অধীনস্থ আশ্রমসমূহের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছি। আজ আবার সেই প্রসঙ্গ লইয়াই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, আজ তাহা নাই। বাঙ্গালা আজ নূতন বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে, ভারত নূতন ভারত হইয়াছে, সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া এক নূতন জাগরণের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই নবজাগরণের মহাকলরবে আমরা আমাদের সেই চির-পুরাতন অমৃতবার্ত্তার ঘোষণা করিতেছি। যাহা পুরাতন ছিল, যাহাকে আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাহাই নূতন সৌন্দর্য্যে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ত্তি লইয়া নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইতেছে। তাই আজ আবার আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। আমাদের প্রাণের নিভৃত কোণে যে কথা আকুলি-বিকুলি করিতেছে, তাহাই আপনাদিগকে কহিব বলিয়া আমরা এইস্থানে সম্মিলিত হইয়াছি। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যে উপস্থিত হইয়াছেন তজ্জন্য আপনাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমাদের ঠাকুর মহারাজ হিমালয়ের গভীর অরণ্য-

মধ্যে গুম্ফাগহ্বরে গুরুসন্নিকটে অবস্থান করিয়া যখন সাধনায় সিদ্ধকাম হইলেন তখন তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে বাঙ্গালাদেশে আসিয়া সত্যধর্ম্ম ও সৎশিক্ষা প্রচারের আদেশ প্রদান করিলেন। গুরুর সেই আদেশ ও তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ সম্বল করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের পথে আসাম প্রদেশ হইয়া ক্রমে গারোপাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং লোকালয়ে অদুরবর্ত্তী স্থানে একটী ক্ষুদ্র ঝরণার ধারে গুরুর আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালনের সুযোগ ও সুবিধার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সে প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। নিকটবর্ত্তী চারিপার্শ্বের জনসাধারণ ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং তিনিও দীর্ঘকাল সাংসারিক সমাজের বাহিরে থাকার পরে পুনরায় তাহার সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়া বিশেষভাবে তাহার গতি ও পরিণতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। গারোপাহাড়ের এই প্রতিষ্ঠান আমাদের নিকট পবিত্র তীর্থস্থান। গুরুভ্রাতা স্বামী যোগানন্দ মহারাজ এই তীর্থ-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতেছেন। আমাদের এই ঢাকা সেক্‌শন ই, বি, রেলওয়ের প্রদ্যোতনগর ষ্টেশনে নামিয়া তথায় পৌছিতে হয়।

নিম্নগদীতে.

গুরুর আদেশ প্রতিপালনে মনোনিবেশ করিয়া ঠাকুর মহারাজ এই গারোপাহাড়ের আশ্রমেই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "যোগীগুরু" প্রণয়ন করেন এবং কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অর্থসাহায্যে মুদ্রিত করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশিত করেন। নাটক-নভেলপ্লাবিত দেশে এই যোগ ও তাহার সাধন-পদ্ধতি-বিষয়ক গ্রন্থ আদৃত হইবে বলিয়া তাঁহার ভরসা ছিল না। প্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে তিনি যখন তাঁহার এই গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ মজুত রাখিতে যান, তখন তাঁহারা উহার বিক্রয় একেবারেই অসম্ভব বলিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং স্পষ্টভাবেই নভেল লিখিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কি মহীয়সী গুরুশক্তি উহাতে নিহিত ছিল, তাহা তখন কেহই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। সামান্ত বিজ্ঞাপনে বিনা আড়ম্বরে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দোকানে রক্ষিত সমস্ত গ্রন্থ বিক্রীত হইয়া গেল। আবার মজুত হইল, আবার নিঃশেষ হইল। আবারও মজুত হইল, আবারও নিঃশেষ হইল। এদিকে আশ্রম হইতেও অর্ডার অনুযায়ী গ্রন্থ পাঠানো হইতে লাগিল। আশাতীত অল্প সময়েই প্রথম সংস্করণ প্রায় ফুরাইয়া আসিল। এই বিক্রয়-লব্ধ অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঠাকুর মহারাজ নব আশায় উদ্দীপিত হইলেন। যোগীগুরু হইল তাঁহার মূলধন। সে মূলধনের ব্যবসায়ে ক্রমশঃ তিনি দেশের সম্মুখে জ্ঞানীগুরু, তান্ত্রিকগুরু ও প্রেমিকগুরুর স্বরূপ প্রকাশিত করলেন। যোগীগুরু গ্রন্থের "গ্রন্থকারের নিবেদন" নামক প্রবন্ধে ঠাকুরমহারাজ লিখিয়াছিলেন যে গ্রন্থবিক্রয় করিয়া লাভবান হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই, কোন একটী দেশহিতকর মহদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানকল্পে অর্থসংগ্রহ করিবার জন্যই তিনি উক্ত গ্রন্থের ব্যয়াতিরিক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তখন তাঁহার এ কথার অর্থ কেহই বুঝিতে পারেন নাই, হয়ত বা কেহ কেহ উপহাসও করিয়াছেন। কিন্তু মহাপুরুষের সেই বাণী আজ সত্যের বিমল জোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়াছে। কৌপীনকরঙ্গ-সম্বল ত্যাগী সন্ন্যাসীকে গুরু যখন কহিলেন, "সত্যধর্ম্ম ও সৎশিক্ষার প্রচার কর" তখন উহা একটা পরিহাস, একটা নিষ্ঠুর ছলনা কিম্বা একটা অসম্ভব আদেশ বলিয়াই হয়ত মনে হইয়াছিল। কিন্তু সেই "যোগীগুরু" মূলধনস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সহস্র সহস্র মুদ্রার ব্যবহারে, সেই গুরু-আদিষ্ট সত্যধর্ম্ম ও সৎশিক্ষাপ্রচারের সঙ্কল্প আজ সমস্ত উত্তরপূর্ব্ব-ভারতবর্ষ অধিক্রান্ত করিয়া জগতের সমক্ষে আসামবঙ্গীয়

অনুন্নত জাতির উন্নত অবস্থা।

সারস্বত মঠ নাম বিঘোষিত করিতেছে। হয়ত বা একদিন সমস্ত ভারত কবলিত করিয়া পৃথিবীময় বিরাট্ ধর্ম্মসঙ্ঘের বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া দিবে। তাই আজ পুনঃপুনঃ বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—

যদি গুরুর কৃপা হয়,
অসম্ভব কিছুই নয়।

যোগীগুরু গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বিক্রয় হইতেছিল, তখন বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করিয়া সহস্র আবেদন-নিবেদনেও যখন গবর্ণমেন্ট প্রজার আপত্তি শুনিলেন না, তখন কোন্ এক অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় সমস্ত দেশ যেন ক্ষেপিয়া উঠিল, বয়কট্ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল তুফানে দেশময় একটা বিরাট্ সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিল। বাঙ্গালায় নবযুগ আরম্ভ হইল, সমস্ত ভারত তাহাতে মাতিয়া উঠিল, তাহারই ক্রিয়া আজ পৃথিবী ব্যাপিয়া এক মহাজাগরণ আনয়ন করিয়াছে। বাঙ্গালার এই স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগ যেন গুরুনিয়ন্ত্রিতরূপেই ঠাকুরমহারাজের নিকট উপস্থিত হইল। সনাতন ধর্ম্মের সারাৎসার তত্ত্ব ও জটিল রহস্য বিশ্লেষণ করিয়া সত্যলাভের উপায় স্বরূপ বিবিধ প্রকার সাধনপ্রণালী বিবৃত করিয়া তিনি ক্রমশঃ পূর্ব্বকথিত জ্ঞানী গুরু, তান্ত্রিক গুরু ও প্রেমিক গুরু নামক অমূল্য গ্রন্থ এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য-সাধন নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত করিলেন। এইসকল গ্রন্থে আমাদের শাস্ত্রে কি রহিয়াছে কেবল তাহাই তিনি দেখাইয়া দেন নাই, অথবা জটিল তত্ত্বসমূহ সুখকর ভাষার সাহায্যে সহজবোধগম্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু বাংলার শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকে ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে আহ্বান করিয়া কহিয়াছেন—"আপনারা আসুন, যে কোন সাধনপ্রণালী শিখিবার ইচ্ছা হয়, হাতে-কলমে শিখাইয়া দিব।" এমন করিয়া কোন মহাপুরুষ এ পর্য্যন্ত আপামরসাধারণকে ডাকেন নাই, একথা জোর করিয়াই বলিতে পারি। শুনিয়াছি, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এমন করিয়াই সকলকে ডাকিয়াছিলেন, "তোরা প্রেম নিবি কে আয়, তোরা নাম নিবি কে আয়!" সেই প্রেমের আহ্বান আবার জগতে নামিয়া আসিয়াছে। বিশ্ব ব্যাপিয়া মহাপ্লাবনের ঢেউ চলিয়াছে, আর অন্ধকারে পড়িয়া থাকিবার সময় নাই, সমাহিতচিত্তে সকলকে শুনিতে হইবে এই যোগী গুরু, জ্ঞানী গুরু, তান্ত্রিক গুরু, প্রেমিক গুরুর মহা-উদ্ধারণ সঙ্কল্পের আশ্বাসময়ী ঘোষণা, আর আমরা তাঁহারই শ্রীচরণের পদধূলি মস্তকে লইয়া দেশদেশান্তরে শত শত বৎসরের বধির শ্রবণে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গাহিব—

তরী দিল খুলে ওই তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে।
সামনে যখন যাবি ওরে,
থাক্ না পিছন পিছে পড়ে,
তুই মিছে তারে বইতে গেলি একলা পড়ে রইলি কূলে॥
ঘরের বোঝা টেনে টেনে, পারের ঘাটে রাখ্লি এনে,
তাইতে তোরে বারে বারে ফিরতে হলো গেলি ভুলে ;—
ডাক্ রে আবার মাঝিরে ডাক্,
বোঝা রে তোর যাক্ ভেসে যাক্,
পরাণখানি উজাড় করে সঁপে দে তাঁর চরণমূলে॥

স্বদেশী আন্দোলনে শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ বাঙ্গালী-জাতির প্রাণের পরিচয় পাইলেন, কিন্তু দেখিলেন, বিজাতীয় শিক্ষাপ্রভাবে এবং আশৈশব ত্যাগসংযমশূন্য উচ্ছৃঙ্খল জীবন বিলাসব্যসনে পরিচালিত হওয়ায় খাঁটী মানুষের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। তিনি দেখিলেন, প্রাণের উন্মাদনায় মানুষ সত্যসুন্দরের ক্ষণিক আভাসে বিমোহন কল্পনার রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তাহার বাস্তব জীবনে একটা ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া রহিয়াছে। তিনি দেখিলেন, বাঙ্গালীজাতির কণ্ঠ ও হৃদয়ে মিল নাই, জ্ঞান ও কর্ম্মে সামঞ্জস্য নাই, তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প করিবার

সাহস নাই, সঙ্কল্প করিলেও তাহা ভঙ্গপ্রবণ কাচের মত সামান্য স্বার্থের আঘাতে নষ্ট হইয়া যায় অথবা একটুখানি অসুবিধায় শিথিল হইয়া পড়ে। এক সম্প্রদায় এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যাহারা দেশের আবহমানপ্রচলিত রীতি-নীতি-সংস্কার কিম্বা বিধি-নিষেধ প্রভৃতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকেন, আর এক সম্প্রদায় বিশ্বাসবান্ হইয়াও সুদীর্ঘ কুঅভ্যাসের ফলে বাস্তব জীবনে একটুখানি বিধি-নিষেধ প্রতিপালনেও অক্ষম। আবার অধিকাংশ লোকই এমন অজ্ঞানতায় অন্ধ যে তাহারা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া অত্যতিমাত্রায় বাহ্য আচারসম্পন্ন অথচ মানুষোচিত সদ্‌বৃত্তির অনুশীলনে একেবারেই উদাসীন। দেশের এই অবস্থা দর্শন করিয়া ঠাকুরমহারাজ চিন্তিত হইলেন, যাহারা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহারাও অকর্ম্মণ্য দেহ-মন লইয়া সামান্য তপস্যার কৃচ্ছ্র সাধনে অথবা নিয়মিত সাধন-পদ্ধতি অবলম্বনে অসমর্থ হইল। সুতরাং দেশের তাদৃশ যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দ্বারা ঈপ্সিত ফললাভের আশা ত্যাগ করিয়া যাহাতে ভবিষ্যৎ সমাজ আদর্শ রূপে গঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য নূতন শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন, দেশের নেতৃস্থানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই শিক্ষার পরিবর্ত্তন চাহিতেছেন, সে সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের হুজুগে জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ নামে নূতন বিদ্যাপীঠও স্থাপিত হইল, কিন্তু তাহাও বিদেশীয় অনুকরণে পরিচালিত হইয়া একটা বিমিশ্র সংস্করণে পর্য্যবসিত হইল। সাধনাসিদ্ধ প্রজ্ঞালোকে অন্তর্দর্শী মহাপুরুষ দেখিলেন, প্রাচীন ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতি ভিন্ন জাতীয় উত্থান অসম্ভব। তাই তিনি সেই পদ্ধতির অবলম্বনে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি জানিতেন, দেশের কাছে এজন্য অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিলে ফল হইবে না, অতএব নিজের গ্রন্থবিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারাই তিনি তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জানিতেন, আত্মসমাহিত তপস্যা ভিন্ন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাই কর্ম্মসাধনোপযোগী নিভৃত স্থানের অনুসন্ধান করিয়া বাঙ্গালার বাহিরে সুদূর আসাম-প্রদেশে কোকিলামুখ নামক স্থানে আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ স্থাপন পূর্ব্বক ঋষিবিদ্যালয় নামে ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রাচীন ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতি ইহাতে অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়াই বিদ্যালয়ের নাম হইল ঋষিবিদ্যালয়।

বর্ত্তমান সময়ে দেশের ও সমাজের যে অবস্থা আসিয়াছে তাহাতে প্রাচীন পদ্ধতি একেবারে ষোল-আনা বহাল রাখিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান অথবা কোন প্রতিষ্ঠান-পরিচালনা অসম্ভব। সুতরাং মূল নীতি ঠিক রাখিয়া যথাসম্ভব সময়োপযোগী আদর্শ গঠন না করিয়া উপায় নাই। বলা বাহুল্য ঋষি-বিদ্যালয়ে সেইরূপ আদর্শই অবলম্বিত হইয়াছে।

প্রাচীন ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে তিনটা প্রধান নীতির অক্ষুণ্ণ প্রতিপালন দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথম গুরুগৃহে বাস, দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য্য, তৃতীয় অনায়াস স্বায়ত্ত-জীবন বা সাধারণ কথায় বলিতে গেলে স্বাবলম্বন। রাজা কিম্বা প্রজা, ধনী কিম্বা দরিদ্র, সকলেরই শিক্ষার জন্য এই তিনটী নীতির অবলম্বন অপরিহার্য্য ছিল এবং সেই জন্যই শিক্ষার অবসানে কতক খাঁটী মানুষ সংসারে প্রবেশ করিত। রাজার ছেলেই হউক আর গরীবের ছেলেই হউক, শিশুকাল হইতেই সংসারের কলুষ-কালিমা হইতে দূরে প্রস্থিত হইয়া, পিতা-মাতার অন্ধ ভালবাসার বাহিরে থাকিয়া, নিঃস্বার্থ প্রেমিক জ্ঞানবান শ্রীগুরুর পর্ণ-কুটীরে, সমস্ত সতীর্থগণের সহিত সমান আহার বিহারের অধিকারে, আত্ম-নির্ভরতায় ও স্বাবলম্বনে, ত্যাগে ও সংযমে, অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্যে, শ্রদ্ধার শক্তিতে, গুরুসেবাজনিত অমোঘ

আশীর্ব্বাদে এবং তদ্ধেতু ভগবৎপ্রসাদে তেজীয়ান, গরীয়ান ও মহীয়ান্, অক্লান্তকর্ম্মী, উদারচিত্ত ও যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সংসারে পুনরায় প্রবেশ করিত। জীবন-সংগ্রামে ব্যর্থতার হাহাকারে তাহারা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইত না. ভাগ্যবিপর্য্যয়ে দুঃখের অভিঘাতে তাহারা দমিয়া যাইত না, স্বার্থের প্রলোভনে বিশ্বাসঘাতকতায় স্বদেশ ও স্বজাতির সর্ব্বনাশ করিত না, অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া দুর্ব্বল ও নিরীহের উপরে অযথা অত্যাচার করিত না। সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য সমাজের জন্য তাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইত না; পরের অধীনে নিজকে চালিত করিতে পারিত, নিজেও পরকে চালিত করিতে জানিত। আমাদের দেশ যে সময়ে এই সকল খাঁটী মানুষের দেশ ছিল, তখনই ভারত ছিল পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট, ভারতবর্ষ তখন শিক্ষায় ও সভ্যতায় সকল দেশের ও সকল জাতির গুরুস্থানীয় ছিল।

আর দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের জাতীয়তা, সমাজ, নৈসর্গিক প্রকৃতি, আর্থিক সংস্থান ও পারমার্থিক আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করিয়া বিজাতীয় অনুকরণে ও আদর্শে, ধীর গতিতে অথচ নিশ্চিতভাবে, আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, আমরা দেখিয়াও তাহা দেখিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। আমরা ইচ্ছা করিয়াই আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতেছি। আমরা যে ক্রমশঃ ধ্বংশের মুখে অগ্রসর হইতেছি তাহা বুঝিয়াও আমাদের স্নেহের সন্তানগণকে আমরা হাতে ধরিয়া সেই স্রোতে ফেলিয়া দিতেছি। অসহায়, দুর্ব্বল ও অপারণতবুদ্ধি সন্তানগণকে স্নেহের ছলনায় মুগ্ধ করিয়া একটু একটু করিয়া প্রতিদিন বিষ সেবন করাইতেছি আর এই মহা পাপকর্ম্মকে আমরা বিদেশীয় ব্যবস্থার সাহায্যে পোষণ করিয়া সভ্যতার আস্ফালন করিতেছি। কিন্তু কৃতকর্ম্মের ফলভোগ হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। পরম শিব বিধাতাপুরুষের আসন টলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোথা হইতে এক পাগ্‌লা হাওয়া আসিয়া শিশুর ক্ষুদ্রপ্রাণেও উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছে। আজ দেশের বুকের উপরে প্রকাশ্য প্রত্যক্ষভাবে তরুণ-সঙ্ঘ কিম্বা সবুজ-সঙ্ঘ প্রভৃতির যে দুর্দ্দমনীয় বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা ঐ শিশুদিগের দ্বারা বিরাট্ শক্তিতে পরিণত হইয়া এই নিষ্ঠুর নির্ম্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবেই লইবে। শ্রীগুরুর কৃপা-কটাক্ষপাত যদি না হয়, তাহা হইলে দেশের, সমাজের, বাঙ্গালার, ভারতের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর অস্তিত্ব অচিরকাল মধ্যেই পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

প্রস্তরের গুরুভারে বোঝাই করিয়া, রাশি রাশি আবর্জ্জনার সুবিন্যস্ত সজ্জায়, শৃঙ্খলিত পদে, পরিমিত পদবিক্ষেপে, ব্যাণ্ডের ঐক্যতানিক বাদ্য রম্ রম্ ঝম্ ঝম্ শব্দে গগন-পবন মুখরিত করিয়া পশুকেই চালনা করা সম্ভব, মানুষকে নয়। কিন্তু ভারতের মানুষ মানুষ বলিয়াই যে গ্রাহ্য হয় না। আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষে এই পশূচিত ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এই যে নব-উষার আলোকে পৃথিবী উদ্ভাসিত হইতে চলিল, নব-জাগরণের অমৃত-বার্ত্তা আমাদের শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে না কি? আরো কি আমরা অন্ধ সাজিয়া এমন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব? কথায় বলে, যে নির্ব্বংশ হয় তার নাতি মরে আগে। আমরা যে এতদিন তাহাই করিতেছিলাম, পৌত্রের ও পুত্রের হত্যার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, এখন আমাদের প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে। দেশের শিক্ষিত সমাজের চিন্তাশীল মনীষী ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতেছেন যে বর্ত্তমান শিক্ষায় আমরা ধ্বংশের পথে চলিয়াছি, সেই ধ্বংশের প্রতিবিধানকল্পেই ঠাকুরমহারাজ ঋষিপ্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

দেশের ও জাতির উন্নতিকামনায় আজ শত শত

মত ও শত শত পথ প্রচারিত হইতেছে। ধ্বংশের দিকে অভিমুখী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু-সংগঠন কার্য্যে দেশের লোককে আজ উদ্যোগযুক্ত দেখিতেছি; অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, ছুঁৎমার্গ পরিহার, বাল্যবিবাহের নিষেধ ও নারী জাতির সমান অধিকার প্রচার করিয়া দেশের লোক আজ হিন্দু-জাতির পরিবর্দ্ধন ও সংগঠন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহাদের শুভ উদ্দেশ্যকে আমরা অভিনন্দন করিতেছি। শাস্ত্র হইতে অনুকূল বা বিরোধী যুক্তির অবতারণা করিয়া আপন আপন অভিরুচি ও সংস্কার অনুযায়ী দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ জাতি ও ধর্ম্মের উন্নতি জন্য বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা করিতেছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া দেশ হইতে ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ দূরীভূত করিবার সঙ্কল্পে এক মহামিলনের বন্ধনে হিন্দুজাতিকে সঞ্জীভূত করিতে সকলে চেষ্টিত হইয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশেরই ইহা খেয়াল হইতেছে না যে যত রকমেরই ব্যবস্থা করা হউক না কেন, প্রকৃত মনুষ্যত্ব জাগিয়া না উঠিলে, এই পচা, ধসা, গলা মানুষের জায়গায়, বীর্য্যবান্ ও দ্রঢ়িষ্ঠ খাঁটি মানুষের অভ্যুত্থান না হইলে, সমস্ত জল্পনা-কল্পনা, সমস্ত ব্যবস্থা ও সমস্ত চেষ্টা শূন্যে লোষ্ট্রনিক্ষেপের ন্যায় নিষ্ফল। জাতীয় উন্নতির আদর্শ সম্বন্ধে সহস্র মত-বিরোধকেও বর্ত্তমানে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি, কিন্তু যাহা আমাদের ভিত্তিস্বরূপ না হইলে সমস্তই বৃথা হইবে, সেই সৎশিক্ষার প্রবর্ত্তনকে প্রথম অবলম্বনরূপে ধরিতে না দেখিলে সকলকেই আমরা ভ্রান্ত বলিতে বাধ্য। মুসলমানকে হিন্দু করিয়া, বিধবার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া, যৌবনবিবাহে শিশুর অকালমৃত্যু নিবারণ করিয়া আমরা না হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলাম, জাতিভেদ অগ্রাহ্য করিয়া সকলে মিলিয়া একসঙ্গে আহার-বিহারে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু তাহাতে এই "সকল রকমে কাঙ্গাল" জাতির অভ্যুত্থান হইবে কি? নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক অবনতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছি; রাক্ষসীর কবলে পড়িয়া আমরা শুদ্ধ মন, শুদ্ধ দেহ ও শুদ্ধ বিবেক সমস্ত হারাইয়াছি। আমাদের সব দিকে দুর্ব্বলতা, সর্ব্বত্র ভণ্ডামী, সকল বিষয়েই ভেজাল। ভেজাল আহারে আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, ভেজাল বিহারে আমরা বিলাসী ও ব্যসনযুক্ত হইতেছি, ভেজাল জ্ঞানলাভে আমরা কপট ও স্বার্থান্ধ হইতেছি। এই হীন নীচ জাতিকে মাথা গণতির হিসাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করাইলে কি হইবে? মানুষ যদি খাঁটী মানুষরূপে জাগিয়া না উঠে তবে ঐ নারীর প্রগতি ও তরুণের জাগরণ ধ্বংসের অনলে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া বসিবে। বাঁচিবার ব্যবস্থা না করিয়া অন্য কর্ত্তব্য আর কিছু এখন নাই। সহস্র মত, সহস্র পথ, এখন সব দূরে পড়িয়া থাকুক, এ সমস্ত আমাদের বিকৃত মস্তিষ্কের স্বপ্ন দর্শন ব্যাপার। পূর্ব্বপুরুষের শুভ আশীর্ব্বাদে, সনাতনধর্ম্মের শেষ চিহ্নরূপে যাহারা সবে মাত্র আকাশ বাতাসের কোলে জন্মলাভ করিয়াছে, এই মানুষগুলিকে অসভ্যতা হইতে দূরে রাখিয়া তাহাদের সৎশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তবে যদি একদিন দেশের উদ্ধার সাধিত হয়, জাতি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্ত দূষিতের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রয়োগসিদ্ধ সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রাচীন আর্য্যঋষির প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালী ভিন্ন উপায়ান্তর নাই এবং যুগযুগান্তরের সেই নিত্যকল্যাণময় পথে জীবন পরিচালনা করিয়া আদর্শ মানুষ যখন সংসারে প্রবেশ করিবে, তখন তাহার জ্ঞানবুদ্ধি-প্রণোদিত মত ও পথের মূল্য হইবে, তখনই দেশের, সমাজের, ধর্ম্মের, নীতির সভ্যতার, সাহিত্যের, কর্ম্মের ও অকর্ম্মের বিধিনিষেধ ও আদর্শের পরিমাপ নির্দ্ধারিত হইবে। একদিন দেশ এই খাঁটী মানুষের আবাসভূমি ছিল, সেই অতীত গৌরব স্মরণ করিয়াই কবির প্রাণ মথিয়া সঙ্গীত উঠিয়াছিল :—

অয়ি ভুবনমনমোহিনি!
অয়ি নির্ম্মলসূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণি!
জনকজননী-জননি!

নীলসিন্ধুজলধৌত চরণতল,
অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্রতুষারকিরীটিনি!

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্যকাহিনী;—

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা বিগলিতকরুণা,
পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনি!

এই ভারতভূমির জাহ্নবী যমুনা ও শত সহস্র নদী উপনদী ও শাখানদীর —

—পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা।
সমীপতো মহাভাগা হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাঃ॥

—যাহারা ইহাদের জল পান করে এবং এইসকল নদীর তীরে বাস করে, তাঁহাদের দেশ মহাভাগ্যবান্ হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্যবৃন্দে পরিপূর্ণ।

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগাস্তত্র মহামুনে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন কচিৎ।

—এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ অর্থাৎ ধর্মের হ্রাসবৃদ্ধি রহিয়াছে, অন্য কোথাও নাই।

অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥

—সহস্র সহস্র জন্মের পর পুণ্যবলে কদাচিৎ এই ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়।

এই ভারতবর্ষকেই স্মরণ করিয়া

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥

—দেবগণ এইরূপ গান করিয়া থাকেন, যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষাস্পদের পথস্বরূপ এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষাও ধন্য।

স্বভাবের আবর্ত্তনে সেই দেশ আবার জাগিয়া উঠিবে এবং তাহারই অগ্রদূত এই ঋষি প্রবর্ত্তিত পন্থায় সৎশিক্ষার প্রচার। গুরুগৃহে বাস করিয়া, ত্যাগে ও সংযমে, শ্রদ্ধাযুক্তহৃদয়ে, সুস্থ নিষ্কলুষ দেহে, স্বাবলম্বনে, যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠিবে। কালস্রোত ফিরিতেছে, প্রাচ্যের বিজয় ডঙ্কা আবার বাজিয়া উঠিবে। বহুমত ও বহুপথ এবং বহু সম্প্রদায় থাকুক, একটুমাত্র সহিষ্ণু হইয়া, অখণ্ড গুরুতত্ত্বের ভিত্তিতে, যে যাহার আপন-আপন গুরুর শরণ গ্রহণ করুক, ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তান সকল প্রতিভায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিবে। বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সম্মিলন তখনই সম্ভবপর হইবে। পৃথিবী ভোগের আকাঙ্ক্ষা তখনই সফলতা লাভ করিবে, তখনই প্রকৃত জ্ঞানের বার্ত্তা প্রচারিত হইবে, মানুষের বাস্তব জীবনে তাহা সহজভাবে অনায়াসে প্রতিফলিত হইবে। এই অমৃত পথ নির্দ্দেশ প্রচারিত করিয়া ঠাকুরনগরাজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠ ও আশ্রম-সমূহে ঋষি-বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। আমরা আজ তাঁহারই জয়গান করিয়া এই সুসংবাদ বিজ্ঞপ্তি করিতেছি। এই প্রসঙ্গে যাঁহাদের জায়গা-জমির উপরে আমাদের এই মধ্য-বাঙ্গালা সারস্বত-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই পরলোকগত হরনাথ রায় ও তাঁহার কন্যা পরলোকগতা জ্ঞানদাসুন্দরীর আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

বাঙ্গালী অষ্টমজাতি

—):*:(—

[ভক্তসম্মিলনীর ১৪শ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীমৎ বিপুলানন্দ সরস্বতী ভক্তিসাগরসঙ্গম দ্বারা পঠিত]

—*—

শ্রীশ্রীজগবন্ধুসুন্দর "ত্রিকাল" গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন "বাঙ্গালী অষ্টমজাতি।" শ্রীকৃষ্ণ যেমন দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান, বাঙ্গালীও সেই-রূপ বিশ্বমায়ের অষ্টম গর্ভের সন্তান—তাই প্রভু বাঙ্গালীকে অষ্টম জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জাতি হিসাবে বাঙ্গালী এ যুগের অবতার। নব যুগের মহাপ্রেমাবতার বাঙ্গালীর ভিতরেই আসিয়াছেন। প্রায় সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালার প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রকট হ'ন, তখন হইতে বাঙ্গালীর ভিতরে নবযুগের মহাতত্ত্বের অরুণাভাস ফুটিয়া উঠে। এক প্রেমে গড়া, মরমচেরা রসের মানুষ ধরাধামে প্রকটিত হন। নয়নের জল হয় তাঁর পতিতের অভিষেক বারি; যমের পাশের কঠোর বন্ধনের স্থানে দুইটী শিরীষকোমল বাহুর সুকুমার বেষ্টন হয়—পতিতের বন্ধন। পতিতকে ক্রোড়ে লইয়া পরমনর নীলায়ত-নয়নের প্রেমধারায় পরিস্নাত করান। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, আর কারণার্ণবশায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলকারণ মহাসঙ্কর্ষণ তাই আবার দন্তে তৃণ ধরিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে প্রেমযাচ্ঞা করিয়া বিচরণ করেন। জগৎ বাঙ্গালীর মুখে এ অভিনব কথা শুনিল। বাঙ্গালী ভক্ত সেদিন মানুষরূপী ভগবানের নিকট নিখিল জীবের পাপ-তাপ ভার লইয়া অনন্ত নরকবাসের জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করিল। ২২ বাজারে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত ও রক্তাক্ত কলেবর হইয়াও অমৃত তেজে গর্জ্জিয়া উঠিল—

খণ্ড খণ্ড হয় দেহ ছাড়ে যদি প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িবে হরিনাম॥

তার পর শতাব্দীতে জাগিল বাঙ্গালার শক্তি-সাধক মহাতান্ত্রিকগণ—ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, সর্ব্বানন্দ; শ্মশানে শ্মশানে লতায় লতায় চলিল ভীষণ মধুর রহস্য সাধন। বাঙ্গালার মর্ম্মভেদ করিয়া উঠিল মহাবাণী "ব্রহ্মানন্দো গিরীন্দ্রসুতায়া বক্ত্রামৃতং বাঞ্ছতি।" কালক্রমে সেই প্রেমের বন্যা বাহিরে অপ্রকট হইয়া অন্তঃসলিলা হইয়া বহিতে লাগিল। আজ আবার নীলাদ্রি-শিখরে রক্তপাষাণে জগতের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই আবার সেই শ্রীগৌরাঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে, সেই ব্রহ্মানন্দ, শঙ্করাচার্য্য ও বুদ্ধরূপী ভগবান্ একীভূত হইয়া পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া বিরাট্ সমন্বয়মূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অচিরেই বাংলা হইতে এক অমৃতের বন্যা নিখিল বিশ্ব ভাসাইয়া ছুটিবে। বাংলার নরনারী সে প্রেমের সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে ছুটিবে, বাঙ্গালী নূতন আদর্শ জগৎকে দান করিবে—"নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান্!" হীন বাঙ্গালী সেই অনুরাগের রঙ্গিমামাখা—অশ্রুজলে ছল ছল আঁখি—রসের মূরতি প্রাণের মানুষকে নিখিল বিশ্বের সমক্ষে প্রকট করিবে। প্রেম যাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস, করুণা যাঁহার নয়নজল, বক্ষ যাঁহার পতিতের কুসুম-শয্যা, নয়নতারা যাঁহার ভক্তের প্রাণপাখীর পিঞ্জর, সে ভগবানকে বাঙ্গালী জগতে

প্রকটিত করিবে। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চ হইতে রক্তপট ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে, নবপ্রেমের দৃশ্যপট অচিরেই উন্মুক্ত হইবে, সে দৃশ্য শুধু প্রেমের খেলা; বাধামুক্ত, কুণ্ঠামুক্ত, রাগদ্বেষমুক্ত, জাতি, দেশ প্রভৃতি সর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিত, পরিপূর্ণ স্বাধীন নর-নারীর বিচিত্র প্রেমলীলা। বাঙ্গালী এই মহাপ্রেম-নাট্যের সূত্রধার।

জীবের শেষ দুর্দ্দিন অপগতপ্রায়। অচিরেই বিশ্ব বিধ্বস্ত করিতে মহাপ্রলয়ের ঝঞ্ঝা ছুটিবে। বাঙ্গালী মহানামের শক্তিকে প্রলয়ের কবাল মুখ হইতে উদ্ধার করিবে। প্রলয় অন্তে আকাশ আবার শান্তভাব ধারণ করিবে। নবানুরাগের অরুণাভা নীলাকাশে ফুটিয়া উঠিবে। নবপ্রেমের সজল-কোমল কাজল-বরণ নব মেঘের কোলে শান্তির রামধনু ফুটিয়া উঠিবে। তখন জগৎ বাঙ্গালীর মর্য্যাদা বুঝিবে। বিশ্বসভ্যতার নবীন ধারার মাধুর্য্যের মূর্ত্তি বাঙ্গালী,—জগজ্জনের প্রাণের নিবিড়তম স্থানে আসন প্রাপ্ত হইবে। বাংলাদেশ মানবজাতির প্রেমতীর্থে পরিণত হইবে। বাংলার মরমের মানুষ বিশ্বজগতের প্রেমাস্পদ হইবে। নব প্রেমযুগের প্রবর্ত্তক—নবসভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা—অখিলবিশ্বের প্রেমমিলনসংঘটনকারী—বাঙ্গালী নরনারী! তোমাদের আর বসিয়া থাকিবার সময় নাই, মহাভবিষ্যৎ তোমাদের কাছে উন্মুক্তপ্রায়। রাজনীতি ছাড়িয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র দেশাত্মবোধ ছাড়িয়া নামযজ্ঞে ব্রতী হও। আত্মস্থ হইয়া শ্রীগুরু-আশ্রিত হইয়া মহাসাধনে নিমগ্ন হও। আকাশে বাতাসে নামের তরঙ্গ তোল—সে লহরী-মালা সমগ্র বিশ্বে প্রবাহিত হউক। তখন তোমাদের নির্ম্মল চিত্তদর্পণে তোমাদের বিরাট্ ভবিষ্যৎ প্রতি-বিম্বিত হইবে, নবপ্রেমের হিঙ্গুলরাগে তোমাদের হৃদয় রঞ্জিত হইবে। সেই প্রেমে-রাঙা প্রাণের ডোর দিয়া তোমরা বিশ্বের নিখিল নরনারীকে অমৃতরাখীতে বাঁধিয়া দিবে। নবযুগের মরমের মানুষের রাঙা পায়ে, মাথা বিকাইয়া দিয়া বাঙ্গালী বাহির হও। প্রাণের হিঙ্গুলরাগে রঙ্গীন্ রাখী হাতে লইয়া লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী নরনারী সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়। তোমরা সেই প্রেমস্বরূপের লীলাবন্ধু—নবগৌরাঙ্গ তোমাদের মরমমন্দিরে জাগিয়াছেন। নবযুগের প্রাণের মানুষ—গৌরসুন্দরের মরমের মানুষ নয়নজলে তোমাদের অভিষেক করিবেন. তাঁহার চরণরেণু মাথায় লইয়া, বাঙ্গালী! তোমায় জগৎকে 'পিরীতি-নগরে' পরিণত করিতে হইবে। এই জগতে যে পিরীতিধনে ধনী, সেই ধনী। যে যত মধুর, সে তত বড়। বাঙ্গালী, তোমার প্রবর্ত্তিত নবসভ্যতায় অর্থ, সামর্থ্য, ঐশ্বর্য্য শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হইবে না। প্রেমিকের জগতে প্রেমের বাজারে প্রেমধনই বড় হইবে।

বাঙ্গালী! বৌদ্ধযুগে তুমি একবার ছুটিয়াছিলে—পাগল হইয়া, উধাও হইয়া, সাগর তরিয়া, হিম-গিরি লঙ্ঘিয়া, কাননকান্তার ভেদ করিয়া, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" বলিয়া, "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মহামন্ত্রে গগন পবন মুখরিত করিয়া, বাঙ্গালী! তুমি ছুটিয়াছিলে। চীন, তাতার, জাপান পাগল করিয়া বাঙ্গালী তুমি ছুটিয়াছিলে। তুমি জগতে নবশান্তি ও প্রীতির বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলে। তোমার শীলভদ্রের চরণে সেদিন চৈন পণ্ডিত হুয়াং চুয়ং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া জ্ঞান ভিক্ষা চাহিয়াছিল। তোমার দীপঙ্করের শ্রীপাদপদ্মে সেইদিন সমগ্র তিব্বত আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। তোমার প্রেমের বানের উচ্ছল পাগল প্লাবনে সেইদিন ভাসাইয়া দিয়াছিলে দেশবিভেদ ও জাতিবিভেদ; চীন, জাপান, তাতার ও মোগলসকলকে মিলাইয়া এক মহামানবগঠনে প্রয়াস পাইয়াছিলে সেদিন তুমি। বাঙ্গালী! সে যুগে তোমার আশা সফল হয় নাই। আজ বাঙ্গালী তোমার সেদিন আসিয়াছে; আজ

বাঙ্গালী! তুমিই প্রাণের বাঁধনে 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' সকল জাতিকে আনিয়া মিলাইয়া এক করিবে, এক পরম প্রেমিকের প্রিয়জনে পরিণত করিবে, বাংলাদেশ নিখিল মানবের প্রেমের হাটে পরিণত হইবে।

তোমার চোখের জলে, তোমার প্রেমপাগল বাহুর সরস পরশে তুমি বাহিরের কৃত্রিম মানুষের উপরে সেই মরমের মানুষ ফুটাইবে। সে মানুষ বন্দুক কামান ভাঙ্গিয়া কৃষিযন্ত্র গড়িবে। যে সকল ভীষণ আয়ুধ লক্ষ লক্ষ নরের রক্তে মেদিনী রঞ্জিত করিয়াছে, তাহারাই নবরূপে কোটি কোটি নরনারীর অন্ন উৎপাদন করিবে। পরস্পরের সুখবর্দ্ধন ও আনন্দপ্রদানই হইবে ধর্ম্ম, ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনই হইবে অধর্ম্ম। বাঙ্গালী! আর সময় নাই। প্রাণের কাণ পাতিয়া শোন, প্রাণের মানুষ ডাকিতেছেন—জলভরা চোখে, কাতরতামাখা কণ্ঠে প্রেমের ঠাকুর ডাকিতেছেন। তাঁহার দিকে প্রাণ উন্মুখ কর, তাঁহার ডাকে হৃদয়ের গুপ্তদ্বার খুলিয়া যাইবে, তোমার প্রাণের নবমাধুর্য্যের ছবি তোমাকে আকুল করিবে। প্রাণে নবযুগে প্রেমযুগের আগমনীগীতিকা স্বতঃই গীত হইবে; তখন বুঝিবে—তুমি কে, কি জন্য আসিয়াছ এবং প্রভু জগদ্বন্ধু কেন তোমার জাতিকে অষ্টম জাতি বলিয়াছেন। চল ভাই! সকলে সেই সহজ মানুষের ডাকে আকুল হইয়া ছুটিয়া যাই, তাঁহার মহাপ্রেমের মাধুরী আমাদের চিত্তে স্ফুরিত হউক, তাঁহার প্রেমপুলকে আমাদের দেহ কণ্টকিত হউক, তাঁহার বিরহমথিত নয়নজল আমাদের হৃদয় সরস ও শ্যামল করুক। আমরা তাঁহার প্রেমপাগল জগতের সেবায় নিযুক্ত হইয়া ঘরে ঘরে তাঁহার কথা প্রচার করি, আমরা জগতের সবার সাথে মিশিয়া যাই, জগতের সবাই আসিয়া আমাদের সহিত মিশিয়া যাউক, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মের নাম অতীতের ভস্মস্তূপে পরিণত হউক। নব প্রেমযুগে জগতজোড়া এক দেশ, এক মানব-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রেম হউক একমাত্র ধর্ম্ম। যে প্রেমের স্পন্দনে বিশ্বের সকল বস্তু স্পন্দিত হয়,—যে প্রেমের বিরহের অতুল ক্রন্দনের ছন্দে ছন্দে পশুপাক্ষিগণও রোদন করিয়া থাকে,—ক্ষণ কল্পে—কল্প ক্ষণে পরিণত হয়,—যে প্রেমের মিলনে হৃদয়ের জ্যোৎস্না কাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে আনন্দচন্দ্রিকা ফুটিয়া উঠে, পুলককম্পনের সঙ্গে সঙ্গে নিখিল জগতের অণুপরমাণুতে ফুটন্ত কদম্বের আনন্দশিহরণ জাগিয়া উঠে,—যে প্রেমের মিলনের আনন্দাশ্রুপাতের তালে তালে তমালনীল মেঘে মেঘে জলধারা ঝরে, সে প্রেমে বাঙ্গালী জগতকে পাগল করিবে। যে প্রেমে অনন্ত বিশ্বের বেদনা ও আনন্দ যুগপৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে,—দুঃখসুখের অতীত পরমানন্দ ও অমৃতের সাগর সৃষ্টি করে—বাঙ্গালা সে প্রেমে জগৎকে পাগল করিবে। তখন বিশ্বজন "ত্রিকাল" গ্রন্থের এই মহাবাক্যের মর্য্যাদা অবধারণ করিবে। বিশ্বের নরনারী বাংলার প্রেমতীর্থে নীল আকাশ ভেদ করিয়া লক্ষ লক্ষ আকাশতরীতে, নীলাম্বুরাশি মথিত করিয়া সহস্র সহস্র অর্ণবযানে ছুটিয়া আসিবে; বাংলার মাটী তীর্থরেণুর মত মস্তকে ধারণ করিবে, দেশদেশান্তর হইতে আগত প্রেমিক ভক্তের চক্ষের জলে বাংলার পুণ্যভূমি সিক্ত হইবে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলায় এ নব প্রেম-লীলা অভিনীত হইবে। বাঙ্গালী! সময় বহিয়া যায়। তোমরা অন্য চিন্তা ছাড়িয়া, হিংসা-দ্বেষ ও কলহ ভুলিয়া, সাগরের মত গভীরতা লইয়া, আকাশের মত উদার হইয়া, বিশ্বপ্রেমিকের নবানুরাগের হিঙ্গুলরাগ মরমে মাখিয়া এ মহা প্রেম-যুগে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার লীলাযন্ত্রে পরিণত হও। তৃণের মত লঘু হইয়া তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণে প্রেম বাঞ্ছা কর।

তিনি আশার অতিরিক্ত ও স্বপ্নের অতীত প্রেম ও অমৃত দান করিবেন, তাঁহার ভাণ্ডার যে অফুরন্ত। নব-বসন্তের বাতাস বহিতেছে,—ভক্ত কোকিলগণ নাম-গান করিতেছে। বিশ্ব জুড়িয়া বিরাট দোললীলা হইবে। প্রাণ হইতে অজস্র রং লইয়া প্রাণে প্রাণে রংএর খেলা চলিবে, অনুরাগের রঙ্গিমায় বিশ্ব লাল হইয়া যাইবে। তরুলতা-পাতায় কুসুমে প্রাণের রাঙ্গা রং ফুটিয়া উঠিবে; সেই বিশ্বব্যাপী দোল-লীলায় দুলিবে জগতের প্রাণ,—একাধারে পরম-নর ও পরম-নারী; আর বাঙ্গালা! তুমি হইবে এই হোলি-লীলার প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্তা। প্রভুর বাণী জয়যুক্ত হউক—কোটি অপমান-লাজ লাঞ্ছিত বাঙ্গালী মধুরাতিমধুর মূর্ত্তিতে অচিরে জগতে প্রকটিত হউক। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিশ্বজগতের মরমের মানুষ বাঙ্গালীর আধার এই মহাপ্রেমযুগের উপযোগী করিয়া গঠন করিয়া আসিতেছেন। বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালার আত্মা! তুমি তাপিত জগতের বুকে স্নেহপ্রলেপ প্রদান করিয়াছ। জয়দেবের সঙ্গে তুমি 'ললিত-লবঙ্গলতা' গাহিয়া ভারতের প্রাণে বসন্তের বাতাস বহাইয়াছ, চণ্ডীদাসের সঙ্গে তুমি 'পিরীতি সাগরে সিনান' করিয়াছ, গৌরাঙ্গ-সুন্দরের সাথে সাথে তুমি নামে-প্রেমে ভাসিয়াছ,—সংকীর্ত্তন রঙ্গে খোল করতালের মধুর মধুর ধ্বনির তালে তালে উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছ, প্রেমানন্দে ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়াছ। ব্রহ্মানন্দ, রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণের সঙ্গে বাঙ্গালী তুমি ভীষণাতিভীষণা রণচণ্ডিকাদেবীকে সরমজড়িতা নবনীকোমলা চিরকাল কুলবধূটীর মত করিয়াছ। বাঙ্গালী, বহু যুগ ধরিয়া এই নবপ্রেমযুগের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছ, তাই বাঙ্গালীর উপর এই মহাপ্রেমযুগের মরমের মানুষের ডাক সকলের আগে আসিয়াছে। বাঙ্গালী সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পরমাশ্চর্য্য ও মহাবিচিত্র লীলায় যোগদান করিবে। তাই প্রভু "বাঙ্গালী অষ্টম জাতি"—"বাঙ্গালী-বিগ্রহ" বলিয়া জলদগম্ভীর মন্দ্রে বাঙ্গালীকে জাগাইবার জন্য ডাকিয়াছেন। বহু বাঙ্গালী নরনারী জাগিয়াছে। তাহারা শ্রীগুরুর ভিতর দিয়া যুগপুরুষের ইঙ্গিত লাভ করিয়া নব প্রেমযুগের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। পুত্র অপেক্ষাও বিত্ত অপেক্ষাও তাঁহাকে প্রিয়তর বুঝিয়া তাঁহার চরণতলে আশ্রয় লইয়াছে। আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার লীলাযন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। খোল করতালের মধুর ধ্বনিতে—তুমুল নামসঙ্কীর্ত্তনের আরাবে আবার বাংলাদেশ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে—অচিরেই জগৎ জুড়িয়া নব বসন্তের নবকুসুমিত উদ্যান প্রকাশিত হইবে। নব গৌরাঙ্গের পরম মধুর লীলা, মহাকালীর পরম বিচিত্র রহস্যলীলা বিশ্বরঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবে। গৌরযুগে যে লীলার পূর্ব্বাভাসের কনকরেখা দিগ্বলয়প্রান্তে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহারই পূর্ণ মাধুর্য্যের বিকাশে সমগ্র বিশ্ব নব প্রেমের অরুণ কিরণে উদ্ভাসিত হইবে। আজও যাহারা জাগে নাই—তাহারা এখনই জাগরিত হও, সময় বহিয়া যায়। বাঙ্গালী! তোমার গৃহে অচিরে মহাপ্রেমোৎসব, আর কি তোমার ঘুমাইবার সময় আছে? তুমি প্রেমের বিগ্রহ, মহাশক্তির আধার; এস, আজ সকলে মিলিয়া প্রেমের মানুষের অভিষেক করি। ভুবনমঙ্গল কীর্ত্তনের রোলে জগতের প্রতি গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত করি। এ ডাক সবারই জন্য; যাহাদিগকে চোর, লম্পট, পতিত, পতিতা বলিয়া তাচ্ছীল্য করিয়া শুভ্রহৃদয় সাধুগণ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, আজ তাহাদেরই একজন বলিতেছে—"এবার পতিত পাষণ্ড প্রেমের মানুষের নিজ জন।" আজ এই পতিতের পতিত বলিতেছে—"শোন আমার মরমের ধন, যদি আমি নিষ্পাপ হইতাম, তবে তোমার ক্ষমার অমৃত আস্বাদনে বঞ্চিত হইতাম, যদি আমি শুদ্ধ ও পবিত্র হইতাম, তবে আমি তোমার ক্ষমাসুন্দর চক্ষে প্রেমধারা দেখিতে পাইতাম না। হে শরীরিণী দয়া, হে প্রাণের মানুষ

ক্ষমার মুরতি, করুণার বিগ্রহ—যদি আমি শুদ্ধ হইতাম তবে তোমাকে জানিতাম না।" বাঙ্গালী, জগতের ঘরে ঘরে প্রচার কর এই সুসমাচার—এবার পতিত পাষণ্ডই তাঁহার পরমগহন নবরূপ—তাঁহার অশ্রুসজল অমৃতমুখ দেখিবে। খৃষ্টের প্রেমমুখ দেখিয়াছিল গণিকা মেরী ম্যাক্‌ডেল্যান্; সজলজলদরুচি কেশকলাপে মুছাইয়া দিয়াছিল তাঁর বিমল পাদপদ্ম। জগাই মাধাই দেখিয়াছিল—নিতাইর স্বরূপ। পতিতের প্রাণ গৌরাঙ্গসুন্দরের যে চরণরাজীব রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র বহু আরাধনায় প্রাপ্ত হন নাই, সুরেন্দ্রযোগীন্দ্র বাঞ্ছিত সে চরণ অনায়াসে লাভ করিল দাক্ষিণাত্যের বারাঙ্গনা বারমুখী। তাই যাহারা নিজকে লাঞ্ছিত, পতিত, পাপলীন বলিয়া সঙ্কুচিত রহিয়াছ, এবার তাহাদেরই পরমানন্দের যুগ, এবার নিখিল বিশ্বের মরমের মানুষ নয়নজলে সর্ব্বাগ্রে পতিতের অভিষেক করিবেন। পরশমণির পরশে তাহারা সোণা হইয়া যাইবে। এই মহাপ্রেমযুগে হইবে গৌরযুগের পরিপূর্ণতা। তখন মানুষের প্রাণ আকাশের মত উদার হইবে, মানুষের অমৃত আঁখি খুলিবে, প্রতি অণুপরমাণুতে অনন্তের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে, কুসুম সঙ্গীতরূপে কর্ণে সুধাবর্ষণ করিবে, পাখীর রব লোকাতীত বিচিত্র বর্ণচ্ছটা বিকাশ করিয়া নয়ন রঞ্জন করিবে। রোগ, শোক, পাপ, তাপ, অনাহার, হাহাকার, কলহ, বিদ্বেষ—নামের বন্যায় ভাসিয়া যাইবে। ফুটিয়া উঠিবে নবীন জগৎ, সর্ব্বত্র শান্তি, মাঠভরা ধানের ক্ষেতে সোণার লহরীমালা, নবীন স্বাস্থ্যের গোলাপী আভা মণ্ডিত নরনারীর নিটোল সবল দেহ, অধরে সরস মধুর হাস্য, কণ্ঠে প্রেমজড়িত বাণী, সর্ব্বাঙ্গে প্রেমের পুলক, নয়নে আনন্দধারা। এ জগৎ ধরায় নববৃন্দাবন; অচিরেই হে বাঙ্গালী, তোমাকে নন্দিত করিতে হইবে—তোমার উপর ভগবানের ডাক আসিয়াছে।

সে বাণী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল বাংলার প্রাণ। বিশ্বমাতৃকা প্রকট হইলেন বিশ্বনায়িকারূপে—কারুণ্যতারুণ্য-লাবণ্যামৃতপরিস্নাতা প্রভাময়ী নবতরুণীমূর্ত্তি শিবরূপী জীবের বাম অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

তখন জগৎ বুঝিবে সিদ্ধ বৈষ্ণব-কবি নরোত্তম কেন গাহিয়াছিলেন :—

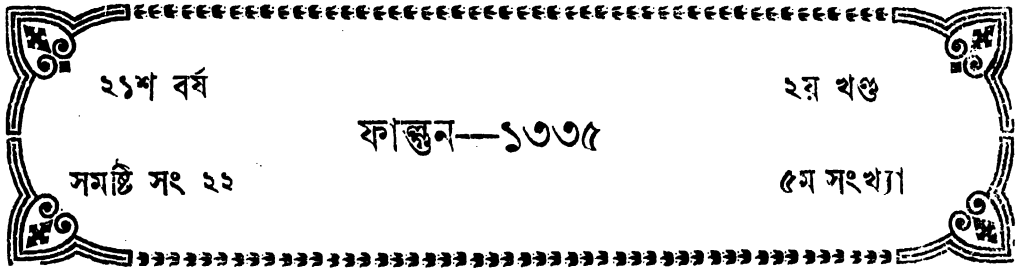
ঐ গৌরমণ্ডল ভূমি যেন শুদ্ধ-চিন্তামণি,
যেবা জানে হয় তাঁর ব্রজভূমে বাস।

তখন বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে—হরিকেলীয় ভূমিতে প্রাচীন কামরূপের মহাপুণ্য ক্ষেত্রে যোগিনীতন্ত্রের সেই প্রাচীন অতি গোপ্য রহস্য, সেই আদি বৃন্দাবন প্রকটিত হইবে। ব্রহ্মপুত্রতীরবর্ত্তী হরিকেলভূমির ইষ্টদেবীকে জাগরিত করিয়াছেন বাংলার সেই বিরাট যুবাপুরুষ শ্রী নিগমানন্দ—অচিরেই যুগযুগান্তের বিস্মৃতির আবরণ ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠিবে বাংলার মহাশক্তি পীঠে নব ব্রজভূমি। সহজ মানুষের দেশ—শ্রীগুরুতত্ত্ব; সহজ মানুষ শ্রী গৌরাঙ্গতত্ত্বের সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিবে বিশ্বজনীন যুগধর্ম্ম।



আর্য্য-দর্পণ

সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র।



২১শ বর্ষ — ২য় খণ্ড

ফাল্গুন—১৩৩৫

সমষ্টি সং ২২ — ৫ম সংখ্যা

মঘবা সুরাধাঃ

—*—

ঋগ্বেদ সংহিতা—৩।৫।২০-২৪

—*—

[বামদেব ঋষিঃ—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ—অগ্নি দেবতা]

সত্রাহণং দাধৃষিং তুম্রমিন্দ্রং
মহামপারং বৃষভং সুবজ্রং।
হন্তা যো বৃত্রং সনিতোত বাজং
দাতা মঘানি মঘবা সুরাধাঃ॥

দুরধর্ষ, মহাবেগে শত্রু কত বধে অগণন,
অগম মহান্তদেব, বজ্রধারী, কাম-বরিষণ;
বৃত্রেরে বধেছে যে সে, অন্ন কত দেছে ভারে ভার,
দেছে ধন মঘবান্, তাই হল অবাধ্য সবার।

অয়ং বৃতশ্চাতয়তে সমীচী-
র্য আজিষু মঘবা শৃণ্ব একঃ।
অয়ং বাজং ভরতি যং সনো-
ত্যস্য প্রিয়াসঃ সখ্যে স্যাম॥

বেড়েছে শক্রর সেনা, তাদের সে হেনেছে মরণ—
অথচ সে একা রণে—শুনেছি এ অদ্ভুত কথন;
অন্ন যত আমাদের দেয় তাহা ভাঁড়ারে জমান—
যাচি তার সখা মোরা—বন্ধু ভেবে রাখে যেন প্রাণ

অয়ং শৃণ্বে অধ জয়ন্নুত ঘ্নন্
অয়মুত প্র কৃণুতে যুধা গাঃ।
যদা সত্যং কৃণুতে মন্যুমিন্দ্রো
বিশ্বং দৃড়্হং ভয়ত এজদস্মাৎ॥

এ ও তো শুনেছি, সে যে শক্র মেরে লভেছে বিজয়,
যুদ্ধে জিনি কত পশু এনেছে যে গণিবার নয়!
সত্যি বটে, ইন্দ্র যদি ক্রোধভরে একবার চায়,
এই যে অটল বিশ্ব, এ-ও দেখি ভয়ে কেঁপে যায়!

সমিন্দ্রো গা অজয়ৎ সং হিরণ্যা
সমশ্বিয়া মঘবা যো হ পূর্ব্বীঃ।
এভির্নৃভির্নৃতমো অস্য শাকৈ
রায়ো বিভক্তা সম্ভরশ্চ বস্বঃ॥

কত গাভী, কত ধন শক্র হতে এনেছে কাড়িয়া,
কত অশ্ব এনেছে যে মঘবান্ শক্র খেদাড়িয়া;
বিশ্বজনে স্তুতি গায়, নেতা সে যে সেরা সবাকার—
বেঁটে দেছে কত ধন আরো কত রেখেছে সে পুরিয়া ভাঁড়ার।

কিয়স্স্বিদ্ ইন্দ্রো অধ্যেতি মাতুঃ
কিয়ৎ পিতুর্জ্জনিতুর্যো জজান।
যো অস্য শুষ্মং মুহুকৈরিয়র্ত্তি
বাতো ন জূতঃ স্তনয়দ্ভিরভ্রৈঃ॥

এই যে ইন্দ্রের তেজ কিছুটা এ জননীর দান,
কিছু বা পিতার—যিনি নিখিলের স্রষ্টা ভগবান্;
মুহুর্মুহুঃ শক্তি এর তিনিই তো জাগালেন প্রাণে—.
গরজি গরজি ঘন মেঘ যথা ঝড় ডেকে আনে।

ক্ষিয়ন্তং ত্বম্ অক্ষিয়ন্তং কৃণোতি
ইয়র্ত্তি রেণুং মঘবা সমোহং।
বিভঞ্জনুরশনিমাঁ ইব দ্যৌরুত
স্তোতারং মঘবা বসৌ ধাং॥

দান চুলো নাই যার তাদেরও সে দিল কত ধন,
পুঞ্জীভূত যত পাপ, মঘবান্ করিল হরণ;
বজ্র ধরি মহাশর আকাশেরে করে খান্ খান—
স্তুতি পড়ে যে, তাহারে দেন ধন এই মঘবান্।

অয়ং চক্রম্ ইষণৎ সূর্য্যস্য
ন্যেতশং রীরমৎ সস্মমানং।
আ কৃষ্ণঃ ঈং জুহুরাণো জিঘর্ত্তি
ত্বচো বুধ্নে রজসোঽস্য যোনৌ॥

ইহারি প্রেরণা লভি সৌরচক্র ঘোরে অনিবার;
"এতশে"রে নিবারিল, যুদ্ধতরে হলে আগুসার;
এঁকে বেঁকে বহে ওই কালো মেঘ ঘন বারিমণ—
আলোকের উৎস যথা, তারি বুকে নিয়েছে আসন।

হিন্দোলায়

——(::)——

মধুর বসন্ত সমাগত। দারুণ দুঃখ-হিমান্তে তাহার এই শুভ আগমন দিকে দিকে পরম আনন্দের ঢেউ তুলিয়াছে। আকাশ-বাতাস মধুর হইতে মধুরতর হইয়া সমস্ত সৃষ্টিকে যেন কি এক নূতন রসে সঞ্জীবিত করিয়াছে। চ্যুত-মুকুলের সুবাস বহন করিয়া দক্ষিণ-পবন মৃদু-মন্দ গতিতে ভ্রমরের প্রাণে অভিনব সাড়া দিতেছে। নির্ম্মল সুনীল আকাশে রক্ত-পল্লবের চূড়া তুলিয়া নাগকেশর সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহার প্রস্ফুটিত কুসুমের সুগন্ধে দিগ্বিদিক আমোদিত হইতেছে। সমস্ত দিবা-রাত্রি ধরিয়া গুণ্ গুণ্ স্বরে অলিকুল পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু-আহরণছলে বিরহীজনকে যেন বিদ্রূপ করতঃ বিরহব্যথা আরও দ্বিগুণিত করিতেছে। তৎসঙ্গে কোকিলের উচ্চ তানে ক্ষণেকের বিস্মৃতিও বিপুল আবেগে হৃদয়কে মথিত করিয়া দিতেছে। নয়নদ্বয়কে ভুলাইবার জন্য প্রকৃতি-রাণীর এই মনোহর বেশ, শ্রবণ-যুগলের জন্য অপ্সরাকণ্ঠবিনিন্দিত বিহগ-নিচয়ের এই অপূর্ব্ব কাকলি, নাসিকার তরে বিবিধ কুসুমের সুবাস, রসনার তরে নানাবিধ সুরসাল খাদ্যের প্রাচুর্য্য, আর ত্বকের তরে প্রিয়জন-সমাগম প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তর্পণের অর্ঘ্যভার লইয়া বসন্ত আজ রতি আর মদনের সমভি-ব্যাহারে ধরায় অবতীর্ণ। আজ কৃষকের ঘরে অন্নের অভাব নাই, প্রকৃতির কার্পণ্য নাই, ধনী-দরিদ্র সকলের প্রাণে এক মধুর মিলনানন্দ। প্রত্যেকের প্রাণে আজ কিসের এক আবেগ আসিয়া পরস্পরের হৃদয়কে অনুরঞ্জিত করিয়া দিতেছে।

জগতের এই বিপুল মাধুরী বৃন্দাবনে যেন একরস মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। জগজনমোহন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রসরাজ রূপে সকলের প্রাণ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। এহেন মধুর দিবসে মধু-বাতাহত অলস অঙ্গ স্বতঃই এলাইয়া পড়ে, হৃদয় দিয়া সমস্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াও যেন অনেকখানিই অপূর্ণ থাকে। সেই পূর্ণতার আকিঞ্চনে বিরাট্ একটা হাহাকার যেন কাহার প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া ফুকারিয়া উঠে। বিরহী-হৃদয়ের এই আকুল আবেগই বুঝি গোপিকারূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে উন্মাদিনী হইয়াছিল। প্রকৃতির এই বিরাট্ উচ্ছ্বাসে তাই গোপিকা-হৃদয়ধন মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত-হৃদয়ের আকিঞ্চনে এই মধুমাসে তাহাদের সহিত আত্ম-সংমিশ্রণ করি[illegible]ন। পরস্পরের প্রাণের দোলে সারা জগৎ আনন্দে আন্দোলিত, তাই আজ হিন্দোলায়ন বা দোল-যাত্রা উৎসব। ফুলে ফলে পরিপূর্ণা ধরণীতে আজ পুরুষ-প্রকৃতির মহান্ অনুরাগে ধূলিকণাও অনুরঞ্জিত। বিশ্ব-প্রকৃতির মাঝে যেন রঙের হোরিখেলা চলিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ আদিপুরুষ আর শ্রীরাধা আদিপ্রকৃতি। এই পুরুষ-প্রকৃতির মিলনই প্রেম। পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যে আকুল আকর্ষণ তাহাই মিলন। বিরহও মিলনেরই নামান্তর। সমস্ত জগতের মূলে রহিয়াছে এই প্রেম। প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে যে মিলনাকাঙ্ক্ষা তাহা থাকিত না—যদি মূলে পুরুষ-প্রকৃতির এই এই অচ্ছেদ্য সংযোগ না থাকিত। আত্মরূপী পুরুষ এই জগৎরূপী মহামায়াকে বুকে করিয়া আছেন বলিয়াই জগৎ এমন সুন্দর। আর বসন্তোৎসব সেই মিলনের উৎসব। প্রকৃতি-রাণী সমস্ত সজ্জা আজ অঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক আত্মরূপী পুরুষের মন ভুলাইতে চলিয়াছেন; তাই আজ প্রতি কুঞ্জে, প্রতি পল্লবে, প্রতি কুসুমে, সমস্ত ধরায় এক অপূর্ব্ব শ্রী বিদ্যমান। জগৎস্বামী আজ প্রকৃতি-সুন্দরীর এই মনোহর লীলায় অনুরক্ত। তাই প্রকৃতির সমস্ত অঙ্গ আরক্তিম করিয়া সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িতেছে। সর্ব্বসুন্দরী প্রকৃতি

আজ শ্রীরাধারূপে সর্ব্বসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কে শোভিতা। জগন্ময় প্রতি হৃদয়ে প্রেমপুষ্প প্রস্ফুটিত। একে অপরকে জড়াইয়া ধরিয়া, ফাগ মাখাইয়া, আদর করিয়া, সোহাগ করিয়া কিছু করিয়াই যেন কূল পাইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণ যে আজ সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। মদন তাই সকলের মাঝে সেই মদনমোহনের আবির্ভাব জাগাইয়া দিতেছে। জগৎ গোপীরূপ ধারণ করিয়া মিলনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া লইতেছে।

শ্রীরাধা গোপীগণপরিবেষ্টিতা, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। তাঁহার আজ কুল নাই, মান নাই, লজ্জা নাই, সম্ভ্রম নাই—সমস্ত হারাইয়া আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তা। বসন্ত ঋতুরাজ—ষড়ঋতুর যা কিছু বৈভব, সমস্ত লইয়া আজ ধরায় আগমন করিয়াছেন। যেদিকেই তাকাও, প্রেমোদ্দীপক সমস্তই বিদ্যমান। রাধাকৃষ্ণের মিলনোদ্দেশ্যে কোনও কিছুরই ক্রুটী নাই, সেই প্রেমবিলাসের সমস্ত উপকরণ আজ স্তরে স্তরে সজ্জিত। নবসৌন্দর্য্যে বিভূষিতা প্রকৃতির এই প্রেমের পূজাই দোলপূজা। প্রতি পত্রে-পুষ্পে শ্যামলে-পীতে সেই শ্যামসুন্দর ও শ্রীরাধার মিলন প্রকটিত। জগৎবাসী প্রত্যেকের হৃদয় আজ প্রিয়-সম্মিলনাকাঙ্ক্ষায় বিগলিত। প্রতি হৃদয়ের এই প্রেমের নামই মদন আর সেই চির-আসক্তিই রতি। ভক্ত এই প্রেম ও আসক্তির সামঞ্জস্য করিলেই তাহাতে প্রাকৃত ভাবের পরাবর্ত্তন হইল। সেখানে বিরাজিত হইলেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। আত্মা বা ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তিরূপা শ্রীরাধার মিলন হইল। জীবের হৃদয় কামের স্থলে পবিত্র প্রেম বিরাজিত হইল।

নিত্য-নব সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা শ্রীরাধা নিত্যনূতন সৌন্দর্য্যসম্ভারে পরিপূর্ণা বাসন্তী রজনীরূপে দেখা দিয়াছেন, ওদিকে হৃদয়-যমুনার জল উজান বহিতেছে। কেন?—সেই শ্যামসুন্দরের মধুর মুরলীশ্রবণে। জীবনে যতই নিত্যনূতন করিয়া রসের যোগান আসিতে থাকে, ইহবৈভবের বিপুলতা যতই মানুষকে আবৃত করে, ভক্তহৃদয় ততই অন্তর হইতে অন্তরতম পুরুষের আহ্বানে কাঁদিয়া আকুল হয়। সে আহ্বানে, সে বাঁশীতে যে কি সুর মাখানো, সে যে কি গুণ জানে, তাহা কেহ জানে না—বোঝে না; বুঝিতে চায় না। চায় শুধু হাপুস্‌নয়নে কাঁদিতে, জানে শুধু বাঁধনহারা হইয়া ঐ আহ্বানের ইসারায় ছুটিতে। আজ এই বসন্তের নবসমাগমে ক্ষণতরে স্তিমিত সে দিশেহারা আকুলতা, সেই একান্ত প্রাণের কামনা যেন দ্বিগুণতর হইয়া ভাবের বন্যা ছুটাইয়া দিয়াছে। সেই প্রেম-মন্দাকিনীর উচ্ছল কলগতি শত বাধার ঐরাবতও রোধ করিতে পারিতেছে না; বাধা পাইয়া উপচিয়া উঠিয়া তাহা যেন আরও ছড়াইয়া পড়িতেছে। পঞ্চ ঋতুতে প্রতীক্ষমানা প্রকৃতির এই উচ্ছ্বসিত আবেগই যেন বসন্তকাল পাইয়া আরও অধিকতর শোভায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাই আজ এই সৌন্দর্য্যভাণ্ডারের অগণিত উপকরণ প্রতিক্ষণে নষ্ট হইয়াও আবার পূর্ণ হইতেছে। এ সৌন্দর্য্যের শেষ নাই; এ মিলনের বিচ্ছেদ নাই। প্রতি অণুতে অণুতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই আনন্দহিন্দোল আন্দোলিত হইতেছে। তাই এই জগৎ চলিতেছে। এই বিশিষ্ট দিনের বিশিষ্ট তিথিতে বিশিষ্ট ক্ষণে যে মিলন-পূজা বিশেষ করিয়া সম্পাদিত হয়, জগতের প্রতি জীবে প্রতি ক্ষণে অহরহ সেই উৎসব অবিশিষ্টরূপে বিদ্যমান। ভক্তহৃদয় যেই পবিত্র মুহূর্ত্তে সেই শুভ মিলনের আকাঙ্ক্ষায় আপনার ক্ষুদ্র ব্যষ্টিত্ব সেই সমষ্টিরূপী শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণপূর্ব্বক সমাহিত হয়, সেই পরম শুভক্ষণেই তিনি এমনি ভাবে সমস্ত দিক্ আলোকিত করিয়া আবির্ভূত হন। ভক্ত-হৃদয়ের ভক্তিরূপা একমাত্র হ্লাদিনীশক্তিই সেই পরম-পুরুষকে এ জগতে টানিয়া নামাইয়া আনিতে পারেন। নতুবা তিনি যে আবরণী মায়াদ্বারা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে আর কোনও শক্তিই অপসারিত করিতে পারে না। তাই এই পরম

পবিত্র শুভ মুহূর্ত্তে আজ জগৎ জুড়িয়া তাঁর স্বেচ্ছায় আগমনের আনন্দে সকলেই উল্লসিত। সেই আনন্দের উন্মাদনা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সকলেই এক দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নিখিল সৌন্দর্য্যকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর করিয়া চলিয়াছে। সে সৌন্দর্য্য-পাথারে অবগাহন করিয়া—কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয় মথিয়া—তাঁহার প্রতি অনুরাগের রাগ অঙ্গে মাখিয়া সমস্ত জগৎ আজ লোহিতবর্ণে রঞ্জিত!

আজ পূর্ণিমা। কি মধুময় এই তিথিটী! এক এক কলা পূর্ণ করিয়া পঞ্চদশ দিবসে আজ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হইয়া সুধাকর শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন আরও ষোল কলায় পরিপূর্ণ করিলেন। যেমন এই রজনীটী উপভোগ্য, আজ তাহা হইতেও বেশী উপভোগ্য হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন প্রতীক্ষায় হৃদয় যেন শুদ্ধ হইয়া আছে। আহা, কি মধুর এই কৌমুদীস্নাত স্নিগ্ধ শুভ্র তাঁর হাসিটুকু! আজ পূর্ণত্বের নিদর্শন শুধু পূর্ণিমা নয়—আজ যে মিলনপূর্ণিমা। সমস্ত জগৎ প্লাবিত করিয়া সুধার সাগরে জগৎকে ভাসাইয়া পূর্ণচন্দ্র অনেক দিনই ধরার বক্ষ স্নিগ্ধ করেন। কিন্তু এমন করিয়া প্রেমিক প্রেমিকার বহুদিনসঞ্চিত, তৃষিত বুভুক্ষিত দীর্ণ চিত্তের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া প্রাণে প্রাণে মিশাইবার দিনটী বুঝি আর নাই। আর সে প্রেমিক প্রেমিকা শুধু এই জগতের প্রাকৃত দেহধারীই নয়—তাহার সত্তা জগৎ জুড়িয়া; সেই মিলনে জগৎ পরিপ্লুত, জাগতিক সমস্ত হৃদয় কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠে—সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আনন্দ শিহরণে দোলাইয়া যায় এই যুগল মিলন।

সেই গুণাতীত পরমপুরুষের সঙ্গে মহাপ্রকৃতির মিলনেই সারা জগৎ এমন উন্মাদনায় মাতিয়াছে। তিনি যে সর্ব্বভূতে থাকিয়াও আরও কিছু বেশী—অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্—সমস্ত জগন্ময় নিজকে ব্যাপ্ত করিয়াও দশ অঙ্গুলি অধিক। তাই তাঁর তৃপ্তিতে জগৎ তৃপ্ত হইয়াও যেন আরও আনন্দে উপচিয়া পড়িতেছে। সমস্তই তাই আজ পূর্ণ। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে; পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।—আজ এই জগৎ পূর্ণ,—এই জগতের বাহিরে ঐ অতীন্দ্রিয় জগৎ পূর্ণ—আর সমস্ত জগতও যেন পূর্ণত্বকে ধারণ করিতে না পারিয়া স্বতঃই উদঞ্চিত হইতেছে। কিন্তু সেই পূর্ণ হইতে এমন করিয়া যাহা আসিতেছে, তাহাও পূর্ণ, তাহাতেও ন্যূনতা নাই। আবার এই পূর্ণ জগতের সদা ধ্বংসোন্মুখীনতা হইতে যতই কিছু হ্রাস হউক না কেন, তাহা তথাপি পূর্ণই থাকিয়া যাইতেছে।

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে সেই অপ্রাকৃত মদনলীলার কোটী অংশের একাংশও এই জগৎ ধারণ করিতে পারে না। এই জগৎ যেইটুকু রসে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে, ভূচরে খেচরে প্রতি পাদপ-বল্লরীতে, সৃষ্টির প্রধান জীব প্রতি নরনারীতে যে সৌন্দর্য্য আমাদের নয়ন-মন ভুলাইয়া লয়, তাহা সেই শ্যামসুন্দরের অঙ্গদীপ্তির কোটী কোটী অংশের এক অংশও নয়। যে রূপলাবণ্যমাধুরী আমাদের মনপ্রাণ হরণ করিয়া বিহ্বল করিয়া দেয়, যে সৌন্দর্য্যপাথারের অথৈ জলে আমরা আমাদের সর্ব্বস্ব নিমজ্জিত করিয়াও তৃপ্তি পাই না, শ্যামসুন্দরের অঙ্গ যেই লাবণ্যমাধুরী দিয়া গঠিত, তাহার একগাছি কেশের লক্ষাংশ দিয়াও এই জগতের নরদেহধারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যপ্রতিমাও গঠিত হয় না। তবে আর আমরা কী তাঁহার রূপ কল্পনা করিব?

আমরা শুধু চাই—আমাদের ক্ষুদ্র আধারটুকু পূর্ণ করিয়া তাঁহার জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত করিয়া তিনি আসিয়া হৃদয় অধিকার করুন। জগন্ময় তাঁহার সে রূপ প্রকটিত হইলেও—আজ এমন করিয়া সমস্ত জগৎ নাচাইয়া হাসাইয়া আন্দোলিত করিলেও আমার চিত্তদোলায় আসিয়া তিনি যে পর্য্যন্ত আসন না পাতেন, সে পর্য্যন্ত আমার সবই বৃথা। কুল, মান,

বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, সম্মান, সকল আজ বিষের মত পরিত্যজ্য—যদি তিনি এসে আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আমাকে আগ্‌লিয়া না বসেন। আমার হৃদয়ই তাঁহার ব্রজের শ্রীরাধিকা। শতবর্ষ কেন, কত কোটী কোটী যুগ পার হইয়াছে কে জানে? কই, তাঁহার সঙ্গে মিলন তো হইল না! আমার চিরবিরহী হৃদয় সেই আভীরবালাগণের মধ্য দিয়া কতবার তাঁহাকে পাইয়াছে;—কতবার তাঁহাকে এমনি করিয়াই বেদনার আবীর দিয়া, রক্তহৃদয়ের অরুণ অনুরাগে রাঙিয়া দিয়াছি! কিন্তু কই, সে নিঠুর যে আবার ছুটিয়া পলাইয়াছে!—আবার ধরিয়াছি আবার পলাইয়াছে! এমনি করিয়া লুকোচুরী যে আর সহ্য হয় না—ওগো, তাই বলি, এবার আপনি আসিয়া ধরা দাও—নতুবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়াও যে তোমাকে ধরিতে পারিব না!

আজ এমন দিনে তোমার স্পর্শের পুলক শিহরণে জগতের আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত মর্য্যাদা ভুলিয়া একে অপরকে আলিঙ্গন করিতেছে, সমস্তটুকু অনুরাগ দিয়া একজন আর একজনকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে—আর এমন করিয়াও বুঝি তৃপ্তি পাইতেছে না, তাই বিশিষ্ট তিথিতে ক্ষণেকের তরে আপনার পানে সকলে চাহিতেছে, বুঝি দেখিতেছে, কোন্ অজানা এসে এমন করিয়া প্রত্যেককে পাগল করিয়া তুলিয়াছে, আর সেই সময়ে সেই নিবিষ্ট ধ্যানরত হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে খুঁজিয়া সমস্ত স্তর পার হইয়া আসিয়া মনোজ্ঞেয় তোমার সন্ধান মিলিয়াছে। হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তির ওপারে, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ তিন গুণের উপরে যে তুমি এমন করিয়া আসিয়া আসন লইয়া দোলা দিতেছ, তাহা কে জানে? বিশ্বের চিত্ত-নারীর সঙ্গে একমাত্র নটবর তুমি এমন করিয়াই মিলিলে! ধন্য আজ এই যুগল মিলন!

* * *

মানুষ চিরদিনই দোল খায়। সুখে, দুঃখে অবস্থার বিপর্যায়ে, সংশয়ে মানবচিত্ত সর্ব্বদাই দোলায়মান। 'আজ যাহাকে প্রাণ নিপীড়িয়া সমস্তটুকু রস ঢালিয়া দিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা হইতেছে, কালের বিচিত্র উপহাসে সেই হয়ত পরম শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। আজ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় কল্পলোকের স্বপ্নে বিভোর, কাল হয়ত বাস্তবের নিষ্ঠুর তাড়নায় দেহ মন জর্জ্জরিত! যেই মন আজকে পাপের চূড়ান্ত সীমায় বিন্দুমাত্র দ্বিধাহীন হইয়া বিচরণ করিতেছে, কাল হয়ত তাহা কল্পনায় আসিয়া সমস্ত শরীরে ভয়ের শিহরণ তুলিতেছে; তবে মানুষের সুখ কোথায়? কোন্ অবস্থাটাকে চিরস্থায়ী ভাবিয়া সে একটু নিশ্চিন্ত হইবে? নাই, নাই—এ জগতের কোথাও সেই পরম নির্ভরযোগ্য চিরশান্তি বিরাজ করে না। সাময়িক দু একদিন বা দু'চার বছরের নিশ্চিন্ত নির্ভরতার উপর বিশ্বাস নাই—কেননা তাহাই আবার পরিণামে প্রবল আশঙ্কার স্থল হইয়া পড়ে। 'তবে কি সুখ নাই? যদি না থাকিবে, তবে এই কথার সৃষ্টিই বা হইল কেন? শুধু এই সাময়িক আনন্দকে লক্ষ্য করিয়াই কি এই "সুখ" শব্দের উৎপত্তি? না, পরম সুখও আছে। সে সুখ কামনার বাহিরে; মানুষ কামনা করিয়া যে সুখকে ডাকে, তাহা আসে পিছনে জ্বালা লইয়া—আর কামনাশূন্যের যে আনন্দ, তাহাই স্থির সুখ। চিরদুঃখের প্রতীকার এই কামনা-তরঙ্গের উপরে অধিষ্ঠিত হওয়া। দোলমঞ্চের যে তিনটী স্তর সজ্জিত দেখা যায়, তাহা এ জগতের সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের ক্রিয়ারূপ বাসনার তরঙ্গ। ত্রিগুণাতীত হইয়া সমস্ত বাসনাবিমুক্ত হইয়াছে যে—জগতের সু-কু আন্দোলন যাহার চিত্তে দাগ বসাইতে না পারে, পুষ্পবাসিত জলের ন্যায় মনে কোনও

বাসনার গন্ধ না থাকে, বাসন্তীর এই অনুপম অনাবিল সৌন্দর্য্যের রসাধিকারী সে-ই। অপ্রাকৃত মদনের লীলাভূমি অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-বিহারী শ্যাম-সুন্দরের অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া যুগলমিলন অনু-ভবের বোদ্ধা সেই-ই।

আজ শুচি সংযত কায়মনে সমস্ত জাগতিক কল্পনা দূরে রাখিয়া, জীবনের লাভে-অলাভে উদাসীন হইয়া একাগ্রচিত্তে বিশ্বের এই নিখিল সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে বিস্তার করিয়া দাও। যেখানে যত কিছু রসের সুষমা, সমস্তকে আপনার মাঝে আস্তৃত অনুভব কর। তাহার মধ্যে নামরূপধারী তোমার ব্যষ্টিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া তারপর এই ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ভাল-মন্দে সমরস হইয়া—অনন্ত কোটী বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের লীলা তোমার মাঝে চলিতেছে, ক্ষণতরে এই অনুভবে আপনাকে সন্দীপিত কর—দেখিবে, এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের দোদুল্যতা তোমারই একাংশে চিরবিলসিত। তোমার মাঝে নিখিল বিশ্বব্যাপারের উত্থান-পতন, সৃজন-বিলয়—কোথাও ব্যষ্টি মমতা নাই অথচ সমস্ত ব্যাপিয়া এক বিভুস্বরূপের চিররহস্যময় অধিষ্ঠান। প্রতীক্ষণ-কম্পিত বিশ্বহৃদয়ের প্রেমদ্যুতিতে, সুরসাল সৌন্দর্য্যলীলাবিলাসে কত বিচিত্র জগৎ ফুলে-ফলে ভাবে ও বাণীতে সঞ্জীবিত! আর সেই অব্যক্ত অনাবিল সুখস্বরূপের যে অভিব্যক্তিই হৃদয়ে ফুটিবে, তাহাই শ্যামসুন্দরের ঘনবিগ্রহ। তখন আর আমি নাই, জগৎ নাই, বিশিষ্ট হইয়া কিছুই নাই—আবার সবি আছে; প্রাকৃত জগৎ হইতেও অনন্তগুণ সুন্দর অতুলন হইয়া সবি সেখানে আছে। সেই মদন-মোহনের অপ্রাকৃত ভাবে পূর্ণ হইয়া প্রাকৃতে নামিয়া আইস—সমস্তই অর্থান্তরিত হইয়া চিরসুখের উপাদান হইবে—প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আনন্দহিন্দোল দেহমনপ্রাণে ঝঙ্কার তুলিয়া ফিরিবে। গুণময় জগতে এই বিরজ ভাবের চিরবসন্ত বহাইয়া দেওয়াই যথার্থ হিন্দোল—ইহাই দোললীলার প্রাণ। মধুর মধুমাসে সেই মধুর আনন্দরসে নিখিলের মনপ্রাণ আজ মুঞ্জরিত হইতে থাকুক, বিরজঃ বা ব্রজলীলায় ফুটিয়া উঠুক!

—*—

উত্তমর্ণ ভারত

—:*:—

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

আজ সকাল-বেলায় ছাত্রদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আমি যে কোনও দিন জন্মেছিলাম, এ কথা তো আমার মনে হচ্ছে না। বাস্তবিক, আমি কোনও দিন জন্মাই নি; আর জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যা আমাকে বোঝাতে পারে যে আমি কোনও দিন মরব।" ভারতবর্ষে এক বিরাট্ জন-সংঘের সামনে বক্তৃতা দেবার সময় আমার মুখ থেকে রাজনীতির গন্ধযুক্ত কিছু বচন বেরিয়ে পড়েছিল। শ্রোতাদের মাঝে জজ, উকীল, সরকারের বড় বড় চাকুরে সব ছিলেন। বক্তৃতার পর তাঁরা এসে প্রতিবাদচ্ছলে বল্লেন, "স্বামীজী, অমন কথা যেন কখনো বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বল্বেন না; তাহলে আপনাকে জেলখানায় যেতে হবে।" রামের জবাব হল, "ভাই সব, আমি তো

জুডাস ইসাক্রিয়ট নই যে ত্রিশটা রূপার চাক্তির খাতিরে সত্যরূপী খৃষ্টকে বেচে ফেল্‌ব! এ কথা আমার কেউ বোঝাতে পারবে না যে জগতে এমন কোনও তরবারি আছে, যা আমার আত্মাকে বিদ্ধ করতে পারে; এমন কি অস্ত্র আছে যা আমাকে আহত করতে পারে?—অজ আমি, অমর আমি—কে আমায় বধ করবে? অতীতে, ভবিষ্যতে, বর্ত্তমানে সদৈব একরূপ আমি! আমি যাব রফা করতে?"

যে কথাগুলো শুনছো তোমরা, হরঘড়ি তা শুনতে পাওনা বটে, হয়ত তা তোমাদের কাছে অদ্ভূতও ঠেকতে পারে; কিন্তু সত্যের কাছে ঋণী আমি, আমাকে এ কথাগুলো যে বলতেই হবে!

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদেশে অনেক গল্পই চল্‌তি আছে। মিনীয়াপোলিসে একটা বৈঠক বসেছিল। কথা শেষ হলে পর একটী মেয়ে এসে রামকে বল্‌লে, "স্বামিজী, ওদেশে মেয়েরা ছেলেকে গঙ্গায় ফেলে দেয় না কুমীরকে খাওয়াতে?" আমি জবাব দিলাম, "ব্রহ্মচারিণি, আমাকেও তো গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল; কিন্তু তোমাদের রূপকথার জোনার মত আবার সাঁতরে তীরে উঠে পড়লাম।" সত্য কথা বল্‌তে কি, গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত আমি হেঁটে গিয়েছি। যারা আমার সঙ্গে হেঁটেছ, তারা জান, এই দেহটুকুন্ দিন ৪০ মাইল পাড়ি দিতে পারে! গঙ্গার তীরে তীরে আদি-অন্ত আমি বেড়িয়েছি, কিন্তু সত্য বল্‌তে কি, গঙ্গার জল এত নির্ম্মল, তার স্রোত এত প্রখর যে বিজ্ঞানের যুক্তিতে কুমীর-ঘড়িয়াল যে তাতে থাকতেই পারে না! কুমীর থাকে কর্দ্দমাক্ত ময়লা জলে; কিন্তু গঙ্গার জলে তো কুমীর নাই! বলিহারি যাই গল্পবাজদের বুদ্ধিকে! ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদেশে এমনিধারা কত কথাই আছে।

সেদিন ওয়াশিংটনের সীটুটা হতে একখানা চিঠি পেলাম, লিখেছে একজন হিন্দু। সে এক ফ্যাসাদে পড়েছে। এক দিন রাত্রে করে সে এক ধর্ম্মসভার অধিবেশন থেকে বাড়ী যাচ্ছিল, মোটরে চড়ে। সে যে মোটরে যাচ্ছিল, একটী মেয়েও এসে তাতে চাপল। দুজনেই একসঙ্গে গেল, একসঙ্গেই থামল, দুজনার বাড়ীও কাছাকাছি। ঘণ্টাখানেক পরে ছত্রেটীকে পুলিসে এসে নিয়ে নিয়ে গেল। ছয় ঘণ্টা হাজতবাসের পর পরদিন তার বিচার হল। তার সহযাত্রিণী মেয়েটী তার নামে নালিশ করেছে, "লোকটা তার কালো কালো ভূতুড়ে চোখদুটী দিয়ে এমন তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছিল যে আমার মনে হচ্ছিল, ও যেন আমায় হিপ্নোটাইজ্ করে ফেল্‌বে। আমি ভারী ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।" হায়রে হায়, বেচারী হিন্দুরা আমেরিকায় আসবার আগে তাদের চোখ দুটা কোথায় রেখে আসবে, বল তো? এদেশে কোথাও কোথাও হিন্দুদের সম্বন্ধে এমনি সব ধারণা চল্‌তি আছে।

আবার এর একটা উজ্জ্বল দিকও আছে। যেমন ধর, ভারতবর্ষের সম্পদ্। প্রাচীন ভারতের অগণিত বৈভব সম্বন্ধে কত তথ্যই তোমাদের বল্‌তে পারি। ইউরোপে রটে গেল যে ভারতবর্ষে ঘরগুলি সব সোণার, রাস্তাগুলো রূপোর; শুনে ইউরোপের লোক ধনের খোঁজে ভারতবর্ষে আসবার জন্য উতলা হয়ে উঠ্‌ল। এমনি করে ইউরোপ থেকে সব দেশের লোক এসেছে ভারতবর্ষ জয় করতে। উত্তর পশ্চিমের রাস্তা ধরে ঘুরতে ঘুরতে কেউ এসে ভারতবর্ষে পড়েছে। তোমাদের কলম্বাসও তো ভারতবর্ষের নূতন রাস্তা আবিষ্কার করতে গিয়ে দৈবক্রমে আমেরিকায় এসে সেঁধুলো! তাই বল্‌ছি, ভারতবর্ষ বাস্তবিকই যাদুর দেশ—অন্ততঃ ধনরত্নের দিক দিয়ে তো? পারস্য আর গ্রীক লেখকেরা

ভারতবর্ষের দেবমন্দির সম্বন্ধে কি বর্ণনা দিয়ে গেছেন, আমি শুধু তোমাদের তাই পড়ে দেখতে বলি। এক মন্দিরে দশহাজার সেবক ছিল; মন্দিরের ছাতগুলো ছিল হীরা আর চুণীর কাজ করা। ভারতের ধন-সম্পদ সম্বন্ধে যদি ঐতিহাসিক বিবরণ চাও তো ক্লাইভ আর হেষ্টিংস সম্বন্ধে বার্কের বক্তৃতা পড়ে দেখো।

ভারতবর্ষের জ্ঞান-সম্পদ সম্বন্ধে তোমাদের অনেক কথাই বল্‌তে পারি। ভারতবর্ষে এক ব্যক্তিকে স্মৃতি-শক্তির অদ্ভুত কসরৎ দেখাতে দেখেছি। প্রায় ৫০।৬০ জন লোক অর্দ্ধচক্রাকারে তাকে ঘিরে বসেছে। প্রত্যেককে যে কোনও বইএর একটা পাতা খুলে বস্‌তে বলা হল। কেউ ইংরেজী, কেউ আরবী, কেউ উর্দূ বই খুলে বস্‌ল। লোকটা ছিল অন্ধ। দর্শকদের প্রত্যেকে বইয়ের পাতায় কয়টা সারি, তা বলে দিল। তারপর সবাই একে একে একটা করে সারি তার কাছে আওড়িয়ে গেল। এই যেমন প্রথম লোকটার পাতায় কুড়িটি লাইন, তার প্রথম লাইনটা সে বলে দিল; দ্বিতীয় লোক-টার পাতায় তেরটা সারি, সে তার পঞ্চম সারিটা বলে গেল। এমনি করে একবার বলা হলে পর সবাই আবার এক এক সারি বলে গেল। এমনি করে এলোমেলো করে পাতার সমস্ত সারিগুলিই সবাই আওড়ে গেল। এমনি করে ধর, তের বারের পালা যখন এল, তখন যে বলেছিল তার পাতায় তেরটা সারি, তাকে সে লোকটা বললে, "আপনার পুঁথির পাতা শেষ হয়ে গেছে।" এমনি করে সবার এলোমেলো সারিগুলো নিজের মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে সে আগাগোড়া এক একটা পাতা আওড়িয়ে যেতে লাগল—একটা ভুলও করল না। এমনি করে সে সবার পাতাগুলি একে একে আওড়িয়ে গেল।

মনস্তত্ত্বের কতকগুলি গবেষণার কথা তোমাদের বল্‌তে পারি। একজন স্বামীজী ছিলেন, পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত তিনি চেতনাকে রুদ্ধ করে রাখ্‌তে পারতেন। আবার হিমালয়ে আমি অনেক স্বামীজী দেখেছি যাঁরা ছয় মাস ধরে মৃতকল্প হয়ে কাটাতে পারেন। ছয় মাস ধরে এমনি জীবন্মৃত হয়ে থাকার একটা উদাহরণ এই দিচ্ছি:—এমনিতর এক স্বামীকে একটা বাক্সে পূরে মাটীতে পুঁতে ফেলা হয়েছিল। ছয়মাস পড়ে তাঁকে খুঁড়ে বার করা হল; তাঁর পূর্ব্বকথিত কতকগুলি প্রক্রিয়া করাতে তিনি আবার বেঁচে উঠ্‌লেন। ভেবে দেখ দেখি, কি তাজ্জব ব্যাপার! একটা লোক তিনদিন মৃতকল্প থেকে আবার বেঁচে উঠেছিল বলে সাড়া ইউরোপে একটা হুলুস্থূল পড়ে গিয়েছিল—তিনদিন পর কবর থেকে উঠেছে, সে যেন কি একটা কি! আর ভারতবর্ষে ছয়মাস পর্য্যন্ত মড়ার মতন থেকে লোক বেঁচে উঠতে পারে—এখন তোমরা যাই বল না কেন। এটা অবশ্য আধ্যাত্মিকতা নয়; কিন্তু শরীর-তত্ত্বের ও মনস্তত্ত্বের এ হচ্ছে কতকগুলি খাঁটী প্রক্রিয়া—একেবারে বিজ্ঞান-ঘেঁষা ক্রিয়া। আজকালকার ডাক্তার সাহেবেরা যদি এ সব তত্ত্বের খোঁজ না রাখেন তো হয়েছে কি?—তাঁদের বিজ্ঞানের পরিধি আরও বাড়াতে হবে। যা আছে, আমরা তারই খবর দিচ্ছি বই তো নয়।

বিধির কথা বলবার আগে প্রতিষেধের কিছু বল্‌বার দরুণ অত্যন্ত ইচ্ছা হচ্ছে। প্রতিষেধের তরফটা হচ্ছে এই। সেদিন এক ভদ্রলোক বললেন, "স্বামীজী, আপনার ওই দর্শন আর ধর্ম্মের বকুনী আর ভাল লাগছে না। কেন, ওসব বস্তা-পচা মাল নয় কি?" শুনলে ভাই, সত্য হল কিনা বস্তাপচা মাল! সত্যের যেন বিকার আর পরিবর্ত্তন সম্ভব! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা ভাই, ইউরোপ আর আমেরিকার এই যে অভ্যুদয়, তার কারণ কি জান? কথাটা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হল এই দরুণ যে, সে বল্‌ল

কিনা যে ধর্ম্মটা একটা বস্তাপচা মাল! আরে বাপু, আমাদের ধর্ম্ম এখনও টাট্‌কা, এখনও জ্যান্ত। এখনও সে ধর্ম্ম বিধির কথাটাই বলে। তোমাদের মত প্রতিষেধের বুলি আওড়ায় না, বলে না যে thou shalt not—তুমি হেন করো না, তেন করো না! আমি বল্‌লাম, আচ্ছা ভাই, আমেরিকার এই অভ্যুদয়ের কারণ কি, আর আমেরিকার ধর্ম্মটা বা কি, তাই পরখ করে দেখা যাক্ না কেন।

আমি বল্‌লাম, তোমাদের ধর্ম্ম তো মাদুলীর মত গলায় পরা চলে। ছেলের গলায় মাদুলী থাকে; যে কাজটা উৎরিয়ে যায়, সেটা হয় মাদুলীর গুণে আর যে কাজটা পণ্ড হয়, সেটা তার নিজের উৎসাহ উদ্যমের অভাবে। তেমনি বল্‌ছি, ভাই সব, বর্ত্তমান ভারত তোমাদের যে সভ্যতার আর অভ্যুদয়ের এত গুণ গাইছে, তার কারণ কিন্তু আর কিছু। তোমাদের খৃষ্টানীতে এ দৌলত হয়নি (আমি বলি ও তো খৃষ্টানী নয়, ও হচ্ছে গির্জ্জানী।) ইতিহাসের তরফ থেকে এটার পরখ হোক। ইতিহাসে কি দেখি? ইউরোপে এই খৃষ্টানী বা গির্জ্জানীর আমদানী হওয়ার পূর্ব্ব থেকেই এমন সব জাতি সে দেশে ছিল, যারা আজকালকার ইউরোপ বা আমেরিকার চেয়ে বেশী সভ্য না হোক তো কম ছিল না। ঈজিপ্টের একটা নিজস্ব সভ্যতা ছিল; চীনেরও ছিল। আজ দেখ্‌ছি কোনও কোনও দিক দিয়ে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান আজও ঈজিপ্ট বা চীনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমান হয়নি। পারস্য, গ্রীস্ ও রোমেরও একটা নিজস্ব সভ্যতা ছিল; ভারতবর্ষের তো কথাই নাই। এই সব দেশ সুসভ্য ছিল, কিন্তু তারা খৃষ্টান ছিল না। সভ্যতা আর লক্ষ্মী-শ্রীর নিদান যদি খৃষ্টানী হয় তো জিজ্ঞাসা করি, এই সব দেশ খৃষ্টানীর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই কি করে সভ্য হল? আবার দেখ, রোম ছিল এক যুগে পৃথিবীর মাঝে সভ্যতায় সবার সেরা; কিন্তু তার পতন হল কিসে? রোমক-সভ্যতার পতনের নিদান কি? খৃষ্টানীর অভ্যুদয়ই হল তার কাল। এ বিষয়ে গিবনের ইতিহাস আলোচনা করে দেখো, কিম্বা কোনও প্রামাণিক ইতিহাসের বই পড়ো। খৃষ্টানীর আমদানীর পূর্ব্বে গ্রীসের লক্ষ্মী-শ্রীর সীমা ছিল না। সেই আগেকার যুগের গ্রীসের সঙ্গে বর্ত্তমান খৃষ্টান গ্রীসের তুলনা করে দেখ দেখি। তাই বলি, ইতিহাস পড়ে দেখ ভাই, ইতিহাস পড়ে দেখ! ইতিহাসের প্রমাণ ছাড়া এ কথা বলবার সাধ্যই নাই তোমার যে আমেরিকা আর ইউরোপের অভ্যুদয়ের হেতু হচ্ছে খৃষ্টানী। ইউরোপে খৃষ্টানী আমদানী হবার পরেও হাজার বছর পর্য্যন্ত ইউরোপ "তমিস্রা যুগের" (Dark Ages) ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সে আঁধারের, সে নিদারুণ কুসংস্কারে আর অজ্ঞানের তুলনা আছে আর জগতে? এই হচ্ছে তোমার ইউরোপে খৃষ্টানী আমদানীর ফল।

কেউ কেউ বলে, "বুঝে দেখ, খৃষ্টানীতে আমাদের কি না হয়েছে! খৃষ্টানীই হচ্ছে জগতের মহাসভ্যতার আদি প্রস্রবণ!" হাঁ সভ্যতার প্রস্রবণই বটে, তা নইলে স্পেনের ইনকুইজিশনের (Inquisition) অমানুষিক অত্যাচার, ডাইনী পোড়ানোর ধুম, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের লাঞ্ছনার এত বাহার? যেখানেই বিজ্ঞান একটু মাথা তুলেছে, অমনি খৃষ্টানী গিয়ে তার টুঁটি চেপে ধরেছে। ব্রুণোকে (Bruno) পুড়িয়ে মারা হল, কেননা তিনি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। খৃষ্টানী বেন জন্সন আর কার্লাইলের কি দুর্দ্দশা করেছিল, জান তো? তাই বলি, ইউরোপ আর আমেরিকার অভ্যুদয়ের আসল কারণটা কি তা ঢুঁড়ে বার করতে হবে।

ভায়া, পাদ্রীর মুগনাড়া আর মরকাম্নির বিভীষিকা তোমাদের বড় করেনি কিন্তু। ষ্টীম-ইঞ্জিনের আগুন, বিদ্যুৎ, ছাপাখানা, রেল, জাহাজ—এই-গুলিতেই না তোমাদের পার্থিব সম্পদ্ আর অভ্যুদয়? ইংলণ্ডের ডাক্তার জনসন্ বলেছিলেন, একটা ছেলে ওই জান্‌লাটা দিয়ে উঁক দিয়ে যদি বলে যে "আমি এই জানালাটা দিয়ে উঁকি দিয়েছিলাম" তো তাকে আচ্ছা করে চাব্‌কে দিতে হয়। তাই আমিও বল্‌ছি, এক কারণে যা ঘটেছে, সেটার ঘাড়ে যদি আর একটা হেতু চাপাও তো তোমাদের কি করা উচিত? তোমাদের পার্থিব অভ্যুদয়ের মূল কারণ হচ্ছে ওই যা বল্‌লাম—ওই সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এই সমস্ত আবিষ্কার তোমাদের গীর্জ্জার পরম শ্রদ্ধাস্পদ পাদ্রী মহোদয়ের দ্বারা হয়নি, তা জান? জেম্‌স্ ৱাট্, জর্জ্জ্ ষ্টিফেন্সন, বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্ক্‌লিন্, টমাস্ এডিসন্ বা এমনিধারা পণ্ডিতদের মাঝে কেউ কি গীর্জ্জার পাদ্রী বা মিশনারী ছিলেন? এঁদের মাঝে কেউ যদি বাইবেলের প্রচারক হতেন তো বল্‌তে পার্‌তাম, তোমাদের পার্থিব সম্পদের মূল হচ্ছে বাইবেলের বাণী। কিন্তু আমরা তো জানি, বিজ্ঞানজগতে পাদ্রীর আবিষ্কার বলতে একমাত্র বারুদের আবিষ্কার। ধর্ম্মপ্রচারকের সুপবিত্র মস্তিষ্ক-সঞ্জাত একমাত্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হচ্ছে ওই!

তবেই দেখছ, তোমাদের উন্নতির হেতু খৃষ্টানীর গোঁড়ামী নয় বা গীর্জ্জাবিহার নয়। আমি বলছি—তা কিছুতেই নয়। আমেরিকা আর ইউরোপের অভ্যুদয়ের হেতু যেমন তার ধর্ম্ম নয়, তেমনি ভারতের অধঃপতনের হেতুও, হিন্দুধর্ম্ম নয়। আমি আবারও বলছি—তোমাদের বা যে কোনও জাতির অভ্যুদয়ের হেতু হচ্ছে তার যথার্থ আধ্যাত্মিকতা; আর যথার্থ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে আচার, বেশভূষা, গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদিকে আমি কখনও ঘুলিয়ে ফেলি না। তাই বলছি, আমেরিকার অভ্যুদয়ের হেতু হচ্ছে তার যথার্থ খাঁটী আধ্যাত্মিকতা। গীর্জ্জাঘর থেকে যতই বেয়াড়া বুলি ঝাড় না কেন, সেই বুলি শুনে যতই মাতামাতি কর না কেন, যথার্থ আধ্যাত্মিকতার মরণ নাই কোনও কালে। ঝুড়ি ঝুড়ি "ইতি কুর্য্যাৎ" আর "ইতি ন কুর্য্যাৎ" তোমায় পেছন-পানে টেনেছে শুধু—আগু বাড়তে দেয়নি তো! কাণ্ট তার নাম দিয়েছিলেন অত্যাবশ্যক শাসন; এগুলো হচ্ছে অনুজ্ঞা-বিভক্তির মধ্যম পুরুষের বচন। এ সব উক্তিতে তোমার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে মাত্র।

যথার্থ আধ্যাত্মিকতার উদ্ভব কোথা হতে? জগতের ইতিহাসে এর স্থান কোথায়? সেই কথা-টাই তোমাদের বলতে চাই। যথার্থ আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে বেদান্ত। জগতের যতগুলি ধর্ম্ম, সব ব্যক্তি-বিশেষের প্রেরণার উপর প্রতিষ্ঠিত। খৃষ্টানীর মূলে আছেন খৃষ্ট, চীনের কন্‌ফুসিয়ানীর মূলে আছেন কন্‌ফুসিয়াস্, বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে আছেন বুদ্ধ, পার্সী ধর্ম্মের মূলে জারাথুস্ত্র, মুসলমান ধর্ম্মের মূলে মহম্মদ। বেদান্ত শব্দের অর্থ হচ্ছে বেদের বা জ্ঞানের অন্ত অর্থাৎ এ হচ্ছে আত্মার বিজ্ঞান। ধাতুবিদ্যার এক-খানা বই পড়তে যে রকম মনোবৃত্তি নিয়ে তোমরা অগ্রসর হও, বেদান্ত পড়তেও তাই দরকার হয়। ধাতুবিদ্যার বই পড়বার সময় লাভোয়াজিয়ে, বয়্‌ল্, রেনল্‌ড্ বা বা ডেভীকে মাথায় তুলে নাচ না তো! ধাতুবিদ্যার বই পড়বার সময় সব তুমি নিজে বিশ্লেষণ করে দেখ, পড়, বোঝ। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে যে জল হয়, এ আমি নিজে পরখ করে জানি, কারু হুকুম শুনে মেনে নিই না। জলে বিদ্যুতের ধাক্কা দিলেই তা জান্‌তে পারি। তেমনি যে ধর্ম্ম পরের মুখের কথার উপর দাঁড়িয়ে, সে তো ধর্ম্মই নয়। তাই সত্য, যা তোমার নিজের অনু-ভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তোমার সঙ্গে এই বোঝা-পড়া করে তারপর তোমাকে গণ্ডায় গণ্ডায় কেতাব দিতে পারি। যত খুসী পড়, হজম কর। বেদান্ত

বল্‌তে আমি ঠিক এই ভাবটা বুঝি। আমি এমন বল্‌ছি না যে বেদান্তের পায়েই মাত্রা খোঁড় ; কাউকে কল্‌মা পড়াতে চাই না। তবে বেদান্ত শব্দটার অর্থটা তোমাদের বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে তারপর আমি বল্‌ছি, এই বেদান্ত বিশাল হিমাচলের বক্ষ হতে নেমে এসেছে। হিমাচল হতে যেমন বহু খরস্রোতা বিশাল-কায়া নদীর উদ্ভব, তেমনি জগতের অধ্যাত্মশক্তির ধারাও ওখান থেকেই উৎসারিত হয়েছে। তোমাদের দেশের প্রাচ্য বিদ্যার্ণবেরা বলেন, এ সব বই নাকি খৃষ্ট জন্মাবার চার হাজার বছর আগে লেখা হয়েছিল। এই সব পণ্ডিতেরা বেদান্তের আদি খুঁজছেন বটে, কিন্তু মূলে এই একটা কুসংস্কার তাঁরা আঁকড়ে ধরে আছেন যে খৃষ্ট জন্মাবার চার হাজার বছর আগে এই পৃথিবীটার সৃষ্টি! কিন্তু আমি বেদ পড়েছি ; অন্তরঙ্গ প্রমাণ উদ্ধার করে আমি দেখাতে পারি যে এই সব পণ্ডিতেরা কতখানি ভ্রান্ত। আমি একটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উচ্চাঙ্গ গণিতের অধ্যাপক ছিলাম। আমি Dynamics, Analitical Hydro Statics, Astronomy, Trigonometry সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা দিয়েছি ; বেদ পড়ার সময় সেই যুগে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্বন্ধে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করতে পেরেছি। কালপুরুষ প্রভৃতি নক্ষত্রপুঞ্জের সেই যুগে আকাশে অবস্থান সম্বন্ধে বেদে অনেক কথাই আছে। ওই সমস্ত ধরে গণিতের বিচারে আভ্যন্তরীণ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহকারে আমি তোমাদের দেখাতে পারি, বেদের অন্ততঃ কিছুটা খৃষ্ট জন্মাবার ৮০০০ বছর আগেকার রচনা। একটা পটের ওপর দেওয়া দুটো আঁচড়কেই প্রমাণ বল্‌বো, না ভগবান যে নক্ষত্রের অক্ষত্রের অক্ষরে অভ্রান্ত গণিতের প্রমাণ লিখে রেখেছেন, তাকেই মানব? বিষয়টা অতি জটিল ও বিস্তৃত ; তবে এই অল্প সময়ের মাঝে আমি তোমাদের মোটামুটী কয়েকটা কথা বল্‌তে পারি, সমস্তটা ব্যাপারের বড় বড় দফাগুলি মাত্র তোমাদের দেখাতে পারি।

(ক্রমশঃ)

—*—

শ্রেয়ঃপথ

—(::)—

প্রশ্ন হইল, মানুষের জীবনের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি? প্রশ্নটী অতি প্রাচীন, কিন্তু যুগে যুগে মানুষ ইহার নূতন নূতন উত্তর দিয়া আসিয়াছে। এই সমস্ত উত্তরের মাঝে যাহারা পরলোকবিশ্বাসী, তাহাদের উত্তরগুলিকে এক কোঠায় ফেলা যাইতে পারে, আর যাহারা পরকাল বলিয়া কিছু স্বীকার করে না, তাহাদের উত্তরগুলিও মূলতঃ আর এক শ্রেণীর। পাশ্চাত্য-দর্শনেও এই প্রশ্নের উত্তর লইয়া বিপাকের অন্ত নাই। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত উত্তর মুখ্যতঃ নাস্তিকবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই বাদ এমনি প্রচ্ছন্ন শোভন আকারে উপস্থাপিত করা হইয়াছে যে ইহাতে আমাদের বুদ্ধি কোথায়ও দ্বিধা করিবার অবসর পায় না। পাশ্চাত্য নাস্তিক-বাদের বিশেষত্বই হইতেছে, যাহা কিছু দৃষ্ট অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, অতিশয় প্রবলতার সহিত তাহার অস্তিত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হওয়া। আস্তিক্য-বাদীর ইহাতে বিশেষ কিছু আপত্তি ছিল না। কিন্তু যখনই এই নাস্তিক্য-

বাদ দৃষ্টকে অতিক্রম করিয়া অদৃষ্টের রাজ্যেও হানা দিতে সুরু করে, তখনই আস্তিক্যবাদীর মাস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠে। মনে হয়, আমাদের জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক আমাদের মনোবৃত্তি ক্রমশঃ নাস্তিকতার দিকেই ঢলিয়া পড়িতেছে।

এতগুলি কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, মানুষের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে ভাগবত যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার মাঝে প্রসঙ্গ-ক্রমে নাস্তিকবাদেরও সমালোচনা আছে। প্রেয়ো-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় নাস্তিক ও আস্তিক উভয় পক্ষের কথাগুলি তলাইয়া দেখিবার একটা প্রয়োজন রহিয়াছে।

শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে যে বিবাদকে আমরা নাস্তিক ও আস্তিক মতের দ্বন্দ্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, শ্রীধর তাহাকেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-ধর্ম্ম বলিয়াছেন। নাস্তিকের ধর্ম্ম মুখ্যতঃ প্রবৃত্তির ধর্ম্ম; আর আস্তিকের ধর্ম্ম নিবৃত্তির ধর্ম্ম। অবশ্য প্রবৃত্তিধর্ম্ম নাস্তিকের ধর্ম্মের চেয়েও ব্যাপক, কেননা সে ধর্ম পরকাল স্বীকার করে; কিন্তু তথাপি আমাদের দেশের আচার্য্যেরা এই পরকালবাদী নাস্তিকদের "আত্মহা" বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। আস্তিকতাও ও নাস্তিকতার মূলও আমাদের মতে সেইখানেই।

দুইটী কথা হয়। একদল বলেন, ধর্ম্মের চরম ইন্দ্রিয়প্রীতি। মনে রাখিতে হইবে, মনও একটা ইন্দ্রিয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়প্রীতি বলিতে মনোগ্রাহ্য প্রসাদকেও বুঝিতে হইবে। এই বিচারে পাশ্চাত্য Ethicsএর চরম পরিণতি যে Perfectionism, তাহাও ভাগবতোক্ত ইন্দ্রিয়প্রীতিরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ভাগবত-ধর্ম্মও Perfect জীবনই চাহিতেছে বটে, কিন্তু প্রাচী এবং প্রতীচী পূর্ণতার আদর্শ স্বতন্ত্র। Eaudomonist যাহাকে অস্তি বলিয়া পূর্ণতা খুঁজিতেছে, ভাগবত তাহাকে বলিতেছেন নাস্তি। তাই অমন গালভরা পূর্ণতাবাদের মাঝেও আমরা পাই নাস্তিকতার গন্ধ। আমাদের দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সমস্ত দৃষ্ট সত্তাকে স্বীকার করিয়া, তাহাদের সহায় লইয়া পূর্ণতার যে আদর্শ, তাহার মাঝে যত মধুই থাক্ না কেন, মূলতঃ তাহারা কিন্তু আত্মার স্বারাজ্যকে অস্বীকার করিয়াই চলিয়াছে। নির্ব্বিশেষ নিগুর্ণ আত্মস্বরূপ বলিতে, মোক্ষ বলিতে, নিরালম্ব বলিতে কি বোঝায়, তাহা পাশ্চাত্য ফিলসফি আমাদের বুঝাইয়া দিতে পারিবে কি? এই ইন্দ্রিয়ারাম জগৎ হইতে চেতনাকে পিছু হটাইয়া লইয়া দিয়াও মানুষ যে সুস্থ বা স্বাভাবিক থাকিতে পারে, একথা পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্বীকার করিবে কি? নিরালম্বনের উপর যে সত্তার ধ্রুব প্রতিষ্ঠা হইল না, তাহাকে অস্তি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রাচ্য মরমীর বাধে বলিয়াই সে বলে, ওই সর্ব্বশোভাসম্পন্ন পূর্ণতাবাদও নাস্তিকতা-দোষদুষ্ট।

প্রাচী বলিতেছে—নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মই শ্রেয়ঃ। এই শ্রেয়ের চরম মোক্ষ। মোক্ষ অস্তিত্বের বিনাশ, উপাধির নাশে অস্তিত্বের পূর্ণতা। এ বস্তুটী কি, তাহা যদি মন-বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে ঝগড়া করিবার কিছুই থাকিত না। কিন্তু যাহা মনবুদ্ধির অগোচর বলিয়া গোড়া হইতে বলিয়া আসিতেছি, মনবুদ্ধির এলাকায় তাহাকে নামাইয়া আনিবার উপায় কি? অথচ তাহা যে নাই, এমন কথা যদি তুমি বল তো তোমাকেই আমি বলিব নাস্তিক। মনবুদ্ধি মরিয়া গিয়া যে অস্তিত্বের পূর্ণতার সন্ধান দিয়া যায়, তাহাই আস্তিক্যবাদের প্রাণ। ফুল মরিয়া ফলকে জাগাইয়া যায়; যে পূর্ণ, সে এই বিনাশের মাঝেই দেখে ফুলের সার্থকতা। প্রাচীর আস্তিক্যবাদ এমনি করিয়া জগৎকে মহাশূন্যে মিলাইয়া দিয়া মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারকে নিঃস্ব করিয়া এক ইন্দ্রিয়াতীত প্রজ্ঞানঘন সত্তার মাঝে আপনাকে পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। এই পরিপূর্ণ সত্তার চেতনা জগতের প্রলয়েও বর্ত্তমান বলিয়া প্রাচী

মোক্ষকে, নিবৃত্তিকে পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া অকুণ্ঠিতকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে।

ভাগবত বলেন, প্রবৃত্তি পরিচারিত নাস্তিক্যবাদের দ্বারা এইরূপ:—অপবর্জ্জন বা ত্যাগ বা মোক্ষের অভিমুখী যে প্রচেষ্টা, তাহা কিন্তু ধর্ম্ম নয়। যাহা অর্থের সংযোগ ঘটায়, বহু উপকরণে জীবনকে জাঁকাইয়া তোলে, তাহাই ধর্ম্ম—ধর্ম্মস্য অর্থঃ ফলং। উপকরণের পরিণাম ভোগ; ভোগই যদি না করিলাম তো অর্থ জোটাইলাম কেন?—অর্থস্য কামঃ ফলম্। আর এই ভোগের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনের প্রীতি; ইহাই তো জীবনে খুশীর রূপ।—কামস্য ইন্দ্রিয়প্রীতিঃ ফলম্। আবার এই ইন্দ্রিয়প্রীতি যে চিত্তের প্রসাদ, তাহাই আবার নিয়া আসে ধর্ম্ম বা প্রবৃত্ত্যভিমুখী চোদনা—Potentiality of Desires। এমনি করিয়া বৃত্তাকারে আবর্ত্তিত হইয়া জীবন কোনও অনির্দ্দেশ্য সার্থকতার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে! চার্ব্বাকের চারু বাণীর ইহাই তাৎপর্য্য। ইহাই যথার্থ নাস্তিক্যধর্ম্ম—Perfectionismর ছদ্ম রূপ।

ভাগবত ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—

> ধর্ম্মস্য হ্যপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
> নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
> কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো, জীবেত যাবতা।
> জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা, নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥

—ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য অপবর্গ বা মুক্তি। সুতরাং অর্থসঞ্চয় বা উপকরণ সংগ্রহে তাহার সার্থকতা কোথায়? (তবে কিছু-না-কিছু উপকরণ সকলকেই সংগ্রহ করিতে হয়; কিন্তু সে সংগ্রহ ব্যাপারে যেন মত্ততা না আসে, যেন লক্ষ্য থাকে—আমার অর্থচিন্তা মোক্ষলক্ষ্যের বিরোধী না হয়)। অর্থ যদি এইরূপে একান্তভাবে নিবৃত্তিধর্ম্মকেই আঁকড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কামভোগই যে তাহার চরম হইবে, এ কথা তো বলিতে পারি না। (এবং এই যুক্তিধারা অনুসরণ করিয়াই বলিতে হয়,) ভোগের লক্ষ্যও ইন্দ্রিয়প্রীতি নয়, কেবলমাত্র যতটুকু ভোগ স্বীকার করিলে শুধু বাঁচিয়া থাকা চলে, ততটুকু ভোগই চাই, তার বেশী নয়। (কিন্তু কামভোগহীন, ইন্দ্রিয়প্রীতির অনুশীলনহীন হইয়া বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা কোথায়?) জীবনের সার্থকতা তত্ত্বজিজ্ঞাসায়,—কর্ম্মচক্রের আবর্ত্তনে উদ্গীর্ণ নিরঙ্কুশ সুখকল্পনার পেছনে ছুটাছুটীতে নয়।

ভোগ-প্রমত্ত জীবের কাণে এই উক্তি বড় কঠোর, বড় কর্কশ শুনাইবে। কিন্তু রোগী তিক্ত ঔষধ খাইতে না চাহিলেও বৈদ্য তো আর তাঁহার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে চাহিবেন না! শাশ্বতী শান্তি যে চায়, তাহাকে নিবৃত্তির পথ ধরিতেই হইবে। আমার কথায় নয়, শুধু তোমার প্রকৃতির মাঝেই যে নিবৃত্ত্যভিমুখী প্রেরণা আছে, তাহা একদিন এই জগৎজোড়া ইন্দ্রিয়বিমোহন রূপরসের মেলা হইতে তোমাকে বিবিক্ত করিয়া মহাশূন্যের পিপাসায় দেওয়ানা করিয়া ছুটাইবে যে! চিরটা কাল মাটী আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছ, একবার আকাশের পানে চাহিয়া দেখিয়াছ কি? কেবল লতার আঁকড়ির মত অবলম্বন ধরিয়া সুখের সন্ধান করিয়াছ, নিরালম্বন আনন্দের আস্বাদ কখনও পাইয়াছ কি? আজ পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে ভার্য্যা হইতে, খ্যাতি হইতে সুখ আহরণ করিতেছ; এই সমস্ত আলম্বনের একটাও যদি না থাকে, মহাশূন্যের বিরাট একাকিত্বের মাঝে নিজকে ভাসাইয়া সুখাস্বাদনের মাদকতা যে কি, তাহা অনুভব করিয়াছ কি? যদি না করিয়া থাক তো মিছামিছি পূর্ণতার জাঁক করিতেছ কেন? বসুন্ধরাই শুধু বীরভোগ্যা নয়, মহাশূন্যও বীরের ভোগ্য, বীর হও তো তুল্যভাবে দুটীকেই যাচাই করিয়া লও! শুধু একটীকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আর একটীকে নাকি-সুরে

গালি-গালাজ করা কেবল কাপুরুষতা নয়, মূঢ়তাও বটে।

কিন্তু এই সঙ্গে আর একটা কথাও বলি। অদ্বয়-তত্ত্বই জীবনের পরম লক্ষ্য বটে এবং প্রাকৃত-জীবনের সহিত তাহার বিরোধ দেখাইবার দরুণ তাহাকে নিবৃত্তিরূপে, শূন্যরূপে চিত্রিত করিতেছি বটে, কিন্তু বাস্তবিক সে তো শূন্য নয়। সংসারের সমস্ত রস তাহা হইতে নিঙরাইয়া বাহির করিয়া দিলাম বলিয়া সে তো নীরস নয়। সে যে পরিপূর্ণ রস-স্বরূপ। সেই পূর্ণ রসকে পাওয়ার দরুণই এখানকার রসাভাস বর্জ্জনের সাধনা। বর্জ্জনে যে রিক্ততা, তাহা পূর্ণতার অঙ্গীকার। আর সে পূর্ণতার আভাস আমরা পাইব, সেই কোন এক অনাগত যুগে এমন তো নয়। ভাগবত দর্শনই এই, যতটুকু ছাড়িবে সঙ্গে সঙ্গে ততটুকুই পাইবে, আর সে পাওয়ায় সুখ-দুঃখের অতীত অনাহত আনন্দ আপনা হইতে ছলকিয়া উঠিবে তোমার মাঝে! নিবৃত্তি আর মোক্ষের চিত্রে যা কিছু বন্ধুর, তা এই আনন্দের জ্যোতিঃতে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে।

এইজন্য পরম শ্রেয়ঃ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভাগবত কেবল নেতিমূলক বর্জ্জন সাধনাকেই বড় করিয়া দেখাইলেন না, সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন আত্ম-প্রসাদের কথা। বলিলেন—

> স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
> অহৈতুক্যপ্রতিহতা চ যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

—সেই হইতেছে মানুষের পরম ধর্ম্ম, যাহা নাকি অধোক্ষজের প্রতি তাহার ভক্তি বা অন্তরের টান; সে টান অহৈতুকী, সে টানকে কেহ দাবাইয়া রাখিতে পারে না; আর এই ভক্তিতেই মানুষ সম্যক্‌রূপে আত্মপ্রসাদ পায়, তৃপ্ত হয়!

"অধোক্ষজ" শব্দটী লক্ষ্য কর। প্রাণের টান একটা নেতি-মূলক কিছু নয়, চিত্তসত্ত্বের সহজ-স্ফুরণ, আনন্দের স্নিগ্ধ দ্যুতি; কিন্তু সেই টান যাঁহার উপর পড়িয়াছে, তিনি অধোক্ষজ অর্থাৎ আমার অক্ষ বা ইন্দ্রিয়-সমূহ যখন অধঃকৃত হয়, তখনই জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্রিয়বৃত্তি অধঃকৃত হইলেই আনন্দের প্রকাশ; আর সেই আনন্দের মাঝে ফুটিয়া উঠিলেন, ভগবান্। ইহাই তো নন্দগৃহে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ। অতএব পরোধর্ম্ম একটা পজিটিভ কিছু বটে; কিন্তু জগতের তরফ হইতে বিচার করিলে তাহার মূল রহিয়াছে নেতিতে। এই-রূপে জগৎ-নাস্তিত্বকে ভিত্তি করিয়াই ভাগবতদর্শনে আস্তিক্যবাদের বিরাট্ সৌধ রচিত হইয়াছে। ইহাই ভারতীয় মোক্ষদর্শন; এ দর্শন Pessimism বা দুঃখবাদ নয়, ইহা আত্মার সম্যক্ প্রসাদ—Perfect bliss of the self!

ভাগবত বলিতেছেন—ইহাই শ্রেয়ঃ; ইহা ছাড়া আর কিছুর পেছনে যদি ঘুরিয়া মর তো বুঝিব মিছামিছি আলেয়ার পেছনে ছুটাছুটি করিতেছ! এই যে পরো ধর্ম্মঃ, ইহার আবার মুখ্য ও গৌণ ব্যবহার রহিয়াছে। ইহাদ্বারা শুধু তোমার লক্ষ্যই নয়, গতিও নিরূপিত হইবে। পরম ধর্ম্ম তোমার লক্ষ্য, স্বনুষ্ঠিত ধর্ম্ম তোমার গতি। ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে অনুষ্ঠানসমূহ লক্ষ্যের অনুকূল হইতেছে কি না। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যদি আত্মপ্রসাদ লাভ না হয় এবং সেই আত্মপ্রসাদ ভগবানে রতি না আনিয়া দেয়, তবে ধর্ম্ম পণ্ডশ্রম মাত্র।

অনুষ্ঠান সপ্রয়োজন। কিন্তু অনুষ্ঠান পাথেয়মাত্র, উহা কখনই লক্ষ্য নয়। অনুষ্ঠানদ্বারা যাহা পাইতে হয়, তাহা অবশ্যই কৃত্রিম। উহাতে আত্মা কখনো নিরালম্ব অবস্থার আনন্দ আস্বাদন করিতে পারেন না। বহু বিচিত্র অনুষ্ঠানে যদি জীবন জড়াইয়া যায়—এখন সে অনুষ্ঠান প্রাচ্যই হউক আর প্রতীচ্যই হউক, শাস্ত্রীয়ই হউক আর অশাস্ত্রীয়ই হউক, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। পরমধর্ম্মের বিন্দুমাত্র আভাস না পাইয়া যে ব্যক্তি

গতানুগতিক ন্যায়ে আশী বছর বয়স পর্য্যন্ত মালা ঠক্ ঠক্ করিয়াছে বা কোশাকুশী ঠং ঠং করিয়াছে, আর যে ব্যক্তি মটর হাঁকাইয়াছে বা বিলিয়ার্ড খেলিয়াছে, উভয়ের মাঝে বড় বেশী তফাৎ নাই। অনুষ্ঠানের জালে উভয়েই জড়িত, উভয়েই তুল্যভাবে কৃপার পাত্র।

অনুষ্ঠানদ্বারাই কিছু হউক, এ চাই না। চাই স্বভাবের স্ফূর্ত্তি। চাই আত্মার তৃপ্তি। জুড়িগাড়ী হাঁকাইয়া বাড়ী আসিয়াছি; তা বলিয়া আজ ঘোড়া দুইটাকে আমার শয়ন কক্ষে নিয়া বাঁধিয়া রাখি না, তাহাদের আস্তাবলে রাখিয়া দিই। সহজকে পাইবার দরুণই কঠিন সাধনা। ধর্ম্মের গৌণ ও মুখ্য ব্যবহারে এইটুকু তফাৎ। এমন জিনিষ চাই, যাহা অহেতুক। বলিতে পারি না যে এত গণ্ডা মালা জপিয়া পাইয়াছি, বা এত ঘণ্টা চোখ উল্টাইয়া প্রাণায়াম করিয়া এ বস্তু মিলিয়াছে। মাধবীর সুবাসে বায়ুমণ্ডল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে; ইহার আর কোনও হেতু নাই—এ মাধবীরই ধর্ম্ম, মধু ঋতুর ধর্ম্ম। মাধবী কি আর মাধবীর সুবাস না ছড়াইয়া রশুনের গন্ধ ছাড়িবে? যাহার যাহা স্বভাব। ভক্তি সবারই স্বভাব, আর স্বভাব অপ্রতিহত। ভক্তি আত্মপ্রসাদ, ভক্তি সুখস্বরূপ। আত্মপ্রসাদ চাই, খুশীতে ভরপুর থাকিতে চাই, সে খুসী নিরালম্বন; তুমি রাজমুকুট মাথায় তুলিয়া দাও বা জুতার মালা গলায় দোলাইয়া দাও, আমি তার মুখ মনে করিয়া আনন্দে আত্মহারা; আমার খুসীকে কেহ ছাপাইয়া উঠিতে পারে না, চাপিয়াও রাখিতে পারে না।

এটী কেমন করিয়া পাওয়া যায়, তাহা কিন্তু বলা যায় না। অবশ্য পথ একটা আছে; কিন্তু কর্ম্মের মারপ্যাচ এমনই যে ঠিক সে পথটীতে পা লক্ষের মাঝে একজনেরও পড়ে কিনা সন্দেহ। খাঁচার পাখী পোরা আছে; দুয়ারও খোলা; পাখীটা ছট্‌ফট্ করিয়া বারবার শিকের ফাঁকেই ঢুঁ দিতেছে, কিন্তু দুয়ারটাকে বরাবর এড়াইয়া যাইতেছে। এমনটী হয়, মুমুক্ষু সাধকেরও হয়। তবে প্রবৃত্তির পথে থাকিতে ওই ছট্‌ফটানীটুকুও যে আসে না। যখন বৈরাগ্যের উন্মেষ হইল, তখনই বুঝিতে হইবে, এরপর ভাটার টান পড়িতেছে। কিন্তু তার পরেও বুদ্ধি স্থির করিতে অনেক সময় যায়। নিবৃত্তির পথে পা পড়িতেই সব কিছু হইয়া যায় না। এইজন্য জ্ঞানী বলেন, আত্ম-সমাধানের কথা—নাশান্তঃ নাসমাহিতঃ—যে অশান্ত সেও পায় না। ভক্ত বলেন, আত্ম-সমর্পণের কথা; শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্—তোমাকে আঁকড়াইয়া ধরিলাম, সোজা কথায় না হয় তো ঠেঙ্গাইয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও। এইগুলি হইল পথের নিশানা।

তাহা হইলে শেষের কথা হইল এই—ইন্দ্রিয়প্রীতির পথে যে ধর্ম্ম, তাহা অনুসরণ করিব না। জীবনের লক্ষ্য—তত্ত্ব জিজ্ঞাসা; পথ—নিবৃত্তি; প্রাপ্তি—ভক্তি বা আত্মপ্রসাদ। ইহার দরুণ জগৎকে নস্যাৎ করিতে হয় তো করিব। এই নেতির উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের আস্তিক্য-দর্শন।



অনুরাগে

——(:*:)——

অরুণ-রাগে রাঙ্গা জগৎ, অনুরাগে ধূলি
ফাগুয়া হয়ে উড়্‌ছে যে ঐ তাইত রে আজ হোলি!
তরুণ প্রাণের পরশ পেয়ে তরুণ ঋতুরাজ—
পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দেছে রং-বেরংএর সাজ!
চিত্তকমল ফুট্‌ল রে অই মধুর সকল দিশ্‌;—
বঁধুর পরশ মিল্‌ল রে তাই স্ফূর্ত্তি অহর্নিশ!
দেখ্‌ ভ্রমরার প্রাণ উজলা ফুট্‌ল বুঝি ফুল—
দখিন্‌ হাওয়া চুপে চুপে বোঁটায় দিল তুল্‌;—
লাজের বাঁধন খুল্‌ল কি তাই মুচ্‌কি হাসিটুক্‌,—
ঈর্ষ্যাভরে কোকিলা তাই জানায় কি তার দুখ্‌!
চ্যুত-মুকুলের আর বকুলের, নাগকেশরের বাস,
গোলাপ চাঁপা আর অশোকে জাগায় কাহার আশ?
এমন দিনে মনে পড়ে কার সে অনুরাগ?—
রঙ্গিয়ে দিল চিত্ত এসে মাখিয়ে দিল ফাগ্‌!

মীরাবাঈ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

—*—

রাণা মীরাকে বিষপান করাইয়াছে, কিন্তু মীরার চিত্ত নির্ব্বিকার। প্রশান্ত স্বরে মীরা রাণাকে বলিতেছেন—

রাণাজী তৈঁ জহর দিয়ো মৈঁ জানী।
জৈসে কঞ্চন দহত অগিন মেঁ
নিকসত বারাবাণী॥
লোকলাজ কুল কাণ জগৎকী
দই বহায় জস পাণী॥
অপনে ঘর কা পরদা করলে
মৈঁ অবলা বৌরাণী॥

—রাণা, আমি জানি, তুমি আমাকে বিষ দিয়াছিলে। (কিন্তু বিষে আমার কিছুই তো হইল না); যেমন আগুণে সোণা পুড়িলে তাহার খাদ বাহির হইয়া যায়, (তেমনি আমার খাদ বাহির হইয়া গেল মাত্র)। লোক-লাজ, কুল-মানের সমীহের কথা তুমি আর কি বলিতেছ? জল যেমন বহিয়া যায়, ও সব আমার তেমনি ভাসিয়া গিয়াছে। তুমি নিজের ঘরের আব্রু রাখিয়া চল, আমি তো প্রেমোন্মাদিনী অবলা মাত্র!

কুলবধূ মীরা, কিন্তু তার এ কি ব্যবহার! রাণা তো কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মীরা মধুর হাসিয়া রাণাকে বলিতেছেন,—

রাণাজী মৈঁ সাঁবরে রঙ্গ রাচী॥
সাজ সিঁগার বাঁধ পগ ঘুঁঘরা
লোকলাজ তজ নাচী॥

—রাণাজী, আমি সেই সাঁবরিয়ার প্রেমে মজিয়াছি; তাই আমার আজ এই বেশভূষা, পায়ে বাঁধিয়াছি ঘুঙুর, আর লোকলজ্জা ছাড়িয়া নাচিয়া বেড়াইতেছি।

তুমি না হয়, শ্যাম-প্রেমে মত্ত হইয়া আছ, কিন্তু লোকে তোমার এই চলানি বরদাস্ত করিবে কেন? তাহারা তোমাকে যে ছিঃ ছিঃ করিতেছে; তাহাদের ধিক্কার শুনিয়া আমাদেরও যে লাজে মাথা হেঁট হইয়া গেল! মীরা মুচ্‌কি হাসিয়া উত্তর করিলেন—

রাণাজী মুঝে যহ বদনামী লগে মীঠী।
কোঈ নিন্দো কোঈ বিন্দো
মৈঁ চলুঁগী চাল অপুঠী॥

—রাণাজী, আমার এই বদ্‌নামী ভারি মিষ্টি লাগে কিন্তু। যার খুসী সে নিন্দা করুক, যার খুসী সে বন্দনা করুক, আমি কিন্তু এই উণ্টা চালেই চলিব।

মীরার এই উণ্টা চাল কেমন? মীরা নিজেই বলিতেছেন—

মীরা লাগো রঙ্গ হরী
ঔরন সব রঙ্গ অটক পরী॥
চুড়ো ম্হাঁরে তিলক অরু মালা,
সীল বরত সিংগারো।
ঔর সিঁগার ম্হাঁরে দায় ন আবে
যে গুরু জ্ঞান হমারো॥
কোঈ নিন্দো, কোঈ বিন্দো মৈঁ তো
গুণ গোবিন্দকা গাস্যাঁ।
জিন মারগ ম্হাঁরা সাধ পধারে
উন মারগ মৈঁ জাস্যাঁ॥
চোরি ন করস্যাঁ জিব ন সতাস্যাঁ
কাঁই করসী ম্হাঁরো কোর
গজ সে উতর কে খর নাহিঁ চঢ়স্যাঁ
যে তো বাত ন হোয়॥
সতী ন হোস্যাঁ গিরধর গাস্যাঁ
ম্হাঁরা মন মোহ্যো ঘণনামী।
জেঠ বহু কো নাতো ন রাণাজী
হুঁ সেবক থেঁ স্বামী॥
গিরধর কন্থ গিরধর ধান ম্হাঁরে
মাত পিতা বোই ভাঈ।
থেঁ থাঁরে ম্হাঁরে রাণাজী
যুঁ কহে মীরাবাঈ॥

—মীরা শ্যামল রঙে ছুপিয়া উঠিয়াছে, সে রঙের উপর আর কোনও রঙ জমিল না। এখন তিলক-মালাই আমার রাণীর মুকুট, শীলব্রতই আমার ভূষণ। গুরু আমাকে যে জ্ঞান দিয়াছেন, তাহা ছাড়া আর কোনও সজ্জার প্রতি আমার তো অনুরাগ নাই। যার খুসী সে মন্দ বলুক, যার খুসী ভাল বলুক, আমি তো গোবিন্দের গুণ গাইবই। যে পথে চলা আমার খুসী, আমি সেই পথেই যাইব। আমি তো চুরীও করিব না, মানুষকেও ঠকাইব না; তবে কে আমার কি করিবে? আর এমন কথা তো কেহ বলিতে পারিবে না যে মীরা হাতীর পিঠ হইতে নামিয়া গাধায় চাপিয়া বসিয়াছে! আমি তোমাদের বিচারে সতী হইতে চাহি না, যে আমার মন ভুলাইয়াছে, সেই গিরিধরেরই আমি গুণগান করিব। রাণা, আমি তোমাদের জ্যেষ্ঠা বধূ, এই সম্বন্ধ তো আর আমাদের মাঝে নাই; আমি প্রজা, তুমি রাজা, এই মাত্র আমাদের সম্পর্ক। এখন গিরিধরই আমার স্বামী, সেই আমার পিতা মাতা ভাই সব। আমি বলি কি রাণা—তুমি তোমার পথে যাও, আমিও আমার পথে যাই!

গিরিধারী যে মীরার কতখানি, তাই বুঝিয়া উঠিবার সাধ্য রাণার নাই। তবুও শেষবার মীরা তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেছেন—

রাণাজী মৈঁ গিরধর রে ঘর জাউঁ।
গিরধর ম্হাঁরো সাচো প্রীতম
দেখত রূপ লুভাউঁ॥

রৈ ন পড়ে তব হী উঠ জাউ
ভোর ভয়ে উঠ আউ ॥
রৈ ন দিনা বা কে সঙ্গ খেলূ
জোঁ রীঝে জোঁ রীঝাউঁ ॥
জো বস্ত্র পহিরাবে সোঈ পহিরূঁ
জো দে সোঈ খাউঁ ।
মেরে উনকে প্রীত পুরাণী
উন বিনে পল ন রহাউঁ ।
জহঁ বৈঠারে জিত হী বৈঠূঁ
বেচে তৌ বিক জাউঁ ।
জন মীরা গিরধর কে উপরু
বারবার বল জাউঁ ॥

—জান রাণা, আমি কোথায় যাই? আমি যাই গিরিধরের ঘরে। সেই যে আমার সত্যিকার বঁধু, তার রূপ দেখিয়া আমার কি যে লোভ হয়! যখনি রাত্রের অন্ধকার নামিয়া আসে, তখনই আমি তাহার কাছে যাই, আবার ভোর হইতেই উঠিয়া আসি। দিন-রাত তাহারই সঙ্গে খেলা করি, যা করিলে সে খুশী হয়, তাই করি। যে কাপড় সে পরিতে দেয়, তাই পরি; যা খাইতে দেয়, তাই খাই। তার সঙ্গে যে আমার সেই কত দিনের প্রীতি, তাহাকে ছাড়িয়া এক পলও কি থাকিতে পারি? সে আমায় যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকি; আজ যদি সে আমায় বেচিয়া ফেলে তো হাসিমুখে বিকাইয়া যাইব। মীরা যে গিরিধরের দরুণ বারবার পুড়িয়া মরিতেও রাজী!

মীরার প্রতি রাণা বিক্রমাদিত্যের এই অত্যাচারের কথা মেড়তারাজ বীরমদেবের কাণে উঠিল। পাঠক জানেন, মীরা বীরমদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী। বীরমদেব মীরার কষ্টের কথা শুনিয়া তাঁহাকে মেড়তায় নিজের কাছে আনিয়া পরম যত্ন ও সম্মানের সহিত রাখিয়া দিলেন। মীরাবাই চিতোর ছাড়িবার পরেই চিতোরে নানা অনর্থ ঘটিতে থাকে। গুজরাতের সুলতান বাহাদুর সাহ দুইবার চিতোর আক্রমণ করিয়া উহাকে বিধ্বস্তপ্রায় করিয়া ফেলেন। ইহার উপর মহারাণা রায়মল্লের পুত্র রাজকুমার পৃথ্বিরাজের জারজ-পুত্র বণবীর রাণা বিক্রমাদিত্যকে হত্যা করিয়া নিজেই মেবাড়ের রাজ-সিংহাসন দখল করিয়া বসে। এদিকে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে জোধপুরের রাও মালদেবজী বীরমদেবজীর নিকট হইতে মেড়তা-রাজ্য কাড়িয়া লন। এইরূপে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয়ত্রই নানা বিপত্তি দেখিয়া মীরার মন সংসারের প্রতি আরও বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। বাস্তবিক, সংসারে এখন তাঁহাকে আশ্রয় দিবারও কেহ রহিল না দেখিয়া মীরা তীর্থ-পর্য্যটনের সঙ্কল্প করিলেন।

কেহ কেহ বলেন, মীরার এই তীর্থভ্রমণের সঙ্কল্পের মূলে গোস্বামী তুলসীদাসেরও প্রেরণা ছিল। মেড়তায় পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে নাকি মীরা শ্বশুরকুলের অত্যাচারকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া একটী শব্দ দূতদ্বারা তুলসীদাসের কাছে পাঠাইয়া দেন এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করেন। মীরার সেই শব্দটী এই—

শ্রীতুলসী সুখনিধান, দুখহরণ গুসাঈ।
বারহিং বার প্রণাম করূঁ, অব হরো শোক সমুদাঈ ॥
ঘর কে স্বজন হমারে জেতে
সবন উপাধি বঢ়াঈ।
সাধুসঙ্গ অরু ভজন করত
মোহিঁ দেত কলেস মহাঈ ॥
বালপনে তেঁ মীরা কীন্হী
গিরিধর লাল মিতাঈ।
সো তৌ অব ছুটত নহীঁ ক্যোঁ হূঁ
লগী লগন বরিয়াঈ।
মেরে মাত পিতা কে সম হো
হরি ভক্তন সুখদাঈ।
হম কো কহ উচিত করিবো হৈ
সো লিখিয়ো সমুঝাঈ।

—হে সুখনিদান দুঃখহরণ গোঁসাই তুলসীদাস, বার বার আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনি আমার সমস্ত শোক পূরণ করুন। ঘরে আমার যত আত্মীয়-স্বজন, সবাই জঞ্জাল বাড়াইয়া তুলিতেছে।

আমি সাধু-সঙ্গ আর ভজন নিয়া আছি, কিন্তু এ জন্য তাহারা আমাকে কি কষ্টই না দিতেছে! বালিকা বয়স হইতে মীরা গিরিধরলালের সহিত মিতালী করিয়াছিল; এখন সে মিতালী তো আর ছুটিতে চায় না; আমি কি করি বলুন; স্বজনার হৃদয় যে শক্ত ডুরীতে বাঁধা পড়িয়াছে। হরিভক্তদের সুখদাতা আপনি, আপনি আমার পিতামাতার সমান; আমার এখন কি করা উচিত তাহা বুঝাইয়া লিখিবেন।

এই পত্রের উত্তরে গোঁসাইজী একটী পদ ও একটী সবৈয়া লিখিয়া পাঠান। সে দুইটী এই—

পদ

জাকে প্রিয় ন রাম বৈদেহী।
তজিয়ে তাহি কোটী বৈরী সম
যদ্যপি পরম সনেহী॥
তজ্যো পিতা প্রহ্লাদ,
বিভীষণ বন্ধু, ভরত মহতারী।
বলি গুরু তজ্যো, কন্ত ব্রজবনিতা,
ভয়ে সব মঙ্গলকারী॥
নাতো নেহ রাম সোঁ মনিয়ত
সুহৃদ সুসেব্য জহাঁ লোঁ।
অঞ্জন কহা আঁখ, জো ফুটে
বহুতক কহোঁ। কহোঁ। লোঁ॥
তুলসী সো সব ভাঁতি পরম হিত
পূজ্য প্রাণ তেঁ পারো।
জা সোঁ হোয় সনেহ রামপদ
এতো মতো হমারো।

—রাম ও সীতা যাঁহার প্রিয় নন, ঘোর শত্রুজ্ঞানে তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে, হউক না সে পরমাত্মীয়! প্রহ্লাদ পিতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, বিভীষণ ত্যাগ করিয়াছিলেন বন্ধুকে, ভরত মাতাকে, বলি গুরুকে, ব্রজবনিতা পতিকে পর্য্যন্ত ছাড়িয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু কাহারও দ্বারা অমঙ্গল অনুষ্ঠিত হয় নাই। যে পর্য্যন্ত রামকে মানিয়া চলিবে, সেই পর্য্যন্তই যা কিছু স্নেহের বন্ধন—সুহৃদের সৎকার ততটুকুই; চোখে দিতে চোখ কাণা করিয়া দেয় যাহা, তাহাকে কি অঞ্জন বলে? বেশী বাড়াইয়া আর আমি কি বলিব, সে-ই সব রকমে পরম হিতকারী, পূজনীয় এবং প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর—রামের চরণে যাহার প্রীতি রহিয়াছে—এই আমার মত।

সবৈয়া

সো জননী সো পিতা সোঈ ভ্রাত
সো ভামিন সো সুত সো হিত মেরো।
সোঈ সগো সো সখা সোঈ সেবক
সো গুরু সো সুর সাহিব চেরো॥
সো তুলসী প্রিয় প্রাণ সমান
কহাঁ লোঁ বতাই কহোঁ বহুতেরো।
জো তজি গেহ কো দেহ কো নেহ
সনেহ সোঁ রাম কো হোয় সবেরো॥

—সে-ই জননী, সে-ই পিতা, সে-ই ভ্রাতা সে-ই কান্তা, সে-ই পুত্র, সে-ই মিত্র, সে-ই সাথী, সে-ই সেবক, সে-ই সখা, সে-ই গুরু, সে-ই স্বামী, সে-ই চেলা; বেশী বলিয়া আর লাভ কি, সে-ই আমার প্রাণের সমান, যে গেহ এবং দেহের স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া সত্ত্ব সত্ত্ব রামকে প্রেমের ডুরীতে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

গোঁসাইর নিকট হইতে এই ইঙ্গিত পাইয়াই নাকি মীরা চিতোর ছাড়িবার সঙ্কল্প করেন। উদাবাঈএর নিকট তিনি নিজের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়া বলেন, "তুমি এখানেই থাক, আমি চম্পা ও চামেলীকে লইয়া বাপের বাড়ী যাইতেছি।" এই বলিয়া গেরুয়া পড়িয়া এক রাত্রে মীরা চিতোর ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া যান।

মীরার জন্ম-তারিখ লইয়া গোলযোগ রহিয়াছে, তাহাতে তুলসীদাস-ঘটিত উপরি উক্ত কাহিনীতে সে

সংশয়ের ছায়াপাত হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। যদিও উদ্ধৃত শব্দ কয়টীর প্রমাণে এই কাহিনীকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তথাপি মীরার এমন করিয়া গেরুয়া পরিয়া রাত্রিযোগে পলাইয়া যাওয়ার কাহিনীটা বড় কটু ঠেকে। বরং বীরম দেবজীই তাঁহার স্নেহ-পাত্রীকে ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন—ইহাই সঙ্গত এবং শোভন বলিয়া মনে হয়। আর মীরার গেরুয়া পরাটাও একটা অ চম্বিত ঘটনা নয়। ভগবানকে পাইবার দরুণ এক সময় তাঁহার চিত্ত এমনই উতরোল হইয়া উঠিয়াছিল যে গার্হস্থ্য সমস্ত সংস্কার বর্জ্জন করিলে যদি বা তাঁহাকে পাওয়া যায়, এই আশায় তিনি উন্মাদিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন। গৈরিক গ্রহণের এই উপলক্ষ্যই মীরার আনুপূর্ব্বিক আচরণের সহিত সুসমঞ্জস; নতুবা রাত্রে গেরুয়া পরিয়া পলাইয়া যাওয়া ব্যাপারটা গেরুয়ার মর্য্যাদাও বাড়ায় না, মীরারও না।

মীরা কিরূপ ঘটনাচক্রে পড়িয়া উদাসিনী পরিব্রাজিকা হইয়া পথের বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া মীরা প্রথমতঃ বৃন্দাবনে যান। তাঁহার বৃন্দাবনে অবস্থানকালেই স্বনামধন্য জীব গোস্বামীর সহিত (ভক্তমালের মতে রূপগোস্বামীর সহিত—এই অসঙ্গতিটুকু লক্ষ্য করিবার মত) মীরার সাক্ষাৎ হয়। কথিত আছে—মীরা শ্রীজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে স্ত্রীলোক বলিয়া মীরাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। মীরা গোস্বামীজীর প্রত্যাখ্যানের হেতু শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "আমি জানিতাম, এ জগতে সবাই প্রকৃতি, পুরুষ শুধু এক ব্রজেন্দ্রনন্দন। কিন্তু আজ শুনিলাম, আরও একজন পুরুষ এ জগতে আছে!" লোকমুখে মীরার এই উক্তি শুনিয়া শ্রীজীব লজ্জিত হইয়া পরম সমাদরে মীরাকে নিজের কাছে ডাকিয়া আনেন।

মীরা বৃন্দাবন হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং রণছোড়জীকে দর্শন করিয়া সেখানেই রহিয়া যান।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে মহারাণা বিক্রমাদিত্যের ছোট ভাই মহারাণা উদয়সিংহ বণবীরকে পরাস্ত করিয়া চিতোর রাজ্য পুনরায় অধিকার করেন। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে বীরমদেব ও মালদেবের নিকট হইতে মেড়তা-রাজ্য আবার ছিনাইয়া লন। মেড়তা-বিজয়ের দুই মাস পরেই বীরমদেবের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাও জয়মল্ল পিতার মৃত্যুর পর মেড়তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এইরূপে মীরার শ্বশুর-গৃহ ও পিতৃগৃহ উভয়ত্র শান্তি ফিরিয়া আসে। চিতোর ও মেড়তা দুই স্থান হইতেই মীরাকে ফিরাইয়া নিবার জন্য বহু আকিঞ্চন করা হয়। কিন্তু মীরা আর কিছুতেই সংসারে যাইতে স্বীকৃত হন নাই। দ্বারকা-ক্ষেত্রেই মীরা মহাসমাধি লাভ করেন। তাঁহার তিরোভাব-কাল লইয়া যে মতদ্বৈধ রহিয়াছে, তাহার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

মীরার মৃত্যু সম্বন্ধে এক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, মীরা চলিয়া যাওয়াতেই সাধ্বীর অবমাননা বশতঃ চিতোরে নানা দৈব দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া চিতোরের মন্ত্রীরা মীরাকে আনিবার দরুণ দ্বারকায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণেরা কিছুতেই মীরাকে ফিরাইয়া নিতে না পারিয়া অবশেষে বলেন, "আপনি না গেলে আমরা আর অন্নজল ছুঁইব না।" সঙ্কট দেখিয়া মীরা রণছোড়জীর নিকট বিদায় লইবার অছিলায় সেই যে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, আর কেহ তাঁহাকে মন্দির হইতে বাহির হইতে দেখিল না। মীরা রণছোড়জীর দেহে লীন হইয়া গেলেন, নিদর্শনস্বরূপ তঁাহার অঞ্চলের এক প্রান্ত বিগ্রহের অঙ্গে সংলগ্ন হইয়া রহিল!

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে রাও মালদেবজী বিবেকবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া মেড়তার সমস্ত রাজভবন ধ্বংস করিয়া ফেলেন। কেবল চতুর্ভুজের মন্দির ও রাজ-মহলের একটুখানি অংশ এই কালাপাহাড়ী হইতে রক্ষা পাইয়া আজ পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে। রাজ-মহলের এই অবশিষ্ট অংশে আজকাল যোধপুরের জিলা-কাছারী স্থাপিত হইয়াছে। ইহারই একটী ছোট পুরাতন প্রকোষ্ঠকে লোকে মীরাবাঈর ভজন-শালা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। শোনা যায়, মীরাবাঈর প্রতি সম্মান দেখাইবার দরুণই নাকি মালদেব রাজমহলের এই অংশটুকু বিধ্বস্ত করেন নাই। কিন্তু এ জনশ্রুতি কতটুকু সত্য, তাহা বলা কঠিন।

মীরার জীবনকাহিনী এইখানে সমাপ্ত হইল। এখন আমরা তাঁহার কোমলকান্ত পদাবলীর সহিত পাঠকের একটু পরিচয় করাইয়া দিব। (ক্রমশঃ)

পথের সঙ্কেত

——(::)——

যেমন নাকি আলো আর আঁধারের আবর্ত্তনে একটা দিন সম্পূর্ণ হয়, তেমনি সুখে দুঃখে, উত্থান পতনে এ জীবনটা পূর্ণ-স্বরূপ পরিগ্রহ করে। অনেকে হয়ত খবর রাখে না, এই দৈনন্দিন জীবনের মাঝেও একটা ছন্দ আছে। কিছুদিন তোমার এমনি চলবে, যেন অনায়াসে সব হয়ে যাচ্ছে—ধূলি-মুঠো ধরতে তা সোণামুঠো হয়ে পড়ছে; চিত্ত ভাবে ভরপুর, সংযম অনায়াস, বৈরাগ্য প্রদীপ্ত। আবার কিছুদিন পরেই তার একটা প্রতিক্রিয়া আসবে। হয়ত যতখানি উঠেছিলে, দেখতে দেখতে তার দ্বিগুণ পড়ে গেলে। কিছুতেই আর তখন নিজকে সামলে রাখতে পাচ্ছ না, যে সমস্ত চিন্তা মনের ত্রিসীমানাতেও ঘেঁসত না, তারা কোথা হতে যেন পাঁকের ভুড়ভুড়ির মত আপনা হতে উঠে আসছে।

এই অবস্থায় কি করতে হবে? চাই নি-স্তরঙ্গের সাধনা। যখন সবি পুণ্য, সবি মধুময়, সবই সুখের, তখনও সজাগ প্রহরী থাকা চাই। এ-ও একটা প্রলোভন। ওই যে সুখের আবেশে চিত্ত এলিয়ে যায়, তার মাঝেই কোন্ ছিদ্রপথে প্রমাদ এসে ঢুকে পড়ে—একটুখানি আয়েসের চিন্তায় মনকে শিথিল করে দেয়, তারপর বালির বাঁধ যেমন করে ভেঙ্গে পড়ে, তেমনি সমস্ত সংযমের শক্তি পলকে মিশিয়ে যায়। এর পরেই আসে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বার পালা।

যখন দেখছ, পড়ে যাচ্ছ, তখন পার তো পূর্ণ উদ্যমে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ জাগৃতিতে নিজকে ধরে রাখবার চেষ্টা কর। মনে খুব জোর থাকা চাই; আর এ জোর চোখরাঙানীর জোর, ধমকের জোর। যারা গরুর গাড়ী হাঁকায় বা হাল বয়, তারা গরুগুলো যতখানি চলে তার তিনগুণ চীৎকার করে; ওই চীৎকারটা কিন্তু নিষ্ঠা নয়; ওটা শব্দ মোহ, একরকম hyqnotism। নিজের ওপরেও hypnotism বা সম্মোহনের মন্ত্র চালাতে হবে। নিজকে ঠেকাতে পারি আর না পারি, মনটাকে খুবই গরম করে রাখব; তেজের সঙ্গে ভাবব, কেন পারব না? আমার ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। আমার ইচ্ছা অপরের ওপর খাটে, আমার ওপর

খাটবে না? আলবৎ খাটবে। মনের অজানা প্রদেশ চুঁড়ে নূতন কিছু না পাই, সে আলাদা কথা; কিন্তু যা পেয়েছি, আমার হক্ বলে জেনেছি, তা বজায় রাখবার মত পৌরুষ আমার নাই? নিশ্চয় আছে!—এমনিতর কঠিন সঙ্কল্পের বুলি শুনিয়ে শুনিয়ে মনকে চাঙ্গা রাখতে হবে।

এতেও যদি নিজকে স্বস্থানে ফিরিয়ে না নিতে পার, যদি দেখ, তোমার হাজার চোখরাঙানী দেখেও সঙ্কল্পের গোড়া আবার শিথিল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে শেষ অমোঘ উপায় অবলম্বন কর—একেবারে চুপ হয়ে যাও। এটা চরম কথা কিন্তু। ডাকহাঁক করাটা আমাদের স্বভাব, তা করতেই হবে; কিন্তু তেমনি আবার চুপ করে থাকাটাও তার চাইতে উঁচুস্তরের স্বভাব। সেটার মহিমাও উপলব্ধি করতে হবে। অবধূত একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন, চীলের। একটা চীল একখণ্ড মাংস পেয়েছিল, তা দেখে তার পেছনে আর কয়েকটা চীল এসে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে চীলটা তাদের সঙ্গে ছুটোছুটী করলে, কিন্তু কিছুতেই সোয়াস্তিতে খাবারটুকু নিঃশেষ করবার সুযোগ পেলে না। অবশেষে সে বিরক্ত হয়ে মাংসের টুক্‌রোটা ওদের মাঝেই ফেলে দিয়ে একটা গাছের ডালে চুপ করে বসে দেখতে লাগল, আর আর চীলগুলো ওটা নিয়ে মহা হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছে। চিলটা ডালে থেকে তাই দেখতে লাগল, আর মনে মনে হাসতে লাগল।

মনের মাঝে এমনি একটা উচুঁ ডাল রাখতে হয়, যেটা নাকি সকল বিকারের অতীত। মনের তেজ খুব বড় কথা, সংযম খুব বড় শক্তি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলে রাখছি, প্রশান্তি তার চাইতেও বড় শক্তি। এমন সময়ও তোমার আসে, যখন সংযম বা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কিছুই করতে পারছে না, যে অবস্থাটা লক্ষ্য করে গীতায় ভগবান বলছেন, "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?" অথচ এই প্রকৃতির মাঝে ঢলে পড়াতেও মানুষের শান্তি থাকে না, একটা অসোয়াস্তি একটা গুমোটের ভাব যেন দম বন্ধ করে নিয়ে আসতে থাকে। তবেই দেখ, প্রকৃতির হাতে নিজকে ছেড়ে দিলেই আরাম নয়; বাস্তবিক আরাম প্রকৃতিকে বশ করাতে।

এই বশ করার দুটো ফিকির আছে। একটা হচ্ছে চোখরাঙানী, মনের তেজ, ইচ্ছাশক্তির প্রবল স্ফুরণ—এর কথা আগেই বলেছি। আর একটা হচ্ছে—একবারে নিরেট কঠিন হয়ে যাওয়া—প্রকৃতির সঙ্গে পূরোমাত্রায় অসহযোগ। "তুমি যা করছ, তা আমার পছন্দ হচ্ছে না, সে কথা বারবার তোমায় বলেছি; তবুও যখন তুমি আমার কথা শুনছ না, তখন ব্যস্, তোমার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেল। আর আমি তোমার ভালতেও নাই, মন্দতেও নাই। তোমার যা খুসী তুমি তাই কর; আমি শুধু সজাগ থেকে দেখব, কতদূর তুমি বাড়তে পার"—এই হল শেষ চাল। এর সুফল অবিসম্বাদিত।

পড়ে যাচ্ছ? সঙ্কল্প শিথিল হয়ে আসছে? হে বৈদান্তিক, এ বিকার তোমার নয়—এ গুণের বিকার। তুমি তো গুণ নও, চঞ্চলা-প্রকৃতি নও, তুমি যে গুণের অতীত, অবিচল শিবস্বরূপ! তুমি ভাব চাও? ভাবুকতার প্রলোভন দিয়ে প্রকৃতি তোমায় সম্মোহিত করতে চাইছে? কিন্তু সে ভাব গুণে খুঁজছ কেন? ভাব কারণ সত্তা—নির্ব্বিকার. তাকে ধরতে হলে তোমাকেও যে নির্ব্বিকার হতে হবে। শোন—গুরুমুখ-নিঃসৃত পরমা শ্রুতি—"জ্ঞান আর ভাব এক।" বেদান্তের ভাষার বলতে গেলে—ভাব শক্তি। গুণকেই ভাব বলে বুঝো না। এই যে জগৎ, এর রূপ দেখছ, এ ভাবেরই রূপ। কিন্তু আসল রূপ তোমাদের চোখে পড়ছে না। গভীর অন্ধকারে একবারে জগৎটার দিকে স্থির

হয়ে চেয়ে থাক দেখি, দেখবে ওর রূপ বদলায় কিনা। ভাব হচ্ছে কারণ; অভাব থাকতে ভাব ধরা যায় না। জ্ঞানের ফল ভাব।

তাই বলছি, স্থির হও—প্রশান্ত হও। কারণের উপাসক তুমি, নির্ব্বিকারা নিস্তরঙ্গা গুণ প্রসূতির হৃদয়াধীশ—তুমি সব। আবার শোন—"গুরুমুখ বেদা"—"এই তো অদ্বৈত অদ্বৈত তো 'এক' সংখ্যা নয়; সব মিলিয়ে গিয়ে একটা শূন্যাকার হয়ে গেল, ওটা অদ্বৈত নয়; জগৎ থাকবেই, তবে তুমি হয়ে; তুমিই সব; এই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেমন আলাদা হয়েও সব নিয়ে তোমার দেহ এক—তেমনি অদ্বৈত।"

অদ্বৈত শুদ্ধ তত্ত্ব, শুদ্ধ ভাব-স্বরূপ—তাই বৈষ্ণবের মধুর রস। আবার শোন—"দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য অবধি জগতে বিকাশ। দাম্পত্য প্রেম সখ্যেরই উচ্চস্তর। তবে সমস্তই মধুরে শেষ হবে। মধুর ভাবই হল আসল ভাব; কিন্তু সে এ জগতের নয়।"

এই সাধ্যের অবধি। পাওয়ার পথ ওই যে বলেছি—প্রকৃতিজয়। সংযম আর প্রশান্তি তার দুটী পক্ষ। চাই অদ্বৈত—নিখিল-দ্বৈতের পূর্ণতা যে অদ্বৈত। আত্মশোধনের দরুণ কখনো বা সংযম প্রয়োগ করবে; আর সব সময়ে থাকবে, প্রশান্ত—নিস্তরঙ্গ, নির্ব্বিকার, ভাবরূঢ় অনুভব। সেই অনুভবের ভূমিকায়, সব ফুটে উঠবে। কেউ তোমাকে হাসাতেও পার্ব্বে না, কাঁদাতেও পার্ব্বে না—অথচ তোমা হতে ক্ষরিত আনন্দেই জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে। ওই যে গোড়ায় কাঁদুনী, আর শেষের এই পুলক, সব যেন এক অনির্ব্বচনীয় সুরে গাঁথা হয়ে মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় কেঁপে উঠবে তোমার মাঝে। তখন মন দিয়েও আর তাঁকে ভাবতে পারবে না—নির্ব্বিকার নিস্তরঙ্গ হয়ে শুধু ইঙ্গিতে অনুভব করবে—আত্মানম্ আত্মনা। এই তো অসমোর্দ্ধ লীলা।

---*---

হিরণ্ময়ী মায়া

—(:*:)—

জ্যোতিঃই চরম নয়, এর মাঝেও আবরণীশক্তি রয়েছে; তাকে অতিক্রম করে যে সত্য রয়েছে, সে তার সন্ধান জানে না। স্নিগ্ধগুণে মানুষকে আকৃষ্ট করে বটে, কিন্তু যার ভিতর সত্যিকার আগুন প্রজ্জ্বলিত, কিছুতেই সে রমণীয়তাকে চরম মনে করে তুষ্ট থাকতে পারবে না। অনেক সাধকই এখানে এসে ঠেকে পড়েন, কেউ মনে করেন এখানেই বুঝি শেষ, তাই তাদের মাঝে নূতন পথ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা বা উদ্যম থাকে না—জ্যোতিঃর প্লাবনে আপন সত্তা ডুবিয়ে দিয়েই তাদের পরম তৃপ্তি। জীবনে এরূপ অনুভূতি আসাই দুর্লভ বটে; কিন্তু এর চেয়েও এমন এক দিব্য স্তর রয়েছে, যার মাঝে কোন মোহিনীশক্তি নেই—আছে শুধু সহজ সত্য নিহিত। সাধক অসময়ে তৌষ্টিকের পথ অবলম্বন করবে, এ আশঙ্কাতেই উপনিষদ্ বলে রেখেছেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

—এমন এক স্তর আছে, যেখানে মানুষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে; কল্পনাতেও আসে না,

এর চেয়ে বড় তুষ্টি কি লাভ হতে পারে জীবনে। ব্যষ্টি আধার যখন তৃপ্তিতে ভরপূর হয়ে উপ্চে পড়ে, তখন আর পাওয়ার কিম্বা চাওয়ার কি থাকে? অনেক সাধকের সাধনার পরিণতি এই জ্যোতিঃ-দর্শন পর্য্যন্তই। সমস্ত জগৎ জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল, কে কোথায় গেল তার ঠিকানা নেই, প্রভূত আনন্দে নিজকে ভুলে গেলাম, ভেদাভেদের আবরণ একে একে উন্মোচিত হয়ে পড়ল—আর চাই কি জীবনে? উপনিষদ্ এ মোহকেও অতিক্রম করে গিয়েছেন, তাই শ্লোকে বল্ছেন, "সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্র দিয়ে আবৃত, হে পূষন্! তুমি সেই আবরণ অপনীত কর, আমি উপলব্ধি করি।" এখানেই গুরুবাদের প্রতিষ্ঠা। আমার নিজ শক্তিতে যখন আর কুলিয়ে উঠতে পারি না, তখনই একজন বন্ধুর প্রয়োজন—আর জগৎ চল্ছেও পরস্পরের সাহায্যে সহানুভূতিতে। একে যদি দাসমনোবৃত্তি বল্তে চাও, তবে প্রত্যেক মানুষের মাঝে কোন না কোন দিকে অভাব আছেই আর তার পূরণার্থে স্থূলে, সূক্ষ্মে কারও না কারও সাহায্য নিতে হবেই তোমার। এই আত্মীয়তার সূত্র, ভূমার উপলব্ধি মানবজীবনেই সার্থক হয়েছে, তাই শাক্যসিংহ রাজত্বকে তুচ্ছ করে, ব্যষ্টি জীবনের সকল দুঃখের বেদনা বহন করে, মুক্তির অনুসন্ধানে বের হয়েছিলেন। অপরের দুঃখ কষ্টের বেদনা আমাদের আঘাত দেয় প্রাণ আছে বলে। যার যত প্রাণশক্তি পরিস্ফুট, তাকে অপরের দুঃখভার লাঘব করতেই হবে—না করে পার্বে না যে সে! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে স্খলন, সে বিপদ্ হতে তো সদ্‌গুরু রক্ষা কর্বেনেই, এমন কি পরিশেষে তিনি এসে আমাদের আনন্দের সংস্কারকেও অপসারিত করে দিবেন, তখন দেখব—যার জ্যোতিঃতে চরাচর উদ্ভাসিত, তিনি আর আমি যে এক!

আনন্দে অনেকেই এলিয়ে পড়েন, তাই গন্তব্য স্থানে না পৌছেই ফিরে আস্তে হয় তাদের। এ জায়গায় অবশ্য প্রলোভনের অনেক কিছু থাকে, কিন্তু সাধকের দেদীপ্যমান সত্যস্পৃহা যদি নিবারিত না হয়, তবেই সকল তত্ত্বের সেরা তত্ত্ব যে ব্রহ্মাত্মৈকজ্ঞান, তাও লাভ হয় এই জীবনে। কঠোপনিষদে নচিকেতাকে যম কম প্রলোভন দেখাননি। "শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব" এই বলে ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ দিলেন, কিন্তু নচিকেতা শেষ পর্য্যন্তও অগ্নিপরীক্ষায় অটল থেকে বললেন, "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো—অতএব বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব"—সেই সর্ব্বজনবিদিত সংশয় 'আত্মা আছেন কি নাই' এই আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়।" এ তো গেল বেদের কথা; তন্ত্রেও নাকি মা এসে ভক্তকে নানা রূপ প্রলোভন দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চান। আর এখানে এসেই অনেক সাধকের পতন হয়। সাংখ্যবাদীরও ভয় রয়েছে প্রকৃতি লয়—তাদের মনে হয় একাকার হয়ে থাকাই বুঝি চরম। এরূপ করে প্রত্যেক সাধকেরই পতনাশঙ্কা রয়েছে। বাহিরের আবরণ ভিতরের সত্যকে সঙ্গোপিত করে রাখে—তাই সাধনার সুতীক্ষ্ণ প্রেরণা দিয়ে চিত্তকে উদ্বুদ্ধ রাখতে হয়। আনন্দ আনন্দকে, মৃত্যু মৃত্যুকে এমনি করে সবাই সবার অন্তরের জিনিষটীকে লোক-চক্ষুর অন্তরাল করে রেখেছে। তাই যাকে জান্তে হবে, তাকে অতিক্রম করতে হবে। অভিভূত হয়ে থাকা জ্ঞানীর লক্ষণ নয়, যদিও প্রকৃতির প্রবল আকর্ষণ মানুষকে অভিভূত করেই রাখতে চায়। শঙ্করাচার্য্যের কৃতিত্বই হচ্ছে মানুষ শেষ বলে যেখানে পরিসীমার খুঁটা গেড়েছে, তারও উপরকার সংবাদ তিনি আনয়ন করতে পেরেছিলেন। আমরা যা দেখছি, তাই চরম নয়। সরোবরের অনির্ব্বচনীয় শোভা, মধুকরের গুণ্ গুণ্ স্বরে মধুপান, হংস-সারস বিহঙ্গমগণের আনন্দে জলকেলি এ সব দেখে কি আর কিছু নূতন ব্যঞ্জনা পাই না? আসল কবির চিত্তকে আকৃষ্ট করে কি

শুধু বাহিরের রূপে, না অন্তরের সৌন্দর্য্যে? কতজনেই তো নদী দেখে, নির্ম্মল সলিল-কণবাহী সমীরণ কতজনকেই স্পর্শ করে, বসন্তের কোকিলের "কুহু কুহু" ধ্বনি কে না শুনতে পায়, পাহাড় পর্ব্বতের নিবিড় নিস্তব্ধতা কে না অনুভব করে—কিন্তু এ সব দেখেই কবির প্রাণে যে এক অভিনব দ্যোতনা জাগে, আর তার অনুভূতি যখন স্বভাবতঃই মার্জ্জিত হয়ে বাহিরে রূপ ধরে ফুটে ওঠে—সে রূপ কার প্রাণে সাড়া না দেয়? শাস্ত্রে-পুরাণে শুনতে পাই আগেকার গাছে নাকি কথা বলত। জড়বৎ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এর মুখ দিয়ে আবার কথা ফুটতে পারে, এ তো আমাদের কাছে আশ্চর্য্য-অসম্ভব। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নেই বলেই এ কথা বলছি। একদিন মুনি-ঋষিদের অনুভূতি বনের তরুলতায় সঞ্চারিত হত, তাই গাছেও উপদেশ দিত, কথা বলত। গাছের প্রাণ নেই, তাদের ভাব নেই, ভাষা নেই, তাদের প্রতি আমাদের এই যে নিষ্ঠুর বদ্ধমূল ধারণা এতেই তারা আমাদের কাছে এত অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে; তাই তাদের বিনাশ করেই আমাদের আনন্দ। বনের নিস্তব্ধতা যে মুনি-ঋষিদিগকে অভিভূত করেনি তার কারণ ছিল প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের অমায়িক অবিচ্ছিন্ন প্রাণের যোগ। আমরা হয়ত নদীর কুলুকুলু শব্দে বয়ে-যাওয়ার ধ্বনি শুনে অভিভূত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ব, মুনি-ঋষিরা সেখানে বসেই আত্ম-চেতনা উদ্বুদ্ধ রেখে, আত্ম-সমাহিত হয়ে, স্রোতস্বতীর তালে তালে-পড়া ঢেউএর সংঘর্ষে উত্থিত নাদ-ধ্বনি শুনতে শুনতে দিবানিশি অতিবাহিত করে দিচ্ছেন। এমনি করে বিশেষ উদ্দেশ্য এবং বাণী প্রচার করে প্রত্যেকেই কালের স্রোতে ভেসে চলছে—যার কাণ আছে সে শুনতে পায়, যার চোখ আছে সে দেখে। বাহিরের স্থূলতা এবং স্থিতি আমাদের দূর করে রেখেছে বটে, কিন্তু প্রাণের যোগসূত্র এখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের পরিপন্থী—সাধন-প্রভাবে তাদের সুনির্ম্মল করে তুলতে হবে। শাস্ত্রে আছে ভাগবত-তনুর কথা—তা হলেই এ স্থূল-শরীরের মায়াকে কাটিয়ে উঠতে হবে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় প্রতি মুহূর্ত্তে অসীমকে সসীম বলে প্রতীয়মান করছে। একটী পুষ্প, পুষ্পরূপেই পরিপূর্ণ, একটী গাছ-গাছরূপেই পরিপূর্ণ, এতেও যথেষ্ট আনন্দ রয়েছে—কিন্তু সমস্ত আনন্দকে যে দিন ভূমার আনন্দে মিলিয়ে দিতে পারব, সেই দিনই না আনন্দের পরিণতি! তা হলেই তো বুঝা গেল, ছোট ছোট আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লে চলবে না।

যারা খাঁটী সত্যলাভেচ্ছু, তাদের প্রাণে অনুসন্ধিৎসার আবেগ চিরকালই থাকবে। ফল মাটীতে পড়ে এ সবাই জানে, কিন্তু নিউটন একে উপলক্ষ্য করেই এক নূতন সত্যের বাণী প্রচার করে গেলেন জগতে। এই যে মূলে পৌছানর অত্যন্ত আবেগ, এতেই কেউ কবি, কেউ দার্শনিক, কেউ চিন্তাশীল হয়েছেন। সবার লক্ষ্যই এক; কিন্তু ঊর্দ্ধমুখী প্রেরণা সবার সমান নয়।

সাধনার প্রথম অবস্থাতেই বিপদ বেশী, আপন আপন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে তখন। কারও মাঝে ঔদার্য্য থাকে না, কেউ কাউকে সহ্য করে চলতে পারে না। ইন্দ্রিয়কে নির্য্যাতিত করার দরুণ যে সংযম নয়, ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধির সাধন করে তোলাই যে অভিপ্রায়—ইন্দ্রিয় তো সে কথা বুঝে না। যোগান পেল না বলে অনন্ত কৈফিয়ৎ এর সৃষ্টি হয় তাদের মাঝে। ভিতরে অসাধারণ বল সঞ্চিত না হলে তাদের সঙ্গে তাল দিয়ে চলাই তো দায়। তাই সাধক হবে চরমদর্শী—পথে বাধা পেলেও সে বাধাকে অনায়াসে উপেক্ষা করার মত শক্তি এবং ধৈর্য্য থাকা চাই। সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখে যদি কোন সময় স্রষ্টার কথা মনে না আসে, আর তাতে আর

আমাতে কি সম্বন্ধ এই যদি বুঝতে না পেলুম তবে তো জগৎশুদ্ধ লোক মোহিনী-মন্ত্রে অভিভূত হয়েই আছে—আমাদের বিশেষত্ব কি? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" এই ত্রিগুণময়ী মায়া সুদুস্তরা বটে, কিন্তু আবার এও বলেছেন, আমাকে যে পায় সে এ মায়াকেও অতিক্রম করে যেতে পারে। প্রত্যেকের মাঝেই যেমন আশ্চর্য্য মোহিনী-শক্তি রয়েছে—তেমনি সত্য স্বরূপ দ্রষ্টা পুরুষও রয়েছেন। এ মায়ার হাত হতে, বাহিরের রূপ-সৌন্দর্য্যের লোলুপতা হতে নিজকে বিনির্ম্মুক্ত করে আত্ম-স্বরূপ দর্শনই শেষ কথা। এই charming Power বা মোহিনী-শক্তিই জগৎশুদ্ধ লোককে ঘুর্-পাক খাইয়ে মার্ছে। এ কঠিন মোহকে অতিক্রম করাই হল সাধক-জীবনের চরম লক্ষ্য। আবিষ্ট হয়ে থাকলেই বুঝতে হবে মায়ার কবলে পড়েছ। জান্বার দুটো ধারাই রয়েছে—যার যেমন সংস্কার; কিন্তু সাধন-পথিককে প্রাকৃতিক জগতের আকর্ষণ অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণেরও পরপারে চলে যেতে হবে। জন্মসিদ্ধ বৈদান্তিক—সংশ্লেষণবাদী জগতে বিরল—সাংখ্যের "নেতি নেতি" বিচার নিয়েই আমাদের চল্তে হবে। স্বভাব-বাদ সিদ্ধ-মহাপুরুষদের দরুণ—মানে তাঁরা প্রকৃতির জটিল রহস্য উদ্ঘাটিত করেছেন; সাধকের চল্বে অনবরত দ্বন্দ্ব—প্রকৃতির সঙ্গে। সাধনার পরিণতিতে একদিন দেখব, যে আমায় তার রূপ-ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল—সে-ও যে সেই সত্যকেই চায়, তা না হলে প্রকৃতির এত পরিবর্ত্তন কেন?

সারথি

সংশয় যখন আছে, তখন তার একটা মীমাংসা-স্থলও রয়েছে। নিজে না বুঝ, অপরের কাছ থেকে বুঝে নাও। এক কথায় সহজ করে বল্তে গেলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথাটিই বার বার উপদেশচ্ছলে বুঝিয়েছিলেন। এতে আত্ম-সমর্পণ আর আত্ম-প্রতিষ্ঠা—দুটো সুস্পষ্ট পথেরই নির্দ্দেশ পাওয়া গেল। এখন যার যে পথে খুসী চল। উপায় নেই এ কথা আর তাহলে বলা চলে না। উপায়ে আমি চল্ব না—তোমার গরজে তুমি এ কথা বল্তে পার; কিন্তু সব লোক তোমার পন্থা অনুসরণ করল না বলে বৃথা আক্ষেপ করাও নিষ্প্রয়োজন। কেননা জগৎ বৈচিত্র্যময়, তার মাঝে এই নানাত্বটুকু থাক্বেই। তবু যে মানুষের ওপর মানুষের অন্যায় দাবী, এই দেখেই আশ্চর্য্য হতে হয়। অহংএর কি নিদারুণ গর্ব্ব!

সংশয় হলেই জিজ্ঞাসা জাগে, আর তাতে আমাদের অন্তর্নিহিত খাঁটী ইচ্ছাটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ সম্বন্ধে কতই না অনর্গল উপদেশ দিলেন শ্রীকৃষ্ণ—অর্জ্জুনের সন্দেহ কিন্তু কিছুতেই মোচন হল না। সন্দেহে অর্জ্জুনের সমস্ত চিত্ত আলোড়িত হতে লাগল। কোন্ পথে গেলে কল্যাণ হবে, বুঝ্তে না পেরে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতং॥

—কর্ম্ম সমূহের ত্যাগের উপদেশ দিয়ে পুনঃ কর্ম্ম-যোগের প্রশংসা আরম্ভ করে দিয়েছেন—এ মাঝে যা শ্রেয়ঃ, আমায় সেটাই নিশ্চয় করে বলুন

এ ক্ষেত্রেই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট সম্পূর্ণভাবে ধরা পরে গেলেন। ত্যাগের শ্রেষ্ঠতা অর্জ্জুনের প্রাণের সত্যিকার সাড়া নয়, অথচ উপদেশ শুনে কেমন যেন একটা খট্‌কা বেজে গেল। সন্ন্যাসের পথ, ত্যাগের পথ যখন শ্রেষ্ঠ পথ, তবে আর যুদ্ধে গিয়ে অসংখ্য নর-নারীর প্রাণবধে কি প্রয়োজন? বাস্তবিক এ ভাবটী যদি অর্জ্জুনের মনের খাঁটী ভাব হত, তবে আর পুনঃ জিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠ্‌ত না। উপদেশ শুনেছিলেন, কিন্তু মনের সঙ্গে মিল হয়নি। আর শ্রীকৃষ্ণের গুরুত্ব এ জায়গাতেই—তিনি প্রপন্ন শিষ্য অর্জ্জুনের মনোগত ভাবটী আগেই ধর্‌তে পেরেছিলেন; তাই বরাবর কেবল যুদ্ধ কর, ওঠ, জাগ, এ সব কথাই উপদেশচ্ছলে বর্ষণ করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন, অর্জ্জুনের ভিতর পুরামাত্রায় যুদ্ধাকাঙ্ক্ষার সুপ্ত বীজ রয়েছে। জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্য সব দিকের কথা শুনেও যখন প্রাণে শান্তি পেলেন না, অথচ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম উপদেশের প্রতিই মন ঝুঁকে পরছে, তখনই অর্জ্জুন শরণাপন্ন—জিজ্ঞাসু; ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভের ভার এক জনের নিকট অর্পণ করে নিজে খালাস হয়ে গেলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বল্‌লেন,—

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥

—কর্ম্ম-সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তি-সাধক; পরন্তু এতদুভয়ের মাঝে কর্ম্ম সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ প্রশংসনীয়। অর্জ্জুনের অভিরুচি দেখেই কর্ম্ম-যোগের এই প্রশংসা, তা না হলে কর্ম্ম আর কর্ম্ম-সন্ন্যাস তো জ্ঞানার্থই; এর মাঝে তো শ্রেষ্ঠ অপকৃষ্ট ভাব নেই। কিন্তু অর্জ্জুনকে এ জায়গায় নির্ব্বেদ কিম্বা সমত্বের উপদেশ না দিয়ে, একটা কিছু উন্নততর আদর্শের কথা বলাই মঙ্গলজনক এবং সমীচীন মনে করে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদিকের গুণ-কীর্ত্তন কর্‌লেন। অর্জ্জুনের চিত্ত এমনি তো ঘুলিয়ে একাকার, এখন তাঁর মাঝে শক্তিকে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে—আর ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন, এ-ও তো অপযশকর। আদর্শ যিনি হবেন তাঁকে তো ভাল-মন্দের অতীত হলে চল্‌বে না, তাহলে তাঁকে দিয়েই যে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধির একটী সুগম-পন্থা পরবর্ত্তীদের দরুণ আবিষ্কৃত হয়ে থাক্‌বে। আর স্পষ্ট বোঝাও যায়, অর্জ্জুনের মাঝে একটা প্রচেষ্টা রয়েছে—তা না হলে "শ্রেয়" কথাটার উল্লেখের কি প্রয়োজন ছিল।

এখানেই সব শেষ হয়ে গেল জান্‌বার-বুঝ্‌বার, এই মনে করে যদি অর্জ্জুন তুষ্টিলাভ করে বসে থাকে, তাই এর পরের অবস্থার কথাও ইঙ্গিতে একটু জানিয়ে দিলেন—

সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥

—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ের ফলই কৈবল্য-লাভ। যখন বুঝ্‌তে পারি সবই একই লক্ষ্যের দিকে ছুটছে তখন তো সাধন-অভিমানের বালাই থাকে না। সোজা-কথায় বল্‌তে গেলে—"কাঁটা দিয়ে কাঁটা খুলে শেষে যেমন দুটো কাঁটাই মানুষ ফেলে দেয়, তেমনি ভাল দিয়ে মন্দকে আয়ত্ত করে, শেষে ভাল-মন্দের অতীত হয়ে যাওয়া। গীতার মাঝে নানা ভাবে এ কথাটারই উল্লেখ রয়েছে। আর গীতা যে আমা-দের কাছে এত আদরের সামগ্রী তাঁর কারণই হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ধারার সঙ্গে এ বেশ মিলে যায়। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব প্রত্যেক মানুষের মাঝেই রয়েছে, কিন্তু গীতার বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে, এ দ্বন্দ্বের মাঝেও How to be a better man—জগতে আদর্শ মানুষ হওয়া যায় কি করে, এর একটা স্পষ্ট সাধনার-ধারা সন্নিবেশিত রয়েছে। গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ শুধু লক্ষ্যের কথা বলেই ক্ষান্ত

হন নি—তিনি সাধনারও একটা নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এ সহানুভূতি পেয়েছি বলেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অতি আপনার।

কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নিয়ে অনেক সময় আমাদের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়, তখন হয়ত আমারই যা ইচ্ছা নয় তাই কার্য্যক্ষেত্রে করে বসি, কিম্বা আমার প্রাণ যা চায়, অপরের কাছ থেকে তার বিপরীত কোন আচরণ পাই—তখন তো তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না, দুঃখ হয়, ঘৃণা জন্মে যে আমার মনের কথা বুঝতে পার্‌লে না—এই বলে। এ সমস্যা যে আমাদের দৈনন্দিন সমস্যা। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মনের মানুষ। আপন স্বভাবের অনুকূলেও কি করে মানুষ মুক্তি-লাভের অধিকারী হতে পারে—এর শিক্ষা পেয়েছি একমাত্র গীতায়। জগাই-মাধাই এদের সংশোধনের চেষ্টা কতজনই তো করেছিলেন—সে ছিল উল্টো পন্থা। গৌরাঙ্গদেব এসে কোন্ মহা-শক্তির সাহায্যে তাদের কলুষিত চিত্তকেও ধর্ম্মের প্লাবনে ভাসিয়ে নিতে পেরেছিলেন ?—শুধু ভরসার বাণী দিয়ে—তিনি তাদের স্বভাবের অনুকূলে চল্‌তে দিয়েও খাঁটী মনুষ্যত্বে উন্নীত করেছিলেন। আঘাতই কি একমাত্র চরিত্র-সংশোধনের অব্যর্থ পন্থা ? এই যে অপরের মহত্ত্বে অনাস্থা স্থাপন, এর প্রতিফল থেকে মুক্ত হয়ে থাকতে পার্‌ব চিরদিন ?

আমাদের আসল ইচ্ছা অনেক সময় আমাদের কাছে অস্পষ্ট। কিন্তু আমাদের মাঝে এমন একজন মহান্ পুরুষ রয়েছেন, যিনি আমাদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ব্যাপ্ত করেও সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অতীত। আমরা যা না দেখি, তা তিনি দেখেন, যা না বুঝি তা বুঝেন ; শুধু বাহিরের কথা-বার্ত্তা নয়, অন্তরের মাঝে যে সংকল্প-বিকল্পাত্মক নীরব ভাষা, তাও তিনি বুঝতে পারেন। সব জানেন বলেই তাঁকে বলি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সম্যকদর্শী ; ভাল-মন্দ দুটো দিকই তাঁর কাছে সুষ্ঠু প্রতিভাত। আমাদের অনিচ্ছায় কোন কাজে তিনি আমাদের উৎসাহ কিম্বা বাধা দেন না। আমি কি চাই, কোন্ দিকে আমার Tendency—এ জানে শুধু আমার অন্তরাত্মা। বাহিরের দৈনন্দিন অনিবার্য্য ঘাত-প্রতি-ঘাতে যখন আত্মার মহিমা ক্ষীণ হয়ে আসে—তখনই এমন একজন বন্ধুর প্রয়োজন, যিনি আমার লুপ্ত চেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ করে তুল্‌তে পারেন, যিনি আমার ভিতরকার ব্রহ্মকে তাঁর ব্রহ্মানুভূতির আবেগ দিয়ে উদ্দীপিত করে তুল্‌তে পারেন। গীতায় এঁকেই বলা হয়েছে সখা। মোহে অভিভূত হয়ে পড়ায় অর্জ্জুনের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তখন একজন পথনির্দ্দেশকের যে কত প্রয়োজন ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

একটী গল্প স্মরণ হল। ছোটবেলায়ই নাকি একটী সিংহশাবক শৃগালের দলে মিশে গিয়েছিল। শৃগালের সঙ্গে সহবাসে সিংহশাবকটীরও দিন দিন ভীরুতা, ভয়, প্রবঞ্চনা—শৃগালের সমস্ত গুণ তাতে সঞ্চারিত হতে লাগলো। একদিন হঠাৎ এক সিংহ না এ ব্যাপার দেখে, ঐ ছোট সিংহটীকে এক কূপের ধারে নিয়ে তার আত্মস্বরূপ দেখিয়ে দিল। তখন আবার তার ভিতর সিংহের পরাক্রম জেগে উঠল—আর অমনি হুঙ্কার দিয়ে আবার সজাতীয়ের দলে মিশে গেল। আমাদেরও হয়েছে ঠিক এমনি অবস্থা, আমরা কি আর আমাদের শক্তিই বা কতটুকু এর অনুসন্ধান আমরা বড় করি না—তাই হাবুডুবু খেয়ে মরছি !

আমার জীবনের সবখানি রহস্য আমি বুঝে ফেলেছি, একথা জোরগলায় আমি বল্‌তে পার্‌ব ? কোন্‌দিকে না কোনদিকে আমার একটী মারাত্মক গলদ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হচ্ছে, তাই বা কে জানে ! পারিপার্শ্বিকের সঙ্গেই সব যাচাই হয়ে যায়—দশজনে এক তালে, এক ছন্দে চল্‌ছে আর আমার ব্যতিক্রম অপরের মনে সন্দেহের বা উদ্বেগের উদ্রেক কর্‌বে, এতে কি আশ্চর্য্যের কিছু নেই ? সবকে বাদ দিয়ে,

সকল সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, আমার বুঝা তো বুঝা নয়—অবুঝ মাত্র। পরমত-অসহিষ্ণুতায় আমার মস্তিষ্কের তারল্যই তো প্রমাণিত হয়। তুমি যে সামাজিক জীব—সকলের সঙ্গে মিলে মিশেই চল্‌তে হবে তোমার—তা না হলে তো বনে জঙ্গলেই তোমার জন্ম হত। পশুরা মুক্ত, স্বচ্ছন্দে বনে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, তুমি কি সেই ধরণের মুক্তির আস্বাদনই পেতে চাও? কারও সঙ্গে কারও মিল নেই, ভাব নেই—কেবল হিংসার আগুন জ্বল্‌ছে—তুমিও কি চাও সেই হিংসানলকে জীইয়ে রাখতে?

জেদ বলে মানুষের একটা দুরন্ত শত্রু আছে। সত্যকেও অনেক সময় বিসর্জ্জন করে মানুষ, কিন্তু জেদ্‌কে যেন কিছুতেই ছাড়তে পারে না। এ ও তাদের একরকম পৌরুষই বটে; কিন্তু অধঃপতনের দিকেই এর গতি। উপদেশ বলে তাচ্ছিল্য না করে যদি যথাসময়ে গতিকে সংযত করে চল্‌ত, তবে হয়ত আর এমন করে অভিমানীকে লাঞ্ছনা পেতে হত না। আনন্দের মাঝে যে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সুষমা রয়েছে জেদের মাঝে তা নেই—তার মাঝে উগ্রতাই বেশী; তাই কেবল অমিল আর অসামঞ্জস্যের নিদান। আমি তো বলি, ঐক্যই আত্মা—তার ধর্ম্মই হচ্ছে চারিদিকের অংশকে টেনে এনে একটা সুষ্ঠু গঠন দেওয়া। এত বিপ্লব, এত দ্বন্দ্ব, তবু যে দশজনকে ছাড়তে পারছ না; বাহিরে ছাড়লেও অন্তরে যে তাদের দরুণই বেদনা অনুভব করছ—তবু কি বুঝতে পারছ না এ তোমারই আত্মার ব্যাপ্তি! তোমাকে যদি তুমি সম্পূর্ণরূপে অনুভব করে থাক, তবে কেমন করে দশজনকে তুমি অবজ্ঞা করবে? কেন না তোমার অস্তিত্ব যে দশজনকে নিয়েই, একজনকে বাদ দিলেই যে একদিকের অঙ্গহানি হল তোমার।

যেখানে দেখছি, আমার একলা মন আর কিছুতেই সমস্যার সমাধানে পৌছ্‌তে পারছে না, সেখানে আমার বিরাট্‌-দেহের সমষ্টি-মনের উপদেশ নেওয়াতে কি আত্মগৌরবের লাঘব হল? আমার কাছে আমি অপমানিত হই কেমন করে? দুর্ব্বল হলে, মানে নিজের সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ ধারণাতেই নাকি মানুষ অভিমানী হয়ে পড়ে। এতটুকু হয়ে থাকা কিনা, তাই কারও বাতাস গায়ে যেন সহ্য হতে চায় না!

সংশয়কেও অবজ্ঞা কর্‌তে হবে। তুমি যার শরণাপন্ন, তার চেয়ে তোমার সংশয়টাই হল বড়? প্রত্যেক সংশয়ের অনুধাবন করে দিন দিন তার কলেবর বৃদ্ধি করাই কি তোমার লক্ষ্য? সংশয়ই কি তোমার পথ-প্রদর্শক? তা হলে আবার একটা স্পষ্ট নির্দ্দেশের অপেক্ষাতেই বা কেন বসে থাক? সংশয় যে দিকে কম্পাসের কাটা ঘুরাবে, সে দিকে গেলেই যদি চরম লক্ষ্যে পৌছ্‌ব বলে আশা কর, তা হলে তো বিশেষ ব্যক্তির কিম্বা সঙ্ঘের শরণ নেওয়াও নিষ্প্রয়োজন। তা হলে তুমি সেবক নও—স্বেচ্ছাচারী।

জগতের মাঝে এত বৈচিত্র্য, আর এত পার্থক্য তবু তো বেশ নিরুপদ্রবেই চল্‌ছে জগৎ। সুশৃঙ্খল নিয়মে প্রকৃতি তার আপন কার্য্য সাধন করে যাচ্ছে—একটা কথা নেই, কলরব নেই—অথচ নিজের প্রাণ দিয়ে সমস্ত অভাবকে পরিপূরণ করে যাচ্ছে। যে নিয়ামিকা-শক্তি প্রকৃতিকে চালিয়ে নিচ্ছে—আমাদের জীবনে কি সে শুভ-শক্তির উদ্বোধন হতে পারে না?

আত্মা যখন স্বার্থ আর অহঙ্কারের গণ্ডীর মাঝে বদ্ধ হয়ে পড়েন, তখন তার ভিতরের সত্য স্ফূর্ত্তি পায় না। অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়—এ আত্মারই ঈক্ষা। সকলের মাঝে নিজকে উপলব্ধি করে আনন্দ পাওয়াই আত্মার উদ্দেশ্য; তাই পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে আত্মার কেবল প্রসারই হচ্ছে। একার মাঝে সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য নেই, আর আমি কেবল আমাতেই সার্থক নই; তা হলে আর নিয়ত চিত্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে কার দরুণ? আমার আমিও সেই পরম আমিরই অনুসন্ধান করছে। ঐক্যের জীবন স্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে মহাসত্যের পরিচয় পায়; তাই

সে অবচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। পরিণতির দিকে লক্ষ্য করলে আমাদের প্রত্যেকের ব্যষ্টি-জীবনেরই সার্থকতা রয়েছে। অপরকে বাদ দিলে যে প্রকারান্তরে তুমিই বাদ পড়ে যাও—এটা লক্ষ্য করেছ কি?

এটুকু ভুললে চল্‌বে না—তুমি যে সেবক। স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতেই এখানে এসেছ। যেখানে কিছুতেই আর সামঞ্জস্য করে উঠতে পার্‌ছ না—জিজ্ঞাসা করে সংশয় নিরসন্‌ করে নাও না কেন? অহঙ্কারে আর আত্ম-প্রতিষ্ঠার গর্ব্বে যখন তুমি অন্ধ হয়ে যাও, তখন সমগ্র ইচ্ছার স্বরূপ তুমি উপলব্ধি কর্‌তে পার না—এখানে শরণাগতির প্রয়োজন নয় কি? নিজের শক্তিতে বাদ-বিবাদ মিটিয়ে নিতে পার সে তো ভাল কথা—গৌরবের কথা; কিন্তু যেখানে অমিল আর অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে অপরের শুভ নির্দ্দেশই যে একমাত্র উপায়। কৃত্রিমতা থাক্‌লে চল্‌বে না, সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ চাই। লক্ষ্য যাদের এক, তাদের মাঝে এত অভাবনীয় বিরোধের সৃষ্টি হয় কেমন করে? তা হলে তোমরা আপন খুসীমত চল্‌ছ—তোমাদের জীবন ব্যভিচারীর জীবন? শরণাগতিতে জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্জ্জুনের জীবন কি অপূর্ণ-জীবন? হয় নিজের পায়ে নির্ভর করে চল; নয় তো যেমনি চালায় তেমনি চল।

শাশ্বতী

——(:*:)——

কথায় কথায় আমরা মুনি ঋষিদের দোহাই দেই; কিন্তু মুনিই বা কি, ঋষিই বা কি, তাহার কোনও খবর বোধ হয় অনেকেই রাখি না। আমাদের অনেকের কাছেই মুনি আর ঋষি এক পর্য্যায়ের মানুষ, যদিও শাস্ত্র তা বলে না। সাধক আর সিদ্ধে যে তফাৎ, মুনি আর ঋষিতেও সেই তফাৎ। ঋষির সম্বন্ধে আমাদের যাহা প্রচলিত ধারণা, তাহা চোরবাগান আর্ট ষ্টুডিওর ছবিতে, যাত্রাগানের আসরে বেশ ফুটিয়া উঠে। আমাদের ধারণায় ঋষির দৈহিক সম্পদের মাঝে আজানুলম্বিত জটাভার, নাভিস্পর্শী শ্মশ্রু, পরিধানে বল্কল, মাথায় টাক্‌ ইত্যাদি; আর তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার নিদর্শন পাই তাঁহার অহেতুক বা তুচ্ছহেতুক শাপাশাপিতে। তাহা ছাড়া ঋষিরা তো আর এই যুগ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকেন নাই, তাই তাঁহাদের সম্বন্ধে নানা আজগুবি খবর জাহির করিবার আরও সুবিধা হইয়াছে। আজকাল কেহ কেহ ঋষিদিগকে এই যুগের আসরে নামাইয়া আনিবার জন্য টানাটানি সুরু করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঋষিদিগের যাঁহারা অছি, তাঁহাদের চোখরাঙানীকে হজম করিয়া কতদূর কি করিয়া উঠিতে পারেন তাহা বলা শক্ত!

কিন্তু একটা সহজ কথা আমাদের মাথায় আসে না যে, ভগবান্‌কে জানিয়া ফেলাই যদি ঋষিত্বের চরম পরিচয় হয় তো সে খেতাব এ যুগের মানুষেও পাইবে না কেন? ভগবান্‌কে যদি ব্যাস কিম্বা বশিষ্ঠ জানিয়া থাকেন তো আমার কি লাভ হইয়াছে? আমিও যতদিন পর্য্যন্ত ব্যাস বা বশিষ্ঠের মতন করিয়া তাঁহাকে না জানিতে পারিব, ততদিন ব্যাস-বশিষ্ঠের অনুভূতি কি আমার কাজে আসিবে? আর আজ যদি ব্যাস বা বশিষ্ঠের অনুভব আমার মাঝে ফুটিয়া উঠে তো আমার মাঝে ঋষিত্বের অভাব ঘটিবে কোন্‌ নজীরে? উপনিষদ্‌ এমন জোরের কথাও বলিতেছেন, যে

ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্ম হয়; সে এখানেই ব্রহ্মকে আস্বাদন করে। এই ভূমিকায় কি আজকাল কেহ যায় না? যে যায়, তাহার সংজ্ঞা কি? কিন্তু নামের এমনই মোহ যে বরং ব্রহ্মবিদ্‌কে আমরা ব্রহ্মীভূত বলিয়া স্বীকার করিব, তথাপি ঋষিত্বের খেতাব তাঁহার উপর চড়াইতে পারিব না, তাহা হইলেই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে!

ঠিক এমনি গোলমাল হইয়াছে বেদ লইয়া। আজ যদি কেহ বলে "বেদের যুগ", অমনি গোঁড়ারা তাহার চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ করিবেন। বেদ ব্রহ্মের নিঃশ্বাস, একথা মানিয়া নিতে কোনও আপত্তিই নাই। মানুষের যত কিছু চিন্তা, যত কিছু ভাবনা, তাহা সেই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষেরই যে প্রেরণা, তাহা অনুভব করি। তিনিই যে আমাদের ধীকে প্রচোদিত করিয়া আমাদের কণ্ঠে বেদবাণীর আবির্ভাব ঘটাইতেছেন, তাহা জানি। কিন্তু সে আবির্ভাব কি কোনও একটা বিশিষ্ট দেশ কাল পর্য্যন্ত সম্ভবপর হইয়াই রুদ্ধ হইয়া রহিল? বেশ দেখিতেছি—বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ ধাপের পর ধাপে নামিয়া আসিতেছে। কল্পসূত্র-গুলিও উহারই অন্তর্গত হইবে কি না, তাহা লইয়া দ্বিধান্দোলিতচিত্তে তর্ক চলিতেছে। কিন্তু ইহার পর বেদবাণীর প্রসার একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল। বুঝিতে পারি, একটা মহাজাতির হৃদয়কে আন্দোলিত করিয়া বিরাটের ভাবরাশি যখন উন্মথিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে সেই মহান্ত জ্যোতির্ম্ময়কে দর্শন করিয়া, তাহার কণ্ঠে যাহা কিছু ছন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই বেদ। কিন্তু হৃদয়ের স্পন্দন সেইখানেই থামে নাই। তাঁহাকে কর্ম্মে অনুভব করিবার, ভাবনার সঙ্গে জড়াইয়া লইবার এবং আত্মচেতনায় ফিরিয়া পাইবার প্রচেষ্টা জাহ্নবী-ধারার মত জীবনের গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহার পরই কি তাহার সমস্ত প্রগতি রুদ্ধ হইয়া গেল? জাতির জীবনে সত্যের আর কোনও গূঢ়তর, নিবিড়তর, উজ্জ্বলতর প্রকাশ ঘটে নাই? সেও কি সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষেরই প্রেরণা নয়? তাঁহারই নিঃশ্বসিত নয়? কিন্তু অহমিকায় অন্ধ মানুষ, সে কথা মানিতে চাহিল না; তাহার আপন বড়াই বজায় রাখিবার দরুণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের সে শ্বাসরোধের ব্যবস্থা করিয়া বসিল!

কিন্তু মানবের হৃদয় এই হঠকারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। বেদের যে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী আঁকড়িয়া শাব্দিকের দল পড়িয়া রহিল, তাহাদিগকে উল্লঙ্ঘন করিয়াও মানুষ সবলকণ্ঠে প্রচার করিল—বেদ ঋষির হৃদয়ে নিত্যই আবির্ভূত হইতেছে, ঋষিও সত্য এবং সনাতন, বেদও সত্য এবং সনাতন—গুরুমুখই নাদ, গুরুমুখই বেদ। দুঃসাহসী এমন কথাও বলিল—তুমি বেদ বলিয়া যেটুকু আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছ, আমি বিজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, আমি জানি ওটুকু সাগর নয়, ডোবা মাত্র, ওসব কেবল পুষ্পিতা বাক্ মাত্র; বেদ ছাড়া আর কিছু নাই, এ তোমার দম্ভমাত্র—আমি বেদবিধির পরপারের খবরও আনিয়াছি—নিস্ত্রৈগুণ্যের বার্ত্তা আনিয়াছি!

সত্য এমনি করিয়া যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছে। বেদ সত্য, ঋষি সত্য; কিন্তু সে কেবল অতীতের কল্পনা নয়, ভবিষ্যতের মরীচিকা নয়। উহা এই যুগেও সত্য, এখনও সত্য। এখনও ব্রহ্মের মুখ হইতে জ্যোতির্ম্ময় বাণী কত শত হৃদয়ে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে, সে বাণী দর্শন করিয়া মানুষ এখনও ঋষির পদবী লাভ করিতেছে। মানুষকে আশা দাও, ভরসা দাও; ঋষির বংশধর বলিয়া যে তাহাকে শুধু আস্ফালন করিতে শিখাইতেছ, তাহা না করিয়া তাহার মাঝে ঋষিত্বের উন্মেষ ঘটাইবার উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত কর। ঋষি যদি আমার মাঝে না নামিয়া আসিলেন, আমার হৃদয়-

গোমুখী ভেদ করিয়া যদি ত্রয়ীর পবিত্র ত্রিধারা উৎসারিত না হইল তো কি প্রয়োজন আমার কাছে সেই ঋষিত্বের আর বেদের বড়াই করিয়া? আমার পূর্ব্বপুরুষকে আমি তখনই শ্রদ্ধা করিতে পারি, যখন জানি, তিনি আর আমি এক হইতে পারি; আমি শুধু তাঁহার কৃপাকটাক্ষের ভিখারী নই, পিতৃরিক্‌থের আমি সমান ভাগ চাই, আমিও পুত্রত্বের উদ্‌যাপন করিয়া পিতৃত্বের আসন অধিকার করিতে চাই। আমি ঋষির বংশধর, সে আমার কাছে শুধু মিথ্যা জাঁকমাত্র নয়; ঋষি যাহা হইয়াছিলেন, আমিও তাহা হইতে পারি, এই ভরসা বুকে লইয়া তবেই না ঋষির বংশধর বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারি! নতুবা আমার দৈন্য যদি কোনও কালেই ঘুচিবার সম্ভাবনা না থাকে তো মিথ্যা একটা জাঁক করিয়া আত্মাবমাননা করিব কেন?

চারিদিকে আজ বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে; স্তোকবাক্য দিয়া মানুষকে ভুলাইয়া রাখিবার দিন চলিয়া যাইতেছে। অকুণ্ঠচিত্তে এখন সত্যকে প্রচার করিতে হইবে। সে সত্য প্রকাশ করিতে গিয়া যদি কাহারও চিরসঞ্চিত সংস্কারে আঘাত পড়ে তো করুণা করিবার অবসর আমাদের নাই। মানুষ দুঃখ পাক্, তাহার সযত্নরচিত তাসের ঘর ধূলায় লুটাইয়া পড়ুক, তবুও সত্যের জয় হোক্; এই বীর্য্য নিয়া, এই প্রজ্ঞা নিয়া অসত্যের সঙ্গে আমাদিগকে লড়াই করিতে হইবে।

প্রতি পদে পদে আমরা পাই কেবল বাধা, কেবল বিভীষিকা! একটু পা বাড়াইতে না বাড়াইতেই ঈশানে যোগিনী, নৈঋতে ডাকিনী, পেছনে হাঁচি, মাথার উপর টিকটিকী আসিয়া বেড়িয়া ধরিল। আমি সব মানি; স্বীকার করি, ইহার মূলে নিগূঢ় বিজ্ঞান আছে, যাহার তথ্য আমি জানি না (হয়ত জানিবও না); কিন্তু তা বলিয়া মরিতে ভয় পাইব কেন? ডাকিনী-যোগিনী মাথার উপরে লইয়াই আমাকে বাহির হইতে হইবে। তাহাতে যদি বিঘোরে পড়িয়া প্রাণও হারাই তো চরম মুহূর্ত্তে এমন কাহারও মুখ দেখিতে পাইব, যে ডাকিনী-যোগিনীরও বাবা। আমি তো জানি, ডাকিনী-যোগিনীকে চটাইয়া ওইটুকুই আমার সত্যিকার লাভ!

নিজের উপর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই, উপরন্তু রহিয়াছে এতটুকু পৈতৃক-প্রাণকে জীয়াইয়া রাখিবার দরুণ কাঙ্গালীপনা।—এই তো আমাদের দশা। এই কুণ্ঠাদীন প্রাণ লইয়া আমরা চলিয়াছি জগতের গুরুগিরি করিতে!

যাহা দুরূহ, তাহাকে দূরে রাখিয়া কেবল পূজা করিলেই তো চলিবে না। কঠিনকে সহজ করিবার জন্যই তো সাধনা। আর সাধনাতেই শক্তির বিকাশ। সেই শক্তির বিকাশই আমাদের চাই। কল্পলোকের মোহন-চিত্র আঁকিয়া শুধু আমাদের বিস্ময়-বিমূঢ় রাখিলেই তো হইবে না!—দাও, দাও, কে এমন প্রাণবন্ত আছ—এই উন্মুখ-প্রাণের প্রদীপকে তোমার জ্বলন্ত শিখা দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া তোল। আমরা শুধু দূর হইতে আশীর্ব্বচনটুকু কুড়াইয়া লইয়াই খুসী থাকিব না—আমরা চাই আমাদের মাঝে তোমাদিগকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে!

এই যে আপনাকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিবার আকুলতা, ইহাই প্রাচীনের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা। প্রাচীনকে আমি নূতন করিয়া আমার মাঝে অনুভব করিতে চাই; আমি যে প্রাচীনকে ভালবাসি, ইহা তাহারই পরিচয়। আর সে প্রাচীন যদি কুহেলিকায় আচ্ছন্ন চিরকালের অতীত হয়, সে যুগ যদি আর কোনও দিন আমাদের মাঝে ফিরিয়া না আসে তো কি হইবে তাহার শ্রাদ্ধবাসরে শুধু বিনাইয়া বিনাইয়া বিলাপ করিয়া? যাহাকে কোনও কালে আপন করিয়া লইতে পারিব না, তাহার স্মরণ-মননে আমার কি লাভ?

তুমি বলিবে, যতটুকুই পাও, ততটুকুই তো লাভ। আমি সে কথা মানি না। আমি ভিখারী নই, খুদকুঁড়া কুড়াইবার জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি না। আমি চাই আমার হক্, কাহারও খয়রাত নয়। যদি বল, আমার হক্ আমাকে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝাইয়া দিবার সাধ্য তোমার নাই, তাহা হইলে মিথ্যা আমার সম্মুখে জাঁক করিতে আসিও না—দূর হইয়া যাও আমার সম্মুখ হইতে ওই স্তোকবাক্যের পসরা লইয়া!

এই বিদ্রোহের বাণীই আজ দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। পরিণাম সম্বন্ধে অন্ধ ভয়াতুর আমরা—আমরা ইহার উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস দেখিয়া সাত-পাঁচ ভাবিয়া মরিতেছি। কেন এই ভাবনা? আত্ম-প্রত্যয় যে কি বস্তু, তাহা কোনও কালে জানি নাই বলিয়া। দেবতার পূজা শিখাইয়াছি, কিন্তু যে মন্ত্রে আত্মপ্রাণ দ্বারা দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহার তাৎপর্য্য শিখাই নাই। ঋষিকে শ্রদ্ধা করিতে হুকুম করিয়াছি, কিন্তু ঋষির যে নির্ম্মল অবদান ভাগবতী দ্যুতিকে আপনার বক্ষে প্রতিফলিত করিয়া সার্থক হইয়াছিল, তাহাকে অর্জ্জন করিবার সঙ্কেত কাহাকেও বলিয়া দিই নাই। আজও দেখি, মহাপুরুষের শরণাগত হই, তাঁহার গুণ-কীর্ত্তনে অসম্ভব মুখর হইয়া উঠি; কিন্তু আমাদের যত আবেগ উচ্ছ্বাস অবশেষে তাঁহার কাষ্ঠ-পাদুকার পূজায় আর তৈলচিত্রের ধূপারতিতে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। আর এই অজ্ঞতার আবছায়ায় রচিয়া ওঠে নানা আজগুবি গল্প, নানা কিম্ভূত-কিমাকার কাহিনী—"কি-জানি-কি-হইতে কি-হয়" গোছের একটা ছম্‌ছমানি মাত্র! এই কি পূজা? এই কি শ্রদ্ধা?

যে প্রাচীন কালের প্রবাহকে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, যাহা জীর্ণ হইয়া পচিয়া-ধসিয়া পড়ে, তাহাকে চিরকাল প্রত্যাখ্যান করিব; তাহাকে বর্জ্জন করিয়াই আমাদের পৌরুষের সার্থকতা। আমরা উপাসক সেই চিরন্তন প্রাচীনের, যাহা যুগে যুগে নূতন নূতন আধারে আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিতেছে। সেই শাশ্বত সত্যের আবির্ভাব আজ আমার হৃদয়েও সম্ভব, এই বিশ্বাসে প্রাণ দিব। আমার বিদ্রোহ জড়তার বিরুদ্ধে, আমার প্রণতি স্ফুরন্ত প্রাণের প্রতি। অনাদি কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আমারই লীলায়িত মহিমা আমি অনুভব করিতেছি—এ লীলার আদি নাই, অন্ত নাই—নব নব উল্লাসে আমার চিত্ত হিল্লোলিয়া উঠিতেছে—মুগ্ধ বিস্ময়ে যাহার স্মৃতিজীর্ণ আলেখ্যের প্রতি তুমি চাহিয়া রহিয়াছ তাহাকেই আমার হৃদয়ের রক্ততালে আমি অনুভব করিতেছি। আমার শ্রদ্ধার এই রূপ। এই বস্তু যদি তুমি আমায় চিনাইয়া দিতে পার তো গুরু বলিয়া তোমার পায় লুটাইয়া পড়িব। আমিও নত হইতে জানি, কিন্তু অসত্যের কাছে নয়, স্তোক-বাক্যের কাছে নয়।

শাধি মাং;—আমাকে শাসন কর, কিন্তু ভয় দিয়া নয়, যুক্তি দিয়া; আমার মনুষ্যত্বের সম্মান পদদলিত করিয়া নয়, মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বে, দেবত্ব হইতে ঈশ্বরত্বে, ঈশ্বরত্ব হইতে ব্রহ্মত্বে আমার প্রকৃতিকে অঙ্কুশাঘাতে প্রচোদিত করিয়া তুমি আমায় শাসন কর; তোমার শাসন আমি মাথা পাতিয়া লইব। কিন্তু চরম কথাকে রহস্যের জালে আচ্ছাদিত করিয়া যদি ছন্দোবন্ধে কেবল বিনাইয়া বিনাইয়া এই কথাই আমাকে শোনাইতে থাক যে সেই সত্যযুগে যাহা হইয়াছিল এই যুগে তাহা আর হইবার উপায় নাই, অতএব হে কলিহত মানব, তুমি সেই সত্যযুগের উদ্দেশ্যেই তোমার ভাণ্ডারের যত চাল-কলা নিবেদন করিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া থাক; তাহা হইলে দূর হইতে তুমি আমার নমস্কার লইয়া বিদায় হইয়া যাও; তোমাকে আমার কোনও প্রয়োজন নাই।

বেদ সত্য, ঋষি সত্য, হাঁচি-টিক্‌টিকি সবই সত্য ; কিন্তু মূলে আমি সত্য না হইলে সবই মিথ্যা—এই পরমসত্যকে আঁকড়িয়া মরিতেও আমরা ভয় পাই না। হে সনাতন শাস্তা, যে আদর্শকে আমাদের মাঝে তুমি বাস্তব ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারিবে, সেই আদর্শের কথাই আমাদের শোনাও। সেই আদর্শকেই আমরা গুরু বলিয়া স্বীকার করিব এবং তাহারই সাযুজ্য-সারূপ্য লাভ করিবার জন্য সমস্ত বিভীষিকা ও দুর্ব্বলতার সহিত কঠিন সংগ্রাম করিব। যাহাকে পাওয়ার সামর্থ্য আছে, তাহাতেই আপাততঃ আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া দিই। শুধু অলস কল্পনার রঙীন্ মায়া নয়, আমাদের দাও একটা কঠিন সত্য, একটা জ্বলন্ত প্রত্যয়!—ইহাই আমাদের বেদ এবং আমরা এই বেদেরই ঋষি। যদি আমরা সমানধর্ম্মা হইতে পারি, তবে ঋষিহৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিবে, কেননা সে হৃদয়ে কার্পণ্যের স্থান নাই, ইহা আমরা ধ্রুব জানি।

মিলন

—(:*:)—

ওগো,

আমার প্রাণে লাগলে ব্যথা, জানি তোমার সইবে না—
এ পারেতে উঠবে যে ঢেউ, এ পারেই তা রইবে না।
তোমার আমার মিলন-কথা,
কত সুখের দুখের ব্যথা ;—
আমার বুকে আছে যা, তা
গলিয়ে মোরেই বইবে না—
(জানি) তোমারো তা সইবে না।
প্রতি গানের প্রতি সুরে,
তুমি আছ হৃদয় জুড়ে—
ভাবি আমি যতই দূরে
টেনেই কি শেষ লইবে না?—
(নইলে) তোমারো যে সইবে না।
একটী দিনের মিলন-স্মৃতি
সকল জ্বালার হয় যে ইতি—
নয় কি তাহাই শেষের গীতি
এই কথাই কি কইবে না?
(শেষে) সকল মধুর হইবে না?

নিষ্ঠা

—*—

একভাবে চল্‌তে চল্‌তে আমাদের শৈথিল্য এবং অমনোযোগ আস্‌তে থাকে। নৈরাশ্যজয়ী নিষ্ঠাই স্মরণ করিয়ে দেয়—কই তুমি তো ঠিক পথে চলনি, এ যে ভ্রান্ত পথ—ওদিকে চল, তা হলে আর পতনাশঙ্কা নাই। সমস্ত দিনের মাঝে বাজে কথায়, বাজে চিন্তায়, এম্‌নি করে কত যে শক্তির অপব্যয় হচ্ছে তার কোন সীমা-পরিসীমা নাই; কিন্তু এই যে অসংযম আর চঞ্চলতার উদ্দণ্ড নৃত্য, একে সুনিয়ন্ত্রিত কর্‌তে পারে একমাত্র নিষ্ঠা। নিষ্ঠা বহুদূর-দর্শিনী, ভবিষ্যতের অনেকখানি অদৃশ্য অংশ তার কাছে স্পষ্ট প্রতিভাত। তাই সে কারও কথা মানে না, উপরোধ-অনুরোধে অশান্ত হয়ে ওঠে না, ধীরে ধীরে একান্ত মনে উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল পথে অগ্রসর হতে থাকে। তারপর যখন দেখি, নিষ্ঠা একটা সত্যিকার জিনিষ আবিষ্কার করেছে, তখন একদিন বুঝি তার অনিবার্য্য একাগ্রতার ফল। নিষ্ঠাই আমাদের পথপ্রদর্শক, কেননা তার দৃষ্টি তো বহুদুর পরিব্যাপ্ত; আমরা আর আমাদের জীবনকে কতদূর বুঝেছি? এই নিষ্ঠার জোরে যাদের দিব্য-চক্ষু খুলে গিয়েছে, তারাই জগাই-মাধাইয়ের মত পাষণ্ড দুরাচারকেও আলিঙ্গন করে বল্‌তে পারেন—তোরা যে আমার অন্তরঙ্গ পরমভক্ত। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের কাছে যা অপ্রত্যক্ষ, নিষ্ঠার দিব্য-চক্ষে তাও যে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে; প্রহ্লাদ স্ফটীক-স্তম্ভে হরিকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন বলেই হরিভক্ত, বিদ্বেষী পিতাকেও জোর গলায় প্রত্যুত্তর করেছিলেন, "হাঁ, হরি এর ভিতরও আছেন।" শক্তির ক্রিয়া না দেখ্‌লে আর শক্তি বিশ্বাস হতে চায় না, হরি যে আছেন, নৃসিংহ মূর্ত্তি ধরে যদি হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ না কর্‌তেন, তবে আর বিশ্বাস হত না।

নিষ্ঠার কাজই হচ্ছে তোমাকে সদা জাগ্রত রাখা। বিভ্রান্ত চিত্তে যখন কোন দিক্ দিয়ে ভগবানের সাড়া না পেয়ে চঞ্চল হয়ে নাস্তিক সেজে বস, তখন নিষ্ঠাই এসে কাণে বারবার আশ্বাসের বাণী বল্‌তে থাকে, এই শেষ নয়, এর পরেও কিছু আছে—তিনিই ভগবান। যার যার সুবিধা-অসুবিধা বুঝে সবাই তোমায় ত্যাগ কর্‌তে পারে, কিন্তু নিষ্ঠা তোমার চিরসঙ্গী। তোমার মনে থাকুক কিম্বা তুমি ভুলে যাও—নিষ্ঠা নীরবে তার আপন কার্য্য সাধন করে চল্‌বেই চল্‌বে। বাহিরের কোন যশ-প্রত্যাশা নেই তার; সফলতায় সে মাত্রা ছাড়িয়ে আনন্দের আতিশয্যও করে না, আবার নৈরাশ্যে ও তার আবেগ দমিত হয় না। এই হঠাৎ একটা বুজ্‌রুকি কোন কিছু পাওয়ার চেয়ে, দৈনন্দিন জীবনের নিষ্ঠা দিয়ে যে সত্যে গিয়ে উপনীত হই, তার মূল্য কি বেশী নয়?

গীতাকারও বলেছেন, শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার কথা—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ অধিকারীই হচ্ছে শ্রদ্ধাবান্। তাঁর মনের প্রবল বিশ্বাসকে নানা দিক থেকে আহত কর্‌লেও সে অবিচলই থাকে। এই যে নিষ্ঠা এবং ব্যভিচারী-ভাব নিয়ত এদের মাঝে দ্বন্দ্ব চল্‌ছেই। কেউ কারও কথা শুন্‌বে না—দুজন চল্‌বে দু'পথে। এখন আমাদের জীবনকে প্রবাহিত কর্‌তে হবে কোন্ ধারায়? অবিচলিত সত্যের আভাস বিদ্যুতের মত অনেক সময় দীপ্তিমান্ হয় বটে; কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের কোলাহলই সে স্মৃতিকে মন থেকে মুছে

ফেলে। অবিশ্বাসের জোর এত প্রবল হয়ে ওঠে—প্রতিকূল চিন্তাই তখন জাগে বেশী।

উপাসনায়, অনুষ্ঠানে, সব দিন সমান অনুভূতি পাই না, কিন্তু তবু নিষ্ঠা হারাব না—কে জানে ভাগ্যে যে দিন কিছু মিল্‌ত, সে দিনই বা ফাঁকিতে পড়ি! আমাদের যে ক্ষুদ্র শক্তি, নানাদিকের ঘাত-প্রতিঘাত এসে কেবল চঞ্চল তরঙ্গেরই সৃষ্টি কর্‌ছে; কিন্তু তার মাঝেও যদি নিমেষের তরে শান্তি পাবার বাঞ্ছা জেগে ওঠে—তা জাগ্‌বে শুধু নিষ্ঠার জোরে। জাহাজের খালাসীরা দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; তবু দেখ্‌ছি, তাদের নমাজের সময়টা কিছুতেই উত্তীর্ণ হচ্ছে না। সারাদিনের কয়লার ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে তাদের প্রফুল্ল মনের মাঝেও কাল আবরণ পড়ে গেছে তারা যদি মুক্তির আস্বাদন পায় তবে এই একটু আরাধনার সময়েই। আল্লার প্রতি এই যে একটু সময়ের দরুণ আকুল প্রার্থনা এতেই তাদের কাজ হয়ে যায়। কিন্তু এই কালা ছাই-মাখানো লোকটা, যে নাকি কাজের চাপে ভাল করে দিন-রাতের খবরও রাখতে পারে না, তার প্রাণে উপাসনার আবেগ জাগিয়ে তোলে কে?

আমরা ফাঁকি দিতেও চাই না, ফাঁকিতে পড়্‌তেও চাই না। কিন্তু দিবসের এমন একটী শুভ-মুহূর্ত্তকে যদি আমরা নিষ্ঠা দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে প্রতিষ্ঠা না কর্‌তে পারি, তবে আমাদের কর্ম্ম পরিশ্রান্ত চিত্ত শীতল হবে কার পরশে? আমাদের নিষ্ঠা দিয়ে, যার যার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়েই সেই শক্তি-পীঠের মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে কিছু সময়ের দরুণ তাঁর সন্নিকটে যাব—জীবনে শক্তি-সঞ্চার কর্‌তে। চুলচেরা বিচার কর্‌তে কর্‌তে, ভগ্নাংশের সৃষ্টি কর্‌তে কর্‌তে সমষ্টি জগতের সমষ্টি আনন্দময় রূপ তো ভুলে যাইই, এমন কি আমাকেও আমি ভুলে যাই। এই যে সাময়িক বিরতি—আমাকেই আমি ফিরে পাব এই আকাঙ্ক্ষায়। ক্ষণিকের তরে আমাদের মন থেকে নিঃশেষে ভাল মন্দ, শুভ-অশুভের স্মৃতি মুছে ফেল্‌তে হবে। কর্ম্মের প্রবল সংস্কারে হয়ত সব দিন মন মুক্ত হবে না—তবু সেই উপাসনার মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হবই হব।

শমনের ডাক এলে যেমন আর এ জগতে থাক্‌বার অধিকার থাকে না, উপাসনার সময় উপস্থিত হলেও আর আমাদের ধূলো-কাদায় জড়িয়ে থাক্‌বার অধিকার নেই। কোলাহলে আমরা সব ভুলে যাই, তার দরুণই নিরবয়ব সজাগ-প্রহরী নিষ্ঠার প্রয়োজন। আমি ঘুমিয়ে পড়লেও সে আমায় জাগিয়ে তুলবেই তুল্‌বে। জীবনে এমন সহৃদয় শুভানুধ্যায়ী আর কে হতে পারে—একমাত্র নিষ্ঠা ছাড়া?

কারও ইচ্ছায় আঘাত দেব না, এই ছিল প্রথম-জীবনের সহজ ধারণা; তাই কাউকে জোর করে নাম করানো, সঙ্ঘের উপাসনায় যোগ দিতে অনুরোধ করা—ভাল লাগুক আর নাই লাগুক শুধু আমার ইচ্ছার প্রগতি লক্ষ্য করে, অপরের রুচি-বিরুদ্ধ কোন একটা কর্‌তে গিয়ে যেন প্রাণে খুব সঙ্কোচ বোধ হত। মনে হত, এখানে এসেও যদি মন বাহিরেই পড়ে থাকে এর চেয়ে এখানে না আসাই তো ভাল। কিন্তু তখন তো এমন করে নিষ্ঠার মাহাত্ম্য অনুভব করিনি। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যারা এসে যোগদান করত, আজ যে তাদেরেই চোখের সাম্‌নে দেখতে পাচ্ছি; যাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা যে একেবারেই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। পরিণাম দেখে আজ স্পষ্টই এ কথা বল্‌তে সাহস পাচ্ছি—ভাল লাগে আর না লাগে তবু তোমাদের নিষ্ঠাকে জাগিয়ে রাখতেই হবে।

যতদিন পর্য্যন্ত ভগবৎ-প্রাপ্তি বিষয়ে একটা অদ্ভুত ধারণা ছিল - যেমন অমাবস্যা রাত্রে অমুক উপকরণের সাহায্যে বিশিষ্ট তিথিতে তিনি এসে আমাকে কৃপা করতে হাজির হবেন—ততদিন সহজ দৈনন্দিন সাধনার চেয়ে, বিশিষ্ট সাধনার প্রতি একটা

লোভ ছিল। তখন বল্‌তাম, রোজ রোজ আবার ভগবৎ আরাধনা কি, এ নিষ্ঠার আবশ্যকতাই বা কি — তিনি তো বিনা সাধনেই একদিন এসে আমায় কৃত-কৃতার্থ কর্‌বেন! নিজের ভিতর যথেষ্ট গলদ থাকা সত্ত্বেও যে সিদ্ধের মত ব্যবহার—এ কি প্রবঞ্চনা নয়? তখন বুঝিনি যে অহৈতুক কৃপাসিন্ধুর স্থান অপবিত্র হৃদয়ে কখনও সম্ভব হতে পারে না। মন তো আর একদিনেই স্বচ্ছ হয়ে যায় না, নিত্য-নূতন ময়লা-মাটী এসে সঞ্চিত হয়—তার দরুণ নিত্যিকার সাধন-নিষ্ঠা প্রয়োজন নয় কি?

সাধনার বড় বাধাই হচ্ছে নিষ্ঠার অনভ্যাস। সারাদিন তো সকল ইন্দ্রিয় স্বেচ্ছায় খেয়াল-খুসীতে বিচরণ কর্‌ছেই—যে যেখানে গিয়েছে সবাই যে নিষ্কলুষ হয়ে ফিরেছে, কোন দিক দিয়ে কলঙ্কের দাগ রেখে আসেনি—এ কথা তো বল্‌তে পারা যায় না। দিবা-শেষে তাদের সকলকে নিয়ে মনের মাঝে এক বৈঠক্ জমাতে হয়—কে কতটুকু উপকারই কর্‌ল বা অনুপকারই কর্‌ল। অপরাধ, ত্রুটী-বিচ্যুতি এ সব থাক্‌বেই, কিন্তু প্রাত্যহিক উপাসনায় পাপের জের জমতে পারে না। আর তিনি চান্‌ও আমাদের কাছ থেকে এই, "দোষ-অপরাধ কর, কিন্তু দিনান্তে একবার এসে প্রাণ খুলে সে সমস্ত আবর্জ্জনা বিসর্জ্জন দিয়ে তোমরা স্বচ্ছ হয়ে যাও।" বহুদিনের সঞ্চিত ময়লা-মাটী নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আমাদেরও যেমন ভারী কষ্ট হয়, তেমনি তাঁকেও তো কষ্টে ফেলা হয়। এক পলকের দৃষ্টিতে যে দৈনন্দিন পাপের ময়লা বিদূরিত হয়ে যেত—আজ তো তিনি এত শুভদৃষ্টি সঞ্চার দিয়েও আমার কিছু একটা পরিবর্ত্তন ঘটাতে পার্‌ছেন না। এর দরুণ দায়ী কি আমি না তিনি?

প্রকৃত সত্যকে তুমি বাদ দিলেও, জগৎশুদ্ধ লোকের মন থেকে তো তা বিতাড়িত করতে পারবে না। জগৎশুদ্ধ লোক বল্‌ছে, ভগবান আছেন—অতএব তিনি নাই, এ ভাবে সাধনা কর্‌লে তুমিই ফাঁকিতে পড়্‌বে শুধু। নাস্তিক হওয়া, শূন্যবাদী হওয়া, এ তো তোমার আত্মার জোরেই আত্মার স্পর্দ্ধা। আর কাউকে মান আর নাই বা মান—তোমাকে তো অন্ততঃ তুমি স্বীকার কর। প্রবৃত্তির পথে ঘা খেতে খেতে তোমার নিষ্কলুষ রূপের প্রতি কি তোমার একটা নিষ্ঠা জাগে না? আমি তো বল্‌ছি, তোমার আসল রূপের নিষ্ঠাবান্ পূজারীই তুমি; এই যে মন ভাল লাগছে না বলে বলছ, তার মূলেও রয়েছে তোমার সেই নিষ্কলুষ রূপের আকর্ষণ; তা না হলে তো তোমার অন্ততঃ একস্থানে স্থিতি হত। সবারই যদি একটা পরিণাম থেকে থাকে, তবে আজ যা ভাল লাগ্‌ছে না, কাল যে তা ভাল লাগ্‌বে না—তার গ্যারাণ্টি তুমি কেমন করে দিতে পার? তা হলে নিষ্ঠা তো উপকারীই—অপকারী নয় তোমার?

বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জ্জুনও হজম করে উঠ্‌তে পারেন নি; কেননা সে দেখা তো স্থূল চোখের দৈনন্দিন সহজ রূপের দর্শন নয়—সে হচ্ছে অদ্ভুত একটা আচম্‌কা দেখা। তাই একদিনে যদি ভগবান্ অজস্র কৃপারাশি বর্ষণ কর্‌তে থাকেন, তবে সে কৃপা রাখ্‌বার যোগ্য আধার কোথায় আমাদের? চিরদিন অন্ধ কোঠায় থেকে থেকে হঠাৎ একদিন যদি রূপের অজস্র ধারা বর্ষিত হতে থাকে, তবে দেখব কি—চোখ যে ঝল্‌সে যাবে—অন্ধ হয়ে যাব! একটু একটু করে পাওয়াতেই তো আনন্দ। রোজ রোজ গিয়ে নিজকে রিক্ত করে তাঁর কাছে গিয়ে যে উপস্থিত হই, তাতে যে শক্তি সঞ্চার করেন তিনি আমার মাঝে, তা তো কোনদিক্ দিয়ে বিচলিত করে না আমায়। রোজই তাঁর কাছ থেকে কোন না কোন কিছু পাওয়ার আছেই - একদিনের অনুপস্থিতিতেও যে অনেকখানি

বঞ্চিত হতে হয়। এ দিক থেকেও তো সাধন-নিষ্ঠার প্রয়োজন কত তা বুঝা যায়। নিষ্ঠার কাজই হচ্ছে তোমায় নিয়ে শেষ লক্ষ্যে পৌছান, তার আগ পর্য্যন্ত সে কিছুতেই থাম্‌তে দিবে না তোমায়। আজ যে অনুভূতির আনন্দ নিয়ে মস্‌গুল হয়ে আছ, তা থেকেও ছিনিয়ে আন্‌বে তোমারই নিষ্ঠা—সে বল্‌বে চোখ মুদ্রিত করো না, চেতনাকে বিলুপ্ত করো না,: আজ যা দেখছ কাল এর চেয়েও আরো মজার জিনিষ দেখ্‌তে পাবে। কোন্‌ দিন তিনি অভয় হস্তে কল্যাণাশীষ বর্ষণ কর্‌তে আস্‌বেন্‌, এ তো কারুও জানা নেই—তাই বল্‌ছি তাঁর কাছে উপস্থিত থাকা চাই প্রতিদিন।

এই যে লাভ-অলাভকে উপেক্ষা করে প্রাণের অদম্য উৎসাহ নিয়ে লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাওয়া—নিষ্ঠা না থাক্‌লে মানুষ এ কর্‌তে পারে না। এই তো ধর না, এখন আলস্য-জড়তায় একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তোমায়—বাহির থেকে তোমাকে সচেতন করে দেবে এমন বন্ধুও নেই. তখন যদি তোমার অবিচলিত নিষ্ঠা থাকে—সেই তো সমস্ত বাধাকে উল্লঙ্ঘন করে, একটা চেতনা জাগিয়ে তুল্‌বে। এক কথায় বল্‌তে গেলে নিষ্ঠা তোমার Safe-guard।

হিমাচলের পথে

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

আমরা ক্রমে আরও ১ মাইল গিয়েই চটী পেলাম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে দেখে এখানেই রাত্রি কাটাব স্থির কর্‌লাম। প্রায় সব চটীই খালি। এর ২০ মাইল পর বন্দর-চটী। সেখানে থাক্‌বার বিশেষ সুবিধা আছে বলে অধিকাংশ যাত্রীই বন্দর চটী চলে যায়। আমাদেরও সময় থাক্‌লে বন্দর-চটীতে চলে যেতাম। কুণ্ডু-চটীতে জলের খুব কষ্ট। পূর্ব্বে একটী বড় ঝর্‌ণা ছিল, কালক্রমে সে ঝর্‌ণা নষ্ট হয়ে গিয়ে এখন খানিক নীচুতে পাথর চুঁইয়ে সামান্য জল পড়ে। উপায় নাই, বাধ্য হয়েই এখানে থাকতে হল। এখানে একজন সাধুর ভেদ-বমি হওয়াতে, যদিও কলেরা হয়নি, তবু এখানে এমন ভয়ানক ভয়ের সঞ্চার হয়েছে যে কেউই এ চটীতে থাক্‌তে চাননি। আমরা কিন্তু থাক্‌লাম। রোগীটীকে দেখে যথাসাধ্য ঔষধ দিলাম। অসুখ হয়েছে তার আজ তিন দিন। আমার ঔষধেই রোগীটী সেরে যায়। কুণ্ডু চটী পাহাড়ের খুব উপরে। আমাদের চটীর উত্তর দিকটা খোলা। উত্তরের পাহাড়ে বৃষ্টি হওয়ার জন্য রাত্রে খুব শীত পড়েছিল। সন্ধ্যা হতেই শীতের দৌরাত্ম্য সুরু হল। যে সব গরম কাপড় ছিল, তাতে সে শীত দম্‌ল না। তখন শীতনিবারণার্থে আমি, চিদানন্দ দাদা, আর হরিদাস ভায়া তাড়াতাড়ি করে আলুভাজি দিয়ে গরম গরম খিচুড়ী খেয়ে নিলাম। বাকী সবাই রুটি খেলেন।

কুণ্ডু চটী ৩ মাইল

মোহন চটী হতে কুণ্ডু চটী ৮ মাইল। এ ৮ মাইল রাস্তা প্রায় সবটাই চড়াই। একেই বিজলীর কঠিন চড়াই বলে। যারা গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, দেরাদুনের পথে রওনা হয়, তাদেরও মুশুরীর কঠিন চড়াই অতিক্রম কর্‌তে হয়। হিমালয়ের প্রথম

স্তরটী যেন খুব উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা, তার পরই আবার নীচু। অনেক দূর প্রায় ৫০।৬০ মাইল গিয়ে আবার ভীষণ উঁচু পাহাড়। সেই সাম্‌নের বেড়া পাহাড়টী মুশুরী—এদিকে বিজলীর পর্ব্বত। মুশুরীর পাহাড় ৬৫০০ ফিট্ উচ্চ। বিজলীর পর্ব্বতও তার চেয়ে বিশেষ কম নয় বলেই মনে হল। এর পর আমাদের ক্রমে নীচুতে নাম্‌তে হবে। আজ আমরা দুবেলায় ১৩ মাইল পথ অতিক্রম করেছি। হরিদ্বার হতে এ স্থান ৩২ মাইল। কুণ্ড-চটিতে ৪।৫ খানা দোকান আছে। একরকম প্যাড়া পাওয়া যায়—১৲ টাকা সের। সদ্যঃপ্রস্তুত পেয়ে নেওয়া গেল।

২২শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।—

রাত্রে শীত বেশী ছিল—বিশেষ অসুবিধা হলেও ঘুম বড় কম হয়নি। আমাদের কুলী মণিরামের এত মাল নিয়ে চল্‌তে বিশেষ কষ্ট হওয়ায় আর একজন কুলী ঠিক করে রেখেছিলাম। মণিরামের বোঝা প্রথম ছিল ১।৬ সের, সহযাত্রীদের কল্যাণে পরে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ মণ। প্রথমে সকলেই কিছু কিছু মাল নিজেরা বইবার মত সঙ্গে রেখেছিলেন; কিন্তু এক বিজলীর চড়াইয়েই সে উদ্যম নষ্ট হয়ে গিয়েছে, ধীরে ধীরে এক এক করে সবাই নিজ নিজ বোঝা কুলীটির ঘাড়েই চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এর জন্য কেউ কেউ আমার উপর আবার অসন্তুষ্টও হয়েছেন। নিজের সামান্য কম্বল দুখানিও নিতে নারাজ—এদিকে কুলী বেচারীর প্রাণ যায় যাক্। আমি এই সব কুলী-বিভ্রাটের জন্যই গত কাল সন্ধ্যাবেলা একজন কুলী ঠিক করে রেখেছিলাম, সে আমাদের সঙ্গে দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত যাবে। সেখানে তার দরুণ আলাদা রসিদ করে দিব। এখন যত মাল নিয়ে সে যাবে, তার ভাড়া এই কুলীর পাওনা থেকে কেটে দেওয়া যাবে। আমরাও কিছু উপরি দিব। ২।৪টী পয়সা চানা গুড় খেতে রাত্রেই দেওয়া গেল। মণিরাম বেচারা কখনো মোট বয়নি, জীবনে এই প্রথম মোট নিয়ে এ পথে চলেছে। শুধু টাকার লোভে যতই তার ঘাড়ে চাপান গিয়েছে বিনা গর-রাজীতে কাল বয়ে এনেছে। তার কষ্ট দেখে আমাদের খুব কষ্ট হয়েছিল, তাতেই অন্য একজন কুলী করে ছিলাম। সকালবেলা সকলেই আপন আপন সাথের জিনিষগুলিও রেখে রওনা হয়ে গেছেন—উদ্দেশ্য, যখন দুজন কুলী হয়েছে, তখন সব জিনিষই তারা বইবে। মণিরাম প্রায় দশ-আনী পরিমাণ মাল বেঁধে রওনা হল। নূতন কুলীটি আমাদের বাকী জিনিষপত্র দেখেই ভয়ে লম্বা দিল—অনেক তোষামোদ করেও তাকে রাখা গেল না। সে বলে, আমি অত বোঝা কিছুতেই নিতে পারব না! তখন আর কি করা যায়? ভাণ্ডার ছড়িদার সুরেশানন্দ আর আমি আছি, বাকী সবাই চলে গিয়েছে। অগত্যা আমরাই জিনিষগুলি নিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লাম। কিছুদূর যাবার পরই আমাদের কুলী মণিরামের সঙ্গে দেখা হল। তার কাছে কিছু মাল আমি দিলাম, তবু আমার যথেষ্ট বোঝা হয়েছিল। গত কাল যেমন কঠিন চড়াই করে এসেছি, আজ আবার তেমনি কঠিন উৎরাই। মাইল খানেক যাবার পর পথের ধারে এক সাধুর পর্ণকুটীরে মণিরাম বিশ্রাম কর্‌ছিল। নিকটেই একটি পরিষ্কার ঝরণা আছে। আরও মাইল খানেক যাবার পর উপর হতে চিদানন্দদাদাকে বন্দর চটী ছাড়াতে দেখ্‌তে পেয়ে চীৎকার করে ডাক্‌তে লাগলাম। তখনও আমি ১ মাইলেরও বেশী উপরে আছি। কয়েক ডাক দিবার পর পর্ব্বতের প্রতিধ্বনিতে তিনি শুন্‌তে পেলেন। তাঁকে অপেক্ষা কর্‌তে বলে আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলাম।

এ চটীটি বেশ সুন্দর। তখন বেলা সাড়ে আটটা হবে। বাঙ্গালা দেশে যেমন নদীর ধারে হাটবাজার বা দোকান থাক্‌লে তাকে বন্দর বলে, এ চটীটিও তেমনি ভাগীরথীর অতি নিকটে বন্দরের মত বলে বোধ হয় এর নাম বন্দর চটী হয়েছে। বন্দর চটীর দুপাশেই বড় বড় ঘর। রাস্তার পাশে অশ্বত্থগাছের তলায় অনেকগুলি ঘর আছে। এখানে ১৬টী চটী আছে। স্থানটী মনোরম। গত কাল আমরা এখানে এসে থাক্‌ব মনে করেছিলাম, কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। চটীর পাশ দিয়েই ভাগীরথী কলকল নাদে প্রবাহিতা, পার্শ্বে আর একটী ঝরণাও আছে, সেটীও খুব বড় নদীর মত, ক্রমে ভাগীরথীর সঙ্গে এসে মিলেছে। জলের এবং থাক্‌বার কোনই অসুবিধা নাই, প্রাকৃতিক দৃশ্যও পরম উপভোগ্য। অশ্বত্থগাছটীর তলা পথরে বাঁধান, তাতে বেশ আরামে বসা যায়। গঙ্গার অপর পারে খাড়া পাহাড়, আবার দক্ষিণ পাশেও খাড়া পাহাড়। স্থানটী বেশ নির্জ্জন, সর্ব্বদাই ভাগীরথীর সুমধুর কলগীতি ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না স্থানটীর সৌন্দর্য্য দেখলেই কোন ঋষির তপোবন বলে মনে হয়। রাস্তার সকলকেই পিছনে ফেলে আগে চলে এসেছিলাম। ক্রমে সকলেই এসে হাজির হয়ে কুলীবিভ্রাটের মন্তব্য নিয়ে ব্যস্ত। নানা গোলমালের পর শেষে স্থির কর্‌লাম, যেমন করেই হোক্ দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত জিনিষগুলি পৌঁছিয়ে দিয়েই আমি একা রওনা হব। সাথীর আর কোন দরকার নাই। **সাথী একমাত্র ঠাকুর!** এই সংকল্প ঠিক করেই কুলীর খোঁজে লেগে গেলাম। কুলী পাওয়া গেল না। ঘোড়া পাওয়া গেল। অগত্যা একটি ঘোড়া ৬৲ টাকায় ভাড়া করে অর্দ্ধেক জিনিষ ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে রওনা হওয়া গেল। আমাদের কুলী দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত ছিল কাজেই দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত জিনিষগুলি পৌঁছিয়ে দিতে পার্‌লেই আমি খালাস। ঠাকুরের কৃপায় কুলী দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত করায় বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। দেবপ্রয়াগ গিয়ে স্থির হবে, আমরা কোন্ দিকে যাবো। কেহই কোন কাজে অগ্রগামী হয় না, অধিকন্তু অগ্রগামী হলেও নানা কথা শুন্‌তে হয়। ঘোড়ার ভাড়া নিজেরাই দিব, তবু এ গোলমাল ভাল লাগে না, তাই দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত ঘোড়া ঠিক কর্‌লাম।

বন্দর চটী
৬ মাইল

আমার আকিয়াবের বন্ধু শ্রীঅতুল বিশ্বাস একটি অয়েল্-ক্লথ দিয়েছিলেন; যখন আমি কুলীর খোঁজে গিয়েছিলাম, তখন কে যেন সেটী আত্মসাৎ করেছে। শুনেছি, পাহাড়ীরা চোর হয় না, যেখানের জিনিষ সেখানেই পড়ে থাকে, কেউ স্পর্শও করে না। তবু প্রায় রোজই কারও না কারও জিনিষ চুরী যাচ্ছে। কুলী ত রাস্তায় মাল ঠিক করে নিয়ে চলে, চটীতে পৌঁছিয়ে মাল দিয়েই সে সরে পড়ে। সে সময় চটী থেকে জিনিষ চুরী গেলে দায়ী কুলীরা নয়। রাত্রিবেলা জিনিষগুলি বিশেষ সাবধানে রাখতে হয়। অনেকের মত, সভ্যবেশধারী এবং সাধুবেশধারী যাত্রী দ্বারাই এ সব কাজ হয়ে থাকে। যাক্ সকলেরই সাবধান হয়ে চলা এবং থাকা উচিত।

বন্দর-চটি হতে ঘোড়ার পিঠে জিনিষগুলি চাপিয়ে আবার চড়াই কর্‌তে লাগলাম। ভয়ানক চড়াই। পাহাড় কেটে রাস্তা, পাহাড়ের নীচ দিয়েই ভাগীরথী প্রবাহিতা; পাহাড়ের গায়ে গাছের চিহ্নও নাই, শুধু পাথর। একবার পদস্খলন হলেই মুহূর্ত্তে কীচকবধের অভিনয় হবার সম্ভাবনা। এক মাইল চল্‌বার পর বাবা কালীকম্বলীবালার জলছত্র ছাড়িয়ে গিয়ে আবার চড়াই; কিছুদূর যাবার পরই একটু খোলা জায়গায় এসে পৌঁছান গেল।

সম্মুখেই চটী, সেও ভাগিরথীর তীরে। আশেপাশে গমের আবাদ হয়েছে, স্থানটী বেশ সমৃদ্ধিশালী, নাম **মহাদেব** চটী।

মহাদেব চটী ৩ মাইল

বন্দর চটী হতে ৩ মাইল। কিন্তু এ পথটুকু বিশেষ সাবধানে চলা দরকার। এখানে মহাদেবের মন্দির, বাবা কালী কম্বলীবালার ধর্ম্মশালা, লেটারবক্স ও ১৫ খানা চটী-বালার ঘর আছে। মহাদেব চটী বেশ বড় ও সুন্দর চটী। জলখাবারের উপযোগী মিঠাইমণ্ডাদিও আছে। আমরা প্যাড়া দিয়ে জলযোগ কর্‌লাম। তখন অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, আর যাবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু ঘোড়াওয়ালা আমাদের আগেই চলে গিয়েছে। নূতন লোক, সঙ্গে অনেক জিনিষ, শেষে তাকে না পেলে ক্ষতির সম্ভাবনা বলে আবার রওনা হওয়া গেল। রাস্তায় অনেক জায়গায় ঝর্‌ণার জলে জাঁতা ঘুরিয়ে আটা পেষা হচ্ছে। বিনা পরিশ্রমে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক গম পিষে নেওয়া যায়। হিমালয়ের প্রত্যেক জায়গাতেই এই ভাবে ঝর্‌ণার জলে জাঁতা ঘুরিয়ে আটা পিষে থাকে। আমরা আবার খাড়া চড়াই কর্‌তে লাগলাম। এখানেও বিশেষ সাবধানে চল্‌তে হয়। আগেকার রাস্তা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পাহাড় কেটে একটী রাস্তা করা হয়েছে। বন্দর চটী হতে রওনা হবার সময়ও এই-রকম রাস্তা দিয়েই এসেছি। রাস্তাটির উপর ছত্রাকারে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। এ পথ দিয়ে চল্‌বার সময় নীচের ভাগীরথীর দিকে তাকালে প্রাণ শুকিয়ে যায়। ভীষণ বেগে বজ্রগম্ভীর শব্দে ছুটে চলেছেন ভাগীরথী—যেন সর্ব্বগ্রাসিনী!

আমরা ১ মাইল পথ চড়াই করে আবার খানিকটা উৎরাইএর পর সামনে একটী চটী পেলাম, নাম **রামপটী** চটী।

রামপটী দেড় মাইল

আমাদের ঘোড়াবালা আমাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করছে। তখন বেলা প্রায় ১১টা। সেখানেই থাকা গেল। ৭।৮টী বড় বড় ঘর। নিকটেই ডাকবাঙ্গলা, জলের পাইপও আছে। চাউল ৷৷৹ আনা, ডাল ৷৷৹ আনা, ঘি ২৷৷৹, আলু ।৴৹, লবণ ৷৷৹ আনা দর। অন্যান্য সবার আস্‌তে দেরী আছে। আমি আগে এসেছি। চটীবালার কাছ থেকে অরহর ডাল আর আলু নিয়ে পাক চাপিয়ে দিলাম। এর মধ্যে ছোট-মা, বড়-মা প্রভৃতি সকলেই এসে হাজির। বিশ্রাম করে স্নান সেরে তাঁরাই পাকের কাজে লেগে গেলেন। আজ দ্বিপ্রহরে একজন মৌনী সাধু আমাদের কাছে এসে বসেছিলেন, তাঁকে অনেক জিজ্ঞাসার পর হাত দিয়ে ইসারায় বুঝিয়ে দিলেন—ভাত খেতে চান। লোকটী অত্যন্ত ভাল, আমাদের সঙ্গে প্রায় চারি ধাম ঘুরেছেন, কারও সঙ্গে ঝগড়া, বিবাদ বা কথাবার্ত্তা কিছুই নাই, কারও সঙ্গে কিছু প্রার্থীও নন। আকাশ, পর্ব্বত, ঝর্‌ণা, গাছপালার দিকে আপনমনে চেয়ে থাকেন। বয়স আমাদের চেয়েও কম মনে হল। বড়ই রুগ্ন। তাঁর বয়স যে কত, তা বুঝা গেল না। চুলগুলি অল্প লম্বা রুক্ষ। হৃষীকেশের সেই কুকুরওয়ালা সাধুদের সঙ্গে তিনি ঘুরেছেন। তারা এই সাধুটীর প্রতি মাঝে মাঝে খুব খারাপ ব্যবহার কর্‌তেন। তারপর তিনি আমাদের কাছে আসেন। সাধুটিকে দেখ্‌লেই প্রাণে আনন্দ হত। আজই প্রথম তাঁকে দেখলাম। প্রথম কিছু না বলাতে সন্দেহ হয়েছিল। সেটী আমাদেরই ভুল। দুদিন উপর্য্যুপরি কয়েকটী জিনিষ চুরী যাওয়াতে যাকে-তাকে আমরা সন্দেহের চোখে দেখতাম। কয়েকদিন পর সে ধারণা নষ্ট হয়ে গেল।

প্রত্যেক দিনই আমি সকলের আগে চটীতে পৌঁছে পাকের জোগাড় করে ডাল-ভাত চাপিয়ে দিবার পর সকলে এসে হাজির হতেন। তখন ছোট-মা স্নান করে পাকে যেতেন, আমরা যেতাম স্নানে। সঙ্গে সঙ্গে এদিকে পাক হয়ে যেত, আমরাও স্নান করে এসে খেতে বস্‌তাম। রাস্তায় চলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্ষুধাও খুব বেড়ে চল্‌ল। বাঙ্গালায়

বা হরিদ্বারে থাকার সময় আধ পোয়া চাউলের ভাত খাওয়াই আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল, কিন্তু এখানে আস্বার পর এক পোয়া চাউল, আধ পোয়া অড়হর বা উরুদ ডাল খেয়ে হজম কর্চ্ছি, ক্ষুধাও খুব হচ্ছে। ঝরণার নির্ম্মল জল ও পাহাড়ের নির্ম্মল বাতাস এত স্বাস্থ্যকর এবং পরিপাকশক্তিবর্দ্ধক যে আকণ্ঠ পূর্ণ করে ভোজন কর্‌লেও জল বাতাসের গুণে এবং পথশ্রমে অতি শীঘ্রই হজম হয়ে যায়। পথশ্রমে আমাদেরও পরিপাকশক্তি খুব বেড়ে গিয়েছে। রাস্তার মাঝে মাঝে চটীওয়ালারা পুরী, মিঠাই, প্যাড়া তৈরী করে রাখে, তা দিয়েও জলখাওয়ার কাজ চল্‌তে পারে। কিন্তু আমার মতে সেগুলি না খাওয়াই ভাল। প্রথম দু'এক দিন খেয়েছিলাম, কিন্তু পাহাড়ীরা ভারী নোংরা আর তারা বাসি জিনিষ রেখে দেয় পয়সার লোভে; দু এক দিনেই বুঝতে পেরে আর তাদের জিনিষ খাইনি। কখনও দরকার হলে কাছে বসে থেকে তৈরী করিয়ে নিতাম। সকালবেলা কিছু না খেয়েও চলা কষ্ট মনে হত, তাই ভিজান ছোলা খেয়ে বের হতাম, তাতে বেশ উপকার হত। ছোলা-ভিজান জল খাওয়ায় পাহাড়ে চলার দরুণ যে রুক্ষ ভাবটি তা কেটে গিয়ে শরীর স্নিগ্ধ হত ও পিত্ত সাম্য থাক্‌ত। পয়সাও কম খরচ। তবে সব জায়গায় ছোলা পাওয়া যায় না, পূর্ব্বাহ্নেই ছোলা সংগ্রহ করে নেওয়া উচিত; একজনের পক্ষে রোজ এক মুঠা ভিজা ছোলাই যথেষ্ট। ছোলাভাজা রাস্তায় যথেষ্ট মিলে। অধিকাংশ যাত্রীই ভাজা ছোলা ও গুড় খেয়ে থাকে। ভাজা ছোলা পিত্তবৃদ্ধিকারক এবং গুরুপাক। তাতে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট করে। রাস্তায় খুব জলপিপাসা লাগলেও বিশ্রাম না করে জল খেতে নাই।

বেলা ৫ টার সময় রামপটী রওনা হওয়া গেল। তখনও পাহাড়ে ভীষণ রৌদ্র। আমরা বেশী রৌদ্রে চল্‌তে পার্‌তাম না। কিছুদূর যাবার পরই একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখ্‌লাম। পাহাড় কেটে চল্‌বার রাস্তা তৈরী হয়েছে, নীচে বেগবতী গঙ্গা প্রচণ্ড কুণ্ডলাকারে পাকিয়ে পাকিয়ে চলেছে, তাতে অসংখ্য মাছ খেলা কর্‌ছে। দক্ষিণ দিকে উঁচু পাহাড়—শুধু পাথর, গাছপালার লেশ নাই। রাস্তাটি ঠিক খাড়া পাহারের উপর। উপরের পাহাড়টী ছত্রাকারে ঝুঁকে রয়েছে। শেষে মাথা ঘুরে কেউ পড়ে যায়, এইজন্য রাস্তার ধারে পাথর দিয়ে রেলিং গোছের করে দেওয়া হয়েছে। এইরূপ আরও দুইটী জায়গা দিয়ে আজই সকালে চলেছি। কিন্তু এইটি সব চেয়ে সুন্দর। ক্রমে ক্রমে উঁচু পর্ব্বত চড়াই করে চল্‌তে লাগলাম। এখানে বিশেষ সাবধান হয়ে চলা উচিত।

ছোট ছোট কয়েকটী চড়াই উৎরাই করে যাওয়ার পরই একটী চটী পাওয়া গেল।

এই চটীর স্থায় **শ্যামল-চটী** বা **শেলামু-চটী**। এখানে ১০টী চটী আছে, জলের পাইপ এবং জল-খাবারের মিষ্টি প্রভৃতি আছে। এখান থেকে ক্রমে ছোট ছোট চড়াই উৎরাই করে চল্‌তে হল। সম্মুখেই কাঁড়ি-গ্রাম। রাস্তার নীচে ও উপরে পাহাড়ীদের ঘর-বাড়ী, এখানে খুব বেশী পরিমাণ জমি চাষ-আবাদ হয়। আমরা কাঁড়ি-গ্রাম ছাড়িয়ে আরও কিছু চল্‌বার পরই চটী পেলাম, সে চটীতে ৪।৫টী দোকান বিশেষ সুবিধা নয় বলে আরও চল্‌তে লাগলাম।

শ্যামল-চটী বা শেলামু-চটী ১॥ মাইল

আধ মাইল গিয়ে একটী অতি সুন্দর চটিতে উপস্থিত হলাম। এ রাস্তার চড়াইয়ের ভাগই বেশী। তবে খুব ক্রমোচ্চ চড়াই বলে বিশেষ কষ্ট হয় নি। আর আমরাও কিছু কিছু অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এ জায়গাটী অতি সুন্দর, পাহাড়ের উপর চটী। চটীর উপরে ও নীচে কাঁড়ি-গ্রামের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। রাস্তার দুই পাশে আম-গাছের সারি। গাছের নীচে ছায়ায় মাঝে মাঝে

কাঁড়ি-চটী বা কান্তি-চটী ৩ মাইল

বসবার জন্য বেঞ্চ পাতা আছে। গোপালজীর মন্দির, রাম-সীতার মন্দির, ১৫টী দোকান, বাবা-কালী-কম্বলীবালার ধর্ম্মশালা, গবর্ণমেণ্ট-হাসপাতাল ও দাতব্য-ঔষধালয়, পাইপের জল, সব রকম খাবারের দোকান আছে। চটীর নিকটেই গ্রাম, আমরা একটী দোতালা চটীতে আশ্রয় নিলাম। তখনও বেলা অনেক ছিল বলে পাহাড়িয়াদের গ্রাম দেখবার জন্য আমি চলে গেলাম। পূর্ব্ববঙ্গে যেমন ধান মাড়ান হয়ে থাকে, পাহাড়িয়ারাও তেমনি গরু দিয়ে গম ছাড়াচ্ছে। কেউ কেউ আমাদের দেশী প্রথানুসারে হাল চাষ করছে। অনেক কলাগাছ, আমগাছে গ্রামটী পূর্ণ; পাহাড়ের মাঝে ঢুকেও এমন সবুজ গাছ আর কোথাও দেখিনি। বোধ হয় জলের খুব সুবিধা আছে বলে গাছগুলি সতেজ আর গ্রামটীও সমৃদ্ধিশালী। এ কয়দিন শুধু আলু ভিন্ন আমাদের আর কোন তরকারী মিলেনি। এখানে কিন্তু খুব বড় বেশ পুষ্ট কাঁচকলা এবং সুমিষ্ট কুমড়া (বিলাতি-লাউ) পেলাম। ১২টি কাঁচকলা ৵০ আনার এবং দুই সের কুমড়া ৵০ আনার কিনে নেওয়া গেল।

আজ মোট ১২ মাইল হাঁটা হয়েছে। এই বার মাইল কিন্তু বাঙ্গালা দেশের সমতল ভূমির ৩০ মাইলের সমান হবে। এখন আমাদের কাজের মধ্যে পথ চলা। ভোর হলেই সাজ সাজ রবে সকলে কে কার আগে বের হবে, তা নিয়েই ব্যস্ত। ভোর হইতে সন্ধ্যা পথ হাঁটা ভিন্ন আর কোন কাজই নাই। মাঝখানে দ্বিপ্রহরের খাওয়ার জন্য ৫।৬ ঘণ্টা বিশ্রাম করি। অন্যান্য দেশীয় যাত্রীরা ভোর হ'তে আস্তে আস্তে সমস্ত দিনে ১০।১১ মাইলের বেশী চল্‌তে পারেন। তারা দ্বিপ্রহরে খাওয়ার জন্য মাত্র এক ঘণ্টা সময় নেয়। আমরা দু'বেলা খুব আরামে পথ চল্‌ছি। খুব সকাল হতে ১০ টা, কোনদিন ১১ টা পর্য্যন্তও, বিকাল বেলা ৫ টা হতে ৯।৯॥ টা পর্য্যন্ত চলি। পাহাড়ের এ সব জায়গায় সন্ধ্যা ৮ টার আগে রাত্রি হয় না। উপরে পাহাড়ের চূড়ায় তখন পশ্চিমোন্মুখ সূর্য্যের সোণালী আলো, এদিকে নীচে পাহাড়ের উপত্যকায় পাহাড়ীদের বাড়ীতে ঘরে ঘরে ঘোর অন্ধকারের মাঝে মাটীর প্রদীপ মিটিমিটি জ্বল্‌ছে দেখা যায়। অন্যদেশীয় লোকগুলি কয়েকখানা রুটী করে একটু নিমক আর লঙ্কা দিয়ে, কখনও বা একটু গুড় দিয়ে খাওয়ার কাজ সেরে নেয়; তাতে তাদের ১ ঘণ্টা লাগে। তারপর আবার চল্‌তে থাকে, আর বিশ্রাম নেয় না। অথচ খুব বেশী যে হাঁটে তাও নয়; পাহাড়ীরা রোজ দশ মাইলের বেশী হাঁটে না। কুলীরা খুব বেশী গেলেও ১২ মাইল পর্য্যন্ত যায়।

আমাদের সঙ্গী নেপালী কুলী মণিরামের খাওয়া এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! মণিরামের উনুন ধরান, আটা মাখা, রুটী করা, সেকা ও খাওয়া বোধ হয় ১৫ মিনিটের মধ্যে হয়ে যায়। মণিরাম এক পয়সার কাঠ নিয়ে এসে আগুন ধরিয়ে দেয় এদিকে আন সের তিন পোয়া পরিমাণ আটায় জল দিয়ে ২।৪ বার ঠাস দিয়ে ৫।৬ খানা মোটা মোটা রুটি হাতে চাপড়িয়ে আগুনে সেঁকে নিত। তারপর আমাদের কাছ থেকে একটু নুন-লঙ্কা চেয়ে নিয়ে খেতে বসে যেত। কোন কোন দিন ২।১ পয়সার আলু পুড়িয়ে নুন লঙ্কা দিয়ে চট্‌কিয়ে নিত; এতেই তার খাওয়া হয়ে যেত। আমরা মাঝে মাঝে তাকে তরকারী গুড় ইত্যাদি দিতাম। সে কিন্তু ঘি চেয়ে নিত রোজই। আটাতে ঘি না দিয়ে খেলে নাকি বিষ হয়ে যায়। অন্ততঃপক্ষে আধ ফোঁটা ঘি হলেও দিতে হবে, নতুবা খাওয়াই হতে পারে না। সর্ষে তেল কখনও খেত না। সর্ষে তেল খেলে নাকি কাঁসি হবে! আমাদের পাক করা ভাত-ডাল সে খেত না, কিন্তু তরকারী খেত। আমরা রোজই তার জন্য কিছু কিছু তরকারী রেখে দিতাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে খাওয়া-দাওয়া সেরে তাওয়াখানা মেজে ঘুমিয়ে

পড়ত। আমরা যখন স্নান করে খেয়ে উঠ্তাম, তখন তার ২।৩ ঘণ্টা গাঢ় নিদ্রা হয়ে গেছে। এমন সরল ও বিশ্বাসী কুলী পাওয়া দুর্ঘট।

এখানে দুধ দই সবই মিলে। প্রথমে আমরা ধর্ম্মশালায় থাক্‌ব স্থির করেছিলাম, কিন্তু ধর্ম্মশালার দুরবস্থা দেখে দোতালা চটিতেই স্থান নিলাম। বিকালবেলা জায়গা পাওয়া ভার। অন্যান্য দেশীয় যাত্রীরা বিকালবেলা ৪।৫টার পূর্ব্বেই জায়গা নিয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ে, তাতে অনেক সময় জায়গা পাওয়া বিশেষ কষ্টের হয়ে ওঠে। একটু বেলা থাক্‌তেই জায়গা দখল কর্‌তে হয়। জায়গা অভাবে অনেক সময় বাইরেও থাক্‌তে হয়েছে। আমরা অনেকদিন উন্মুক্ত আকাশতলে আকাশের তারা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছি। তার উপর আবার বৃষ্টি হলে সে যে কি কষ্টকর ব্যাপার, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝবে না। এ চটির সব জিনিষের দরই রামপটি চটির মত। শুধু ঘি ৩৲ টাকা সের।

সন্ধ্যার আগে পাহাড়ের উপরে সরকারী হাসপাতাল দেখতে গেলাম। একজন হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব-সাধু জ্বরে ভুগছেন, হাসপাতালে আর কেউই নেই। শুন্‌তে পেলাম, সাধুমহারাজ লছমনঝোলা হতে একদিনেই অন্যান্য সাধু-মণ্ডলীর সঙ্গে এই চটীতে এসে পৌছেছিলেন। সে দলে ত্রিশজন বৈষ্ণব সাধু ছিলেন, সকলেই হিন্দুস্থানী। অত্যন্ত গরম হওয়ায় সে বিশ্রাম না করে দুই লোটা ঠাণ্ডা পানী পান করার সঙ্গে সঙ্গেই সর্দ্দিগর্ম্মি হয়ে জ্বর হয়েছে। এখন নিউমোনিয়া হয়েছে, খক্ খক্ শব্দে অনবরত কাসি হচ্ছে। আজ জ্বর ছেড়েছে। ২ দিন যাবৎ ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা নাই। ডাক্তার-বাবু ২।৩।৪ দিন পর পর একবার এসে রোগী না দেখেই কিছু ঔষধের ব্যবস্থা করে দিয়েই চলে যান। নার্স, কম্পাউণ্ডার পাচক প্রভৃতি কাকেও খুঁজে পেলাম না, ডাক্তারের কোয়ার্টার তালা লাগান। রাত্রে কখনও হাসপাতালে বাতি পড়ে না। হাসপাতালের সংলগ্ন ডাক্তারের কোয়ার্টার থাক্‌লেও, ডাক্তার বা অন্য কোন লোক সেখানে থাকে না, ভয়—পাছে হাসপাতালের রোগীদের বাতাস গায় লেগে তাঁদেরও অসুখ করে বসে। ডাক্তারটী পাহাড়ী; রোগীটির কোনও যত্ন নিচ্ছে না। দিনের বেলা একটী লোক এসে এক ঘটি জল ও ২।১ খান রুটী দিয়ে বিদায় হয়। সেই অন্ধকার গুহায় রোগিটীর অবস্থা দেখে বিশেষ কষ্ট হল। চটীবালাদের কাছে খোঁজ নিলাম। রোগী নিজেও নানা কথা বলে কাঁদতে লাগল। কোন কিছুর দরকার হলে রোগীকে সেই পাহাড় বেয়ে নীচে নেমে এসে চটীবালাদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে নিয়ে যেতে হয়। লোকগুলির যেন সহানুভূতি নাই—বিশেষ এমন একজন রোগী দেখা সত্ত্বেও। রোগীর সংস্পর্শে গেলে পাছে অসুখ হয়, এই ভয়েই তারা রোগীর কাছ ঘেঁষে না, অধিকন্তু চটি হতে তাড়িয়ে দিতে চায়। গত কুণ্ডচটীতে যে সাধুটির অসুখ হয়েছিল, দুই দিনের মধ্যে মাত্র ৫।৬ বার দাস্ত হওয়াতেই তাঁর কলেরা হয়েছে ভেবে চটীতে স্থান দেওয়া হয়নি, খোলা জায়গায় এই শীত-বাতের মধ্যে তিনি পথের ধারে পড়ে ছিলেন। এই বোকা ডাক্তারটীই বলেছিল—"কলেরা হয়েছে।" কলেরার নাম শুন্‌লে কোন চটীবালা স্থান দিবে না। সামান্য ২।৩ বার ভেদবমি হলেই চটিতে স্থান পাবার কোন আশা নাই। চটিবালা চটী হতে তাড়িয়ে দিবে। তবে ঝগড়া-বিবাদ কর্‌লে স্থানের অভাব হয় না। হয়ত চটীবালাই চটি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে। দেবপ্রয়াগ গিয়ে এই ডাক্তারটির সম্বন্ধে সেখানে হাসপাতালে জানিয়েছিলাম। তারা কোন খোঁজ-খবর নেয় নাই। সদাশয়গণ যদি এদিকে একটু লক্ষ্য রাখেন, তাহলে যাত্রীদের মহা উপকার সাধিত হয়। আমরা এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আজকাল পাহাড়ী লোকদের যেটুকু সহৃদয়তা দেখা যায়, সে শুধু স্বার্থের খাতিরে। পয়সা খরচ করতে পারলে কোনও কষ্ট পেতে হয় না, যা ইচ্ছা তাই করা যেতে পারে। চটি হতে চাল ডাল না নিলে চটীতে স্থান দিবে না, শেয়াল কুকুরের মত তাড়িয়ে দিবে। বাবা কালীকম্বলীওয়ালার অনেক ছত্রে সদাব্রতধারী সাধুদের এই ভাবে বিব্রত হতে দেখেছি। তবে নাগা সাধুদের কিছু বল্‌তে সাহস পায় না। যারা সদাব্রত না নিয়ে চলেন, তাঁরাও অনেক সময় চটীতে না থেকে যেখানে ধর্ম্মশালা আছে, সেই ধর্ম্মশালায় গিয়ে স্থান নেন। তাতে সদাব্রতধারীদের অনেক কষ্ট হয়, তাঁরা ধর্ম্মশালায়ও স্থান পান না, আবার চটীতে থাকবার উপায় নাই। অথচ সে সব ভদ্রলোকই ধর্ম্মশালায় থেকে চটীবালাদের নিকট হতে চাল ডাল কিনে থাকেন। সদাব্রতধারীরা চটী হতে চাল ডাল না কেনার দরুণ চটিতে স্থান পান না, আবার ধর্ম্মশালাতেও গৃহীদের জন্য স্থানের অভাব হয়ে পড়ে। ধর্ম্মশালায় যিনি কর্ম্মচারী থাকেন, তিনি ধর্ম্মশালার সংলগ্ন একটী দোকান খুলে রাখেন। ধর্ম্মশালায় স্থান না দিলে, তাঁর দোকান থেকে সওদা নিবে এই আশাতেই তারা গৃহীদের স্থান দিয়ে বিশেষ যত্ন করে থাকে। গরীব লোকগুলি দশবার ঘ্যান্ ঘ্যান্ করেও স্থান পায় না, তাদের কাতরোক্তিতে কারও প্রাণ গলে না। অবশ্য সব ধর্ম্মশালাতেই এ ব্যবস্থা নয়। যারা শিক্ষিত যাত্রী, তাঁহারা এ সব বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখলে ভাল হয়।

আজ এখানে ৮।২০ মিনিট পর্য্যন্ত রাত্রি হল। একদিকে বৈশাখ মাস, অন্যদিকে হয়ত পাহাড়ের শীর্ষদেশ বলে দেরীতে রাত্রি হয়। আজ রাত্রে সমারোহের সহিত ডাল, ডাল, কুমড়া কাঁচকলা ও আলু দিয়ে ডালনা করা হয়েছিল। আজ তরকারী পাওয়া গেল বলে একটী ডালনা হল। পাহাড়ের পথে এই-ই কিন্তু খুব ঘটা। আস্‌ছে কালের জন্য কাঁচকলা ও কুমড়া রেখে দেওয়া হল। রাত্রিবেলা একজন বৃদ্ধ পাহাড়ী ব্রাহ্মণ এসে কেদারখণ্ড-মাহাত্ম্য পাঠ করে এক পয়সা দু'পয়সা হিসাবে দক্ষিণা দিয়ে বিদায় হলেম। তিনি এমন নাছোড়বান্দা, আমরা শুন্‌তে না চাইলেও জোর করে পাঠ আরম্ভ করে দিলেন। সে যেন অহেতুক কৃপা। কিন্তু পাঠের শেষে দক্ষিণার জন্য পীড়াপীড়ি বা আবদারটাও না করে পারলেন না। তিনি চলে যাবার পর আরও ৩।৪ জন এসে আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেই পাঠ করে দক্ষিণার জন্য উৎপীড়ন আরম্ভ করেছিল; দুঃখের বিষয় তাদের রিক্তহস্তেই বিদায় নিতে হল। পাহাড়ে কিন্তু ঘুম খুব হয়। এক ঘুমেই রাত কাবার!

২৩শে বৈশাখ, শুক্রবার—

রোজই আমাদের সকালে রওনা হতে দেরী হয়ে যায়। রওনা হতে দেরী হলেও কিন্তু আমরাই সকলের আগে যেয়ে পৌছি। কুলী ও ঘোড়ার উপর জিনিষগুলি দিয়ে রওনা হলাম। বড় পাহাড়ের উপরে ছিলাম। ক্রমে তার উপর ছোট ছোট কয়েকটি চড়াই উৎরাই করে ২॥ মাইল আসার পর ভীষণ উৎরাই পাওয়া গেল। সকলকে পেছনে ফেলে খুব বেগে নাম্‌তে লাগ্‌লাম, এ উৎরাইটি খাড়া উৎরাই। প্রতি পদবিক্ষেপেই মনে হতে লাগল এবারই বুঝি মুখ থুবরিয়ে পড়ে যাব। পা দুটিও অসাড় হয়ে অস্‌ছিল, মাঝে মাঝে বিশ্রাম করে খুব সতর্কতার সঙ্গে ঝোলান পুলের নিকট উপস্থিত হলাম। এমন ভীষণ উৎরাই আজ পর্য্যন্ত আর একটিও পাওয়া যায়নি। নায়ার নদী বা ব্যাসগঙ্গা

নদীর উপর ঝোলান-পুল পার হয়ে একটি ছোট দোকান পেলাম। সেখানে বসে সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। এখান হতে দুইটি রাস্তা হয়েছে—একটি রাস্তা দেব-প্রয়াগ গিয়েছে, অন্যটি নায়ার নদী বা ব্যাস গঙ্গার ধার দিয়ে ল্যান্স ডাউন বা নিজামাবাদ অভিমুখে গিয়েছে। এই ল্যান্স ডাউন পথে হিমালয়ের মালপত্র বেশী আমদানী হয়ে থাকে।

২।৪ জন আসার পর আমরা ডাইনের ল্যান্স ডাউন রাস্তা বাদ দিয়ে বাম দিকের রাস্তা ধরে থানিক দূরে প্রায় মাইলখানি যাবার পরই **ব্যাসগঙ্গা-চটী** পেলাম। চটির অল্প দূরেই নায়ার-নদী বা ব্যাসগঙ্গা নদী ও ভাগিরথীর সঙ্গম-স্থল। শ্রীশ্রীমন্মহর্ষি ব্যাস-দেবের মন্দির মধ্যে তাঁর পাথরের মূর্ত্তি আছে। আমরা তাঁকে প্রণাম করলাম। প্রবাদ আছে, ব্যাসদেব এখানে বসে তপস্যা করেছিলেন বলে এই চটির নাম ব্যাস চটি এবং নদীর নাম ব্যাস-গঙ্গা। বাবা কালী-কম্বলীবালার ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের বন্দোবস্ত ১৫।১৬ খানি বড় বড় চটি, সব রকম খাবার ও জল-খাবারের দোকান, একটি ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস্‌ও আছে। সঙ্গম-স্থানে স্নান করা যাত্রীদের একটী কর্ত্তব্য কার্য্য। এই রাস্তার এই চটীটি সব চেয়ে বড়। সমুদ্র-বক্ষ হইতে এই স্থান ১৪১৪ ফিট্ উচু। এখানকার চটীগুলি প্রায়ই দোতালা। দোতালা চটি পেয়ে কথনও নীচের তলায় থাকতে নাই। উপরে চলা-ফেরার ফলে নানা আবর্জ্জনা-মাটি ঝুর্ ঝুর্ করে নীচে পড়ে। চটি হতে সঙ্গমস্থল প্রায় আধ মাইল দূরে। সেখানে যেতে হলে সারি সারি গমের জমীর উপর দিয়ে যেতে হয়। আমরা বাবা কালীকম্বলীবালার ধর্ম্মশালা হতে সদাব্রত নিয়ে আবার রওনা হলাম।

ব্যাস চটী
৪ মাইল

তখন বেলা সাড়ে আটটা বেজে গেছে। আমরা ব্যাসচটি হতে ছোট ছোট কয়েকটি চড়াই উৎরাই করে ছালড়ি-চটিতে উপস্থিত হলাম। চটীতে ২টি দোকান আছে। ঘরগুলি ছোট। ব্যাসচটী হতে বের হয়ে ১ মাইল এসেই পাহাড়ের ভিতর ফলফুল, নানারকম গাছপালায় শোভিত একটী আশ্রম দেখতে পেলাম। দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হয়। একটি সুন্দর মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্ত্তি বিরাজিত, মূর্ত্তিগুলি বেশ। এখানকার পুরাতন রীতি অনুসারে পুরাণাদি শাস্ত্র পড়াবার জন্য একটি বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়টির নাম "ব্যাস-কীর্ত্তি পাঠশালা"। শ্রীশ্রী ১০৮ শ্রীমৎ বাবা বংশীদাস জী ও গোমতীদাসজী দ্বারা এই পাঠশালা স্থাপিত। তাঁদের ঠিকানা—পোঃ দেবপ্রয়াগ, মোকাম রামঘাট, বৈষ্ণব আশ্রম, ব্যাসঘাট, জিলা গাড়োবাল। বিদ্যার্থী আশ্রম থেকেই খোরাক-পোষাক পায়। সামনে ভাগীরথী গঙ্গা, আশ্রমের চারদিকে সুন্দর ফুলের বাগান। আমগাছ, কুলগাছও আছে। গাছগুলি বেশ তাজা। গঙ্গা কাছে থাকাতেই জায়গাটা এত সুন্দর।

ছালড়ি চটী
৩ মাইল

ছালড়ি চটী হতে বের হয়ে আরও ছোট ছোট কয়েকটি চড়াই উৎরাই করে ২॥ মাইল এসে উমরাসু চটীতে পৌছলাম। এখানে ধর্ম্মশালা, ১ খানা দোতালা দোকান বা চটী, সবরকম খাবার ও জলখাবারের বন্দোবস্ত আছে। দুপাশে অনেক আমগাছ। চারিদিক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জলের ঝরণাও আছে। নিকটেই খানিকটা উৎরাই করলেই গঙ্গা নদী। অনেক বেলা হয়েছে, এখানেই আহারাদি সেরে দেবপ্রয়াগ যাব স্থির হল। দোতালা ঘর ছিল, তবু তাড়াতাড়ি যাব

উমরাসু চটী
২॥ মাইল

বলে নীচুতেই রইলাম। দোকানদারকে দিয়ে জল আনিয়ে পাক চাপিয়ে দিলাম। মায়েরা এসে স্নান করে পাকের ভার নিলেন। আমরা স্নানে চললাম। অনেক দিন জলে নেমে স্নান করিনি—জলের কথা শুনে প্রাণ আইঢাই করছিল। অনেকটা উৎরাই করতে হল তার পর খাড়া চড়াই; আসতে গলদ্ঘর্ম্ম হয়ে গেল। আমি আর চিদানন্দদাদা খুব আনন্দে স্নান করেছিলাম। এখানে একটি ঝরণা ছিল, এবার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খুব অসুবিধা হয়েছে, তবুও ভগবানের কৃপায় একটি ছোট ঝরণা দিয়ে সামান্য জল পড়ে। আমাদের বিহারীদাদা (বিমলানন্দ ব্রহ্মচারী) গত বৎসর বদরীনাথদর্শনে যাবার সময় এই উৎরাসু চটীতে বসন্তে আক্রান্ত হয়ে বিশেষ কষ্ট পেয়েছিলেন, সেই ঘরটি তিনি আমাদের দেখালেন। একজন বাঙ্গালী বালবিধবা, বৃন্দাবনবাসিনী, পরোপকারপরায়ণা মায়ের সেবাযত্নে মুমূর্ষু অবস্থা থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। সেই মা আমাদের সঙ্গেই এবার চলেছেন—যাঁকে আমরা 'পাগলী মা' বলে ডাকি। বাস্তবিক তাঁর স্বভাবটী পাগলের মত। লোকের সেবাযত্ন করতে, রোগীর শুশ্রূষা করতে—ইত্যাদিতে তিনি একাই দশজন। কোন কাজেই তাঁর "পারব না" নাই। তাঁর সঙ্গে আমরা বেশ আনন্দেই ছিলাম।

খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি দেবপ্রয়াগে পৌঁছবার মতলবে এই দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্র অগ্রাহ্য করে রৌদ্রের মধ্যেই বের হয়ে পড়লাম। এখান

গৌড়ী চটী
২॥ মাইল

এখান হইতে দেবপ্রয়াগ ৪॥ মাইল পথ মাত্র; সমস্ত রাস্তাই প্রায় সমতল, সামান্য চড়াই উৎরাই আছে। রৌদ্রের মধ্যে বের হয়ে ২॥ মাইল পথ গিয়ে গৌড়ী চটী পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এই ২॥ মাইল পথ যদিও ৪০ মিনিটে অতিক্রম করেছি, তবুও অত্যধিক রৌদ্রে আমাদের খুব ক্লান্ত করে ফেলেছিল। এই চটীর নিকট অনেকগুলি সারি আম গাছ, ২।৪টি কালজাম গাছ আছে, আমি একটি আম গাছের তলায় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। দেখতে দেখতে দলস্থ অন্যান্য সকলেই এসে গাছতলায় আড্ডা নিলেন। অনতিদূরে পাহাড়ী ছেলেরা গাছের ছায়ায় "ডাংগুলি" খেলছে। মাঝে মাঝে দু একটি ছেলে এসে পয়সার জন্য আব্দার করল। ১ ঘণ্টা বিশ্রাম করার পর রৌদ্রের তাপ কিছু কমলে আবার চলতে লাগলাম। নিকটেই দুই জন চটিওয়ালা বসে আছেন, এখানে মাত্র দুইখানা চটি। বাম পার্শ্বের চটিওয়ালার একটি ৫ বৎসরের লাল টুকটুকে ছেলে যাত্রীদের জল খাওয়াচ্ছে। উমরাসু চটি হতে এ পর্য্যন্ত আর জলের ঝরণা না থাকায় প্রত্যেকেই বিশেষ পিপাসার্ত্ত হয়ে আসে। আমরাও বিশেষ তৃষ্ণার্ত্ত ছিলাম। ছেলেটির কাছে জল নিয়ে খেলাম। ছেলেটির আনন্দভরা মুখখানিতে পার্ব্বত্য ভাব মোটেই নাই, মনে হল যেন ভদ্রলোকের ছেলে! তাকে দেখে আমাদের খুব আনন্দ হল। অসংখ্য যাত্রী সে পথ দিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি সকলকেই "আইয়ে মহারাজ", "পীইয়ে মহারাজ" বলে জল দিচ্ছে। তার লোটাটি ছোট; বোধ হয় এক সেরেরও কম জল ধরে। সে ছেলেটি যে স্থান হতে হাতে জল ঢেলে দিচ্ছে, সে স্থানটি ২॥×৩ ফুট উঁচু হইবে। সকলেই দাঁড়িয়ে জল পান করে। উঁচু জায়গা হতে তার ঢালবার বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু জল উপরে নেই। ঘটির জল শেষ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে ঘরে ঢুকে আবার জল নিয়ে আসে। সে যেখানে দাঁড়িয়ে জল দিচ্ছে, সেই ঘরের ভিতরেই জল, সেটি ঘরের ছাদ।

জলের জন্য সে পুনঃ পুনঃ উঠা-নামা করাতে হাঁপিয়ে পড়ল। তবু সে কাউকে বিমুখ না করে কষ্ট-স্বীকার করেও পুনঃ পুনঃ উঠে নেমে জল দিচ্ছিল। অদূরেই তার মা দাঁড়িয়ে। তাকে ক্লান্ত দেখে মা এসে তার সঙ্গে যোগ দিয়ে জল দিতে লাগলেন। যেমন ছেলে, তেমনি তার মা. যেন একটি দেবী-প্রতিমা। ছেলেটির ঘটীর জল ফুরিয়ে গেলেই মার হাতে ঘটিটি দেয়, তার মা জল ভরে এনে আবার তাকে দেয়। এইভাবে সে অনবরত জল দিচ্ছে। আমরা কয়েকজন দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে তার জলদান-ব্যাপার দেখতে লাগলাম। অনেক লোক জলপান করে তাকে পয়সা দিয়ে গেল, সে কিন্তু কারো কাছে কিছুই চায় নি। আমরা কয়েকটি এলাচ দিয়ে বিদায় নিলাম। হাতে এলাচ দিতেই আমাদের সে নমস্কার করল। আজ দেব-প্রয়াগে গিয়ে পৌছার আগেই যেন একটী দেবশিশুর কাছে আশীর্ব্বাদ পেলাম। আমরা ছেলেটির কথা বল্‌তে বল্‌তে আর ভাবতে ভাব্‌তে আনন্দমনে চল্‌তে লাগলাম, এমন সময় হরিদাস-ভায়া গান ধরল। আমিও তার সঙ্গে যোগ দিলাম।

এখান হতে দেবপ্রয়াগের দৃশ্য কি সুন্দর। এ রাস্তাটি প্রায় সমতল, প্রায় এক মাইল দূর হতেই আমরা দেবপ্রয়াগ দেখতে পেলাম। দূর হতে দেবপ্রয়াগের বাড়ীগুলি যেন স্বর্গ বলে মনে হতে লাগল। ক্রমে আমরা সে সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে পাণ্ডাদের কথার জবাব দিতে দিতে দেবপ্রয়াগের ডাকঘরের নিকট পৌছলাম। পূর্ব্বে আমরা অলকানন্দায় ও ভাগিরথী গঙ্গার মাঝখানের দেব-প্রয়াগের দৃশ্য দেখেই চমৎকৃত হয়েছিলাম, এখানে এসে আবার অলকনন্দায় রাম পাহাড়ের দৃশ্য ঐরূপ সুন্দর চমৎকারপ্রদ। পাহাড়ের ভিতর এমন একটি সুন্দর সহর দেখে আশ্চর্য্য হলাম। হিমালয়ের উত্তরাখণ্ডের সব ধাম ঘুরেছি—এমন সুন্দর সহর হিমালয়ের ভিতর আর দেখিনি।

তখন বেলা ৬।৪০ মিনিট। গৌড়ী চটি হইতে দেবপ্রয়াগ আস্‌তে একটিছোট পুল পার হয়ে এসেছি।

দেবপ্রয়াগ
২মাইল

আমরা পোষ্ট মাষ্টার বাবুর সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ে তাঁর নামে যে সব পত্র এসেছিল নিয়ে নিলাম। পোষ্ট মাষ্টারটী অত্যন্ত ভদ্রলোক। রাস্তায় এমন সদাশয় লোক খুব কমই পাওয়া যায়। আমাদের পাণ্ডার ছড়িদার সুরেশানন্দ উমরাসু চটিতে আমাদের ছেড়ে আগেই চলে এসেছে—পাণ্ডাকে খরচ দিতে আর দেবপ্রয়াগে আমাদের বাসস্থান ঠিক করতে। ক্রমশঃ আমাদের ঘোড়াওয়ালা, কুলী ইত্যাদি সকলেই ডাক ঘরের কাছে এসে জমা হ'ল।

সেখান হতে অলকানন্দা ২০০ ফুটেরও কিছু বেশী নীচু হবে। অলকানন্দার স্রোত অত্যন্ত প্রবল; কিন্তু শব্দ এমন ভীষণ যে প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়। আমি ও হরিদাসভায়া সহরটি একটু ঘুরে দেখে অলকনন্দার তীরে বস্‌লাম। আজ শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথি। আকাশে মেঘ না থাকায় নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় অলকানন্দা সৌন্দর্য্যে পরিপ্লাবিত। সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে মন আপনা হ'তেই তন্ময় হয়ে আসে। আত্মচিন্তার পক্ষে প্রশস্ত স্থান বটে!

আজ আমরা ১৪ মাইল হেঁটেছি। হরিদ্বার হতে দেবপ্রয়াগ ৫৮ মাইল।

(ক্রমশঃ)

স্বয়ম্ভুর কৃপা

—(:*:)—

গোড়া হইতেই সাধনার প্রয়োজন। যাহারা বলে, সাধন-ভজনের কোনও প্রয়োজন নাই, হয় তাহাদের জীবনী-শক্তি প্রবৃত্তির অপচয়ে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে তাহারা হঠাৎ কৃপাসিদ্ধ। আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সতত ব্যস্ত মধুকরের ন্যায় একটু একটু করিয়াই মধু সঞ্চয় করিব—তাতে ভেজাল থাকিবার উপায় নাই। কৃপাসিদ্ধিকে অবহেলাও করি না, বড় শ্রদ্ধাও করি না। জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি—সহজ জীবন কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠে! উপনিষদের মাঝে একটী শ্লোক রহিয়াছে—

> পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
> স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
> কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
> দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

—পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কারণে জীব বাহ্য বস্তুই সতত দর্শন করে—অন্তরাত্মাকে নহে। খুব কম লোকের মনেই মুক্তিলাভের ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়গণকে বহির্বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আনিবার আকুল চেষ্টা জাগে। প্রথমেই আমাদের নিদারুণ বাধা ইন্দ্রিয়গণের বহির্ম্মুখীনতা। তাই বলিতেছিলাম, প্রথমেই সাধনা করিয়া তাহাদের মোড় ফিরাইতে হইবে অর্থাৎ যে দিকে চলিতেছে, সেদিকে নহে—অন্তরাত্মার দিকে। এখানেই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার পরিচয় পাই। আমাদের মন ছুটিয়া যায় বিষয়ের দিকে আর প্রাণ চায় সেই দিক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে। এখানেই মানবজীবনের অনাদি কলহের সৃষ্টি। প্রকৃতির সব কথাতে, সব রুচিতে নির্ব্বিচারে সায় দিতে বাধে বলিয়াই প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই। কেন ভগবান্ ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখী করিয়া দিলেন—এই প্রশ্ন আহাম্মকের। কেন না, ভগবান্ স্বয়ম্ভূ—স্বাধীন; তাঁহার যেমন ইচ্ছা হইয়াছে, তেমনি ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে হইবে, আমাদের মাঝে সংগ্রাম করিবার শক্তি তিনি দিয়াছেন কি না। অন্ততঃ এই ভাবনাটী যখন মনে জাগে যে, আমরা প্রকৃতির ক্রীতদাস নই—গাছপালা পশুপক্ষীর জীবনের মত একঘেয়ে জীবন আমাদের নয়, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার শক্তিতে একটা পরিবর্ত্তনের স্রোতই জগতের অনেক বদ্ধমূল সংস্কারের উপর দিয়া প্রবাহিত করাইতে পারি—তখন আর এই প্রশ্নটাই মনে জাগে না যে ভগবান্ এইরূপ না করিয়া ঐরূপ কেন করিলেন না। মোট কথা, ভগবান্ তখন কৈফিয়ৎ দেওয়ার হাত হইতে নিস্তার পান!

জগতের সবই যে অব্যবস্থিত, ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারি। কাজেই সংস্কারের প্রয়োজন। সংস্কার করিতে হইলেই শক্তির প্রয়োজন, আর সেই শক্তি আয়ত্ত হইবে সাধনা দিয়া। কাজেই শুদ্ধির দরুণ সাধনার একান্ত প্রয়োজন। হিন্দুর প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানের পূর্ব্বেই শুদ্ধির ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমরা যে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় পাইয়াছি—তারা আমাদের শত্রু, যে পর্য্যন্ত আমরা তাহাদের সংস্কার করিয়া সাধনোপযোগী করিয়া লইতে না পারি। আমাদের জীবন শুধু প্রবৃত্তির দারুণ লালসা মিটাইবার জন্য নয়—আর একটা দিকও রহিয়াছে, সেইটাই আমাদের কাম্য। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে আমাদের বাহিরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ত্রুটীই পরিলক্ষিত

হইতেছে না, আরাম-কেদারায় বসিয়া বসিয়া যাহা চাহিতেছি, হাতের কাছে তাহাই পাইতেছি; এক পয়সার তেল-লবণও তাহার দরুণ খরচ হইতেছে না—ইহা হইতে আরামের জীবন আর কি থাকিতে পারে? কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই সমস্ত দিয়াই কি কেহ কখনও সম্পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন? ভিতরে আর কোনও অত্যাবশ্যকীয় অভাব অনুভব করিতেছেন না—যার দরুণ সময় সময় জাগতিক ধন-ঐশ্বর্য্যের প্রতিও বিতৃষ্ণা জন্মে? সময় সময় মনে হয় না, ছেলের উপর সমস্ত ভার দিয়া এখন আমরা কাশীবাস করি? ঐ যে আদিম যুগ হইতে সন্ন্যাসের পথ বলিয়া একটী পথ রহিয়াছে শুনিয়া আসিতেছেন, ইহা কি মিথ্যা? এখনও যে দ্বারে দ্বারে কত সাধু-সন্ন্যাসী অযাচিত ভাবে সাধু উপদেশ দিয়া যাইতেছে! এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগকে দেখিয়াও কি কাহারো মনে অন্য এক রাজ্যের কথা স্মরণ হয় না? বাস্তবিকই তাঁহারা যে বলিতেছেন, যাহা দেখিতেছ, সবই নশ্বর—ইহা ছাড়াও পরম সত্য রহিয়াছে—এই সবই কি মিথ্যা উক্তি?

স্পষ্ট কথা বলিতেছি, ভোগেও তৃপ্তি পাই না, অভ্রভেদী ঐশ্বর্য্যেও নয়। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আর একটী পথ রহিয়াছে! সেই পথ "নেতিমূলক"—যাহা দেখিতেছি তাহাই ইতি নয়; আরও রহিয়াছে—এই তাহার অর্থ। এই যে অস্বীকৃতি আর আত্মত্যাগ, ইহার মূলে রহিয়াছে সাধনার পূর্ণ আস্বাদনের স্পৃহা। প্রবৃত্তির পথে চলিয়া দেখিয়াছি, দুদিনেই ইন্দ্রিয়সমূহের তেজ বিলীন হইয়া যায়! ত্যাগী না হইলে যে ভোগীও হইতে পারা যায় না, এইখানেই তাহার তাৎপর্য্য পাই। সম্যক্ উপলব্ধির দরুণই ইন্দ্রিয়-সংস্কার। বৃন্দাবন-লীলার তাৎপর্য্য স্থূল বিকারগ্রস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া বুঝা যায় না—চিন্ময়ের লীলা চিন্ময় দেহ ছাড়া উপলব্ধি হয় না। পঞ্চবটীতে বসিয়া বসিয়া যে নিরক্ষর সাধক সাধনায় দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতেন—তিনি চাহিয়াছিলেন চিন্ময়ী জননীকে। সাধন-প্রভাবে সমস্ত বিকার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া এই স্থূল চোখ দিয়াই জগজ্জননীর দর্শনলাভে তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন। স্থূল চোখ দিয়াই মায়ের রূপ দর্শন হয় বটে—কিন্তু সংস্কৃতি চাই।

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বিরোধ চলিতেছে—ইহাই তো জীবনের পরিচয়। প্রকৃতির নির্দ্দেশ অবনত মস্তকে সকলেই স্বীকার করিয়াছে। পশু পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, সূর্য্য-চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র কেহই প্রকৃতির কড়া নিয়মের ব্যতিক্রমে চলিতে পারে না—সকলের মাঝেই একটা ভয়ের আতঙ্ক রহিয়াছে—কিন্তু মানুষ বলিতে পারিয়াছে আমি প্রকৃতির ধার ধারি না—আমি চলিব আমার স্বাধীন ইচ্ছায়। এক মানুষ ছাড়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে এত বড় স্পর্দ্ধার কথা আর কেহ বলিতে পারে নাই।

আদি পাপের—The Original sinএর দোহাই দিয়া অনেকেই পাপকর্ম্ম করিয়াও মনে একটু শান্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু বিবেকের কঠোর শাসনে মানুষ ইহাতে শান্তি লাভের অধিকারী হইতে পারে না। পাপ করিলে মানুষের অনুশোচনা জাগেই। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি, মানুষের মাঝে একটা আধ্যাত্মিক দিকও রহিয়াছে। সাধনায় আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাই দানব প্রবৃত্তি না পারিয়া শেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। আদিম পাপ বলিয়া সাফাই গাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই; ইচ্ছা করিলে মানুষ পাপ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে, এমন শক্তি ভগবান মানুষকে দান করিয়াছেন। মানুষের জীবন স্রোতে ভাসিয়া যাওয়ার জীবন নয়।

প্রথমেই শক্তির প্রয়োজন। আমার অন্তর্নিহিত শুভ ইচ্ছার পরম শত্রুই ছয়টী রিপু। তাহাদিগকে স্ববশে আনিতে হইবে। তারপর আমার যেমন ইচ্ছা তাহাদিগকে দিয়া কাজ হাঁসিল করাইয়া লইতে পারিব। তাহারা যাহা চায়, তাহাতেই বাধা দিতে হইবে—আর আমার ইচ্ছার বেগকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে হইবে। আমার ইচ্ছা আর ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছাতে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। আমি যে দিকে যাইতে চাহি না, ইন্দ্রিয় আমাকে সেই দিকেই আকর্ষণ করিয়া লয়।

স্বয়ম্ভু কৃপা করিয়া আমাদের দরুণ যে অসুবিধাটুকুর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে আমাদের স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। সম্পদভিলাষী শক্তিমন্ত জাতির নিকট এভারেষ্ট কেন এত উঁচু হইল, সে প্রশ্ন জাগিবে না, তাহারা এভারেষ্টের উপর আরোহণ পূর্ব্বক রত্ন আহরণ করিতেই যত্নশীল। আমাদের জীবনকেও সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে স্বয়ম্ভুর ঘাড়ে দোষ না চাপাইয়া প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বে যাহাতে বিজয়ী হইয়া ফিরিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। শত্রুকে জয় করিলে তারপর আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির কোনও ব্যাঘাত হইবে না। তাহা হইলে আমাদের প্রথম কাজই হইতেছে বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্ম্মুখী করা। কেননা স্বয়ম্ভু তো ইচ্ছা করিয়াই তাহাদিগকে উল্টা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা আমাদের ই নসিবের ফের!

গভীরতার সার্থকতার অভাবেই ইন্দ্রিয় এমন উগ্র ভাবে লোলুপতা নিয়া প্রকাশ পায়। তাহাদের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার ইন্ধন যোগাইতে না পারিলেই অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দেয়। শক্তি যদি থাকে, একদম উপবাসী রাখিয়া মারিয়া ফেল, তারপর তোমার ইচ্ছানুযায়ী প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া আবার তাহাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত কর, দেখিবে তখন শত্রুই কিভাবে মিত্রবৎ কাজ করে। এখন ইন্দ্রিয়ের যে রস আছে, সে রস তীব্র, তাহাকে শুকাইয়া আবার মাধুর্য্য রসে পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হইবে, তবেই তাহার উগ্রতা যাইবে। উপকরণ পাইয়াছি বটে আর তাহাদিগকে দিয়া কাজও হইবে অনেক, কিন্তু এক একটির পিছনে যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করিতে হইবে। খাওয়ার সার্থকতা তখন বুঝি যখন খুব অল্প হইলেই চলে, তাহা না হইলে রাক্ষসের মত এক স্তূপ অন্নধ্বংসেও পরিতৃপ্তি পাই না। ইন্দ্রিয়ের বেলায়ও তেমনি; তাহারা যখন প্রকৃত রসের আস্বাদন পায়, তখন আর বাহিরে তাহাদিগকে উন্মত্ত হইয়া ফিরিতে হয় না—শুদ্ধ হইয়া, শান্ত হইয়া ভিতরের অমৃত আস্বাদনেই তাহারা তন্ময় হইয়া যায়। মোড় ফিরাইয়া তাহাদিগকে সেই চরম সার্থকতার দিকেই নিয়া যাইতে হইবে। তোমাকে যদি হাতেকলমে আমি বুঝাইতে পারি, তোমার জীবনের একটী পরম সার্থকতা রহিয়াছে, তাহা হইলে সমস্ত প্রবৃত্তির মায়িক আকর্ষণকে কি তুমি ছিন্নভিন্ন করিতে পারিবে না? ইন্দ্রিয় তো অন্ধ, নিজের ভাল-মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। পবিত্র হইলে ভগবৎ উপলব্ধির সাধন সে তাহারাই হইতে পারিবে, এই কথাটা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আমাদের কর্ত্তব্য তো এইখানেই। ছেলের খাওয়া প্রথমতঃ মাকেই বাছিয়া দিতে হয়, তাহা না হইলে যা তা খাইয়া পেটের অসুখই হয়। ছেলের মত ইন্দ্রিয়ও বুঝে না, কিসে তাহাদের পরিতৃপ্তি হইবে; কাজেই তাহারা যাহা চায়, তাহা না দিয়া মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃষ্টি করিয়া আমাদেরই তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবুঝ ছেলে আর অবুঝ ইন্দ্রিয় চঞ্চলতার দরুণ এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে না; কাজেই তাহাদিগকে শাসনাধীন রাখিতে হয়।

উপনিষদের শ্লোকে রহিয়াছে—পরমাত্মাকে দর্শন করিতে হইলে "আবৃত্তচক্ষু" হইতে হইবে। ইন্দ্রিয় বাহিরের বিষয় দেখিতেই অভ্যস্ত, তাগাদিগকে প্রত্যাহৃত করিতে হইলেই শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তি অর্জ্জিত হইবে অবিচলিত সাধনা দিয়া। তবেই দেখিতে পাইতেছি স্বয়ম্ভুর বিচার নিরপেক্ষ; তিনি শুধু সমস্যা দিয়াই আমাদিগকে ফাঁপরে ফেলেন নাই, মুক্তিলাভের উপায় নির্দ্ধারণও করিয়া দিয়াছেন। ইন্দ্রিয় বহির্ম্মুখী বটে, কিন্তু তাহাদিগকে প্রত্যাহৃতও করা যায়। যে ইন্দ্রিয় মানুষকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়; প্রত্যাহৃত হইলে তাহাদিগের সাহায্যেই অমৃতত্ব লাভ হয়।

প্রত্যাগাত্মদর্শনেই ইন্দ্রিয়ের চরম সার্থকতা। জনম অবধি বাহিরের রূপ দর্শন করিয়াও শ্রীরাধার তৃপ্তি হইল না। এই যে তাঁহার অসহ্য বিরহ-বেদনা, যুগ-যুগান্তরের অতৃপ্তি—এ কাহার দরুণ—ইন্দ্রিয়াতীত রূপ-দর্শনের নিমিত্ত নয় কি? একবার ভাগ্যক্রমে সেই অতীন্দ্রিয় রূপের দর্শন ঘটিলে আর কি ইন্দ্রিয়কে বিষয়াভিমুখে নিতে কাহারও সাধ্য আছে? বিকারের মাঝেও ইন্দ্রিয় কিন্তু সেই পরমাত্মাকেই অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে—তাহারা যে কেন কিছুতেই পরিতৃপ্ত পাইতেছে না ইহাই তাহার নিদর্শন।

একটা মজার গল্প পড়িয়াছিলাম, একজন একটা রেখা টানিয়া বলিল, কে ইহাকে না কাটিয়া, না মুছিয়া ছোট করিতে পারিবে? অনেকেই তাহার প্রশ্ন শুনিয়া থ বনিয়া গেলেন, তাঁহার মাঝে একজন বলিয়া উঠিলেন, হাঁ, আমি পারিব। তিনি আসিয়া ঐ রেখাটার পাশাপাশি একটা বড় রেখা টানিয়া দিলেন—তাহাতেই সেই রেখাটী ছোট হইয়া গেল। এমন সহজ উপায় ছিল দেখিয়া, সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল। ইন্দ্রিয়ের বেলাতেও এই গল্পটী খাটে—তাহাদিগকে নির্য্যাতিন না করিয়া সংশোধন করিতে হইলেই বড় একটা তাৎপর্য্য আনিয়া তাহাদের পাশে দাঁড় করাইতে হইবে—তখন আপনি তারা ছোট হইয়া যাইবে। শুধু জোর জুলুম করিয়া তাহাদিগকে ফিরাইতে পারা অসম্ভব। যে রসে তাহারা মজিয়া রহিয়াছে, ইহা হইতেও বড় রসের আস্বাদন তাহাদিগকে দিতে হইবে—আর তার উপায় অন্তর্ম্মুখী হইয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে আত্ম-ধ্যানে রত থাকা।

প্রতীক্ষায়

ওগো বঁধু, আর কি পড়িবে মনে
বিস্মৃত এ অবজ্ঞাত জনে?—
আর কি তুলিবে হিয়া নিমিষের তরে
হেরে এই তপ্ত অশ্রু নয়নের 'পরে?
যেই স্মিত-হাসিটুকু আজিও অধরে—
এখনো কি তাহা হতে তত মধু ঝরে?
মৃত সম্ভাষণে আর নাচিবে কি হিয়ে—
চাহিবে বাঁধিতে আরো বাহুডোর দিয়ে?

বল বঁধু, বল সখা, সর্ব্বস্ব আমার,
কোন্ ক্ষণে মিলিবে সে পরশ তোমার?

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

অন্তরের খাঁটি প্রত্যয় দিয়ে যদি যাচাই করে নিতে পারি, তবেই শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞান সার্থক—নতুবা অসার বুদ্ধিবিজৃম্ভণ মাত্র। মতবাদের নড়চড় আছে, কিন্তু আত্মা অবিচল, অভ্রান্ত; অনেক সময় মতবাদমাত্রে পর্য্যবসিত হলেও মূলতঃ শাস্ত্র ঋষিহৃদয়নিহিত আত্মসত্যেরই দ্যোতক। এই শ্রদ্ধা অন্তরে নিয়ে নির্ভীক সমনস্ক হয়ে শাস্ত্রগহনে প্রবেশ করতে হবে। যে শাস্ত্রজ্ঞান আত্মপ্রত্যয়কে জাগিয়ে তোলে—আমাতে এবং জগতে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে দেয়, সেই শাস্ত্র-জ্ঞানই যথাযথ আয়ত্ত বলে বুঝতে হবে। আমিই খাঁটি—শাস্ত্র আমাকে সাজিয়ে তুলবে মাত্র: অথবা আত্মজ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞান একই—বুদ্ধির হেরফের ঘুচাতে হবে মাত্র। সত্য যদি একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়, তবে সামঞ্জস্য করা ভিন্ন কি পন্থা আর থাকতে পারে?

আমার যা প্রকৃতিগত উপাদান, যা আমার আত্ম-বিকাশের পক্ষে অনুকূল, তাই আমার ভালো লাগে; সময়ে তাই সদ্‌ভাব রূপে দেখা দেয়। আর যা প্রতিকূল, যা আমার কাছে মন্দ, তাই রিপুভাবে প্রাণে জ্বালা দেয়। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে এমন একটা সুদৃঢ় সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকা চাই, যা সমস্ত বিরোধ বা বিচ্ছিন্নতাকে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করে নিতে পারে। এতেই কল্যাণ—এই কল্যাণেই সকলকে পূর্ণ করে।

উৎসব সেইদিনই সার্থক, যেদিন সকলের অন্তরে সত্যোপলব্ধির জন্য আকুল প্রেরণা আসে। প্রকৃত উৎসব হচ্ছে অন্তরে—বাইরে নয়। উৎসব সকলকে অন্তরে-বাইরে মিলিয়ে দিয়ে। নিজের আনন্দ পরকে বিলিয়ে দেওয়াই উৎসবের সাধনা। সেই একের আনন্দেই নিখিলের আনন্দ—এইটাই বিশ্বের পরম সত্য। এই সত্যই সকলকে অমৃত পাইয়ে দেয়। উৎসবই অদ্বৈত ভাবের সূচক।

জগতের একই বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে অর্থাৎ গুণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করে। মানুষের মধ্যে দেবত্ব অসুরত্ব দুইই রয়েছে। আমাদের মন অনুযায়ী অর্থাৎ প্রবৃত্তি অনুযায়ী নিজকে আমরা গড়ে নিই। জগতের ব্যাপারে ঘাত অনুযায়ী প্রতিঘাত পাওয়া যায়; মানুষের মধ্যেও আমাদের ঘাত অনুযায়ী প্রতিঘাত, ব্যবহার অনুযায়ী ব্যবহার পেতে হয়। সূর্য্য নবগ্রহের চেয়ে বড় অর্থাৎ শক্তিশালী, তাই সে এই নবগ্রহকে টানতে পারছে অর্থাৎ ধরে রাখছে। মানুষের মধ্যেও যে যত শক্তিশালী, সে ততখানি অপরকে টানতে পারে অর্থাৎ সেই অনুপাতে অপরের মধ্যে নিজের ভাব সঞ্চারিত করতে পারে। দেবতা হওয়া অসুর হওয়া মানুষের নিজের হাত—শুধু লক্ষ্যের একাগ্রতা চাই।

বিচার করি অনেক সময় আমরা বড় কাজ ধরে। কিন্তু ছোটখাট কাজগুলির দিকে নজর দিলে মানুষকে আমরা চিনতে পারি বেশী।

মানুষ মনে করে—এই স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে যা দর্শন করছি, তাই সত্য; কিন্তু তা হলে স্বপ্নে মানুষ

কোন্ ইন্দ্রিয় দিয়ে দর্শন করে বা ভোগ করে? এই যে মানুষ অসত্যকে সত্য মনে করছে—এই তো মায়া। এই মায়াকে জয় করতে পারলেই মানুষ ভূমার আস্বাদ পায় অর্থাৎ জগজ্জয়ী হয়। তখন জগৎকে সে কি দেখে?—দেখে এক নূতন গৌরবে ভরা, উজ্জ্বল, ভাবময়। মূর্খ মানুষের দৃষ্টিতে বইয়ের অক্ষরগুলো যেমন কালীর আঁচড় বলে মনে হয়, কিন্তু পণ্ডিতের চোখে সেইগুলিই নানারকম ভাবার্থ নিয়ে ফুটে ওঠে, এই জগৎও তেমনি জ্ঞানীর চোখে অন্য রকম ভাবে প্রতিভাত হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন—লবণের পুতুল হয়ে সমুদ্র মাপতে যাওয়ার কথা। আমরাও সত্যকে নিয়ে তাই করি। সত্য যখন ফুটবে, স্থূল ইন্দ্রিয়-বোধ কোথায় উড়ে যাবে। এই হচ্ছে বেদান্তের নেতি নেতি।



সংঘ হচ্ছে একটা সত্যানুভূতির কেন্দ্র; এই কেন্দ্রেই নিজ নিজ প্রাণরশ্মি সংমিলিত করবার জন্যই সকলের আকুলভাবে ছুটাছুটী; তা থেকে কেউ যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তবে সে সংঘকে দুর্ব্বল করে, তারও নিজের মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে শক্তি ও শান্তির ব্যাঘাত ঘটায়। সংঘ মানে প্রত্যেকের বিরুদ্ধ ও অপূর্ণ বিচ্ছিন্নতাকে এক ও সুসম্পূর্ণ করা; এতে যে শক্তি উদ্ভূত হয়, তা বিশ্বজয়ের সামর্থ্য রাখে। মানুষের মাঝে এ এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি; সম্মিলনেই সত্যের প্রতিষ্ঠা—আনন্দের উদ্দীপনা ও শক্তির চরম বিকাশ।



সমষ্টির দিকে তাকাতে গিয়ে আমরা ভুলে যাই ব্যষ্টিকে। ব্যষ্টিজীবনের গলদ কাটিয়ে প্রত্যেকে নিজকে তৈরী করতে শিখ; সমষ্টিও আপনি গড়ে উঠবে সুন্দর হয়ে।



সংযত ভাবে ভাষাও বের করে দেয় সুন্দর। আমাদের আনন্দ হয়ে যায় উচ্ছৃঙ্খল—অসংযত ভাষায় তার ইঙ্গিত পাই। কিন্তু আনন্দ হওয়া চাই শান্ত ও স্নিগ্ধ। আনন্দে দৃঢ় হওয়ার তপস্যাতেও আমাদের সিদ্ধ হতে হবে। আনন্দে ঢলে পড়লে তার রস ঠিক ঠিক উপভোগ করা যায় না।



"সেবায়াং গুরোর্গরীয়ান্"—সেবার মধ্যে গুরু-সেবাই শ্রেষ্ঠ। জগতে সেবার বিষয়ও অনন্ত, প্রণালীও অনন্ত; কিন্তু গুরুসেবা অতুলনীয়। যদি আত্মত্যাগ বা আত্মোৎসর্গ করিতে বাসনা থাকে, তবে সদ্‌গুরুসেবাব্রতেই করা কর্ত্তব্য। অভিমান—এমন কি সাধনভজনের অভিমানেও মানুষকে ক্ষুদ্র করিয়া রাখে। ব্যস্ততার সাধন ভজন সোণার শৃঙ্খল—উপনিষদের কথায়, হিরণ্ময় যবনিকা। উহাও ছিন্ন করিতে হইবে—সদ্‌গুরুসেবার ঐকান্তিকতা দ্বারা, গুরুবাক্যে অকপট বিশ্বাস দ্বারা। যখন সাধ্যসাধনের প্রবৃত্তি একীভূত হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠ কর্ম্মে বা গুরুসেবায় চিত্ত অচলপ্রতিষ্ঠ হইবে, তখনই উদ্দাম জীবনের শান্তি হইবে, হৃদয়ে পূর্ণতা আসিবে।



কাউকে বঞ্চিত করো না। যে ক্ষেত্রে তোমার একটু মাত্র ব্যবহারে, একটা সম্বোধনে কেউ সন্তুষ্ট হয়ে যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে এত কৃপণতা কেন?



মায়ের কোলে ছেলে যেমন নিঃসঙ্কোচে থাকে, প্রাণের কথা জানাতে দ্বিধা করে না, তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। মায়ের কাছে ছেলের প্রাণ স্বভাবতঃ বাঁধা। যার কাছে প্রাণ স্বতঃই বাঁধা পড়ে, সেই তোমার আদর্শ।

তোমার ভালবাসার জিনিষ যার-তার হাতে ছেড়ে দিবে কেন? তুমি যাকে ভালবাস, তার মূল্য অন্যের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী জান। জেনে শুনে তাকে অপরের হাতে দিয়ে লাঞ্ছিত করা ঠাট্টা করা বই কি? যে তোমার উপর নির্ভর করে, সে কি তোমার চালাকী-চাতুরীতে ব্যথা পায় না?

মানসিক ক্রিয়া একেবারে রুদ্ধ করা অসম্ভব। তবে তাকে শুদ্ধ করাই সাধনা। বিচার দ্বারা যত সহজে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তত আর কিছুতে হয় না। তাই সর্ব্বদা প্রত্যেক কাজেকর্মে কথায়-বার্ত্তায় বিচারের অনুশীলন করা উচিত। স্বভাবের বশে যদি কোন কুকর্ম্মও হয়ে যায়, ক্ষোভের বা দুঃখ করবার কিছু নাই। কিন্তু মনে থাকা উচিত যে ওটা আমার করা মন্দ বই ভাল নয় এবং শক্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা আবশ্যক।

সর্ব্বদা আমি আমি করে কর্ত্তৃত্বর বোঝা বয়ে মরছ। আঘাতের পর আঘাত তোমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে ভুল ধরে দিচ্ছে, তবু তোমার ভ্রম দূর হচ্ছে না। ঘুরে ফিরে সেই একই সুর। তোমার বলতে যা কিছু ছিল, সকলই যে তুমি একদিন দিয়ে ফেলেছ—তোমার অস্তিত্ব এখন কোথায়? তুমি আর তুমি নও—তুমি সেই।

যার আত্মগৌরব নাই, তার অপরকে শাসন বা অনুগ্রহ করবারও অধিকার নাই। সে একটা ঢেলা সদৃশ। তার কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। তাকে নির্ব্বিকার বলা যেতেও পারে। কর্ম্মচেষ্টা মাত্রেই বিকার। দেহ থাকতে নির্ব্বিকার হওয়া সহজ না হলেও জ্ঞানে হওয়া কঠিন নহে। তোমার মাঝেই যা কিছু হচ্ছে। তুমি অকর্ত্তা—দ্রষ্টা মাত্র।

সংঘ নদীর মত। নদী যে কোন্ সময় কোন্ দিক দিয়া প্রবাহিত হইবে, তাহার ঠিক নাই; কিন্তু উৎপত্তি যখন পর্ব্বতে, তখন মরিবার আশঙ্কা নাই। তবে ভীতি-বিভীষিকা থাকিবেই—দোষ আর গুণ দুটা পাশাপাশি—উহা কেবল সময় সময় আধার পরিবর্ত্তন করে। এই পরিবর্ত্তন ও অপরিবর্ত্তন জন্য অনুশোচনা নিরর্থক; উহা পূর্ণতারই লক্ষণ বলিয়া ধীরস্থির থাকিতে হইবে। এই ব্রতে যে যত অগ্রণী হইতে পারিবে, সে তত পূর্ণতার দিকে যাইবে।

সুখে-দুঃখে, সংসারের সকল ব্যাপারেই মানুষ মানুষের কাছে ছুটিয়া আসে; আর অধ্যাত্মজগতের সহায়তা লাভ করিবার জন্যও যে মানুষ মনুষ্যের কাছে ছুটিয়া যাইবে—এ তো স্বাভাবিক। যেখানে দেখিব, অধ্যাত্মিক দৈন্য বুঝিয়াও মনুষ্য মানুষের সন্ধান করিতেছে না, সেখানে বুঝিব, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আনুগত্যের সহজ সরল পথ না লইয়া সে চলিয়াছে আত্মাভিমানের বাঁকা পথ ধরিয়া। মানুষের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াই যে ভগবান এত সহজে নিজকে ধরা দিয়া রহিয়াছেন—অভাগা মানুষ সে কথাটা সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

বাহিরের ক্ষুদ্রতা দেখিয়া হতাশ হইতে নাই, প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মসত্তার উপর, প্রত্যেকের হৃদয়ের স্বাভাবিক মনুষ্যত্ববোধের উপর নির্ভর রাখিয়া দোষী-নির্দ্দোষী সকলের প্রতি মনকে সমভাবে স্নিগ্ধ রাখিতে হইবে—ইহাই নেতার সাধনা। সাধকমাত্রেই নেতা—নিজ জীবনের নেতা। কর্ম্মক্ষেত্রের নেতৃত্ব আত্মনেতৃত্বেরই বহিঃস্ফুরণমাত্র; আসলে নিজকে নিয়াই চলিতে হইবে। প্রত্যেককে প্রত্যেকের অন্তর্দ্দেবতাই চালাইয়া লইতেছেন। শুধু বিশ্বাস ও ধৈর্য্য চাই। হঠাৎ কিছু হওয়ার ফল প্রায়ই ভাল হয় না, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

কেহ কাহাকেও কিছু করাইতে পারে না। ধর্ম্ম যদি নিজের গরজে না হয় তো উহাকে ধর্ম্মই বলিব না—উহা প্রাণহীন অনুষ্ঠান বা ভক্তিবিহীন পূজার আড়ম্বর মাত্র। ধর্ম্ম হইবে স্বপ্রতিষ্ঠ—ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ।

প্রত্যেকের স্বপ্রতিষ্ঠ ভাবই সংঘশক্তির মূল এবং মিলনের সূত্র। কেহ কাহাকেও রেয়াৎ করিয়া চলে না, অথচ প্রত্যেকে প্রত্যেককে শ্রদ্ধা বিশ্বাস করে এবং ভালবাসে—এই সমন্বয়টুকুই প্রাণের পরিচয়।

যখন নিজের মাঝে অনুভব করিব ন্যায়পথে চলার দৃঢ়তা এবং অপরের হৃদয়ে অনুভব করিব আমারই প্রীতিকোমল হৃদয়—তখনই বুঝিব যে ঠিক পথে চলা হইতেছে। অজ্ঞানবশতঃই অপরের উপর অশ্রদ্ধা ও নিজের শক্তিতে অবিশ্বাস আসে; পথের বাধা জ্ঞানে সেগুলির সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে। শ্রদ্ধাই সামঞ্জস্যের নিদান।

যিনি জীব দুঃখে দুঃখী, তাঁহার দুঃখের ভাগী হইয়া আমরা যে অনুত্তম দুঃখময় সুখে আত্মহারা হইব, জগতে সেই সুখ অপেক্ষা মহাসুখ আর কিছুতেই নাই।

সেই জ্যোতির্ম্ময় অন্তর্দেবতা যিনি রূপে ভাবে সামঞ্জস্য লইয়া অর্থাৎ নরাকৃতি ধরিয়া আমাদের মাঝে নামিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গ করিলে আমরা অন্তরে এমন একটা কিছু পাই, যাহার নিকট আমাদের নিজের ব্যক্তিগত সুখবাসনা তুচ্ছ, ব্যক্তিগত বুদ্ধি স্তিমিত, আত্মাভিমান অস্পষ্ট ও লঘু! তাঁর চরণে আপনাকে বিকাইয়া, নিজেকে এমনি ফাঁকা করিয়া ফেলাতেই তো আমাদের জীবনের সার্থকতা। আর আমাদের জীবনের সার্থকতা ছাড়া আর কিছুই তো তিনি চান না!

গুরুশক্তি বলি, ভগবৎপ্রেরণা বলি, যাহাই বলি না কেন—চিত্তের পবিত্রতাবলে তাহা নিজের আয়ত্তে আনিতে হইবে—নতুবা পাইয়াও পাওয়া হইল না। কৃপায় যাহা পাইলাম, সেবায় তাহা ফিরাইয়া দিব—ইহাতেই সাধনসিদ্ধি: বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনও সেই বিশ্ববিধাতারই পূজার অর্ঘ্য।

প্রারব্ধ কর্ম্মানুযায়ী এবার যেমন বেশেই এ জগতে এসে থাক না কেন, তার পরেও তোমার করবার আছে। আর শত চেষ্টাতেও যদি তোমার মনের মত না হতে পার, এবারকার আদর্শের সঙ্গে কিছুতেই নিজকে মিলাতে না পার, তবে এক জনকে বুকে রেখে ছেড়ে দাও সব কামনার মায়া—যা আসে চুপ করে সয়ে যাও! এমনি নির্ব্বাক্ ও নির্ব্বিকার থেকে নিজেই নিজের মিত্র হও—সকল শত্রুই পরাঙ্মুখ হয়ে তখন পথ ছেড়ে দিবে। হঠাৎ একদিন দেখবে, এরই মাঝে অজ্ঞাতে তোমার কাম্য কবে পেয়ে বসেছ! তা বলে সাধনা দ্বারাই হয় নাই—আবার আগেকার ওই সাধনাটুকু না হলেও হত না।

সমস্যার সমাধান মানুষ বাহিরে খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু প্রকৃত মীমাংসা বাহিরে হইতে পারে না—যে পর্য্যন্ত নিজের ভিতরে তাহা মিটিয়া না যায়।

ভগবান্ কাউকে সুখ-দুঃখের ভাগী করে জগতে পাঠান না। সুখ দুঃখের কারণ মানুষ নিজেই। যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল। তোমায় অমন করে গড়েছ তুমিই। এজন্য দোষী, শত্রু কিম্বা মিত্র, অন্যে নয়। আত্মৈব আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

জীবনে যা কিছু করছি, তার পিছনে একজন রয়েছে, সে ভালতেও নাই, মন্দতেও নাই; অথচ সেই হচ্ছে আসল কর্ত্তা, যাকে সকলে বলে "আমি।" তাঁকে সাক্ষী রেখে এই বাইরের আমিটার যদি পদে পদে পরাজয় হয়—মরণ ঘটে, তবুও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। যে নিজের মরণ এই ভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে পারে, সে-ই "আমি"র সন্ধান পেয়েছে। সম্পদের দ্রষ্টার চেয়ে এমনি মরণের দ্রষ্টা হতে পারলেই দ্রষ্টৃত্ব ফুটে বেশী—দুর্ব্বল তা পারে না।

চঞ্চল চিত্তেরও শক্তি কম নয়। কিন্তু ঐ চঞ্চলতাই সে শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তার ক্রিয়ার বেগ কমিয়ে দেয়। একমুখী করতে পারলে আবার সেই শক্তিতেই অদ্ভুত পরিণাম ঘটায়। আর একমুখী হওয়ার নামই সংহতি। সংহত চিত্তই স্থির চিত্ত। চঞ্চল চিত্ত যেন পঞ্চমুখী নদী। তাদের শক্তি কম নয়, বরং বেশী বলেই যেন তারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু যদি একমুখী হত, তবে আরও বৃহৎ হয়ে বেশী বেগে শীঘ্র গিয়ে সাগর পেত। তাই সব দিক থেকে গুটিয়ে 'চিত্ত ভগবন্মুখী বা ব্রহ্মীভূত করতে চেষ্টা কর—ক্রমশঃ শক্তি বাড়বে, সিদ্ধি তোমার করায়ত্ত হবে।

চাই আত্মবিশ্বাস। যে কোনও কাজ আমরা করিতে যাই না কেন, যদি মূলেই তাহাতে দৃঢ়

বিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে কাজেই হস্তক্ষেপ করিবে, প্রকৃতিও তাহার অনুকূল হইবে। দ্রোণশিষ্য একলব্য তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

তাঁর রাস্তা কোন দিকে? তোমার ভিতর দিয়ে।

সত্যের সাড়া পেলেই হৃদয় ভরে ওঠে। সেখানেই সামান্য রকমেরও একটা শুভ সত্য ব্যাপার আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেই চিত্ত অনেকখানি ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। আকাশ-বাতাস ভুবনময় যেন আমাকে প্রচার করতে ইচ্ছা হয়। ইহা দ্বারাই বুঝি, সত্য আমাদের কত প্রিয় —কতখানি শক্তিসঞ্চারক। সত্য যার জীবনে যতখানি প্রস্ফুট, আনন্দে তার ততখানি অধিকার। মানুষ যতখানি আপনাকে ব্যর্থ মনে করে, তার বারো-আনি এই সত্যকে লাঞ্ছিত করার অপরাধে অর্জ্জিত হয়। তার ভিতরে যে ব্রহ্মতেজ অবিরত জ্বল্‌ছে—বাক্যে, ব্যবহারে ও চিন্তায় সে তাকে অস্বীকার করে চল্‌ছে। এই ভাবে সত্যকে অপমানিত করায় তার দণ্ড স্বরূপেই মানুষ দুঃখ পায়। নতুবা তার ভিতরে যে বিরাট্ সত্য-স্বরূপ রয়েছেন, তিনি প্রত্যেকের জীবনেই প্রকট হতে চান। কে সে বীর তাঁকে অভিনন্দিত করবে? এই তোমরাই— এই আমরাই।

আমরা সবাই চাই—কিসে শান্তি পাব, সুস্থির হব, মনে সুখী, দেহে সুন্দর হব। কিন্তু মানুষ এ কথা জানে না যে সে কিসে সত্যিকার সুন্দর হয়। তাই সে চায় সেজে-গুজে পরের কাছে সুন্দর হ'তে। কিন্তু সাজলেই তো সুন্দর হওয়া যায় না— সকলে তাকে সুন্দর বলে না বা তার আত্মতৃপ্তি আসে না। তবে মানুষ সুন্দর হয় কিসে, কিসে সে অপরের কাছে মনোরম ও আপনার কাছে আপনার মনোমত হতে পারে? তা পারে মনটাকে নিজের ইচ্ছানুসারে চালাতে জানলে। মনের মত অনুযায়ী চল্‌বে না—মতের অনুযায়ী মনকে চালাবে। এমনি করে মনকে নিজের মুঠোয় এনে তারপর যে জগতের সঙ্গে চল্‌তে থাকে, তার তখন সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে। মোটকথা সংস্কার যত সুন্দর হয়, রুচি যত শুভ্র হয়, বাইরের আচার ব্যবহার ভাব-ভঙ্গীগুলিও ততই অপরের চিত্তাকর্ষক হয়। আর দেহের তো কথা নাই—যতই ভিতরে আনন্দ পাবে, বাইরের সৌন্দর্য্য-সুষমা ততই যেন উছলে উঠবে। তখন যেমন সাজেই সাজ না কেন তাতেই মানাবে। আর অন্তরটা কুৎসিৎ রেখে বাইরে যতই বেশের জৌলুস হোক্, দুদিনেই তা অপরের কাছে বিষ হয়ে উঠবে।

মানুষ বড় হয় কি দিয়ে? দেহের সামর্থ্যে, বা প্রতিভার অদ্ভুত স্ফুরণে যে দীপ্তি, তা সকলের আয়ত্তাধীন নয়; কচিৎ কোনও ভাগ্যবানের জীবনে যে অদ্ভুত কর্ম্মের আদর্শ আমরা দেখতে পাই, তাও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব, অথচ পরমশান্তি-বিধায়ক পন্থা কি? প্রত্যেকের জীবনেই একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে—প্রতি কর্ম্মে, প্রতি কথায়, সকলের কাছে সেই বৈশিষ্ট্যটুকু আপনি প্রকট হয়। কিন্তু সে প্রকটের মাঝে দোষগুণ সমস্তই বিমিশ্রভাবে অজ্ঞাতসারে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে জগৎকে যেইটুকু আঘাত আমরা করি, আচারে-ব্যবহারে যেটুকু অসঙ্গতি এসে জগদ্ব্যাপারের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে উদ্যত হয়, সেখানেই আমরা উল্টা আঘাত পাই। এই প্রত্যাঘাতের উদ্দেশ্য, যাতে আমরা আমাদের জীবনের সঞ্চয় থেকে ধূলাবালির কালিমা ধুয়ে ফেলে আসল সোণাটুকু বার্ করতে পারি। অহরহঃ আঘাতের ফলে মনটাকে এমনি করে ক্রমশঃ শুদ্ধ করার সুযোগ ও অধিকার সকলেরই আছে। এই মনটা নিয়ে ঘরকন্না সবাইকে করতে হয়। কিন্তু সে ঘরকন্নার যে সঞ্চয়, তা সংস্কাররূপে আমাদের বহুজন্ম ঘুরিয়ে ঠিক স্থানে নিয়ে পৌঁছায়। যারা বুঝে এই ঘরকন্না করতে পারে, মনের ঘর কেবল আবর্জ্জনা দিয়ে পূর্ণ না করে যথার্থ ধনের সংগ্রহে নিযুক্ত হয়, তাদের এই জীবনেই পরা শান্তি লাভ হয়—মানুষ সর্ব্ববৃহৎ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়।

বাসন্তী

——(:*:)——

হিমের দারুণ পীড়নের অবসান হইয়াছে। নিরন্ন অস্থি-পঞ্জরময় কৃশ দরিদ্রের মত বৃক্ষগুলি আর শুধু কঙ্কালের মত দাঁড়াইয়া নাই। ফুলে ফলে পল্লবে মুঞ্জরিত হইয়া উৎসবপূর্ণ ভবনের মত আজ সকলে মৌন আনন্দে বিভোর। তরু লতা ফুলে ফলে নীরব স্মিতহাস্য প্রদর্শনপূর্ব্বক অলিকুলও ব্যস্ত হইয়া দিবা-নিশি আপন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। প্রতি কুঞ্জ তাহাদের গুঞ্জনে মহাভাবপুঞ্জের আবেশে যেন নিথর হইয়া আছে। আকাশে বাতাসে ভুবনে ভবনে এক মধুর নীরব হাস্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতির লীলায় আজ সমস্ত দৈন্যের সম্পূর্ত্তি হইয়া এক উৎসবের মেলা বসিয়াছে। তাঁহার সমস্ত শক্তির সমন্বয়ে দশদিক শুধুই আলোয় আলোময় হইয়া গিয়াছে, একটা বিরাট প্রশান্তিতে সমস্ত জগৎ আজ স্নিগ্ধ। পশু-পক্ষী কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্য্যন্ত এমন কি দেবতারাও বুঝি আজ কি এক অজ্ঞাত মধুময় স্নেহের সুকুমারস্পর্শে পুলকিত, নূতন করিয়া সঞ্জীবিত! কি এক অমৃত-রসপানে সকলেই যেন বীর্য্যবন্ত ও প্রশান্ত হইয়াছে।

ফুলের সৌরভে, শোভার সৌন্দর্য্যে জগৎ আজ এমন সঙ্গীতময় হইল কি করিয়া? কার আগমনে নিখিলের আজ এত সম্পদ! আজ বসন্তকে অঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক জগন্ময়ী বাসন্তীর আবির্ভাব হইয়াছে। জগতের এই পরিপূর্ণতা দিয়া যাঁহার আগমনবার্ত্তা সূচিত হইতেছে, তিনি বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিচিত্রভাবে অভিনন্দিতা হইলেও একমাত্র ভারতই তাঁহাকে জগজ্জননী মহাশক্তিরূপে পূজার আসনে বসাইয়া সমস্ত তত্ত্বের সন্ধান করতঃ সফলকাম হইয়াছে। আজ দিকে দিকে প্রকৃতির যে লাস্য-লীলা চলিয়াছে, একমাত্র ভারতের হিন্দুই তাহার মাঝে শুধুই ভোগে নিজকে সঙ্কুচিত করে নাই। এই নিখিলের সৌন্দর্য্য-কল্পনা বুকে লইয়া আত্মসমাধানপূর্ব্বক ধ্যান-নিরত হইয়াছে। তাহাতে যে আনন্দময়ী সর্ব্বশক্তি-সম্পন্না জননীর মধুর পরিকল্পনা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই মূর্ত্তিমতী শ্রীশ্রীবাসন্তীদেবী। এমন করিয়া সমস্ত সৌন্দর্য্যের কোলে বসিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়াও আবার আপনঘরে ফিরিয়া আসা, বাহিরের উপস্থিত সমস্ত ব্যসনেও অপ্রমত্ত ও নিরপেক্ষ থাকিয়া তাহার মূলতত্ত্বের অনুধ্যান—ভোগলোলুপ মনের স্বাভাবিক বিলাস উপকরণকে উপেক্ষাপূর্ব্বক এই সমস্তের মূল উৎসের অনুসন্ধান—একমাত্র ভারতের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত কালে প্রকৃতির এক একটী বিভিন্ন সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয়। জীবকুল এই সমস্ত ঋতুতে জীবনের নব নব স্বাদ অনুভব করে। আতপের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সন্তাপিত হইয়াও বৈশাখের মনোরম পুষ্পবিকাশের গন্ধে দেহমন সন্তৃপ্ত, দীর্ঘ দিবাভাগের সুদীর্ঘ আলোকে জীবলোক প্রভূতকর্ম্মে আত্মনিয়োগে সক্ষম। বর্ষার বারিধারায় শ্রান্ত শরীরকে সুস্নাত করিয়া কৃষকসমূহ ভবিষ্যতের দেহমন-স্নিগ্ধকারী অন্নকূটের ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকে। তরুগণ ঝরঝর বারিধারায় আনন্দাশ্রু বর্ষণ করে। গগন-তলে জলদের বিদ্যুল্লতার পরিকল্পনায় বিমুগ্ধ কেকাকুল সানন্দে পুচ্ছ উর্দ্ধে তুলিয়া নৃত্য করিতে থাকে। গুরু-গুরু নাদে মেঘবৃন্দের আরোহণ-অবরোহণ-শব্দে চিত্ত চমৎকৃত হয়। তারপর সুস্নিগ্ধ শরতে দেহ-মন পাবনকারী মধুর পবন যখন সমস্ত মেঘের কালিমা দূর করিয়া আকাশকে সুন্দর সুনীল বর্ণে অনুরঞ্জিত করে, বৃক্ষে বৃক্ষে মধুর স্মিত হাস্য সদৃশ স্বল্প তাপযুক্ত সূর্য্যকিরণ পড়িয়া যাবতীয় কুসুম-

কোরককে বিকশিত করে, তখনও প্রাণীগণের আনন্দের সীমা থাকে না—আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে শ্যামলা প্রকৃতিমায়ের লীলাঞ্চল সন্দর্শনে প্রফুল্ল ভাব বিরাজ করে; বিহঙ্গনিচয় মধুর স্বরে তান ধরে। ক্রমে ক্রমে যখন সেই শরৎ বিগত হয়, অজ্ঞাতসারে সুখ-ঐশ্বর্য্যের আড়াল দিয়া চুপি চুপি হেমন্ত আসিয়া সে স্থান অধিকার করে। হরিৎ শস্য শ্যামলা ধরণীর সমস্ত অঙ্গ আনন্দে পীতবর্ণ ধারণ করে। মাঠে মাঠে সোণার রং ফলাইয়া ধানের ক্ষেত্রে প্রকৃতি জননীর সোণার আঁচল ঢেউ খেলাইয়া যায়। কৃষকের ভবনে আবার উৎসবের সোরগোল পড়িয়া যায়। নানাবিধ শস্যসমাগমে ভবন পূর্ণ হইয়া উঠে। নূতন ধান্যের অন্ন হইতে মিষ্টান্নের আশায় কলকণ্ঠবিনান্দিত শিশুদিগের আনন্দ-কাকলীতে গৃহ মুখরিত হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সেই সময়কার কোলাহলে সমস্ত ভুবনই নবীন প্রাণে নূতন চেতনায় সন্দীপিত হয়। কিন্তু সেই হেমন্তও চিরস্থায়ী নয়। তাহাকেও বিলীন হইতে হয়। ঋতুরাজের প্রৌঢ়ত্ব এই হেমন্ত অপগত হইলে ক্রমশঃ তাহার বার্দ্ধক্যে শীতরূপী জড়তা আসিয়া আক্রমণ করে। সমস্ত পাদপ সমূহ পত্রপুষ্প বিমুক্ত হইয়া মরার মত নির্জীব ভাবে ঋতুরাজের অস্থিপঞ্জর দেখাইয়া যেন তাহার বার্দ্ধক্যকে বিশেষ করিয়া সমস্ত লোকে প্রকটিত করে। দিনের আলো স্বল্প বিধায় রজনীর মহাতমো তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র গ্রাস করিয়া বসে। তরুগণ শীতের দৌরাত্ম্যে জড়সড় হইয়া নিরুপায় ভাবে বিধাতার মুখ চাহিয়া ঊর্দ্ধদিকে নীরবে চাহিয়া থাকে। ফলফুলশূন্য বলিয়া সম্পদবিহীন ধনীর পুত্রের ন্যায় জনগণকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয়। সমস্ত পশুপক্ষীর আহার প্রচেষ্টার সময় ক্ষীণ হইয়া যায়। কিন্তু মানুষও কি তখন দেহসর্ব্বস্বের ভাবে ভোগের কামনাকে আঁকড়িয়া ধরে?—কেবল জীবোপস্বের আয়োজনে তৎপর হয়?

শীতের পরেই বসন্ত—ইহা যেন আঁধারের পরই আলোর মত বিশ্বকে এক প্রকাণ্ড রহস্যের কবল হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক নূতন জীবন দান করে। এমন ভাবে মরণের পর যে নব জীবন, তাহা যেমন ব্যষ্টির জীবনে মধুময়, সমষ্টির পক্ষেও মহা শুভফলদায়ক। এইজন্যই বোধ হয় মরণ, আঁধার বা অসৎ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হয় না, কেননা তাহা হইলে যে জীবনের, আলোর বা সত্যের মহিমা শীঘ্র সুস্পষ্ট হইত না। এই মরণরূপী রহস্যের সঙ্গে বিশ্বের অনাদি যুগ হইতে লড়াই চলিয়া আসিতেছে। যেমন ব্যষ্টির জীবনে তেমনি সমষ্টিগত জীবন লইয়াও প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক বিশিষ্ট জাতিকেই এই রকম অবিরত যুদ্ধ করিয়া বাঁচিতে হইয়াছে। তাহাতেই সেই বাঁচা সার্থক হইয়াছে। ভারতের ঋষিরা এমন ভাবেই জগৎকে বাঁচিবার সঙ্কেত দিয়া গিয়াছেন। যখন বিনাশের করাল ছায়া দেবসমাজকে আবৃত করিতেছিল, জগতের যাবতীয় সুশৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া উন্মার্গগামী অসুরেরা সমস্ত বিশ্ব গ্রাসপূর্ব্বক তাহাকে ধ্বংস পথে লইয়া যাইতেছিল, সেই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাসঙ্কটের সময়ে দেবসমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অমন ভাবে মৃত্যুর বিভীষিকারূপী রহস্যের অধীনে মৃতের মত নিস্তেজ হইয়া বিশ্বের মাঝে আপনাদিগকে ন্যস্ত রাখিতে পারিলেন না। সমস্ত অত্যাচার অনাচারের উৎপীড়নে পীড়িত তাঁহারা তখন বাঁচার মত বাঁচিবার আশায় এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইলেন যে তাঁহাদের সেই উদ্বোধনের সম্মিলিত উদ্দীপনাই সমস্ত অশুভশক্তিকে পরাস্ত করিল—সেই তেজই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমগ্র অসুরের নিধন সাধন করিল। সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আবার শান্তি বিরাজিত হইল। জগৎ আবার শৃঙ্খলিত হইয়া যথাযথ ভাবে চলিতে লাগিল। আর সেই অশুভাসুর-নাশিনী আশ্বাস দিলেন অর্থাৎ দেবতাদের স্থির বিশ্বাস হইল যে

এইরূপে যখনই যে কোন আকারে এই অশুভা সুরের করালছায়ায় জগৎ আচ্ছন্ন হইবে, তখনই এই মহাতেজময়ী মহাশক্তিস্বরূপিণীর আবির্ভাব হইবে।

ব্যক্তিগত জীবনেও দেখি, যখন চারিদিক কেবল ব্যর্থতার করুণক্রন্দনে চিত্ত ধূমায়িত হইয়া উঠে, বাহিরের কোনও আশার আলোক নয়নগোচর হয় না—আপনার মাঝে কেবলই আবর্জ্জনার স্তূপ জমিতে থাকে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোনও উপায় থাকে না, কেবল নিরাশার অন্ধকারেই সব তলাইয়া যায়—তখনই সেই দারুণ স্তিমিতাবস্থাই মৃত্যুর সমতুল্য। আর সেই মরণের কোলে বসিয়া মানুষ যেন চরম চেষ্টায় আর একবার মরণকামড় দেয়, তাহাতে সে মরে না—মরণআঁধারের ভীষণতার মাঝেও এখন নবজীবনের ভ্রূণরূপে, আশার ক্ষীণালোকবিন্দু ফুটিয়া উঠে আর সেই ক্ষুদ্র নক্ষত্রই ক্রমশঃ বৃহৎ ও উজ্জ্বলতর হইয়া জীবনের আশার সূর্য্যরূপে দিগ্বিদিক আলোকিত করে—মানুষ তখন নূতন জীবন পায়। মরণের এই দ্বন্দ্ব স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদে প্রতিক্ষণে সর্ব্বত্রই হইতেছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মাঝেও তাই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় রহিয়াছে। ইহাই দেবাসুর সংগ্রাম। এই সংগ্রামে অসুরের পরাক্রম অধিক হইলেই, অমাবস্যায় আঁধারে জগৎ আচ্ছন্ন হইবার পরেই ব্যষ্টির সমগ্র চিত্তের একমুখী প্রচেষ্টায় অথবা সমষ্টি দেহশক্তির এক প্রভাবে, সম্মিলিত তেজেই অসুরতমোবিনাশিনী সর্ব্বগুণময়ী জগজ্জননী শ্রীশ্রীবাসন্তী দেবীর আবির্ভাব হয়। অমাবস্যার পরেই একটু একটু করিয়া যে আশার জ্যোৎস্না উঠিতেছিল, সপ্তমী তাই সকলের ভরসাস্থল আবির্ভাবের দিনরূপে পরিগণিত হইল। সেই মায়ের কাছে আমরা কি প্রার্থনা করি?

মানুষ কি চায়? সে চায় ঋদ্ধি, সিদ্ধি, বীর্য্য ও জ্ঞান। আধুনিক যে সভ্যতার যুগে বিজ্ঞানের এত প্রভাব, তাহার লক্ষ্যও ইহাই। পাশ্চাত্য জগতের একমাত্র কাম্য এই ঋদ্ধি, সিদ্ধি, বীর্য্য ও জ্ঞান। ভোগ করিতে হইলে ভোক্তার এই চারিটী অতি প্রয়োজন। জগৎকে শুধু ভোগ্যরূপে ধরিলেও তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান চাই, তাহাকে শত্রু কবল হইতে কাড়িয়া লওয়ার মত বীর্য্য চাই, তাহাতে সিদ্ধিলাভ নিতান্ত প্রয়োজন। আর এই সমস্ত পার্থিব প্রয়োজনে ঋদ্ধি অর্থাৎ ধনের যে আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। পাশ্চাত্য জগৎ এই সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া সমগ্র দেহ-মন এই জগতের ভোগ্যাহরণের প্রতি নিবিষ্ট করিয়াছে। আর তাহারই ফলে দিন বিজ্ঞানের এত উন্নতি ও তৎসঙ্গে মানুষের অভাব বৃদ্ধি এবং তাহা নিরাকরণের প্রচেষ্টা। কিন্তু এই প্রচেষ্টা বহির্ম্মুখী বলিয়াই দিন দিন ক্ষুধার উপশমের পরিবর্ত্তে উহা তীব্রভাবে বাড়িয়াই চলিয়াছে। পূর্ব্বে যাহা উপশান্তির জন্য প্রযুক্ত হইয়াছিল এখন তাহাই কোন্ বিনাশের ছিদ্র দিয়া মহা অসুরকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে। তাই অজ্ঞাতসারে এক সর্ব্বগ্রাসী দুষ্ট ক্ষুধার কবলে পড়িয়া পাশ্চাত্য জগৎ আজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যতই অভাব দূরীকরণার্থ নিত্য নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে, ততই আরও বেশী করিয়া নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি হইতেছে। তাই পাশ্চাত্য আজ মহা ফাঁপরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। তাহাকে এ বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া অমৃতের সন্ধান দিয়া বাঁচাইবার শক্তি যদি কাহারও থাকে তবে তাহা এই প্রাচ্যের তপোভূমি ভারতেরই আছে। ভারতের হিন্দুই সে সঞ্জীবন মন্ত্রের ঋষি বা আবিষ্কারক। উহারা আবিষ্কার করিতেছে প্রত্যহ মরণের ফাঁদ বা গরল, আর সেই ঋষির সমাজের আবিষ্কার হইতেছে অমৃত—যাহা মরণের কোল হইতে টানিয়া আনিয়া মানুষকে নব-জীবন দানে অমর করিয়া তোলে।

হিন্দুও চায়—ঋদ্ধি, সিদ্ধি বীর্য্য ও জ্ঞান। এই ভারতের সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির যুগে প্রতি গৃহ এই ঋদ্ধি, সিদ্ধি, বীর্য্য ও জ্ঞানের জলন্ত উদাহরণ বহু ছিল। ভোগের প্রাচুর্য্য ও সঙ্গে সঙ্গে সামর্থ্য এত ছিল যে আজ তাহা শুনিয়া আমরা সে সমস্ত প্রাচীন উপকথার মধ্যেই গণ্য না করিয়া পারি না। তাঁহাদের যাহা বাস্তব ছিল, আমাদের কাছে তাহা কল্পনার বিষয়। প্রাচীন ভারত কি দৈহিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিষয়েই অদ্ভুত সমৃদ্ধ ছিল।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হিন্দু সেই সমৃদ্ধিতে এই জগতের সেই পার্থিব চরমোৎকর্ষের মাঝেও আত্মবিসর্জ্জন দিয়া উন্নতির পরিসমাপ্তি করে নাই। যখন এই-জগৎ লইয়া সম্পূর্ণ কারবার চলিতেছিল, তাহার মাঝেও তাঁহারা অতীন্দ্রিয় আর একটী উন্নততর জগতের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহারা জানিয়াছিলেন, এই জগতের যতই বৈভব হউক না কেন, উহা সমস্তই নশ্বর—মহাকালের নিদারুণ অট্টহাস্তে সকলই একদিন না একদিন কর্পূরের পাহাড়ের মত উবিয়া যাইবে। আর কামনা বিজৃম্ভিত অর্ব্বাচীন মানব তখন স্তম্ভিত হইয়া শুধুই অদৃষ্টকে ধিক্কার পূর্ব্বক হায় হায় করিবে। এই পরিদৃশ্যমান জাগতিক ঐশ্বর্য্যের এই পরিণাম জানিয়া তাঁহারা এই বিভবে আত্মবিস্মৃত না হইয়া অপ্রমত্ত থাকিয়া আর এক জগতের সন্ধান করিয়াছিলেন। তাই বর্ত্তমানের তুলনায় কোটিগুণ ঋদ্ধি, সিদ্ধি, বীর্য্য, জ্ঞান লাভ করিয়াও তাঁহারা উহাদের স্থূলে কামনা করিলেন না। যে অনাদি অবিনশ্বর মূল উৎস হইতে উহারা এই জগতে নামিয়া আসিয়াছে, তাঁহারা সেই মূল উৎসের অনুসন্ধানে এক একজন জীবন পণ করিয়া সাধনায় ব্রতী হইলেন। কত যুগ, কত বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা সেই নিত-নূতন সত্যে উপনীত হইতে লাগিলেন। আজ পাশ্চাত্যে যেমন নিত্য-নূতন পার্থিব ভোগের ও তাহাদের উৎপাদক নব নব যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে, ভারতেও একদিন এইরূপ অপার্থিব নিত্য-জগতের নিত্য সুখের সত্য আবিষ্কৃত হইত। এই সাধনার দেশে আজ অসাধনে যে আমরা আধ্যাত্মিক সম্পদ্ দেখাইয়া জগৎকে মুগ্ধ করিতেছি, তাহা সেই প্রাচীন পিতৃপুরুষগণেরই সাধনা-সঞ্চিত সম্পত্তি! এই অক্ষয় সম্পত্তির যতই ব্যয় হইতে থাকিবে, সুযোগ্য অধিকারী ইহাকে গ্রহণপূর্ব্বক যতই বিশ্বের আসরে সকলের মঙ্গলার্থে নিয়োজিত করিবে—ততই ইহার পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইবে। জগৎ-সভায় বরেণ্য হইয়া ভারত অনাদিকাল পর্য্যন্ত এই সম্পত্তি বিতরণ করিয়া যাইতে পারিবে। ভারতের প্রচেষ্টা ও প্রাপ্তির ইহাই বিশেষত্ব। ঋদ্ধি, সিদ্ধি তাঁহারাও লাভ করিয়াছেন, কিন্তু সে লাভ দুদিনেই ফুরাইয়া গিয়া অভাবের তাড়নায় তাঁহাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করে নাই।

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বীর্য্য ও জ্ঞানের সন্ধান পূর্ব্বক বাস্তবে তাহা লাভ করিয়া ঋষি যখন উহাদের মূল উৎসের খোঁজ করিলেন, তখন ধ্যানে সেই উৎসরূপী দেবতার সাক্ষাৎ পাইলেন। মানুষের যত কিছু কামনা, তাহা পূরণ করিবার জন্য যেন এই সমস্ত দেবতা মানুষের কাতর আহ্বানে আবির্ভূত হইলেন। ঋষি স্থূলে ইঁহাদের মহিমা উপলব্ধি পূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী করতঃ ইঁহাদের মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিলেন। দেবতার সাথে মানুষের সম্পর্ক ক্রমশঃ সহজ ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আর্য্য ঋষি মানুষ হইতে দেবতা হইয়াছেন—দেবতাকেই শুধু মানুষের মাঝে টানিয়া আনেন নাই। শুধু ইহাই নয়, মানুষ মনুষ্যত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব ও ব্রহ্মত্বে পৌছাইতে পারে, ঋষি নিজ জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

জগতে মানুষের কাম্য সমস্ত স্থূল-সূক্ষ্ম বিষয় সমূহ কামনা করিয়া ঋষির তৃপ্তি ঘটিল না। এই সমস্তের মূলে কোন্ দেব-শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তিনি তাঁহার

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঋষি আবার ধ্যানে বসিলেন। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য-সুষমা, সমস্ত শক্তির প্রস্রবণ, সকল অমঙ্গল যার ছোঁয়াচে মঙ্গলে পরিণত হয়, এমন সর্ব্বার্থসাধিনী মহাশক্তি, মহা আনন্দের একাধারে কল্পনা করিয়া ঋষি ধ্যানস্থ হইলেন। এবার দশদিক আলো করিয়া ভুবন মোহিনী বাসন্তী শ্রী, ধী, বীর্য্য, সিদ্ধি সঙ্গে লইয়া ঋষির মনকে বাহন করিয়া দশভূজা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইলেন। সাধক বিশ্বময় প্রতি অণুপরমাণুতে যে শক্তির উন্মেষ দেখিয়াছিলেন, সেই সমস্ত শক্তির—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় চেতন-অচেতনের সারভূতা, জগন্ময় পরিব্যাপ্তা রুদ্র-শান্তা, পরম সৌম্যা জগজ্জননীর অভয় আশীর্ব্বাদ বর লাভ করিলেন। সকল দ্বন্দ্ব মিটিল, হৃদয়ের সংশয় এক নিমেষে ঘুচিয়া গেল। সাধক দিব্যচেতনায় বিভোর হইলেন। চক্ষু মুদিয়াও যে রূপ, বাহিরেও ঘন বিগ্রহে সেই রূপ, আবার জগন্ময় পরিব্যাপ্ত সেই একই ভাবের একই রূপের লহরী। আজ বিশ্ব জুড়িয়া কেবল তাঁহারই দ্যুতি। আজ বিশ্বপ্রাণে যে এক মহান্ প্রশান্তি, তাহা তাঁহারই প্রতি শ্রদ্ধাভরে প্রণতিস্বরূপ। তাঁহাকে পূজা করিয়া জীবনের প্রতি ক্ষণে তাঁহারই অস্তিত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া হৃদয় তাঁহাদের স্বতই বিস্ময়ে পুলকিত আবার ভক্তিতে অবনত হইয়া পড়িল !

যখন কর্ম্মক্লান্ত দেহমনের শ্রান্তিতে আপনাকে অসহায় ভাবিয়া নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন তো বুঝি নাই, বিশ্বময় এমন করিয়া বিপুল শক্তি-সমন্বিতা বিশ্বময়ী কেমন করিয়া লুকাইয়া আছেন ! প্রতি শ্বাসে শ্বাসে যে তাঁহারই নিশ্বাস প্রশ্বাস অনুভব করিতেছি। আমার প্রতি কর্ম্ম, প্রতিক্ষণের চিন্তা যে তাঁহা হইতেই উদ্ভূত। সকল প্রচেষ্টার মূলই যে তিনি। শিরায় শিরায় মর্ম্মে মর্ম্মে যে শক্তির জোয়ার খেলিয়া যায়, তাহাও যেমন তাঁহারি মধ্যে, তেমনি ঐ যে প্রলয়ের বিষাণ দিনাদে সমস্ত সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়, তাহাও তাঁহারি শক্তিতে। সব চেয়ে বড় কথা, তুমি একান্ত ভাবে আমারই—আমি তোমারই। বিশ্বব্যাপিনী, আজ যে ঘনবিগ্রহে ধরা দিয়াছ, তাহা যে আমারই জন্য। আমার হৃদয়ের সকল বেদনা, সকল অনুভূতি আজ তোমাকেই কেন্দ্র করিয়া ! বিশ্ব হৃদয়েই আজ পূর্ণতা নামিয়া আসিয়াছে আর তাহাতে আবির্ভূতা হইয়াছ তুমি !

মহাসপ্তমী তিথিতে শ্রীশ্রীবাসন্তীর আবির্ভাব, তৎপর দিবসই অশোকাষ্টমী তিথি। এই দিন জগন্মাতাকে অন্নপূর্ণারূপে আরাধনা করি। নির্গুণ পুরুষ সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন আর তাঁহারই মহাশক্তিরূপিণী মহামায়া সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা হইয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ সাধন করিয়া থাকেন। শিব অর্থাৎ সকলের মঙ্গল বিধাতা যিনি তিনি এইরূপে নিষ্ক্রিয় হইয়া কেবল-মাত্র মহামায়াকে ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই নিরাকার নির্গুণ পরম শিব। ব্যষ্টি ভাবে এই জীব, আর সমষ্টি ভাবে শিব, দুইজনেই যথাক্রমে মহামায়ার কাছে ভিখারী। ব্যষ্টি-সমষ্টি উভয় জীব-নেই আমরা মহাশক্তির আশ্রয় লইয়া থাকি। এই মহাশক্তিরূপিণীই জগদম্বা অন্নপূর্ণা। স্থূলে সূক্ষ্মে সমস্তের প্রেরণাই তিনি প্রেরণ করেন। অন্নপূর্ণাজননী একমাত্র তিনিই। অন্নের দাতাও তিনি, আবার অন্নও তিনিই। তাই তিনি অন্নপূর্ণা ও অন্নদা।

কামনার আহার জুটাইতে না পারিয়াই সকলে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। এই বিভ্রমের লীলা লইয়াই জগৎ চলিতেছে। তাঁহার নিকট হইতে প্রসন্ন অন্ন গ্রহণ না করিয়া করিয়া যখনই ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় আপন অন্ন আপনি নির্ব্বাচন করিতে গেল, তখনই তাহার আত্মঘাত সুরু হইল। অন্ধ মানব, ভোগের কাড়াকাড়ি লইয়াই ব্যস্ত।

কিন্তু একবার যদি এই বসন্তের মৃদুমন্দ পবন-হিল্লোলের সঙ্গে দেহ মন মিশাইয়া আপনা ভুলিয়া বিশ্বময়ীকে উপলব্ধির জন্য বিশ্বময় আপনাকে প্রসারিত করিতে পার, এই মন্থর সমীরণের মত আপনার বুকের সুবাস কুবাস উভয়ের প্রতি উদাসীন হইয়া অনন্ত শূন্যে বিচরণ করিতে পার, তবে সে পরম পবিত্র মুহূর্ত্তেই ভুবন আলো-করা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী জগজ্জননীর সুদিব্য বিকাশ হইবে। জগৎ জ্যোতির্ম্ময় রূপে প্রতিভাত হইবে। সেই অমল ধবল শুভ্র জ্যোতিসমুদ্রে অবগাহন হইয়া যে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিবে, তাহার প্রভাবে সমস্ত তমো দূর হইয়া আপনার হৃদয়ের সাথে জগৎ জুড়িয়া চিরবসন্ত বিরাজিত দেখিবে—দেবী-বাসন্তীর দর্শন সেদিনই ঘটিবে।

মীরাবাঈ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

—*—

মেরে পরম সনেহী রামকী, নিত ওলূড়ী আরে ॥
রাম হমারে হম হৈঁ রাম কে, হরি বিন কুছ ন সুহারে ॥

আমার পরম প্রীতি রামের সঙ্গে, নিত্যই সে আমার স্মরণে জাগিয়া রহিয়াছে। রাম আমার, আমি রামের, হরি বিনা আর কিছুই যে আমার রোচে না!

"রাম আমার, আমি রামের"—এই হইল মীরার দর্শনের মর্ম্মকথা। জননীকে সম্বোধন করিয়া একদিন মীরা বলিয়াছিলেন,—

মাঈ. ম্হানে সুপনে মেঁ পরণ গয়া জগদীস!

—ও মা, স্বপ্নে আমার জগদীশের সঙ্গে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

মা মেয়ের এই পাগলামি শুনিয়া মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন, পাগল মেয়ে! স্বপ্নে মানুষ কত কিছুই দেখে, তাই বলিয়া কেহ কি সে সব কথা বিশ্বাস করে?

মেয়ে সজলচক্ষে, অতি মধুর হাসিয়া প্রীতিসিক্ত কণ্ঠে বলিল, বিশ্বাস করিবে না মা, ওই স্বপ্নের মাঝেই যে আমার গায়ে হলুদ হইয়া গেল—"সুধে ভীজ্যো গতে"—আমার অঙ্গ সুধাসিক্ত হইল যেন। শ্রীভগবান্ যে আমার স্বামী; স্বপ্নে তোরণ বাঁধিয়া ছাপ্পান্ন কোটী বরযাত্রী সঙ্গে লইয়া তিনি যে আমাকে তাঁহার করিয়া গেলেন।

সুপনেমেঁ ম্হাঁনে পরাণ ময়া জী হো গয়া অচল সুহাগ!

—সত্যি মা, স্বপ্নে আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে. বঁধুর অচল সোহাগ যে আমি পাইয়াছি!

এই স্বপ্নাবেশের মাধুরী মীরার জীবনকে যেন জ্যোৎস্নাধারায় গলাইয়া গিয়াছে। কোথায়ও বিচার-বিবেকের কাঠিন্য নাই, অথচ জ্ঞান যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া তাঁহার বাণীতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। কৃচ্ছ্র সাধনার কোথায়ও আভাস নাই, অথচ বিরহের বেদনায় অমুদ্দিষ্ট তপশ্চর্য্যার মাঝেও একটী কমনীয় শ্রী দান করিয়াছে। মীরার সমস্তই এমনি সহজ ও মধুর!

লীলা-বিলাসের কথা পরে বলিব, আগে গোড়ার কথাই বলি। ভক্তির সূচনা ব্যাকুলতাতে; ব্যাকু-

লতার প্রকাশ প্রার্থনায়। মীরার প্রার্থনা যেন একটী আনত স্নিগ্ধ পুষ্পস্তবকের মত; কোথায়ও তাহার এতটুকু আড়ম্বর নাই, কার্পণ্য নাই, ছলনা নাই। বাংলায় নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনায় যেমন পাই একটা বেপথুমতী বিহ্বলতার অনতিব্যক্ত স্ফুরণ, ঠিক তেমনটি আমরা পাই মীরার প্রার্থনায়। গিরিধরকে সম্বোধন করিয়া মীরা বলিতেছেন—

মীরা কো প্রভু সাচী দাসী বনাও।
ঝুঠে ধন্ধো সে মেরা ফঁদা ছুড়াও॥
লুটে হী লেত বিবেক কা ডেরা।
বুধি বল যদপি করূঁ বহুতেরা॥
হায় রাম নহিঁ কছু বস মেরা।
মরত হুঁ বিবস প্রভু ধাও সবেরা॥
ধর্ম্ম উপদেস নিত প্রতি সুনতী হুঁ।
মন কুচাল সে ভী ডরতী হুঁ॥
সদা সাধুসেবা করতী হুঁ।
সুমরণ ধ্যান মেঁ চিত ধরতী হুঁ॥
ভক্তিমার্গ দাসীকো দিখাও।
মীরা কো প্রভু সাচী দাসী বনাও।

—ওগো প্রভু, মীরাকে তোমার সত্যিকার দাসী করিয়া নাও! মিথ্যা ধাঁধার ফাঁদ হইতে আমাকে মুক্তি দাও। কতই তো জোর করি, কতই তো ফন্দী খাটাই, তবুও ওরা আমার বিবেকের ডেরা যে লুটিয়া নেয়। হায় গো প্রভু, কিছুই যে আমার বশে নয়! ওগো, আমি বিবশ হইয়া পরাণে মরি, শীঘ্র আমার কাছে ছুটিয়া এসো প্রভু! ধর্ম্মের উপদেশ নিত্যই শুনিতেছি, মন পাছে বেচাল হইয়া যায়, এই শঙ্কায় সদা জাগিয়া আছি; সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করিতেছি, স্মরণ-মননে চিত্তকে ধরিয়া রাখিয়াছি। হে প্রভু, তোমার এই দাসীকে ভক্তির পথ চিনাইয়া দাও, তোমার মীরাকে সত্যিকার দাসী করিয়া নাও!

এই কয়টী ছত্রে প্রাণের আকুলতা কেমন অনাড়ম্বর অথচ জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে!

আশা ও আশঙ্কায় কম্পমান চিত্ত লইয়া মীরা বলিতেছেন—

মহাঁরী সুধ জ্যুঁ জানো ত্যুঁ লীজো জী॥
পল পল ভীতর পন্থ নিহারূঁ।
দরসণ মহাঁনে দীজো জী॥
মৈঁ তো হুঁ বহু ঔগণহারী,
ঔগণ চিত মত দীজো জী॥
মৈঁ তো দাসী থাঁরে চরণ কঁবলা কী
মিল বিছুরন মত কীজো জী॥

ওগো, আমার কথাও তুমি যখন মনে হয় একবার শুধাইও! আমি পলে পলে অন্তরের পথ চাহিয়া ফিরিতেছি, হে প্রভু, আমায় দরশন দিও! আমার তো অবগুণের আর সীমা নাই, তুমি যেন তাহার উপর নজর দিও না। আমি তোমার চরণের দাসী, একবার কাছে আসিতে যেন ভুলিয়া যাইও না প্রভু!

এই ব্যাকুলতা নিরন্তর মীরাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। মীরার আর এখন—

দিন নহিঁ চৈন রাত নহিঁ নিদরা সুখুঁ খড়ী খড়ী।
বান বিরহকে লগে হিয়ে মেঁ ভূলুঁ ন এক ঘড়ী॥

—দিনে নাই শান্তি, রাত্রে নাই ঘুম; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমি শুকাইয়া যাইতেছি। বিরহের বাণ আমার হিয়ায় বিঁধিয়াছে, এক মুহূর্ত্তও তো তাহাকে আমি ভুলিতে পারিতেছি না!

আমি এমন করিয়া যাহাকে চাই, সে কি আমায় দেখা না দিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু প্রথম দর্শনে যেমন আছে আনন্দ, তেমন আছে শঙ্কা। দেখিয়া আপনা ভুলিয়া যাই, কিন্তু আশা না পুরিতেই যে মানসী প্রতিমা চঞ্চলা হইয়া উঠে। দেখা দিয়া যে সে পলাইয়া যাইতে চায়—ক্ষণিকের দর্শনে প্রাণে চিরন্তনের বিরহানল জ্বালিয়া দিয়া! তাই ওগো গিরিধর, তোমার পায়ে মীরার এই মিনতি—

পিয়া মহাঁরে নৈণা আগে রহজ্যো জী ॥
নৈণা আগে রহজ্যো, মহাঁনে ভুল মত জাজ্যো জী ॥
ভৌসাগরমেঁ বহী জাত হুঁ, বেগ মহারী সুধ লীজ্যো জী ॥

—ওগো প্রিয়, তুমি দাঁড়াও আমার আঁখির আগে! আমার আঁখির আগে দাঁড়াও গো—আমাকে ভুলিয়া যাইও না যেন! এই ভব সাগরে দেখ আমি ভাসিয়া চলিয়াছি, তুমি একবার আসিয়া আমার কথা শুধাইয়া যাও!

আমার এ মিনতি—এ দাবী নয়; কেননা তুমিই যে কি, আর আমিই বা কি, তাহা আমি জানি। কিন্তু তবুও, একথাও ভুলিতে পারিনা যে আমি হীন হই, ক্ষুদ্র হই, তবুও আমি তোমার ছাড়া আর কারু তো নই। তাই বলি—

হো জী মহারাজ ছোড় মত জাজ্যো ॥
মৈঁ অবলা বল নাহিঁ গোসাঈঁ, তুমহিঁ মেরে সিরতাজ ॥
মৈঁ গুণহীন গুণ নাহিঁ গুসাঈঁ, তুম সমরথ মহরাজ ॥
রাবলী হোই কে কিন রে জাউঁ, তুম হৌ হিবড়া রো সাজ।
মীরা কে প্রভু ঔর ন কোঈ, রাখো অব কে লাজ ॥

—ওগো মহারাজ, তুমি আমায় ছাড়িয়া যাইও না যেন। ওগো গোসাঁই, আমি যে অবলা, কোনও বলই যে আমার নাই; তুমিই যে আমার মাথার মুকুট। জানি প্রভু, আমি গুণহীনা, কোনও গুণই আমার নাই, আর তুমি সমর্থ, তুমি মহারাজ। কিন্তু আমি তোমার হইয়া আর কাহার হইব, প্রভু! তুমিই যে আমার বুকের হার। মীরা জানে, তাহার মালীক আর কেউ নয়; এখন তুমিই মীরার লজ্জা রক্ষা কর।

আর ও বলি, আমি কি আর তোমাকে জানি না প্রভু, যে কাঙ্গাল, যে শরণাগত, তাহাকে তুমি যে বুকে তুলিয়া লও? এ কথা জানি বলিয়াই তো বলি—

রাবলো বিড়দ মোহিঁ রূড়ো লাগে, পীড়িত পরায়ে প্রাণ ॥
সগো সনেহী মেরো ঔর ন কোঈ, বৈরী সকল জহান ॥
মীরা দাসী অরজ করত হৈ, নহিঁ জী সহারো আন ॥

—তোমার ওই স্বভাবটী বড় ভাল লাগে যে তোমায় ভালবাসে, তুমি তাহার দুঃখ দখিলে গলিয়া যাও! তোমার মীরাও বড় দুঃখিনী, তাহার আত্মীয় বান্ধব বলিতে কেহই নাই, সমস্ত সংসারটাই তাহার শত্রু। তাই তোমার দাসী মীরা তোমার কাছে এই আর্জী করিয়া রাখিল, তার যে আপন বলিতে আর কেহ নাই, এ কথা যেন তুমি ভুলিয়া যাইও না!

বাস্তবিকই তো, তুমি ছাড়া আমার আর কে ই বা আছে? —এই যে প্রভু,—এই যে তুমি—এই যে আমার কাছে—অতি কাছে—এখন আর——

তুম বিচ হম বিচ অন্তর নাহীঁ জৈসে সূরজ ধামা।
মীরা কে মন ঔর ন মানৈ চাহে সুন্দর শ্যামা ॥

তোমার আর আমার মাঝে অন্তরাল কিছুই নাই—যেমন সূর্য্য আর সূর্য্যকিরণে তফাৎ নাই কিছুই। মীরার মন আর কিছুতেই শান্ত হইবে না, সে চায় শুধু শ্যামসুন্দরকে।

বিরহিনীর হৃদয় ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—

প্যারে দরসণ দীজ্যো আয়, তুম বিন রহ্যো ন জায় ॥
জল বিন কমল চন্দ বিন রজনী, ঐসে তুম দেখ্যাঁ বিন সজনী।
যাকুল ব্যাকুল ফিরূঁ রৈণ দিন, বিরহ কলেজো খায় ॥
দিবস ন ভূখ নীঁদ নহিঁ রৈণা, মুখ সূঁ কথত ন আবৈ বৈণা।
কহা কহূঁ কুছ কহত ন আবৈ, মিল কর তপত বুঝায় ॥
কূঁ তরসাবো অন্তরজামী, আয় মিলো কিরপা কর স্বামী।
মীরা দাসী জনম জনম কী, পরী তুম্হারে পায় ॥

—প্রিয়তম, এসো, একবার দরশন দাও, তোমাকে ছাড়িয়া আর থাকিতে পারি না যে! জল না থাকিলে যেমন কমল, চাঁদ না থাকিলে যেমন রজনী; ওগো বঁধু, তোমাকে না দেখিয়া আমারও সেই

দশা! আমি দিবারাতি আকুলি-বিকুলি করিয়া ফিরিতেছি—বিরহে যে আমার কলিজা খাইয়া ফেলিল। দিনে আমার ক্ষুধা নাই, রাত্রে নাই ঘুম, কথা বলিতে গেলে আমার মুখে যে বচন সরে না। কি আর বলিব; কোন কথাই যে জুটিতেছে না—এসো বন্ধু, আসিয়া এই তাপ শীতল কর। ওগো অন্তরের ধন, এমন করিয়া তৃষা বাড়াইতেছ কেন, এস দয়া করিয়া আমায় বুকে তুলিয়া লও। মীরা যে তোমার জন্ম জন্মের দাসী; ওগো তোমার পায়ে পড়ি, একবার এসো!

এই যে—এই যে প্রভু তুমি আসিয়াছ—

মৃহাঁরো জনম-মরণ কো সাথী,
থাঁ নে নহিঁ বিসরূঁ দিন রাতী॥
তুম দেখ্যাঁ বিন কল ন পড়ত হৈ, জানত মেরী ছাতী।
ঊঁচী চঢ় চঢ় পন্থ নিহারূঁ রোয় রোয় অঁখিয়া রাতী॥
যো সংসার সকল জগ ঝূঁঠো, ঝূঁঠা কুল রা নাতী।
দোউ কর জোড়্যাঁ অরজ করত হূঁ, সুণ লীজো মেরী বাতী॥
যো মন মেরো বড়ো হরামী, জ্যুঁ মদ মাতো হাথী।
সতগুরু দস্ত ধরো সির উপর, আঁকুস দে সমঝাতী॥
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, হরিচরণাঁ চিত রাতী।
পল পল তেরা রূপ নেহারূঁ, নিরখ নিরখ সুখ পাতী॥

—ওগো আমার জন্ম মরণের সাথী! দিন-রাতের মাঝে এক মুহূর্ত্তের দরুণও কি তোমাকে ভুলিতে পারি? তোমাকে না দেখিলে যে আমার সোয়াস্তি নাই—এ কথা তো আর কেউ জানে না, জানে কেবল আমার অন্তর। তোমার দরুণ উঁচুতে চড়িয়া আমি পথের পানে চাহিয়া রহিয়াছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ লাল হইয়া গিয়াছে। এই জগৎসংসার সকলই মিথ্যা, কুলের সম্বন্ধও তো মিথ্যা; আমি দুই কর জুড়িয়া তোমার কাছে আরজী করিতেছি, আমার কথা কয়টী তুমি শুনিয়া লও।—এই যে আমার মন, এ বড় পাজী, যেন মদে মাতাল হাতী। ভাগ্যে সদ্‌গুরু তাঁহার হাত আমার মাথায় রাখিয়াছেন, তিনি অঙ্কুশের আঘাতে তাকে পথে ফিরাইয়া আনেন। তাই আজ গিরিধর নাগরই মীরার প্রভু। তোমারই চরণেই আমার চিত্ত লীন হইয়া রহিয়াছে। আমি পলে পলে দেখি বন্ধু তোমার রূপ—আর দেখিয়া দেখিয়া কি বিপুল সুখে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠে।

আমার এ সুখের তুলনা কি জগতের কোথাও আছে? তোমার উদ্দেশ পাইয়া আজ আর আমি দীনা হীনা কাঙালিনী নই. আজ আমি রাজরাজেশ্বরী—

বড়ে ঘর তালী লাগো রে, ম্হাঁরা মন রী উণারথ ভাগী রে॥
ছীলরিয়ে ম্হাঁরো চিত নহীঁ রে,
ডাবরিয়ে কুণ জার।
গঙ্গা যমনা সূঁ কাম নহীঁ রে,
মৈঁ তো জায় মিলূঁ দরিয়ার॥
কাচ কথীর সূঁ কাম নহীঁ রে,
লোহা চঢ়ে সির ভার।
সোনা রূপা সূঁ কাম নহীঁ রে
ম্হাঁরে হীরাঁ রো বোপার॥
ভাগ হমারো জাগিয়ো যে
ভয়ো সমন্দ সূঁ সীর।
অমৃত প্যালা ছাড়ি কৈ
কুণ পীবৈ কড়বো নীর।

—আজ আমি বড় ঘরের ঘরণী হইয়াছি, আমার মনের সকল কামনা পূর্ণ হইয়াছে। এতটুকু পুকুরের প্রতি আর আমার নজর নাই, আমি ডোবার জল খুঁজিব কেন, গঙ্গা-যমুনাই বা ঢুঁড়িব কেন, আমি সমুদ্রে যাইয়া মিশিব! কাচ, লোহা, সোণা, রূপা দিয়াই বা আমার প্রয়োজন কি, আমার যে এখন হীরার বেসাতী! ওগো, আমার ভাগ্য আজ জাগিয়াছে, সাগরের সঙ্গে আজ আমি মিলিয়াছি। এখন অমৃতের পেয়ালা ছাড়িয়া কে তিক্ত জল পান করিবে বল?

(ক্রমশঃ)

উত্তমর্ণ ভারত

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

—✱—

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

প্রাচীন গ্রীকেরা ভারতবর্ষের যে বিবরণ লিখে রেখে গেছে, তা কেউ পড়েছ ? খ্রীষ্ট জন্মাবার প্রায় ৬০০ বছর আগে গ্রীকরা ভারতবর্ষে আনাগোনা সুরু করে। ইতিহাসে আছে, এই গ্রীকদের ভারতবর্ষে ভ্রমণকাহিনী। আমি তার কতক কতক পড়েছি। দেখবে, ওই সব ভ্রমণকাহিনীতে ভারতবাসীদের একটা আদর্শ জাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রীকরা বল্‌ছে, হিন্দুরা মিথ্যা কথা বল্‌তে জান্‌ত না। স্ত্রীলোকেরা অবাধে পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা কর্‌ত। স্ত্রী-পুরুষের অধিকারে সাম্য ছিল। সমস্ত দেশ জুড়ে বনে পর্ব্বতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। দেশের বাহ্য সম্পদের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা তারা রেখে গিয়েছে ; আর বল্‌ছে, ওদেশে কোথাও ব্যভিচার বা বিশ্বাসঘাতকতার লেশমাত্র ছিল না। দেশের দার্শনিক মত সম্বন্ধেও তারা কিছু কিছু আলোচনা করেছে। মোট কথা, এ দেশ দেখে গ্রীকরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আজও প্রাচীন ভারতের বড় বড় কোনও গ্রন্থভাগ স্ত্রীলোকের লেখা দেখতে পাই। ভারতবর্ষে একবার একটা বিশাল ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়, জগতের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন তার বক্তা, আর সেখানে সভানেত্রীর কাজ করেছিলেন এক নারী। নারীর হৃদয় হতে উৎসারিত হয়েছে কোনও কোনও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বাশ্চর্য্য বেদবাণী। ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের কথায় সায় দিয়ে আমিও বলি, সত্যের আদি ভ্রূণ নারীর হৃদয়ে।

ভারতবর্ষের এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অধঃপতন হল কিসে ? ভারতবর্ষে পৌত্তলিকতা এলো কোথা থেকে ? পৌত্তলিকতা তো ভারতবর্ষের পয়দা নয়। আজ খৃষ্টানরা নাক সিঁটকিয়ে বলে, তোমরা সব পৌত্তলিক ! কিন্তু বিশাল বেদসাহিত্যে, কাব্যে, ব্যাকরণে, গণিতে, স্থপতিবিদ্যায়, সঙ্গীতে, কোনও শাস্ত্রেই পৌত্তলিকতার নামগন্ধও তুমি পাবে না। তাহলে এই পৌত্তলিকতা এলো কোথা থেকে ? এ তো ভারতের ধর্ম্মের কোনও অঙ্গ নয়। এই পৌত্তলিকতা এসেছিল খৃষ্টানদের দৌলতে। লোকে ইতিহাসের ওই পাতাখানি উল্‌টায়নি এখনো, কিন্তু আমার এই গবেষণা ছাপার হরফে বের হবে। বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ উভয়বিধ প্রমাণ দিয়ে আমি দেখাতে পারি যে খৃষ্টের তিরোভাবের পর চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীর মাঝে কতকগুলি রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান ভারতবর্ষে যায় ; আজও তারা সেখানে আছে, তাদের সেণ্ট টমাস ক্রীশ্চান বলা হয় ; তারা দাক্ষিণাত্যে থাকে। এই খৃষ্টানেরাই প্রথমতঃ পৌত্তলিকতার প্রচার করে। অন্তরঙ্গ প্রমাণসহায়ে আমি দেখাতে পারি—পৌত্তলিকতার সব চেয়ে বড় চাঁই রামানুজের একজন গুরু ছিলেন এই সেণ্ট টমাস ক্রীশ্চান সম্প্রদায়ের লোক। যে মূর্ত্তির সম্মুখে এঁরা মাথা নুইয়েছিলেন, সে মূর্ত্তি আমি জানি ; আর এও জানি, এই আদি মূর্ত্তির মুখের ছাঁচ মোটেই প্রাচ্য নয়। এই হতেই বুঝ্‌তে পারি, তোমাদের খৃষ্টানী হতেই পৌত্তলিকতার উদ্ভব। এ জিনিষ তোমরাই ওদেশে নিয়ে গিয়েছ। আজ মিশনারীরা ভারতবর্ষে গিয়ে পৌত্তলিকতার উপর ঝাল ঝাড়ে ; এক হাতে তারা বিগ্রহ বিধ্বস্ত করে, আর এক হাতে আবার পয়সার লোভে বিগ্রহ বানিয়ে বেচে ! এমনি করে তোমরা ওদেশের লোককে খৃষ্টান বানাবে ! এই যে বিগ্রহ বানিয়ে লোকের কাছে বেচ, বাইবেলের চেয়ে তার জোর বেশী হবে না কি ? তোমরাই সে কথা ভাল বোঝ !

তারপর ও দেশে নারী-জাতীর দাসীবৃত্তি সম্বন্ধে কথাই হয়ত তোমরা শুনেছ। শুনেছ, মেয়েরা ও দেশে ঘোমটা দেয়। কিন্তু অবগুণ্ঠনের মূল ইতিহাস সম্বন্ধে দু'চার কথা বল্‌ছি। মুসলমানরা এক সময় ভারতবর্ষের রাজা ছিল। তারা অত্যন্ত লম্পট ছিল। অবিবাহিত মেয়েদের ওপর পাশব অত্যাচার হত। হিন্দুরা এ থেকে বাঁচতে গিয়ে নিয়ম করল যৌবন উদ্গমের পূর্ব্বেই সব মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। রাস্তায় ঘাটে চল্‌তে মেয়েদের ঘোম্‌টা ছাড়া চলা সম্ভবপর ছিল না, কারণ বিজেতা মুসলমানেরা তাদের মুখ দেখলেই ইজ্জত মারবার চেষ্টা কর্‌বে। এমনি করে অবগুণ্ঠনের সূত্রপাত হয়; আর মুসলমানরা যে দেশ জয় করেছে, সেই দেশেই অবগুণ্ঠনের রেওয়াজ হয়েছে। হিন্দুর শাসন কালে এই নিয়ম কিন্তু ছিল না।

ভাই সব, হিন্দুরা তোমাদেরই জ্ঞাতগুষ্টী। তাদের ভাষা তোমাদের ভাষারও আদি। আমার চাম্‌ড়া যে কাল, তার কারণ রোদে পুড়ে তা এমন হয়েছে। নইলে আমার শরীরের যে অংশ ঢাকা রয়েছে, তা তোমাদের মতই গৌর। হিন্দুর মুখে প্রাচ্য ছাঁচ বটে, কিন্তু তারা তোমাদের আত্মীয়, তোমাদের সঙ্গে এক।

আধ্যাত্মিকতা আর সভ্যতার দরুণ ইউরোপ যে গ্রীসের কাছে ঋণী, এ কথা কেউ অস্বীকার কর্‌বে না। কিন্তু, ভাই, গ্রীক্‌দের মূলের খবর কি? গ্রীকদের দর্শন সম্বন্ধে কি বল্‌তে চাও? ভারতের দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে কখনো প্লাতো, সোক্রাতেস্‌ বা পীথাগোরাস্‌ পড়েছ? যদি তা পড়ে থাক তো এ কথা কিছুতেই অস্বীকার কর্‌তে পারে না যে আত্মার অমরত্ব, জন্মান্তর ইত্যাদি সিদ্ধান্ত হিন্দু-দর্শনেরই দান; তফাৎ এই যে হিন্দুর সবটুকু গ্রীকেরা নিতে পারে নি। হিন্দুর ন্যায়ের সঙ্গে আরিষ্টোটলের ন্যায়ের তুলনা করে দেখ, তার গলদ কত। পঞ্চাবয়বী ন্যায়কে গ্রীকেরা কি ভাবে বিশ্লেষণ করেছে, আর হিন্দুরাই বা কি ভাবে করেছে একবার তুলনা করে দেখ। হিন্দু ন্যায়ের আরোহ, অবরোহ (Inductive, Deductive) দুটী প্রণালীই ব্যবহার করেছে, আর গ্রীক্‌ ও ইউরোপীয়ন্‌ দার্শনিকেরা শুধু অবরোহ প্রণালীই দেখিয়েছে উইলিয়াম্‌ জোন্স এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন; তিনি বল্‌ছেন,—গ্রীক্‌ গ্রন্থকারদের লেখার সঙ্গে হিন্দুর উদার, প্রাঞ্জল, গম্ভীরার্থ দর্শনপ্রস্থানের যখন তুলনা করি, তখন এ কথা না মনে হয়েই পারে না যে ভারতীয় দর্শনের মূল প্রস্রবণ হতেই গ্রীক্‌চিন্তার ধারা প্রবাহিত।

তোমাদের বাইবেলের প্রাচীন সংহিতা হতে নবীন-সংহিতায় তফাৎ কি?—এই সব উক্তি লক্ষ্য কর দেখি—"আমি এবং আমার পিতা অভেদ"; "আমি তাঁতেই সঞ্জীবিত, সঞ্চলিত ও সমাহিত; আদিতে ছিলেন বাক্‌; বাক্‌ ছিলেন ব্রহ্মে; বাক্‌ই ছিলেন ব্রহ্ম"; "তনয়কে যে দেখিয়াছে, তাতকেও সেই দেখিয়াছে"; "বৈকুণ্ঠ তোমার অন্তরে"; "প্রতিবাসীকে নিজের মতই ভালবেসো।" তারপর দেখ, খৃষ্ট যখন বল্‌ছেন, "তোমরা আমার মাংস আহার কর, আমার রক্ত পান কর; আমার মাংস আহার আর রক্ত পান না করলে তোমাদের আর নিস্তার নাই", তখন লোকে কথাগুলোর অর্থ যে কতখানি বাঁকিয়ে চুরিয়ে নিয়েছে, তা একবার ভেবে দেখ। টাট্‌কা রক্ত মাংস খেলেই সব চুকে যেত, কিন্তু তারা এখন তাকে করে তুলেছে একটা পুতুল-খেলা। একবার বেদসম্বন্ধী কেতাব দু'চার খানা পড়ে দেখো, তাহলেই জান্‌তে পার্‌বে, এ সব উক্তি বেদেও আছে, হাজার হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে এই সব সত্য প্রচার হয়েছিল। খৃষ্টের পুনরুত্থান, তাঁর উপদেশ—এ গুলোও হিন্দুর বেদান্ত-বাদের অভিমত। নিকোলাস্‌ নোটোভিচ (Nicho-

las Notovitc) নামে একজন রুশীয় পণ্ডিতের লেখা একখানি ফরাসী বইএর ইংরেজী অনুবাদ—নাম "যীশুখ্রীষ্টের অজ্ঞাত জীবন"; বইখানা পড়ে দেখতে পার।

তিব্বতের এক মঠে কতকগুলি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়; তাকেই ভিত্তি করে এই বইখানা লেখা। লেখক সেই মঠে গিয়েছিলেন; বইখানা পড়তে গেলে লেখকের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। যীশুর জীবনের যে অংশের কথা বাইবেলে কিছুই নাই, সেই সময়কার কথা বইখানাতে আছে—তাঁর ৮ বছর বয়স হতে ৩০ বছর বয়স পর্য্যন্ত। যে সময়টা তাঁর কেটেছিল ভারতবর্ষে। ঘটনা হুবহু মিলে যাক্ আর না যাক্। প্রকারান্তরে খবরটা জেরুজিলাম পর্য্যন্ত আসা বিচিত্র নয়। মোদ্দা কথা এই যে, যীশুর কার্য্যকলাপ এবং উপদেশ ভারতীয় বেদান্ত দর্শনেরই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। বাইবেলে আছে, "প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে"—কিন্তু তার কোনও হেতুবাদ তাতে দেওয়া নাই। মহাত্মা হার্ব্বাট স্পেন্সার বলেছিলেন, ছেলেকে যখন শুধু বলি, এটা করো, কি এটা করো না, তখন আমি তার বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন উন্নততর প্রকৃতিকে শিকল দিয়ে বাঁধি। কেবল হুকুমের জোরে যখন আমরা ছেলেকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নিতে চাই, তখন তার মনকেও আমরা বেড়াজালে বন্দী করি। ছেলেকে যা করাতে চাও, তা সে আপন জোরে করতে চাইবে। কিন্তু যখনি বলবে, "ওটা কর্" বা "ওটা করিস্ না", তখনি তার মনকে তুমি খোঁড়া করলে। একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হল, "খোকা, তোমার নাম কি?" খোকা বললে, "তা তো জানি না, তবে মা আমায় ডাকেন, আ-রে ও-ক-রি-স্-নে।" যখনই বলছ, তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে, তখনি আমায় তুমি তার হেতুও বুঝিয়ে দেবে। আমি আমার প্রতিবেশীকে ভাল বাসবো কি করে, যখন দেখি ওই বুলির প্রচারক পাদ্রীর দল হিন্দুকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে? এমন অবস্থায় আমরা কি করে প্রতিবেশীকে ভালবাসি? এই সব জুলুমের হুকুম জগতে যথেষ্ট প্রচার হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও জগৎ যেখানে ছিল, ঠিক সেইখানেই আছে। কনফুসিয়াস্, জারাথুস্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ সবাই সত্য প্রচার করেছেন, কিন্তু তবুও ধরণী তেমনি পাপপঙ্কিলই আছে। জগতের সুখ এক কণিকাও বেড়েছে কি? কেউ কেউ বলেন, জগৎটা যেন একটা কুকুরের লেজ। একটা বাঁশের চোঙায় কুকুরের লেজটাকে বারো বছর পূরে রাখ, কিন্তু চোঙাটা খুলবামাত্রই যেই বাঁকা, সেই বাঁকা! উপমাটা জগতের সম্বন্ধেও খাটে। জগৎটাকে সোজা করবার দরুণ যতই টানা হাঁচড়া কর না কেন, ছেড়ে দেবামাত্রই আবার সে ফিরে যাবে সেই আদিম যুগে।

আবার একটা গল্প মনে পড়্‌ল কিন্তু। এক নকল-স্বামিজীর কাছে একটা লোক গিয়েছিল একটা মেয়েকে বশ করবার উপায় জান্‌তে। নকল বাবা বল্‌লেন, "একটা মন্ত্র তোমায় বলে দেব—জপ কর্‌তে হবে। জপতে জপতে মেয়েটীর মন তোমার দিকে ঝুঁকে পড়বে। কিন্তু খবরদার, মন্ত্রজপের সময় যেন বাঁদরের চিন্তা তোমার মনে না আসে।" লোকটা যথাসাধ্য জপ সুরু কর্‌ল বটে, কিন্তু বেচারীর এমনি কপালপোড়া যে ওই বাঁদর আর তার সঙ্গ ছাড়ে না। লোকটা নকল বাবার কাছে ফিরে এসে বল্‌ল, "বাবা, তুমি যদি বাঁদরের কথা ভাবতে আমায় বারণ না করতে তো সারা জন্মেও ও পোড়ার মুখ আমার মনে আসৃত না।" তাই বলছি ভাই, ওই সব "কুর্য্যাৎ" আর "ন কুর্য্যাৎ"এর যে এত ছড়াছড়ি, ও সব কিছু ভগবানের আদেশ নয়। দেখ না কেন, গরু ঘোড়া,

বাঘ-ভালুকেও যে পশু হয়েও মানুষের চেয়েও পবিত্র জীবন যাপন করে। যাকে তোমরা বল "পাশব" প্রবৃত্তি, তা দমন কর্‌বার দরুণ তাদের তো বিধি-নিষেধের বাণী নাই।

যখনি বলা হল, "প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাস্‌বে" তখনি কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে গেল। কারু হুকুম শুনে কেউ কিছু কর্‌বে না। প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাস্‌ব কেন? বেদান্তদর্শনে নয়টা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে অতি চমৎকারভাবে অতি আশ্চর্য্য রূপে এই সত্যটী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যাঁরা প্রাচীন বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা জানেন, "মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা"; অতএব আমার প্রতিবেশী আমারই স্বরূপ। যখন জানি, আমার প্রতিবেশী আমারই স্বরূপ, তখন তাকে কাজে কাজেই আমার মতই ভালবাসি। কথাটা এখানে বাইবেলের চেয়েও পরিষ্কার করে লেখা। আমাদের মনস্তত্ত্বর আইন জানা দরকার, মানব মনের গতি বিধি এমনিতরই বটে। ছোট ছেলেকে আগুন ছুঁতে বারণ কর তো সে তা ছোঁবেই। কিন্তু ছেলেকে যদি বল, আগুন ছুঁলে হাত পুড়ে যাবে, তাহলে সে নিজের গরজেই আর আগুন ছোঁবে না। তাই খালি খালি বলো না —"ওরে, আগুন ছুঁস্‌নে।" যখনি তুমি বল, প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবেসো অমনি আমিও বলি, বাস্‌বো না তো! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যখন বল, প্রতিবেশীও যে তোমারই স্বরূপ, তখন আর তার প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার না করে পারি না।

ইউরোপে যে আধ্যাত্মিকতার বিপুল প্রবাহ বইছে, তার গঙ্গোত্রী কোথায়, তা তোমাদের বল্‌লাম। এখন আরও একটু এগিয়ে দুটো কথা বলি।

সাধুশাস্ত্রের ভিতর দিয়ে এই সব মহাবাণী ইউরোপে প্রচার হয়েছিল বটে, কিন্তু "তমিস্রাযুগে" এ সব বাণী লুপ্ত হয়ে যায়। জগতে তখন নূতন প্রেরণার প্রয়োজন হয়। এই যে নবভাবের জাগরণ "তমিস্রাযুগ"কে হটিয়ে "মধ্যযুগ"কেও যা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তা এসেছিল কোথা থেকে? ইতিহাস যদি পড়ে থাক তো নিশ্চয়ই মান্‌বে যে রেনেশাঁসে (Renaissance) যে নবভাবের প্রেরণা জাগে, তাই তামস যুগ আর মধ্যযুগকে হটিয়ে দিয়েছিল। এই নব উদ্বোধন হয়েছিল খৃষ্টান বিধর্ম্মী গ্রীস্ আর রোমের সাহিত্যের অনুশীলন করে। ওই বিধর্ম্মী সাহিত্যেই ইউরোপের মোহ ছুটিয়ে দেয়, আর সে সাহিত্যের মূল হচ্ছে ভারতে। জগৎকে কলুষমুক্ত কর্‌বার নবীন প্রেরণা এমনি করে এসেছিল—ভারত থেকেই। তারপর বর্ত্তমান জগতের চিন্তাধারার অনুবর্ত্তন করে দেখা যাক্।

আচ্ছা, বাছনি, বল দেখি, আমেরিকার নব ভাবটি কি? এই যে "ক্রীশ্চান বিজ্ঞান", "থিয়সফি," "অধ্যাত্মবাদ" এগুলো কি? স্থূলেই হউক বা সূক্ষ্মেই হউক, যে সব হিন্দুসাধুরা এদেশে এসেছিলেন, তাঁরাই এ সব প্রচার করে থাকুন, কি পরোক্ষ ভাবে সোপেনহাউরের লেখা থেকেই এ আসুক, কি আমেরিকার নব ভাবোদয় হতে সরাসরি এ সব দেশময় ছড়িয়ে পড়ুক, যাই হোক্ না কেন, জিনিষটা আসলে এসেছে ভারতবর্ষ থেকে। রাষ্ট্রজগতে মৌলিক গণতন্ত্র বা সমাজবাদ (Socialism) বলে যে নূতন ভাবের রোশনাই নিয়ে তোমরা এত হৈ চৈ করছ, আমি প্রমাণ কর্‌তে পারি যে এও ভারতবর্ষের আমদানী। সমাজ আর বেদান্ত নিয়ে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছি, আর "জাতির অভ্যুদয় ও পতন" নিয়েও একখানা বই লিখেছি। এই সমস্ত লেখায় এমন আমি যা বল্‌ছি তা প্রমাণপ্রয়োগসহকারে বিবৃত করেছি।

আমেরিকার এই নব বোধোদয়ের প্রবক্তা হলেন "এমার্সন" (Emerson)। এমার্সন সত্য প্রচার করেছেন, আধ্যাত্মিকতা প্রচার করেছেন, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা নিয়ে তিনি ব্যবসাদারী করেননি।

তিনি সত্যকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। এমার্সনের আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন, হেন্‌রি ডি থরো (Henry D. Thorean)। এমার্সনের চেয়েও তাঁর মৌলিকতা বেশী। এমার্সনের আর একজন চেতয়িতা হচ্ছেন কার্লাইল। কার্লাইল, এমার্সন, থরো, হুইট্‌ম্যান—এরা সব এই নবভাবের প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে? নানা জায়গা থেকেই তাঁরা পেয়েছেন বটে। কাণ্ট আর শোপেনহাউরের মত লোকের লেখা বেরুলো কোথা থেকে? আর কোথা থেকেও নয়, সরাসরি বেদান্তানুশীলন থেকে। আমি প্রমাণ করতে পারি, জগতে কার্লাইল আর রাস্কিন্ (Ruskin) এই যে নবধারার প্রবর্ত্তন করেছেন, এর মূল রয়েছে কাণ্ট, শোপেন্‌হাউর্ আর ফিক্‌টের (Fichte) লেখায়; আবার এও প্রমাণ করা যে এ দেশে এই সব ভাব ভারতবর্ষেরই আমদানী, কারণ কাণ্ট, শোপেনহাউর, ফিক্‌টে এবং স্বেডেনবর্গের (Swedenborg) লেখাও কতকটা সরাসরি হিন্দুদর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত। শোপেনহাউর তাঁর The world is Will & Idea নামক বইয়ে বল্‌ছেন "জগতে এমন কোনও ধর্ম্ম বা দর্শন নাই, যা বেদান্তের মত মহিমান্বিত বলে গণ্য হতে পারে। এই বেদান্ত জীবনে আমার সান্ত্বনা ছিল, মরণেও এ আমার শান্তি দেবে।" বেদান্ত দর্শনকে এর বাড়া আর কেউ কিছু বল্‌তে পেরেছে? শোপেনহাউরের লেখাতেও বেদান্ত দর্শনের অনেকে উল্লেখ ও ইঙ্গিত আছে। দর্শনের ইতিবৃত্তলেখক ফরাসী পণ্ডিত ভিক্টর কুজাঁ (Victor Cousin) বল্‌ছেন "ঈশ্বরের সত্য-স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুরা যে অভিজ্ঞ, সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তাদের দর্শন তাদের চিন্তা এমন মহত্ত্বময়, এমনি উন্নত, এমনি সূক্ষ্ম যে ইউরোপীয়দের লেখার সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয়, এ যেন মধ্যাহ্ন-তপনের পূর্ণ ভাস্বর দীপ্তির সম্মুখে প্রমিথিউসের স্বর্গ হতে চুরী করে আনা আগুনের মৃতকল্প শিখাটী।"

আর এক জায়গায় তিনি বলছেন, প্রাচ্যের দর্শন ও কাব্যের মহাকীর্ত্তিসমূহ যখন প্রণিধানসহকারে অধ্যয়ন করি বিশেষতঃ ইউরোপখণ্ডে নবপ্রচারিত ভারতীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করি, তখন তার মাঝে এমনি গম্ভীর ও বিরাট সত্যসমূহের পরিচয় লাভ করি, যা ধারণা করতে গিয়েও ইউরোপের প্রতিভা স্তম্ভিত হয়ে নিজের দৈন্যকে মাত্র প্রকট করে। প্রাচ্যের এই দর্শনবিজ্ঞানের সম্মুখে নতজানু আপনা হতেই আমাদের হতে হয়, আর বিশ্বমানবের এই সূতিকাগৃহে পাই জগতের শ্রেষ্ঠ দর্শনের আদি প্রস্রবণ।" হেগেল বলেন, হিন্দুজাতির চিন্তার সঙ্গে তুলনা করলে ইউরোপীয়দের মহোর্দ্ধ চিন্তাও যেন মনে হয় অতিকায় দৈত্যের সম্মুখে খর্ব্বাকৃতি এক বামন!" "ভারতের ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন" নামে তাঁর নামে একখানা বইয়ে তিনি লিখেছেন, "প্রাচীন ভারতবাসীরা যে ঈশ্বরের পরমার্থজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তাদের সকল লেখাতেই এমনি মহান্ উদাত্ত, প্রাঞ্জল একটা ভাব রয়েছে যে মানুষ ভগবানের কথা বলতে গিয়ে এমনি মর্ম্মস্পর্শী কল্পনা আর শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিব্যক্তির পরিচয় বোধ হয় আর কোথায়ও দিতে পারেনি।" বিশেষ করে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে তিনি বলছেন, মানুষ যে মূলে ভাগবত, এ কথা পুনঃ পুনঃ তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, যাতে জগতের সঙ্গে অবিশ্রাম দ্বন্দ্বে সে নব প্রচেষ্টায় নূতন প্রাণশক্তিতে আরও বলীয়ান্ হয়ে ওঠে—তার সমস্ত কর্ম্ম ও চেষ্টার লক্ষ্য যে স্বরূপে পুনর্লীন হওয়া এই কথাই যেন তার অন্তরে চির-জাগরূক থাকে। ম্যাক্‌সমুলার বলছেন, "শোপেন্‌হাউরের মত মহাপ্রাজ্ঞ দার্শনিকের উক্তির যদি সমর্থন প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি আজীবন

যে জগতের সমস্ত ধর্ম্ম ও দর্শন একান্ত মনে অনুশীলন করেছি, সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে অতি নম্রভাবে তাঁর সমর্থন করছি।" ম্যাক্‌স্‌মুলার আরও বলছেন, "দর্শন ও ধর্ম্মের অর্থ যদি হয় পরকালের জন্য একটা প্রস্তুতি—আনন্দময় একটা জীবন আর আনন্দময় একটা মরণ, তাহলে বেদান্তের চেয়ে শ্রেয়স্কর প্রস্তুতি যে কি হতে পারে, তা আমার ধারণার অতীত।" আবারও তিনি বলছেন, "শোপেনহাউর বেদান্ত সম্বন্ধে যে উচ্ছ্বসিত অভিমত প্রকাশ করছেন, তার অনুমোদনে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা বা ভয় নাই। জীবনভরা সংসারপথে চলতে বেদান্ত আমায় যা দিয়েছে, তার দরুণ এর কাছে আমি চিরঋণী।" সার এডুইন্ আর্ণল্ডের (Sir Edwin Arnold) India Rivisited, Song celestial, Light of Asia, Song of Songs প্রভৃতি বইয়ে এ সম্বন্ধে অনেক খবরই পাবে। আমি তোমাদের এসব বই পড়তে বলছি। যারা তাঁর Walden & Lettersএ বেদান্তশাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন ; তাঁর Excursionএ ভারতীয় সাহিত্যের কথা আছে। আমেরিকার এই নব বোধোদয়ের মূল হচ্ছেন থরো ; আর তিনি নিজেই স্বীকার করছেন, তাঁর সমস্ত প্রেরণা হিন্দুর কাছ থেকে পাওয়া। ইমার্সন ইংলণ্ডে প্রবাস করার পর আমেরিকায় ফিরে আসবার সময় কার্লাইল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত এসেছিলেন। কার্লাইল তাঁকে এডুইন্' জোন্‌সের ভগবদ্গীতার একখানা প্রাচীন অনুবাদ উপহার দিয়েছিলেন। কাণ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই গীতা লাটীন, ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষায় অনুবাদ হয়ে গিয়েছিল। কাণ্ট ইউরোপের দার্শনিক চিন্তার পুনরভ্যুদয় ঘটান ; দেশ, কাল ও নিমিত্তের চেতন স্বরূপ (a priori charactor) হচ্ছে তাঁর দর্শনের মূল ভিত্তি ; এর দরুণ তিনি ভারতবর্ষের কাছে ঋণী।

মিসেস্ এড্ডির (Mrs Eddy) বইএর প্রথম সংস্করণে ভগবদ্গীতা হতে অনেক উদ্ধরণ দেওয়া ছিল পরের সংস্করণে সেগুলো বাদ দেওয়া ছিল। ভগবানের বাণীই যদি হয় তো তা প্রাঞ্জল, স্ফুট ও উদারার্থ হবে।

আমি এমন কথা বল্‌ছি না এখানকার লোক সব নকলনবীশ বা সাহিত্য-তস্কর! আমি এই কথাই বল্‌ছি যে আমেরিকার লোকেরা এই সব সত্য নিজে নিজে আবিষ্কার করাও যা, ভারতবর্ষের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া তা। জগতে নূতন কিছুই নয়।

খাঁটী সমাজবাদ (Socialism) হিমালয়বাসী স্বামীদের মাঝে এখনও জীবন্ত হয়ে আছে। ইংলণ্ডের এডোয়ার্ড কার্পেণ্টার তাঁর সমাজবাদ পেয়েছিলেন হিন্দুর কাছে। তাই বল্‌ছিলাম, তোমাদের যত নব-চিন্তার ধারা, সব হিন্দুর প্রাচীন চিন্তারই অভিব্যক্তি। ঠিক মাঝখানটীতে যেতে হলে, নিখিল সত্যের কেন্দ্রে পৌছাতে হলে, একটু রয়ে সয়ে ভারতবর্ষ হতে আরও জ্ঞান আহরণ কর্‌তে হবে। যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি কত আশ্চর্য্য বই আছে, যা এখন পর্য্যন্ত তোমাদের ভাষায় অনুবাদ হয় ন ; আমেরিকার সমস্ত নূতন চিন্তা তার মাঝে পোরা। যোগবাশিষ্ঠ যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি ব্যাপক, যুক্তিপূর্ণ; আর বাস্তবিক ওখানা কাব্যই বটে। এমনি করে আমাদের গণিতের বই রচনা করা হয়েছে ; তাইতে গণিত ছেলেদের কাছে একটা বিভীষিকা না হয়ে আমোদ হয়ে ওঠে।

এ জগতে কাজ করবে আনন্দে! একটা বাগানের কথা মনে পড়ে গেল ; কুলী বেচারীরা তার রাস্তার খোয়া ভাঙছে। তাদের হৃদয় ভার, সারাদিন তাদের খাটুনী। বাগানের ঘাসে ঢাকা সবুজ অঙ্গনে রাজকুমারেরা টেনিস্ খেল্‌ছে। রাজকুমারদের কাজটা হচ্ছে আনন্দের ; কুলীদের চেয়ে হয়ত গুরুতর পরিশ্রমে তাদের গা বেয়ে ঘাম পড়ছে।

এ জগতে তামাদের খ'ণ্টা হোক্ ওঃ ক্রীড়াসক্ত রাজকুমারদের মত। তোমাদের যে কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিতে হবে, তা নয়; কিন্তু কাজের প্রতি তোমাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন করতে হবে; কাজ হবে সব সময়েই তোমাদের কাছে আমোদ। এই এক রকমের আনন্দ,—তোমার ব্রহ্মকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত থেকে কর্ম্ম করা। ব্রহ্মচেতনার উচ্চ শাখায় অধিষ্ঠিত আছ যখন, তখন তোমার অন্তর হতে স্বর্গীয় সঙ্গীত ও অপরূপ কর্ম্ম-প্রেরণা আপনি উৎসারিত হয়ে পড়বে। জোর করে যা করা হয় তার কোনোদিন জোর থাকে না। যেমন নাকি সূর্য্য হতে আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে, গোলাপ হতে যেমন গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, তুষারমণ্ডিত তুঙ্গশৃঙ্গ হতে যেমন স্বচ্ছতা ঝরে পড়ে ঝরণা আর নদী বয়ে যায়; তেমনি তোমার ভিতর হতে উৎসারিত হোক—আনন্দ, প্রেম, জ্যোতিঃ—হে, জ্যোতির জ্যোতিঃ।—ওঁ শান্তিঃ—ওঁ—ওঁ—ওঁ!*

*আমেরিকা, জুলাই ২৯, ১৮৯৪ সন।

বেদনা

ওগো বঁধু,
সকল লজ্জা বুঝি আমার পড়ল এবার ধরা—
জানলে তুমি কি আছে মোর ক্ষুদ্র এ বুক ভরা!
জানত সবে সরোবরে কমল ফুটেই রয়—
তারই নীচে পাঁক রয়েছে তাও কি মনে হয়?
নিশীথ রাতের আকাশ-বুকে তারার মালা ঐ,
দিনভরা যে ঝড় বয়েছে চিহ্ন তাহার কই?
আমার মুখের হাসিটুকুই সবাই শুধু চায়—
কান্না যে তায় অনেকখানি কেউ কি দেখে হায়?
কুণ্ঠা আমার, দুঃখ আমার, আমার যত কু—
তোমার কোলেই পায় সে শোভা, তোমার কাছেই সু!
রইল না তাই গোপন বুঝি তোমার কাছে আর—
লজ্জা যাহার আপনি নিলে দৈন্য কোথায় তার!
তুমি বিনে নাই যে বঁধু হেথায় আমার কেউ—
সকল লজ্জা নামিয়ে এনে বহায় প্রেমের ঢেউ!

নেশার ঝোঁক

আজ কেবল বারবার সেই উন্মত্ত মধুকরগুলোর কথাই মনে জাগ্‌ছে। বসন্তের সাড়া পেয়ে কত দূরদূরান্তর হতে তারা প্রলুব্ধ হয়ে এসেছে—আর মাধবী পুষ্পের মধু পান করে বেভুলা হয়ে লতাকুঞ্জের নীচেই পড়ে আছে। নেশা যখন ছুটবে, তখন আবার গিয়ে বস্‌বে সেই পুষ্পের মাঝে। এমনি করে দিন-রাত গৃহ ছেড়ে কত মধুকর গাছের তলায়ই পড়ে আছে। এদের অবস্থা দেখে, এ কথাটাই মনে জাগ্‌ছিল—এই য নেশার আমেজ নিয়ে অলসভাবে দিনগুলো কাটিয়ে দচ্ছে এরা—এতেই কি চরম সুখ, না এ ছাড়াও কিছু আছে? কেন জানি, বল্‌তে পারি না, এ ঋতুরই এমন একটা মোহিনী-শক্তি আছে—সচেতন মানুষও অচেতন হয়ে পড়ে এ সময়; আর পশু পক্ষী ইতর প্রাণীর তো কথাই নেই। মদের নেশায় বিভোর হয়ে থাকে যারা, তারা তো নেশার কবল থেকেই রেহাই পায় না—মদ যে কি জিনিষ, তা আর জান্‌বে কোন্ সময়? তাই বল্‌ছি, প্রথমেই যদি নেশায় অভিভূত হয়ে পড়ি—সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌বে কে? বসন্তের ছোঁয়াচ পেয়ে ধরণী বিচিত্র বর্ণে, গন্ধে সজ্জিত হয়ে উঠেছে এ সব দেখবার মত অক্লান্ত দৃষ্টি-শক্তি চাই। কিছুক্ষণ দেখেই যদি ভাবের নেশায় আঁখি ঢুলুঢুলু কর্‌তে থাকে—তবে যে তুমি নিতান্ত ভাগ্য-হীন। তাই প্রথমেই ঋতুরাজকে নিবেদন কর্‌ছি—তিনি যেন আমাদের নেশার প্রবল ঝোঁককে অতিক্রম করে যাবার দরুণ সকল সময় চেতনা প্রদীপ্ত রাখেন।

আমরা সৌন্দর্য্য দেখব, অলস হয়ে ঘুমোব না—এই আমাদের পণ। জেগে থকব, এই জন্য সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে পরেও চৈতন্যময় কর্তৃত্বকে অনুভব কর্‌তে পারি। স্বেচ্ছায় যদি আজ হৃদি শতদলের সমস্ত পরতগুলো খুলে না দিই, তবে আজ আমাদের অনেক দিক দিয়ে ক্ষতি—সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাতা যিনি, তিনি আমাদের মত্ততা দেখে ফিরে যাবেন। এবার যদি ফিরে যান তবে আর আশা নেই, কেননা এই সৌন্দর্য্যের সাধনা আমার একলার নয়। তাঁর আগমনের অগ্রদূতের মিষ্টি প্রলোভনের ভাষাতেই যদি বদ্ধ হয়ে পড়ি, দুদিন পরে যে চিত্তে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হবে—তখন তো এমন মনের মানুষও কাছে পাব না, যার কাছে দুটো কথা বলে অব্যক্ত ব্যথার লাঘব হবে। তিনি রয়েছেন সবের পেছনে, সকলকে অতিক্রম করে; তাই তুষ্টির চেয়ে উদ্বেগই হবে আমাদের বেশী। সমস্ত লোলুপতার উপকরণ পেয়েও, উপবাসী হয়ে যদি তাঁর কাছে হাজির হতে পারি, তখন যে আনন্দরসে সঞ্জীবিত করে দেবেন আমায়, এই আমার শ্রেয়ঃ। তাহলে পাখীর কাকলি, মধুকরের গুঞ্জন, বিরহ জাগিয়ে দেবার বসন্তের অগ্রদূতের সুমিষ্ট কুহুরবেই অচৈতন্য হয়ে পড়লে চল্‌বে না! যিনি সবার ভিতর আনন্দ সঞ্চার করে জগৎকে মাতিয়ে তুলেছেন—উন্মুখ হয়ে থাক্‌বে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিয়োজিত কর্‌বে তাঁরই ধ্যানে, তাঁরই চিন্তায়।

জীবনের আনন্দলীলা যিনি কর্‌ছেন, তিনি যে অন্তরেই প্রচ্ছন্ন, আর সব তো বহিরঙ্গমাত্র! আজ যা দেখ্‌ছি কিম্বা শুনছি, এই যদি চরম হয়—তবে কি এই মত্ততা, আর প্রলোভনই সত্য? তবে আর লোকে বলে কেন—অতীন্দ্রিয় বলেও একটা ইন্দ্রিয় আছে? যা দেখা যায় না, তা দিয়ে তাই দেখা যায়। সত্যই যদি সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধিতে পেতে হয়, তবে যে অতীন্দ্রিয়কে উদগ্র ব্যাকুলতায় ফুটিয়ে তুলতে হবে—তাহলেই আড়ম্বরকে প্রত্যাখ্যান কর-বার মত হৃদয়ে শক্তি থাকা চাই। নাই বা মিলুক আনন্দ, তবু এই ব্যভিচারী আনন্দের উন্মত্ততায় আর প্রলুব্ধ হতে চাই না। কাব্যোদ্যানে

ভ্রমণ করে ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়ার চেয়ে, সত্যলাভের দরুণ শূন্য কঠোর জীবনও শ্রেয়ঃ। আমার আমিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে, মধুরস পানে মত্ত মধুকরের জীবনই কি আমাদের বাঞ্ছনীয়? পুরুষ যাঁরা, প্রকৃতির হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করে তাঁরা কি স্বস্তি পান? প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত হয়ে সাংখ্যের পুরুষ কি জীবনে কিছু পাননি? আর তিনি যে তত্ত্বের অনুসন্ধান পেয়েছেন—বাইরের রূপ যে তারই অধীন, সেই তত্ত্বের উপাদানেই তার রূপগঠন। সব বুঝে শুনেও যে আবিষ্ট হয়ে থাকা—এটা একটা রহস্য নয় কি?

তোমার জীবনের লক্ষ্য যদি সেই অন্তরতমই হয়ে থাকেন, তবে তাঁকে দিয়েই বুঝ না—তিনি কেমন করে এত সৌন্দর্য্যের মাঝেও অটল হয়ে রয়েছেন। তিনি যদি অভিভূত হয়ে পড়তেন, নব নব প্রেরণার উৎস তোমাদের মাঝে জাগত কোথা থেকে? তোমাদের জীবন তো ক্ষুদ্র নদী—সাগরের অবারিত যোগসূত্র রয়েছে বলেই তোমাদের অস্তিত্ব—তা না হলে কবেই যে মিলিয়ে যেতে!

সময়ে সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের একটা বিকাশ হয় বটে—কিন্তু তাকে বিচার দিয়ে বুঝতে হয়। যতই তলিয়ে বিচার করতে থাকবে ততই উপনিষদের এ বাণীর সত্যতা উপলব্ধি হবে—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ?
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃশ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি?

এই যে আকর্ষণ, আর বিষয়ের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি, এর মূল কোথায়? মন কার ইচ্ছায় প্রেষিত হয়ে স্ববিষয়ে গমন করছে? কোন্ দেবতা এই চক্ষু-কর্ণকে স্ব স্ব কার্য্যাভিমুখী করে দিচ্ছে? শ্রেষ্ঠ প্রাণই বা কার নিয়োগে গমনাগমন করছে? এ সব চিন্তালহরী যদি চিত্তে খেলতে থাকে, তাহলে কি এত অনর্থের সৃষ্টি হয়? এই "কেন" প্রশ্নটী যার মনে জাগবে, তার কি আর কোকিলের ডাকই চরম মনে হবে? সে চাইবে, এ সুমিষ্টস্বরের উদ্ভব-স্থান কোথায় তাকে দেখতে। ভগবানের সৃষ্টি-ক্রিয়া তখনই সার্থক হবে, যখন সৃষ্টি দেখেই স্রষ্টার কথা আপনি মনে জাগবে। আকাশ-বাতাস আজ দিব্য গন্ধে পরিপূরিত, মরা মরা গাছগুলি নিজে তো কষ্ট পেতই, আমাদের পর্য্যন্ত তাদের জীর্ণতায় আর পত্রহীন শূন্য দৃষ্টিতে আঘাত দিত; আজ দেখি তাদের ভিতরেও প্রাণের সঞ্চার হয়েছে, কত চেষ্টাই যেন করছে, কচি কুঁড়ি পাতাগুলি তাদের অন্তরের আনন্দকে অভিব্যক্ত করছে। রূপ আর রূপীর মাঝে যদি একটা ঐক্য করে নিতে পারি অর্থাৎ একের দর্শনে যদি অপরকে বিস্মৃত না হই, তবেই বুঝব, ঋতুরাজ বসন্তের সত্য অনুভূতি পেয়েছি জীবনে। মত্ততার তো ভাল-মন্দ জ্ঞান থাকে না, তারা নিজেই অন্ধ, অপরকে পথ দেখাবে কি? পরন্তু যারা চেতন, তারা যে দীনদুঃখীকেও ভরসার বাণী শুনাতে পারে। তাদের শক্তিই চারিদিকে সংক্রামিত হতে থাকে—তারা তো আর মধু পোকা নয় যে নিজের ভাবেই আবিষ্ট থাকবে!

আর কারও কথা বলছি না, অন্ততঃ সত্যান্বেষী যারা—তাদের যেন ভাবুকতার চেয়ে তত্ত্বের দিকেই মন আকৃষ্ট হয় বেশী। কঠোর অগ্নিপরীক্ষার পর ভক্তহৃদয়ে যে আবেগের বাণী আসে—সে কাব্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ কাব্য জগতে নাই। জয়দেবের গীতি-মাল্য পড়ে কার প্রাণ না আকৃষ্ট হয়? তার মাঝে কি স্বচ্ছভাব সন্নিবেশিত! চিত্তের চমৎকৃতি যাতে জন্মায়, তাই নাকি কাব্য। 'সৌন্দর্য্য দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি, এর চেয়ে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় কি তিনি নন—যিনি সমস্ত সৌন্দর্য্যের মূল? তিনিই যে আদি কবি! সায়ণ বলেছেন—কবি ক্রান্তদর্শী—তাহলে তো আর আবিষ্ট হয়ে থাকা চলবে না। আদিকবির

মনে যে অসংখ্য Lyricএর সমাবেশ। তত্ত্ব জান্‌তে হ্‌লেই যে অচৈতন্য হয়ে পড়তে হবে, এ কথা বলেছে কে?

তাঁকে ভালবাসি বলেই তাঁর বিধানকে অবনত মস্তকে বহন করে নিয়ে চলি। ভাবে এলিয়ে পড়্‌লেই কি তিনি হবেন ভগবানের অন্তরঙ্গ? আমার তো মনে হয় নীরব-কর্ম্মীরই কদর বেশী। কবি যদি সামঞ্জস্য বিধান কর্‌তে না পারেন তবে তিনি ক্রান্তদর্শী হলেন কি করে?

ভাবে গদগদ হয়ে লুটোপুটি খেয়ে পড়ে থাকা—এ ভাবে মানুষ কয়দিন থাকৃতে পারে; নেশাই আর কয়দিন ভাল লাগে? মানুষ কি কোন একটা অবস্থাতে অবরুদ্ধ থাকৃতে পারে? আকাশের গায় মেঘ দেখলেই মূর্চ্ছা যাওয়া—ক উচ্চারণ কর্‌তে গিয়েই একেবারে অজস্র অশ্রু-বর্ষণ; এ সব ভাবের আতিশয্য—পরিপাক নয়। নেশার পরিপাক আছে—তাকেও Assimilate করা যায়, আর যার ভিতর এ শক্তির উন্মেষ হয়েছে, তিনিই সহজ মানুষ হতে পেরেছেন। কৃত্রিমতা আর কয়দিন ভাল লাগে!—উপাধির মায়াকে যদি অতিক্রম করে না উঠতে পারলাম, তবে আর কি শক্তি সঞ্চিত হয়েছে? কামকলাতত্ত্ব জান্‌বার দরুণ শঙ্করাচার্য্য এক রাজার দেহে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন—চেতনা যদি প্রবুদ্ধ না থাকৃত তবে কি আর সে বন্ধন থেকে বিনির্মুক্ত হতে পার্‌তেন? একটা আমিকে সদা-জাগ্রত রাখতে হয়। অসংযত বাসনাকেও যে নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে পারে, সেই হচ্ছে আসল "আমি"।

আজ যদি আনন্দে মেতে, সোহাগে গলে, কর্ত্তব্যের কথা ভুলে যাই, তবে বুঝব—চেতনহীন মত্ত মধুকর আমি, প্রকৃতির অনাদি কুহকিনী মায়ায় ভেসে চল্‌ছি, যখন যে অবস্থায় ফেল্‌ছে তাতেই রাজী। বসন্তে এত আনন্দের মাতামাতি, কিন্তু দেখাতে পার্‌বে কেউ কারও আপন জায়গা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে আনন্দের নেশায় ঢলে পড়েছে? প্রত্যেকে আপন মনে সৌন্দর্য্যের সাধনা করছে। সবাই আপনার মাঝে পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে পেয়ে আপন মনে হাস্‌ছে—এতে কোন কলরব নেই, আড়ম্বর নেই—নীরব নিথর সৌন্দর্য্য। এই সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে বলেই এত ভরপুর সৌন্দর্য্যের একত্রে সমাবেশ। মানি, সবার মাঝেই আকর্ষণী শক্তি আছে, কিন্তু যিনি সৃষ্টি কর্ত্তা তিনি শুধু সৃষ্টির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দূর থেকে দেখে কি কম আনন্দ অনুভব কর্‌ছেন? শুদ্ধ-সত্ত্বের বীজ কি মানুষের মাঝে নেই? অপরকে খাইয়ে যদি বড় একটা তৃপ্তি অনুভব না হত, তা হলে উপবাসী থেকে মায়ের প্রাণে এমন আনন্দের সঞ্চার হত কোথা থেকে? সমস্ত জগৎ আজ আনন্দের প্লাবনে ভেসে যাক্‌—তোমাকে কিন্তু জেগে থাকৃতেই হবে। আমার আমিত্ব লোপ পেয়ে যাবে, এর কল্পনাতেও যে শরীর শিউরে ওঠে!

নরাকার পরব্রহ্ম

——(:*:)——

স্তবস্তুতিতে পাঠ করি- "নরাকার পরব্রহ্ম" "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা" ইত্যাদি। যাঁরা আধুনিক, তাঁরা এ সমস্ত বুলি শুনলে, অনেক সময় চটে যান; চটে যাওয়ার কারণটা এই যে, এতে মানুষের মান অপরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকালকার অত্যাধুনিকেরা একটা নূতন ধুয়া তুলেছেন, humanatarianismর; তাঁরা বলছেন, সর্বত্রই মানুষের জয় গান কর, যে মানুষের কাছে ভগবানও তটস্থ। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে ওই যে উপরের বয়ান উল্লেখ করলাম, তার Idealটা নিশ্চয়ই খাটো নয়। মানুষ আর ব্রহ্ম এই দুয়ের যদি সামঞ্জস্য ঘটে, কোথায়ও তাহলে সে Idealএর কাছে আধুনিক Human atarianismও নিশ্চয়ই হার মেনে যাবে। আমাদের সবই যে আস্তিকালের নয়, আমরাও যে art উপভোগ করতে জানি, আমাদের ওই "নরাকার পরব্রহ্ম" theoryটাতেই তা সুন্দর বুঝিয়ে দেয়।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই, কেবল একটা theory পেলে তো হবে না। অনুভব চাই। তাহলে সাধনাও চাই। আর তা চাইতে গেলে সাধনার একটা ক্রমও চাই। নরাকার আর পরব্রহ্ম এ শুধু আমাদের কাছে একটা বিশ্বাসের গৎ হয়ে আছে। কথাটা যখন আওড়াই, তখন মনে হয়, সমন্বয়ের সত্যটা যেন এক নিমেষেই বুঝে নিয়েছি। কিন্তু তা যে বুঝি না, তা জানতে পারি যখন ওই ধারণাটা নিয়ে ব্যবহারিক জগতে নেমে আসি। তখন দেখি, মানুষে আর ব্রহ্মে মহা বিরোধ লেগে গিয়েছে!

নরাকার আর পরব্রহ্ম, এই দুটোকে যুগপৎ সম্বন্ধ অনুভব করবার আগে পৃথক পৃথক অনুভব করতেই হবে। জীবনে অনেক ভাবনা-চিন্তার ঘূর্ণিতে হাবুডুবু খেয়ে বুঝেছি, যদিও সংশ্লেষণটাই চরম সত্য, তথাপি গোড়া হতে বিশ্লেষণ করে না চলে আমাদের উপায় নাই। বুদ্ধিটা হল বিশ্লেষণের যন্ত্র; ওটাকে অতিক্রম ক'তে হলে ওর দেনা শোধ করে তো যেতে হবে। তাই যা আমার আদর্শ, সংশ্লেষণ দিয়ে তা বুঝে রাখলেও চলতে হবে বিশ্লেষণের পথেই। যেমন স্রোতস্বতী নদী পার হওয়ার মত। সোজা ওপারে ওঠা যদি লক্ষ্য হয় তো একটু উজিয়ে যেতে হয়, তাহলেই স্রোতের টানে ঠিক জায়গায় নিয়ে পৌছিয়ে দেয়। বিশ্লেষণ পথে চলব, প্রাণের দুয়ার খোলা রেখে। সংশ্লেষণের অন্তঃস্রোত সামঞ্জস্যের দিকেই টেনে নেবে।

তাই যদি হয় তো মানুষ আর ব্রহ্ম এই দুয়ের মাঝে গুরুকে কোনটা দিয়ে আগে বুঝব? আমি বলি, তাঁর ব্রহ্মভাবই আগে বুঝব! শুধু বোঝা-বুঝি নয়; গুরুকে বোঝা মানেই গুরু হওয়া। শিষ্যের উদ্বোধনে গুরুরই সাধনজীবনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাই গুরু যেমন প্রথমতঃ মানুষ ছিলেন, তারপর ব্রহ্ম হলেন, তারপর আবার ফিরে মানুষ হলেন, আমাদেরও তাঁকে ঠিক সেই ভাবেই বুঝতে হবে। হাজার চেষ্টা করি না কেন, প্রথম দর্শনে আমরা গুরুকে মানুষ বলেই জানি। (যারা অস্পষ্ট ভাবে এবং অস্ফুট ভাষায় গুরুকে নানা কথা বলে খুব বাড়িয়ে জেনেছে বলে মনে করে, তাদের কথা আমি বলছি না; গুরুর সঙ্গে সামরস্য অনুভব করবার অন্তরঙ্গা প্রেরণা যাদের মাঝে আছে, তাদের গুরুদর্শনের কথাই এখানে বলছি।) সে মানুষ আবার আমার মতই সাধারণ মানুষ—তেমনি হর্ষ-শোক, সুখ দুঃখ দ্বারা আন্দোলিত।

কিন্তু বুদ্ধির বিশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ভাব নিশ্চয়ই বদ্‌লে যাবে। তখনই সঙ্কট। গুরুকে মানুষ ভাবতে গেলে দেখি, তাঁর মহিমা খর্ব্ব হয়; অথচ মানুষের বেশী ভাবতে গেলে তাঁর ব্যক্তিত্ব থাকে না, তাতেও প্রাণে ব্যথা পাই। গুরু ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত, এই হল তাঁর তত্ত্ব। দুটো ভাব এক সঙ্গে ধারণা কর্‌তে পার্‌ব না; তাই দ্বিধান্দোলিত না হয়ে তাঁকে অব্যক্ত ভাবাই উচিত। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ; সদ্‌গুরুই জগদ্‌গুরু—আমার গুরুও তাই; আপাতদৃষ্ট ব্যক্তিত্ব নিত্যেরই লীলাবিভূতি, এই ভাবটাই আগে ধর্‌তে হবে। অব্যক্তে প্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌লে প্রেমের টানে ব্যক্তি আপনিই আস্‌বে, তখন অব্যক্ত আর ব্যক্ত একাধারে দেখ্‌তে পাব। জীবন তখনই পূর্ণ হবে।

আশ্চর্য্য এই, গুরুরও যে তত্ত্ব, ঠিক সেই তত্ত্ব যে মানুষেরও। মানুষের অবধি পেয়েছে কেউ? তার কতটুকু আর ব্যক্ত হয়ে ফুটে রয়েছে? ত্রিপাদই যে মানুষের অব্যক্ত; আর সেই অব্যক্তই অমৃত। মানুষ যখন মানুষকে ভালবাসে, তখন তার ব্যক্ত স্বরূপকে উপলক্ষ্য রেখে অব্যক্তেরই উপাসনা করে। তাই যে ভালবাসে, সে বুঝিয়ে দিতে পারে না, কেন কাকে সে ভালবাস্‌ছে। কিন্তু এটুকু সত্য যে, যাকে ভালবাস্‌ছি, তার যতটুকু দশের চোখে ধরা পড়েছে, ততটুকু নিয়ে আমার প্রেম নয়; আমার প্রেম লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রাণের মানুষের গোপন রহস্যটী আবিষ্কার করে সার্থক হয়েছে।

এই ভাব ভগবানেও। তাঁরও ব্যক্ত মহিমার চেয়ে অব্যক্ত মহিমার প্রতি আমার আকর্ষণ বেশী। অথচ আমার ভাবনার বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও রূপ বদলাচ্ছে। প্রথমতঃ ভগবান্‌কে ভেবেছি, মানুষের মত। সে মানুষ আপ্যায়নে তুষ্ট, অমর্য্যাদায় রুষ্ট; আমার প্রাণের অপূর্ণ আশার পরিপূর্ণতার প্রতীক্ সে মানুষ। তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কাজ আদায় করা যায়, ঘুষ দেওয়া চলে—এমনিতর আরও কত কি! এই তো মানুষের গড়া আদি ভগবান্। তারপর সে ভগবানেরও বিবর্ত্তন হয়; মানুষ অনুভব করে অন্তরের মাঝে অব্যক্তের প্রেরণা। যেখানে কিছুই নেই, সেখানেই সব কিছু দেখতে অভ্যস্ত হয়। এমনি করে আঁধারে, শূন্যতায়, মরণেও সে পায় একটা পরমাশ্রয়। এই তার ব্যক্তিত্ববোধবর্জ্জিত ভগবান্। এই ভগবানের কত জাঁক, কত তাঁর দার্শনিক দেহরক্ষীর পাহারা। যুক্তির সঙ্গীন বুদ্ধির শানে তীক্ষ্ণ করে মানুষ হয়ে তাঁকে আগ্‌লে আছে, কোথায়ও ব্যক্তিত্বের একটু উদ্দেশ পাচ্ছে তো মার মার করে গিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হচ্ছে। কিন্তু এখানেই যে ভগবানের বিবর্ত্তনের শেষ হয় না, সে খবর নিয়ে আসেন রসিক, প্রেমিক, ভাবুক, কবি। তাই আবার ভগবান্‌কে মানুষ বানিয়ে, মানুষের মাঝে ভগবান্‌কে দেখে আমাদের অন্তরের রস-বুভুক্ষার চরম তৃপ্তি ঘটে।

আবার আরও আশ্চর্য্য এই যে, এই বিবর্ত্তনের মূলে আমারই চিতের পরিণাম। বস্তু যা, তা তো বস্তুই থেকে যাচ্ছে; বদলাচ্ছে শুধু আমার দেখবার ধারাটা! তাই মানুষকে যদি প্রাণিতত্ত্বের বিচারে বানরের সগোত্র ভাবি তো সে লাভ আমারই; আবার ব্রহ্মতত্ত্বের বিচারে যদি তাকে শুদ্ধ-শান্ত-বিভু-রূপে জানি তো সে ক্ষতিও আমার। আমিই এক বার জন্তু, আর একবার মানুষ, আর একবার ব্রহ্ম; আবার ঘুরে ফিরে সেই মানুষ। আমি যাকে দেখছি, যাকে ভাবছি, তার বিবর্ত্তনও আমারই এই দৃক্-ভঙ্গীরই অনুবর্ত্তন করবে না কি?

পথের কথা

——:*:——

আমরা প্রতিদিন স্বভাববশে যে কার্য্য করি, তার মাঝে কোনও বিশেষ চেষ্টা থাকে না—করতে হয় করছি, উঠ্‌তে হয় উঠ্‌ছি, বসতে হয় বস্‌ছি, অনেকটা এই রকমের যন্ত্রচালিতের মত করে যাই। মনের এই অবচেতনার মাঝ দিয়ে যে কাজগুলি করে যাই, তার গোড়ায় বিশেষ কোন প্রেরণার স্পর্শ থাকে না বলেই ও কাজগুলি আমাদের মনকে তত সজাগ করে দেয় না। এই যে ঘুমিয়ে থেকে কাজ, এ অনেকটা পশুর কাজের সামিল বলে ধরা যায়। পশুরাও প্রকৃতির নিয়মে জীবন যাপন করে যায়, তার মাঝে না থাকে আত্মচেষ্টার প্রবল বেগ, না ফোটে শিল্প। বাস্তব জগতে যে তরুলতা ফলফুল দিয়ে তার মাঝে বিধাতা অন্যান্য জীবকে রেখেছেন, মানুষকেও তারি মাঝেই রেখেছেন, কিন্তু মানুষ আপন হৃদয়ের জ্ঞানকে, ভাবকে সমুজ্জ্বল করে নিয়ে তারই অনুপাতে সমস্ত জগৎকে সাজিয়ে নেয়। তার মাঝে এই বিশেষত্বটুকু রয়েছে বলেই মানুষ সমস্ত প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যেখানে এই শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন না পাওয়া যায়, পশুর মত অবচেতনা বা অভ্যাসবশে মনকে মূঢ় রেখেই তার কাজ সে করে যায়, সেখানে সে কাজ বাইরের দিকে সুসমাপ্ত হলেও অন্তরকে পূর্ণ করে কিছু দিয়ে যায় না। তাই সে কাজকে নিজের বিচারে পশুর সামিল বলে ধরে নেওয়া যায়। এই দিক থেকে আমাদের নিত্যকর্ম্মগুলি পশ্বাচার-বিধি নামে খ্যাতি হয়। কিন্তু পশুর সঙ্গে তুলনায় এই নিত্যকর্ম্মের মাঝেও কি আমাদের বিশেষত্ব নাই?

দেহের তাড়নেই হোক, বা মনের তাড়নেই হোক, মানুষ প্রত্যহ যা কিছু করে, বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করে তা করে যেতে পারলে তার মাঝেই উন্নততর আর এক জগতের রশ্মি এনে ফেল্‌তে পারে। হিন্দু-জাতি এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অতি সূক্ষ্মভাবে করেছিলেন। আর তারই ফলে দৈনিক পশ্বাচার-বিধির মাঝে পর্য্যন্ত এমন সমস্ত কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন যে তার ভিত্তিতেই যোগদর্শন গড়ে উঠেছিল। শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ের প্রতিকর্ম্মের মাঝে নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসার ফল এমনি বৃহৎ হয়!

শ্রদ্ধা আসে কেমন করে? শ্রদ্ধা অর্থে বুঝি আস্তিক্যবুদ্ধি। এই করেই আমার যা কাম্য, অন্তে গিয়ে তা পাব; আমার এই প্রচেষ্টার ফলের মাঝেই সে সিদ্ধি লুক্কায়িত—এই বলে যে গভীর বিশ্বাস, তাই শ্রদ্ধা। তবেই দেখছি গোড়ায় চাই একটা বৃহৎ লক্ষ্য। সেই আদর্শের অনুপাতে জীবন চালাতে গিয়ে জীবনের প্রত্যেকটি দিনকে, দিনের প্রত্যেকটী কর্ম্মকে হৃদয়ের সমস্তটুকু আবেগ দিয়ে অভিনন্দিত করতে হয়। যখন কোনই লক্ষ্য ছিল না, তখন সেই ভেসে চলার মাঝে হয়ত আয়েস স্বীকার করতে হত না—তাই এক রকম করে দিন চলে যেত। কিন্তু যখনই কোন উঁচু আদর্শকে লক্ষ্য করে চলতে চাই, তখনই দেখি পদে পদে বাধা, আর তাদের ঠেল্‌তে গিয়ে দরকার হয় আপ্রাণ শক্তি। তাই শাস্ত্রে বলে, "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।" শুভকার্য্যে শত বাধা।

শ্রেয়ের দিকে চলতে গিয়ে এই যে দুঃখ, তা যতই না কেন হৃদয়ভেদী হোক্, তবুও চোখের সামনে সেই জ্বলন্ত আদর্শকে লক্ষ্য রেখে শেষের মধুময় ফলটীর দিকে তাকিয়ে সমস্তই সহ্য হয়। মূলে চিত্তের যে গভীর বেগ আমাদের আদর্শের দিকে ছুটিয়ে দেয়, তার সে তীব্র গতিকে কোনও বাধাই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু চাই ঐ

উঁচু আদর্শ। জীবনে খেয়েদেয়ে বেঁচে থাকে অনেকেই। আর সেই বাঁচবার মাঝেও শুধু দেহ ধারণ করা ও মরণ কালে কিছু চিহ্ন রেখে যাওয়ার সাধারণ ইচ্ছা অনেকেরই থাকে। তবুও সে বাঁচাকে বাঁচা বলা যায় না। সে চিহ্ন অর্থেও যার যার শক্তি অনুসারে শুধু কয়েকটী দৈহিক বংশধর বা তাদের ভরণ-পোষণের দরুণ কিছু টাকা পুঁজিই নয়। মানুষ যার প্রকৃত অধিকারী, যা মানুষ ভিন্ন আর কারও সাধ্যায়ত্ত নয়, সেই অমরত্বে বা নিত্যসুখেও আমাদেরই দাবী। মানুষের এই স্থূল দেহ চিরস্থায়ী নয়—তা চিরস্থায়ী হয়ে লাভও নাই; নিত্য রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যুপূর্ণ সংসারে দু'এক জন যদি অমর হয়ে থাকে, তবে সে এক মহা বিড়ম্বনাই বটে। আবার মানুষের কর্ম্মে বা চিন্তায় যে অমরত্ব, তাও তুলনায় কিছু দীর্ঘকাল মাত্র। এ ভোগ হয় সূক্ষ্মে। আজ যে কর্ম্ম করি, তার ফল এ দেহেই হোক বা পরেই হোক কিছুদিন ধরে তা ভোগ করতে হবেই। সুকর্ম্মের ফল যখন স্বর্গ বা কীর্ত্তি, তখন কিছু কিছু সৎকর্ম্ম করা থাকলে আরও কয়েক দিন বেশী করে ভোগ করা যেতে পারে; কিন্তু ভোগান্তে আবার এই মরজগতেই ফিরতে হয়। পূর্ব্বকীর্ত্তি ও স্মরণ থাকে না, তাই এ পথেও নিত্যসুখ লাভ হয় না। ঘুরেফিরে আবার সেই দুঃখের রাজ্যেই আসতে হয়। তবেই স্বীকার করতে হয়, অমরত্বে আমাদের দাবী থাকলেও তা দেহসংক্রান্ত নয়। অথচ এই দেহ দিয়েই নিত্যসুখ আঁকড়ে ধরতে চাই। এমন তৃণের দড়ি দিয়ে আগুনকে বেঁধে রাখ্‌তে যাওয়া পাগলামি নয় কি?

তাই এজন্য চাই, প্রতি মুহূর্ত্তে দারুণ জ্বালা।—এই দেহ দিয়ে কত রকম করে তো ভোগ করে দেখছি, কিন্তু কৈ তৃপ্তি তো কিছুতে মিল্‌ছে না! বরং উত্তরোত্তর ভোগের কামনা যে বেড়েই চল্‌ছে—দুঃখ আরও বাড়ছে! তবে এ দেহ নিয়েই বা কি করব, যদি ভোগই না হল? কিন্তু আমাদের এর চেয়ে যে বড় ভোগ রয়েছে—যার জন্য এ দেহটাকে যন্ত্র করে জগতে এসেছি। সে দিকে মন মোটে ভিড়েই না। নিত্য সুখ বা অমরত্ব এই দেহ দিয়েই লাভ হবে। কিন্তু তার ভোগ এই দেহ দিয়েই হবে না। তাহলে যে অনেকখানি ঠকে যেতাম! দুদিনের জন্য দেহ ধারণ করে তাকে দিয়ে যে মহা বস্তু লাভ করব, তা যদি এ দেহের ভোগেই শেষ হয়ে গেল, তবে আর তেমন খাটুনীতে বিশেষ কি হল? বরং এ জগতের জন্য তেমন করে খাটলে আরও শীঘ্র কিছু তীব্র নেশা হত! কাজেই এবার যখন এ দেহটা নিয়েই এসেছি, তখন এমন করেই একে খাটিয়ে নিতে হবে যেন আর ফিরে আসতে না হয়—এই খাটুনীর ফলেই শাশ্বত পরম ও চরম সুখ লাভ হয়।

শ্রেয়োলাভের জন্য যেখানে তীব্র জ্বালা থাকে, পথ সেখানে আপনি সুস্পষ্ট হয়ে আসে। হৃদয়ের এমনি জ্বালাই জ্যোতিঃরূপে তখন পথ দেখিয়ে নেয়। জগতে পথের অভাব হয় না, অভাব হয় সেই পথে চলার লোকের। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কল্পনার জাল বুনে যে পথকে মানুষ কুসুমাস্তৃত মনে করে প্রথমে পা দেয়, কিছু দূর চলার পরে সে কল্পনার মালা ছিঁড়ে যায়, পথের কাঁটার আঘাতে ব্যথিত হৃদয়ে তখন পিছন ফিরেই তাকায়। হয়ত এ কাঁটা-বনের ও পারেই তার ইষ্ট-মন্দির, এতখানি আসার পর আর একটু গেলেই গন্তব্যস্থানে পৌছাত, কিন্তু ভুলের মায়া এমনি যে ওখান থেকেই ফির্‌তে হয়। নতুবা আদর্শে যে দেবতা রয়েছেন, তার টানে মানুষকে পথ খুঁজতে হয় না; যে দিক দিয়ে তাঁর টান আস্‌তে থাকে, সেটাই পথ হয়ে দাঁড়ায়। অপরের শিক্ষার দরুণ খোঁচার ভিতর দিয়েই সাধককে পথ করে নিতে হয়। জগতে বিশেষ করে অনুকূল স্থান কাল পাত্র

এসে সাধকের সামনে ধরা দেয় না, তাঁর লক্ষ্যের প্রতি তীব্র তন্ময়তার বেগে সমস্তই তাঁর সাথে তারই অভিমুখে ছুটতে থাকে। প্রতিকূলতার সমস্ত হাওয়াকে আপনার প্রচণ্ড গতির বেগে অভিমুখী করে নিতে না পারলে সে সাধকের তেজ কি? জগতের কেউ এসে সুখের ইমারত গড়ে প্রতীক্ষা করে বসে থাকবে না—সাধকের তেজে শূন্যে ইমারত গড়ে উঠবে।

এই প্রচণ্ড তেজ বা তীব্র আকুলতা চাই সাধকের। কিন্তু শুদ্ধ আধার না হলে সে ব্যাকুলতা তো ফুটবে না। এজন্য সেই তেজের আগুন ধরাতে বহু শুষ্ক ইন্ধন জোটাতে হয়। এই দেহ, এই মন বা ইন্দ্রিয়ই সে ইন্ধন। এগুলি সমস্তই কি মহৎ কি নীচ সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পরমবস্তু লাভ করতে এখানে কেউ আসে না। কৌশল করে খাটিয়ে নিতে পারলে এই দিয়েই সে পরম সম্পদ্ লাভ হয়। যে কৌশলে এই দেহ-মন-ইন্দ্রিয়কে তার যোগ্য করতে হয়, তাই পথ্যাচার-বিধি। এগুলি পশুরও আছে, কিন্তু কোনও বিশেষ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলিকে বিশিষ্ট সংযমের পথে না চালিয়ে পশু চলে প্রকৃতির প্রেরণায়—আর মানুষ চলে যেন এই স্বাভাবিক সম্পদ্গুলি তার আদর্শরূপ দেবতার পূজার অর্ঘ্যরূপে সাজিয়ে নিয়ে। যে আদর্শের ধারা যেমন বিভিন্ন, পূজার রীতিও তেমনি বিভিন্ন। আদর্শের বিভিন্নতানুসারে আমাদের প্রত্যেকের কর্ম্মও, এইরূপ বিভিন্ন, তদনুযায়ী নিত্যকর্ম্মও বিভিন্ন হতে পারে। কিন্তু পথ্যাচার-বিধির যা মূল উদ্দেশ্য,—সেই সংযম সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজন। রিপুর তাড়নায় মানুষ যখন অস্থির হয়ে পড়ে, তখন সাম্লাবার অবসর থাকে না। গোড়া হতে বাঁধতে সুরু না করলে ভিত্তি দাঁড়াবে কোথায়? ঝড়ের হাওয়ায় ধসে যাওয়াই তার স্বাভাবিক। শক্ত হবার, বেগ সহ্য করবার অবসর প্রথম থেকে না হলে মাঝখানে গিয়ে কিছুই টিকতে চায় না।

গোড়া বাঁধতে হলে, প্রথমেই নজর পড়ে মানুষ যেখানে পশুর সমান হয়ে রয়েছে, সেই প্রবৃত্তির দিকে। জিহ্বা ও উপস্থ মানবজীবনে বাল্যকাল হতে সুরু করে মরণ পর্য্যন্ত প্রহরী থাকে। তারা যেন শয়তানের নিযুক্ত। কোনও ইন্দ্রিয়ের বিশিষ্ট বোধ যখন জাগে না, তখনও সেই শিশুর জীবনেও জিহ্বা গিয়ে হানা দেয়, তখন থেকেই তার অত্যাচার সুরু হল! ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপস্থের ক্ষুধাও এসে তাতে যোগ দেয়। এমনি করে কখনও একজন, কখনও আর জন, কখনও বা উভয়ে একত্র হয়ে শয়তানের আদেশে মানুষকে সারা জীবন ধরে সুযোগ খোঁজে। দেবতার শক্তি যেই মুহূর্ত্তে সঙ্কুচিত হবে, অমনি সেই দুর্ব্বলতার সুযোগে তারা এসে ঘাটি আগ্লিয়ে বসবে। কিন্তু মানুষ যদি চেতনার পূর্ব্বে শিক্ষা দ্বারা সাবধান ও সচেতন হয়ে সংযম দিয়ে চিত্তের পবিত্রতা রক্ষা করে চলে, তাহলে আর এ বিপদ হয় না। সংস্কার শুদ্ধ হয়ে রিপুর তাড়না দূর করা একমাত্র শিক্ষা, অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারাই সম্ভব। বৈরাগ্য ভাগ্যবানের জন্মার্জিত সুকৃতির ফল। কিন্তু শিক্ষা বা অভ্যাস সকলেরই সাধ্য। তাই পথ্যাচারবিধি সকলেরই পালনীয়। উজ্জ্বল লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে যদি দিনের সমস্ত খুটিনাটী কাজ করে যেতে থাকি, তবে তার মাঝ দিয়েই নিজের সবলতার সন্ধান পাব। লক্ষ্যানুযায়ী চলতে গিয়ে বিচারপূর্ব্বক নিজের জন্য যে পন্থা আবিষ্কার করি, তাই পথ্যাচার-বিধি। চিন্তায় যে উচ্চ আদর্শ, তাই মানুষের মনুষ্যত্ব, আর হাতে-নাতে যেটুকু করা যায়, তাই পশুত্ব। এই মানুষ ও পশু উভয়েই জগতে বাঁচবার জন্য বাস্তবে কত কিছুই করছে। কিন্তু আদর্শ বোধে করাটুকুই এর মাঝে মনুষ্যত্ব। জ্ঞানের ও ভাবের পরিচয় সেখানেই।

এপথে চলতে গিয়ে ভ্রান্তি বা কাঁটা-খোঁচার আঘাত যতই আসে, ততই সাধকের পক্ষে মঙ্গল।

বিনা বিঘ্নে যে পথ চলা, তার মাঝে শক্তির ক্রমোন্নতি নাই। কিন্তু নিত্য নূতন বাধা এলেই তাতে সাধক আর আপনাকে জড় বাহনের মত চালিয়ে নিতে পারে না। জীবনের পরিচয় তাকে তখনই দিতে হয়। হয়ত দেহ মন সে বাধার সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হয়, কিন্তু এও মনে রাখতে হবে যে আকুলতা বাড়বে তাতই আরো বেশী। অশ্রু-পূর্ণ আকুলেক্ষণ হয়ে পরম বিষাদযুক্ত দেখলে তবে না সারথি মধুসূদনের কৃপা হবে—পথ বাৎলে দিবেন। আপন শক্তির চূড়ান্ত আগে ওই পথের বাধায় হয়ে যাক্, তবেই না তখন আপন ন্যূনতা পূরণের জন্য ব্যাকুলতা আসবে। সিদ্ধিপথে এমনি ব্যাকুলতা আনবার জন্যই তো প্রথমে বাঁধা রাস্তায় পা দেওয়া। এমনি বাধা যদি তাতে এসে না জুটত, তবে যে মধুসূদনের সাক্ষাৎ পাওয়াই যেত না। যতই সমস্যা এসে জুটবে, সমাধানের নিত্যনূতন প্রচেষ্টায় ততই প্রচেষ্টার বেগ ও নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার হবে। হৃদয়ের রথ থেকে শ্রীমধুসূদন ততই নূতন আশ্বাসে নূতন প্রেরণায় দীপ্ত করে তুলবেন। সে দীপ্তিতে লক্ষ্য আরও উদ্ভাসিত হতে থাকবে। লক্ষ্যের আকর্ষণ আরও বেড়ে যাবে। ঘুরে ফিরে আবার বলতে হয় ওই আকর্ষণে পড়ে যাওয়াই সমস্ত প্রচেষ্টার মূল। শুধু তীব্র আকর্ষণ বা আবেগই সমস্ত চলার মাঝে বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলবে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে হবে না—এই কর বা ওই কর। পথ বলে দেবে পথের কথা।

জয়

বিশ্বময় আজ ছড়িয়ে গেছে যেই সুরেরি গান,—
তাঁরই সে সুর বরণ করে আপন ঘরে আন্!—
নিখিল-ভরা উদার জ্যোতিঃ, ঐ যে ফুলের বাস,
তার সাথে তুই মিলিয়ে দে তোর ক্ষুদ্র বুকের আশ!
হয়ত ঘরে আছেই বা তোর গুপ্ত কোনও ধন—
সেই ভরসায় আপনা নিয়েই থাকিস্ না রে মন!—
মুক্ত হয়ে তুই দে খুলে তোর ক্ষুদ্র হৃদয় আজ—
এই ভুবনের ঐ আকাশের শুভ্র আলোর মাঝ!
সন্ধ্যারতির ধূপের মত,—আপনি হলেই ক্ষয়,
ভুবনভরা বইবে সুবাস—তবেই হবে জয়!

হিমাচলের পথে

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

২৪ বৈশাখ, শনিবার—

দেবপ্রয়াগ হরিদ্বার হতে ৫৮ মাইল। দেবপ্রয়াগ বহু পুরাতন এবং সমস্ত উত্তরাখণ্ডের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী সহর। অলকানন্দা শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণের বহু উপরে ধনাধিপতি কুবেরের রাজধানী অলকাপুরী পর্ব্বতের পাদদেশ হতে উৎপন্ন হওয়াতে অলকানন্দা নামে খ্যাত হয়েছেন। অলকানন্দা মানা গ্রামের ঊর্দ্ধে সরস্বতী নদীর সঙ্গে মিশে, ক্রমে শ্রীশ্রীবদরীনাথজীর পাদদেশ ধৌত করে বিষ্ণুপ্রয়াগে এসে ধবলী গঙ্গার সঙ্গে মিশেছেন। ক্রমে বিষ্ণুপ্রয়াগ হতে নীচে পাতাল-গঙ্গা ও গরুড়-গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্ণপ্রয়াগে এসে কর্ণ-গঙ্গায় মিশেছেন, কর্ণপ্রয়াগ হতে ক্রমে নীচু দিকে নেমে রুদ্র-প্রয়াগে মন্দাকিনীর সঙ্গে একত্র হয়ে আবার দেবপ্রয়াগে ভাগিরথী গঙ্গায় মিশেছেন। ভাগিরথী গঙ্গা স্বর্গারোহণ-শিখর পর্ব্বত হতে উৎপন্ন হয়ে জাহ্নবী-গঙ্গা ও ভিলঙ্গ গঙ্গার সহিত মিলিত হয়ে দেবপ্রয়াগ এসে অলকানন্দার সহিত মিশেছেন। অলকানন্দা ও ভাগিরথীর সঙ্গম স্থান বলে এর নাম প্রয়াগ। এখানে অলকানন্দা প্রায় ১৫০ ফুটের উপর চওড়া এবং ভাগিরথী ১২৫ ফুট চওড়া। সঙ্গমের পর ভাগিরথী প্রায় ২৫০ ফুটেরও উপর চওড়া হবে। কিন্তু বর্ষাকালে ৩৫০।৪০০ ফুট চওড়া হয়ে থাকে। ভাগিরথী উচ্চ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ভীষণ গর্জ্জন করতে করতে ফেনপুঞ্জাবৃত হয়ে অলকানন্দায় এসে মিশেছেন। অলকানন্দার চয়েও ভাগিরথীর স্রোত প্রবল। দেবপ্রয়াগে ভাগিরথীর বেগের মত জলের এত প্রচণ্ড বেগ সমগ্র উত্তরাখণ্ডে আর কোথাও নাই। যেমন প্রচণ্ড বেগ, শব্দও তেমনি ভীষণ। আমি, চিদানন্দ-মহারাজ ও সারদা-ভায়া সঙ্গম-স্থানে স্নান করতে গেলাম। সেখানেও হরিদ্বার হৃষিকেশের মত বড় বড় মাছ আনন্দ মনে খেলা করছে। আমরা কয়েকখানা বাসী রুটি মাছকে খাওয়ালাম। মাছগুলি নির্ভীক. পিঠে হাত বুলিয়েও দিয়েছি। সঙ্গম-স্থানে জলের স্রোত অত্যন্ত বেশী, খুব সাবধানে স্নান করতে হয়। স্নান করবার জন্য একটী বড় লোহার মজবুত শিকল পাথরের সঙ্গে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। সেই শিকল ধরে আমরা অতি সন্তর্পণে স্নান করলাম। হাত হতে শিকল ছুটে গেলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে অস্তিত্ব লোপ পাবে। শিকল ধরে স্নান করবার সময় এক পাণ্ডা শিকল ধরার জন্য পয়সা দিইনি বলে উৎপীড়ন করেছিল। কিন্তু পয়সা দিবার কোন নিয়ম নাই। এ শিকল সর্ব্ব-সাধারণের সুবিধার জন্য সর্ব্ব সাধারণ কর্ত্তৃকই স্থাপিত। আমরা স্নান করে তাড়াতাড়ি বাসায় চলে এলাম। আমাদের এখানে এসে সকলেরই যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী হয়ে যাবার মত পাকা হয়ে যাওয়াতে আজ সকালেই কয়েকখানা জরুরী টেলিগ্রাফ করা হল। যে কয়দিন টেলিগ্রাফে টাকা না আসে, ততদিন অপেক্ষা করতে হবে। কাজেই আমাদের সঙ্গীরা সকলে আজ দেব-প্রয়াগে শ্রাদ্ধ করলেন না। ধীরে ধীরে সমস্ত সহর ও ভাল ভাল স্থান দেখে-শুনে আর একদিন শ্রাদ্ধ করবে স্থির করল।

দেবপ্রয়াগ দুইভাগে বিভক্ত—বৃটিশ দেবপ্রয়াগ ও টেহরী দেবপ্রয়াগ। অলকানন্দার বাম দিকে যে দেবপ্রয়াগ, সেইটাই বৃটিশ দেবপ্রয়াগ। তার অন্য নাম "বা" নগরী। আমরা গত কাল বৃটিশ দেবপ্রয়াগে অথবা "বা" নগরীতে ছিলাম। এই "বা"

নগরীতে পোষ্টাফিস্ (পোঃ দেবপ্রয়াগ, গাড়োয়াল, ইউ, পি) টেলিগ্রাফ অফিস্, বাবা কালীকম্বলীবালার ধর্ম্মশালা, সদাব্রত অফিস্, ছত্রশালা, কেদারবদরীর রাস্তা, কুলীর রেজিষ্টী অফিস্, থানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, বড় বড় দোকানওয়ালা চটী, নানাপ্রকার খাবারের দোকান, কাপড়, জামা, জুতা প্রভৃতির দোকান আছে। বৃটিশ দেবপ্রয়াগ হতে একটী লোহার সুদৃঢ় ঝোলা পুল দিয়ে টিহরী দেবপ্রয়াগ সংযুক্ত। পুলটী বেশ ভাল, অসংখ্য লোক যাতায়াত করছে, মাল-বোঝাই ঘোড়া পর্য্যন্ত অক্লেশে চলে যাচ্ছে। পুলটী ২৮০ ফুট লম্বা। উপর দিয়ে যাবার সময় বেশ দোলে। পুলের উপর দাঁড়িয়ে অলকানন্দার দৃশ্য বেশ মনোরম বোধ হল। আবার অন্যদিকে সঙ্গমস্থলও বেশ সুন্দর দেখায়। পূর্ব্বে এই পুলটী দড়ির ছিল। লছমনঝোলায় যেভাবে দড়ির পুল পূর্ব্বে ছিল, এখনও হিমালয়ের অনেক জায়গায় ঐরকম পুল আছে। লোহার পুল হবার আগে এখানেও ঐরকম ঝোলা পুল ছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রথম লোহার পুল তৈরী হয়। পরে গোহনার বন্যায় তা নষ্ট হয়ে গেলে আবার ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে একজন নৈনিতালবাসী উদারচরিত মহাত্মা ৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে সংস্কার করে দেওয়ায় সর্ব্বসাধারণের সুবিধা হয়েছে। গত ৩২ সনের আশ্বিনের ভীষণ বন্যায় আবার পুলটি ধ্বংস হতে বসেছিল।

পাকা পুলটী পার হয়ে গেলে টেহরী দেবপ্রয়াগ। সেখানে বদরীনাথের পাণ্ডাদের বসতবাড়ী, (প্রত্যেকেরই বাড়ী পর্ব্বতের ভিতর গ্রামেও আছে) কয়েকটি খাবারের দোকান, অন্যান্য দরকারী সমুদয় জিনিষের দোকান, আদি বিশ্বেশ্বর, রঘুনাথজিউর মন্দির, ব্রহ্মতীর্থ, বশিষ্ঠগুহা, বরাহতীর্থ, সূর্য্যতীর্থ, ডিপুটি কালেক্টরী অফিস্, থানা, ফরেষ্ট অফিস্ আছে, এ সব টেহরীরাজের। দেবপ্রয়াগ টেহরীরাজ্যের একটি সবডিভিশন। অলকানন্দা ও মাঝখানে যে সহর, তাকেই টেহরী দেবপ্রয়াগ বলে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এ স্থান ২৩৬৫ ফিট উচ্চ। আবার নগরের পেছনে যে পাহাড়টি আছে, তা নগর হতে ৮০০ ফিটেরও বেশী উচ্চ। বৃটিশ দেবপ্রয়াগ হতে টেহরী দেবপ্রয়াগ সুন্দর। টেহরী দেবপ্রয়াগের দক্ষিণ দিকে ভাগীরথী, তার দক্ষিণে দশরথ পর্ব্বত। সঙ্গমস্থল হতে প্রায় ৫০ ফুট উঠ্‌লেই সাম্‌নে সাধু ও যাত্রীদের জন্য একটী করোগেট্ আয়রণের (টীনের) লম্বা ধর্ম্মশালা আছে। সেখানে বহু লোক, অধিকাংশই সাধু। সেখান হতে ক্রমে সিঁড়ি বেয়ে ২০০ ফুটের উপর উঠ্‌লে শ্রীরামচন্দ্রদেবের প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরটী শুধু পাথর সাজিয়ে তৈয়ার করা হয়েছে, কোন প্রকার মসল্লা দিয়ে গাঁথা হয়েছে বলে মনে হয় না। মন্দিরটি একটী প্রকাণ্ড চত্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা বৈকালে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রজীর মন্দিরে গেলাম, তখনও মন্দির খোলে নাই। চত্বরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম, উদ্দেশ্য আরতি দর্শন করে আস্‌ব। প্রবাদ আছে, শ্রীশ্রীরামচন্দ্রদেব রাবণবধের পাপক্ষয়মানসে এখানে তপস্যা করেছিলেন। সেই স্থানের উপরই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটী বহু পুরাতন। আমাদের পাণ্ডা বল্‌লেন, টেহরী গবর্ণমেণ্ট মৃত্যুকালে নিজ ব্যবহারের সমস্ত অলঙ্কার-পরিচ্ছদ এই মন্দিরে দান করে যান। মন্দিরে অনেক ধন-দৌলত রক্ষিত আছে বলে প্রবাদ। মন্দিরের উপর একটি সাদা গম্বুজ, একটি সোণার গোলা ও চূড়া আছে। পাণ্ডারা এর বয়স দশ হাজার বৎসরেরও উপর বলে মনে করেন। কেউ আবার ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রজী নিজে তৈয়ার করে গিয়েছেন বলে বিশ্বাস করেন। সেখানে আরও ছোট ছোট অনেক গুলি মন্দির আছে। দেবপ্রয়াগ এসে ভাগিরথীতে, অলকানন্দায়, ব্রহ্মকুণ্ডে, বশিষ্ঠকুণ্ডে প্রত্যেক যাত্রীরই স্নান করা বিধি। মুণ্ডিতমস্তক হয়ে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান, ভোজ্যদান,

গোদান ইত্যাদি করতে হয়। শ্রীশ্রীরামচন্দ্রজীরও ষোড়শ উপচারে পূজার বিধি আছে।

লছমন-ঝোলার মত ভাগিরথীর উপর দড়ির ঝোলা পার হয়ে দশরথ পাহাড়ে, গ্রামে ও গাড়োয়াল জেলার রাজধানী "টেহরী" সহরে যাওয়া যায়। দশরথ পাহাড়ে একটী স্কুল আছে। স্কুলে ৩০টী ছেলে পড়ে। লেখা পড়া শিখবার কোন ভাল বন্দোবস্ত নাই। সাধারণ ভাবে পাঠশালার বিদ্যাই ইঁহারা যথেষ্ট মনে করেন। অধিকাংশই পাণ্ডা, তারা কোন রকমে নাম ধাম লিখ্তে পারলেই যাত্রী-রূপ মৌরশী সম্পত্তিতে অধিকার লাভ দ্বারা বিনা বাধায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে থাকে। বৃটিশ দেবপ্রয়াগের পুলিশ ষ্টেশনে তিনজন পুলিশ ও একজন হেড্ কনেষ্টবল আছে। টেহরী দেব-প্রয়াগে টেহরী-রাজের কোর্ট, থানা প্রভৃতি আছে, সে নামে মাত্র। অলকানন্দার দ্বারা টেহরী ও বৃটিশ বিভক্ত। টেহরী দেবপ্রয়াগ হতে যে রাস্তা অলকানন্দার দক্ষিণ পাশ দিয়ে ক্রমে পাহাড়ের শীর্ষদেশাভিমুখে চলে গিয়েছে, ঐটা টেহরী হয়ে গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরীর রাস্তা। অলকানন্দার বাম পাশ দিয়ে যে রাস্তা উত্তর দিকে গিয়েছে, সেটী কেদার-বদরীর রাস্তা। টেহরী যাবার রাস্তা খুব চড়াই, জলকষ্টও খুব বেশী। ৮।১০ মাইল পর পর চটী, কিন্তু স্বচ্ছ জল দুর্ল্ভ। এ রাস্তাটী দেব-প্রয়াগ হতে ৩৩ মাইল। আরও একটী টেহরী যাবার রাস্তা আছে। ভাগিরথী-গঙ্গার উপর দড়ির ঝোলা পুল পার হয়ে ভাগিরথী ডান হাতে রেখে ক্রমে ভাগিরথীর ধার দিয়ে উত্তর দিকে যেতে হয়। এ পথে টেহরী ৩০ মাইল। কিন্তু এ পথে খুব বাঘের ভয়। চটীর সংখ্যাও খুব কম। কিন্তু জল খুব আছে। আমরা এই বাঘের রাস্তা দিয়ে টেহরী হয়ে যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী গিয়েছিলাম, যথা সময়ে তা জানাব। আরও একটী রাস্তায়ও টেহরী যাওয়া যায়। সে অনেক ঘোরা। কেদার-বদরীর রাস্তায় শ্রীনগর গিয়ে সেখান হতে বরাবর টেহরী যাওয়া হয়। সে রাস্তা ৫০ মাইলের উপর। কেউ সে রাস্তায় যায় না। উপরের স্কুলের মাষ্টার বাবু, আমাদের কাছে বসে দেবপ্রয়াগের ইতিহাস বর্ণন কর্চ্ছিলেন।

আমরা মন্দিরের সামনে প্রকাণ্ড চত্বরের এক পাশে স্কুলের মাষ্টারবাবুর সঙ্গে বসে দশরথ পাহাড়ের দৃশ্য দেখ্ছিলাম। এই প্রকাণ্ড চত্বরের মধ্যে পাণ্ডাদের ছোট ছোট অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে খুব হট্টগোল করে খেলা কর্চ্ছিল। ছেলেদের খেলা দেখ্তে দেখ্তে মন্দিরের দরজা খুলে গেল, আরতির কাঁশর ঘণ্টা, ঢোলের বাজনায় দেবপ্রয়াগ মুখরিত করে তুলল। আমরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে আরতি দর্শন করে রাত হওয়াতে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলাম।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র জীর মন্দিরে যাবার সময় অনেক গুলি দোকানে জিনিষের বিভিন্ন দাম দেখে অবাক হয়ে যাই। টেহরী দেবপ্রয়াগের যে রাস্তা মন্দি-রের দিকে গিয়াছে, সেই রাস্তার শেষ দোকান-দারের কাছে জিনিষাদির দাম শুনে যখন পাণ্ডার বাড়ীতে আছি, তখন সেখান হইতেই জিনিষ কিনব স্থির করলাম। দেবপ্রয়াগের মধ্যে তাদের দোকানে সব চেয়ে বড় এবং বাঁধা দর। সে দোকানদারের সঙ্গে আমার অনেক আলাপ পরিচয় হল, তিনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। লোকটীর বাড়ী নাজিবাবাদ। তাহার বাবা, গোকুলচন্দ্র ২৫ বৎসর পূর্ব্বে সস্ত্রীক-বদরীনারায়ণ যাবার সময় দেবপ্রয়াগ দেখে খুব আনন্দ হওয়ায়, এখানেই থেকে সৎ-ভাবে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য একটী দোকান করে সাধন ভজনে বাকী জীবন কাটিয়ে দেন। তাহার তিন পুত্র বেনারসী দাস, হরিসিং, সুন্দরলাল দুজন নেই, লালা বেনারসী দাস এখানে আছেন। তাঁর সঙ্গেই আমাদের আলাপ হল। রাস্তার

দু'ধারেই তার দুইটি দোকান। চাল, ডাল, লবণ, তৈল হইতে আরম্ভ করে কাপড়, ছাতি এমন কি জুতা পর্য্যন্ত সব কিছুই তার দোকানে পাওয়া যায়। এ দোকানে যা নাই দেব প্রয়াগে তা নাই। সব জিনিসেরই একদর, কোন গোলযোগ নাই। তার পিতার প্রতিষ্ঠিত সেই ক্ষুদ্র দোকান এখন দেবপ্রয়াগে সব চেয়ে বড় দোকানে পরিণত হয়েছে। নিজেদেরই তেতালা বাড়ীর নীচের তালায় দোকান ঘর। আমরা বেনারসী দাসের নিকট হতে আমাদের দরকারী সমুদয় জিনিষ কিনে নিলাম। রাস্তার সমুদয় চটী হইতে দেবপ্রয়াগে জিনিষের দর খুব কম। সাধারণতঃ চাউল ডাল ৷৷০, আটা ।০ আনা, ঘি ১৸৵০ আলু ৵১০ সের। এ পথে জুতা ছাড়া চলিবারও উপায় নাই। হরিদ্বার হতে এ রাস্তা গুলি কাঁটার ভর্ত্তি। বনবেল, করমজা ও বাসক গাছে রাস্তা ছেয়ে আছে, অবশ্য রাস্তার উপরে গাছ না থাক্‌লেও কাঁটার অভাব নাই। পাণ্ডারা তাদের আপন বাড়ীতে প্রায়ই যাত্রী উঠায় না। বিশেষতঃ অধিকাংশ পাণ্ডার বাড়ীই দেব-প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী পাড়া গ্রামে। যারা দেব-প্রয়াগ ২।১ দিন বাস কর্‌বেন, তাদের জিনিষাদির দাম ডবল দিতে হবে।

টেহরী দেবপ্রয়োগে জলের কল আছে দেখিলাম। ব্রহ্মদেশীয় একজন সদাশয় ব্যক্তি (বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী) তীর্থস্থানে পাণ্ডাদের জলকষ্ট দেখে ৩০০০০ ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী জলের কল স্থাপন করে লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। টেহরী দেবপ্রয়াগের লোকেরাই কলের জল খায়। বৃটিশ-দেবপ্রয়াগে এখন কলের জল যায় নাই, সত্বরেই নেওয়ার বন্দোবস্ত হচ্ছে। ভাগীরথীর অপর তীরে দশরথ পর্ব্বতের ওপরকার একটি বড় ঝরণা হতে জল সরবরাহ হচ্ছে। দড়ির ঝোলা পুলের পাশ দিয়েই মোটা সীসার পাইপে জল আসছে। ঝোলাদড়ির পুলটির পরিবর্ত্তে একটী পাকা লোহার পুল দিবার কথা হচ্ছে। এক পার্শে থাম (পাকা) তৈয়ার হয়ে গেছে।

৫ বৈশাখ, রবিবার—

অনেক লোক সদাব্রত নিয়ে দেবপ্রয়াগে এসে, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী না গিয়ে কেদারবদরী যায়। তাহাদের কতকগুলি চিঠি অনর্থক নষ্ট হয়ে যায়। আবার যারা কেদারবদরীর চিঠি এনে সেখানে যায়নি, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী হয়ে কেদারবদরী যায়, তাদেরও অনেক চিঠি নষ্ট হয়ে যায়। বদল করে নিলে প্রত্যেকেরই উপকার হয়। হরিদাস-ভায়া কাহার নিকট হতে বদল করে নিয়েছিল, তাতে দুজনেরই সুবিধা হয়েছিল। আমরা বাবা-কালী-কম্বলবালার ওখান হতে সদাব্রত আনলাম। ভল-ভিয়ালার মাঝে আর কোন চটী না থাকায়, এখান হতেই ২ খানা চিঠির সদাব্রত পেলাম। একটী দিচ্ছে শেঠ লছমনদাসজী, সুরজমল জেঠিয়া, মোকাম খুরজা আটা ৷৷৵ পোয়া, ডাল ৷৵ পোয়া ঘি, ১ তোলা, লবণ ১ তোলা, মরিচ ১টী, আর একটী দিচ্ছেন, খুরজা নিবাসী শেঠ গৌরিশঙ্কর গোয়েঙ্কা আটা ৷১০ সের, ডাল ৷। পোয়া, ঘি ১ তোলা, লবণ ১ তোলা, মরিচ ২টা। চিদানন্দদাদার প্রথম-খানা চিঠির সদাব্রত পেলাম। তিনি যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর পথে আর কোথাও সদাব্রত পাবেন না, ত্রিযুগী নারায়ণ আস্‌লে পাবেন। পরে তার চিঠিও কার সঙ্গে বদল করে নিয়েছিলেন, তাতে অনেক সুবিধা হয়েছিল। আজও সঙ্গমে স্নান করে আসি। বিকেল বেলা, চিদানন্দ দাদা, ও হরিদাসভায়ার সঙ্গে দশরথ পাহাড়ে বেড়াতে যাই। দশরথ পাহাড়

যেতে হলে ভাগিরথীর উপর দড়ির ঝোলা পার হয়ে যেতে হয়। সে এক বিষম ব্যাপার, ঝোলার মাঝখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝোলা এমন দোলে যে পড়ে যাব বলে বিষম ভয় হয়। একবার পড়ে গেলে, মুহূর্ত্তেই অস্তিত্ব লোপ পাবে। বহুকষ্টে ঝোলা পার হয়ে দশরথ পাহাড় চড়তে লাগলাম, সে খাড়া চড়াই। আমরা মাঝামাঝি উঠে একটা পাহাড়ী লোকের বাড়ীর নিকটে বস্‌লাম। সে বাড়িটী সুন্দর। তাহার পাশ দিয়েই একটী ঝরণা বয়ে যাচ্ছে। কয়েকটী আমগাছে ছোট ছোট অসংখ্য আম ঝুল্‌ছে। বাড়ীওয়ালী কচি কচি কতকগুলি আম পেড়ে একটী ছোট লেড়্‌কিকে দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। চিদানন্দজী আমাদের ফেলে আরও প্রায় ৩।৪ শত ফুট্ উপরে উঠে গেলেন। সেইটাই পাহাড়ের শীর্ষদেশ মনে করে খুব আনন্দে উঠছিলেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখতে পেলেন, তার ওপর আরও ৪।৫ শত ফুট না উঠলে শীর্ষদেশে যাওয়া যাবে না। সেইটাই যে শীর্ষদেশ তার কোন প্রমাণ নাই, কারণ সেখানে উঠেও হয়ত আবার আর একটি ঐরূপ ৪.৫ শত ফুট উঁচু পাহাড় দেখবেন। পাহাড়ের রীতিই এইরূপ। এ দিকেও সন্ধ্যা হয়ে এল বলে তিনি নেমে আস্‌ছিলেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে যখন বাসায় ফিরে এলাম, তখন রাত্রি ৮টা। দশরথ পাহাড়ের উত্তর পাশ দিয়ে দশরথ কন্যা শান্তা নাম্নী একটা মাঝারী ঝরণারূপ নদী এসে ভাগিরথীর সঙ্গে এসে মিশেছে। দড়ির ঝোলা পুলটী প্রত্যেক পারে খুব মোটা মোটা ৪টী খুটীর সঙ্গে বাঁধা আছে। কচি আম আমাদের হাতে দেখে পাণ্ডাজী খেতে মানা করলেন, বল্‌লেন এখন কচি আম খেলেই আমাশয় হবে।

২৬ বৈশাখ, সোমবার—

আজ বিশ্রাম। আজ পর্য্যন্ত কারও রিপ্লাই টেলিগ্রাফের কোন উত্তরই এল না। বদরীনারায়ণে ব্রহ্মকপালীতে পিণ্ডদান করলে আর কোথাও পিণ্ড দিতে হয় না। আজ বৈকালে এখানে প্রবল জোরে ঝড়্ বৃষ্টি হয়। এরূপ প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি পাহাড়ে আর কোন দিনই দেখিনি। ঘণ্টা দুই প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে পৃথিবীকে কাঁদিয়ে পর মুহূর্ত্তেই যেন প্রকৃতি হাসতে লাগিল। তখন পশ্চিমাকাশের সূর্য্যকিরণে পাহাড়গুলি ঝক্‌মক্ করছিল। বাবা কালীকম্বলীবালার ধর্ম্মশালার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অনেক সাধু মহাত্মা ধুনীর কাছে বসেই প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা হেসে উড়িয়ে দিলেন, অনেক লোকে ঐ ধর্ম্মশালার প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের নীচে আশ্রয় নিয়ে অনেক নিশ্চিন্ত হয়েছিল। একটী বেলার মধ্যেই অতগুলি কাজ হয়ে গেল। সন্ধ্যা লাগবার পূর্ব্বেই পাণ্ডা বালকেরা আরতির সম্ভার নিয়ে এসে যাত্রীদিগকে আশীর্ব্বাদ করতে এবং নানাবিধ দেবমূর্ত্তি দেখিয়ে পয়সার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। এ কাজটী যেন ছোট ছোট ছেলেদের একটা ব্যবস্থা, পয়সা না পেলে গালাগালিটী যেন আপনিই তাদের মুখ হতে বাহির হয়ে পড়ে! এখানকার অধিকাংশ বাড়ীই পাথরের ছাউনি বিশিষ্ট। এখানে তিনদিন বাস করবার নিয়ম। পাণ্ডারা আপন আপন খাতায় যাত্রীদের নাম লিখিয়ে নেন। এখানকার পাণ্ডাদের উৎপীড়ন নাই, আমাদের বেশ যত্ন করেছে। আজ পাণ্ডাজী তাদের গ্রাম হতে কতকগুলি "ছিম" এনে আমাদের খেতে দিলেন। উদ্দেশ্য এই রকম তরকারী বা মিষ্টি ও আচারাদি দিয়ে যাত্রীদের সন্তুষ্ট করা।

২৭ বৈশাখ, মঙ্গলবার—

আজও দেবপ্রয়াগে বিশ্রাম। গত কাল প্রবল ঝড়ের জন্য টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে গিয়েছে, কাজেই আজও কারও টেলিগ্রাফের কোন জবাব পাওয়া গেল না। এদিকে দিনাজপুরের যে

দুজন মা আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা অন্য যাত্রীর সঙ্গে কেদারনাথ বদরীনাথের দিকে রওনা হয়ে গেলেন, মায়েদের দুজন কম্‌ল বলে যেন অনেকটা বোঝা পাতলা হল। বিকেল বেলা চারিদিকে পাহাড়ের মধ্যে বেড়িয়ে এলাম।

২৯ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—

আমাদের সঙ্গে পাগলীমার দলে বিশ জন ছিলেন, তারাও আমাদের সঙ্গে গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরী যাবে স্থির করে টাকার জন্য টেলিগ্রাফ করেছেন, তাঁদেরও আজ পর্য্যন্ত কোনও উত্তর আসে নাই। কাজেই তাঁরা টাকার জন্য আরও কদিন দেরী করবেন স্থির হল—টাকা এলে আমাদের সাথে এসে মিলবেন। তারা বিশ জন কমে গেলে আমাদের দলে প্রথমে যে ৭জন ছিলাম, সেই ৭জনই রওনা হব স্থির হল আর কুলী সঙ্গে যাবে। সুরেশানন্দকেও এখানেই কিছু দিয়ে বিদায় করে দিলাম।

আগামী কাল আমাদের যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। কথা হল সেই বাঘের রাস্তায় যাওয়াই সুবিধা। আমরা বাঙ্গালী, জল ভিন্ন বাঁচব না, যদিও সে রাস্তায় বাঘের ভয় এবং চটী কম, তথাপি অন্য রাস্তার চেয়ে সেই রাস্তাটিই আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক। দেবপ্রয়াগের যারা বৃদ্ধলোক, তাদের সকলেরই এই মত, চিদানন্দদাদাও তাই স্থির করলেন। আমি বাঘ দেখার লোভে সেই রাস্তাতে যাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। কাল খুব ভোরে উঠেই রওয়ানা হতে হবে। আমাদের মালপত্রগুলি আজই ওজন করে কুলীর রসিদ কাটাতে হবে। গত বারে কুলীর রসিদ কাটানোতে আমার উপর দোষের বোঝা অনেকেই চাপায়েছিলেন বলে আমি এবার বম্‌ভোলা হয়ে বসে আছি। আমার সমুদয় জিনিষই আমি নিজে বইব।

সমস্ত দিনেও কুলীর মালপত্র ওজন বা রসিদ সম্বন্ধে কাকেও আগ্রহান্বিত দেখিলাম না। বিহারী দাদা ২।১ বার রেজেষ্ট্রী আফিসে ঘুরাফিরা করে রণে-ভঙ্গ দিয়েছেন, অথচ গত কিছু গোলের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই। আমি এ কাজে না নামলে আস্‌ছে কালও যাওয়া হবে না। বুঝলাম অগত্যা আমাকেই কুলীর রসিদ করিবার জন্য নামতে হবে। একজন লোক এসে আমাদের মালগুলি ওজন করে দিয়ে চলে গেল। এবারও গত বারের মত অনেকেই অনেক জিনিস বার করে নিজে বহন করবেন বলে রেখে ওজন করলেন, জিনিষের ওজন ৮০ সের (ত্রিশ) সের হল। যে কুলীটি আমাদের সঙ্গে এসেছিল, তাকেই সঙ্গে নিব স্থির হল। ভাড়া প্রতি মণ ১০০৲ হিসাবে ৭৫৲ টাকাতেই ঠিক করে ১০৲ টাকা বায়না দেওয়া হল। টেহ্‌রীরাজ প্রতি টাকায় /৫ পয়সা হিসাবে ৫৸/১৫ আনা ও ট্যাণ্ডেল খরচ বাবদ ৷৹ আনা মোট ৬৷/১৫ আনা কুলির নিকট হতে কেটে নিল। কুলীকে কেউ জানে না বলে গোল বেধে ছিল। ট্যাণ্ডেল কুলীর জামিন হতে চায় না। অগত্যা আমিই কুলীর জামিন হয়ে তাকে সঙ্গে নিবার বন্দোবস্ত করলাম। এখানকার ট্যাণ্ডেল এ কুলীকে চিনে না, কাজেই সে জামিন হতে চায় নাই। অধিকন্তু কেউ জামিন না হলে রেজেষ্ট্রী অফিসার রসিদ দিবে না। এখানে একটি কথা সকলকেই জানিয়ে রাখি। যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরীর পথে প্রায়ই নোট চলে না। ১০৲ টাকার নোটে হয়ত সময়ে ৫৲ টাকা Cash পাওয়া যাবে। নতুবা বিপদ হয়। সুতরাং প্রত্যেকেরই হরিদ্বার নতুবা দেবপ্রয়াগ হতে নোট ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা ও রেজগী সঙ্গে রাখা উচিত। আমাদের সঙ্গীরা অনেকেই নোট ভাঙ্গিয়ে নিলেন। আমার কাছে যা ছিল, সবই রেজগী। আমি হরিদ্বার হতেই সব রেজগী করে এনেছিলাম। রেজগীর

জন্যও অনেক সময় বেগ পাইতে হয়। কম পক্ষেও ১৪।১২৲ টাকার রেজগী হাতে রাখা উচিত।

দেবপ্রয়াগ হইতে (হরী ৩৩ মাইল, নারায়ণ চটী ৫ মাইল, পুরাণা চটী ১০ মাইল, খোলা বা খোয়া ১২ মাইল, টেলী ২৬ মাইল, টেহরী ৩৩ মাইল।

৩০ বৈশাখ মে শুক্রবার—

"রবি, গুরু মঙ্গলের ঊষা আর সব ফাসফুসা" খনার এই বচনটির রক্ষার্থে আমরা ভোর বেলা গুরুর ঊষায় যাত্রা করব স্থির করছিলাম। বৃন্দাবনের মায়েদেরও তাতেই বলা হয়েছিল। তাঁর ভোর ৪ টার সময় এসে আমাদের ডেকে তুললেন। নতুবা ঊষা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারতাম কিনা কে জানে? ৪টার সময় উঠে সমস্ত জিনিষাদি গুছাতে গুছাতে সূর্য্যদেব আকাশে দেখা দিলেন, ঘড়ি দেখিলাম ৬টা বেজে গেছে। আমাদের ঊষাযাত্রা বটে! আজ কুলীর মালের অবস্থা দেখে বিশেষ দুঃখ হল। সেই প্রকাণ্ড বোঝা! অথচ ওজনের সময় ৩০ সের! আজ কিন্তু এক মণেরও বেশী হয়ে গেছে।

শুধু হাত পা দিয়ে পাহাড়ে চড়াই করতেই কত কষ্ট, তাহার উপর জিনিষ বহন করে পাহাড় চড়াই করা কত কষ্টকর ভুক্তভোগী ভিন্ন বুঝান কষ্টকর। আমরা কুলী সহ এখন ১৩ জন পথের পথিক হলাম।

সদাব্রতের চিঠি বিক্রী করবার কারও অধিকার নাই। আমাদের সঙ্গী চিদানন্দ দাদা ও হরিদাস ভায়ার চিঠি এখানে আমরা বদল করে নিয়েছিলাম, প্রকারান্তরে তাদেরও উপকার হয়েছিল, আমাদের উপকারে লেগেছিল। এতে কোন পক্ষেরই ক্ষতি করে না, বা তার জন্য কেউ কিছু দাবী করে না, অধিকন্তু সন্তুষ্টই হয়। অনেক লোক সদাব্রতের চিঠি নিয়ে রাস্তায় এসে ফিরে যায়, তারাও চিঠি বিক্রি করে না, সদাব্রতের উপযুক্ত লোককেই দিয়ে দেয়। একজনের একখানা চিঠির বেশী নিবারই নিয়ম নাই।

এখানকার সেবাসমিতির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। মহাবীর দলের প্রয়াগ সেবা সমিতির একটী শাখা সমিতি রূপে দেবপ্রয়াগে ২বৎসর যাবত সমিতির কাজ আরম্ভ হয়েছে। তার প্রেসিডেণ্ট দৌলতরাম পাণ্ডা। তিনি কোটপ্যাণ্ট পরে প্রত্যহ খুব সেজেগুজে একটি বীরপুরুষের মত ঘোড়ায় চড়ে দেবপ্রয়াগ হতে হরিদ্বারের পথে মাইলখানেক পর্য্যন্ত যান। তার সঙ্গে এক জন চাপরাশী সেজেগুজে যায়। সেবাসমিতির খাতায় ১৬।১৭ জন স্বেচ্ছসেবকের নাম আছে। সবাই পাণ্ডা, প্রত্যেকেরই এক একটী ব্যাজ আছে। তারা পথে এসে নিজেরা সেবাসমিতির লোক পরিচয় দিয়ে যাত্রীদের বিশ্বাস বাগিয়ে নিয়ে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনকে পাণ্ডার করতলস্থ করে দেয়। ৭।৮ দিন দেবপ্রয়াগে থেকেও সেবাসমিতির কোন কাজ আমরা দেখিনি। কিন্তু বিকালবেলা ব্যাজ পরে কয়েকটী সেবককে যাত্রী ধরবার জন্য বেড়াতে দেখেছি। একটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় আছে, তাও কখনো যে খোলে মনে হয় না। মহাবীর দল বা প্রয়াগ সেবা-সমিতির সঙ্গে এদের কোন সংস্রব নাই। শুনতে পেলাম, সত্বরেই প্রয়াগ সেবাসমিতির দল এসে এদের সঙ্গে যোগ দিবে। তারা যোগ দিলে যদি এদের কাজ ভাল হয়।

আমরা বেলা ৭॥টার পর বের হয়ে টেহরি দেবপ্রয়াগের ভিতর দিয়ে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রজীর মন্দিরের সামনে ভাগীরথীর উপর ঝোলা পুল পার হয়ে ভাগীরথী ডাইন হাতে রেখে তীরে তীরে চলতে লাগলাম। এ সময় এদিকে খুব গরম। উপরের রাস্তায় ভীষণ জলকষ্ট। এ গরমে সে রাস্তায় গেলে জলকষ্ট হবে বলে এই বাঁধের রাস্তাতেই আমরা রওনা হলাম।

এ রাস্তায় যেতে অনেকের বিশেষ আপত্তি থাকলেও চিদানন্দদাদার যখন এ রাস্তায় যাওয়ার আদেশ হল, তখন আর অন্যের কথা শোনে কে? আমাদের ভয় ছিল, মায়েরা এ ঝোলা পুল পার হতে পারবেন কি না! পাহাড়ী লোকগুলি তাঁদের ধরে ধরে পার করে দিয়েছিল, তার জন্য তাদের বখশিস্ও দেওয়া হয়েছিল। এ রাস্তাটী ভাল নয়—একজন লোক চল্‌তে পারে, এই পরিমাণ প্রশস্ত। পূর্ব্বে ভাল ছিল, লোকজন কম চলাতে এখন খারাপ হয়ে গিয়েছে! এটী পাহাড়ী লোকদের চল্‌বার রাস্তা। মাঝে মাঝে গ্রাম আছে; বামদিকে উঁচু পাহাড়, দক্ষিণে ভীষণ খাড়া উৎরাই, নীচেই ভাগীরথী ভীষণ গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে ছুটে চলেছেন। জল খুব আছে। এদিকে জলের সুবিধা থাকায় প্রায় সমুদয় পাহাড়েই চাষ-আবাদ চল্‌ছে। ইচ্ছামত জলের ঝর্‌ণা হতে ধারা নিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে, আবার দরকারমত সে ধারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখানে জলের খেলা বড়ই সুন্দর।

নারায়ণ-চটী ৫ মাইল

আমরা দেবপ্রয়াগ হতে ৫ মাইল গিয়ে একটী চটী পেলাম। অনেক বেলা হয়েছে বলে এই চটীতেই থাকা গেল। আজ সকলেই একসঙ্গে চলেছি, পাছে কাউকে একা পেলে বাঘ মহারাজ উদরসাৎ করে বসেন। এ রাস্তায় পূর্ব্বে বাঘের উৎপাত ছিল না। মাসখানেক যাবৎ কোথা হতে বাঘ এসে খুব উৎপীড়ন কর্‌ছে। কাজেই আজ দলভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয় বলে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলেছি। আজ আস্তে আস্তে চল্‌তে হয়েছে। এ চটীটির নাম **নারায়ণ-চটী**। এখানে একটী পুরাতন ধর্ম্মশালা আছে। কলিকাতার রাজা বাবু দামোদর-দাসজী ও শ্রীমতী সুন্দরী দেবী এই ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরা বাঙ্গালী ছিলেন, একখানা পাথরে তাঁদের নাম লেখা আছে। ধর্ম্মশালায় ২ খানা ঘর। এক পার্শ্বে দোকানদার থাকার জন্য আরও একখানা ঘর। দোকানদারটী লোক ভাল। সে গ্রামেই থাকে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যেবেলা এসে কোন যাত্রী এসেছে কিনা খোঁজ নেয়, দরকার হলে চাল-ডাল প্রভৃতি দিয়ে যায়। তার ছেলেকে বাড়ীতে পাঠিয়ে কতকগুলি টাট্‌কা কাঁচকলা এনে আমাদের দিল। দ্বিপ্রহরে অরহর, উরদ মিশিয়ে ডাল ও কাঁচকলা-ভাজা দিয়ে খাওয়া গেল। নিকটেই ঝরণার জলে সুবিধামত স্নান করে গিয়েছিলাম। তারা সেই ঝরণার জল ইচ্ছামত নালা কেটে নিয়ে জমি চাষ কচ্ছে। আমাদের জিনিষাদি দিয়ে পিতা-পুত্রে জমির কাজে লেগে গেল। তারা জমি চাষ আবাদ কর্‌তে কোন সময়ের জন্যই আকাশের পানে তাকিয়ে থাকে না। আবশ্যক মত জমিতে জল দিয়ে নালা বন্ধ করে দিলেই অন্যদিকে জল চলে যায়। তাদের এ সব জমির কাজ দেখলাম। এ রকম সুন্দর জলের বন্দোবস্ত থাক্‌লে আজ বোধ হয় সোণার বাঙ্গলায় এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ হত না। তারা নিরক্ষর চাষা, তাই এত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কোন প্রকারে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌ছে। চাষ আবাদের অত সুবিধা থাক্‌তেও দেশটী খুবই গরীব বলে মনে হল। আমরা ধর্ম্মশালায় থাকার সময় কয়টী লোক ধর্ম্মশালায় এসেছিল। তাদের প্রত্যেকেরই জামা-কাপড় প্রভৃতি এত ছেঁড়া যে কি করে যে সেগুলির গায় দেয় বা পরে থাকে ভাব্‌বার বিষয় বটে! বাঙ্গালা দেশের অতি দীন-হীন ভীখারীর পোষাকও বোধ হয় তার চেয়ে উৎকৃষ্ট। এখানে জমি খুব, আবাদও খুব হচ্ছে, তা সত্ত্বেও অত গরীব কি করে হল, তাদের জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। সকলের সেই ভারতীয় সনাতন প্রথানুযায়ী কপালে হাত দিয়ে একমাত্র অদৃষ্টের জন্যই তাদের এ দুরবস্থা বুঝিয়ে দিলে! সে দুরদৃষ্ট-অদৃষ্ট যে তারা নিজেরা কচ্ছে

নিয়েছে, তা বোধ করি মুহূর্তের জন্যও তাদের চিন্তায় আসে না। সমস্ত হিমালয়ের মধ্যে এমন গরীব দেশ আর দেখিনি। একজন অতি বৃদ্ধ লোক এসে একটা জামা-কাপড়ের জন্য কান্না জুড়ে দিল। এ পার্ব্বত্য প্রদেশে আমরা কাপড় কোথায় পাব বললাম। কিন্তু বুঝিয়ে দিলে, তার মত গরীব এ দেশে কেউ নাই, অধিকন্তু সে বৃদ্ধ হয়েছে, তার কিছু করবার শক্তি নাই। তার দুরবস্থা দেখে আমাদেরও খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার একটা হাফ-হাতা জামা ছিল, সেই পুরাতন জামা ও একখানা পুরাতন কাপড় তাকে দিয়ে দিলাম। সেটা হয়ত মাসখানেক মাত্র ব্যবহার করতে পারতাম। সেই পুরাতন কাপড় জামা পেয়েই বেচারা এত আনন্দিত হয়েছিল যে বলবার নয়। (ক্রমশঃ)

দুটো কথা

——(:*:)——

বাহিরটা অন্তরটাকে গড়ে তুলবার পক্ষে যে কি পরিমাণ সাহায্য করে, সে কথা আর বলবার নয়। ঠিক যেমন ক্ষিদের সময় একগ্রাস অন্ন পেটে পড়ামাত্রই প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে যায়, তেমনি আমাদের এই মুহূর্তের চেষ্টা বা চিন্তা পরমুহূর্তেই ফল প্রসব করে; আমাদের দৃষ্টি সূক্ষ্মানুভাবী নয় বলে আমরা সেটা সাধারণতঃ বুঝতে পারি না। এই জন্যই একবার ভাঙ্গন ধরলে তাকে টিকিয়ে রাখা বড় কঠিন হয়ে উঠে। ব্রহ্মচারীকে প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকতে হবে। প্রত্যেক কাজের গোড়ায় অন্তরাত্মাকে প্রশ্ন করতে হবে, মহারাজ, তুমি এ কাজে অনুমোদন করছ তো—প্রসন্ন আছ তো রাজা? তিনি যদি প্রসন্ন মনে হুকুম দেন, তবেই আর ভয় নাই। কিন্তু তাঁর হুকুম শোনবার জন্য ধৈর্য্য-বীর্য্যের কত প্রয়োজন।

অতীতের মর্ম্মদাহী স্মৃতি কখন জোর ধরে জান? যখন দুশ্চরিতে ডুবে যাও। ওই তো সংস্কার। তোমার দর্শনশাস্ত্রও বলবে, স্মৃতি সংস্কার ছাড়া তো আর কিছু নয়। যা করেছ, তা যেন তোমার পেছনে পেছনে ছুটছে, এতদুর ছুটে এসেও তার ছায়ায় বিভীষিকা দূর করতে পারছ না। কেন? —না তুমি বীর্য্যহীন বলে। যে রকম কাজ করেছ আগে, সেই রকম কাজ আবার করে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছ, একটা আবর্ত্ত রচনা করেছ; এখন তার টানে শুধু তোমারই অতীত কেন," বিশ্বের যত অশুভ কর্ম্মীর কর্ম্মফলের বোঝা এসে তোমায় চেপে ধরবে। শোন গুরুমুখী বাণী—"যখন যেমন চিন্তা করবে, ঠিক সেই রকম ভাবগুলো এসে বাইরে থেকে তোমায় সাহায্য করবে। যদি অধঃপাতে যাবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলে ওই সব অসৎ শক্তিই এসে তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে নরকের পথ আরও পরিষ্কার করে দেবে। আর শুভ চিন্তা করলে তেমনি শুভ চিন্তাগুলো এসে সহায় হবে। দ্বন্দ্বটা সাময়িক—ওইটাই সত্য নয়। উঠ্‌ছ বা গড়িয়ে পড়ছ, এইটাই হল আসল কথা।"

বাস্তবিক দ্বন্দ্বটা তো একটা বিকল্প অনুভূতি মাত্র। অথচ ওটাকেই আমরা খুব পাকা বলে মনে করি, আর তাতেই সংশয় আরো বেড়ে যায়। কিন্তু উঠ্‌ছি বা পড়ছি, এই একটা বিশ্বাস যদি দৃঢ় থাকে, প্রত্যেক কাজের ফলকে

ওঠা বা নামার কোঠায় ভাগ করি, সংশয়ের দোলায় না ছলিয়ে রাখি, তাহলে জীবনপথে চলবার মত একটা মস্ত সহায় ও বল পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা দ্বন্দ্বকেই একান্ত ভাবে স্বীকার করে দিন দিন সংশয়বাদীই হয়ে উঠ্‌ছি; তাতে উত্থানেও উৎসাহ পাচ্ছি না, পতনেও চেতনা হচ্ছে না। "দ্বন্দ্ব ক্ষণিকের, জয় বা পরাজয়ই মর্ম্মান্তিক সত্য" এই কথাটা বিশেষ করে ধারণা করতে হবে।

আর চাই নিয়মে নিষ্ঠা। শুভকর্ম্মের প্রেরণা সব সময়েই আস্‌ছে। সংযত হয়ে তাকে গ্রহণ করতে হবে। উচ্ছ্বাসে অনেকটা এগিয়ে গেলে হাঁপিয়ে পড়তেই হয়, তখন আর নূতন চেষ্টার সাহস থাকে না। আবার অশুভ কর্ম্মের পাকে জড়িয়ে পড়লে বা অলস হয়ে বসে থাক্‌লে প্রমাদ তো অনিবার্য্য। এই কথাটী মনে রাখতে হবে।

ধর্ম্মের বাবুয়ানী ছাড়। খুব সরল ভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে সুরু কর। গেঁয়ো লোক যেমন করে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে, তেমনি করে কর। আহার-বিহারে আরাধনা চলুক। কারু অনুরক্তি-বিরক্তি তোমারি লক্ষ্য নয়। চাই আত্মার তুষ্টি। মরণকে ভয় করো না; কোনও অবস্থাতেই ভ্রূক্ষেপ করো না। তোমার চারপাশে সব হেল্‌ছে-ছুল্‌ছে, কিন্তু তুমি বসে আছ আপন আসনে অবিচল হয়ে; আর দেখছ, আজ এক রকম, কাল একরম! নিত্য নূতন খেলা। দেখ্‌বি মজা—থামিস্‌ না কোথাও; থমকে দাঁড়ালেই পেছনের ভিড়ের চাপে হুমড়ি খেয়ে পড়বি।

কেবল অফুরন্ত প্রাণের বেগে সমুখপানে ঠেলে চল। আপাততঃ Plan আঁকা, ছক্‌ পাতা, কিছু দিন বন্ধ রেখেই দেখ না। কেবল সারা দিন একটা না একটা কিছু করা—এই নিয়ে থাক। তারপর যখন দেখবে অবিরাম কাজ করাটা অভ্যাস হয়ে গেছে তখন ছক্‌ করো; নইলে কেবল ছক্‌ করতে করতেই বুড়ো হয়ে যাবে, অথচ কাজ কিছুই হবে না।

কিন্তু মনে রেখো, ছক্‌ বর্জ্জন করতে বলছি, বাইরের কাজে; তোমার অন্তরের কাজে নয়। সেখানে চাই, একটা কঠোর নিয়মের অনুবর্ত্তন। তার ত্রুটী হলে জবাবদিহী নাই, আছে স্বেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ। তোমাকে দুঃখ দেবার মালিক তুমিই; আর নিজকে দুঃখ দিতেই হবে—নইলে কোনদিন বড় হতে পারবে না। জানই তো যারা পরাধীন তারা দুঃখী। তেমনি পরাধীন অর্থাৎ আত্মার অধীন করে রাখ্‌তে হবে। তোমার এই দেহকে, ইন্দ্রিয়কে মনকে। পরমাত্মা সম্রাট, তাঁর রাজ্যবিস্তারের ভার তোমার ওপরই; দেহে, ইন্দ্রিয়ে, মনে বুদ্ধিতে ক্রমেই তাঁর সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়বে। এই রাজ্যবিস্তার হয়ত সামে হবে না, দানে হবে না—কঠোর দণ্ডনীতি অবলম্বন করতে হবে। প্রথমতঃ ওরা বিদ্রোহ করবে, দুঃখ পাবে। তা পাক্‌ কিন্তু পরাধীনতার আর একটা সুখ আছে শরণাগতিতে। সেই সুখের অধিকারী করবার দরুণই ওদের ওপর বিধিমত পীড়ন চালাতে হবে।

আর খাঁটী থাকবে দেহে আর মনে। এক-বিন্দু বীর্য্য, একটা রাজার রাজত্বের সমান। আর মনের অনুরাগে তা টলে পড়ে। তাই বলি, মনটা নিস্তরঙ্গ রাখ, দেশ-কাল-পাত্রের সব চিন্তা ভুলে যাও—একেবারে নির্বাত নিষ্কম্প হয়ে যাও। তবে বীর্য্যলাভ হবে।

ভাব থাক্‌, ওরে থাক্‌। অভাব ঘুচলে ভাব আপনি আসবে। এখন কেবল প্রাণের সমস্ত চেষ্টা দিয়ে আপনাকে ধুয়ে মুছে তোল্‌। মনের আয়নাখানা ঘসে ঝক্‌ঝকে করে তোল্‌ দেখি, বিশ্বতোজ্যোতিঃর আলো তাতে ঠিকরে পড়ে

কিনা? ভাব দিয়ে যাকে চাস, তাকে ধরবি কি দিয়ে? এই দেহ মন দিয়ে তো মাটীর ঢেলাকেই আঁকড়ে ধরা চলে, চিন্ময়ী প্রতিমার নাগাল কি পাওয়া যায়? সব শূন্য হলে পরে পূর্ণ হয়ে বসবে সে। সে যে অগমপুরীতে আঁধারের বাসর। কিছু না থাকলেও কিছু থাকে, এই বোধ যতদিন পাকা না হচ্ছে, ততদিন ভাবের দরুণ ঝাঁপাঝাঁপি করে কেবল অভাবের খাদেই গড়িয়ে পড়ি।

এই কথাটা মনে রাখতে হবে, সংযম ছাড়া পথ নাই। অসংযমের শাস্তি পদে পদে। সোজাসুজি ব্যভিচার করাকে সহজ সাধন বলে না। সহজ অবস্থা আসে পরিপাকের পর। যেমন আলুসিদ্ধ বা বেগুনসিদ্ধ; বাইরের আকার ঠিকই আছে—কিন্তু ভিতরে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। কাঁচা অবস্থায় থেঁৎলে নরম করলে তাকে সিদ্ধ বলে না। সিদ্ধ করতে হলে তাপ চাই। দেহে ইন্দ্রিয়ে মনে তাপ দেওয়া চাই, তবে না ওদের ভিতর নরম হয়ে সিদ্ধ হবে।

আচার

আচার হচ্ছে ধর্ম্মের বহিরঙ্গ রূপ। ধর্ম্মের তত্ত্ব "নিহিতং গুহায়াং," তাই বাইরেরও আচার দেখেই আমরা সাধুপন্থা বিনির্ণয় করি। এই কথাটিই গীতায় বলা হয়েছে—

> যদ্‌যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
> স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

এ সংসার অনুবর্ত্তক মাত্র। সকলেরই একটা কিছু স্বাধীনতা নাই। সবাই স্বাধীন হলে রাজ্য অরাজক হয়। তাই সাধারণকে শ্রেষ্ঠজনের অনুবর্ত্তন করে চলতে হবে।

তাঁর ভিতরে যে আনন্দ, সেই আনন্দকে আমারো ভিতরে পাব, এইজন্যই মানুষ অতিমানুষের কাছে ছুটে এসেছে। তার প্রাণে ব্যাকুলতা আছে, উদ্যম আছে, শক্তির সব রকম পরিচয়ই সে দিতে পারে; কিন্তু সে পথ জানে না। কোন পথে চললে সে আনন্দ পাবে, এ নির্দ্দেশ নিজের মধ্যে না পাওয়া পর্য্যন্তই তার পক্ষে আচারের প্রয়োজনীয়তা। দিশাহারা জীবন-তরীকে এক পথে চালাবার দরুণ যে শ্রেষ্ঠ জনের আদেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ তাই হচ্ছে আচার। আচার কর্ম্ম-জগতের সত্য—ধর্ম্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত। আমার ধর্ম্ম যতদিন আমি জানি না, ততদিন মহাজন নির্দ্দিষ্ট আচার পালন দ্বারাই ধর্ম্মসাম্য রাখতে হবে।

কখন কোন্ ক্ষেত্রে কি করলে যে ধর্ম্ম হয়, আর কি করলে অধর্ম্ম হয়, দৈনন্দিন জীবনে এ এক সমস্যা। নিয়মের পর নিয়ম মানুষ সরল বিশ্বাসে স্বীকার করে নিচ্ছে, নিজের একটা অস্ফুট সার্থকতার প্রত্যাশায়—তার জ্ঞাত-অজ্ঞাত সকল রকম প্রচেষ্টারই একান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সে ধর্ম্মলাভ করবে। ধর্ম্ম অর্থাৎ যা তার প্রাণ, যা না হলে তার চলে না; কিন্তু সে জিনিষটাকে কি সবাই আমরা চিনি? ধর্ম্মকে জানি না—আমাদের মুখ দিয়ে এই কথাই বের হওয়া উচিত। ধর্ম্ম কি, তা যে দিন বুঝব, সে দিন থেকে আর অধীনতার প্রয়োজন থাকবে না। অধীনতার উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্বাধীনতা লাভ; যে ছোট

সে বড়র কাছ থেকে তার অভাব পূরণ করে নেবে, এই জন্যই ছোটকে বড়র অধীন হতে হয়। বড়র অধীন হয়ে ছোট যা করে নির্ভরশীল হৃদয়ে, তাই তার পক্ষে ধর্ম্মানুগত আচার।

ধর্ম্মের অনুগমনই যথার্থ আচার। শ্রেষ্ঠজন ধর্ম্ম-বলেই শ্রেষ্ঠ। যার যা বল, তা তার আচরণে প্রকাশ পায়। জগতের শ্রেষ্ঠজনেরা চলেছেন ধর্ম্মকে লক্ষ্য করে, আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম সব সময় বুঝি না; তাই আমরা চলেছি তাঁদের লক্ষ্য করে। তাঁদের কি লক্ষ্য করবার ক্ষমতা আমাদের আছে? তাঁদের চালচলন, তাঁদের ভাবভঙ্গী, শ্রীমুখের দুটী কথা, ইত্যাদিতে যতটুকু আমাদের শক্তি, ততটুকু দিয়েই তাঁদের আমরা গ্রহণ করছি। নিজের উচ্ছৃঙ্খলতাকে শান্ত করে আনছি তাঁদের দেখাদেখি; অন্তরের ধর্ম যদি এমনি করে তাঁদের বাহিরাচারে প্রকাশ না পেত, তবে আমরা জীবনের আদর্শ পেতাম কোথায়?

এই যে অপরের মাঝ থেকে আদর্শ খুঁজে নিতে হয়, নিজের মাঝে তা অনুভব করি না—এর মূলে কারণ রয়েছে মোহ বা স্বার্থপরতা। নিজের ভাল-মন্দ যে আমরা বেশ বুঝি, আমাদের স্বার্থপরতাই তা প্রমাণ করে দেয়। "পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং" এটী বাস্তবিকই খুব সহজ কাজ; অতি বোকা মানুষটীও পরের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে রায় দিবার সময় অনেক বুদ্ধি হাৎড়িয়ে পায়। কেউ যদি উপদেশ চায় তো তাকে ঝুড়ি ঝুড়ি বচন তাকে শুনিয়ে দিতে পারব, আর তাই শুনে লোকে স্তম্ভিত হয়ে যাবে; বচন দিয়ে এক-রকম হিপ্নোটাইজ্ই করে ফেলি আমরা মানুষকে। এই করলে "জীবন পূর্ণ হবে" আর ঐ করলে হবে না —এ জল্পনা প্রত্যেকেরই আছে, কিন্তু সে যেন পর-হস্তগত ধনের মত—কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্—এক একটা ব্যাপার জীবনে এমন এসে যায়, যখন সবি ঘুলিয়ে গিয়ে হিতাহিতবোধ থেকেও থাকে না। এই বোধহীনতাটাই হচ্ছে মোহ—এর মূলে স্বার্থান্ধতা। বুঝেও বুঝ্ছি না, অশেষ ধর্মকথা পরকে শুনিয়ে তার মন ভোলাতে পারছি কিন্তু নিজকে শোনাতে পারছি না, আদর্শকে জেনেশুনেও কর্মে বা আচরণে ফুটিয়ে তুলতে পারছি না—এই তো হৃদয়ের অন্ধকার। এই অন্ধকার দূর করবার জন্যই তো মহাজনদের কাছে গিয়ে পথের আলো খুঁজে নেওয়া। তাঁদের জীবনই আমাদের পথের আলো। সেই আলোতে পথ চলাই হল যথার্থ আচার।

স্পষ্টই তো দেখ্ছি, অনেক জেনেশুনেও কিছু হচ্ছে না—অন্ধ হয়ে নিজের খেয়ালখুসীকে নিয়েই চল্ছি, কর্ম্মবিহীন ভাবুকতায় নির্বুদ্ধিতার কস্রতই বাড়ছে, আর আত্মসুখ আঁকড়ে থাকতে থাকতে মন নিস্তেজ ও কৃপণ হয়ে আস্ছে, দেহ আলস্য-জড়তার পায়ে আত্মবিক্রয় সুরু করেছে। এরি নাম ভাবের ঘরে চুরী। এই করে করে জীবনকে শেষ পর্য্যন্ত সামাল দেওয়া যাবে না। শুধু ভাবে-ভাবে নয়, হাতে-কলমে কিছু করাই চাই।—তা না করা পর্য্যন্ত হয়ত সুখ পেলে পেতেও পার, কিন্তু সোয়াস্তি কিছুতেই হবে না। স্বেচ্ছায় দুঃখকে মেনে নিতে হবে, নিজকে নিজে খাটাতে হবে। এই হচ্ছে শ্রেয়ের পথ।

অনেকখানি বুঝেও এতটুকুও না করার চেয়ে, এতটুকু বুঝে এতটুকু করাই শ্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃপথের অনুবর্ত্তনই আচার। ধর্মসুবাসিত কর্ম্মই হল আচার। অন্ধ প্রাকৃত নিয়মের বশে যা করে যাই, তা আচার নয়, আচার হচ্ছে স্ববশ কর্ম্ম।

জীবন কিসে সার্থক হবে, তা জানি না, তবু আভাসে কতকটা বুঝি, আর বাকীটুকু শুনি মহাজনের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীতে; দুটোয় জড়িয়ে আমার ধর্ম সম্বন্ধে আমার যে আশা-আশঙ্কা বিজড়িত অস্পষ্ট আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষা, তাই হবে আমার আচরণের প্রাণ। প্রকৃতির উপর আত্মশক্তিকে জয়ী করাই হল আচারের আলম্বন।

আমি ভাল নই, কিন্তু ভাল হতে চাই। যেদিকে ভাল হয়ে গিয়েছি, সেদিক দিয়ে আমি ধার্ম্মিক; আর যেদিক দিয়ে হচ্ছি বা হতে চেষ্টা আছে, অন্ততঃ হতে ইচ্ছাও আছে, সেদিক দিয়েই আমি আচারবান্ হয়ে থাক্‌ব।

"আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়"—এখানেও আচার শব্দের উল্লেখ পাই। এও গীতার ঐ শ্লোকটীর প্রতিধ্বনিমাত্র। সুতরাং ক্ষুদ্রের জন্য মহতের যে আত্মত্যাগ, তাকেও বল্‌তে পারি—আচার। শ্রেষ্ঠ জনের আচরণ নিঃস্বার্থ; কাজেই আমাদের জীবনেও নিঃস্বার্থ কর্ম্মই দরকার। সমাজের জন্য আমার যা কর্ত্তব্য, আমার যে আত্মত্যাগে জগৎবাসীর হিত হবে, তাই আমার পক্ষে আচার।

মহাজনেরা কখনও বলেন না যে অন্ধ হয়ে তোরা আমার অনুবর্ত্তন কর্। বরং তাঁরা বলেন, "যতটুকু কর্‌বি, বুঝে কর্;—নিতান্তই বুঝ্‌তে না পারিস্, কথায় বিশ্বাস কর্।" বিশ্বাস করে যার দ্বন্দ্ব দ্বিধা না গেল, তার বিশ্বাস হয়ই নি। স্বেচ্ছায় মহাজনানুগত হয়ে আপন গরজে শৃঙ্খলাকে মেনে নিয়ে চল্‌তে হবে। সকলের ভিতর আত্মা জেগে উঠুন—যাবতীয় ধর্মনীতি এই প্রেরণাতেই সঞ্জীবিত থাকে। আত্মাকে জাগিয়ে রেখে চল্‌তে গিয়েই আমরা আচারশীল হই। গতানুগতিক কর্ম্মপ্রবাহকে আচার বলি না। আচারের সংজ্ঞা হচ্ছে আত্মকর্ত্তৃত্বের দিক থেকে। যে কর্‌ছে, তার মন-প্রাণ × ধর্ম্মকর্ম্ম = আচার।

প্রত্যেকের জীবনেরই একটা বিশেষ দুর্ব্বলতা থাকে। সেটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠি। বিশেষ প্রণিধান করে দেখলেই বোঝা যায় যে একটা দুর্ব্বলতা মূলে থেকে আর আর গুলিকে টেনে আন্‌ছে। উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর হচ্ছি, ঐ দুর্ব্বলতা দিয়েই তা বুঝতে পার্‌ব। সাংখ্যে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের যে বিবেক অর্থাৎ নিজের সঙ্গে নিজের যে লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে, নিজেদের জীবনে তা খাটাবার সূত্র এইখানেই পাই। আমার যা বিশেষ দুর্ব্বলতা, তাকে প্রকৃতির প্রতীক্ ধরে নিয়ে লড়াই সুরু কর্‌তে হবে। দুর্ব্বলতা জয় হলেই প্রকৃতি বশ। বশ করা মানেই অটল থাকা। যে প্রবৃত্তি তোমাকে পেড়ে রেখেছে, তাকেই তুমি পেড়ে রাখলে, অথবা তার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ রইলে, এরি নাম বিবিক্ত থাকা —অর্থাৎ তোমার উপর তার আর কোন অধিকার রইল না, সে তোমাতে থেকেও আলাদা হয়ে বশ হয়ে রইল। জীবনটাকে বিশৃঙ্খল করে রাখলে প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই কর্‌বে কি নিয়ে? যাতে জীবন সুশৃঙ্খল, সমঞ্জস, সুডৌল হয়, তাই আচার।

এই দিক দিয়ে বল্‌তে গেলে প্রত্যেকের আচার প্রত্যেক হতে আলাদা। তোমার যা ধর্ম্ম, আমার তা নাও হতে পারে। কিন্তু কথাটা অধিকারীভেদের সূচক। আজ হয়ত আমি তোমা হতে আলাদা; কিন্তু একথা ঠিক জানবে যে তোমার অবস্থা পার হয়েই তবে আমার অবস্থায় আমি এসেছি; আবার আমার অবস্থা তোমারও হবে। স্তরভেদে সবরকম অবস্থাই সকলকে পেতে হয়। জগতে কেউ ঠকে না, সবার পাতেই সব পড়ে। এইটাকেই রূপকে বলা হয়—চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ। জ্ঞানী জানেন, এই একটা জীবনই বিশ্বজীবনের অনুভূতিকেন্দ্র। সুতরাং আচারে বিভিন্নতাটাকে বৈষম্য বল্‌তে পারি না; বরং বলি—সুষমাপূর্ণ বৈচিত্র্য। আচারে বৈচিত্র্য না রাখলে ব্যক্তিগত সাধনার ভিত্তি থাকত না; আর ব্যষ্টিজীবন সার্থকতামণ্ডিত না হলে সমষ্টিতে শক্তি জাগে না। যে সংঘের প্রত্যেক ব্যক্তিই আত্মোন্নতি-পরায়ণ নয়, সে সংঘে কাজ নিয়ে কেবল ঠেলাঠেলি আর হট্টগোলই সার—সত্যিকার কিছু পাবার আশা সেখানে নাই। প্রত্যেকের নিজ নিজ পালনীয় কর্ত্তব্য বা আচারে শৈথিল্যই কি সংঘের বা সমাজের অধঃপতনের কারণ নয়?

দশ জনে মিলে একটা নিয়ম আমার ঘাড়ে

চাপিয়ে দিচ্ছে, সেইটাকেই কিন্তু প্রাণবন্ত আচার বল্‌ব না; আত্মহিতকে কেন্দ্র রেখে আমারই যে সংঘহিতকল্পে স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ, যে আচরণ আত্মনো মোক্ষার্থং, আবার জগদ্ধিতায় চ, যাতে অজ্ঞজনের বুদ্ধিভেদ জন্মায় না এবং দশ জনের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে তোলে না—তাই যথার্থ আচার। এর মূলে থাকবে আত্মজ্ঞান, আত্মতৃপ্তি—শ্রেয়ো বিধাযুক্ত সৌহার্দ্দ্য। আমার ইচ্ছায় আমি সাধু হয়েছি—আত্ম-ইচ্ছারই চরম বিকাশ চাই; এ নইলে সাধুত্বের কোন তাৎপর্য্যই থাকে না। আচারের মূলেও থাকবে তেমনি শুভেচ্ছাবাহক জাগ্রত হৃদয়—আচার্য্যের হৃদয়। আমার আচার বিশ্বের বরেণ্য এবং আচরণীয়, সেই আচারে প্রতিষ্ঠালাভই আমার আচার্য্যত্ব। আচার ভ্রষ্ট হলেই ধর্ম্ম অঙ্গহীন জড়তা-স্তূপে পরিণত হয়। আলস্য ও জড়তার বশে আচারকে অবহেলা করে দেখেছি—অনুভব নিস্তেজ হয়ে আসে।

দশের মন এমনি জিনিষ, মহাজনেরা পর্য্যন্ত তা হতে রেহাই নিতে চাননি। তাঁদেরও এ হিসাব রেখে চল্‌তে হয় যে অজ্ঞের বুদ্ধিভেদ জন্মালাম কিনা, লোকসংগ্রহের বিঘ্ন ঘটালাম কিনা, তাঁকে ভুল বুঝে কেউ ভুল পথে পা বাড়িয়ে নিজেরই ক্ষতি করল কিনা। যতদিন সমাজ আছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আছে, ততদিনই আচার আছে; স্বেচ্ছাচারী হলে প্রকৃতি তাকে সহ্য করে না—বার বার আঘাত দিয়ে তাকে আবার মহাজনানুগত পন্থায় ফিরিয়ে আনে। প্রাকৃত নিয়মের ব্যতিক্রম নাই; সুতরাং মানুষকেও যেখানে প্রকৃতির সহায় নিয়ে চল্‌তে হবে, সেখানে নিয়তাচারী, সদাচারী হতে হবে। তাল মান বিহীন সঙ্গীত হয় না, তেমনি আচারাবহীন ধর্ম্মও হতে পারে না। মানুষ অন্তরে যা পেয়েছে, তা বাইরে না দিয়ে পার্‌বে না; দিতে হলেই একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রীতিতে দিতে হবে। আত্মজীবন বিসর্জ্জনের সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রীতিই হচ্ছে আচার।

বাক্যের যেমন স্ফোট, মানবজীবনে তেমনি ধর্ম্ম। কার স্বধর্ম্ম যে কি, তা কে বলে দেবে? স্বধর্ম্মনিরূপণ—এ হচ্ছে জীবনের সেরা সমস্যা। ধর্ম্ম চিররহস্যে আবৃত। যিনি যতটুকু পাচ্ছেন, জগৎকে দিয়ে যাচ্ছেন, সেই নির্দ্দেশে জগৎ চল্‌ছে—কিন্তু কেউ বল্‌তে পার্‌বে না—ধর্ম্মের স্বরূপ এই বা ঠিক এই কর্‌লেই তোমার স্বধর্ম্ম রক্ষা হবে। তা বলাও যায় না। জগতে বাইর থেকে কিছু পাবার কোথাও নাই—প্রত্যেককে আত্মান্বেষী হয়ে নিজের স্বধর্ম্ম চিনে নিতে হবে। কেননা পরধর্ম্ম ভয়াবহ। প্রকৃতির আইনে পরধর্ম্মকে হজম করে ফেল্‌বারও কোন উপায় নাই—ঘা খেয়ে খেয়ে সবাইকে আত্মনিষ্ঠ হতেই হবে। স্বধর্ম্মকে জান্‌তে হলেও আচারের প্রয়োজন, পর-ধর্ম্মকে নিরুদ্বিগ্ন রাখবার জন্যও আচারের প্রয়োজন। আচার হচ্ছে আমাতে এবং বিশ্বে ভাব বিনিময়ের সেতু।

বুদ্ধদেব ব্রহ্ম সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে অর্থাৎ কোন রহস্যময় সমাধান সম্বন্ধে নির্ব্বাক্ থাক্‌তেন; জীবনের অভাব মিটাবার দরুণ কেউ তাঁর কাছে এলে তিনি আগেই খোঁজ নিতেন, সে আচারে খাঁটী কিনা; প্রশ্ন কর্‌তেন তুমি শীলবান্ হয়েছ কিনা—প্রবৃত্তিপরতন্ত্র ভোগবাসনোদ্দাম জীবনের নেতা হতে পেরেছ কিনা? অন্তরে কিছু পেলাম কি না পেলাম, সেটা বিচার জগতের উর্দ্ধে, সুতরাং ধরে নিলাম সেটা শূন্য; আমার পূর্ণতার যাচাই হবে এই দিক দিয়ে যে, আমি যে ভাবে চল্‌ছি, তাতে জগৎ অক্ষুব্ধ থাক্‌ছে কিনা। উপকার কর্‌বার অভিমান ছেড়ে দিতে হবে, অপকার না করে চল্‌তে পেরেছি কিনা, এইটাই হল বিচার্য্য। বুদ্ধদেব "শূন্য" বলে জীবনের অন্তঃসত্তাকে অগ্রাহ্য করেন নি; অনধিকারীর পক্ষে ও সব শূন্যই বটে। শীলবান্ হতে পারলে, আচার-নিষ্ঠ হতে পারলে তখন মানুষ নিজেই বুঝতে পারবে, তার অন্তর শূন্য কি পূর্ণ—ভগবান্ আছেন কি নাই। শেষের গৎটা আগেই বাজাতে গিয়ে চালাক মানুষ

নিজের ক্ষতি করে। জীবনের প্র্যাকৃটিক্যাল দিকটা সাধককে ধরতে হবে, তাই হচ্ছে আচার—আত্মবিচারে তার প্রতিষ্ঠা, দশজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যে তার সার্থকতা, আর আত্মপ্রসাদে তার পুষ্টি। নিজের নিয়তির নিয়ন্তা হতে পারে মানুষ—শুধু পবিত্র আচরণের গুণে। বুদ্ধদেব নিজের জীবন দিয়ে এ আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সেই পঞ্চশীলের কথা, সংঘ গঠনের কাহিনী, ঘরে ঘরে নীরবে জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটী পর্য্যন্ত নিজকে বিলিয়ে দিয়ে সত্য প্রচারের অক্লান্ত চেষ্টা—এ সব কাহিনী যখনি মনে পড়ে, তখনি মুক্ত-কণ্ঠে সাধক-জীবনের একান্ত আশ্রয় আচারের জয়গান না করে পারি না।

"সঙ্ঘ-শক্তিঃ কলৌ---"

——(::)——

ভারতের বৈশিষ্ট্য কোথায়?—তার আধ্যাত্মিকতায়। হাজার হাজার বছর ধরে ভারত পরাধীন থাকা সত্ত্বেও আজও ভারতের জাতির মেরুদণ্ড দৃঢ় আছে। ভারতসন্তানগণ শক্তিসাধক। শক্তি-সাধনা ভারতে অতি পুরাতন। এই জগতের প্রতি অণু-পরমাণুতে ভারত-সন্তানগণ শক্তির খেলা দেখ্‌তে পেয়েছিল, শক্তির সাধনায় ভারত সন্তানগণ শক্তিকে আয়ত্ত করতে পেরেছিল। তার প্রমাণ ভারতের শিলা-পাথরে পাতার মর্ম্মরে মর্ম্মরে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—আজও হচ্ছে। হিমালয়ের উচ্চ শিখরে শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্য মধ্যে যে বেদধ্বনি ঋষির কলকণ্ঠে নিনাদিত হয়েছিল, আজও তা ভারতের বনে-প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ভারতসন্তানগণ শক্তির বরপুত্র। যখন জগত নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন ভারত জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে জগৎকে নূতন প্রাণে নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াস পেয়েছিল। শক্তিবলে বলীয়ান্ ভারত-সন্তানগণ এই মরজগতের মধ্যে স্বর্গের পারিজাতের সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীরণ করেছিল। একদিকে বেদ, অপর দিকে কর্ম্ম উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে পেরেছিল ভারত। গীতায়ও কর্ম্মকাণ্ডের পরেই জ্ঞানকাণ্ড দেখ্‌তে পাই। গীতায় হল সর্ব্বোপনিষদের সার। এর বক্তা হলেন স্বয়ং পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণ, আর শ্রোতা কৃষ্ণ-সখা পার্থ। মোহের বশবর্ত্তী হয়ে কৃষ্ণ সখা পার্থ কর্ম্মে বা কর্ত্তব্যে অবহেলা দেখিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের উপদেশচ্ছলে গীতার অবতারণা করেছেন। প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ মোহকে অপসারিত করে অর্জ্জুনের বৈরাগ্য উৎপাদন করবার প্রয়াস পেয়েছেন। দুর্য্যোধনাদি মোহে অন্ধ হয়ে আত্ম-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে স্বার্থান্ধ হয়ে জ্ঞাতিবধের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত। তাই পার্থ-সখা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেও ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবার প্রয়াস পেলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আত্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বলেছিলেন, এতে তোমার লাভালাভ জয়াজয় কিছু নেই। এই যুদ্ধে মৃত্যু হলে তোমার অক্ষয় স্বর্গ লাভ, জয়লাভ হলেও তোমার হর্ষ-বিষাদের কোনো কারণ নেই বা জ্ঞাতি বধের জন্যে কোনো পাপ নেই। আত্মা হননও করে না বা নিজেও হত হন না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মমার্গের সঙ্গেই জ্ঞানমার্গের অবতারণা করেছেন।

কর্ম্ম ছাড়া জ্ঞানের কোনো খোঁজ মিলে না। কর্ম্মকে বাদ দিয়ে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। অর্থাৎ

ঠিক ধর্‌তে গেলে আধার-আধেয়ের সম্পর্ক। বল্‌তে গেলে যেমন বায়ু সর্ব্বত্র বইছে, কিন্তু যখন গাছ-পাতা নড়ছে, তখনই বলা যায়, বায়ু বইছে। কর্ম্মের ভিতর দিয়েই জ্ঞানকাণ্ডে উত্তীর্ণ হবার পন্থা গীতায় রয়েছে। বেদেও কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড দুইই রয়েছে। বেদ আর গীতাকে খাটো নজরে দেখলে সত্যকেই খাটো করা হয়। কর্ম্মকে বাদ দিয়ে ভারত কোনো দিন অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হয়নি; কর্ম্মের ভিতরদিয়েই ভারত ত্যাগের পথ ধর্‌তে পেরেছিল। তাই আমরা দেখ্‌তে পাই পরমহংসাগ্রগণ্য চিরমুক্ত শুকদেবের গুরু হয়েছিলেন কর্ম্মযোগী গৃহী জনক ঋষি।

কর্ম্মেই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। কর্ম্ম ছাড়া জীবজগৎ এক মুহূর্ত্তও থাকৃতে পারে না। বুদ্ধদেবও কর্ম্মের প্রাবল্য দেখিয়ে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ব্যষ্টিতে যা কর্ম্ম কর্‌তে হচ্ছে সমষ্টিতেও তাই দেখ্‌ছি। তাই সঙ্ঘের প্রয়োজন। গীতায় যেমন কর্ম্মকে বাদ দিয়ে জ্ঞানকে দেখাবার চাতুরী নেই, তেম্‌নি ব্যষ্টিকে বাদ দিয়ে সমষ্টির প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। সমষ্টিকে ছেড়েও ব্যষ্টির অস্তিত্ব থাকে না। ব্যষ্টিতে প্রাণে যে সাড়া পাওয়া যায় সমষ্টিতেও তাই। তাই বলি, সঙ্ঘশক্তিকে কর্ম্মের দিক দিয়ে দেখ্‌লে চেতনাবিহীন বললে চলে না। যেখানে, প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, যেখানে কর্ম্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়েছে সেই সঙ্ঘ-শক্তিকে বাইরের জড় পদার্থের সঙ্গে কি করে তুলনা করি? ব্যষ্টিতে যে অন্তরতম দেবতার কোমল পরশে পুলকের বিদ্যুৎ খেলে যায়, সমষ্টিতেও তারই সাড়া দেখ্‌তে পাই। এই সমষ্টি নিয়েই তো সঙ্ঘ-শক্তি। সেইখানেই তো প্রাণের মিলন, হৃদয়ের যোগাযোগ। ক্ষুদ্র ব্যষ্টিকে ছেড়েই সমষ্টিতে মিলন। এইখানেই অমৃতের আস্বাদ, আত্মতৃপ্তির পরিসমাপ্তি। সমষ্টিই ব্যষ্টিতে কর্ম্মরূপে ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগত কর্ম্মই হল সমষ্টির সেবা। আমরা উপরেই বলে এসেছি। অর্জ্জুনকে এই কর্ম্মের জন্যেই শ্রীকৃষ্ণ উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ভারতের জাতির ইহাই সাধনা।

সমস্ত জগৎ কর্ম্মডোরে বাঁধা। কর্ম্মের বন্ধনেই জীব জগৎ। কর্ম্মের দরুণই সমষ্টি থেকে ব্যষ্টিতে অবতরণ। কর্ম্মকে জড়ের সঙ্গে তুলনা করলে চলে না। যে শক্তি সঙ্ঘের মধ্যে খেলছে, ব্যষ্টিতে কর্ম্মের দ্বারা সেই শক্তিরই স্ফুরণ হচ্ছে। অর্থাৎ কর্ম্ম সঙ্ঘশক্তিরই নামান্তর মাত্র। তাই ভারত কর্ম্ম আর জ্ঞান সম্পূর্ণ পাশাপাশি জিনিষ বলে মনে করে এসেছে। পাতার এপিঠ আর ওপিঠ। ব্যষ্টি আর সমষ্টিও যে ইহাই, তা বলাই বাহুল্য।

বেদ আর গীতা কবির কল্পনা-প্রসূত নয়। এ ঋষির অতীন্দ্রিয় দর্শন। যেখানটায় ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্ব হারিয়ে যায়, যেখানটায় মানুষের কর্ম্মবন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে, যেখানটায় মানুষের বুভুক্ষু হৃদয়ের পিপাসা মিটে যায়, অমৃতের কবাট খুলে, সেই খান হতেই বেদ আর গীতার উদ্ভব।

সেবার দ্বারা চিত্তের মলিনতা দূর হয়। সেবায় জীবের অন্তর ধুয়ে সেবা-ধর্ম্মের অধিকারী করে শমরস হৃদয়ে স্ফুরিত করে। নিজকে অপরের মাঝে মিলিয়ে দেওয়াই জীবের পরিণত অবস্থা। সঙ্ঘ এই পরিণতির নামান্তর। তাই বলি ব্যষ্টিকে না ছাড়তে পারলে সমষ্টির সন্ধান পাওয়া যায় না! যেখানে গেলে আত্মতৃপ্তি হয়, অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায়, সঙ্ঘ সেইখানে আমাদের পৌঁছিয়ে দেয়। সঙ্ঘ শুধু বাইরের জিনিষ নয়। সঙ্ঘ-দেবতা অন্তরে বাইরে সর্ব্বত্র বিরাজ করছেন। ব্যক্তি বা অহং নাশে অমৃতের সন্ধান মিলে। ব্যষ্টির পূর্ণতা কর্ম্মে, আর সমষ্টির পূর্ণতা জ্ঞানে—উভয়ই এ আমারই অনুভবের দুইটী বিভাব। কর্ম্মে জ্ঞানে এই সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই ভারতের সনাতন জাতীয়তা। আমরা এই সনাতন ধর্ম্মেরই উপাসক।

ঋষি আরও বলেছেন, "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" ঋষি গাছের পাতার মর্ম্মরে, জগতের অণু-পরমাণুতে আকাশের বুক চিঁরে অপরোক্ষা অনুভূতিকে পেয়েছিলেন। সূক্ষ্মেরই প্রতীক্ স্থূল। তাই জীবের কর্ম্ম-শেষে স্বরূপ প্রাপ্তি। জীব রসের অনুভূতিতে ছুটাছুটী করছে। ওই তো তার স্বরূপে আকর্ষণ। তাই জীবের তপস্যা কর্ম্মরূপে প্রতিফলিত হচ্ছে। মানুষ আত্ম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য নীতির অনুসরণ করে চলে: তাই সঙ্ঘ মানুষের মাঝেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সঙ্ঘ যে বিরাটেরই প্রতীক্। ইহাই বুঝি মানব আধারের ভিতর দিয়েই ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ।

ঋষি বলেছেন, "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।" সত্যকে পেতে হলে হৃদয় দিয়েই পেতে হবে। হৃদয় শূন্য হলে সেখানে বুঝতে হবে স্বার্থের কলুষ রয়েছে। তাই জানি, সঙ্ঘে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রের বিসর্জ্জনে বড়কে পাওয়া। শ্রীগুরুর কাছেও আমরা ইহাই পাই। শ্রীগুরুর কাছে শিষ্যকে প্রপন্ন ভাব নিয়ে যেতে হয়। শূন্য কলসীতেই জল ভরাতে হয়। ওই শূন্য হৃদয়েই তো গুরুর কৃপা এসে হৃদয়-ক্ষেত্রকে উর্ব্বরা করে। তাই গুরুকেও তো হাত-পাওয়ালা মানুষ মাত্র বলা চলেনা। জীবের হৃদয়ে শ্রীগুরুর করুণাধারা ফল্গুনদীর মত বয়ে শুষ্ক হৃদয় সিক্ত করে দিচ্ছে। গুরু যে করুণা ও প্রেমের মূর্ত্তি।

তাই বলি, গুরু আর সঙ্ঘে কোনো তফাৎ দেখিনা। গুরু যদি প্রতি জীবহৃদয়ে চিন্ময়রূপে বিরাজ করে, সঙ্ঘের কি তার কোনো রূপ থাকতে পারে না? সঙ্ঘ যে শ্রীগুরুরই স্থূল রূপ। এই তো ব্যষ্টিকে নিয়ে সমষ্টির পরিপুষ্টি। ইহাই সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে বিবর্ত্তন, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে আবর্ত্তন। ইহাই বেদে ওঁকারে পর্য্যবসিত হয়েছে। ওঁকারেই নিখিল বিশ্ব সংহত। আমরা চাই ঐক্য, চাই মিলন, চাই সংহতি।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!!

একটু

আঁধার ঘেরা জীবন মাঝে
একটু আসে আলো,
ওরে, সেইটুকু্ই তোর ভালো!

একটুখানি আলোর বাধায়
আসতে নারে যম,
ওরে, সেইটুক্-ই কি কম!

তিলে তিলে দগ্ধে মরিস্
একটু আসে ঘুম,
সে যে জানায় তাঁরি চুম্!

বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে
একটু যে আশ্রয়—
করে সবকে পরাজয়!

একটী দিনের স্মৃতির রেখা
জীবনভরা বাজে—
তোরে জাগায় সকল কাজে!

সকল প্রাণের বিনিময়ে
একটুখানি হাসি—
মোরা তাই যে ভালবাসি!

তাই বলি মন ঠেলিস্ না রে
তুচ্ছ বলে মানি—
ওতো নয় রে একটুখানি!

"আনন্দে থেকো !"

জীবন-পথে অনেক বিক্ষোভ, অনেক অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়েছে; অতীতের অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি পড়লে, চিন্তায় উদ্বেগে চিত্ত ভারগ্রস্ত হয়ে যায়—তাই আজ বর্ষবিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর দেওয়া আশীর্ব্বচনটুকুই ধ্যান করব, জপ করব—"তোমরা আনন্দে থেকো।"

আর কিছু দিয়ে যাননি, শুধু অন্তরের মাঝে ওই কথার স্মৃতিটুকুই রেখে গিয়েছেন। আজ ঘাড়ের ওপর এত বোঝা এসে চেপেছে, এক এক সময়ে ভাবলে দিশেহারা হই—চারিদিকে অন্ধকার দেখি, কিন্তু তার মাঝে ওই যে বিদায়-কালীন আশীর্ব্বচনটী—"তোমরা আনন্দে থেকো"—এই আমার সম্বল, এই আমার মূলধন।

ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, দেহে মনে, প্রাণে, বাক্যে তাঁর শুভ ইচ্ছা বিকাশের পথে প্রতি পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছি, এক এক সময়ে আমারই মনে হয়েছে—এ পাপের না জানি কি গুরুতর প্রায়শ্চিত্তই বহন করতে হবে! অসার কল্পনা শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে, দোষ ত্রুটী অপরাধ সমস্ত ভুলে গিয়ে যাওয়ার সময় ঐ অমৃতময় বাণীটিই শুনিয়ে গেলেন!

পদে পদে আমরা আহত হব, কল্পনাতীত দুঃখে আমাদের পতিত হতে হবে—তবু আমাদের মুখে মলিনতার ছায়া পড়বে না। তিনি যা আশা করে-ছিলেন আমাদের কাছ থেকে পেতে, তা পেয়ে যাননি বলে জীবনকে ধিক্কার দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চল্‌বে না। আবার আমাদের জীবনকে আনন্দময় করে তুল্‌তে হবে। একবার অন্ততঃ তাঁকে প্রফুল্ল কর্‌বার আয়োজন আমাদের কর্‌তে হবেই হবে।

তিনি যা দিয়ে যান, তা আমরা ধরে রাখতে পারি না—এই আমাদের দুর্ভাগ্য, আর এই আমাদের বিপদ। আধার শুদ্ধি হয়ে ওঠেনি এখনি—ভাল ভাল জিনিষ রাখবার ভাল জায়গা চাই। গণ্ডগোলের মাঝে পড়ে, তাঁর প্রশান্ত মুখের প্রফুল্ল হাসিটুকু বিস্মৃত হয়ে যাই—খুব নিঃসহায় বলে অকূলে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকি। আমাদের ওপর এত কল্যাণ-শক্তি অজস্র ধারে বর্ষিত হচ্ছে, তবু বল্‌ছি—আমার মনের ময়লা কাট্‌ল না, ভারী বোঝা এতটুকুও হাল্কা হল না!

ওই কথার শক্তিতেই তো আমাদের বুক গর্ব্বে উঁচু হয়ে উঠবে। মিথ্যা গর্ব্ব নয়, মিথ্যা অভিনয় নয়; তিনি যে আমাদের মাঝে সত্যি সত্যি শক্তি-সঞ্চার করে গিয়েছেন। নির্ভয় চিত্ত, আর অসামান্য কর্ম্ম প্রচেষ্টায় তাঁর ভাবের রূপ দিব। আমরা যে কিছু পেয়েছি, তার পরিচয় দেব কাজে-কর্ম্মে। দুর্ভিক্ষ মহামারী এ সবের ভয়ে সবার চিত্ত শঙ্কাকুল, আমাদের কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি পত্তন করতে হবে ঐ ভয়াবহ স্থানে। ভয়ে যেখান থেকে সব পালিয়ে এসেছে, আমরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব সেই জায়গায়—কেননা তিনি যে আমাদের অভয় দিয়ে গিয়েছেন!

নিরাশ তো বরাবরই করে এসেছি—একবার তাঁকে আশা দিতে পারব না? তিনি বেশী কিছু প্রত্যাশা করেন না, আমরা আনন্দে সম্মিলিত হই, এই তাঁর ইচ্ছা। বিরুদ্ধাচরণ, বিরুদ্ধ-দলের সৃষ্টি করে শুভ ইচ্ছার মূলে কতবার কুঠারাঘাত করেছি, নির্ব্বিবাদে সকল জ্বালা তাঁর উন্নত হৃদয়ের মাঝে স্থান পেয়েছে—সে খবর আমরা কেউ রাখিনি। কেউ জানি না কতদিন আমাদেরই দরুণ দুঃসহ তপস্যায়, বিনিদ্র রজনীতে তাঁর কাল কেটে গিয়েছে।

অজ্ঞানে ছিলাম, বুঝি নাই, তাতে ক্ষতি ছিল না; এখন বুঝতে পেয়েও যদি অকৃতজ্ঞের মত উদাসী হয়ে থাকি, তবে কোনো জায়গায় গিয়ে শান্তি মিল্‌বে, এ কি আশা করা যায়?

তোমার প্রাণে অমন বল আছে, তুমি নিঃসন্দেহে বল্‌তে পার—"আমি তোমাদের জীবনের ভার নিলাম, তোমরা আমার কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে যাও।" শ্রীকৃষ্ণের মত সবাই এমন বল্‌তে পারে?—"সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এতগুলো জীবনের ভার নিয়েছেন তিনি—শুধু তোমরা তাঁর নির্দ্দেশে কাজ করে যাবে বলে! পদে পদে তোমাদের অবিশ্বাস, আর প্রবঞ্চনাময় ভাবের মূর্চ্ছায় তাকে আঘাত করে না কি? তবুও তিনি তোমাদের ক্ষমার চোখেই দেখছেন।

জাগ্‌তে হবে, আর ঘুমিয়ে থাক্‌বার সময় নেই; ভাবনা যার মাঝে জেগেছে, তার আবার ঘুম আসে কেমন করে? মূঢ়-ভূমিতে এখনও রয়েছি, একটা তন্দ্রার আচ্ছন্নতা এখনো চোখে লেগে রয়েছে, জগতের কলরব অস্ফুট ভাবে অস্পষ্ট শব্দে আমারও প্রাণে বাজ্‌ছে—তাতে সাময়িক চেতনা হচ্ছে—আবার সব ভুল।

তর্কের কথা নয়, তোমার অনুভূতির মাঝেই সেই অমৃতময় বাণীর জ্বলন্ত প্রমাণ নিহিত। অসমাপ্ত সাধনার দরুণ্ অধিকতর যোগ্যতা অর্জ্জন করে সমর্পণের জীবনকে সার্থক করে তুল্‌তে হবে। মহত্বের ভাবনা ভিতরে না ঢুকে, সঙ্কীর্ণ ভাবনাকে পরিত্যাগ কর; দেখবে মহৎকৃপা তার অকুণ্ঠিত সত্তা নিয়ে তোমার দৈনন্দিন জীবনে ফুটে ওঠে কিনা! সংস্কারের বন্ধন থেকে একবার মুক্ত হতে পার্‌লে আর নেই, তখন তাঁর শুভ ইচ্ছা সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাজিত করে তোমার সমস্ত মন-প্রাণকে ছেয়ে ফেল্‌বে। অপরোক্ষানুভূতির পথ খোলা রয়েছে—শুধু চাই আপ্ত-ব্যক্তির নির্দ্দেশ মত নিঃসঙ্কোচে চলা।

মুক্তির পরপারে যে চিন্ময় সৌন্দর্য্যরাশি ফুটে রয়েছে, তার দরুণ অন্তহীন ব্যাকুলতা চাই। তাঁকে পাব, তাঁর দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হ'চ্ছ—এই তো আনন্দের বিষয়। সাধনায় আনন্দ মিলিয়ে যাবে না, উজ্জ্বল হয়ে অসামান্য প্রভা বিস্তার করবে, তাই বলছি, তোমার উন্নতি হচ্ছে না অবনতি হচ্ছে, তার প্রমাণ হবে তোমার আনন্দের অভিব্যক্তি দিয়ে।

অনন্ত প্রান্তরের মাঝ দিয়ে একাকী তোমাকে চল্‌তে হবে, কেউ সাথী হবে না—কেবল তোমার উন্মুক্ত প্রাণ, আর অনন্ত আকাশের দিগন্তব্যাপী নীলিমা। গজেন্দ্রগমনে চললে লক্ষ্যে পৌছান তোমার দায় হয়ে উঠ্‌বে। অনেক ভৎর্সনা তুচ্ছ কথা, চারিদিক হতে নিরাশার বাণী এসে চলনোন্মুখ প্রচেষ্টাকে বাধা দিবে—তুমি কিন্তু ভয় পেয়ো না। তুমি যে বহুদূর যাত্রী, এ কথা যেন স্মরণ থাকে—পথের মাঝে বিশ্রাম তোমাকে পিছিয়ে দেবে।

আনন্দ তোমায় ঠেলে নিয়ে যাবে। নানা দেশ দিয়ে যেমন নদী চলেছে, মানুষের জীবন-স্রোতও এঁকে বেঁকে চিরকাল ধরে নানা সমস্যার মাঝ দিয়ে চল্‌ছে—আর ফুরাচ্ছে না। বিচিত্র লীলা, আর কর্ম্মের কলধ্বনি—কোন কালেই এর শেষ নেই। তুমি থাম্‌তে পার; তা বলে পৃথিবীর কাজ কর্ম্মের বিরাম নেই। আর থাম্‌বার কোন পন্থাই যে নেই, তোমার আনন্দ যে নিজেরও বাহক, অপরেরও সহায়ক—তাই তোমার দায়িত্ব সকলের চেয়ে বেশী। সঙ্কীর্ণতা নিয়ে দম বন্ধ হয়ে অপরে মরে মরুক, কিন্তু তুমি যে বাঁচাবার ভার নিয়েছ। গর্ব্ব করার কিছু নেই, যা পেয়েছ, তাই বিলাবে।

ধনজন-যৌবনের সুখ-শয্যা হতে গাত্রোত্থান করে দুঃসহ ক্লেশে ঘোর নিষ্ঠুর মৃত্যুর মাঝে ঝাঁপ

দিয়ে পড়তে হবে তোমাদের! সর্ব্বাপেক্ষা সুকঠোর সত্যকে সুমধুর করে তুলতে হবে— তোমাদেরই জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে। কাজেই সব কাজে কর্ম্মে অগ্রগামী হতে তোমাদের। তোমাদের ভয় নেই, মৃত্যু নেই,—আছে কেবল আনন্দ। নদী কত বাধা পায়, আবর্ত্তের মাঝে পড়ে মনের খেদে পাক খেতে থাকে, কিন্তু তার আনন্দের বেগকে প্রশমিত করতে পারে এমন সাধ্য কার? সে আর কারও আশা রখে না, চলে শুধু নিজের আনন্দে আর অখণ্ড বিস্তৃত সাগরের অদৃশ্য আকর্ষণে।

যার কাজ বেশী, তার মুখে কথার আড়ম্বর, নেই, আপন মনে সে কর্ম্ম সমাধা করে যাচ্ছে। এত মত, এত পথের সৃষ্টি হচ্ছে—এক এক সময় মনে হয় এগুলি কি বৃথা উল্লাস! কর্ম্মকে পঙ্গু করে দেয় এমন আনন্দ চাই না। কর্ত্তব্যের গুরুভার বহন করেও আনন্দে থাকতে পারি কিনা এই হচ্ছে পরীক্ষা। যাবার বেলায় তিনি মাথা থেকে কর্ম্মের বোঝাটা নামিয়ে বলেননি—তোমরা শুধু আনন্দই করতে থাক। এ কথাটি বলেননি বলেই তো কর্ম্মের বোঝা আমাদেরই বহন করতে হবে বেশীর ভাগ। সবার উপরে তিনি যে আমাদের আনন্দের যোগান দিচ্ছেন, এ কথাটা ভাবলেও তো কত দিকের বোধ জেগে ওঠে।

কত দিকে আকর্ষণ, দৃষ্ট-অদৃষ্ট কত মোহের জাল—সবকে ছিন্ন ভিন্ন করে ঐ লক্ষ্যের দিকে অপ্রতিহত বেগে ছুটতে হবে। যদি এর মাঝেই লাভালাভ খতিয়ান করে দেখবার অনিবার্য্য আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে—তবেই বুঝবে পতন অতি সন্নিকটে। ভয়ে সব থেকে এড়িয়ে চলতেও বলছি না, কিন্তু গতির পথে তাদের আবেদনটাই যেন বড় হয়ে না ওঠে। কথা শুনা না শুনা, তোমার খুসী—খেয়াল।

সাড়া দেশময় সহজ সাধনা বনাম ভণ্ডামির খেলা চলছে। সব জায়গায় ফাঁকী, আর আচমকা একটা কিছু পেয়ে যাওয়া। আবার বেদান্তের ভাব লোপ পেতে বসেছে, রূপের লোলুপতা উগ্র হয়ে দেখা দিয়েছে; তাই বলছি আশা নেই, ভরসা নেই—শুধু নিছক আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকার দরুণ কয়টী সবল হৃদয় চাই। ভাব থাকবে খুব বড়, অথচ আত্ম চরিত সংশোধনের চেষ্টাই রাখতে হবে সজাগ। তাই বড় বড় সাধনার বিভীষিকায় জীবনকে বিভীষিকাময় করে তোলা নয়—দৈনন্দিন জীবনের অতি ছোটখাটো কল্যাণকর নিয়মগুলোকেই প্রাণপণে প্রতিপালনের চষ্টা করতে হবে।

বড় বড় আদর্শের চাপে পড়ে, ছোট ছোট জীবনগঠনমূলক নিয়মগুলো প্রাণ হারাতে বসেছে, অথচ এদের দিয়েই কিন্তু কাজ হয় আমাদের বেশী। প্রথম কাজই আমাদের ওই নিয়মগুলো নিজেদের জীবনে প্রাণপণে প্রতিপালন করা। আর সমষ্টির মন থেকে এদের প্রতি অবজ্ঞার ভাবকে বিদূরিত করা। তাই শুধু স্কীম্ গড়া নয়, প্রতিষ্ঠান পত্তনের দরুণ সৌধ নির্ম্মাণের অযথা আড়ম্বর নয়, সকলের সুখে দুঃখে নিজের জীবনকে জড়িত করে তার মাঝ থেকেই আনন্দরসের যোগান পাওয়া। তাই আমাদের জীবন কঠোরতা আর সৌন্দর্য্যের সমন্বয় স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

"আনন্দে থেকো"—এই সোজা কথাটীরও যে এমন গভীর তাৎপর্য্য রয়েছে, উপদেশ শুনবার সময় তা বুঝিনি। এখন তার গভীর অর্থ ক্রমশঃ দ্যোতিত হচ্ছে। শুধু তাঁর আদেশকে শিরোধার্য্য করেছি বলেই আজ অনেক ক্ষতিকে, ব্যথাকে সহজে ভুলতে পেরেছি। কোন ক্ষোভের কারণ ঘটলে, মুখ যখন কাল হয়ে আসে—তখনই মনে হয়—এই তো তাঁর আদেশ অমান্য হল। এমনি করে জোর করে আনন্দ করতে হয়েছে, এতদিন তা অভিনয়রূপে ছিল—আজ সত্যি বলছি, আনন্দ না পেলে যেন আর বাঁচি না!

আরণ্যক

—:*:—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদ-সংহিতা

বিশ্বাসে মানুষকে অনেকখানি বড় করে দেয়, তার ভিতরে অনেকখানি ভালবাসা ও সঙ্গে সঙ্গে শক্তির সঞ্চয় হয়ে পড়ে। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর জান্‌লেই যে তোমার সম্বন্ধে আমার দ্বন্দ্ব মিটে যায়—আমার যোগ্যতা থাক্ বা না থাক্ তার বিচারের সময়টুকুর সবুর হয় না; যাতে আর কোনও দিন এ বিশ্বাসের অপচয় না ঘটে, সে জন্য তখনই মনটাকে বাঁধা সুরু হয়ে যায়। সামান্য মানুষ হয়েও আমি তোমার বিশ্বাসের যখন এত মূল্য দিতে স্বীকার করি, তখন ভগবানের উপর বিশ্বাস কর্‌তে তিনি কি সে বিশ্বাস রাখবেন না? তাঁকে ভালবাস্‌লে, বিশ্বাস কর্‌লে যে আপনি হৃদয় উদার হয়ে যায়, সকলের মাঝেই তাঁর সাড়া পেয়ে সকলকে জড়িয়ে ধর্‌তে ইচ্ছা হয়। তাঁর সান্নিধ্যে এমনি করে অজ্ঞাতে আপনাকে বৃহৎ শক্তিমান্ করে তুল্‌তে পারি আমরা। তাঁকে বিশ্বাসের এমনি মহিমা—তাই চাই শুধু বিশ্বাস। আবার যে কোনও কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগের পূর্ব্বেও তার ভিতরকার সত্য বস্তুর উপর হৃদয়ের যে গভীর বিশ্বাস, তা শুধু সেই কাজটাই সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করে না—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসীকে অনেক কিছুর সঙ্গে যুক্ত করে অনেকখানি বৃহৎ ও শক্তিমান্ করে দিয়ে যায়। বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই তদ্বিষয়ে প্রেম, প্রেমেই শক্তি সঞ্চয় হয়—মানুষ বড় হয়ে যায়।

✿

সাধারণ মানুষ স্বপ্নজগৎকে যেমন জাগ্রৎ অবস্থায় অলীক বলে জানে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে তেমনটি করে জানাটাই হচ্ছে দ্রষ্টৃত্বের লক্ষণ। তা না হ'লে সাধারণ মানুষের ন্যায় দ্বন্দ্বের অভিঘাতে দ্রষ্টা কি আপনাকে অচল অটল রাখতে পারেন? ঝঞ্ঝাবাতাগ্রস্ত মহাসাগরের ন্যায় সংসারের আলোড়নে দ্রষ্টা অবিক্ষুব্ধ, আর ইতর সাধারণ উহাতে ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ। এইটুকুই দ্রষ্টা এবং অদ্রষ্টায় তফাৎ। জনকরাজার অন্তঃপুরে আগুন লাগল আর সকলেই দেখছে সব যেন পুড়িয়ে ছাই হতে চলেছে, কিন্তু জনকের এতে কোন চেষ্টাই দেখা গেল না, তিনি শুধু বললেন—"মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহতি কিঞ্চন।"

✿

বিশ্বাসো হি ধর্ম্মমূলং—অর্থাৎ ধর্ম্মের মূলই বিশ্বাস; বিশ্বাসহীন মানব জগতের কোনও সুখ শান্তির অধিকারী হইতে পারে না। তুমি যতই ন্যায় নিষ্ঠাপরায়ণ হওনা কেন, অবিশ্বাসের ফলে সকলই ধর্ম্মের ভাণ হইবে। অপবর্গ তো মিলিবে না! বিশ্বাসে কঠিনও হয় সহজ।

✿

প্রকৃত উপদেষ্টা শিষ্যকে প্রতিশ্রুতির শৃঙ্খলে বাঁধে না।

✿

সংসার বলতে সাধারণতঃ পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র-কন্যা প্রভৃতিকে নিয়া—ইহাই বুঝায়; কিন্তু সংসার কথার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, পুনঃ পুনঃ জন্ম নেওয়া; সংসারযন্ত্রণাও এইটী, এবং মুক্তির জন্য তপস্যাও ইহারই।

সত্যদ্রষ্টা তুমি। অন্তরের মধ্যে বিষবৃক্ষের অঙ্কুর দেখিয়া হতাশ হইও না, নিজকে খাঁটি রাখিও, প্রশান্ত হইও—দেখিবে, মন্ত্রশক্তি এবং অপূর্ব্ব ফল ফলিয়াছে।

মানুষের যতদিন কামনা থাকে, ততদিন অপরকে বুঝতে পারে না। মানুষ নিজের কামনা থাকতে অপরের দরদী হতে পারে না। সে যে নিজেই ভুল পথে চলেছে, কি করে সে অপরের ভুলসংশোধনের দরদী হবে? জগতে আমরা অপরের সমালোচনা করতে গিয়ে শিব গড়তে বানর গড়ে বাস। কাজেই ক্ষুদ্র কামনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে হৃদয় দিয়ে অপরকে দেখাই হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব।

মানুষ যতখানি সত্যের পথে এগুবে, ততখানি দায়িত্বসম্পন্ন হবে আর নিজের হৃদয় দিয়ে অপরের হৃদয় জয় করতে পারবে। দায়িত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তি অপরের দোষের চেয়ে গুণের অংশটাই বেশী দেখতে পায়। স্বার্থ আর দায়িত্ব এক জিনিষ নয়। স্বার্থে গণ্ডী আঁটা থাকে; স্বার্থশূন্য ব্যক্তিকে গণ্ডীতে বদ্ধ করতে পারে না, দূরে পালিয়ে যায়। তাই মানুষকে নিজের ব্যক্তিত্বের অভিমান ছেড়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নামতে হবে। এতেই মানুষের শান্তি।

মানুষ অপরের একটুখানি উপকার করেই মনে করে, অপরকে সে কৃতার্থ করেছে। কিন্তু কেউ কাউকে কৃতার্থ করতে পারে না। যার যেমন কর্ম্ম তাকে তেমনি করতেই হবে। নিজের ভাগটাই নিজে করে যায়। সিংহ সে সর্ব্বদাই পশুর রাজা। সবার ভিতরেই পুরুষসিংহ স্বমহিমায় বিরাজমান; সে কারো তোয়াক্কা রেখে চলে না। তাই দেখি—ধনীও চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য পেয় উপভোগে দিন কাটাচ্ছে, আর গরীব শাকান্ন খেয়েও দিন কাটাচ্ছে; ধনী নিজের বর্ত্তমান অবস্থায় উচ্চ কামনার পেছনে ছুটেছে, আর নির্ধনীর তো কথাই নাই। জগতে ধনী আর নির্ধনীতে কোন পার্থক্য নাই; সবাই কামনার দাস। তাই বুঝি ভারতসম্রাট্ আকবরকেও কৌপীন-মাত্রৈকসম্বল সন্ন্যাসীর কাছে ভিক্ষুক প্রতিপন্ন হতে হয়েছিল। যে কামনাকে জয় করতে পেরেছে, সেই ধনী, সেই বাদশাহ, সেই প্রভু—জগৎ তার প্রজা।

ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে যেমন করে পাপ-পুণ্য ভোগ করতে হয়, অপর জীবের তা হয় না। কারণ মানুষ ভাল-মন্দ বোঝে। অন্যান্য জীব প্রকৃতির বশে চলেছে; তাদের ভাল-মন্দ কোনটাই নাই। মানুষের মত পশুপাখীর মধ্যে উপকার-অপকারের বালাই নাই। মানুষ তার জীবনের সবখানকে পেয়ে, উপকার-অপকার বুঝে দায়িত্ব-সম্পন্ন হয়েছে, তাই তার মধ্যে পাপ-পুণ্য এসে পড়েছে। আত্মবিচারই তার বিশেষত্ব।

সাধুর জীবনে শিল্প ফুটবে না, এ অরসিকের কথা। সাধু হবে সব চেয়ে বড় আর্টিষ্ট। সৌন্দর্য্যের রাণী সাধুর প্রতি চলায়-ফিরায় রং ফলিয়ে দিবে। মহাসাধু বিশ্বের বিধাতার কাজকর্মে কি সৌন্দর্য্যের কামাই আছে কোনোখানে?

পাঁচফুলের সাজি নিয়ে মন্দিরে যাচ্ছি। ছোট, বড় ফুলের মাঝে থাকবেই। সবার গন্ধও যে সমান হবে, তাও নয়। কিন্তু সবগুলিই যেন অক্ষত হয়, পুজারীর চোখ থাকবে শুধু ঐদিকটায়।

আইন বন্ধন নয়। দেহটাকে জড়ত্বের হাত হতে রক্ষা করবার, চিন্তাধারাকে সুষ্ঠু রেখে ক্রমোন্নতির

পথে এগিয়ে নেবার উপায় মাত্র। নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকাই ভবিষ্যৎ উন্নতির চিহ্ন।

তোমার সামনে যেমন আরও পাঁচজনকে চল্‌তে ফির্‌তে দেখ্‌ছ, তোমার আশ্রিত দেহটাকেও ঐরূপ বলে ভাব। এ দেহের প্রতি তোমার যেমন দরদ, অন্যের প্রতিও তাই হওয়া উচিত। সবই যে তোমার।

ফুলকে আদর্শ কর। তোমার মনমত জগৎ গড়ে উঠবে না। তোমার মনমত তুমি হও আগে!

সংবাদ ও মন্তব্য

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে পুরীধামে অবস্থান করিতেছেন।

আগামী ২৮শে বৈশাখ হইতে ৩০শে বৈশাখ পর্য্যন্ত দিবসত্রয় অত্রত্য সারস্বত মঠের দ্বাবিংশ বার্ষিক মহোৎসব ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জন্মমহোৎসব সম্পন্ন হইবে। আমরা সাধু, ভক্ত ও আর্য্যদর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণকে এই উৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

দানপ্রাপ্তি

পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে—

সংগৃহীত—গ্রাম শালদহ ৮৲ বড়বেড়া ৯।/০ রূপুসকুণ্ডী ৫৵০ পানীঝাকা ৮৵০ দক্ষিণশোল ৪৲ মৌরাকান্দি ৩৷৵১০ সাপধরা ৩৲ পাকুড়ীয়া ৬॥৵১০ মালবান্দী ৩.০ আড়ি ১৮০ পনুখীশোল ৩৷৵০ গণ্ডানাটা ৪৲ বেনাশোলি ৩০ মানুষমুড়ীয়া ৭৮॥/১০।

বর্ষশেষে

শ্রীগুরুর মঙ্গলময় অঙ্গুলিসঙ্কেত অনুসরণ করিয়া "আর্য্যদর্পণের" একবিংশ বর্ষ সমাপ্ত হইল। বৈশাখ মাস হইতে আর্য্যদর্পণ ২২শ বর্ষে পদার্পণ করিবে। শ্রীগুরুর কৃপায় এবং গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগের আনুকূল্যে আমরা এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ দেশের ও বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়া নিজকে ধন্যজ্ঞান করিতেছি। আর্য্যদর্পণ যে ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকদিগের আদরের সামগ্রী হইয়াছে, ইহা ভগবানেরই কল্যাণময় আশীর্ব্বাদের ফল।

নববর্ষের পত্রিকা বৈশাখের শেষভাগে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করি।

যাঁহারা আগামী বর্ষে পত্রিকা লইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে মনিঅর্ডারযোগে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধা, নতুবা ভিঃ পিঃতে পত্রিকা লইতে বিলম্ব হইবে এবং খরচও বেশী পড়িবে। ১৫ই বৈশাখের মধ্যে পত্রিকার মূল্য অথবা নিষেধসূচক পত্রাদি না পাইলে আগামী বর্ষের পত্রিকা বৈশাখের শেষভাগে গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইবে। যাঁহারা আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকিবেন না, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৫ই বৈশাখের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন। গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিলে তাঁহাদের কোনও ক্ষতিই হয় না, কিন্তু আমাদিগকে নিরর্থক ডাক-খরচ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং যাতায়াতে পত্রিকাখানিও নষ্ট হইয়া যায়। গ্রাহকদিগের অনবধানতায় পত্রিকা ফেরৎ আসিলে আমাদিগকে কতখানি ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া অনিচ্ছুক গ্রাহকগণ যেন অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বেই একখানা কার্ড লিখিয়া আমাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতে নিষেধ করেন। ভরসা করি, আমাদের এই অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না।